বর্ধমান জেলার ইতিহাস
ও
লোকসংস্কৃতি



প্রথম খণ্ড

বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি

প্রথম খণ্ড

একক‌ড়ি চট্টোপাধ্যায়



র‍্যাডিক্যাল
কলকাতা
২০০০

BARDHAMAN JELAR ITIHAS O LOKOSANSKRITI/PRATHAM KHANDA

প্রথম প্রকাশ :
অক্টোবর, ২০০০

প্রচ্ছদ :
অমিতাভ ভট্টাচার্য

প্রকাশক ও মুদ্রক :
অরুণকুমার দে
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

পরমারাধ্যা স্বর্গগতা জননী

কমলিনী দেবী

ও

পরমারাধ্য স্বর্গগত পিতৃদেব

হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

সবিনয় নিবেদন

জেলার ইতিহাস প্রসঙ্গে W. W. Hunter লিখেছেন—Every country almost every parish in England has its annals but in India vast provinces have no individual history whatever. Districts that have furnished the sites of famous battles or lain upon the routes of Imperial progress appear in for moment in the general records of the country, but before the eye has become familiar with their uncouth names, the narrative passes on and they are forgotten.

In the dedicatory epistle, Hunter declared that his business is with the people and the pages of his annals have little to say touching the governing race.

জেলার তো দূরের কথা, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ছিল না। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর কারমাইকেল মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে আমন্ত্রণ করে তিনখণ্ডে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ যুগের ইতিহাস রচনার প্রস্তাব দেন—ফল কি হয়েছিল জানা নাই। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাংলাদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জেলার বিশেষ করে বর্ধমান জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য আমাদিগকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়। এর মধ্যে চেষ্টা যে হয় নাই, তা নয়; W. W. Hunter ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর Annals of Rural Bengal প্রকাশ করেন। এটি মূলত বীরভূম জেলার আদিবাসীদের জীবন নিয়ে লেখা হলেও এতে বর্ধমান সম্পর্কিত অনেক তথ্য সন্নিবেশিত আছে। এরপর Hunterএর Statistical Accounts of Bengal (Districtwise 20 volumes), Burdwan ও Imperial Gazetteers-র বর্ধমান জেলা সম্পর্কিত তথ্য বর্ধমান জেলার ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস বলা যেতে পারে।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট W. B. Oldhamএর রচিত Some Historical and Ethical Aspects of the Burdwan district জেলার ঐতিহাসিক ও জনজীবন সম্পর্কিত এক বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে অভিনন্দনযোগ্য। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে Petersonএর Burdwan Gazetteer জেলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সমন্বিত অমূল্য আকর গ্রন্থ। ১৯১৫

খ্রীষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ বসু 'বর্ধমানের পুরাকথা' রচনা করেন। এই সময় বর্ধমান রাজ এস্টেটের ম্যানেজার রাজা বনবিহারী কাপুরের নির্দেশে রাখালদাস মুখোপাধ্যায় বর্ধমান রাজবংশের কাহিনী নিয়ে 'রাজবংশানুচরিত' রচনা করেন।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ডঃ অশোক মিত্র আই.সি.এস. মহাশয়ের সম্পাদিত District Census Handbook, 1957 ও Tribes and castes of West Bengal, পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (৫ম খণ্ড, বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলা)। ড. মিত্র মহাশয় বর্ধমান টাউন স্কুলের ছাত্র ছিলেন ও কিছুকাল বর্ধমানের জেলাশাসক ও District Census Officer ছিলেন। কাজেই তাঁর সম্পাদিত পুস্তকগুলি জেলার জনজীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত এক গুরুত্বপূর্ণ অমূল্য গ্রন্থ। ১৯৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুকূলচন্দ্র সেন ও নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী রচিত 'বর্ধমান পরিচিতি' পুস্তকাকারে বর্ধমান জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস হিসাবে অভিনন্দনযোগ্য।

বর্ধমান জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হিসেবে সেন ও চৌধুরীর 'বর্ধমান পরিচিতি'র পর নানা নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ সুধীরচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের 'বর্ধমান পরিক্রমা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়েই ১৯৯০-৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয় অশেষ পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও সততা সহকারে তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' তিনখণ্ডে প্রকাশ করেন। বইটি জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত তথ্যের খনি বিশেষ ও জেলা সম্পর্কিত অমূল্য গ্রন্থ।

অনুকূলচন্দ্র সেন ও নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, সুধীরচন্দ্র দাঁ ও যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী প্রত্যেকেই আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তথ্য সংকলন করেছেন; কাজেই এই তথ্য সংকলন ও বিচার বিশ্লেষণের ধারা প্রতিটি লেখকের ক্ষেত্রে পৃথক হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুমিত সরকারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

History is never a set of given facts, it is always open to diverse reading and interpretation which however must always remain to the test of available evidence (Dr. Sumit Sarkar, Statesman 4.3.2000). তাছাড়া ইতিহাস কেবল রাজারাজড়ার কাহিনী নয়, তাদের জয়পরাজয় উত্থানপতনের বিবরণ নয়—ইতিহাস বিশেষভাবে জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত—গ্রীসের আদি ঐতিহাসিক Herodotusএর কথায় History is a narrative of events and circumstances relating to man in his social or civic condition.

ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য জনজীবন—তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ—যে কার্যকলাপ সমকালীন সমাজকে

অতীতেও প্রভাবিত করেছে, বর্তমানেও করছে আবার ভবিষ্যতের ইতিহাসকেও প্রভাবিত করবে।

জীবনের প্রথম ভাগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত অবস্থায় আমাকে জেলার বহু গ্রামে ঘুরতে হয়েছে—অনেক গ্রামে ক্যাম্প-অফিস করে কিছুদিন থাকতেও হয়েছে। সে-সময় জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছে, তাদের ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, পূজাপার্বণ, অর্থনৈতিক অবস্থা, গ্রামের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মন্দির, মসজিদ, দেবস্থান, পীরস্থান ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছি। এর কারণও ছিল। সেটেলমেন্ট বিভাগে থাকার সময় কোন মৌজার তসদিক (attestation) সম্পূর্ণ হলে সেই মৌজা সম্পর্কিত একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখে জেলা অফিসে পাঠাতে হতো—যার ভিত্তিতে সেটেলমেন্ট অফিসার Settlement Operation শেষে জেলা স্তরের রিপোর্ট তৈরি করে সরকারে জমা দিতেন। তখন থেকেই জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার একটা সুপ্ত বাসনা জাগ্রত হয়। কিন্তু সময়ের অভাবে হয়ে ওঠে নাই। তবে ১৯৬৪ সালে বর্ধমান শহরে রাজ কলেজিয়েট স্কুলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থের জন্যে 'জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি' সম্পর্কিত এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে দিতে হয়। এরপর সেই প্রবন্ধের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের মুখপত্র 'সাপ্তাহিক পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার ১৯৭২ সালের ৩রা নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

তখন থেকে তথ্য সংগ্রহ অব্যাহত থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> "কলসে কেবল জলই ভরিতে থাকিলাম—কোন দিন দান পানের উপযোগী হইল না।"

এরপর চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর হঠাৎ একদিন যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের তিনটি খণ্ড হাতে এলো। মনে পড়ে গেল সাহিত্যিক তারাশঙ্করের একটি লেখা (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৫)—

> "আগুনের আসল সত্তা উত্তাপ—সে তার মৌলিক সত্তায়—সর্বত্র ছড়িয়ে আছে—কিন্তু থাকলেও সে দৃশ্যমান নয়। অকস্মাৎ বস্তুপুঞ্জকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করে। তখন উত্তাপের সঙ্গে সে দীপ্তিমান হয়ে ওঠে। প্রদীপে তেল আছে—সলতে আছে, শিখা নাই। সে শিখাটি নিতে হয় আর একটি জ্বলন্ত প্রদীপের শিখা থেকে। শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে কীর্তিমানের সংস্পর্শে বা কীর্তির সংস্পর্শে এসে নবীন জীবনের দীপাধারের তেল-

সলতের উপকরণ প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠে—জীবনের গুণের উপকরণে আগুনের ছোঁয়া লেগে ভিতরের আগুন আত্মপ্রকাশ করে।"

আমার জেলার ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে একথা কতখানি যে সত্য তা লিখে প্রকাশ করতে পারবো না। যজ্ঞেশ্বরবাবু-র "বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি" গ্রন্থটির খণ্ড তিনটি হাতে আসায় অমনি আমার জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত তথ্যের ভাণ্ডার প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো—তবে যজ্ঞেশ্বরবাবুর ইতিহাস যেখানে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত দীপ্তিমান তার পাশে আমার এই প্রচেষ্টা নগণ্যমাত্র। জ্যোতি কতখানি দেবে সে বিচারের ভার ঐতিহাসিক ও পাঠকদের ওপর। কারণ ইতিহাস যিনি লিখবেন তাঁর দায়িত্ব বড় কঠিন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব সম্পর্কে কিরণশঙ্কর রায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

"একথা ভুলিলে চলিবে কেন যে কলের ইতিহাস লিখিতেছ না, মানুষের ইতিহাস লিখিতেছ। মানুষের প্রাণ আছে, নানারকম বৃত্তি-প্রবৃত্তি আছে, যাহা কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই বিশ্লেষণ করা যাইবে না, যাহা কেবল নিজের কল্পনা দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। মনকে মন দিয়াই বুঝিতে হইবে নচেৎ যাহা বোঝা যাইবে তাহা সত্য নহে। .....আমরা আমাদের দেশে এমন ঐতিহাসিককে চাই যিনি তাঁহার কল্পনার দ্বারা আমাদের অতীতকে জীবন্ত করিয়া তুলিবেন, ...অতীতের আদর্শ দেখাইয়া আমাদের ভবিষ্যতের আদর্শ এই দেশের কালো আকাশে আলোর রেখায় আঁকিয়া দিবেন।" (সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩২২)

অতুলচন্দ্র গুপ্তও প্রায় একই কথা বলেছেন—"যে জাতীয় সত্য ইতিহাসের লক্ষ্য, তাহা দৈনন্দিন জীবনে সর্বসাধারণ যাহা লইয়া কারবার করে, সেই রকম সত্য। সুতরাং সে সত্য আবিষ্কারের প্রণালীও সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষের প্রতিদিনকার কাজের যুক্তির প্রণালী। যে প্রণালীতে কোনও বৈজ্ঞানিক বিশেষত্বের আশা করা দুরাশা।"

"একথা সত্য যে সমসাময়িক সাহিত্য, ঘটনা লোকচরিতের মধ্য দিয়াই অতীতের মনকে অনুভব করিতে হইবে এবং সেই সমস্ত দলিল নির্বাচনে একটা বিচারশক্তি প্রয়োজন, যাকে বৈজ্ঞানিক বলা যাইতে পারে কিন্তু সকলের চেয়ে প্রয়োজন অতীতের মনকে গ্রহণ করিবার শক্তি, অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎসাহ। কারণ শ্রদ্ধা ভিন্ন অতীতের রহস্য বোঝা যাইবে না—ইহাই প্রকৃত ঐতিহাসিকের বিশেষত্ব।" (সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪)

ঐতিহাসিক আমি নই—অতীতের ঘটনা, নিদর্শন, তথ্য, সমসাময়িক সাহিত্য, ঘটনা এবং লোকচরিত ও দলিল-দস্তাবেজের সঠিক নির্বাচন করে তাদের পেটের

কথা বের করে এনে নিপুণভাবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা কতটুকু সে-সম্পর্কেও অবহিত নই। তবে একথা জোর দিয়ে বলতে পারি অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধা, উৎসাহের কোন ঘাটতি আমার ছিল না বা আজও নাই। সেই সততা, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায় সহকারে অতীতের মহৎ আদর্শকে কতটা আমার পুস্তকে তুলে ধরতে পেরেছি—আমাদের ভবিষ্যতের আদর্শকে এ-জেলার আকাশে আলোর রেখায় এঁকে দিতে সক্ষম হয়েছি—সুধী সমাজ ও পাঠকবর্গ তাঁর বিচার করবেন। আমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁদের রায়ের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করব—অবশ্য যদি অপেক্ষা করার জন্য বেঁচে থাকি। তাছাড়া পাঠকদের কাছে সবিনয় নিবেদন, সূচীপত্রে বিষয়বস্তুর যেভাবে বিন্যাস করা হয়েছে এই গ্রন্থে সেভাবে উল্লেখ নাই—সূচী অনুসারে মোটামুটি পরপর আছে।

এবার কৃতজ্ঞতা জানাবার পালা। এই গ্রন্থরচনায় অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি কুমির-কোলার আমার স্নেহভাজন উত্তম চট্টোপাধ্যায়, মেড়ালের গৌর দত্তরায়, ভাতারের অনিল সোম, নাড়ুগ্রামের আমার সহকর্মী ও সহাধ্যায়ী অজিত মুখোপাধ্যায়, অনুজপ্রতিম সত্য ভট্টাচার্য, বোঁয়াই নিবাসী সুভাষ দিকপতি, আমার প্রয়াত সহকর্মী ক্ষীরগ্রামের সমর চৌধুরী, সহকর্মী বর্ধমানের দীনেশ ভট্টাচার্য, আমার স্নেহভাজন ছাত্র ভোঁতার মহম্মদ জিকরিয়া, বর্ধমানের বিশ্বপতি মজুমদার, ইছলাবাদের শ্রদ্ধেয় সুনীল ঘোষ এবং আরও অনেকের কাছ থেকে। সকলের কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

তবে বইটি আজ ছাপার অক্ষরে যে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে তার একমাত্র কৃতিত্ব আমার সহোদরপ্রতিম সহকর্মী শিবু চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র আমার স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান ডা. অভিজিৎ ও র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশনের অরুণকুমার দে ও কর্মীবৃন্দের। আমি অসুস্থ—শিবুবাবুর চেষ্টায় অরুণবাবু আমার বাড়ীতে এসে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেছেন। শিবুবাবু ও অভিজিৎ দফায় দফায় প্রুফ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে এদের ঋণশোধ হবার নয়—ঈশ্বরের কাছে এঁদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলকামনা করি।

চিত্র–তালিকা

[প্রথম খণ্ড]

চিত্র পরিচিতি

[প্রথম খণ্ড]

১. **বীরভানুপুরের প্রস্তরায়ুধ**
১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে দুর্গাপুরের নিকট দামোদর নদীর উত্তরতীরে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় অধীক্ষক শ্রী বি. বি. লাল উৎখনন চালিয়ে ৪০০০ বছর আগেকার ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ আবিষ্কার করেন।

২ক. **প্রাচীন প্রস্তরায়ুধ : বনকাটি**
ঐ সময়েই কাঁকসার জঙ্গলে বনকাটি অঞ্চলে প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর প্রস্তর আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়।

২খ. **ক্ষুদ্রাশ্মীয় প্রস্তরায়ুধ : পাণ্ডুরাজার ঢিবি**
আউসগ্রাম থানার পাণ্ডুক গ্রামের রাজাপোতাডাঙ্গায় ১৯৬২–৬৪ পর্যন্ত ৪ বাব খনন কার্য চালিয়ে ক্ষুদ্রাশ্মীয় প্রস্তরায়ুধ, ধূসরবর্ণের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

৩. **মস্তিষ্কের করোটি : পাণ্ডুরাজার ঢিবি**

৪. **জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান বা বাবলাডিহির নেংটাশ্বর**
১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে কালাপাহাড়ের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে নিমজ্জিত একটি পুস্করিণী থেকে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের তিনফুট উচ্চ প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এই মূর্তিটি বাবলাডিহিতে নেংটেশ্বর মহাদেব রূপে পূজিত হচ্ছে।

৫. **তীর্থঙ্করগণের মূর্তি ক্ষোদিত প্রস্তরফলক : সাতদেউলিয়া**
মশাগ্রাম স্টেশন থেকে আঝাপুরের দিকে ২–৩ কিমি গেলেই সাতদেউলিয়ার জৈনমন্দিরে জৈন তীর্থঙ্করের অসংখ্য মূর্তি প্রস্তরফলকে ক্ষোদিত আছে।

৬. **প্রাচীন শিখরদেউল মন্দির : সাতদেউলিয়া**
সাতদেউলিয়ার জৈনমন্দির শিখর দেউল রীতিতে গঠিত।

৭ক. **বুদ্ধমূর্তি : ভরতপুর**
পানাগড় রেলস্টেশন থেকে ৪ কিমি দক্ষিণে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহযোগিতায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভরতপুরে উৎখননের ফলে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধমূর্তি ও খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বছরের কাছাকাছি সময়ের তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে।

৭খ. **বৈশ্রবণ মূর্তি : কাঞ্চননগর**
বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে কাঞ্চননগর যখন সাথর্কনামা ছিল—যখন এখানে বর্ধমানরাজের প্রাসাদ ছিল, ধূস দত্তদের বাণিজ্যের রমরমা ছিল, সেই সময়ে বৈশ্রবণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈশ্রবণ অতি প্রাচীন দেবতা। আসলে বৈশ্রবণ

কুবেরের অন্য নাম—ধনাধিপতি যক্ষরাজ। তবে বর্তমানে ইনি কালাচাঁদ নামে পরিচিত; শিবের ধ্যানে পূজা হয়। পুরোহিত কালাচাঁদের নামে কবচ, মাদুলি দিয়ে দু-পয়সা উপায় করেন।

৮ক. বর্ধমানের ৭ম শতাব্দীর জামা মসজিদ

বর্ধমানের রাজবাড়ীর দক্ষিণে পুরাতনচক এলাকায় ৭ম শতাব্দীতে নির্মিত জামা মসজিদ।

৮খ. ষোড়শ শতাব্দীর বহরাম সক্কার মাজার

শাহ্ মহম্মদ আদিতে ছিলেন পেশোয়ারের অধিবাসী। তিনি পীর বহরামের বহু পূর্বেই ইসলামের আদর্শ প্রচারের জন্য বর্ধমানে আসেন। পরে তিনি পীর বহরাম সক্কা সাহেব নামে পরিচিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজবাড়ী সংলগ্ন দক্ষিণ প্রান্তে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর মাজারে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সিরনি দেয়।

৯. তালিতগড়ের মাটির দুর্গের ধ্বংসাবশেষ

বর্ধমানে ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে বর্গী হাঙ্গামার সময় মহারাজ চিত্রসেন বর্গী হাঙ্গামা প্রতিরোধকল্পে তালিতের দক্ষিণ রেলগেটের পশ্চিমে মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা দুর্গটি নির্মাণ করান। বর্তমানে এর কোন চিহ্ন নেই।

১০. কালনার মজলিস সাহেবের মসজিদ

কালনা থেকে ২ কিমি দূরে শাসপুরে তুর্কি আফগান যুগের তিনটি মসজিদের অন্যতম এইটি। মজলিস সাহেব ও বদরসাহেব এখানে আসেন ইসলাম ধর্মপ্রচারের জন্য। ১৪৯০–৯১ খ্রীস্টাব্দে ২য় নাসিরুদ্দিন শাহের আমলে মসজিদটি নির্মিত হয়।

১১. খাজা আনোয়ার সাহেবের নবাববাড়ি

১২. খাজা আনোয়ার সাহেবের নবাববাড়ির হাওয়া মহল

রহিম খানের সঙ্গে যুদ্ধে খাজা আনোয়ার হোসেন ও খাজা আব্দুল কাশেম শহীদের মৃত্যুবরণ করেন—১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ফারুকশিয়ার কর্তৃক পোদ্দার হাট (বর্তমানে আনোয়ার বেড়) অঞ্চলে ১০ বিঘা জমির ওপর খাজা আনোয়ার ও অন্যান্য শহীদদের সমাধিস্থল নির্মাণ করা হয়। প্রাসাদ, হাওয়া মহল, জলটুঙ্গি, মসজিদ, বেগমমহল সহ সমাধিস্থল আজ ভিখারীদের আশ্রয়স্থল। প্রাসাদের পরই চতুষ্কোন পুষ্করিণী—মধ্যে ঘর—পাড় থেকে হাওয়ামহল পর্যন্ত যাবার বাঁধানো প্রশস্ত পথ। এই ঘরে জ্যোৎস্না রাত্রে বেগমরা হাওয়া খেতে আসতেন—মধ্যে মধ্যে গানের জলসা বসতো।

১৩. বরাকরের ৪নং শিবমন্দির

বরাকরের ৪টি শিব মন্দিরের অন্যতম। এই মন্দিরের স্থাপত্য অপরূপ। শীর্ষদেশ বেগুনের আকৃতি বিশিষ্ট বলে এটিকে বেগুনিয়া মন্দিরও বলে।

১৪. কাঞ্চননগরের বহির্ভাগে বারোদুয়ারি গেট

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চিতুয়া বরোদার রাজা শোভা সিং ও বিষ্ণুপুরের রাজাকে পরাজিত ও হত্যা করে বিজয়স্তম্ভ স্বরূপ কাঞ্চননগরের বহির্দ্বারে ১২টি একই আকারের তোরণ নির্মাণ করান। ১২টির মধ্যে এখন ১টি বর্তমান—পাশেই তোরণের ইতিহাস লেখা আছে। তোরণটি মধ্যযুগের স্থাপত্যের নিদর্শন।

১৫. বারোদুয়ারি গেটের স্মৃতি ফলক

গেটের স্মৃতিফলকে নিম্ন-বর্ণিত ইতিহাস লেখা আছে—বর্ধমানাধিপতি বীরবর কীর্তিচন্দ রায় চিতুয়া ও বরদার জমিদার শোভা সিংহের পাশবিক অত্যাচারের প্রতিশোধার্থে তাহার ভ্রাতা হিম্মত সিংহ প্রভৃতিকে সম্মুখ সমরে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্বে পরাজয় করিয়া বর্ধমানের নিকট স্বচ্ছাপিত কাঞ্চননগরের প্রবেশদ্বার বারদ্বারী নামক স্থানে যে দ্বাদশটি বিজয়তোরণ সংস্থাপন করেন তম্মধ্যে এইটি বর্তমানে তাঁহার সেই প্রাচীন কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

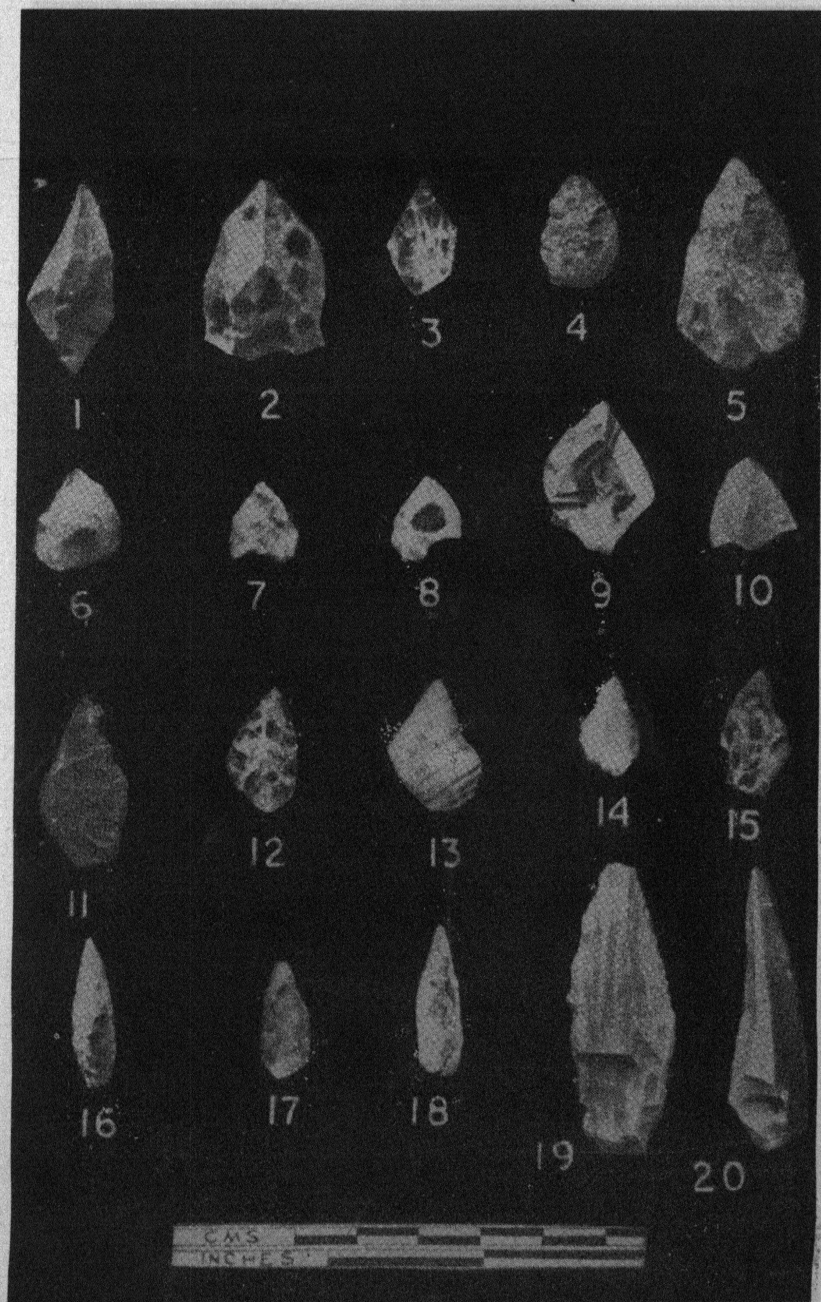
ফলকে হিন্দীতেও অনুরূপ কথা আছে।

১৬. বিজয়তোরণ

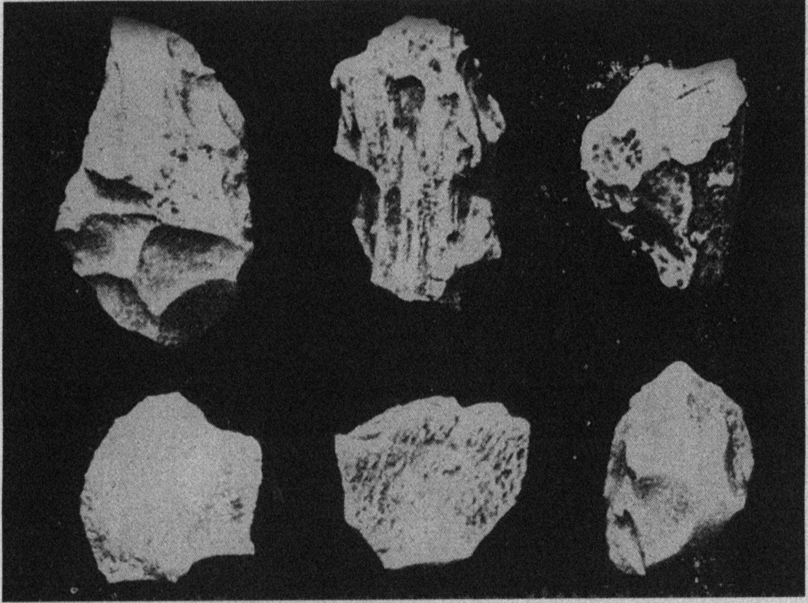
১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাবের আমন্ত্রণে বড়লাট লর্ড কার্জনের আগমন উপলক্ষে এই সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হয়। গথিক স্থাপত্যের এই সুদৃশ্য তোরণের প্রথমে নাম ছিল STAR OF INDIA, পরে হয় কার্জন গেট ও বর্তমানে বিজয়তোরণ।

কৃতজ্ঞতা

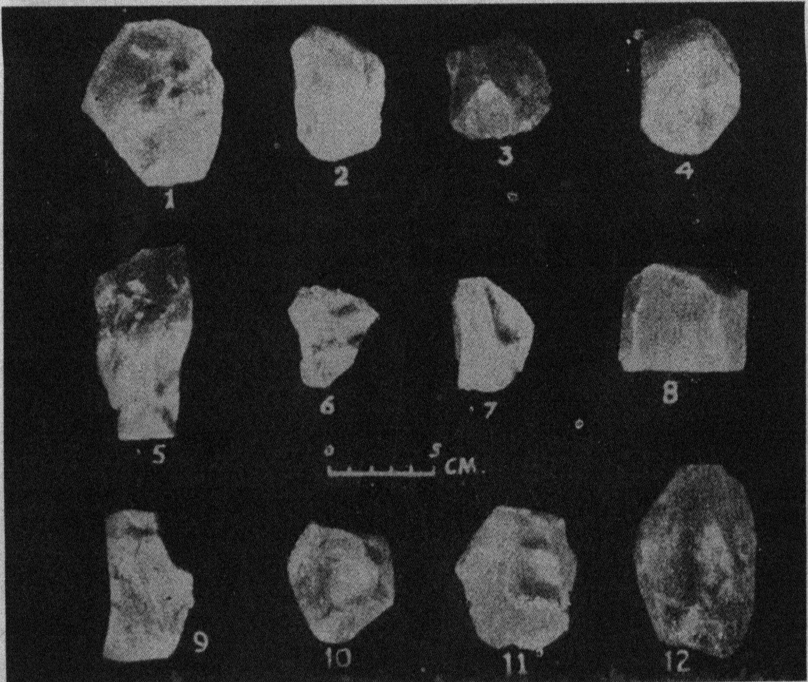
ডঃ কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষাল,
যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা ১৪০৩, ডঃ বিনয় ঘোষ



১. বীরভানুপুরের প্রস্তরায়ুধ



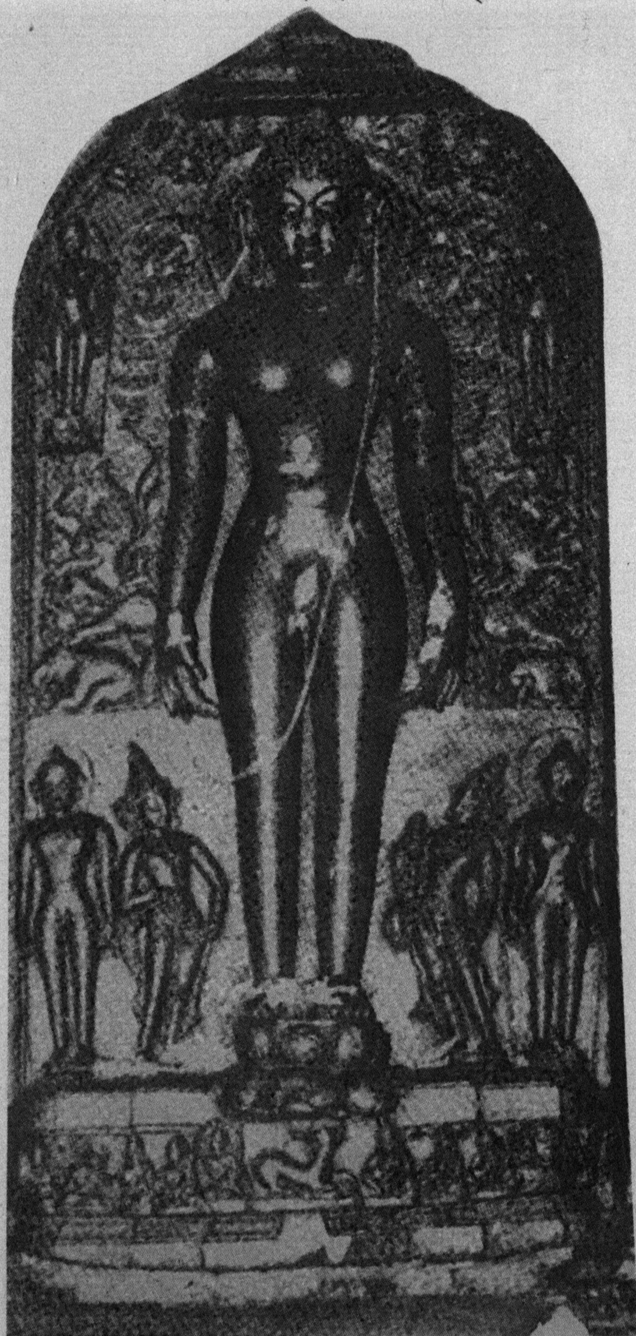
২ক. প্রাচীন প্রস্তরায়ুধ : বনকাটি



২খ. ক্ষুদ্রাশ্মীয় প্রস্তরায়ুধ :পাণ্ডুরাজার ঢিবি



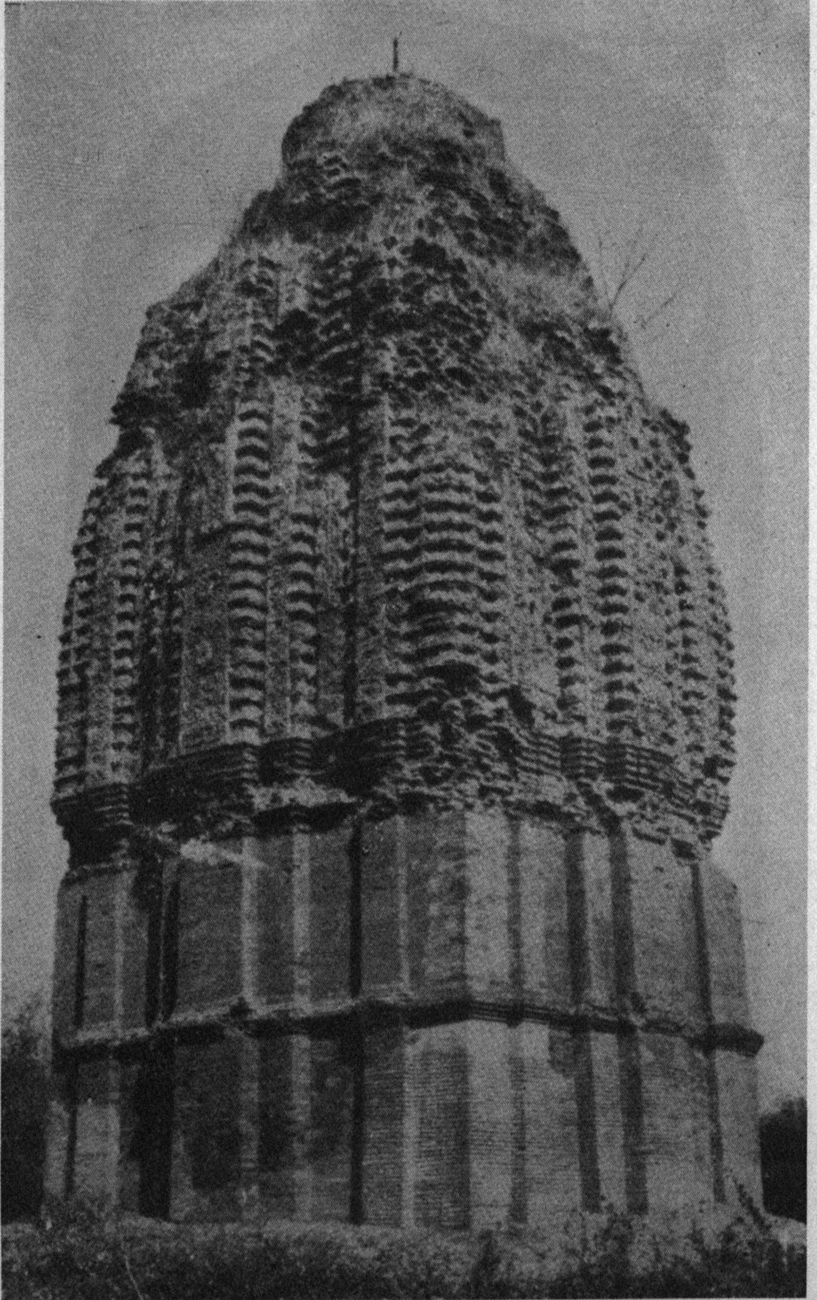
৩. মস্তিষ্কের করোটি : পাণ্ডুরাজার ঢিবি



৪. জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান বা বাবলাডিহির নেংটাশ্বর মহাদেব



৫. তীর্থঙ্করগণের মূর্তি ক্ষোদিত প্রস্তর ফলক : সাতদেউলিয়া



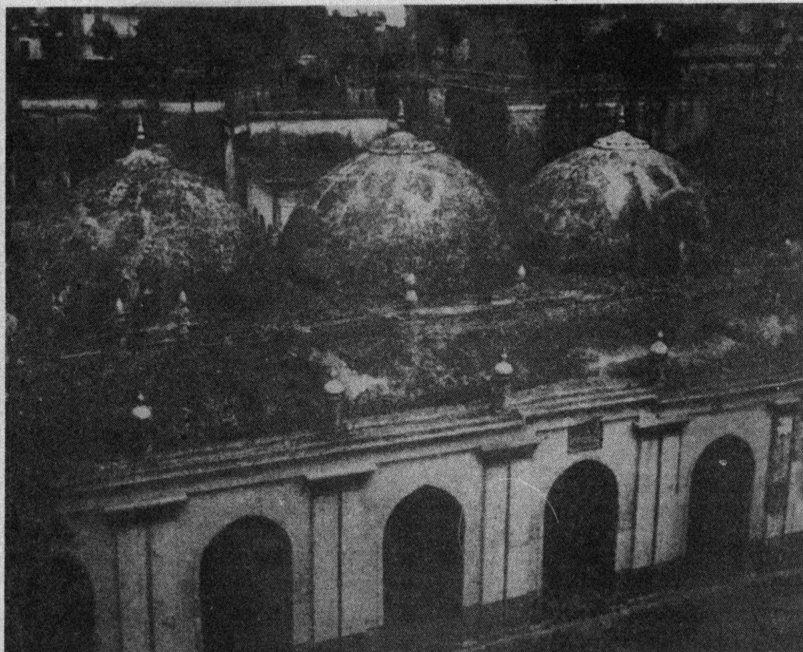
৬. প্রাচীন শিখরদেউল মন্দির : সাতদেউলিয়া



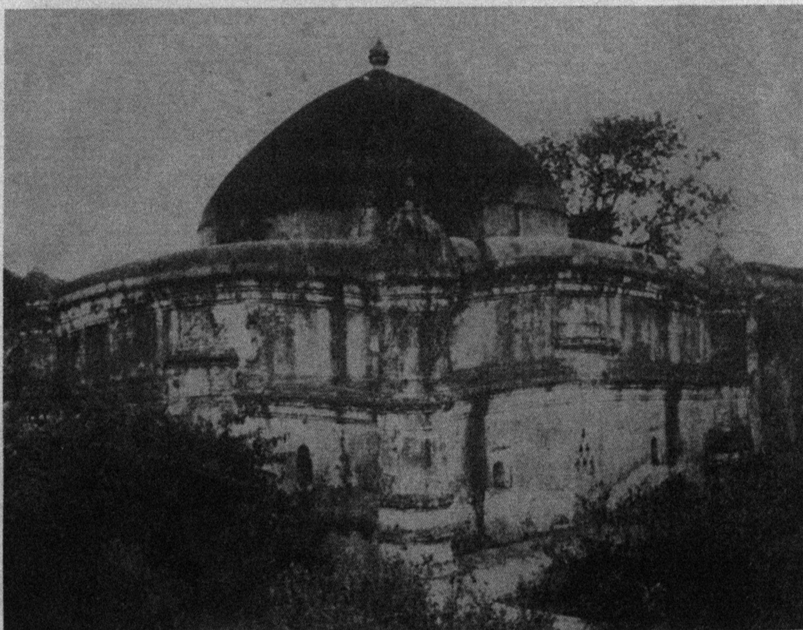
৭ক. বুদ্ধমূর্তি : ভরতপুর



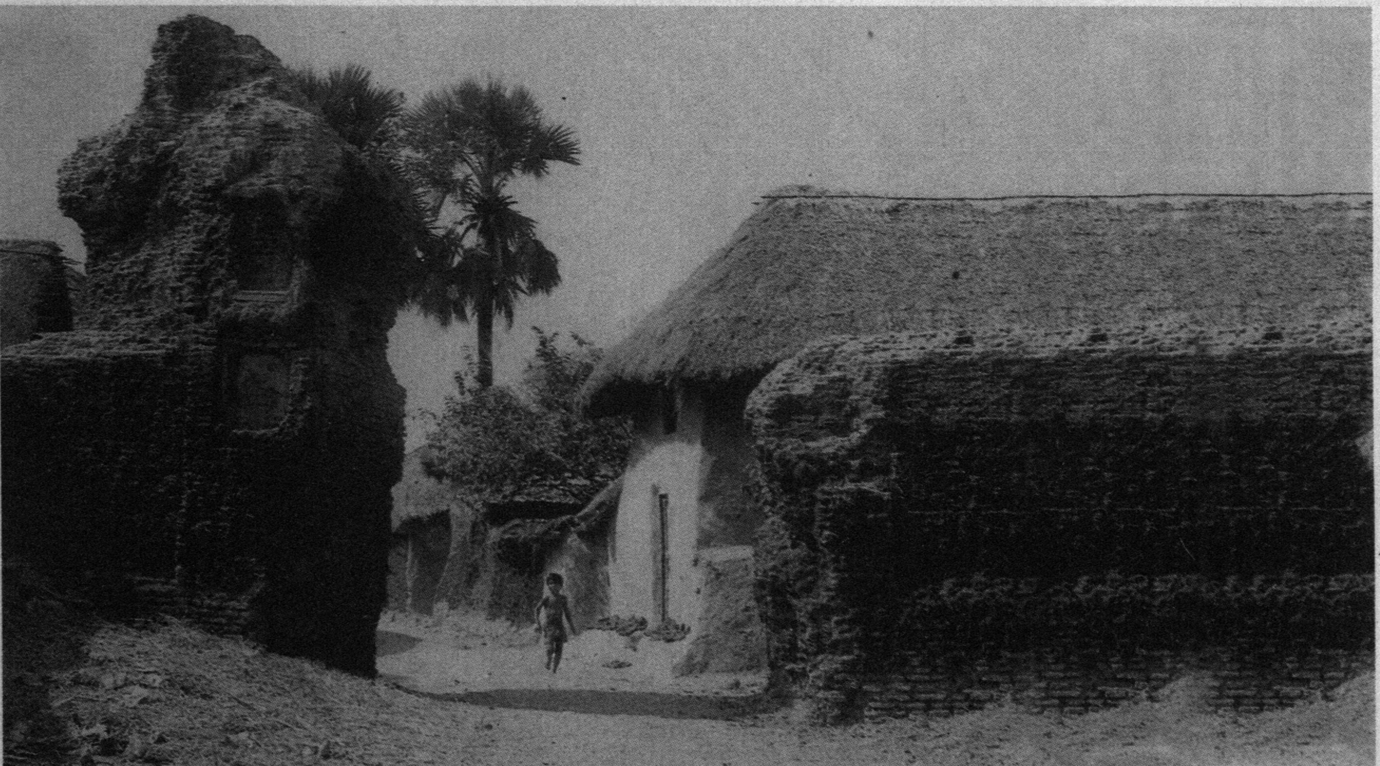
৭খ. বৈশ্রবণ মূর্তি : কাঞ্চননগর



৮ক. বর্ধমানের ৭ম শতাব্দীর জামা মসজিদ



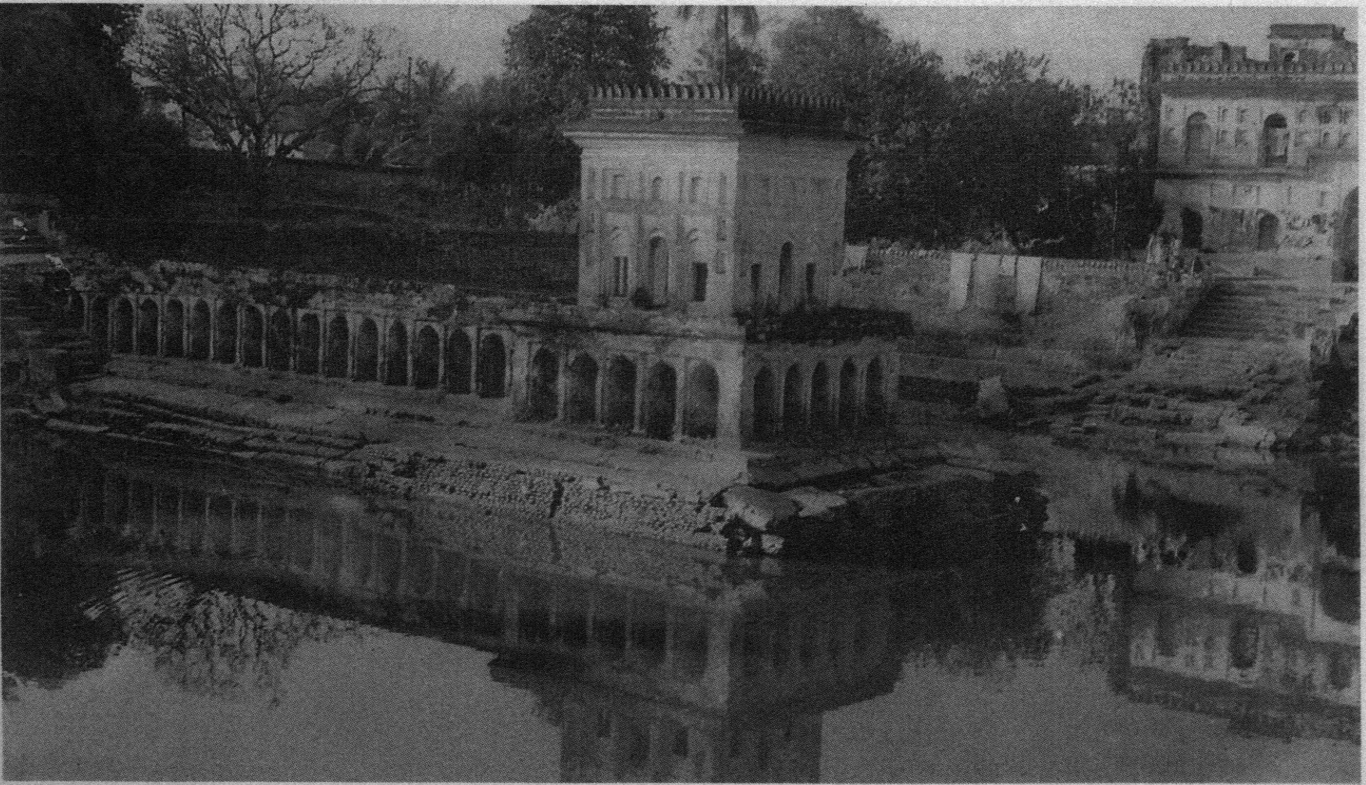
৮খ. ষোড়শ শতাব্দীর বহরাম সক্কার মাজার



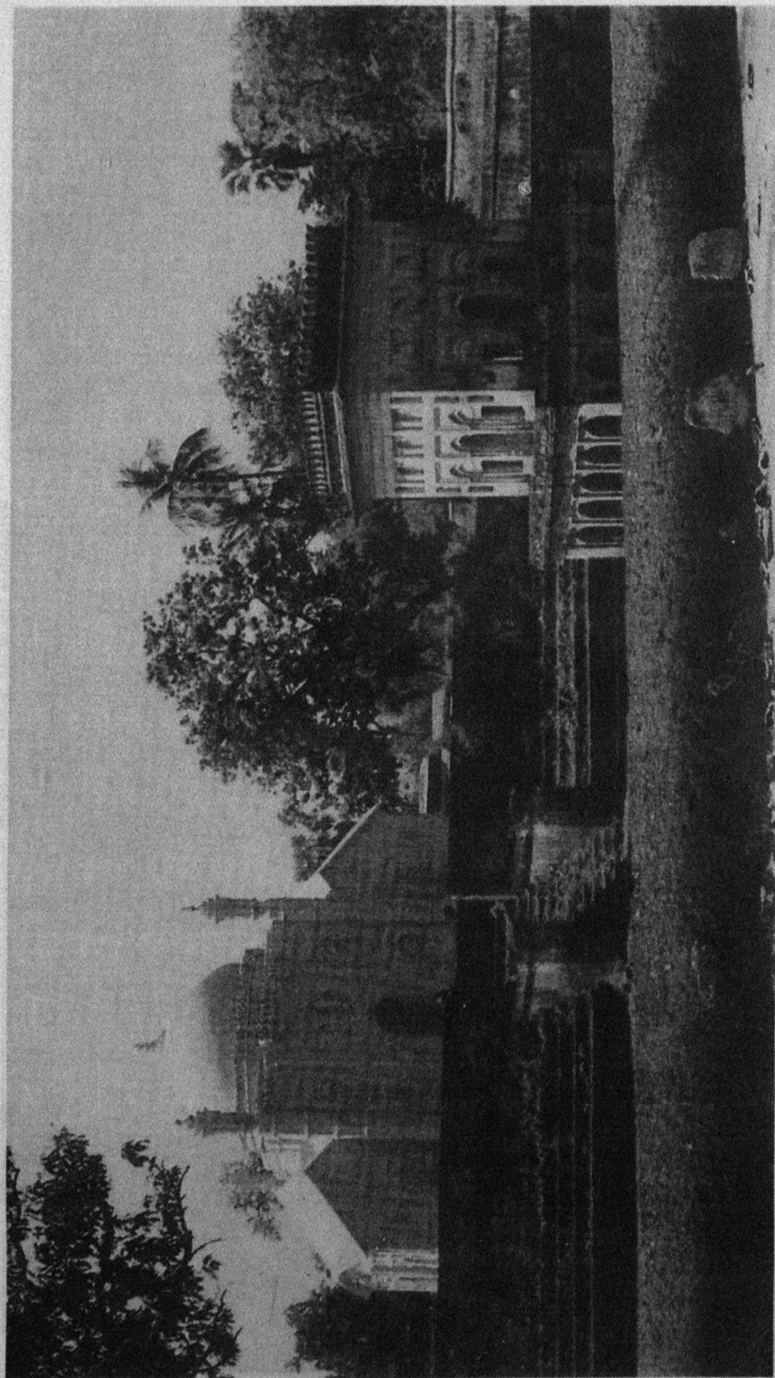
৯. তালিতগড়ের মাটির দুর্গের ধ্বংসাবশেষ



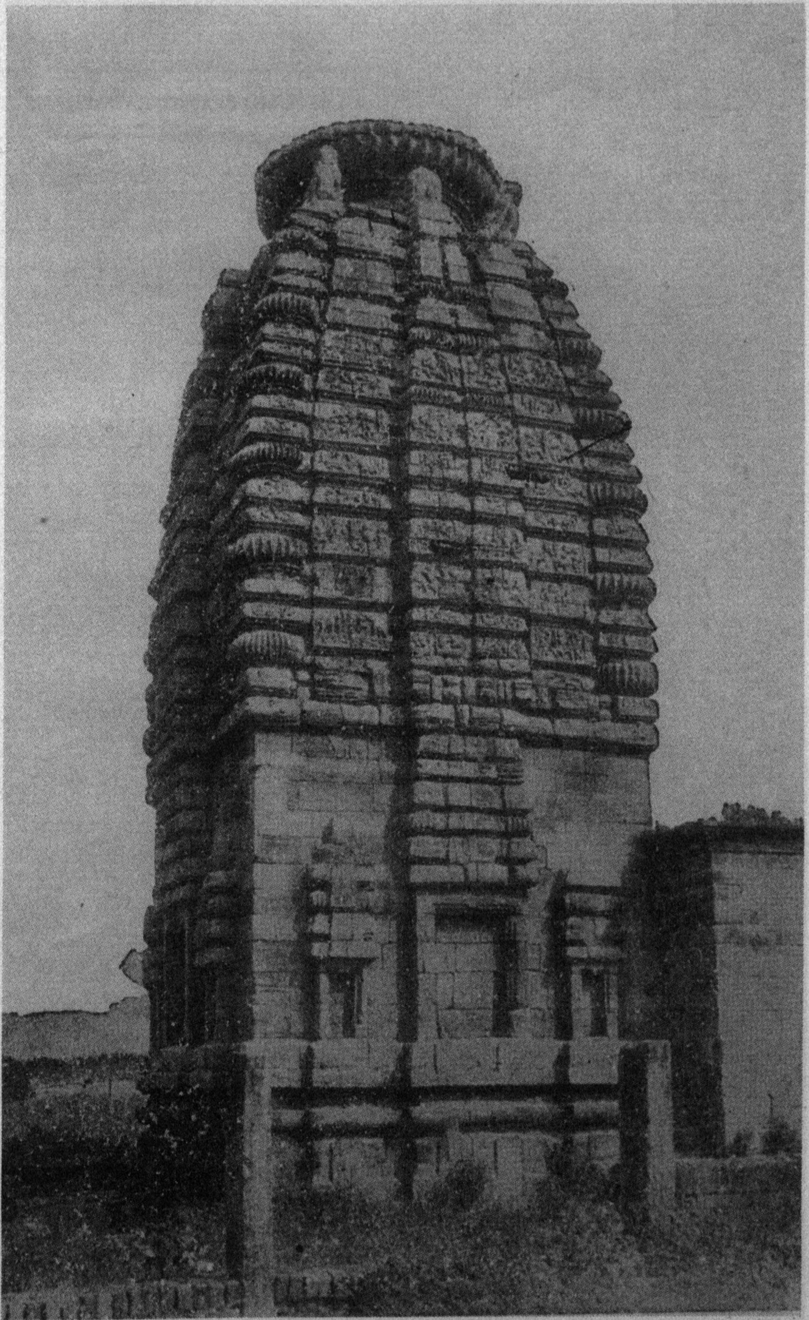
১০. কালনার মজলিস সাহেবের মসজিদ



১১. খাজা আনোয়ার সাহেবের নবাববাড়ি



১২. খাজা আনোয়ার সাহেবের নবাববাড়ির হাওয়া মহল



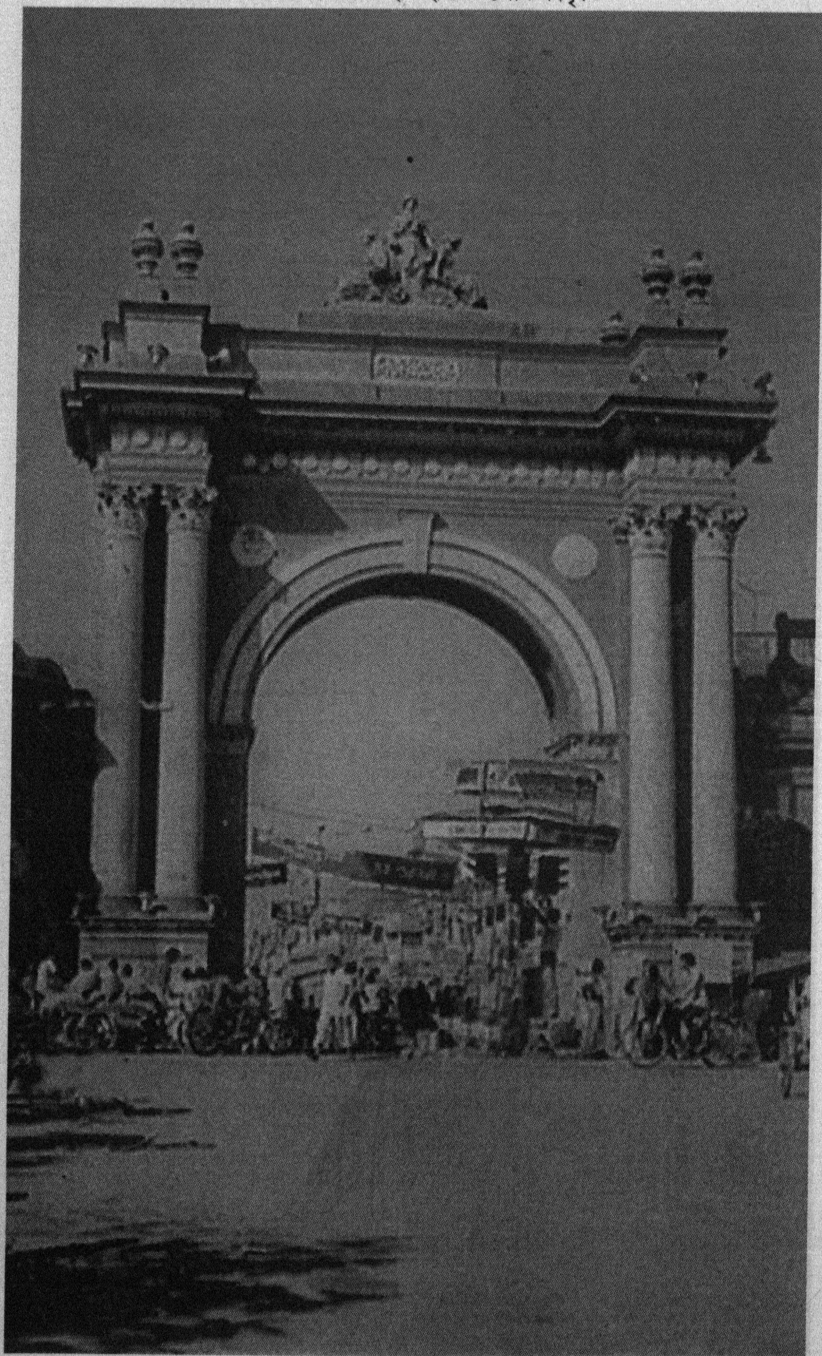
১৩. বরাকরের ৪নং শিবমন্দির



১৪. কাঞ্চননগরের বহির্ভাগে বারোদুয়ারী গেট।

বর্দ্ধমানাধিপতি বীরবর কীর্ত্তিচন্দ্র
রায় চিতুয়া ও বরদার জমিদার
শোভাসিংহের পাশবিক অত্যাচারের
প্রতিশোধার্থে তাহার ভ্রাতা হেম্মত-
সিংহ-প্রভৃতিকে সম্মুখ সমরে ১৭৩৭
খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব্বে পরাজয়
করিয়া বর্দ্ধমানের নিকট স্থাপিত
কাঞ্চননগরের প্রবে[illegible] বারদুয়ারী-
নামক-স্থানে যে [illegible]

১৫. গেটের স্মৃতি-ফলক



১৬. বিজয়তোরণ

সূচি

প্রথম খণ্ড

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় পর্ব

প্রথম পর্ব

ইতিহাসের সূচনা
নামকরণ-অবস্থান-সীমা
প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন
জলবায়ু
নদনদী
অরণ্যসম্পদ
বন্যপ্রাণী ও প্রাণী সংরক্ষণ
মৎস্য চাষ
খনিজ সম্পদ
জনজীবন
ভাষা
বাসগৃহ
পোশাক-পরিচ্ছদ
জাতি
ধর্ম
জেলার রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা
প্রাচীন যুগের শাসনব্যবস্থা

এক অধ্যায়



ইতিহাসের সূচনা

উত্তরম্ যৎ শিলাবত্যাঃ
　　　　অজয়স্যচৈব দক্ষিণম্
ভাগীরথ্যাঃ পশ্চিমায়াং তু
　　　　দ্বারকেশ্বরম্ চ পূর্বস্যাম্
জনপদং তদ্ বৰ্দ্ধমান নাম
　　　　রাঢ়ী যত্র সন্ততিঃ ॥

(বিষ্ণুপুরাণ অনুসরণে)

অজয়-খড়োশ্বরী-সভ্যতার-পথ ধরে : 'বর্ধতে' ইতি বৃধ্ + শানচ প্রত্যয়ান্ত পদ বর্ধমান—যার বৃদ্ধি আছে, সেই তো বর্ধমান। সর্বেষাম্ বৰ্দ্ধনান্নিত্যং বৰ্দ্ধমান মতো বিদুঃ। খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্রাক্ মৃৎশিল্প অনূপলীয় আর পুরোপলীয় সভ্যতার পূর্ব থেকে বর্ধমানের বৃদ্ধির যে সূচনা হয়েছিল তা এখনও অব্যাহত ধারায় বয়ে চলেছে—এ যে বর্ধমান! পণ্ডিতদের ধারণা বৈদিক সভ্যতা বঙ্গদেশে প্রবেশ করে নাই। ঋক্‌বেদের 'প্রজাঃ তিস্রোঃ' ও ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে' 'বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের পাদাঃ' পদে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 'বঙ্গ' ও 'অবগধাঃ' বৃক্ষ ও বনস্পতি কিংবা বঙ্গ ও মগধ সে বিষয়ে পণ্ডিতরা একমত নন। নীহাররঞ্জন রায় 'বঙ্গাবগধাঃ' পদে বঙ্গজনদের বগধদের সঙ্গে যোগ সূত্রের কথা বলেছেন। তাঁর মতে 'বগধ' বোধ হয় 'মগধ', এই অনুমান অনৈতিহাসিক না-ও হতে পারে। অথর্ব বেদে মগধ জনপদের উল্লেখ আছে। মগধ থেকে যেমন মাগধী, বঙ্গ থেকে 'বাগধী' হওয়াও বিচিত্র নয়। এ তথ্য থেকে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে বৈদিক সভ্যতা এখানে প্রবেশ করে নাই।

কিন্তু অজয় নদের তীরে পাণ্ডুক গ্রামে রাজপোতাডাঙ্গায় পাণ্ডুরাজার 'ঢিবি'র খননকার্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার নিঃসন্দেহে বঙ্গদেশের এক সুপ্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব ভাবনার ওপর নতুন আলোকপাত করে।

এই আবিষ্কার থেকে সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধা হয় না যে এই বর্ধমান অঞ্চলে আজ থেকে ২/৩ হাজার বছর আগে সিন্ধুসভ্যতার সমসাময়িক এক তাম্রোপলীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষার ফলে রাজস্থানের কালিবঙ্গান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনের বয়স খ্রীষ্টপূর্ব ২১১০–১১২৫, আর পশ্চিমবঙ্গের মহিষাদল থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনের বয়স খ্রীষ্টপূর্ব ১২৮৫–১১২০ এবং পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে আবিষ্কৃত নিদর্শনের বয়স খ্রীষ্টপূর্ব ১০১২ নির্ণীত হয়েছে। কিন্তু এই তথ্য সঠিক নাও হতে পারে। Carlton S. Coon তাঁর The History of Man গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—C-14 পরীক্ষার জন্য আহৃত দ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে polythyline tube-এর মধ্যে শীল করে না রাখলে পরীক্ষার ফল ভুল হবে। পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও মহিষাদল থেকে আহৃত দ্রব্য কার্বন পরীক্ষার জন্য এভাবে সংরক্ষিত হয় নাই। সেই হেতু পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে প্রাপ্ত জিনিসের বয়স সঠিক না হওয়াই স্বাভাবিক। সঠিকভাবে সংরক্ষিত হলে এখানকার সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতার সমসাময়িক বলেই প্রমাণিত হতো বলেই আমার ধারণা। বিশেষ করে এক ধরনের থালার নিম্নভাগ পাওয়া গেছে যেটা মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত পিলসুজাকৃতি মৃৎপাত্রের অনুরূপ। এখানে প্রাপ্ত কয়লা রঙের যে চালের নমুনা পাওয়া গেছে তার দ্বারা একদিকে যেমন এখানকার সভ্যতার প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় অন্যদিকে তেমনি এ অঞ্চলে সেকালে কৃষির প্রাধান্যের আভাস সূচিত হয়। ভাতার থানায় বড়বেলুন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ১৯৭৪ খ্রীষ্ট অব্দে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে খড়্গেশ্বরী বা খড়ি নদীর ধারে বানেশ্বর ডাঙ্গায় উৎখনন কার্য চালান হয়। এই খননকার্যের ফলে এখানে পোড়ামাটির হাঁড়ি কলস কৌণিক পানপাত্র, কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রের ভাণ্ড, লৌহনির্মিত তরবারির ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে। ১৬ ফুট নীচে কুঁড়ে ঘরের গৃহতলও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব জিনিষপত্রের কার্বণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে খড়ি নদীর তীরে অজয় নদের তীরবর্তী পাণ্ডুরাজার ঢিবির অনুরূপ তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। অনেকের ধারণা সুদূর অতীতে দামোদর এই গ্রামের পাশ দিয়েই প্রবাহিত হতো, পরে এর এক শাখা খড়্গেশ্বরী রূপে পরিচিত হয়। ভাতার থানার আমারুন স্টেশনের কাছে আড়া গ্রামের কাছে সাঁওতাল ডাঙ্গাতেও খননকার্য চালিয়ে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই নিদর্শনের মধ্যে কৃষ্ণলোহিত কলসের মধ্যে সংরক্ষিত অস্থি-র অংশবিশেষ প্রাগৈতিহাসিক কালে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পরিচয় বহন করে। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতেও লৌহনির্মিত তরবারির অংশ পাওয়া গেছে। এ সম্পর্কে পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য— "During the excavation of

1964 it was decisively proved that iron was known and probably melted at this site by side with the use of copper and microliths." দাশগুপ্তের মতে এই সব নিদর্শন খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ এর আগের তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন। ১৯৬২ সালে ২৭শে নভেম্বর মঙ্গলকোটের খননকার্যের ফলে অনেক তাম্রাশ্মীয় যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তুষ ও কয়লার মত কালো রঙের চালের নমুনা। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতেও অনুরূপ কয়লার রঙের চালের নমুনা আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল। বর্তমানে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে চালগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। অতীতে চালগুলি দীর্ঘকাল ভূগর্ভে থাকায় কয়লার মত carbonised হয়ে গেছে কিংবা অগ্নিকাণ্ডের ফলেও এগুলির এরকম রঙ হতে পারে। কিন্তু চাল ও তুষের নিদর্শন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সেই সুদূর অতীতেও এ অঞ্চলে মানবগোষ্ঠী যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এখানে যে অস্থি-র অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেছে সেগুলি ভারতীয় জীবতত্ত্ব বিভাগের মতে গরু, শূকর বা কচ্ছপের হাড় বা খোলস। তাছাড়া এখানে প্রাপ্ত নবোপলীয় কুঠার, কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র তাম্রোপলীয় সভ্যতার অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। মঙ্গলকোটে রোমান পটারীর অনুরূপ বাদামী রঙের পাত্রের তলদেশ পাওয়া গেছে। এর থেকে অনুমান ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে এগুলি এসেছিল। অতুল সুর তাঁর 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' প্রবন্ধে মন্তব্যে করেছেন—"মনে হয় সিন্ধুসভ্যতার গঠনে বাঙালীদের কিছু অবদান ছিল। সিন্ধু ও গুজরাটে হরপ্পা যুগে এক বিস্তৃত অঞ্চলে শরাক জাতিও ছিল, বাঙালীরাও শরাক জাতি এবং তারা অবৈদিক আর্য জাতিরই এক শাখা যাদের নাম নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ 'আল্পীয়' দিয়েছেন।"

১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল-এর The Statesman পত্রিকায় একটা খবর থেকে জানা যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উৎখনন করা মঙ্গলকোটে যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে এখানে প্রত্নক্ষেত্রে তাম্রাশ্মীয় যুগ থেকে মৌর্য-কুষাণ-গুপ্ত যুগ এবং গুপ্তোত্তর যুগের পর মধ্যযুগ পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক উন্নত সভ্যতা বর্তমান ছিল। কারণ মঙ্গলকোটে খননকার্যের ফলে একদিকে যেমন পাওয়া গেছে প্রাগৈতিহাসিক কালের রোমান পটারীর মত বাদামী রঙের পাত্রের অংশ ও কয়লা রঙের চাল, তুষ, তেমনি পাওয়া গেছে মৌর্য আমলের হস্তীপৃষ্ঠে আরোহী চিহ্নিত মুদ্রা, কুষাণ যুগের পোড়ামাটির মূর্তি, গুপ্তযুগের শিলমোহর, সুলতানী ও মোগল আমলের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, সুলতানী ও মোগল যুগের সভ্যতার নিদর্শন।

ভাতার থানার শ্রীপুরদেবপুরের উত্তর প্রান্তে একটা মাটির বিরাট ঢিবি আছে। জনশ্রুতি ঐখানে নাকি মহারাজা দেবাদিত্যের প্রাসাদ ছিল। তাঁর নাম অনুসারেই ঐ অঞ্চলের নাম দেবপুর। এখানে মাটির নীচে পাওয়া গেছে ১′–১/২′ ইটের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এখানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির জিনিসপত্র প্রমাণ করে, এখানেও মঙ্গলকোটের সমসাময়িক এক প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মঙ্গলকোট ও দেবপুর শ্রীপুরে গভীরভাবে খননকার্য চালালে প্রাচীন যুগের উন্নত সভ্যতার যেমন নিদর্শন মিলবে তেমনি বর্ধমানের প্রাচীন ইতিহাসের ও প্রাচীন কালের এক অনাবিষ্কৃত রহস্যের উদ্‌ঘাটন ঘটবে। The Statesman পত্রিকার ১৯৯৪–১লা মে তারিখে একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় Archeological finds dating back to the chalcolithic period at pratsal on the confluence of rivers Rupnarayan and Hooghly in West Bengal indicate that a civilisation flourished at the lower Ganga Valley. The most remarkable antiquities were works of art as artefact of bone. Geologist Vincent Ball had found some lithic tools spread over several places-Kunkun in Hooghly (1867) coalmines of Bokaro in Raniganõþ (1867). Important discoveries open a door to civilisation dating back to a period prior to Mohenjodaro adding a new dimension to the study of early art of Bengal and India e.g.-clay modelling, an animal head in clay and on bone, painting on a fragmented disc. of bone of a bovine animal, a human mandible with teeth. From all these it appears that largely unknown lower Valleys fostered a civilisation no less glorious than those of the Nile and the Indus.

আমার মনে হয় জনশ্রুতির রাজা গদাধরের রাজধানী বর্ধমানের উপকণ্ঠে গোদা মৌজায় (J L 41) শহীদ্‌তলার ধ্বংসাবশেষ-এ খননকার্য চালালে বর্ধমান শহরের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্য-সমৃদ্ধ নিদর্শন পাওয়া যাবে। রায়না থানার কাইতি গ্রামের সন্নিকটে আলমপুরের কাছে বিরাট মাঠ ও কাইতির পশ্চিম প্রান্তের বিরাট ঢিবির খননকার্য চালালেও প্রাচীন কালের অনেক নিদর্শন পাওয়া যাবে। প্রবাদ এই অঞ্চলটি পৌরাণিক রাজা বানের রাজধানী ছিল। রূপরামের ধর্মমঙ্গলেও এর উল্লেখ আছে "কাইতি চাপিয়া বন্দ্যো বানরাজার পাট। উষাবালি পোতা বন্দ্যো শ্বেত গঙ্গার ঘাট।" খণ্ডঘোষ থানার কুমিরকোলায় একটি পুকুর কাটার সময় প্রাচীন কালের মুদ্রা পাওয়া গেছে। তাছাড়া দামোদর তীরবর্তী অঞ্চলে

মাটির ১৬ ফুট নীচে এক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই জেলার আড়া, গোপালপুর ও কাঁকশার জঙ্গলে পশু শিকারের উপযোগী প্রস্তরের তৈরী কুঠার ও অন্যান্য অস্ত্রও পাওয়া গেছে। আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮৫-তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দেখা যায় দুর্গাপুর কাঁকশা অঞ্চলে নবোপলীয় যুগের পাথরের মসৃণ কুঠার পাওয়া গেছে। সূচ্যগ্র ফলাযুক্ত তামার ও লোহার হাতিয়ার আবিষ্কার এ অঞ্চলে তামা ও লোহার এক মিশ্র যুগের দ্যোতক।

The earliest artefacts dating from about 5000 B.C. and belonging to the Mesolithic or late stone age have been traced at Birbhanupur in Durgapur Thana. The microlithics found here make the site so far to be the most important in Eastern India.

The exact age in years is difficult to guess, but may be placed between 10,000–4000 B.C. [H.D. Sankila—Prehistory and Protohistory in India and Pakistan referred to in "Bardhaman Gazettee" March 1994]

কাঁকসা থানার আড়া গ্রামের ধ্বংসস্তূপ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্তূপ। গোপভূমের অমরার গড়-এর এখন গড় নেই, রাজবাড়িও নেই, দুর্গও নেই। কিন্তু এখানকার উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি ও স্তূপ এবং ইতস্তত ইটের গাঁথনির নিদর্শন দেখে এ অঞ্চলে এক প্রাচীন ইতিহাসের অস্তিত্ব অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। ব্যাপক খননকার্য চালালে এখানে এক উন্নত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাবে ও বর্ধমানের ইতিহাসের প্রাচীন পটের উপর নতুন আলোকপাত ঘটবে। ভাতার থানার হরিবাটী গ্রামে আমার পৈতৃক বাড়ীর উত্তরে কায়স্থ পাড়ায় প্রয়াত ভুজঙ্গ মজুমদার, পূর্ণচন্দ্র রায় ও নলিন মজুমদারদের কুলদেবতা রাধাবল্লভ রাধারানীর একটি মাটির মন্দির আছে। রাধাবল্লভের মূর্তি কয়েক বৎসর আগে চুরি যায়। মন্দিরের ঠিক পশ্চিমে ছোট ছোট ইটের এক প্রাচীন মন্দির (?) এর ধ্বংসাবশেষ আছে। সেখানে জুলাই '২০০০ এর প্রথমেই সামান্য মাটি খুঁড়তেই একটি বেলে পাথরের নৃত্যরতা নারী তার পাশে ছোট ছোট নারী ও নীচে হাঁস ঘোড়া ফুল সমন্বিত ১৪″x ৮″ প্রস্তর মূর্তি ও রামসীতা অঙ্কিত ২টি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। মুদ্রায় পালি ভাষায় লেখা আছে। মূর্তির গঠনশৈলী দেখে আমার ধারণা এটি দশম শতাব্দীর পালযুগের। আরও খননকার্য চালালে হয়ত জেলার প্রাচীন ইতিহাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। মূর্তিটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ৬।৭।২০০০ এর আজকাল পত্রিকাতে সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

দুই অধ্যায়



নামকরণ-অবস্থান-সীমা

'বর্ধমান' নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। অনেকে মনে করেন জৈন আচরঙ্গ সূত্রে উল্লিখিত সূহ্মভূমিই বর্তমান বর্ধমান। আবার অনেকে বলেন বর্ধমানের নামের সঙ্গে জৈন তীথঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের পূতস্মৃতি বিজড়িত। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে উজুবালিয়া নদীর তীরে মহাবীর আর্হৎ লাভ করেছিলেন। এখানকার গ্রাম বড়োয়া-আস্থাই হল সেকালের "অস্থিক গ্রাম"। ডঃ গোপীকান্ত কোঙার তাঁর "বর্ধমান জেলার মেলা" গ্রন্থে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মত উদ্ধৃত করে বলেছেন "খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অস্ট্রিকবীর যাযাবর ডোম, বোড়ো ইত্যাদি জাতির লোকেরা বর্ধমানে বাস করতো। বর্ধমান হল 'বোড়োডোমন' বা 'ব্রডমন' কথার সংস্কৃতরূপ। আবার মহারাজ তেজচন্দ্রের স্তাবকতা করে পরাণচাঁদ কাপুর তার "হরিহরমঙ্গল" কাব্যে বলেছেন মহারাজের রাজত্বে মানীদের মান্য বৃদ্ধি পায় তাই বর্ধমান। মহাবীর যে বর্ধমানে এসেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পার্শ্বনাথ পাহাড় তো এ জেলা থেকে খুব দূরে নয়। বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া সীমান্তে জৈন ধর্মাবলম্বী শরাক জাতির বাস। সাতদেউলিয়া গ্রামে মহাবীর তীর্থঙ্করের অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। এমন কি একটি প্রস্তর খণ্ডে মহাবীর তীর্থঙ্করের ১৫০ মূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। কল্পসূত্রানুসারে মহাবীর ত্রয়োদশ বৎসরে ঋজুপালিকা বা উজবালিয়া নদীর তীরে কৈবল্য লাভ করেন। কল্পসূত্র মতে উজবালিয়া দামোদরের উপনদী বরাকর। বাবলা-ডিহি শঙ্করপুরের নেংটাশ্বর মূর্তি প্রকৃতপক্ষে জৈনদের তীর্থঙ্করের মূর্তি। আবার অনেকে বলেন মহাবীরকে এদেশের লোক ভাল চোখে দেখে নাই। তাই তার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। জৈনদের আচারঙ্গসূত্র গ্রন্থে উল্লেখ আছে মহাবীর যখন পথহীন লাঢ়, বজ্জভূমি ও সুহ্মভূমিতে প্রচার উদ্দেশ্যে ঘুরে

বেড়াচ্ছিলেন, তখন এই সব দেশের অধিবাসীরা তাঁকে আক্রমণ করেছিল। কতকগুলি কুকুরও তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে কামড়াতে আরম্ভ করে। কিন্তু কোন লোকই এই কুকুরগুলিকে তাড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসে নাই, বরং লোকেরা এই জৈন ভিক্ষুককে আঘাত করতে আরম্ভ করে ও ছু ছু বলে চিৎকার করে তাঁকে কামড়াবার জন্য কুকুরগুলিকে লেলিয়ে দেয়। মহাবীরের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক। আচারঙ্গসূত্রের লাঢ়, বজ্জ্ভূমি ও সুব্‌ভ ভূমি যথাক্রমে রাঢ়, বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমি অর্থাৎ মোটামুটি দক্ষিণ রাঢ় বলেই পণ্ডিতদের অভিমত। তাই যদি হয় তাহলে বলতে হয় মহাবীর এ অঞ্চলে সম্প্রদায় বা কৌম বিশেষের কাছে ভাল ব্যবহার পান নাই। কিন্তু এই কৌম কারা? অষ্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীতে কুকুরের প্রতিশব্দ 'দৃক্'। P. C. Bagchi এর মতে বাংলা চু চু বা তু তু মূলত অষ্ট্রিক ভাষাভাষীদের ভাষা থেকে গৃহীত। তা যদি হয় মহাবীরের প্রতি যারা খারাপ ব্যবহার করেছিল তারা আদিম অষ্ট্রিক ভাষাভাষী। এরা নিশ্চয়ই মহাবীরের মহত্ত্ব বোঝে নাই—বোঝার মত cultureও এদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। কিন্তু এরা ছাড়া অন্য জাতি তো ছিল। জৈন উপাঙ্গ পন্নবনা (প্রজ্ঞাপনা) গ্রন্থে আর্যজাতির তালিকায় বঙ্গ ও রাঢ়ের উল্লেখ আছে। আনুমানিক দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মথুরায় প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে রাঢ় দেশে জৈন ভিক্ষুর উল্লেখ আছে। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দে বা তার পূর্বেই যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার প্রভৃতি উপলক্ষে ক্রমশ বহুসংখ্যক আর্য এদেশে আসে ও বসবাস করে। এ বিষয়ে এখনও বোধহয় সঠিক সিদ্ধান্ত হয় নাই। সে যাই হোক বর্ধমান তার নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই 'চালকোলিথিক' সভ্যতার যুগ থেকে এগিয়ে চলেছে কালের ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে—এ ধারা গতিশীল, এ ধারা চলমান ও বর্ধমান, "সর্বেষাং বর্দ্ধনান্নিত্যং বর্দ্ধমান মতো বিদুঃ।"

রাঢ়ের মধ্যমণি এই বর্ধমান। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া ও মানভূম রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে সুহ্ম ও মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের টীকায় 'রাঢ়' অভিন্ন বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। পার্জিটার সাহেব এই মতের সমর্থক। তিনি Ancient countries in Eastern India-তে উল্লেখ করেছেন—It appears that Shumha must have comprised the modern district of Hooghly, Howrah, Bankura, Bardhaman and eastern portion of Midnapore. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) গ্রন্থে সুহ্ম ও রাঢ় দেশকে অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে রাঢ়ভূমি দক্ষিণে দামোদর এবং সম্ভবত রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত বিস্তৃত

ছিল। সাধারণত রাঢ়দেশ গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাঢ়ের অপর নাম সূহ্ম। বর্ধমানভুক্তি বা বর্ধমান জনপদ এই রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থে বর্ধমানের চতুঃসীমার বিবরণ আছে। অজয় নদের দক্ষিণে শিলাবতী নদীর উত্তর, গঙ্গার পশ্চিম ও দ্বারকেশ্বর নদের পূর্ব এই চতুঃসীমার মধ্যে ৮৮ বর্গযোজন (১১ যোজন দৈর্ঘ্য/৮ যোজন প্রস্থ) পরিমিত এই ভূখণ্ড বর্ধমান জেলা। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ/পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে দেখতে পাই সূহ্ম দেশের অধিবাসীরা রঘুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সূহ্মদেশ বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে পণ্ডিতগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বঙ্গদেশের প্রাচীন একটি মানচিত্রে বঙ্গদেশের প্রাচীন নাম দেখা যায় কোটি-বর্ষ। এই মানচিত্রে বঙ্গদেশের কয়েকটি বিভাগ লক্ষণীয়—বর্ধমান ভুক্তি, কঙ্কগ্রাম ভুক্তি, পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি, সমতট, হরিকেল বঙ্গ। এই মানচিত্রে বর্ধমান ভুক্তিকে দক্ষিণ রাঢ় ও কঙ্কগ্রাম ভুক্তিকে উত্তর রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডাঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে কোটিবর্ষ নগরের অবস্থিতি ছিল বর্ধমান-হুগলী সীমান্তে রায়না থানার রত্নালু নদীর তীরে কোটশিমুল গ্রামে। কিন্তু কোটশিমুল ও কোটিবর্ষ সমার্থক নয়।

বল্লালসেনের তাম্রশাসনে উত্তর রাঢ় বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে কঙ্কগ্রাম ভুক্তিকে উত্তর রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছে। এর থেকে মনে হয় উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় বৃহৎ রাঢ় জনপদের দুটি বিভাগ এবং দুই রাঢ়ের সীমান্তে আছে অজয় নদ। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে খড়েশ্বরী (খড়ি নদী) নদীকে দুই রাঢ়ের সীমারেখা বলে গণ্য করেছেন।

ডঃ সুকুমার সেন বর্ধমান পরিচিতি স্মরণিকায় মন্তব্য করেছেন ধর্মপীঠমালার মধ্যমণি শ্রীবর্ধমান ধর্মপীঠের অবস্থান হচ্ছে সাতগেছিয়ার নিকট বঁড়োয়া গ্রামে। কোন কারণে নগর ধ্বংস হওয়ায় বা পাশের বল্লুকা বা বেহুলা নদী বিনষ্ট হওয়ায় বর্ধমান নগর বর্তমান স্থানে সরে এসেছিল। ডাঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে উজুবালিয়া নদীর তীরে মহাবীর আর্হৎ লাভ করেছিলেন। এই নদী হলো একালের বল্লুকা-চম্পা নদী অথবা কংস বা জলকুলা নদী। একদা নদীটি ছিল অজয়ের শাখানদী। এই নদীর তীরে যক্ষমন্দির 'বৈর্যাবর্ত চৈত্য' হচ্ছে সাতগেছে বড়োয়াঁ গ্রামের বর্তমান ধর্মমন্দিরের স্তূপাবলী। এখানকার গ্রাম বড়োয়াঁ-আস্থাই হলো সেকালের বর্ধমান-অস্থিকগ্রাম। এই বর্ধমান-অস্থিকগ্রামের যক্ষশূলপাণির মন্দিরে

মহাবীর তাঁর কেবল দর্শনের পরে, প্রথম বর্ষের চাতুর্মাস্যা পালন করেছিলেন। কুব্জিকাতন্ত্র মতে শ্রীবর্ধমানের মঙ্গলাদেবীর পীঠের উল্লেখ আছে। আদি চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মানিক দত্তও এই নতুন বর্ধমান-কেই দেবী পীঠ বা 'বড় বর্ধমান' বলেছেন। কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তও বলেছেন—"বর্ধমান হইল বড়োয়াঁ"।

বর্তমান বর্ধমান ও নবাবহাটের মাঝামাঝি অঞ্চলে বেহুলা নদী প্রবাহিত ছিল। এর শুষ্কখাত জি.টি. রোডের উত্তরে বর্তমান। বর্ধমানের নিকটবর্তী কাঁদরসোনা গ্রামের পাশ দিয়ে যে নদীখাত দেখা যায় তাকে গ্রামবাসীরা বেহুলা নদী বলেই মনে করেন। Some Historical Aspects of the Inscription of Bengal গ্রন্থে বিনয় চন্দ্র সেনের মন্তব্য উল্লেখের দাবী রাখে—"According to the Jain Kalpasutra Mahavira spent sometime in Asthikgrama. The commentory says that it was formerly known by the name Vardhamana." কাজেই বেহুলা-বল্লুকা-দামোদর এর মধ্যবর্তী অঞ্চল যার মধ্যে গোদা, বাহির সর্বমঙ্গলা, জোত গোদা, লাকুরডি, কাঞ্চননগর, বংপুর, ইদিলপুর, ইছলাবাদ, খাজা আনোয়ার বেড়, জগৎবেড়, মীরছোবা, কানাইনাটশাল, বালিডাঙ্গা অন্তর্ভূক্ত। সেই বিরাট অঞ্চল নিয়ে প্রাচীন বর্ধমান নগরীর অবস্থান ছিল বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

তিন অধ্যায়



প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন

ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের জীবনযাত্রা, তার গতিপ্রকৃতি ও জীবনধারার ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। জনজীবনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশও পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত না হলে কোন অঞ্চলের ইতিহাস সঠিকভাবে জানা যায় না। কারণ কোন অঞ্চলের ইতিহাস শুধু সেখানকার শাসক বংশের ইতিহাস নয় সেখানকার সামগ্রিকভাবে জনজীবনের ইতিহাস। এ বিষয়ে ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—Annals of a country of a given period cannot be correctly evaluated without having an idea of its geographical conditions during the relevant age. দার্শনিক বডিন (Bodin)-এর কথায় যে মানবগোষ্ঠী যে অঞ্চলে বসবাস করে তাহার সভ্যতা ও ইতিহাস সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এ মন্তব্য এ জেলার ইতিহাস রচনার পক্ষে সমান প্রযোজ্য।

ভৌগোলিক পরিবেশের বৈচিত্র্য যেমন জনজীবনে বৈচিত্র্য আনে, তেমনি উদার বা অনুদার পরিবেশ জীবনের উন্নতির মাত্রা নিরূপণ করে, মানুষের সঞ্চরণশীলতাকে অনিবার্য করে তোলে। পরিবেশের বৈচিত্র্যের ওপর মানুষের কার্যকলাপের বিভিন্নতা ঘটে। সংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। কোন অঞ্চলের বা জেলার ভৌগোলিক উপাদানের আলোচনা প্রসঙ্গে সেখানকার আয়তন, সীমা, অবস্থান ভূপৃষ্ঠের গঠন—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ—জলবায়ু, নদনদী, অরণ্যসম্পদ, খনিজ দ্রব্যের আলোচনাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আয়তন : প্রাচীন বর্ধমানভুক্তির আয়তন ও সীমা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে বর্ধমান জেলা ২২.৫৬ অক্ষাংশ থেকে ২৩.৫৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬.৪৮ দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৮.২৫ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। জেলার উত্তর সীমানায় রয়েছে সাঁওতাল পরগনা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা, পূর্ব সীমান্তে নদীয়া, দক্ষিণে হুগলী, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া আর পশ্চিমে রয়েছে ধানবাদ। জেলার পশ্চিমে বয়ে চলেছে বরাকর নদ, উত্তরে অজয় জেলাকে বীরভূম ও সাঁওতাল পরগনা থেকে পৃথক করে রেখেছে; অবশ্য কাটোয়া মহকুমার কিছু অংশ অজয়ের বামতীরে পড়েছে, দক্ষিণে দামোদর নদ জেলাকে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া থেকে আলাদা করে বয়ে চলেছে হুগলীর দিকে। বর্ধমান-পুরুলিয়া খাতের দৈর্ঘ্য ৭২ কিমি। আর মোটামুটি ভাবে ভাগীরথী এই জেলার পূর্ব সীমানা চিহ্নিত করেছে। কিছুটা ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। কারণ নবদ্বীপ এই নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত হলেও নদীয়া জেলায় পড়েছে, আর অগ্রদ্বীপ এই নদীর বাম তীরে অবস্থিত হয়েও বর্ধমান জেলাভুক্ত। ভাগীরথীর স্রোতধারার দিক পরিবর্তনের ফলে অবশ্য শিকোস্তি পয়োস্থি ও চরভূমি গড়ে ওঠার জন্য মাঝে মধ্যে নদীয়া ও বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক স্তরে সীমানা সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ভূমি ও ভূমিরাজস্ব আধিকারিকের (Director of Land Records and Surveys) এর তথ্য থেকে নিম্নমত বাঁকুড়া, বিহার, হুগলী ও বীরভূমের মধ্যে সীমানা অ্যাডজাস্টমেন্টের বিবরণ পাওয়া গেছে।

১। ১৯৫৪–৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলা থেকে বর্ধমান জেলার সঙ্গে ২৫৪.১০ একর যুক্ত হয়।

২। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বিহার থেকে বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয় ৯৮৪.৪১ একর। অর্থাৎ লাভের ঘরে যোগ হয় ১২৩৮.৫১ একর।

৩। আবার তেমনি ১৯৫৪–৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান থেকে বীরভূমের সঙ্গে যুক্ত হয় ১১৬২.৫১ একর। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান থেকে হুগলীতে চলে যায় ১৪৮৪.৭০ অর্থাৎ বর্ধমানের নীট লোকসান হয় ২৬৪৭.২১–১২৩৮.৫১ বা ১৩৬৮.৭০ একর ভূমি।

আয়তনে এই যোগ-বিয়োগের ব্যাপারটা এখনও চলে আসছে, মনে হয় ভবিষ্যতেও চলবে। ১৯৭১ ও ১৯৯১-এর সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে জেলার আয়তন ছিল ৭০২৮ বর্গ কিলোমিটার আর ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে এই আয়তন দাঁড়িয়েছে ৭০২৪ বর্গ কিমি অর্থাৎ এই কয়েক বছরেই আমাদের জেলা ৪ বর্গ কিমি হারিয়েছে।

ভূ-প্রকৃতির প্রধান তিন ভাগ : ভূ-পৃষ্ঠের গঠন অনুযায়ী জেলাকে প্রধানতঃ তিনটি প্রধান ও ৮টি উপবিভাগে ভাগ করা যায়—(১) পার্বত্যময় অঞ্চল, (২) ল্যাটেরাইট গঠিত সমভূমি (৩) পলিগঠিত সমভূমি।

(১) পার্বত্যময় অঞ্চল : জেলার পশ্চিমপ্রান্তে অনুচ্চ পাহাড় যা বিন্ধ্যপর্বত থেকে ক্রমশ অবক্ষয়িত হতে হতে গলসী এমন কি খানা জংশন পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে এসেছে। খানা জংশন স্টেশন থেকে উত্তরে লক্ষ্য করলেই অনুচ্চ ১০/১২ মিটার দীর্ঘ শিলাময় টিলা দেখা যাবে। কল্যাণেশ্বরীতে যেখানে দামোদরের ব্যারেজ করা হয়েছে সেই হালদা পাহাড়ের উচ্চতা ৫০০ ফুট। এছাড়া চিত্তরঞ্জন, সালানপুর, হীরাপুর, কুলটিও পার্বত্য-অঞ্চলভুক্ত। জেলার পশ্চিমে বিন্ধ্যকুক্ষির পূর্বমুখী শাখা ও উত্তরে দক্ষিণাভিমুখী অঞ্চলের পাহাড়ের তরঙ্গায়িত শাখা বিদ্যমান। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ অংশের উচ্চতা ৮০ থেকে ২২৭ মিটারের মধ্যে। আসানসোল মহকুমার উচ্চতাই সর্বাধিক।

(২) ল্যাটেরাইট গঠিত সমভূমি : অণ্ডাল ও রানীগঞ্জের খনি অঞ্চল থেকে আউসগ্রামের জঙ্গল পর্যন্ত লালবর্ণ রুক্ষ্ম ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অঞ্চল। এ অঞ্চলে শাল-পিয়াশালের, সেগুন- পলাশের অরণ্য যোজন বিস্তৃত। অজয় থেকে দামোদরের দূরত্ব অনুমান ৩০ কিমির মত। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে এককালে ছিল শালের সমুদ্র। বন্যপশু আর ঠ্যাঙাড়েদের ছিল রাজত্ব। একদিন ঠগ্ বাছতে গাঁ উজাড় হতো। আজ আর সেদিন নেই। এখন বন কেটে বসত তৈরী হয়েছে। দুর্গাপুরে তো এখন গড়ে উঠেছে ইস্পাত নগরী—বাংলার রূঢ়। একদা যা ছিল নিবিড় অরণ্য আজ সেখানে চলছে কর্মযজ্ঞ। দুর্গাপুরে এককালে যেখানে ছিল বুকের রক্ত হিম করা মোষখাপুরের জঙ্গল আজ সেখানে নানা টাইপের কোয়ার্টার, হরেক অফিস, বিল্ডিং, কৃষ্ণচূড়া সেগুনের সারি। বাঘ সিংহ নিশ্চয়ই ছিল, তা না হলে মোষখাপুর নাম হলো কি করে? গলসী নামের সঙ্গে ঠগীদের গলায় ফাঁসির দড়ি এখনও ঝুলছে। পোতনার পাশ দিয়ে নিশ্চয়ই কেউ যেত না, পাছে কেউ মেরে পুঁতে দিলে যমের বাবাও টের না পায়। এই অঞ্চলে ল্যাটেরাইট মাটির জন্যই বোধহয় বর্ধমানকে বলে রাঙামাটির দেশ—তাই এখনও লোকের মুখে ছড়া শুনতে পাওয়া যায়—'বর্ধমানের লালমাটি, বুড়িকে ধরে কচ্ করে কাটি'। এরপরে পূর্বদিকে রয়েছে অজয়-দামোদরের পলিমিশ্রিত পলি-ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার মিশ্র সমভূমি। আউসগ্রাম থানার পূর্বাংশ থেকে মঙ্গলকোট, ভাতার, গলসী পর্যন্ত এই মিশ্র সমভূমির বিস্তৃতি। বাণেশ্বরডাঙ্গা, সাঁওতালডাঙ্গা, পাণ্ডুরাজার ঢিবির খননকার্যের সময় এই রকম মিশ্র

সমভূমির মৃত্তিকার নমুনা পাওয়া গেছে। এ অঞ্চলেও মনে হয় এককালে খুব ঘন না হলেও জঙ্গল গড়ে উঠেছিল—আর ঠ্যাঙ্গাড়েদেরও যথেষ্ট উপদ্রব ছিল তা না হলে—"যদি যাবি নর্জ্জা, নেয়ে ধুয়ে ঘর যা" বা "যদি পেরুলি কর্জ্জনা, নেয়ে ধুয়ে ঘর যা না"—এরকম প্রবাদের চলন হলো কি করে?

(৩) **পলিগঠিত সমভূমি** : তৃতীয় ভাগে আছে ভাগীরথী-দামোদর-অজয়-খড়েশ্বরী-দ্বারকেশ্বর-বেহুলা-বল্লুকা বিধৌত সমভূমি যা প্রায় জেলার ৩/৫ অংশ জুড়ে বিস্তৃত। কেতুগ্রাম, কাটোয়া, পূর্বস্থলী, কালনা, মেমারী, বর্ধমান, জামালপুর, খণ্ডঘোষ, রায়নার বিরাট অঞ্চল জুড়ে এই পাললিক সমভূমি বিস্তৃত। এখানকার পলির গভীরতা ১২০ ফুট থেকে ১২০০ ফুট পর্যন্ত। জলস্তরও ভূত্বকের ৩০/৪০ ফুট নীচেই পাওয়া যায়—আর দুর্গাপুর আসানসোলের দিকে শিলাস্তর ভেদ করে ১৫০/২০০ ফুটের নীচে ছাড়া জলস্তর পাওয়া যায় না। অবশ্য বর্তমানে অতিরিক্ত ডিপ বা শ্যালো পাম্পের সাহায্যে জমিতে জলসেচের প্রয়োজনে অতিরিক্ত পরিমাণে জলোত্তোলনের ফলে ক্রমশ জলস্তর নিম্নগামী হচ্ছে।

উপবিভাগ : বিহার মালভূমি ও গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বিধৌত পাললিক সমভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত এই বর্ধমান জেলার প্রধান তিনটি বিভাগকে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়।

ক) আসানসোল মহকুমার শিলাময় মালভূমি ও সমপ্রায় ভূমি অঞ্চল, খ) অজয় বরাকরের মধ্যবর্তী কচ্ছপ-পৃষ্ঠ উত্তল ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা সম্পৃক্ত ভূমি অঞ্চল, গ) নুনিয়া-সিঙ্গারন খালের মধ্যবর্তী প্রশস্ত উপত্যকা ভূমি, ঘ) দামোদর-অজয়ের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের উত্তরপ্রান্তে তুমুনী-কুনুরের সুসংবদ্ধ ল্যাটেরাইট ভূমি, ঙ) এরুয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ওড়গ্রামের তরঙ্গায়িত পাললিক-ল্যাটেরাইট উচ্চভূমি, চ) খণ্ডঘোষ-রায়না-জামালপুর থানার দ্বারকেশ্বর-দামোদর মধ্যবর্তী পাললিক সমভূমি, ছ) কুসুমগ্রামের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে কালনার সমভূমি, জ) উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে কাটোয়া-কেতুগ্রাম-পূর্বস্থলী থানার ভাগীরথী বিধৌত পাললিক সমভূমি।

ক) শিলাময় মালভূমি ও সমপ্রায় ভূমি অঞ্চল : জেলার পশ্চিম প্রান্তে গণ্ডোয়ানা-জাত ছোটনাগপুরের মালভূমি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মোনাড্‌নক ও টিলা খচিত সমপ্রায় ভূমি আসানসোল মহকুমার পূর্বসীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। গড় উচ্চতা ৪০০-১০০০ মি। ছোটনাগপুরের মালভূমির পর্বতশ্রেণী অভিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিশেষ ধরনের লোহিত মৃত্তিকা ল্যাটেরাইট সংযুক্ত হয়ে

পূর্বদিকে প্রসারিত। ৮৬.৫০ পূঃ দ্রাঘিমা ও ২৩.৪৮ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত ভূখণ্ডে এর উচ্চতা ২২৭ মি। অজয় ও বরাকর নদীর মধ্যবর্তী ৫০০ ফুট বিস্তৃত। দামোদর-অজয়ের মধ্যবর্তী ৫০০ ফুট বিস্তৃত সমপ্রায় ভূমি অঞ্চল ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রসারিত। মাঝে মাঝে কঙ্করময় ভূমিতে ছোট ছোট ক্ষয়প্রাপ্ত টিলা দেখা যায়।

খ) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা সম্পৃক্ত ভূমি অঞ্চল : অজয়-বরাকরের উত্তল মালভূমি পশ্চিমের আসানসোল মহকুমার মালভূমি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পূর্বে রানীগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। দামোদর-অজয়ের মধ্যবর্তী ল্যাটেরাইট অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা ১৫০ মি থেকে ৮৭ মি এর মধ্যে। নুনিয়া ও অসংখ্য খাল ও নালা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে দামোদরকে পুষ্ট করে। দামোদর তীরবর্তী অঞ্চল শিলাময় মোনাড্‌নক সমন্বিত ল্যাটেরাইট ভূমিতে কাঁটা গাছের ঝোপ, বুনো খেজুর, শুষ্ক পুষ্করিণী দেখা যায়। এর উত্তরে শিল্পাঞ্চল। কুলটি ও বার্ণপুরে লৌহ-ইস্পাতের কারখানা ও বেগুনিয়া-শাঁকতেরিয়া, চিঁচুরিয়া, বড়ঢেমো, হীরাপুর অঞ্চলে অসংখ্য কোলিয়ারী। অনুর্বর এই অঞ্চলে মৃত্তিকায় জলধারণের ক্ষমতা কম থাকায় এ অঞ্চল কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত। তবে অজয়-দামোদরের বন্যাসঞ্জাত পলিস্তর সঞ্চয়ের ফলে স্থানে স্থানে সামান্য কৃষিকার্য হয়। এই অঞ্চলেই পড়েছে মাইথন জলাধার যার মধ্যে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র পড়েছে বর্ধমান জেলায় আর অফিস কলোনী পড়েছে বিহার অংশে।

গ) প্রশস্ত উপত্যকা ভূমি : নুনিয়া-সিঙ্গরন-তুমুনী-বিধৌত বরাবনি, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, অন্ডাল থানা নিয়ে গঠিত অজয় থেকে দামোদর পর্যন্ত বিস্তৃত কঙ্করময় লোহিত মৃত্তিকা অঞ্চল। এ অঞ্চলে বিশেষ টিলা বা ক্ষয়প্রাপ্ত মোনাড্‌নক দেখা যায় না। এ অঞ্চলে অসংখ্য স্বাভাবিক ও কৃত্রিম জলাশয় দেখা যায়। এই ভূখণ্ডে বেশীর ভাগই শিল্পঞ্চল ও মাঝে মাঝে কোলিয়ারী দেখা যায়।

ঘ) সুসংবদ্ধ ল্যাটেরাইট ভূমি : চতুর্থ উপবিভাগ তুমুনী-কুনুর বিধৌত দামোদর-অজয় মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে গঠিত। ইছাপুরের পশ্চিমাংশে এই ভূমিখণ্ডের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ১২০ মি। এর পূর্ব দিকে ভূমি ক্রমশ ঢালু হয়ে উপত্যকা ভূমিতে পর্যবসিত। অজয়ের দক্ষিণ তীরে সেমাল্য গ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছোট ছোট মোনাড্‌নক ও বালিয়াড়ি দেখা যায়। পশ্চিমাংশে শাল, পিয়াশাল সেগুনের জঙ্গল। অন্ডাল-সাঁইথিয়া রেল লাইনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনেকগুলি কোলিয়ারী গড়ে উঠেছিল; এদের মধ্যে অনেকগুলিই পরিত্যক্ত। তুমুনী-অজয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা ৬০ মি থেকে ১২০ মি-এর মধ্যে। এই উপবিভাগ দুর্গাপুর মহকুমার দক্ষিণার্ধ সিঙ্গারন নালা থেকে

রন্ডিয়ার এন্ডার্সন বাঁধ হয়ে গলসী থানার খড়ি ও বাঁকার অববাহিকা পর্যন্ত প্রসারিত। এই অংশে দামোদরের গড় বিস্তৃতি ২ মাইল; মাঝে মাঝে বিরাট দ্বীপের মত শিকস্তি ভূমি। অবশ্য দামোদর পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার পর সমগ্র অংশ দুর্গাপুর জলাধারে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া বর্ধমান-বাঁকুড়া জেলার মধ্যবর্তী দামোদর নদের ওপর ২২৭১ ফুট বাঁধ নির্মিত হওয়ায় দামোদরের ভয়ঙ্করী বন্যাকে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাঁকুড়া বর্ধমান উভয় জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দামোদর ক্যানেল থেকে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে। দামোদরের ওপর এই সেতুবন্ধ বর্ধমান-বাঁকুড়ার মধ্যে সড়ক যোগাযোগের পথ সুগম করেছে। এই বাঁধ থেকেই একটা Navigation Canal কেটে কলকাতা ও দুর্গাপুরের মধ্যে জলপথে যোগাযোগের পরিকল্পনাও ছিল কিন্তু জমি অধিগ্রহণ করে মাঝে মাঝে বিরাট খাল কেটে চাষের জমি নষ্ট করা ছাড়া আর কোন অগ্রগতি হয় নাই। আজ যেখানে দুর্গাপুর-শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে সেখানে শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল নিবিড় অরণ্যের ব্যূহ। দামোদর-অজয়ের মধ্যবর্তী ১৮ মাইল জুড়ে শাল, পিয়াশাল, সেগুন, পলাশের জঙ্গল যোজন যোজন বিস্তৃত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ময়ূরভঞ্জের ফরেষ্টরেঞ্জ বাঁকুড়া-রানীবাঁধ হয়ে দুর্গাপুরের এই অঞ্চলেই শেষ হয়েছে। এই জঙ্গলে যেমন ছিল ঠ্যাঙ্গাড়ে দস্যুদের আস্তানা তেমনি ছিল চিতা, হায়না, নেকড়ে, বুনো শুয়োরের উৎপাত। এই ভূখণ্ডেই পানাগড়ের দক্ষিণে দামোদরের উত্তর তীরে চম্পাই-এর কাছে ছোট টিলার আকারের সাঁওতালী পাহাড়। এই ভূখণ্ডের পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে কাঁকর মেশান শক্ত মাটি, ঢেউ খেলানো রাস্তা ও বন্ধুর খোয়াই, প্রান্তরের বেশীর ভাগ অংশে ছোট ছোট কাঁটা গাছের ঝোপ, কেশে ঘাস-এর জঙ্গল, বুনো খেজুরের গাছ। সিঙ্গারন নদীর ধারণ অববাহিকা অঞ্চলের ঊর্ধগতি অংশে গ্রাভেল ও ছোট টিলা সমন্বিত ঊষর ভূমি। রঘুনাথপুর, বেনাচিতি, ফরিদপুর অঞ্চলে যেখানে ছিল গভীর জঙ্গল আজ সেখানে শিল্পনগরী গড়ে ওঠায় অরণ্যভূমির ঘটেছে নির্বাসন। অবশ্য পানাগড়ের পর থেকে গলসী পর্যন্ত বিস্তৃত ল্যাটেরাইট ভূত্বকের ওপর দামোদর-অজয়-এর বন্যাসঞ্চিত পলির আস্তরণ পড়ায় এই অঞ্চলে বর্তমানে কৃষিকার্য ব্যাপকহারে চলছে।

ঙ) তরঙ্গায়িত পাললিক-ল্যাটেরাইট উচ্চভূমি : এই উপবিভাগে রয়েছে বর্ধমানের উত্তর অঞ্চলকে ঘিবে এরুয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ওড়গ্রামের ডাঙা। এই অঞ্চলের ভূগঠনে ২টি ভাগ লক্ষ্য করা যায়—বদ্বীপের আকার বিশিষ্ট পাললিক সমভূমি ও উপত্যকা সমভূমি। ওড়গ্রামের তরঙ্গায়িত উচ্চভূমির ভূপ্রকৃতি কুনুরের

বন্যাসঞ্জাত পলিগঠিত কঙ্করময় ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা বিশিষ্ট উচ্চভূমি এরুয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলেই রয়েছে দেবপুরের উত্তর প্রান্তে জনশ্রুতির রাজা দেবাদিত্যের মজাগড় ও ঢিবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিলিটারী ক্যাম্প-এর দৌলতে ও পরে উদ্বাস্তু কলোনী গড়ে ওঠায় এই অঞ্চলের উন্নয়ন অব্যাহত আছে। ওড়গ্রামে বর্তমানে সরকারী উদ্যোগে ডাকবাংলো ও পরিকল্পিত সামাজিক বনসৃজনের ফলে একটা পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ওড়গ্রামের পূর্বদিকে কুসুমগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত পাললিক সমভূমি, এ অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা ৪৭ মি.।

চ) পাললিক সমভূমি : খণ্ডঘোষ-রায়না-জামালপুর থানার দামোদর-দ্বারকেশ্বর বিধৌত পাললিক সমভূমি ও গলসী-ভাতার-মঙ্গলকোট, মেমারী ও আউসগ্রাম থানার পূর্বার্ধ ঘিরে রয়েছে তামলা, অজয়, দামোদর-বাঁকা-কুনুর বিধৌত পাললিক সমভূমি অঞ্চল। এই ভূখণ্ড দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে হুগলী জেলার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। গুসকরা-মেমারী ও বর্ধমান শহরাঞ্চল এই ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

ছ) কালনার সমভূমি : কুসুমগ্রামের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে ভাগীরথী-খড়ি-বাঁকা-বেহুলা বিধৌত কালনার পাললিক সমভূমি অঞ্চল।

জ) ভাগীরথী বিধৌত পাললিক সমভূমি : কুসুমগ্রামের উত্তর ও উত্তর-পূর্বে অজয়-ভাগীরথী-ব্রহ্মাণী বিধৌত কাটোয়ার ব-দ্বীপাকৃতি প্লাবনভূমি। এই বদ্বীপের কেন্দ্র বিন্দুর শীর্ষ অজয়কে অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদ সীমান্তে উত্তরে চাকতা ও পূর্বে মোরগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে ভাগীরথীর বক্ষে প্লাবনজনিত শিকস্তি ভূমি ও চর গড়ে উঠেছে। তবে প্রতি বছরই বন্যার সময় এই চর ভাঙা-গড়ার খেলা চলে।

চার অধ্যায়



জলবায়ু

কর্কটক্রান্তি রেখা বর্ধমান জেলার প্রায় মাঝখান দিয়ে দুর্গাপুর, ক্ষীরগ্রাম, পূর্বস্থলীর ওপর দিয়ে প্রসারিত। চিত্তরঞ্জন, চিচুরবিল, উদ্ধারণপুর, কর্কটক্রান্তির কিছুটা উত্তরে ২৩° ৪৫" অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। বর্ধমান কালনার অক্ষাংশ ২৩° ১৫" , জাড়গ্রাম জামালপুরের অক্ষাংশ ২৩° । কাজেই সমগ্র জেলা ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু CW_g ও AW টাইপ জলবায়ুর মধ্যে ওঠানামা করে। CW_g এর অর্থ warm temperate rainy climate with mild dry winter of eastern gangetic type of temperature trend আর Aw এর অর্থ tropical savana climate hot in all seasons but moderately comfortable with only 25° C to 20° C annual range of temperature. অর্থাৎ জেলার জলবায়ু ক্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র, শীতকালে শুষ্ক ও মৃদুশীত আর সর্ব ঋতুতেই মোটামুটি ক্রান্তীয় সাভানা টাইপের উষ্ণ জলবায়ুর মাঝামাঝি আবহাওয়া। তবে বৎসরের মধ্যে তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস থেকে ৩৫° সেলসিয়াস-এর মধ্যে ওঠানামা করে। পশ্চিমাঞ্চলে ছোটনাগপুর ও রাজমহল পাহাড়ের প্রভাব থাকায় ভূত্বক পাথুরে। চিত্তরঞ্জন, কুলটি, সালানপুর, হীরাপুর এই পার্বত্য অঞ্চলভুক্ত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু কিছুটা চরমভাবাপন্ন। এ অঞ্চলে গ্রীষ্মে গড় তাপমাত্রা ৩৭° সেলসিয়াস আর শীতকালের গড় তাপ ২৫° সেলসিয়াস। অন্ডাল থেকে আউসগ্রামের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা; এখানেও গ্রীষ্মকালে ৩৫°–৪০° সেঃ তাপমাত্রা, শীতকালে ১৫°–১৮° সেঃ। পূর্বাঞ্চল অজয়-ভাগীরথী-দামোদর বিধৌত পাললিক সমভূমিভুক্ত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু মোটামুটি মৃদু নাতিশীতোষ্ণ, মনোরম। এ অঞ্চলের তাপমাত্রা গ্রীষ্মে ৩০°–৩২° সেঃ আর শীতকালে ১৭°–১৮° সেঃ।

দুর্গাপুর আসানসোল অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের গড় ১২৫–১৫০ সেমি আর পূর্বাঞ্চলের বৃষ্টিপাতের গড় ১৫০–১৭৫ সেমি। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আসানসোল অঞ্চলে ১৪৬৯.৩ মিমি; বৎসরে গড়ে ৭৭.১ দিন বৃষ্টিপাত হয়। বর্ধমানের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫২৮.৬ মিমি ও গড় বৃষ্টিপাত হয় বৎসরে ৭৭.৬ দিন, কাটোয়ায় এই পরিমাণ ১৩৬৫.১ মিমি/৭৪ দিন, শ্যামসুন্দরে ১২৭০.১ মিমি/৭০.৭ দিন। আসানসোল অঞ্চলে বাতাসে আর্দ্রতা বেশী থাকায় গ্রীষ্মে উত্তাপ খুব বেশী অনুভূত হয়। পূর্বাহ্নের আর্দ্রতা ৭০% ও অপরাহ্নের আর্দ্রতা ৫৫%। ফলে দুপুরে গরমে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। দুর্গাপুর অঞ্চলে কলকারখানার আধিক্যের জন্য গ্রীষ্মের গরমের তীব্রতা খুবই বেশী। সেকারণে পূর্বে দুর্গাপুর আসানসোল অঞ্চলে অফিস কাছারী সব সকালে আরম্ভ হতো। বর্তমানে এ প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে। জেলায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত ১৭৫–১২৫ সেমির মধ্যে। মৌসুমী বায়ু হিমালয়ে প্রতিহত হয়ে পশ্চিম দিকে যত অগ্রসর হয় তত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে থাকে। তাই আসানসোল অঞ্চলের বৃষ্টিপাত পূর্বাঞ্চলের চেয়ে কম। তাছাড়া পূর্বাঞ্চলে দামোদর-ভাগীরথীর প্রভাব ও অধিক পরিমাণ বৃক্ষরোপণ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলেই মনে হয়। তবে প্রত্যেক বছর একই রকম বৃষ্টিপাত হয় না। কোন কোন বছর অনাবৃষ্টি ও আবার কোন কোন বছর অতিবৃষ্টিও হতে দেখা যায়। মৌসুমীর আগমন ও প্রত্যাবর্তনও একই সময়ে হয় না। ফলে বৃষ্টিপাতের সূচনা ও বিদায়কালের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করা যায়। কয়েক বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে নিম্নচাপের প্রভাব বেশ বেড়ে গেছে। আশ্বিন মাস থেকে পৌষ-মাঘ মাসেও মাঝে মাঝে নিম্নচাপের প্রভাবের ফলে ঝড়-বৃষ্টির আধিক্য দেখা যায়। বৃষ্টিপাতের অসম বন্টনের জন্য মাঝে মাঝে নদীতে প্রবল বন্যা দেখা যায়। বেশ কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ভাগীরথী, অজয়, দামোদর, বাঁকা, খড়োশ্বরীর জল ফুলে ফেঁপে ওঠে। নদীখাতে পলি জমে জলনিকাশী ব্যবস্থা নষ্ট হওয়ায় ঐ জমা জল দুকূল প্লাবিত করে বন্যার সৃষ্টি করে।

সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখের পর বৃষ্টিপাত কমে যায়, তবে এই সময়ে বিশেষ করে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে নিম্নচাপের ফলে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। অক্টোবরের ৯/১০ তারিখ নাগাদ মৌসুমী বিদায় নেয়। কিন্তু নিম্নচাপ প্রবল হলে ঘূর্ণিঝড় যাকে বলে ‘আশ্বিনের ঝড়’ মাঝে মাঝে উৎপাত ঘটায়।

শীতকালে বৃষ্টিপাত বিশেষ হয় না। উষ্ণতাও বেশ কমে যায়। আসানসোল দুর্গাপুর বলয়ে পাথুরে মাটিতে শীতের প্রাবল্য দেখা যায়। ভোরের দিকে মাঝে মাঝে কুয়াশা দেখা যায়।

পাঁচ অধ্যায়



নদনদী

বর্ধমান জেলা চতুর্দিকে নদী পরিবৃত ভূখণ্ড। জেলার পূর্বে প্রবাহিত হচ্ছে ভাগীরথী-হুগলী, উত্তরে অজয় ও তার শাখানদী, দক্ষিণ-পশ্চিমে দামোদর-দ্বারকেশ্বর ও তাদের শাখাপ্রশাখা। এছাড়া সারা জেলা জুড়ে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা ঝিল-বিল ও হানা। জেলায় নদীগুলির মধ্যে দামোদরই প্রথম, ভাগীরথীর স্থান দ্বিতীয়। জেলার মধ্যে প্রবাহিত নদীগুলির মধ্যে দামোদর, ভাগীরথী, অজয়, বরাকর, কুনুর, খড়িই প্রধান। সংস্কৃত সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যে জেলার এমন নদীর উল্লেখ পাওয়া যায় যাদের অস্তিত্ব বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। শিলাবতী, সরস্বতী বর্তমানে ভিন্ন জনপদের নদী। বকুলা, ইন্দ্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় না। জেলার অববাহিকা গঠনে, কৃষিকার্যের সহায়তায় ও প্রধান প্রধান নদীকে পুষ্ট করতে কানা নদী, কানা দামোদর, দেবখাল, ঘিয়া, তমলা, সিঙ্গারন, নুনিয়া, খুদিয়া, বাঁকা, ব্রহ্মাণী, কাঁটাখাল, খণ্ডেশ্বরী, মুণ্ডেশ্বরী, কুকুয়া, তুমুনি এদেরও অবদান কম নয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ এই সমস্ত নদী জেলার সমতলভূমিকে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা করেছে। প্রাচীনকালে এই সমস্ত নদনদীর গতিপথ যে অনেকাংশে ভিন্ন ভিন্ন ছিল সে বিষয়ে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নিঃসন্দেহ। গত চার পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে নদী ও খালের গতিপথের যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে তা ইবনবতুতা, বারণি, র‍্যালফ (Ralph Fitch) ফিচ্, ফার্নাণ্ডেস প্রভৃতি পর্যটকদের বিবরণ, ডেন ব্রোকের (১৬৬০) মানচিত্র, রেনেলের মানচিত্র, ১৮৫৪—৫৫; ১৯১০, ১৯৫০—৫১ সালের সার্ভে মানচিত্র থেকে জানা যায়। যাই হোক বর্তমানে যে নদনদী ও খালের অস্তিত্ব রয়েছে—যাদের অবদানে জেলা সমৃদ্ধ, তাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

দামোদর : দামোদরকে নিয়ে কত প্রবাদ, আজও লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। "সত্যের গঙ্গা দামোদর", "খুদে নুনে বরাকর, তিন নিয়ে

দামোদর", "ওরে নদ দামোদব, তোরে নিয়ে আতান্তর"—এই সব প্রবাদের দ্বারা এই নদের প্রাচীনত্ব উৎস ও প্রকৃতির কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। বর্ধমানের দুঃখের নদ বা হোয়াংহো এই দামোদর পুরাণের মহাগৌরী, মঙ্গলকাব্যের দেবনদ, অরিয়ানের Andomatis, আর পালামৌ-হাজারীবাগের আদিবাসীদের 'দামুদা', অতিপ্রাচীন নদ এই দামোদর।

অস্ট্রিক ভাষী আদিবাসীদের ভাষায় এর নাম দামুদা—দামু-দা-ক্ প্রত্যয়ান্ত পদ। 'দামু' অর্থে পবিত্র আর 'দা' অর্থে জল, তাই এর অন্য নাম সত্যের গঙ্গা।

দামোদর আর তার কোনার, গুয়াই, জামনিয়া, উসরি, বোকারো, হাহারো, খদিযা, ভেড়া ও ববাকর মিলে বিরাট দামোদর অববাহিকা অঞ্চল। দামোদর উপত্যকা অঞ্চল রয়েছে ৫৮৪৭৯ বর্গকিলোমিটার জুড়ে, যার ৫৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩২,১১৩ কিমি বিহারের মধ্যে পড়ে আর ২৬,৩৬৬ কিমি পশ্চিমবঙ্গে। বিহারেব রাঁচী জেলায় রাজাকুপ্পায় খামারপত (১,০৬৭ মিটার উচ্চ) গিরিশৃঙ্গের সোনাজুড়িয়া প্রস্রবণই হলো দামোদরের উৎসস্থল। দামোদরের মোট দৈর্ঘ্য ৫৪১ কিমি যার মধ্যে ২৮৭ কিমি পড়েছে বিহারে আর ২৫৪ কিমি পশ্চিমবঙ্গে। ৫৪১ কিমি দৈর্ঘ্যের মধ্যে রাজারুপ্পা থেকে বরাকরের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত উর্ধগতি, বরাকর—দামোদর থেকে বড়শুল পর্যন্ত মধ্যগতি আব বড়শুল থেকে ভাগীরথী-দামোদর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত নিম্নগতি। উর্ধগতিতে ঢাল ৬ ফুট, মধ্যগতিতে ২ ফুট আর নিম্নগতিতে ৯ ইঞ্চি।.অববাহিকা অঞ্চলে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৩৫০.৭ মিমি বা ৫৩.১৮"; এই বৃষ্টিপাত হয় সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। উর্ধগতি অংশে দামোদর ও বরাকরের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ২টি জলাধাব নির্মাণ করা হয়েছে—একটি বরাকরের উপর মাইথন ও অপরটি দামোদরের উপর পাঞ্চেৎ পাহাড়ে; বন্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অববাহিকা অঞ্চলে জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনও এই জলাধার নির্মাণের অন্য উদ্দেশ্য। পাঞ্চেৎ পাহাড়, দামোদর-বরাকর সঙ্গমস্থল থেকে ৫ কিমি পশ্চিমে আর মাইথন ড্যাম (Dam) ঐ সঙ্গমস্থল থেকে ১৩ কিমি উত্তরে। জলাধার বরাকর নদীর উর্ধগতি অঞ্চলে মালভূমিতে নির্মিত হয়েছে। প্রথমে অবশ্য বরাকর ও উরশির সঙ্গমস্থলে বেলপাহাড়ি ড্যাম নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। পরে সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় ও তিলাইয়া বাঁধ নির্মাণ অনুমোদিত হয়।

দুর্গাপুরে ব্যারেজ নির্মাণের আগে দামোদর তার মধ্যগতি অঞ্চলে অর্থাৎ দুর্গাপুর থেকে বড়শুল পর্যন্ত উচ্চাবচ বালুচরের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হতো। মধ্যগতির পর চাঁচাই-এর কাছে প্রায় সমকোণে নদী গতি পরিবর্তন করে।

এরপর জামালপুর থানার সাদিপুর, বেড়ুগ্রাম, চক্ষনজাদি, দাদপুর, জামালপুর শুঁড়ে-কালনা হয়ে মুণ্ডেশ্বরী খাতে দ্বিধা বিভক্ত হয়। তারপর জাড়গ্রামের পাশ দিয়ে কোড়াগ্রামে হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে। মুণ্ডেশ্বরী খাতই এখানে দামোদরের প্রধান ধারা। জামালপুর থানার দেবখাল উইলফোর্ডের বেদবতী বা দেবনদের স্মৃতি বহন করছে। (Historical Geography and topography of Bihar, M. S. Pandey) পার্শ্ববর্তী একাধিক খাল থেকে জল এসে এই দেবখালকে পুষ্ট করছে।

নিম্নগতিতে হুগলী জেলার মধ্যে রাজবলহাট, আমতা, বাগনানের পাশ দিয়ে ফলতার কাছে দামোদর ভাগীরথীতে মিশেছে।

কোন কোন ভূতাত্ত্বিকের মতে প্রাচীন কালে ভাগীরথী, অজয় ও দামোদরের মধ্যে একটা যোগসূত্র ছিল এবং খড়ি বা খড়োশ্বরী ছিল দামোদরেরই একটি শাখানদী। এই সমস্ত ভূতাত্ত্বিকের মতে দামোদর বর্ধমান থেকে গতিপথ পরিবর্তন করে পশ্চিম থেকে সরাসরি পূর্ব বাহিনী হয়ে কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছিল; তারপর দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী হয়ে বর্তমানের রূপ পরিগ্রহ করে।

Dr. P. K. Roy তাঁর Agricultural Economy of Bengal গ্রন্থে এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন—

"But before her (Damodar) joining Hooghly near Kalna, she is known to have had flowed almost a direct west to east course and discharge her water into the Hooghly at a point in the vicinity of Katwa, which is hundred miles north of Calcutta. Gradually she took a south-easternly course, changing her point of continuance with Hooghly at the same time until she assumed her present course." কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে বেহুলার নিরুদ্দেশ যাত্রাপথের বর্ণনায় দামোদরের এই পুরানো প্রবাহপথের ইঙ্গিত মেলে। Reverend Long এর বিবরণীতেও দেখা যায় :

"The river (Damodar) formerly flowed behind Kalna where old Kalna now is, it passed by Pyagachi, the remains of deep and large Jhils are still to be met there."

সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় কুন্তলা লাহিড়ির একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দামোদরে অন্তত পক্ষে ২৭ বার বন্যা হয়েছে। এর মধ্যে ১৭৭০, ১৮৫৫, ১৯১৩, ১৯৪৩ এর বন্যায় বর্ধমান শহরের অধিকাংশ অংশ ডুবে যায়।

১৮৫৫ সালের বন্যায় জামালপুর থানার কৃষ্ণপুরে বাঁধ ভাঙে। ১৯১৩ সালের বন্যায় বর্ধমান শহরে ত্রাণকার্যে নিযুক্ত বর্ধমান মহারাজার জঙ্গবাহাদুর হাতিও মারা যায়। ১৯৪৩ সালে বন্যায় বর্ধমান ও মেমারীর মাঝখানে মানিকহাটিতে দামোদরের বামতীরে যে বাঁধ ভাঙে তার ফলে শক্তিগড় পালসিটের কাছে জি. টি. রোড এমন কি হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইন বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে হাওড়া থেকে দিল্লী পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ ও রেলপথের যোগাযোগ প্রায় মাসাবধিকাল বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। হাওড়া থেকে বর্ধমান আসতে হলে ব্যাণ্ডেল থেকে কাটোয়া এসে B.K. লাইন ধরে বর্ধমান আসতে হতো।

দামোদরের এই বিধ্বংসী বন্যার হাত থেকে নিম্ন দামোদরের অববাহিকা অঞ্চলের অধিবাসী, নগর ও গ্রামকে রক্ষা করার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানী জমিদারের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর মাসে যে বন্যা হয় তার ফলে বন্যার জল বাঁধ ছাপিয়ে যায় ও বর্ধমান শহরের পশ্চিম প্রান্তে বাঁধ ভাঙে, ফলে শহরের বেশীর ভাগ অংশ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। সেবার মহারাজার চেষ্টায় বাঁধ মেরামত হয় ও মহারাজা মেরামতির খরচ বাবদ কোম্পানীর কাছে দেয় রাজস্ব থেকে ৮০.০০০ টাকা ছাড় পান।

এরপর ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান রাজ কীর্তিচাঁদের ও কোম্পানীর মধ্যে দামোদরের বামতীর বরাবর বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতির জন্য এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর জন্য মহারাজাকে ১,৯৩,৭২১ টাকা অতিরিক্ত দেবার কথা বলা হয়। কিন্তু চুক্তি মত সঠিকভাবে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতির কাজ পরিচালিত না হওয়ায় কোম্পানী ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে Supdt of Pulbandi নামে একটা সরকারী পদ সৃষ্টি করে তার ওপর বাঁধ নির্মাণ ও তদারকির দায়িত্ব দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বন্যা নিরোধ করা সম্ভব হয় না। ১৮৪০ সালের বন্যায় দামোদরের বামতীরের বাঁধে কম করে ১১৩টি ফাটল দেখা যায়। তখন ১৮৬৬ ও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে The Bengal Embankment Act পাশ করে সরকার বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতির ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেন।

এই আইনের ফলে সরকার দামোদরের বামতীর বরাবর সিলিয়া হতে আলিপুর, চাঁচাই থেকে জয়রামপুর পর্যন্ত ১১৫ মাইল ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের কাছে জুজুটি থেকে জামালপুর পর্যন্ত ২২ মাইল খালের জন্য ২টি বাঁধ দেবার ক্ষমতা পান। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৩২০ সালে ও ১৩২৫ সালের বন্যায় বর্ধমান জেলাকে রক্ষা করা যায় নাই।

স্বাধীনতার পর দামোদর পরিকল্পনা অনুসারে তিলাইয়া, মাইথন, পাঞ্চেত ও দুর্গাপুর ব্যারেজ নির্মাণের ফলে বর্তমানে বন্যার প্রকোপ অনেক কমে গেছে। অবশ্য এই সব বাঁধ নির্মাণের ফলে উচ্চ মালভূমিতে নদীর অববাহিকা অঞ্চলের প্রায় ২০০টি গ্রামের লক্ষাধিক আদিবাসী মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে আর ৫০,০০০ মানুষের জমি ব্যারেজের কুক্ষিগত হয়েছে। এই সমস্ত উচ্ছেদ হওয়া আদিবাসী কৃষকদের কিছু অংশ কয়লাখনি, সিমেন্ট কারখানা ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ পেয়ে সস্তা শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু পরিকল্পনামাফিক কি সব জমিতে ক্যানেলের জল দিয়ে সেচের ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণ হয়েছে? কলকাতা থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত ন্যাভিগেশন ক্যানেল কেটে নৌকা যোগে পরিবহনের ব্যবস্থাও রূপায়িত হয় নাই বরং এর জন্যে যে সব জমি অধিগৃহীত হয়েছে তার ফলে যে শস্য হানি হয়েছে তার মূল্যও কম নয়। তাছাড়া দামোদরের বামতীর বরাবর বাঁধ নির্মাণের ফলে প্লাবনজনিত পলি নদীর বামতীর বরাবর নিষ্ক্রমণ হতে পারে নাই—নদীখাতেই জমা হতে থাকে, ফলে নদীখাতের গভীরতা প্রতি বছর কমে আসছে। ফলে বর্ষাকালে যখন ব্যারেজে আর অতিরিক্ত জল ধরে রাখা সম্ভব হয় না; তখন এক এক সময়, লক্ষাধিক কিউসেক জল ছাড়ার ফলে দামোদরের বন্যার ফলে নদীর দক্ষিণতীরে পাড় ভেঙে নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে ও তীরস্থ গ্রামগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এরও প্রতিকারের কথা চিন্তা করার সময় এসেছে।

ব্যারেজে প্রতি বছর পলি জ'মে তার জলধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। ব্যারেজের এই পলি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ও নদীর দক্ষিণ পাড়ের গ্রামগুলি রক্ষার জন্য নদীখাতের ড্রেজিং-এর দরকার। এই সমস্ত কাজ ব্যয় সাপেক্ষ হলেও এগুলি সম্পন্ন করা খুবই প্রয়োজন। তা না হলে একদিন দেখা যাবে, গোটা পরিকল্পনাটাই নষ্ট হতে বসেছে।

এতৎ সত্ত্বেও অস্বীকার করার উপায় নাই যে দামোদরের বহুমুখী পরিকল্পনা জেলার মানুষের মধ্যে এনেছে এক বিরাট অর্থনৈতিক পরিবর্তন। পরিকল্পনায় সেচপ্রকল্প থেকে ১৯৫৫ সালেই জেলায় ৫,৮৯,৪৫৩ একর খরিফ চাষে, ১.০১,৮৭৬ একর বোরো চাষে ও ১৯,৫২১ একর রবিচাষে সেচের জল সরবরাহ করা হয়েছিল। ১৯৮৯–৯০ সালের হিসাবে দেখা যায় বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার ৫ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমিকে এই পরিকল্পনায় সেচপ্রকল্পের অধীনে আনা হয়েছে। বোকারো, চন্দ্রপুরা ও দুর্গাপুরে যে তিনটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, তার থেকে বর্তমানে ১০৭৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

এছাড়াও ১০৪ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ায় গভীর নলকূপ দিয়ে চাষের বাড়তি সুযোগ হয়েছে। জেলার জলসম্পদ অনুসন্ধান দপ্তর ও পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৩–৯৪ সালে সরকারি গভীর নলকূলের সংখ্যা ছিল ৫৪৩, নদী-জলোত্তোলন-সেচব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছে ২৬৫ ক্ষেত্রে, সরকারী ও বেসরকারী অগভীর নলকূপের সংখ্যা ৩৭,০৪৭ যার মধ্যে বিদ্যুৎ চালিত অগভীর নলকূপ ১০১৫৮ টি আর এর জন্যে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ ৯৮,২৫৪ হাজার কিলোওযাট ঘন্টা (KWH)। বর্ধমান শহর ও জামালপুর থানায় শুখা মরসুমে দামোদরের বালি তোলাও একটা বড় ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পরিকল্পনায় ত্রুটি ও অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও দামোদর জেলার জনজীবনের আর্থিক উন্নয়নে এই পরিকল্পনা এক আশীর্বাদ-স্বরূপ।

বরাকর : বরাকর নদী দামোদরের সবচেয়ে বড় উপনদী। বরাকর শহরের নাম অনুসারেই নদীর নাম। বিহারের হাজারীবাগের ৭ মাইল উত্তরে ইচ্‌ক শহরের ২১০০ ফুট উচ্চ কোডারমা পার্বত্য অঞ্চলে বরাকর উদ্ভূত হয়ে উত্তরবাহিনী হয়ে বরাকর, হাজারীবাগ, মানভূম জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সালানপুর থানার ঘাটকুল মৌজায় বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেছে। এরপর সালানপুর ও কুলটি থানার পাশ দিয়ে ২৩′৪২″ উঃ অক্ষাংশে ও ৮৬′৪২″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে শিয়ালডাঙ্গায় দামোদরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে প্রবাহ পথের ঢাল ৭ ফুট। প্রধান উপনদী বারসোতি ও উরসি যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তরদিক থেকে বরাকরে এসে মিশেছে।এছাড়া খুদিয়া, লারহিয়ান্দিকে নিয়ে প্রায় ১৫টি উপনদী ও বর্ষায় ছোট ছোট কাঁদর ও প্রস্রবণ থেকে জলধারা এসে বরাকরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিধ্বংসী বন্যার সৃষ্টি করে। বর্তমানে দামোদর পরিকল্পনা অনুসারে তিলাইয়া ও মাইথন ব্যারেজ নির্মাণের ফলে বন্যার প্রকোপ অনেক কমেছে। বরং দুর্গাপুর ব্যারেজ নির্মাণের ফলে দামোদর ও বরাকরের জল দ্বারা ক্যানেলের মাধ্যমে জেলার ব্যাপক অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে। বর্ধমান জেলায় বরাকরের প্রবাহপথ মাত্র ২০ কিমি। উৎসস্থল থেকে সঙ্গমস্থল পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ২২৫ কিমি ও অববাহিকা অঞ্চল ৬১৫০ বর্গ কিমি।

নুনিয়া : আসানসোল মহকুমার সালানপুর থানার আদরা গ্রামের এক উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হয়ে খায়েরবাদ মৌজার কাছে পূর্বমুখী হয়ে বরাবনি থানায় প্রবেশ করেছে। তারপর বরাবনি থানার ইটাপোরা মৌজা পার হয়ে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়েছে। নুনিয়ার দুই উপনদী পুনাতা খাল ও দামোদর খাল, চককেশবগঞ্জের কাছে নুনিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে মিলিত স্রোত আসানসোলের

৩ মাইল পূর্বে জি. টি. রোড পার হয়ে রানীগঞ্জ থানার এগরা ও দামুন্যা মৌজার সীমান্তে দামোদরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। খাতের দৈর্ঘ্য ৪০ কিমি.। গ্রীষ্মকালে নদীতে জল থাকে না বললেই হয়। তবে কালিপাহাড়ির পর থেকে কয়েকটি নালার জলে পুষ্ট হওয়ার ফলে গ্রীষ্মকালেও অন্তত হাঁটুজল থাকে।

অজয় : অজয়ও একটি প্রাচীন নদী। প্রাচীনত্বের দিক থেকে দামোদরের পরই অজয়ের স্থান। Mc. Crindle এর সম্পাদনায় মেগাস্থিনিস ও এরিয়ানের প্রাচীন ভারতের বিবরণে দেখা যায় Amystis নদী কাটাদুপা নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। Wilfred এই Amystis কে অজাবতী বা অজয় A-Joy বা Not conquered বলে চিহ্নিত করেছেন। বিহার জেলার সাঁওতাল পরগনার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে মুঙ্গেরের ৩০০–৩৬০ মি. উচ্চ পাহাড় থেকে বহির্গত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে হাজারীবাগ জেলা অতিক্রম করেছে। তারপর দক্ষিণ-পূর্বগামী হয়ে সাঁওতাল পরগনার আফজলপুরের পাশ দিয়ে চিত্তরঞ্জনের কয়েক মাইল পূর্বে সিমজুড়ির কাছে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেছে। এরপর দক্ষিণাভিমুখী হয়ে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমান্ত বরাবর পূর্ব ও উত্তর-পূর্বমুখী হয়ে কেতুগ্রাম থানার নারেঙ্গ মৌজার কাছে কাটোয়া মহকুমায় প্রবেশ করে কাটোয়ায় ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছে। সাঁওতাল পরগনার এই নদের প্রধান উপনদী পাথরো ও জৈন্তী আর বর্ধমান জেলার উপনদী তুমুনী ও কুনুর। তুমুনি কাঁকসা থানার ৪৪নং বিষ্ণুপুরের উত্তর সীমান্তে ও কুনুর মঙ্গলকোটের পাশ দিয়ে উজানি কোগ্রামে অজয়ে পড়েছে। মঙ্গলকাব্যের ভ্রমরার দহ এখানেই ছিল। অজয়কুনুরের সঙ্গমে ছিল এর অবস্থান; 'হ্রদ' পদ থেকে বর্ণবিপর্যয়ের ফলে উচ্চারিত হয় 'দহ'। কাজেই মনে হয় হ্রদের মত এই জলাধারে তখনকার দিনের বণিকরা বাণিজ্যযাত্রা শেষ করে এই দহেই বাণিজ্যতরী ডুবিয়ে রাখতেন—

পূর্ব হতে ছিল ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।
ডুবুরী লইয়ে সাধু গেল তার কূলে॥

(চণ্ডীমঙ্গল)।

প্রবাহপথে কুনুর কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট থানার এবং কেতুগ্রাম ও কাটোয়া থানার প্রাকৃতিক সীমারেখা চিহ্নিত করেছে। উচ্চগতিতে অজয়ের প্রবল জলস্রোতে ভূমিক্ষয়ের ফলে বন্যার জলে মোটা বালি বাহিত হয়ে আসে। এর ফলে একদিকে যেমন নদীর খাতে বালি সঞ্চিত হয়ে নদীখাত উন্নত হচ্ছে, তেমনি অববাহিকার অনেকাংশ কৃষির অযোগ্য হয়ে উঠেছে ও বর্ষায় অজয়ের বন্যা ভয়ঙ্করী রূপ গ্রহণ করছে।

অজয়ের মোট দৈর্ঘ্য ২৮৮ কিমি। এর মধ্যে বর্ধমান জেলার প্রবাহপথ ১৫২ কিমি। মধ্যগতি ও নিম্নগতিতে নদীখাত হ্রাস পাওয়ার ফলে প্রায় প্রতি বছরই অজয়ে বন্যা হয়।

অজয়ের অববাহিকা আউসগ্রাম থানা পর্যন্ত শিলাস্তর ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। এর ফলে আউসগ্রাম থানার বিশেষভাবে অজয় তীরবর্তী অঞ্চলে শাল, পিয়াশাল, পলাশের জঙ্গলমহল। আউসগ্রামের পূর্ব সীমান্ত থেকে মৃত্তিকা পলিগঠিত। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অজয় নিম্নগতিতে সুনাব্য ছিল ও রানীগঞ্জের খনি অঞ্চলের কয়লা নৌকাযোগে এই নদীপথ ধরে ভাগীরথী দিয়ে কলকাতায় চালান যেত। নদীর দুধারে বনজঙ্গল প্রচুর ছিল। কিন্তু অববাহিকা অঞ্চলে কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর কলকারখানা ও জনবসতি গড়ে ওঠায় কৃষিজমির স্বার্থে ব্যাপকভাবে বনাঞ্চল নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। এর ফলে নদীর অববাহিকা অঞ্চল থেকে ব্যাপকভাবে ভূমিক্ষয় বেড়ে গিয়েছে ও ক্ষয়জাত মৃত্তিকা নদীর মধ্যে পড়ে নদীখাতে সঞ্চিত হতে থাকে, আর অবক্ষেপণের ফলে নদীর জলধারণ ক্ষমতাও কমতে থাকে। বর্তমানে গ্রীষ্মকালে নদীর ক্ষীণ স্রোতধারা নদীর অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। সরকারী হিসাবে বর্তমান শতকে ১৯৮৭ পর্যন্ত অজয়ে ১৪ বার বন্যা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কিছু বাঁধ দিয়ে বন্যা রোধ ও জমির ফসল রক্ষার চেষ্টা হয়েছিল, তারপব সরকারী প্রচেষ্টায় গোরাবাজার থেকে সাগরপোতা পর্যন্ত বাঁধ দেওয়া হয়। কিন্তু বাঁধের উচ্চতা ও প্রসার বন্যার প্রবল জলস্রোত রোধের উপযুক্ত না হওয়ায় বাঁধ দিয়ে বন্যারোধ করা সম্ভব হয় নাই। ইলামবাজারের কাছে সেতু নির্মাণ করে পানাগড় থেকে সিউড়ি এবং ভেদিয়া স্টেশনের পর রেললাইন পাতার জন্য রেল কর্তৃপক্ষের দ্বারা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা বহু আগে থেকেই আছে। এই নদীর তীরে আউসংগ্রাম থানার ৪২নং গোস্বামী খণ্ড ও ৫৩নং পাণ্ডুক মৌজায় পাণ্ডুরাজার ঢিবি মতান্তরে রাজপোতা ডাঙায়, সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক তাম্রাশ্মীয় যুগের এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় বর্ধমানের ইতিহাসের প্রাচীন পর্বের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এই নদীর ধারেই কেন্দুবিল্ব গ্রামে গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের জন্মস্থান।

ভাগীরথী : পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ নদী এই গঙ্গা—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এ নদী বিভিন্ন নামে পরিচিত—গঙ্গা, জাহ্নবী, ভাগীরথী, হুগলী, পদ্মা। পদ্মা ও ভাগীরথীকে মহাকবি কৃত্তিবাস বড় গঙ্গা ও ছোট গঙ্গা বলে উল্লেখ করেছেন।

পদ্মার বিশালতা ও ভাগীরথীর ক্ষীণ কায়ার জন্য মহাকবি বড় গঙ্গা ও ছোট গঙ্গা বলে উল্লেখ করলেও ভাগীরথী বা ছোট গঙ্গাই হিন্দুর চক্ষে প্রাচীন ও পবিত্র—'পদ্মার বিশালতাও তাহাকে ধর্ম বা ভক্তির দিক দিয়া সমতুল করতে পারে নাই।' (বাংলাদেশের ইতিহাস/প্রাচীন যুগ) পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদী হলেও এ জেলার অর্থনীতি ও জনজীবনে ভাগীরথীর স্থান দামোদরের পরে।

হিমালয়ের গাড়োয়াল পার্বত্য অঞ্চলে গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে নির্গত হয়ে হরিদ্বারে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করেছে; এরপর উত্তর ভারত, বিহার অতিক্রম করে মালদহ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দিয়ে প্রবেশ করেছে রাজমহল পার্বত্য এলাকায়। তারপর সমতলে অগ্রসর হয়ে পূর্ব-দক্ষিণ বাহিনী গঙ্গা গিরিয়ার কাছে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে এক ধারা মুর্শিদাবাদকে দ্বিখণ্ডিত করে নদীয়া ও বর্ধমানের সীমানা চিহ্নিত করে কলকাতা ও হাওড়ার মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই ধারা নবদ্বীপ পর্যন্ত ভাগীরথী নামে তারপর থেকে সাগর পর্যন্ত হুগলী নামে উল্লিখিত। ভাগীরথী বা হুগলী যে নামেই পরিচিত হোক না কেন, বর্ধমানবাসীর কাছে এ নদী গঙ্গা নামেই পরিচিত। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ভ্যান ডেক ব্রোকের মানচিত্র অনুসারে রাজমহলের কিছু দক্ষিণে গঙ্গানদীর তিনটি শাখা নদী দক্ষিণবাহিনী হয়ে গঙ্গাসাগর সঙ্গমের নিকটে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর রেনেলের মানচিত্র অনুসারে সরস্বতী, ভাগীরথী ও যমুনা এই তিনটি শাখার মিলিত স্রোত ভাগীরথীতে পরিণত হয়ে গঙ্গাসঙ্গম পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

গঙ্গা অতি পবিত্র নদী—এর এক ফোঁটা জলও 'গঙ্গা' বলে মাথায় ছিটিয়ে নিলে ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের দেহমন পবিত্র হয়ে যায়। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর ধারণা মৃত্যুর পর অস্থি ও ভস্ম, মগরার ত্রিবেণী সঙ্গমে বিসর্জন দিলে মৃতের আত্মার সর্বপাপ মোচন হবে ও আত্মার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে। 1902 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত The New popular Encyclopediaতে—এ কথা স্বীকার করা হয়েছে। "Ganges (called by the Hindus Ganga from a verb meaning 'to go') one of the greatest rivers of Asia, which rises in the Himalayas mountains in the province of Garhwal. It is formed by the junction of two head streams called respectively the Bhagirathi and the Alkananda which unite at Deoprag.... Its length with deviations is calculated, at about 1500 miles. It is an imperative duty of the Hindus to bathe in the Ganges or at least to wash themselves with its water. The Hindus believe that the river rises immediately from the feet of Brahma and it possesses great miraculous powers on account of its divine origin."

ভাগীরথীর সঙ্গে রামায়ণ ও মৎস্যপুরাণোক্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগর রাজার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ভগীরথের নাম জড়িত বলে অনেকে মত পোষণ করেন। Wild Cocks তাঁর Ancient Irrigation system গ্রন্থেও ভাগীরথীকে man made canal বলে অভিহিত করেছেন; যদিও বর্তমানের ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এমত সমর্থন করেন না। তবুও মনে হয় পৌরাণিক কাহিনীকে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে এর সমর্থন মেলে।

"ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" নামক কল্পবিজ্ঞান প্রবন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর 'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' প্রশ্নের উত্তরে নদীর কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে যেন 'মহাদেবের জটা হইতে' উত্তরের সন্ধান পান। তারপর ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে বের হয়ে হিমালয়ের ত্রিশূল পর্বতে জটাকৃতি তুষার-রাশির মধ্যে মহাদেবের জটার একটা বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করেন। কপিল-মুনির শাপে ভস্মীভূত সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রকে গঙ্গাসলিলে সিক্ত করিয়ে উদ্ধার করার প্রচেষ্টায় ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পৌরাণিক কাহিনীকে নিছক কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। খ্রীষ্টজন্মের ২০০ বছর আগে প্রচণ্ড খরাক্লিষ্ট দুর্ভিক্ষ পীড়িত মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান ও হুগলীর ৬০,০০০ জনগণকে বাঁচাবার জন্য রাজমহলের গিরিয়ার কাছ থেকে খাল কেটে গঙ্গার জলকে এই সব জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে শস্যশ্যামল করার জন্য তৎকালীন ভগীরথ নামক স্থপতির প্রচেষ্টা অবাস্তব না হওয়াই স্বাভাবিক।

হরিদ্বার থেকে মোহানা পর্যন্ত গঙ্গার দৈর্ঘ্য ২৪৯৯ কিমি হলেও বর্ধমান জেলার পূর্ব সীমান্ত বরাবর এর দৈর্ঘ্য ১১০ থেকে ১২০ কিমি এর বেশী নয়। মোহানা থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত অংশে জোয়ারভাটা দেখা যায়। বর্ধমান জেলার প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত ভাগীরথীতে জোয়ার-ভাটার বিশেষ প্রভাব অনুভূত হয় না। কালনার কাছে জোয়ার-ভাটার প্রভাবে শেষ প্রান্তে ৪১৮ মি. দীর্ঘ ও ১৬৭.৭ মি. বিস্তৃত অর্ধচন্দ্রাকৃত বালিয়াড়ি গড়ে উঠেছে। কাটোয়ায় জোয়ার-ভাটার কোন প্রভাবই অনুভূত হয় না। বাঁকা, ব্রহ্মাণী, অজয়, খড়ি, শিবা, খণ্ডেশ্বরী, বাবলা, কুজি প্রভৃতি নদী ও কাঁটাখাল, কামালের খাল, কামাখ্যা খাল ভাগীরথীর জলধারাকে পুষ্ট করে। বর্তমানে হুগলী নদীপথে পলি জমে যাওয়ায় কলকাতা বন্দর মৃতপ্রায় হয়ে এসেছে। পলিমুক্ত করতে ক্রমাগত মাটিকাটা ড্রেজারের সাহায্য নিতে হয়। ফরাক্কায় গঙ্গা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণ করে কাটা খাল মারফৎ ভাগীরথী, হুগলী নদীপথে অতিরিক্ত ৪০,০০০ কিউসেক জলের সরবরাহ করে পলিমুক্ত করার চেষ্টা চলছে।

খড়েশ্বরী বা খড়ি : মানকরের কাছে মাড়োর (৮৭.৩৪ পূর্ব দ্রাঘিমা ও ২৩.২৬ উত্তর অক্ষাংশ) কাছে এক খনিত খাত (furrow) থেকে নির্গত হয়ে ইষ্টার্ন রেলওয়ের উত্তর বরাবর আউসগ্রাম থানার ভাদা করঞ্জি পর্যন্ত এসে উত্তরমুখী হয় ও পূর্বগামী হয়ে ভাতার থানার কর্জনার পর থেকে কিছুটা দক্ষিণাভিমুখী হয়ে পূর্বমুখে নদী কলিগ্রাম পার হয়ে গৌড় নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মিলিত স্রোত আবার উত্তর-পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়েছে। পথে নওয়াপাড়া গ্রামের কাছে ব্রহ্মাণী ও খণ্ডেশ্বরীর মিলিত স্রোতের সঙ্গে মিশে নাদনঘাটের কাছে বাঁকার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পরে এই মিলিত স্রোত দক্ষিণ-পূর্বগামী হয়ে কালনা থানার নন্দাই গ্রামের কাছে ভাগীরথীতে পড়েছে। উৎসস্থল থেকে ভাগীরথীতে সঙ্গমস্থল পর্যন্ত নদীর দৈর্ঘ্য ১৪০ কিমি। প্রচলিত ধারণা অনুসারে মাড়োর কাছে নদীর উৎসস্থল বলে চিহ্নিত হলেও দামোদর থেকে বর্তমান উৎস পর্যন্ত অববাহিকা অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় একসময় দামোদর খালের সঙ্গে খড়ির যোগাযোগ ছিল। পরে দামোদর থেকে বর্তমান উৎসস্থল মজে যাওয়ায় নদীর প্রাচীন পর্বের এই অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রেনেলের মানচিত্রে খড়ির (currie) যে উৎসস্থল দেখানো হয়েছে সেটাও বর্তমান উৎসস্থল থেকে কিছুটা পশ্চিমে। একাধিক কাঁদড় ও ক্যানেলের মাঠভাসা জল খালের মাধ্যমে এই নদীতে পড়ায় নদীর নিম্নগতিতে বারোমাস জল থাকে। তবে মানকর ও আউসগ্রাম থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় ল্যাটেরাইট অঞ্চলের কাঁকর মিশ্রিত বড় দানার বালি বর্ষার জলে বাহিত হওয়ায় উচ্চগতি ও মধ্যগতিতে নদীখাত মজে আসছে, ফলে এই অংশে গ্রীষ্মকালে ক্ষীণ জলস্রোত প্রবাহিত হয়ে নদীর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। বর্ষাকালে অবশ্য জিয়ারা, পারহাট, কর্জনা, মন্তেশ্বর, নাদনঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে নদী পারাপারের জন্য দুটি তালগাছের গোড়ার দিকটা খুঁদে জোড়া দিয়ে ডিঙির সাহায্যে পারাপার করতে হয়। খড়ি নদীর মোটা বালি প্লাস্টার ও ছাদ ঢালাই-এর কাজে বিশেষ উপযোগী বলে সদর থানার মাহিনগর, ভাতার থানার কর্জনা প্রভৃতি স্থান থেকে এবং নদীগর্ভ থেকে বালি তুলে শহরাঞ্চলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়। বর্ষায় নদীতে পূর্বে প্রচুর পরিমাণে গলদা চিংড়ি উঠতো—এমনকি বঁড়শিতে জোঁকের টোপ গেঁথে ছিপের সাহায্যেও বড় বড় চ্যাংড়া মাছ তোলা হত। কয়েক বৎসর যাবৎ এ সব মাছ অমিল হয়ে গেছে। অজয়ের তীরে যেমন পাণ্ডুরাজার ঢিবি খননকার্যের ফলে তাম্রাশ্মীয় যুগের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনি খড়ি নদীর তীরে ভাতার থানার বড়বেলুন গ্রামের বানেশ্বরডাঙা ও আমারুন স্টেশনের

কাছে আড়াগ্রামের সাঁওতালডাঙায় খননকার্যের ফলে তাম্রাশ্মীয় যুগের প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে বর্ধমান জেলার প্রাচীন ইতিহাসের জনগোষ্ঠীর নদীকেন্দ্রিক সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। খড়ি নদীর তীরে মানকর, ভাদা, জগদাবাদ, পারহাট, কর্জনা, কুড়মুন, কুসুমগ্রাম, মন্তেশ্বর, দেনুড়, নাদনঘাট প্রভৃতি গ্রাম অবস্থিত। এইসব অনেক গ্রামে বর্তমানে River Pump এর সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা করে বোরো ধান, গম তরিতরিকারী ফলানোর চেষ্টা চলছে।

বাঁকা বা বঙ্কেশ্বরী : গলসী থানার ৬৩ নং রামগোপালপুর মৌজার উত্তরে ধানক্ষেতের জলধারাপুষ্ট এক খাতই বাঁকার উৎসস্থল। পূর্বে দামোদরের মূল প্রবাহ উত্তর-পূর্বমুখী খাত পরিত্যাগ করার ফলেই মনে হয় বাঁকার সৃষ্টি হয়েছিল; পরে খড়ির ক্ষেত্রে যেমন এক্ষেত্রেও তেমনি সে খাল মজে যায়। আঁকাবাঁকা গতির জন্যই নদীর নাম বাঁকা বা বঙ্কেশ্বরী। উৎসস্থল থেকে বের হয়ে দামোদরের সমান্তরালভাবে বর্ধমানের কাঞ্চননগরের কাছে জুজুটিতে একটা কাঁদড়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে ২নং জাতীয় সড়ক ও বর্ধমান স্টেশনের কাছে ইষ্টার্ন রেল অতিক্রম করে কন্টিয়া, বৈকুণ্ঠপুর, ভৈটা, গাঙ্গপুর, শক্তিগড়, পালসিট হয়ে চাঁদা নদীর সঙ্গে মিশে মেমারী, মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী অতিক্রম করে কালনার জালুইডাঙ্গার কাছে খড়ি নদীর সঙ্গে মিশেছে ও মিলিত স্রোত কালনার নন্দাই গ্রামে (জে.এল.৪৩) ভাগীরথীতে পড়েছে। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ভ্যান ডেন ব্রোকের মানচিত্র ও ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের রেনেলের মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় বাঁকার উৎসস্থল ও প্রবাহপথ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছিল। ভ্যান ডেন ব্রোকের অংশে ঐ ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আবার রেনেলের মানচিত্র অনুসারে বর্তমান চাঁদা নদীর খাতই ছিল বাঁকার খাত। পূর্বে দামোদরের পূর্বমুখী খাতের কিছুটা বাঁকার খাত দিয়ে প্রবল জলধারা প্রবাহিত হত। বর্ষাকালে এর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি পলিমিশ্রিত জলধারা দ্বারা প্লাবিত হত। বাঁকার তীরবর্তী গ্রামগুলির উর্বর পলি গঠিত মৃত্তিকাই এর প্রমাণ। বাঁকার খাতটিকে সংস্কার করে বর্ধমানের কাছে জুজুটির স্লুইস গেট—যেখান থেকে ইডেন ক্যানেলে জল সরবরাহ করা হয়, সেখান থেকে এই নদী দিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করলে রিভার পাম্পের সাহায্যে নদীতীরবর্তী ও পার্শ্ববর্তী জমিতে জলসেচ করে প্রচুর রবিখন্দের ফসল ও সব্জী ফলানো যায়। নব্বই-এর দশকেই বর্ধমান-এর কিছুটা অংশে বাঁকার খাত থেকে মাটি কাটা হয়েছিল। এই প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখলে নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলিতে কৃষি উৎপাদনের বিরাট সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে।

কানানদী ও কানা দামোদর : দামোদরের বিধ্বংসী বন্যায় নদীর দুপাশে অসংখ্য হানা ও খালের সৃষ্টি হয়। নদীও প্রবাহ্-পথ পরিবর্তন করতে থাকে। ফলে দামোদরের অববাহিকা অঞ্চলে কানা নদী ও কানা দামোদরের মত কমপক্ষে ৭ টি কানা, মজা বা বোজা খালের সৃষ্টি হয়েছে।

কানা দামোদর ও কানা নদী জামালপুরের উত্তরে বামতীরের বাঁধের একটা স্লুইস গেট থেকে বের হয়ে বর্ধমান ও হুগলী জেলার সীমান্ত বরাবর ৫ মাইল পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে কানা নদী ৮৫নং মহেশগাড়িয়া মৌজায় হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে, আব কানা দামোদর আরও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে মাধবপুরে হুগলীতে প্রবেশ করেছে। উভয় খালই ইডেন ক্যানেলের জলে পুষ্ট।

কানা দামোদব এরপর হুগলীর বানীবনের কাছে বাসুদেবপুর, বাজপুরের নালার সঙ্গে মিশে মিলিত স্রোত উলুবেড়িয়ার কাছে ভাগীরথীতে পড়েছে।

মুণ্ডেশ্বরী : মুণ্ডেশ্বরী খাল রায়নার ২নং ব্লকের মাধবডিহি থানার শ্রীরামপুর মৌজার (জে. এল. ৬৫) উত্তরে একটি পুষ্করিণী থেকে বের হয়ে দক্ষিণে কাইতি চকভুরা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে। মুণ্ডেশ্বরী খাল আধুনিক কালের বলেই মনে হয়। প্রবাদ—কাইতির এক জমিদার তনয়া মুণ্ডেশ্বরীর স্মৃতি বহন করছে। রেনেলের মানচিত্রে বা ১৯১০ সালের বর্ধমান ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এর উল্লেখ নাই। ১৯৯৪-এর বর্ধমান ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে কাকী ও মুণ্ডেশ্বরী খালের উৎস রায়না থানায় বলে উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। আরও দেখা যায় যে কাকী খাল কেশবপুরের কাছে কানা খাল ও কাকী খাল এইভাগে ভাগ হয়ে যায় ও পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট কাঁদড় বা খালের জলে পুষ্ট হয়। তবে বছরের সব সময় জল থাকে না। বর্ষাকালে কাকী খাল ও মুণ্ডেশ্বরী খাল দিয়ে বন্যার আকারে জলধারা প্রবাহিত হতে থাকে।

১৩২০ সালের দামোদরের বিধ্বংসী বন্যায় জামালপুর থানার ৭২নং শিয়ালী মৌজায় দামোদর দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় ও মূল-খাত মুণ্ডেশ্বরী খালের সঙ্গে মিলিত হয়ে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত রূপনারায়ণে মিশেছে।

দ্বারকেশ্বর : মূলত বাঁকুড়া জেলার নদী। পুরুলিয়ার তিলবনী পাহাড় থেকে বের হয়ে ছাতনার পাশ দিয়ে বাঁকুড়ায় প্রবেশ করেছে। বর্ধমান জেলায় মাধবডিহি থানার একলকী (জে. এল. ১৩৫), নরোত্তমবাটি (১৩৬) ও বাবলা (১৩৭) মৌজার দক্ষিণে বর্ধমান ও হুগলী জেলার সীমান্তে প্রবাহিত। বর্ধমান অংশে এর দৈর্ঘ্য ১০ কিমি এরও কম। খণ্ডঘোষ থানার রাউতরা মৌজার (জে. এল. ১১০)

দক্ষিণে বর্ধমানে প্রবেশ করেছে। মাধবডিহি থানার মনিয়ারী গ্রামের (৮৭.৪৬ পূর্ব দ্রাঘিমা ও ২২'৫৭.৩০" উত্তর অক্ষাংশে) দক্ষিণে জেলা অতিক্রম করেছে। এই নদীর বর্ধমান অংশে এর বামতীরে ২টি খাল—একটি উচালন থেকে আর দ্বিতীয়টি একলকী থেকে প্রবাহিত হয়ে দ্বারকেশ্বর নদীতে মিশেছে। বর্ষাকালে এই দুইটি খালের জলধারা দ্বারকেশ্বরকে পুষ্ট করে।

সিঙ্গারন : জামুরিয়া থানার অণ্ডাল-সাঁইথিয়া লুপ লাইনের ইক্‌রা জংশনের ৩ কিমি উত্তরে এর উৎসস্থল। এখান থেকে বের হয়ে দক্ষিণাভিমুখী প্রবাহিত হয়ে রানীগঞ্জের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে সিঙ্গারন, তপসী, অণ্ডাল অতিক্রম করে ওয়ারিয়ার কাছে দামোদরে মিশেছে। মোট দৈর্ঘ্য ৩৫ কিমি। প্রবাদ—এই নদীর অববাহিকা অঞ্চল এক সময় ঘন জঙ্গলে আবৃত ছিল ও সেই জঙ্গলে সিংহের রাজত্ব ছিল। এই সিংহ থেকেই নদীর নাম সিংহরন/সিঙ্গারন। আবার কারও কারও মতে মহাবংশে উল্লিখিত রাঢ়রাজ সিংহবাহুর রাজধানী ছিল সিঙ্গারন। তাই সিঙ্গারন গ্রামের নামেই নদীর নাম। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে ছোট ছোট নালা দিয়ে বর্ষাকালে জলস্রোত এই নদীতে পড়ে নদীকে পুষ্ট করে।

বেহুলা : বর্ধমান ও নবাবহাটের মাঝখানে জি. টি. রোডের ধারে শুষ্কখাত বর্তমান। অনেকের মতে এই খাতেই বেহুলা প্রবাহিত ছিল। বেহুলা নদীর ২টি খাত। দুটি খাতের উৎসস্থল ভিন্ন—কিন্তু দুটি খাতই কালনার কাছে ভাগীরথীতে পড়েছে। ১নং খাতটি খড়ি ও বাঁকার মিলিত স্রোতের কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বে উভয় নদীর মিলিত স্রোতের শাখানদীরূপে বহির্গত হয়ে কালনার দক্ষিণে বল্লুকার সঙ্গে মিলিত হয়ে ভাগীরথীর জলা বাঁকিপুরের বিলে পড়েছে। প্রথমে ভাগীরথীতেই পড়েছিল পরে ভাগীরথীর গতি পরিবর্তন করায় ভাগীরথী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ও পূর্বের সঙ্গমস্থলের কাছে বাঁকিপুরের বিলের সৃষ্টি হয়েছে।

বেহুলার ২নং খাতটি বর্ধমান ও শক্তিগড়ের মাঝামাঝি কোন স্থান থেকে দামোদরের শাখারূপে বের হয়েছিল। পরে ইডেন ক্যানেল খনন করায় ও দামোদরের উত্তরে বাঁধ নির্মাণের ফলে বেহুলা দামোদর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বর্ধমান থানার কাঁদরসোনা (জে. এল. ৮৬) মৌজার মধ্যে বেহুলা নামে একটা কাঁদড়ের অস্তিত্ব এখনও বর্তমান। স্থানীয় প্রবাদ—মনসামঙ্গলের বেহুলা মৃত স্বামীর ভেলা নিয়ে এই নদী পথে গিয়েছিলেন ও এখানে তাঁর কানের সোনা হারিয়ে যায়। তাই গ্রামের নাম কানের সোনা / কাঁদরসোনা। বর্তমানে রসুলপুর স্টেশনের এক কিমি উত্তরে গোপালপুরের কাছে এর উৎসের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। এখান থেকে বের হয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে চাঁচাই পর্যন্ত গেছে, তারপর

পূর্বমুখী হয়ে মেমারী, নবগ্রাম, বৈদ্যপুর, রামনগর, আটকোটিয়া হয়ে নারিকেল-ডাঙ্গায় তিন ভাগে ভাগ হয়ে তেমোহানীর সৃষ্টি করেছে। ডঃ অশোক মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত "পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা" গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে দেখা যায় মুসলমান আক্রমণের সময় কিংবা কালাপাহাড়ের ভয়ে নারিকেলডাঙ্গার জগৎগৌরীকে এই বেহুলার জলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। বর্তমান মন্দিরের পিছনে বেহুলার মূল পূর্বমুখী খাত ও দক্ষিণমুখী শাখা খাতের সংযোগস্থলে বাঁকের মুখে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হত। সেইখানেই জেলের জালে দেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। মনে হয় এখান থেকেই তে'মোহানীর সৃষ্টি। এরপর নদী পূর্বমুখী হয়ে কালনা থানার ভুরকুণ্ডার (জে. এল. ১১৯) কাছে ইডেন ক্যানেল থেকে বহির্গত গাঙ্গুরের সঙ্গে মিশেছে। মিলিত স্রোত ত্রিবেণীর ৪ কিমি উত্তরে ভাগীরথীতে পড়েছে। তবে বর্ষায় নদীতে জলপ্রবাহ প্রবল হলেও অন্য সময় গতিপথ বুজে যাওয়ার জন্য রুদ্ধ হয়েছে, কোথাও বিলের আকার ধারণ করেছে আবার অন্যত্র প্রবাহপথ স্পষ্ট।

কুনুর : অজয় নদীর দক্ষিণে প্রবাহিত অজয়ের প্রধান উপনদী উখরার উত্তর-পূর্বে ইছাপুরের পশ্চিমে ফরিদপুর-দুর্গাপুর থানার ৩৮নং বাঁশগড়া মৌজার ১২০ মি. উচ্চভূমি হতে উৎপন্ন হয়ে উত্তর-পূর্ব বাহিনী হয়ে অন্ডাল, ফরিদপুর, আউসগ্রাম ও মঙ্গলকোট থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নতুনহাটের কাছে অজয়ের সঙ্গে মিশেছে; মোট দৈর্ঘ্য ১১২ কিমি ও ধারণ-অববাহিকা অঞ্চল (Catchment area) ৭৭২ কিমি। কুনুরের দক্ষিণ দিক থেকে ১১টি ও উত্তরদিক দিয়ে ৪টি ছোট নদী বা কাঁদড় এসে কুনুরে মিশেছে। অবশ্য এইসব কাঁদড়-উপনদী বর্ষাতে ফুলে ওঠে; অন্য সময় স্থানে স্থানে শুকিয়ে যায়; আবার কোথাও থাকে পায়ের চেটোভেজা জল। বর্ষাকালে এইসব উপনদীর জলে পুষ্ট হয়ে ধনকোড়া, ছোরা গুসকরার কাছে কুনুর বন্যাপ্রবণ হয়েছে। বন্যার জলে আউসগ্রাম ও মঙ্গলকোট থানার বিরাট অঞ্চল প্লাবিত হয়। উজানী কোগ্রামের কাছে অজয়-কুনুরের সঙ্গমস্থলেই মঙ্গলকাব্য-খ্যাত ভ্রমরার দহ। মনে হয় মঙ্গলচণ্ডী নাম থেকেই হ্রদাকৃতি ভ্রমরার দহের নামকরণ করেছিলেন কবিকঙ্কণ। কারণ মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে—তদাহং ভ্রামরং রূপং, কৃত্বা সঙ্খ্যেয়ংষটপদম্।

ব্রহ্মাণী : মঙ্গলকোট থানার কালি পাহাড়ী মঞ্জুলার ৮০ ফুট উচ্চে অবস্থিত এক জলাশয় থেকে বের হয়ে ব্রহ্মাণী উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত। এরপর কৈচরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়ে পঞ্চাননতলার কাছে শ্যামবাটী ক্ষেত থেকে উৎপন্ন খণ্ডেশ্বরী নামে এক খালের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ব্রহ্মাণীর আর একটি খাত শ্রীখণ্ডের উত্তর-পশ্চিম থেকে বের হয়ে কাটোয়া থানার নন্দীগ্রামের কাছে প্রধান শাখার

সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত স্রোত পূর্বদিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আবার দু' ভাগে বিভক্ত হয়েছে। পূর্বদিকের শাখা কাটোয়া ও পূর্বস্থলী সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত হয়ে পূর্বস্থলী থানার ৫১ নং হলদিপাড়া মৌজায় খড়িতে পড়েছে। অপর শাখাটি কাটোয়া মন্তেশ্বর থানার সঙ্গমস্থলে শিলাগ্রামে খড়িতে মিশেছে।

ঘিয়া : জামালপুর থানার ২৫ নং ফইমপুর থেকে একটি খাত আর ১১৬ নং ইলসরা থেকে আর একটি খাত—দুটি ছোট নদী বের হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে হুগলী জেলায় মিলিত হয়েছে; এই মিলিত স্রোতই ঘিয়া নদী নামে পরিচিত। নদীতে প্রায় বারমাসই জল থাকে। এই জেলায় এর প্রবাহপথ ১৬ কিমি। জামালপুর থানার ইলসরা থেকে বহির্গত খাল ও রায়না থানা থেকে বহির্গত রত্নালু খাল বাহিত জলপ্রবাহে এই নদী পুষ্ট।

কাকী নদী : শুঁড়ে কালনার বিপরীতে রায়না থানায় দামোদরের বন্যায় একাধিক হানার সৃষ্টি হয়েছে। এই সব হানার মধ্যে মুচী হানা আর বেগো হানা প্রসারিত হতে হতে একত্র মিলিত হয়েছে ও কাকী নদী নামে কোটশিমুলের কাছে হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে। হুগলী জেলায় প্রবেশ করে মুণ্ডেশ্বরীর প্রধান স্রোতধারার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। হানা দিয়ে বন্যার সময় প্রচুর বালি এসে মাঝে মাঝে বালুচর ও দহের সৃষ্টি করেছে।

তুমুনী : জামুরিয়া থানা হরিপুরের কাছে চিচুরিয়া (৮৭'.১২" পূর্ব ও ২৩'.৪১" উত্তর অক্ষাংশ) গ্রামের কাছ থেকে বের হয়ে অজয়ের দক্ষিণে অজয়ের সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে শ্যামরূপাগড়ের কাছে অজয়ে পড়েছে। ইটখালা নালা এর প্রধান উপনদী। ছোট্ট নদী—বর্ষা ছাড়া বৎসরের অধিকাংশ সময় শুষ্ক থাকে। নিম্নাংশে বর্ষায় বন্যা দেখা দেয়।

কুকুয়া : এটিকে নদী বললে নদী নামের অপমান হবে। খাল বলাই যুক্তিযুক্ত। বুদবুদ থেকে বের হয়ে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে ইডেন ক্যানেলকে অতিক্রম করে গলসী থানার ১২৪ নং ওমরপুর মৌজায় দামোদরের সঙ্গে মিশেছে। মোট দৈর্ঘ্য ২০ কিমি।

তমলা : এটিও একটি মহানালা। অন্ডাল থানার উখরা গ্রামের দক্ষিণে ছোড়া থেকে উৎপন্ন হয়ে সিঙ্গারন নদীর সমান্তরালে দক্ষিণে-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে ২নং জাতীয় সড়ক অতিক্রম করে দুর্গাপুর থানার বীরভানুপুরে দামোদরে মিশেছে। মোট দৈর্ঘ্য ২৫ কিমি।

দ্বারকা বা বাবলা : এটি প্রধানত বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের নদী। বর্ধমান জেলায় এর প্রবাহপথ তিন কিমি। মুর্শিদাবাদ জেলার নতুন গ্রামের কাছে বর্ধমান

জেলায় প্রবেশ করে কাটোয়া থানার ১০০নং বিষ্ণুপুরের কাছে ভাগীরথীতে পড়েছে।

গৌড় : গলসী থানার ১৫১ নং চন্দনপুরে এর উৎসস্থল। রেনেলের মানচিত্র ও ১৮৫৪–৫৫ খ্রীষ্টাব্দের রেভিনিউ সার্ভের মানচিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রামগোপালপুরই ছিল এর উৎসস্থল ও বর্ধমান থানার বেলকশের কাছে বাঁকার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে বাঁকার সঙ্গে গৌড়ের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উৎসস্থল থেকে বের হয়ে বীরপুর, তালিত, মালকিতা, কলিগ্রাম পার হয়ে তুব্‌গ্রামের পূর্বে খড়িতে মিশেছে। বর্ষা ছাড়া অন্য সময় বিশেষ জল থাকে না। মূলত মাঠের জলেই পুষ্ট।

বল্লুকা : বল্লুকার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের যোগ নিবিড়। এটি একটি অতি প্রাচীন নদী। মানিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম চক্রবর্তী, ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গলে বল্লুকার উল্লেখ আছে। "শীলারূপে রহে বিষ্ণু বল্লুকার তীরে" (ময়ূরভট্ট)। আচার্য সুকুমার সেনের মতে ধর্মপূজার ঐতিহ্যমণ্ডিত বল্লুকা নদী দামোদরের একটি প্রাচীন খাত। এই প্রাচীন খাতের উপরেই হাজার বছর আগেকার বর্ধমান শহর ছিল। ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন অনুসরণ করে সে বর্ধমান শহর এখন বড়োয়াঁ গ্রামে পরিণত। এইখানে প্রাচীন বল্লুকা নদীর তীরে ধর্মঠাকুরের বিখ্যাত মন্দির ছিল।

প্রাচীনকালের ভ্যান ডেক ব্রোক ও রেনেলের ম্যাপ পর্যালোচনা করলে সাহিত্যাচার্যের মতের সমর্থন মেলে। প্রাচীনকালে দামোদরের উত্তর-পূর্বমুখী খাত বাঁকা, গাঙ্গুর ও বল্লুকার গতিপথ ধরে ভাগীরথীতে মিলিত হত। পরে দামোদরের প্রবাহপথ পরিবর্তিত হয় ও বাঁকা থেকে বল্লুকাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। বর্তমানে নদীর খাত প্রায় শুষ্ক, কোথাও কোথাও মজে গিয়ে জমিতেও পরিণত।

বর্তমানে সার্ভে মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে মেমারীর কাছে গাঙ্গুর নদী থেকে বল্লুকা বের হয়ে কামালপুর, শ্রীরামপুরের পাশ দিয়ে কালনা থানার ৯৪নং রাঙ্গাপাড়া গ্রামের দক্ষিণে ১নং বেহুলা খাতের সঙ্গে মিলেছে ও মিলিত স্রোত ত্রিবেণীর ৪ কিমি উত্তরে ভাগীরথীতে পড়েছে।

এই সব নদী ছাড়া বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন থানায় বিভিন্ন কাঁদড় ও খাল মাঠের উদ্বৃত্ত জলধারা থেকে উৎপন্ন হয়ে খড়ি, অজয়, দামোদর প্রভৃতি নদীতে পড়েছে। এইসব খালের মধ্যে আউসগ্রাম থানার ৯০নং সুয়াতা মৌজা থেকে পঞ্চগঙ্গা নামে একটা খাল বের হয়ে কুনুরে মিশেছে। রায়না থানার রত্নালু খাল যশপুর থেকে বের হয়ে কোটশিমুলের পাশ দিয়ে গিয়ে ঘিয়া নদীর সঙ্গে মিশেছে, কাঁটাখাল ঐ খানার পলাশন থেকে বের হয়ে বড় বৈনানের কাছে মুণ্ডেশ্বরীতে

পড়েছে। ভাতার থানার ১৬নং বিঘড়া মৌজার পূর্বদিক থেকে একটা কাঁদড় বের হয়ে নারানপুর, খুরুল, পিলখুড়ি পার হয়ে পারহাটের কাছে খড়িতে মিশেছে। ডুবি খাল মন্তেশ্বর থানার পিপলুন থেকে বের হয়ে মোড়লডাঙ্গার কাছে খড়িতে মিশেছে। ইলসরা খাল জামালপুর থানার ইলসরা থেকে বের হয়ে হুগলী জেলায় ঘিয়া নদীর সঙ্গে মিশেছে। কেতুগ্রাম থানার গঙ্গাটিকুরী মৌজার উত্তরে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও কেতুগ্রাম থানার হোসেনপুর থেকে বহির্গত ছয়টি কাঁদড় মিলিত হয়ে মিলিত স্রোত কেতুগ্রাম থানার ১২২নং শাখাই গ্রামের কাছে অজয়ে পড়েছে। এই সমস্ত খালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দামোদর নদের দেবখাল।

দেবখাল : এই খালের উৎপত্তি খণ্ডঘোষ থানার ৯নং কুমিরকোলা মৌজার একটু পশ্চিমে দামোদর থেকেই। গ্রামের প্রবীণদের একাংশের বক্তব্য এই খালটি স্থানীয় শালী নদীর অংশবিশেষ। বন্যার ভাঙনে শালী অনেক আগেই দামোদরের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। বাংলা ১৩২০ সালের দামোদরের বিধ্বংসী বন্যায় অধুনালুপ্ত শালী নদীর নীচের অংশে যে হানার সৃষ্টি হয় সেটিই দেবখাল নামে পরিচিত। ব্রিটিশ আমলে এই খালের ওপর এই গ্রামে একটা বাঁধ দেওয়া হয়—সেই বাঁধ তত্ত্বাবধানের জন্য এক কর্মচারী নিযুক্ত ছিল—সে-ই এই খালটির দেখাশোনা করতো। এর জন্যে তাকে মাঝে মাঝে কুমিরকোলা থেকে জামালপুর থানার ৭নং সাদিপুর পর্যন্ত যেতে হত। কারণ এই খাল কুমিরকোলায় দামোদর থেকে বের হয়ে পান্নার বিলের দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বর্ধমান-বাঁকুড়া রোডকে নিশ্চিন্তপুরের কাছে দুবার অতিক্রম করে জামালপুরের পাশ দিয়ে গিয়ে ৭নং সাদিপুরের পশ্চিমে আবার দামোদরেই মিশেছে। পান্নার বিল ও নিশ্চিন্তিপুরের মাঝামাঝি জায়গায় খণ্ডঘোষের বড়বিল থেকে একটা খাল এসে দেবখালের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দামোদরের গতির একই দিকে এই খাল বয়ে চলেছে। তবে এই খালে বৎসরের সব সময় জল থাকে না—বর্ষাকালেই ফুলে ফেঁপে উঠে প্রবল আকার ধারণ করে।

গর্জন খাল : এই খালটি কালনা থানার ৪২নং খাঁপুর গ্রামে খড়ি ও বাঁকার সঙ্গমস্থল থেকে বের হয়ে নতুন গ্রাম, ধাত্রীগ্রাম অতিক্রম করে বল্লুকা খাতে মিশেছে। এই খালের দক্ষিণ অংশ স্থানীয় লোকের কাছে বেহুলা নামে পরিচিত।

কামালের খাল : ক্ষীর গাঁয়ের দক্ষিণে 'ধামাচে দীঘি' থেকে এই খাল বের হয়ে পুইনী, সরগ্রাম পার হয়ে চন্দ্রপুরে (মঙ্গলকোট থানা) খড়ির সঙ্গে মিশেছে। মধ্যে অবশ্য সেনেডা-সরগ্রাম কাঁদড় ও মাধপুর কাদড় কামাল খালে পড়ে খড়ির জলপ্রবাহ বৃদ্ধি করেছে।

ছয় অধ্যায়



অরণ্যসম্পদ

যে সমস্ত গাছ নিজে থেকে মাটি ভেদ করে জন্মলাভ করে বেড়ে ওঠে, তাকেই বলে স্বাভাবিক উদ্ভিদ। স্বাভাবিক উদ্ভিদ দেশের তথা এ জেলার এক বিশেষ সম্পদ। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা অরণ্যসম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করে। W. W. Hunter এর Annals of Rural Bengal থেকে জানা যায় অজয় ও দামোদরের অববাহিকা অঞ্চল এক সময় গভীর অরণ্যে পূর্ণ ছিল। সেই অরণ্যে সিংহ, বন্যহস্তী, বন্যশূকর, চিতা অবাধে বিচরণ করতো। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও যেমন বাড়ছে তেমনি শিল্পায়নের দ্রুত প্রসার ঘটাতে হচ্ছে। ফলে বনভূমি কেটে জনবসতি ও শিল্পনগরী স্থাপন করতে হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটছে, দ্রুত ভূমিক্ষয় হচ্ছে। এর জন্য স্বাভাবিক উদ্ভিদের উপর নির্ভর করা সম্ভব হচ্ছে না। সরকারকে বর্তমান বনভূমির সংরক্ষণ ও নতুন বনভূমি সৃষ্টির জন্য উদ্যোগী হতে হচ্ছে।

জেলার বনাঞ্চলকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) সাঁওতাল পরগনা থেকে আসানসোল মহকুমার পশ্চিমপ্রান্ত নিয়ে গঠিত আসানসোল বনাঞ্চল, (২) দুর্গাপুর মহকুমার দুর্গাপুর থেকে অজয়ের উত্তর তীর পর্যন্ত দুর্গাপুর বনাঞ্চল, (৩) বর্ধমান মহকুমার আউসগ্রাম থানা ও ভাতার থানার ওড়গ্রাম বনাঞ্চল। এছাড়া বর্ধমান শহরে কৃষ্ণসায়রের ও গোলাপবাগের বিপরীতে রমনা-বাগান। তবে রমনাকে বন না বলে উদ্যান বলাই যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনোত্তর পর্বে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন এবং পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপায়ণের ফলে যত্রতত্র জনবসতি গড়ে উঠেছে ও বনভূমির নির্বাসন ঘটছে। ফলে বিরল প্রজাতির অনেক বৃক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে আসছে। চিরহরিৎ তলোয়ারাকৃতির Yacca প্রজাতির লতানে গাছ আজ নিশ্চিহ্ন। এই গাছের দৃষ্টিনন্দন বড় বড় পদ্মের মত সাদা সাদা ফুল আর অরণ্য প্রেমিকদের

মনকে উদাস করবে না। আদিবাসী সম্প্রদায় তো জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য ও অর্থোপার্জনের জন্য বৃক্ষছেদনকে নিজেদের মৌলিক অধিকার করে নিয়েছে।

আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অসংখ্য কয়লাখনির অস্তিত্ব প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ অঞ্চলে বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গণ্ডোয়ানাল্যান্ডের অবশিষ্টাংশে অবস্থিত এই দুই মহকুমার লৌহযুক্ত ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা ও জলবায়ু এই বনভূমি গড়ে ওঠার প্রধান কারণ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রায় ৩২ কোটি বৎসর পূর্বে কার্বোনিফেরাস পিরিয়ডে ভূগর্ভে আলোড়নের ফলে কিংবা ভূমিকম্পের ফলে এই অঞ্চলের বিশাল অরণ্যভূমি ভূগর্ভে অবদমিত হয় ও যুগ-যুগান্ত ধরে ভূগর্ভস্থচাপ ও তাপের প্রভাবে শাল, পিয়াশালের জঙ্গল কয়লায় পরিণত হয়।

ময়ূরভঞ্জের ফরেষ্ট রেঞ্জ থেকে বাঁকুড়ার রানীবাঁধ হয়ে আউসগ্রাম থানার জঙ্গলমহল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে সাধারণত আর্দ্রক্রান্তীয় পর্ণমোচী জাতীয় বৃক্ষ যথা—শাল, সেগুন, শিরীষ, শিশু, মেহগিনি, বাবলা, পলাশ, খদির, শিমুল, মহুয়া বৃক্ষের সমারোহ। তবে এ অঞ্চলে কয়লাখনির সন্ধান পাওয়ার আগে পর্যন্ত যে নিবিড় অরণ্যভূমি ছিল, কয়লাখনি আবিষ্কারের পর খনি খননের জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৃক্ষছেদন করতে হয়। তারপর স্বাধীনোত্তর ভারতে দুর্গাপুর শিল্পপ্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) একর বনভূমির নির্বাসন ঘটে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ফলে অনেক বনভূমি কাটা যায়। দামোদর পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে সেচব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় ও নিবিড় কৃষিপ্রকল্পের বিস্তারের ফলে আউসগ্রামের জঙ্গলমহলের অনেকটা অংশেই বনভূমিকে কৃষিজমিতে পরিণত করা হয়েছে। এর জন্যে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্প গ্রহণ করে বনভূমির সম্প্রসারণ ও পরিবেশ রক্ষার দিকে নজর দিতে হয়েছে। জেলার পূর্ব ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে দামোদর অজয় ভাগীরথীর পলিগঠিত এলাকায় কামরাঙ্গা, বট, অশ্বত্থ, আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, বেল, নারিকেল প্রভৃতি জাতীয় গাছের সংখ্যাই বেশী। নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বালুকামিশ্রিত পাললিক ভূমিতে শিমুল, শিশু, কাজু, নারিকেল, জবা বাঁশ, মুটি বাঁশ, বেউল বাঁশ, Lendrocalamus Strictus জাতীয় ঘাস, ভূমিক্ষয় যেখানে বেশী সেখানে সাবাই ঘাস লাগান হচ্ছে।

অন্যান্য মৃত্তিকায় শাল, পিয়াশাল, মহুয়া, Ailanthus হরিতকী, বহেরা, আমলকী, টিক; বাঁধ এলাকায় সোনাজহুরী, মিনজরী, আম, কাজু, ছায়াদানকারী বৃক্ষ, বাবলা, ইউক্যালিপটাস, সংকর জাতীয় ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি গাছের চারা বিতরণ করে কিংবা নামমাত্র দামে বিক্রয় করে সরকারী বনবিভাগ থেকে সামাজিক বনসৃজনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

সরকারী তথ্য থেকে জানা যায় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে জেলার বনভূমির পরিমাণ ছিল ১২৬.৬০ বর্গমাইল। এর অধিকাংশ অরণ্য ছিল জমিদারদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, কিছু পরিমাণ ছিল সরকারী বনবিভাগ ও জমিদারদের যৌথ মালিকানাধীন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই বনভূমির আয়তন ছিল ২২৭ বর্গমাইল আর ১৯৬৪ সালে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬২ বর্গমাইল, এর মধ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছিল ১৯৭ বর্গ কিমি।

১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। বর্ধমান জেলার একাজে সাহায্যের জন্য ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই 'দুর্গাপুর সমাজভিত্তিক বনসৃজন বিভাগ' সৃষ্টি হয়। বর্ধমানে রমনার বাগানের সরকারী বনবিভাগ ও দুর্গাপুরের 'সমাজভিত্তিক বনসৃজন বিভাগ' যৌথ ভাবে বনসৃজন প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণে হাত মিলিয়েছে। বর্ধমান বনবিভাগ বিশেষভাবে বনভূমি এলাকায় নিয়োজিত আর দুর্গাপুর সমাজভিত্তিক বনসৃজন বিভাগ বনভূমির বাইরে অধিগৃহীত (Vested) জমিতে, পথিপার্শ্বে ক্যানেলের বাঁধ বরাবর, নদীপাড়, রেললাইনের ধার ও ব্যক্তিগত অব্যবহৃত জমিতে বনভূমির সম্প্রসারণ ও পরিবেশ রক্ষায় নিয়োজিত। বনসৃজন প্রকল্পে হাত দেওয়ার আগে যেখানে জেলার ভৌগোলিক আয়তন ৭০২৪ বর্গকিমি, তার তুলনায় বনভূমি ছিল ৩.৪৫ শতাংশ বা ২৪৩ বর্গকিমি, বনসৃজন প্রকল্প গ্রহণ করার পর ১৯৯৪-৯৫ সালে বনভূমির সেই আয়তন বেড়ে দাঁড়ায় ৭.৯৪ শতাংশ অর্থাৎ ৫৫৭.৭০ বর্গকিমি।

সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য সবুজায়ন ও পরিবেশ সুরক্ষিত করা। তাছাড়া জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জ্বালানি, পশুখাদ্য, ঢালাই-এর খুঁটি, আসবাবপত্রের কাঠ সরবরাহও এই প্রকল্পের গৌণ উদ্দেশ্য। বিগত কয়েক বছরে সরকার থেকে সাধারণের তত্ত্বাবধানে ৩৫০০ হেক্টর জমিতে বনসৃজন করা হয়েছে। রাস্তার ধারে, রেল লাইনের পাশে, ক্যানেল-এর বাঁধ বরাবর ও অধিগৃহীত জমিতে সাধারণত ইউক্যালিপটাস বা চিকবল্লীপুর মহীশূরের সংকর জাতীয় ইউক্যালিপটাস, কৃষ্ণচূড়া, বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষের চারা রোপণ করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কারণ এই সমস্ত গাছ ক্রান্তীয় ও শুষ্কডাঙ্গা জায়গায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এ জাতীয় গাছ থেকে রেয়ন সুতা ও সিনথেটিক জাতীয় সুতা অল্প খরচে পাওয়া যায়। কিন্তু এদেশের পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের মতে এই জাতীয় বৃক্ষ মাটির উর্বরতা শক্তি কমিয়ে দেয়, তাছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংরক্ষণের পক্ষেও ক্ষতিকর। উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদদের এর বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা দরকার। কারণ পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা সত্য হলে সুদূরপ্রসারী ক্ষতির সম্ভাবনা আশুলাভের আশার চেয়ে জেলার অর্থনীতির পক্ষে মারাত্মক হতে পারে।

সাত অধ্যায়



বন্যপ্রাণী ও প্রাণী-সংরক্ষণ

সুদূর অতীতে একসময় জেলার প্রায় ৫০ শতাংশ ঘন অরণ্যে পূর্ণ ছিল। অরণ্যের মধ্যে সিংহ, চিতাবাঘ, বাঘ, নেকড়ে, হায়না, শৃগাল, ভল্লুক অবাধে বিচরণ করতো—Peterson এর Burdwan Gazetteers (1910) থেকে এ তথ্য জানা যায়। কালনা, কাটোয়ার ভাগীরথী তীরবর্তী অরণ্যে চিতাবাঘও দেখা যেত। কাঁকসার জঙ্গলমহলে নেকড়ে ও হায়নার উৎপাত লোকালয় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। লোকালয় থেকে এরা ছাগল, ভেড়া, বাছুর ধরে নিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখতো। বন্য শূকর ও বানরের উৎপাত এখনও আছে। আউসগ্রাম থানার সুয়াতা ভালকীর জঙ্গলমহলে ভালুকের খুব উৎপাত ছিল। প্রবাদ—প্রাচীনকালে ভল্লুপাদ নামে এক রাজার নাম অনুসারে ভাল্‌কী গ্রামের নামকরণ হয়েছে। ভল্লুপাদ সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে,—ভল্লুপাদের গর্ভবতী মাতা এক পুষ্করিণীতে স্নান করতে গিয়ে ভল্লুকের দ্বারা আক্রান্ত হন, ভল্লুকটি মহিলাকে বনের মধ্যে নিয়ে যায় ও সেখানেই মহিলা প্রসব করেন। এই পুত্রই পরে ভল্লুপাদ নামে পরিচিত হয়। কালনা থানার ৯১ নং বাঘনাপাড়া সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—এই গ্রাম এক সময় গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল ও সেখানে বাঘের উৎপাত ছিল। আজীবন ব্রহ্মচারী রামাইপ্রভু বৃন্দাবন থেকে আনা কৃষ্ণ-বলরামের দারুমূর্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে এখানে জঙ্গল পরিষ্কার করে অঞ্চলটিকে ব্যাঘ্রমুক্ত করেন; গ্রামের নাম হয় বাঘ-না-পাড়া অর্থাৎ বাঘনাপাড়া। এগুলি নিছকই প্রবাদ, প্রবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু বাঘ-ভাল্লুক অবাস্তব না হওয়াটাই স্বাভাবিক। ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Dist. Gazetteers থেকে জানা যায় বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে বর্ধমান শহরের কাছাকাছি জঙ্গলে একটা চিতাবাঘকে মেরে ফেলা হয়েছিল। সাঁওতাল পরগনার সন্নিহিত আসানসোল

মহকুমার জঙ্গলে বাঘও দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমায় শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার ফলে জনবসতি বিস্তারের সঙ্গে এ অঞ্চলের বনভূমি প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, আর তার ফলে বন্যপ্রাণীরও বিলুপ্তি ঘটছে। বনভূমি যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেখানে মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে কিছু হরিণ, ভাল্লুক, চিতা ও ময়ূর, তিতির জাতীয় পক্ষী। আদিবাসী ও চোরা শিকারীদের অত্যাচারে তাও বোধহয় বেশীদিন থাকবে না। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে Wild Birds and Animals Protection Act পাশ হলেও চোরা শিকার বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার W. B. Wild Life Preservation Act পাশ করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দায়িত্ব সরকারী বনদপ্তরের হাতে ন্যস্ত করেছেন। এর ফলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আগে বানরের অত্যাচার বন্ধ করতে বানরের লেজ কেটে নিয়ে গেলে জেলাশাসকের কাছ থেকে পুরস্কার মিলতো বলে প্রবাদ আছে। শহরের রাস্তায় ভাদ্র-আশ্বিন মাসে কুকুর দেখলে কুকুর মেরে ফেলার রেওয়াজ ছিল। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনকে জোরদার করার ফলে সেসব বন্ধ হয়েছে। ফলে এদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে জেলায় দেখা যায় ছাগল, ভেড়া, গরু, বলদ, মহিষ, কুকুর, বিড়াল, খরগোশ। পাখীর মধ্যে দেখা যায় পাতিকাক, দাঁড়কাক বা যমকাক, সারস, বক, তিতির, ময়না, কোকিল, গাঙশালিক, শালিক, ময়ূর, বাবুই, বুলবুলি, পাপিয়া, নিমপেঁচা, লক্ষ্মীপেঁচা, কাকাতুয়া, ফিঙে, কাঠঠোক্‌রা, গাঙচিল, কোকিল।

তবে শঙ্খচিলের প্রজাতিটা বোধহয় অবলুপ্তির পথে। আগে বর্ষাকালে পাখী শিকার দণ্ডনীয় ছিল। এখন আর কোন সময়েই পাখী শিকার আইনত স্বীকৃত নয়।

সাপের মধ্যে জেলায় দেখা যায় গোখরো, কেউটে, খইয়ে গোখরো, তেঁতুলে গোখরো, শামুকভাঙ্গা কেউটে, বোড়া, চন্দ্রবোড়া, লাউডগা, শঙ্খচূড়, কালনাগিনী, হেলে, ঢেমনা, অজগর, রাজসাপ, দাঁড়াস, কারাহত। চাষের সময় মাঠে কাজ করতে গিয়ে অনেক চাষী শামুকভাঙ্গা কেলের ছোবলে প্রাণ হারায়। তবে সর্প-বিশারদদের মতে শতকরা ৮০ ভাগ সাপের বিষ নাই বা ছোবলে প্রাণ যায় না—প্রাণ যায় আতঙ্কে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার সুযোগ না নিয়ে সাপুড়ে ও ওঝাদের চিকিৎসার ওপর নির্ভর করার ফলে।

আট অধ্যায়



মৎস্যচাষ

জেলায় দামোদর, ভাগীরথী, অজয়, খড়ি, কুনুর প্রভৃতি নদী, খাল, বিল, ঝিল, বাওড় প্রভৃতি জলাশয়ে নানা জাতির মাছ পাওয়া যায়। তাছাড়া গ্রামে-গঞ্জে, শহরেও দীঘি, পুকুর, ডোবা, মেঠো পুকুর সর্বত্র মৎস্য চাষ হচ্ছে। সরকারী হিসেবে দেখা যাচ্ছে জেলায় মৎস্যচাষযোগ্য জলাশয়ের পরিমাণ ২০,৬১৯ হেক্টর কিংবা ২০৬ বর্গকিমি অর্থাৎ সমগ্র জেলার আয়তনের ২.৯৩ শতাংশ। এছাড়া অর্ধপতিত জলাশয়ের পরিমাণ ৭৩৮৬ হেক্টর, পতিত জলাশয় ৩১৮৯ হেক্টর, বিল ও বাওড় ১৯৪০ হেক্টর এবং নদী, খাল, বিলের আয়তন ১৭,৩০৮ হেক্টর সব মিলিয়ে জলাশয়ের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৫০,৪৪২ হেক্টর। এইসব জলাশয়কে যদি নিবিড় মৎস্যচাষ প্রকল্পের আওতায় আনা যায়, তাহলে জেলায় মাছের অভাব থাকবে না। অবশ্য নদীনালাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার অসুবিধা আছে। বর্তমানে গঙ্গা ও দামোদর নদীতে ২০ লক্ষ উন্নত জাতের চারাপোনা ছেড়ে এইসব নদীতে ডিমপোনা উৎপাদনের এক অভিনব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে নদী, নালা ও জলাশয় থেকে সাধারণত রুই, মৃগেল, কাতলা, খড়কেবাটা, পাবদা, ভাঙান বাটা, মৌরালা, চাঁদা, দাঁড়কে, পুঁটি, সরলপুঁটি, কৈ, মাগুর, খলসে, চেলা, ছিবুরি বা ল্যাটা, চ্যাঙ, ট্যাংরা, বেলে, বোয়াল, সোল, আড়, ফলুই, চিতল, গলদা, কুচো চিংড়ি, বাচা, খয়রা, বীরবর, ভেলা, ফেনসা, সিলোন, ভোলা প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। সত্তর দশক থেকে নিবিড় মৎস্যচাষ প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে নানা রকম সংকর প্রজননের মাছের চাষ হচ্ছে। রুই, কাতলা, মৃগেল, কই-এর সঙ্গে চীন দেশের সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, কমনকার্পের সংকর প্রজননের দ্বারা সিলভার কার্প, সাইফোন, লাইলনটেকা, তেলাপিয়া প্রভৃতি নানা ধরনের মাছের চাষ হচ্ছে। এইসব সংকর জাতীয় মাছের উৎপাদনও বেশী আবার

সাইফোন, লাইলনটেকা পুকুরেই ডিম ছাড়ে ও তার থেকেই পোনা তৈরী হয়। যে সব পুকুরে ৫/৬ মাসের বেশী জল থাকে না, ভাতার ও আউসগ্রাম থানার সেইসব পুকুরে ১৯৯৫–৯৬ থেকে আফ্রিকান জাতের মাগুর চাষ করে ব্যাপক ফল পাওয়া গেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক এ বিষয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের সাহায্যে মৎসচাষী উন্নয়ন সংস্থা গড়ে উঠেছে। ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আউসগ্রাম ২নং ব্লকে ইকো-হ্যাচারি তৈরী হয়েছে। বর্ধমান জেলায় বর্তমানে ৫০ হাজার মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়। মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে এই উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। জেলার ৩০টি হ্যাচারী থেকে কৃত্রিম প্রজননের দ্বারা বছরে ৫০০ কোটি মৎস্যবীজ উৎপাদিত হচ্ছে। জেলায় বর্তমানে ২৯টি মৎসজীবী সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। সমিতির মাধ্যমে অল্প সুদে ঋণ দিয়ে মৎস্যচাষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। জেলায় বর্ধমান শহরে কৃষ্ণসায়র পরিবেশ উদ্যানে একটা বৃহদায়তন মীনাধার (Aquarium) নির্মাণ করা হয়েছে। তবে বর্তমানে বছর বছর পুকুরে মহুয়া খোল, চুন দেওয়ার ফলে মাছের উৎপাদন বাড়ছে কিন্তু মাছ বড় হতে পারছে না। তাছাড়া খোল দেওয়ার ফলে চ্যাঙ, ছিবুরি, মৌরালা জাতের মাছ প্রায় বিলুপ্তির পথে। আর সংকর প্রজননের দ্বারা যে মাছ উৎপাদিত হচ্ছে সে মাছে আর আগেকার স্বাদও পাওয়া যাচ্ছে না। আগে দামোদরে ও ভাগীরথীতে প্রচুর ইলিশ উঠতো। ১৯৫২ সালে রনডিহা, জামালপুর, বর্ধমান, বেড়ুগ্রাম, বড়শুলে প্রচুর ইলিশ উঠেছিল। বর্তমানে জামালপুর থানায় দামোদরে বর্ষায় মাঝে মাঝে সামান্য ইলিশ ওঠে। কিন্তু দিন দিন তাও অবলুপ্তির পথে। বর্তমানে চালানি ইলিশ ভরসা; নদীর উজানে ডিম ছাড়ার জন্য ইলিশের ঝাঁক আর আসছে না। খড়ি নদীতে পারহাট, জগদাবাদ, কর্জনা অঞ্চলে প্রচুর চ্যাংড়া (গলদা চিংড়ি) উঠতো, এমন কি জোঁকের টোপ দিয়ে ছিপ দিয়েও অনেকে বড় বড় চ্যাংড়া মাছ ধরতো। কয়েক বছর হল সেই চ্যাংড়া মাছও আর উঠছে না। এখন সংকর প্রজননের মাধ্যমে মৎস্যচাষ বাড়িয়ে মৎস্য উৎপাদনে জেলাকে উদ্বৃত্ত করে তোলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে এখনও জেলায় মাছের ঘাটতির পরিমাণ ১০ হাজার টনের। এর জন্যে ১০০০ হেক্টর জলাশয়ে নিবিড় মৎস্যচাষ প্রকল্প গড়ে তোলা প্রয়োজন। জেলার উত্তরাংশে খনি এলাকায় পরিত্যক্ত খোলামুখ খনিতে ৫০০ হেক্টর জলাশয় চিহ্নিত করে নিবিড় মৎস্যচাষ প্রকল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সঠিক পরিকল্পনা মাফিক কাজ এগুলো হয়ত আগামী ৫/৬ বছরে জেলাকে মৎস্য সরবরাহে উদ্বৃত্ত করা সম্ভব না হলেও অন্তত স্বনির্ভর করা সম্ভব হবে।

নয় অধ্যায়



খনিজসম্পদ

বর্ধমান জেলার আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। জেলার খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা, লৌহপিণ্ড, তৃতীয় স্তরের সাদা ও পীতাভ মৃত্তিকা (Tertiary clay), সাদা রঙের পাললিক স্তরের মৃত্তিকা (argillaceous alluvium clay), অগ্নিসহ ইষ্টক তৈরীর উপযুক্ত মৃত্তিকা (Fire clay) ও বেলে পাথর (Sand Stone) উল্লেখযোগ্য।

কয়লা : কয়লাখনিগুলি রানীগঞ্জ কোলফিল্ড, আসানসোল ও দুর্গাপুরের শিলাময় ল্যাটেরাইট এবং কঙ্করময় ল্যাটেরাইট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। কয়লা উৎপাদনে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে বিহারের প্রথম স্থান, রানীগঞ্জ কোলফিল্ড অঞ্চলের স্থান দ্বিতীয়। একথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতের কয়লা শিল্পের পথিকৃৎ এই রানীগঞ্জ কোলফিল্ড অঞ্চল।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এথোরার কাছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন সামনার ও এস. জে. হিটলি কয়লার সন্ধান পান। তারপর থেকেই এই অঞ্চলে কয়লা অনুসন্ধানের কাজ চলতে থাকে। সেই প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ ঘটে ১৮১৫–১৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার গভর্নর জেনারেল আর্ল অব্ মিন্টো-কে (প্রথম) কয়লা অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই অনুসারে ইংলণ্ডের যন্ত্রকুশলী মিঃ জোন্স (Jones)-কে এই অনুসন্ধান চালাবার জন্য নিয়োগ করা হয়। জোনসের একটা সুবিধা ছিল যে তিনি ভাল বাংলা বলতে পারতেন। জোনস্ সরকারের কাছে থেকে ৬% সুদে ৪০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে কাজ শুরু করেন। কাজ শুরু করার পর কাজের খুব একটা অগ্রগতি আনতে পারেন নাই। Jones বর্ধমানের রানী বিষণকুমারীর কাছ থেকে রানীগঞ্জ এলাকায় ৯৯ বিঘা জমি লিজ নিয়ে খননের কাজ আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি ৯৮ জন শ্রমিক নিয়ে চিনাকুড়ি অঞ্চলে কাজ শুরু করেছিলেন। চিনাকুড়ি-মুদ্‌গা অঞ্চলে প্রায় ৩৯ ফুট

খনন করে তিনি নিশ্চিন্ত হন যে এ অঞ্চলের কয়লা গুণমানে ইংলণ্ডের কয়লার সমতুল। কিন্তু Jones সরকারের কাছ থেকে নেওয়া Advance এর টাকা সুদসহ যথাসময়ে শোধ করতে অপারগ হন। ফলে ১৮২০ সালে তিনি দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এগিয়ে আসেন Messers Alexander & Co. নামে একটি এজেন্সী হাউস কোম্পানী। এই কোম্পানী জোনসের ঋণের টাকা সুদসহ্ শোধ করে খননের দায়িত্ব পান। ১৮২৭ সালে Co. এর উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,০৭,০০০ মণ। পাঁচ বছরের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ৪,০০,০০০ মণ। লাভ হয় ৭০,০০০ টাকা। কিন্তু এই সময় Agency Co. গুলি চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়ে। তখন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ৭০,০০০ টাকা দিয়ে খনিগুলি কিনে নেন। শুরু হয় Carr & Tagore Co. এর যৌথ উদ্যোগে কয়লা উৎপাদনের কাজ।

এরপর একে একে বিভিন্ন কোম্পানী গড়ে উঠতে থাকে ও তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত কোর্ট অবধি গড়ায়। শেষে William Princep এর চেষ্টায় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে Carr & Tagore Co. এবং Gilmore Hombray & Co. এর মিলনে জন্ম নিল Bengal Coal Co.। এরপর থেকে কয়লাশিল্পে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়।

এখন থেকেই খনি এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন Company গড়ে ওঠে ও কয়লাশিল্পের দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—বেলোড়ি অঞ্চল—Birbhum Coal Company.

কুমারডিহি, নিয়ামতপুর ও দিশেরগড় অঞ্চল—Equitable Coal Company.

বামুনডিহা অঞ্চল—M/s Madhu Roy & Prasanna Datta Company.

আলিপুর ও পানুরিয়া—Birds & Company.

পাতালবাড়ি—South Barakar Coal Company.

সোদপুর, সাকতোরিয়া, দামোদর কুণ্ডা, চান্‌স ও লুচিবাদ অঞ্চল—Bengal Coal Company.

ক্রমে ক্রমে আসানসোলের দিকেও খনিখনন এবং কয়লা উত্তোলনের কাজ শুরু হয়। একে একে আরও বিভিন্ন কোম্পানী গড়ে ওঠে; এদের মধ্যে Andrew Yule, New Beerbhum Coal Co., The Equitable Coal Co. The Raneegange Coal Assen, The Barakar Coal Co., Balmer Lawrie, Joogidih Coal Co., Katras Jharia Coal Co. বরাবনী কোল কোম্পানী, ইম্পিরিয়াল কোল কোম্পানী, বেনালিয়া কোল কোম্পানী, সেন্ট্রাল তেঁতুলিয়া কোল কোম্পানী, সালানপুর কোল কনসার্ন, দি সেন্ট্রাল কেন্দা কোল কোম্পানী ইত্যাদি।

রানীগঞ্জ কোলফিল্ড উন্নয়নে ইউরোপীয়দের পাশাপাশি ভারতীয়রাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, মধু রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কাশ্মীর (মতান্তরে পাঞ্জাব) এর গোবিন্দ পণ্ডিত, জোড়াসাঁকোর দাঁ পরিবারের শিবকৃষ্ণ দাঁ, পূর্ণচন্দ্র দাঁ, রায়না থানার বলিয়াড়পুর গ্রামের নিবারণ সরকার এবং Poniati Coal Company এর মালিক উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরাও কয়লাশিল্প উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

রানীগঞ্জ-আসানসোল কোলফিল্ড অঞ্চলে প্রথম দিকে সাঁওতাল ও বাউরিরা শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হয়। রানীগঞ্জ অঞ্চলের শ্রমিকরা ছিল বাউড়ি আর চিনাকুড়ির শ্রমিকরা ছিল সাঁওতাল, পরে অবশ্য পাটনা ও গয়া জেলা থেকে আসে রাজোফররা, হাজারিবাগ থেকে আসে ভুঁইঞারা, দেওঘর অঞ্চল থেকে আসে ডোম ও ধাঙড়রা, উত্তরপ্রদেশ থেকে লোধা ও পাসিসরা; উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে কুর্মী ও মুঙ্গের থেকে আসে বেলদাররা। কোদাল, বেলচা, গাঁইতি, শাবল, ক্রো-বার এইসব যন্ত্র ব্যবহার হত। বর্ষাকালে খনিতে জল ঢুকে গেলে পুকুরে ছেঁচার মত ডোঙ্গা জাতীয় পাত্র ব্যবহৃত হত। পরে স্টীম ইঞ্জিনের ব্যবহার শুরু হয়। আরও পরে অবশ্য উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি Safety Lamp এর প্রচলন হয়।

প্রথম দিকে কয়লা কলকাতায় চালান যেত জলপথে দামোদর ও অজয়-ভাগীরথী দিয়ে। তবে বর্ষাকালে নদীগুলি বহনযোগ্য হলে তবেই পরিবহণ সম্ভব হত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নদীপথে রানীগঞ্জ থেকে কলকাতায় কয়লা পাঠাতে খরচ পড়তো ১০০ মণে ১০ টাকা। রেলের ওয়াগান খুব বেশী পাওয়া যেত না।

রানীগঞ্জের কোলফিল্ডের আয়তন ১৫৫০ বর্গ কিমি। ১৭৭৪ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত এ অঞ্চল থেকে ৩৬২ মিলিয়ন মণ কয়লা উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়াও এই সময়ের মধ্যে বন্যা ও অগ্নির ফলে অনেক পরিমাণ কয়লা নষ্টও হয়েছে। বর্ধমান জেলায় প্রধান কয়লা উৎপাদক অঞ্চল রয়েছে রামনগর, দিশেরগড়, সালানপুর, আসানসোল, গৌরাঙ্গডি, চুরুলিয়া, চরণপুর, কালিপাহাড়ী, শিবপুর, রানীগঞ্জ, তোপসী, কেন্দা, পুরুষোত্তমপুর, উখরা, কাজোরা, আর অজয়ের অপর পাড়ে রয়েছে পরিপুরকন্তা, রসোয়ান, আরাঙ ও হিঙ্গলী কলিয়ারি। এদের মধ্যে সালানপুর এরিয়ায় চকবল্লভপুর, সংগ্রামপুর ও কুনুস্তোরিয়া এরিয়ার কুনুনতোরিয়া ও পরাসিরা, শ্রীপুর এরিয়ার জামুরিয়া, মগমা এরিয়ার হরিয়াজাম, পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার নতুনডাঙ্গা, মাধাইপুর ও ডালুরবাঁধ, মাউথ দি ইউনিটের সোদপুর, সীতারামপুর এরিয়ার ধেমো, খোট্টাডি এরিয়ার খোট্টাডি, কেন্দা এরিয়ার নিউ কেন্দা ও ম্যামা এরিয়ার খুদিয়া কোলিয়ারী দুর্ঘটনাপ্রবণ।

কার্বনের উপস্থিতির হার অনুসারে কয়লাকে প্রধানত চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন—(১) অ্যানথ্রেসাইট—সর্বোৎকৃষ্ট (কার্বন ৯০-৮৫%) (২) বিটুমিনাস—মধ্যম, এতে কার্বনের পরিমাণ ৫০-৮৫% (৩) লিগনাইট—তৃতীয় শ্রেণীর, কার্বনের পরিমাণ ৩৫-৫০ % (৪) পিট কয়লা—নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এতে কার্বনের পরিমাণ ৩০-৩৫ %। বর্ধমানের কয়লা প্রধানত গণ্ডোয়ানা যুগের বিটুমিনাস অর্থাৎ মধ্যম শ্রেণীর।

রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ—মিলিয়ন টনস্-এ

	৩০৫ মি. গভীরতায়	৬১০ মি. গভীরতায়
১. Coking (নির্বাচিত গ্রেড-১)	২৯১.৬	৫৫৭.০
২. Non-Coking (গ্রেড-১)	২৮০৩.০	৪৯১৫.৪
৩. Non-Coking (নিম্নমান)	৫০২৯.০	৮৩৬৩.৭
মোট	৮১২৩.৬	১৩৮৩৬.১

এদের মধ্যে অপচয় আছে।

উৎপাদন অনুসারে কয়লাখনির

বিভাগ ও সেই অনুসারে কয়লাখনির সংখ্যা : (১৯৫৪-এর হিসাব)

উৎপাদন ৫০০০ টনের কম	৫০০১—১০,০০০ টন	১০,০০১—২০,০০০	২০,০০১—৩০,০০০	৩০,০০১—৫০,০০০
কয়লাখনির সংখ্যা ২৬০	৯৪	১৩৩	৮৯	৮৩
উৎপাদন	৫০,০০১—১,০০,০০০	১,০০,০০১—২,০০,০০০	২,০০,০০১—৩,০০,০০০	৩,০০,০০১
সংখ্যা	৯৬	৫৯	২৯	৯
সর্বমোট — ৮৫২				

ইষ্টার্ন কোল ফিল্ডের (ই.সি.এল. লিঃ) মোট কয়লাখনির সংখ্যা ১২৭টি, এর মধ্যে বর্ধমান জেলাতেই আছে ১০৮টি। বেঙ্গল কোল কোম্পানী লিমিটেডে (B.C.C.L.) এর মালিকানায় আছে ৭৮টি, তার মধ্যে পশ্চিম বাংলায় ৩টি।

এই সমস্ত কয়লাখনির শ্রমিক সংখ্যা—১,৭৭,৮৮৯ (৩১.১২.৯১ এর হিসাব)।

এর মধ্যে আন্ডার গ্রাউন্ড মাইনার	:	১,০১,৭৫৭
ওপেন ফাস্ট প্রজেক্ট	:	১৬,২৩৫
নন মাইনিং	:	৫১,৮৯৭
বিবিধ	:	৮০০০
সর্বমোট	:	১,৭৭,৮৮৯

বি. সি. সি. এল. কোং এর বিভিন্ন পদে নিযুক্ত অফিসার পর্যায়ের ও অন্যান্য কর্মীর সংখ্যা :

একজিকিউটিভ	:	৩,৩৮৩
সুপার ভাইজার	:	৮,৯০৯
দক্ষ	:	৩৫,৮৭২
মিনিষ্টারিয়েল	:	১০,৯৮৩
ক্যাজুয়েল	:	৭৩৯
বদলি	:	২৯২
বিবিধ	:	৫৫৮
অদক্ষ	:	১,১৭,১৫৩
মোট	:	১,৭৭,৮৮৯

কোল ইণ্ডিয়ার ঐ তারিখে কর্মীসংখ্যা ৬,৭২,৮৬৬। কয়লাশিল্পে দুর্নীতির মাত্রা বর্তমানে এক চরম সীমায়। কিছু অসৎ অফিসার, ঠিকাদার ও মাফিয়াদের যোগসাজসে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার কয়লা পাচার হচ্ছে। কিছু অসৎ অফিসার ও মাফিয়ারা মিলে শিল্পজগতে সর্বনাশ ডেকে আনছে। Durgapur Project Ltd. মার খাচ্ছে, Durgapur Steel-এর উৎপাদন কমছে—সেখান থেকেও কয়লা পাচার হচ্ছে। এর ফলে অনেক খনি ও কারখানা বন্ধ হওয়ার মুখে। অনেক কয়লাখনিকে বন্ধ করে দিতে হচ্ছে।

লৌহ : প্রাগৈতিহাসিক তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার যুগে যে বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় লৌহের খনি ছিল এবং লৌহের ব্যবহার হত পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও

বাণেশ্বরডাঙ্গার খননকার্যের ফলে তা প্রমাণিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে পরেশ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর Excavations at Pandu Rajar Dhibi গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। During the excavation of 1964, it was decisively proved that iron was known and probably melted at this site, side by side with the use of copper and microliths in period III in a chronological horizon around 1000 BC. রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানে লৌহ গলানোর চুল্লীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

লৌহ নানাপ্রকার রাসায়নিক যৌগে (Chemical combination) শিলার মধ্যে আকরিক রূপে অবস্থান করে। লৌহ আকরিকের মধ্যে অক্সাইড-এর পরিমাণ অনুসারে একে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—(১) হেমাটাইট (Fe_2O_3)—এতে লৌহের পরিমাণ ৭০ শতাংশ; এটি রক্তবর্ণ (২) ম্যাগনেটাইট (Fe_3O_4)—এটি কৃষ্ণবর্ণ, এটি একটি সর্বোৎকৃষ্ট লৌহ-আকরিক, এতে লৌহ থাকে ৭২ শতাংশ (৩) লিমোনাইট ($2Fe_2NO_3$, $3H_4O$)—এটি পীতাভ বাদামী রঙের, এতে লৌহের পরিমাণ ৬০, এটি তৃতীয় শ্রেণীর লৌহ আকরিক। আর নিকষ্ট লৌহ আকরিক হচ্ছে সিডেরাইট ($FeCO_3$)—এটি ধূসর বাদামী রঙের, এতে লৌহের পরিমাণ ৪৮ শতাংশ।

রানীগঞ্জ কোলফিল্ড এলাকায় যে লৌহপিণ্ড পাওয়া যায় সেটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর সিডেরাইট গ্রুপের ($FeCO_3$), এর মধ্যে লৌহের পরিমাণ ৪৮.২%। রানীগঞ্জ এলাকায় Iron Stone Shale Group লৌহপিণ্ড এলাকার ঘনত্ব ৩৬৬ মি ও এই এলাকার উত্তরদিকে ৫৩ কিমি ও পূর্ব-পশ্চিমে ১১৪ কিমি অর্থাৎ ৬০৪২ বর্গকিমি জুড়ে বিস্তৃত।

তবে একথা ঠিক যে আকরিক লৌহ উৎপাদন ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার অবদান খুবই সামান্য। তবে রানীগঞ্জ কোলফিল্ডে কয়লা খনি উৎখননের সময় যে লৌহপিণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায় তা কুলটি-বার্ণপুর অঞ্চলে বৃহদায়তন লৌহশিল্প গড়ে তুলতে উৎসাহ দান করেছে।

বক্সাইট : এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে বক্সাইট কাঁচামাল রূপে ব্যবহৃত হয়। বিহারের রাঁচীর কাছে লোহারডাঙ্গা অঞ্চলে এবং বর্ধমান জেলার আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে ভারতের বক্সাইটের মোট সঞ্চয়ের ৫০ ভাগ সঞ্চিত আছে। বক্সাইট প্রধানত ক্ষয়প্রাপ্ত টিলার উপরের স্তরে (Topping to flat-top mounds) অবস্থান করে। আকরিক বক্সাইট পিণ্ড থেকে ধৌত (Leaching) প্রক্রিয়ায় লৌহ ও অন্যান্য খনিজ অপসারিত করা হয়—পড়ে থাকে

অ্যালুমিনিয়াম (Al_2O_3) ৫০ শতাংশ ও সিলিকেট কমবেশী ৭ শতাংশ। তখন এই পড়ে থাকা অংশ থেকে এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন সহজসাধ্য হয়। তবে বক্সাইট থেকে এ্যালুমিনা নিষ্কাশনের জন্য প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয়। কাজেই বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে বক্সাইট নিষ্কাশন ও এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

ম্যাঙ্গানিজ : ম্যাঙ্গানিজ একটি লৌহ-সংকর ধাতব সম্পদ। ইস্পাত তৈরীতে দরকার হয় বলে শিল্পোন্নত দেশে ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা খুব বেশী। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে স্টীল নির্মাণে ৯০ শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহৃত হয়। এই ইস্পাত ঘর্ষণজনিত ক্ষয়রোধে সহায়তা করে। বর্ধমান জেলার সন্নিহিত কেওনঝড়, ময়ূরভঞ্জ জেলায় সব থেকে বেশী ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে ভারতের মোট উৎপাদনের ৩৩.৬৬ শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। বিহারের সিংভূমেও সামান্য ১.৩৪ শতাংশ পাওয়া যায়। বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ কোলফিল্ড অঞ্চলে যে আকরিক লৌহপিণ্ড পাওয়া যায় তার মধ্যে ১.৪ থেকে ২.৫ শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ থাকে। ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে বর্ধমান জেলার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

মালচৈতা ও পাওলটন কানোয়া অঞ্চলে যে Iron Stone Shale (আকরিক লৌহপিণ্ড) আছে তাহা যথাক্রমে ১৬ ও ১০.২৫ শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড সমৃদ্ধ।

কেওলিন : সিলিকট শিলার মধ্যে নরম অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে Hydrous Aluminium Silicate বর্তমান। ধূসর বর্ণের এই কর্দম (Clay) ও অগ্নিশিলা (Fire Clay) রানীগঞ্জ কোলফিল্ড ও বরাকর অববাহিকা অঞ্চল থেকে উৎখননের দ্বারা বের করে' দুর্গাপুর ফ্যাক্টরীতে অগ্নিসহ ইট, টালি ও পটারী উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। রানীগঞ্জ থানার ২৩নং রোনাই মৌজায় ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার উপরিস্তরে ১ থেকে ১.২২ মি. পুরু আস্তরণে হালকা যে ধূসর কাওলিন মৃত্তিকা পাওয়া যায় সে মৃত্তিকা "রানীগঞ্জ ইষ্টক ও টালি" নির্মাণের কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। D.R.S. Mehta-র Indian Minerals অধ্যায় থেকে জানা যায় রানীগঞ্জ কোল ফিল্ড অঞ্চলে ৬.১ মি. গভীরে ৪১,২৯, ৫৩২ টন Fire Clay এর সঞ্চয় আছে।

শিরিস কাগজ : বর্ধমান জেলায় প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পালিশ করা শিরিস কাগজ (Abrasives) উৎপাদনের বিরাট সম্ভাবনা আছে। কৃত্রিম ঘষাই কাগজ তৈরীর কাঁচামাল হিসেবে Silicon Carbide ও অন্যান্য পালিশ করার উপাদান বর্তমানে ভারতে আমদানী করতে হয়। কিন্তু দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে

আসানসোল ও রানীগঞ্জের কোলফিল্ড অঞ্চলে যে পরিমাণ মোটা ও সরু বালি ও বক্সাইট পাওয়া যায় এবং দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে যে হারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে তাতে এই জেলাতেই এই কৃত্রিম জাতীয় Abrasives (ঘষাই কাগজ) যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী হতে পারে।

পাথর : রাস্তা তৈরী ও রেললাইনের ধারে যে ballast লাগে বা Building তৈরীতে যে পাথর ব্যবহৃত হয় তার জন্য Dolerite Dykes ও রাজমহল ট্রাপ খুবই উপযুক্ত। গ্রানাইট, নীস, গণ্ডোয়ানা উপত্যকা ও পাঞ্চেত-এর বেলেপাথর রানীগঞ্জ কোলফিল্ড-এ পাওয়া যায়। দামোদর অজয়ের মিহি বালি দিয়ে পরিত্যক্ত কয়লাখনি বোজান হচ্ছে। কুনুর, দামোদর, বরাকর, দ্বারকেশ্বর-এর মোটা বালি ঢালাই ও প্লাষ্টারের কাজে ব্যবহৃত হয়। খড়ি ও ভাগীরথীর মোটা বালি একাজে বিশেষ উপযুক্ত। ভাগীরথীর বালি মগরা থেকে আনা হচ্ছে। খড়ির বালি কর্জনা, মাহিনগর থেকে তোলা হয়।

দশ অধ্যায়



জনজীবন

ভূপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের ফলে জনজীবনেও বৈচিত্র্য ঘটা স্বাভাবিক। পশ্চিম অঞ্চলে প্রস্তর কঙ্করময় ভূত্বক রুক্ষ পরিবেশের জন্য ও খনি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এখানকার জনগণ সাধারণভাবে খনি ও শিল্পকর্মের উপর নির্ভরশীল আর পূর্বাঞ্চলে অনুকূল জলহাওয়া ও পাললিক ভূপ্রকৃতির জন্য এখানকার জনসাধারণ মোটামুটিভাবে কৃষির উপর নির্ভর করে।

পশ্চিম প্রান্তে চিত্তরঞ্জন, সালানপুর, হীরাপুর, আসানসোল, দুর্গাপুর পার্বত্য অঞ্চলভুক্ত। আসানসোল, অণ্ডাল, রানীগঞ্জ থানা নিয়ে গঠিত এই পার্বত্য অঞ্চল। ভূতাত্ত্বিকদের মতে ৫০০০ বছর আগে রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণের রাঢ় অঞ্চল ও বর্ধমান জেলার অবস্থিতি ছিল বঙ্গোপসাগরের উপকূলে। ফলে এই অঞ্চলে গন্ডোয়ানা শিলাস্তরের উপর Holocem যুগে সমুদ্রতল উত্থিত হতে থাকে ও পলি সঞ্চিত হতে থাকে। তারপর Carboniferous Period-এ Pennsylovanion যুগে সমুদ্রপৃষ্ঠ ক্রমশ উত্থিত হতে হতে জেলার ভূত্বক জেগে ওঠে। এ স্তরের গভীরতা কোথাও কোথাও ১২৫০ ফুট পর্যন্ত। এই স্তরে গড়ে ওঠে বিরাট বনভূমি। পরে ভূমিকম্প আর ভূত্বকের আলোড়নের ফলে এই বনভূমি ভূগর্ভে নিমজ্জিত হয়। যুগ যুগ ধরে এই বনরাজি ভূগর্ভের অভ্যন্তরের উত্তাপ ও প্রবল চাপে স্তরীভূত কয়লায় পরিণত হয়। রানীগঞ্জ, অণ্ডাল, রাজবাঁধ, সীতারামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে কয়লার অসংখ্য খনি। জেলায় এই অঞ্চলের কয়লার স্তর আজও বহন করছে গণ্ডোয়ানা যুগের অস্তিত্ব। ফলে ১৩৩৫.৫৬ একর জুড়ে এই অঞ্চলে যে জনবসতি গড়ে উঠেছে তাদের জীবনধারা ও জীবিকার্জনে ও নগরায়ণে একটা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় এ অঞ্চলের ১৩৩৫.৫৬

হেক্টর পরিমিত ভূভাগে বাস করে ২২,১১,৩১৯ জন অধিবাসী, যাদের মধ্যে গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যা হচ্ছে ৬২,১৬০ ও শহরে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ১৫,৯০,০৫৯ অর্থাৎ শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা এ অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ৭১.৮৬ শতাংশ, কৃষকের সংখ্যা ৪৯,০৮৫ অর্থাৎ ১২.৫ শতাংশ, কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা ৬৪,০১৩ অর্থাৎ ২.৭৬ শতাংশ আর খনি, শিল্প, কল-কারখানায় নিযুক্ত অধিবাসীর সংখ্যা ৭,২৯,৪৫১ অর্থাৎ ৩১.৫৫ শতাংশ।

শহর ও গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা : বুদবুদ, আউসগ্রাম, গলসী, ভাতার ও মঙ্গলকোট থানার পলিমিশ্রিত লোহিত মৃত্তিকা (Laterite) অঞ্চলের ১৮৫৬.২০ হেক্টরে লোকসংখ্যা ৯,২৩,৪৫৭; যাদের মধ্যে ৮,৮৬,৮৮৫ জন বাস করে গ্রামাঞ্চলে আর ৩৬,৫৭২ জন বাস করে শহরাঞ্চলে। এদের মধ্যে কৃষক ও কৃষি-শ্রমিক এর সংখ্যা যথাক্রমে ১,৫৯,১০৩ ও ১,৪৭,৩৩৩; অর্থাৎ উভয়ে মিলে ৩৩.১৮ শতাংশ আর শিল্পকর্মে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ৩,১০,২২২ অর্থাৎ ১০.৮৭ শতাংশ।

এদের চেয়ে কৃষি-নির্ভর পূর্বাঞ্চলের কৃষিজীবী ও কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশী। সমগ্র অঞ্চলের ৩৮৩২.২৪ হেক্টর পরিমিত ভূখণ্ডের জনসংখ্যা মোট ২৯,১৫,৮২৯; এদের মধ্যে গ্রামে বাস করে ২৪,১৮,৫১৩ ও শহরে বাস করে ৪,৯৭,৩১৬ জন অর্থাৎ যথাক্রমে ৮২.৭১৭ ও ১৭.০৩ শতাংশ। এ অঞ্চলের কৃষিজীবী ও কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা মোট ৬,৯৬,১১৪ অর্থাৎ এ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ২৩.৮৭ শতাংশ। যদিও ভূতাত্ত্বিকদের মতে ভাতার ও মঙ্গলকোট থানা পলিমিশ্রিত ল্যাটেরাইট অঞ্চলভুক্ত কিন্তু আমার মতে অজয়-কুনুর-খড়োশ্বরী-ব্রহ্মাণী বিধৌত ও দামোদর ক্যানেলের জলে সেচসেবিত ভাতার ও মঙ্গলকোট থানাকে বর্তমানে কৃষি অঞ্চলভুক্ত বলে গণ্য করাই উচিত। লোহিত মৃত্তিকা ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। পূর্বে এ অঞ্চলে অনেক জমিতে ইক্ষু চাষ হতে দেখেছি। কিন্তু বর্তমানে বৎসরে একাধিকবার উচ্চফলনশীল ধানচাষের প্রচলন হওয়ায় এই দুই থানায় ব্যাপক হারে বছরে ২/৩ বার উচ্চ ফলনশীল ধানচাষই হচ্ছে। বোরোচাষের জন্য ক্যানেলের জল যদি কোন কোন এলাকায় না সরবরাহ হয়, অগভীর নলকূপের দ্বারা সেচের সাহায্যেও ধানচাষই এলাকার প্রধান শস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেক্ষেত্রে অর্থাৎ ভাতার ও মঙ্গলকোট থানাকে পূর্বাঞ্চলের কৃষি-নির্ভর অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করলে মিশ্র লোহিত অঞ্চলের আয়তন দাঁড়াবে ১০৭৬৯০ হেক্টর ও মোট লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৮,৪৮,২৭৬, আর কৃষি-নির্ভরশীল ও কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,০০,৩৬২ অর্থাৎ ২১.১২ শতাংশ।

ভাতার ও মঙ্গলকোট থানাকে পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগ করলে এর আয়তন দাঁড়াবে ৪,৬১১,৫৪ হেক্টর এবং লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৯,৯১,০১৯ ও কৃষি-নির্ভরশীল ও কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮,৯৬,৪৭৬ অর্থাৎ ২৯.৯৭ শতাংশ। পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও কৃষিনির্ভর জনসমষ্টির অনুপাত যথাক্রমে ১২.৫ শতাংশ ও ২.৭৬ শতাংশ। কিন্তু কলকারখানায় ও খনিতে নিযুক্ত শ্রমজীবীর অনুপাত ৩১.৫৫ শতাংশ।

সমগ্র জেলার ভূত্বকের এই বৈচিত্র্যের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের জনজীবনেও বৈচিত্র্য ঘটা স্বাভাবিক। পার্বত্য, লোহিত মৃত্তিকা ও খনি অঞ্চলে যেমন বিভিন্ন শিল্পকর্মে ও খনির কাছে নিযুক্ত শ্রমজীবীর লোকের সংখ্যা বেশী, পূর্বাঞ্চলে মিশ্র লোহিত ও কৃষিপ্রধান অঞ্চলে তেমনি কৃষিনির্ভর লোক ও কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের যেখানে লোকসংখ্যা ১৯৯১-এর আদমসুমারী অনুসারে ৬৮,০০৭,৯৬৫; সমগ্র বর্ধমান জেলার লোকসংখ্যা ৬,০৫০,৬০৫ অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ৮.৮৯ শতাংশ লোক এ জেলাতেই বাস করে। এই ৬,০৫০,৬০৫ জন লোকের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩,১৮৬,৮৩৩ ও নারীর সংখ্যা ২,৮৬৩,৭৭২। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বর্গ কিলোমিটার এ জনঘনত্ব ৭৬৭; জেলার জনঘনত্ব সেখানে ৮৬১। ১৯৮১—'৯১ এই দশ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পশ্চিমবঙ্গের ২৪.৭৩ আর জেলার বৃদ্ধির হার ২৫.১৩। জেলার জনগণের শহরাঞ্চলে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ৩৯.০৯ শতাংশ। প্রধান প্রধান কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ২১.৮১ শতাংশ কৃষক বা কৃষি-নির্ভর, ৩০.৭০ শতাংশ কৃষি-শ্রমিক। পশুপালন, মৎস্যচাষ, বৃক্ষরোপণ, বাগিচাফসল উৎপাদন প্রভৃতি অনুরূপ কর্মে নিযুক্ত শ্রমজীবীর সংখ্যা ০.৯০ শতাংশ, কয়লাখনি ও পাথর ভাঙার কাজে নিযুক্ত লোকের হার ৭.২১ শতাংশ, কুটির শিল্পে ১৪.১৩ শতাংশ, গৃহনির্মাণ কার্যে ১.৪৪ শতাংশ, ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তির হার ৯.৪৫ শতাংশ এবং অন্যান্য কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৪.৪২ শতাংশ।

জেলার ৬০,৫০,৬০৫ লোকসংখ্যার মধ্যে ১৬,৬০,৪৯৩ জন অর্থাৎ ২৭.৪৪ শতাংশ তপসিলীভুক্ত ও ৩,৭৬,০৩৩ জন তপসিলী উপজাতি অর্থাৎ ৬.২১ শতাংশ। সমগ্র জেলায় ২৫৮৮ গ্রামে বাস করে ৩৯,২৭,৬১৩ জন, যাদের মধ্যে ২০,৩১৮৪২ জন পুরুষ ও ১৮,৯৫, ৭৭১ জন মহিলা। আর জেলার ৬১টি শহরে বাস করে ২১,৫২,৯৯২ জন, যাদের মধ্যে ১১,৫৪,৯৯১ জন পুরুষ ও ৯,৯৮,০০১ জন মহিলা।

জনসংখ্যা, হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ : ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জনগণনার সূচনা। তারপর থেকে প্রতি দশ বৎসর অন্তর জনগণনা হয়ে আসছে। জনগণনার হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন মহকুমার লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অজয়, ভাগীরথী, কুনুর বিশেষ করে দামোদরের মাঝে মাঝে বন্যা, কখনও অনাবৃষ্টি, বন্যায় শস্যহানির ফলে বিভিন্ন মহকুমায় জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। তাছাড়া ম্যালেরিয়া, সাইক্লোন, দুর্ভিক্ষ, কলেরা, বসন্তমহামারীও হ্রাস-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। সব মহকুমায় এই সমস্ত রোগ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের প্রভাব সমানভাবে পড়ে নাই। এর ওপর রানীগঞ্জ, আসানসোল, সীতারামপুর, কুলটি অঞ্চলে কয়লাখনির আবিষ্কার, লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠায় ঐ সব অঞ্চলে জেলার বাইরে থেকে জন-অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, ফলে ঐ অঞ্চলে এক এক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশ দশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ও মন্বন্তরের ফলে যেমন একদিকে জনসংখ্যা কমেছে, অন্যদিকে বঙ্গবিভাগের ফলে পঞ্চাশের দশকে দলে দলে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে বর্ধমান, রাজবাঁধ, শিবপুর, দুর্গাপুর, আসানসোল, কালনা, কাটোয়া, গুসকরা, দেবপুর অঞ্চলে লোকসংখ্যা কিছুটা বেড়ে যায়। তার ওপর স্বাভাবিক জন্মহার বৃদ্ধি ও চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতি এবং ম্যালেরিয়া, বসন্ত নির্মূল হওয়ার ফলে মৃত্যুহার হ্রাসের ফলে স্বাভাবিক বৃদ্ধি তো আছেই।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দামোদরে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে ২৭ বার। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বন্যায় দামোদরের দক্ষিণ তীরের বাঁধ ধ্বংস হয়ে যায়। এতদিন যাঁর জমিদারীর মধ্যে বাঁধ পড়তো তিনিই এর মেরামতির দায়িত্ব নিতেন। ১৮৫৫ সালে কোম্পানী নদীর ডানদিকের বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতির পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন ও নদীর বামতীর বরাবর বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বন্যা কিন্তু রোধ করা গেল না। বারবার বন্যার ফলে অনেক লোক উদ্বাস্তু হয়ে অন্য জেলায় বা অন্য মহকুমায় চলে যায়। ফলে জেলার কোন কোন মহকুমার জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। নীচের ১নং সারণিতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রাম ও শহর অঞ্চলের জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির হার এবং ২নং সারণিতে মহকুমা ভিত্তিক ১৯০১–'৯১ পর্যন্ত জনসংখ্যা ও হ্রাস-বৃদ্ধির হার দেখানো হল।

সারণী–১

বর্ধমান জেলা : শহর ও গ্রামভিত্তিক কয়েক বৎসরের জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার হ্রাস–বৃদ্ধির হারের সারণী

জেলা	১৯০১ খ্রী: জনসংখ্যা	১৯২১ খ্রী: জনসংখ্যা	১৯০১-২১ এক বৎসরে হ্রাস-বৃদ্ধির গড় শঃ হাঃ	১৯৩১ জনসংখ্যা	১৯২১-৩১ বাৎসরিক হ্রাস-বৃদ্ধির গড় শতকরা হার	১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ এর জনসংখ্যা	১৯৩১-৫১ এর বার্ষিক হ্রাস-বৃদ্ধির গড় শতকরা হার
জেলা	১৫৩২৪৭৫	১৪৩৪৭৭১	–০.৩২	১৫৭৬৬৯৯	+ ০.৯৮	২১৯১৬৬৭	+ ১.৯৫
শহর	৮৬৭২৮	৯৫৭৪২	+ ০.৫১	১২৯৮৮৫	+ ৩.৫৬	৩২৩৯৪১	+ ৭.০৮
গ্রাম	১৪৪৫৭৪৭	১৩৩৯০২৯	–০.৩৭	১৪১৫৮১৪	+ ০.৭৯	১৮৬৭৭২৬	+ ১.৪৬
	১৯৬১ এর জনসংখ্যা	১৯৫১–৬১ বার্ষিক গড় (শঃ হাঃ)	১৯৭১ এর জনসংখ্যা	১৯৬১-৭১ এর বার্ষিক গড় শঃ হাঃ	১৯৯১ এর জনসংখ্যা	১৯৭১–৯১ এর বার্ষিক হ্রাস-বৃদ্ধির শঃ হাঃ	
জেলা	৩০৩২৮৪৬	+ ৪.০৫	৩৯২০৩৯৫	+ ২.৭১	৬০৫০৬০৫	+ ২.৭১	
শহর	৫৬১০৭৮	+ ৭.৩২	৮৯৫২৮৯	+ ৫.৯৬	২১২২৯৯২	+ ৬.৮৫	
গ্রাম	২৫২১৭৬৮	+ ৩.৫০	৩০২৫১০৬	+ ১.৯৯	৩৯২৭৬১৩	+ ১.৪৯	

সারণী-২

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জনগণনা বৎসরে বার্ষিক গড় হ্রাস-বৃদ্ধি সহ মহকুমাভিত্তিক জনসংখ্যা

	১৯০১	১৯২১	১৯৩১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১
বর্ধমান জেলা শঃ হ্রাঃ	১৫৩২৪৭৫	১৪৩৮৭৭১ —০.৩২	১৫৭৫৬৯৯ + ০.৯৮	২১৯১৬৬৭ + ১.৯৫	৩০৮২৮৪৬ + ৪.০৬	৩৯১৬১৭৪ + ২.৭০	৪৮৩৫৩৮৮ + ২.৩৪	৬০৫০৬০৫ + ২.৫১
বর্ধমান সদর মহকুমা	৬৮৩৩৮১	৫৮৯৮৪৯ —০.৮২	৬২৫২৯৫ + ০.৬০	৮০২০৫৭ + ১.৪১	১১৪৯০৩৮ + ৪.৩৩	১৪১৫৩০৩ + ২.৩২	১৬৮৫৪৪৮ + ১.৯০	২০৭৯৫৯৯ + ২.৩৪
কালনা মহকুমা	২২৭৮১২	২০৫৯৫৪ —০.৪৮	২১৮৭৩৭ + ০.৮৬	৩০৫৭৫১ + ১.৯৯	৪১৬২২০ + ৩.৬১	৫২৯৭২৭ + ২.৭৩	৬৫৩৯২৭ + ২.৩৪	৮২৫৯৯৬ + ২.৬৩
কাটোয়া মহকুমা	২৪৯৮৯৯	২৩৫০০৪ ০.৩০	২৬৮৫৮৭ + ১.৪২	৩১৪৫৯৪ + ০.৮৬	৪২৬৫১৪ + ৩.৫৫	৫৩২৪৯৪ + ২.৪৮	৬১৯৩৪৮ + ১.৬৩	৭৩৮২৩৮ + ১.৯১
আসান-সোল ও দুর্গাপুর মহকুমা	৩৭১৩৮৩	৪০৩৯৬৪ + ০.৪২	৪৬৩০৮০ + ১.৪৪	৭৬৯২৬৫ + ৩.২১	১০৯১০৭৪ + ৪.১৮	১৪৩৮৬৫০ + ৩.১৮	১১০৩২৬৬ আসানসোল মহকুমা	১৩৭৩৯৭৩ + ২.৬২
দুর্গাপুর মহকুমা							৭৭৩৩৯৯	১০৩২৭৯৯ + ৩.৩৫

সারণী–৩

ধর্মসম্প্রদায়ভিত্তিক ১৯৬১ ও ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনার তুলনামূলক হিসাব

ধর্মীয় সম্প্রদায়	১৯৬১	১৯৭১	বার্ষিক বৃদ্ধির হার
হিন্দু	২৫৯৮৮৭৫	৩২১৯৬৪২	+২.৩৯
মুসলমান	৪৬৭৬৬৯	৬৭২২২৭	+৪.৩৭
ক্রীশ্চান	৭৯৬৩	১০৪০৯	+৩.০৭
শিখ	৫৮৫৫	১০৪৪৩	+৪.৩৯
জৈন	১৯২৫	৯২৭	–.৫১৮
বৌদ্ধ	৫৫৩	৪০৫	– ২.৬৭
অন্যান্য সম্প্রদায়	০৬	৩৮২৪	.....
ধর্মের উল্লেখ নাই এমন	...	২০৯	.....

সারণী–৪

১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী মহকুমা ভিত্তিক তপসিলী জাতি ও উপজাতি সংখ্যা

মহকুমা	১৯৯১ তপসিলী জাতি	১৯৯১ তপসিলী উপজাতি	মোট জনসংখার অনুপাতে শতকরা হার	
			তঃ জাতি	উপজাতি
বর্ধমান	৬৫৫০১৫	১৮২৩৩২	৩১.৪৯	৮.৭৬
কাটোয়া	২২০০৬৬	৭৩০৭	২৯.৮০	০.৯৯
কালনা	২২৬০০৪	৫২৩৮২	২৭.৩৬	৬.৩৯
আসানসোল	৩০০৪৭৬	৮৩৩২১	২১.৮৬	৬.০৬
দুর্গাপুর	২৫৮৩৩২	৫০৬৯১	২৫.০১	৪.৯০
জেলা	১৬৬০৪৯৩	৩৭৬০৩৩	২৭.৪৪	৬.২১

সারণী–৫

জেলাভিত্তিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষিজীবী, শ্রমজীবী ও কর্মহীনদের সংখ্যা ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে

কর্মের শ্রেণী	সংখ্যা	সমগ্র জনসংখ্যা অনুপাতে শতকরা হার
প্রধান কর্মজীবী	১৭৯০১৩০	২৯.৭২
কৃষিজীবী	৩৯২১২৩	৬.৪৮
কৃষিশ্রমিক	৫৫১৯৩৭	৯.১২
পশুপালন, বনসৃজন, মৎস্যপালন, বাগিচা ক্ষেত্রের কর্মী	১৬২৭১	০.৬২
খনি ও পাথর ভাঙ্গাই কাজে নিযুক্ত কর্মী	১২৯৫৫৪	২.১৪
কুটির শিল্পে নিযুক্ত কর্মী	৫২৭৫০	০.৮৭
কুটির শিল্প বাদে অন্য শিল্পে নিযুক্ত কর্মী	২০১৩৩২	৩.৩২
গৃহনির্মাণ কার্যে	২৫৮৬২	০.৪২
ব্যবসা-বাণিজ্যে	১৬৯৯৮৮	২.৮১
পরিবহণ, যোগাযোগ, স্টোরেজ	৭০৯৩২	১.১৭
অন্যান্য ক্ষেত্রে	১৮৭৩৮১	৩.০৯
প্রান্তিক শ্রমজীবী	৫৬৭১৬	০.৯৪
কর্মহীন	৪১৯৫৭৫৯	৬৯.৩৪

উপরের সারণীগুলি পর্যালোচনা করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, প্রতিবার জনগণনা বৎসরে ক্রমশ গ্রামের জনসংখ্যার হার কমছে আর শহরের জনসংখ্যার হার ক্রমশ বাড়ছে। এর কারণ মনে হয় রুজি-রোজগারের জন্য বা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার তাগিদে অনেকেই শহরমুখী হচ্ছে। তাছাড়া স্বাধীনতার পূর্বে গ্রামগুলি অনেকটা আত্মনির্ভর ছিল। এ জেলায় লেখাপড়ার তেমন সুযোগ সুবিধাও গড়ে ওঠে নাই। স্বাধীনতার পরে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আসার ফলে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে ও শহরের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে

থাকে কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা শহরেই বা শহরতলীতে বসতি স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। এদের অনেকেই বেশ উচ্চ শিক্ষিত ও এদেশের মুসলমানদের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় ও চাকুরী বিনিময় করেই শহরাঞ্চলেই বসতি গড়ে তোলার আগ্রহী হন। সরকার এঁদের পুনর্বাসনের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এছাড়া বন্যা, মহামারী এসব কারণ তো ছিলই। অপারেশন বর্গা শুরু হওয়ায় অনেকের গ্রামে জমি জায়গায় তাদের পূর্ব অধিকার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে ও তারা গ্রামে জমি-জায়গা রাখা নিরাপদ মনে করেন নাই। ফলে জমি জায়গা বিক্রি করে দিয়ে শহরে চলে আসতে শুরু করেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জনগণনা বৎসর থেকে জাতি ও ধর্মভিত্তিক জনগণনার সূচনা হয়েছিল। পরে এই পদ্ধতি বন্ধ হয়ে যায়। আবার ১৯৫১ সাল থেকে সরকারের তপসিলী জাতি ও উপজাতিদের সংরক্ষণের স্বার্থে জাতি ও ধর্মভিত্তিক জনগণনা শুরু হয়। সরকার আবার ২০০১ সাল থেকে জাতিভিত্তিক জনগণনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কারণ এর ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে নানারকম উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত; হিন্দুদের তুলনায় অন্যান্য সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলমান, ক্রীশ্চান ও শিখদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, অবশ্য জৈন ও বৌদ্ধদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। এগুলি ছাড়া অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনে হয় অন্য জেলা বা অন্য রাষ্ট্র থেকে এ জেলায় অনুপ্রবেশের ফলেই এই বৃদ্ধি।

পশ্চিমবঙ্গে তপসিলী জাতির সংখ্যা ৫৯ ও উপজাতির সংখ্যা ৩৮। সব জেলার ক্ষেত্রেই এই তালিকা প্রযোজ্য।

তপসিলী জাতি : ১. বাগ্‌দি, দুলে, ২. বাহেলিয়া, ৩. বাইতি, ৪. বানতার, ৫. বাউড়ি, ৬. বেলদার, ৭. ভোগ্‌তা, ৮. ভুঁইমালী, ৯. ভুঁইয়া, ১০. বিঁদ, ১১. চামার, চর্মকার, রবিদাস, রুইদাস, ঋষি, ১২. চাউপাল, ১৩. দাবগার, ১৪. দামাই (নেপালী), ১৫, ধোবা, ধোবী, ১৬. দোয়াই, ১৭. ডোম, ধাংগর, ১৮. দোসাদ, দুসাদ, ধারী, ধারহি, ১৯. ধাসি, ২০. গন্‌রি, ২১. হালালখোর, ২২. হাড়ি, মেথর, মেতর, ভাঙ্গি, ২৩. জেলিয়া, ধাংগর কৈবর্ত, ২৪. ঝালোমালো, মালো, ২৫. কাদার, ২৬. কামী, ২৭. কানড্রা, ২৮. কান্‌জান, ২৯. কেওরা, ৩০. কারেংগা, কোরাংগা ৩১. কাউর, ৩২. কেওট, কেউট, ৩৩. খয়রা, ৩৪. খটিক, ৩৫. কোচ, ৩৬. কোনাই, ৩৭. কোনওয়ার, ৩৮. কোটাল, ৩৯. কুরুরিয়ার, ৪০. লালবেগী, ৪১. লোহার, ৪২. মনহার, ৪৩. মাল,

৪৪. মাল্‌লাহ্‌, ৪৫. মুশাহার, ৪৬. নমঃশূদ্র, ৪৭. নাট, ৪৮. নুনিয়া, ৪৯. পালিয়া, ৫০. পান, সাওয়াশী, ৫১. পাশী, ৫২. পাট্‌নি, ৫৩. পোদ্‌, পৌন্ড্র, ৫৪. রাজবংশী, ৫৫. বাজোয়ার, ৫৬. সারকী, ৫৭. শুঁড়ি (সাহাব্যতীত), ৫৮. তিয়র, ৫৯. তুরি।

তপসিলী উপজাতি : ১. অসুর, ২. বৈগা, ৩. বেদিয়া, ৪. ভূমিজ, ৫. ভূটিয়া, সেরিপা, টোটো, দুক্‌পা. কাগাটে, টিবেটান, ইয়োলমো, ৬. বির্‌হোর, ৭. বিরজিয়া, ৮. চাক্‌মা, ৯. চেরো, ১০. চিক্‌বারাইক, ১১. গারো, ১২. গোণ্ড, ১৩. গোরাইট, ১৪ হাঁজৎ, ১৫. হো, ১৬. কারমালি, ১৭. খারওয়ার, ১৮. খোন্‌দ, ১৯. কিষাণ, ২০. কোয়া, ২১ কোরওয়া, ২২. লেপ্‌চা, ২৩. লোধা, খেরিয়া, খরিয়া, ২৪. লোহরা, লোহ্‌রা, ২৫. মাগ, ২৬. মাহলি, ২৭. মাহলি, ২৮. মালপাহাড়িয়া, ২৯. মেচ, ৩০. ম্রু, ৩১. মুনডা, ৩২. নগেশিয়া, ৩৩. ওরাঁও, ৩৪. পারহাইয়া, ৩৫. রাভা, ৩৬. সাঁওতাল, ৩৭. সাওরিয়া পাহাড়িয়া, ৩৮. শভর।

বর্তমানে আবার ও.বি.সি. (O.B.C.) অর্থাৎ সরকারী ভাবে স্বীকৃত কিছু পশ্চাদ্‌পদ জাতির তালিকা তৈরী হয়েছে। অর্থাৎ ক্রমশ বর্ণ-হিন্দুর সংখ্যা সংকুচিত হচ্ছে। ক্রীশ্চান ও মুসলমানগণও চাকুরী বা অন্যান্য লাভজনক ক্ষেত্রে তপসিলী জাতির মত সংরক্ষণ অধিকার দাবীর আওয়াজ তুলেছে। নারীরাও চায় বিশেষ অধিকার, নারীদের মধ্যে যারা তপসিলী জাতিভুক্ত তাদের জন্য চাই পৃথকভাবে আসন সংরক্ষণ। এইভাবে মেরুকরণ প্রক্রিয়া কার্যত বিচ্ছিন্নতাবাদকেই মদত যোগাবে বলেই অনেকেই মনে করছেন। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ নিয়ে ও স্বাধীনোত্তর ভারতে ভাষাভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিকে মদত দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিকদল রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য যে খেলায় মেতেছেন, তাতে জাতীয় সংহতি ভেঙে পড়তে বাধ্য। যদিও এ সমস্ত চিন্তাভাবনা সামগ্রিকভাবে সমগ্র দেশের ব্যাপার; তবু এ জেলা তো তার প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে না।

এগারো অধ্যায়



ভাষা

নানান্ দেশের নানান্ ভাষা
বিনা স্বদেশের ভাষা পুরে কি আশা?

রাঢ়ের মধ্যমণি বর্ধমান জেলার অধিবাসীদের প্রধান ভাষা বাংলা। বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা নেই। তবুও জেলার ভৌগোলিক পরিবেশে জীবিকার সন্ধানে ও বিভিন্ন অঞ্চলে সঞ্চিত নানা প্রকার সম্পদের আকর্ষণে ঐসব অঞ্চলে নানা জাতি নানা গোষ্ঠীর জনসমাবেশ ঘটে। এর ফলে জেলার বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া মহকুমায় প্রধানত বাংলা ভাষাভাষীর প্রাধান্য হলেও এই জেলায় সর্বত্র সাঁওতাল, কোঁরা, উর্দু ভাষাভাষী মুসলমান, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সদর, কালনা, কাটোয়া মহকুমায় বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ৯০ শতাংশ যেখানে সমগ্র জেলায় বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ৮২.৩৪ শতাংশ (১৯৯১ সেন্সাস অনুযায়ী)। কিন্তু আসানসোল, দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার পর থেকে ঐ সব অঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নানা ভাষাভাষী লোকের সমাবেশ ঘটেছে, যার ফলে ১৯৬১ সালের জনগণনা রির্পোট অনুযায়ী এই অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা এই অঞ্চলের জনসংখ্যার ৬৩.৪১ শতাংশের বেশী নয়। এই অঞ্চলের কয়লাখনি আবিষ্কারের পর থেকেই বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যভারত, উড়িষ্যা থেকে নানা জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটতে থাকে। এই শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে শিল্পায়নের অগ্রগতির ফলে এ অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষী ছাড়া অন্য ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৬১ সালের জনগণনার হিসাবে দেখা যায় এ জেলায় কমপক্ষে ৫৫টি ভাষাভাষী লোকের বাস ছিল তার মধ্যে ১১টি ভাষাভাষী ছিল অভারতীয়।

নিচের তালিকা থেকে ১৯০১, ১৯৩১ ও ১৯৬১ সালের জেলার জনসংখ্যার অনুপাতে প্রধান প্রধান ভাষাভাষী জনগণের হ্রাস-বৃদ্ধির হারের একটা চিত্র পাওয়া যাবে।

	১৯০১	১৯৩১	১৯৬১
জেলার মোট লোকসংখ্যা	১৫৩২৪৭৫	১৫৭৫৬৯৯	৩০৮২৮৭৫
বাংলা ভাষাভাষী	১৪০৯৬০৬	১৩৭৩৫৩২	২৫৩৮৭০৭
শতকরা হার	৯১.৯৮	৮৭.১৬	৮২.৩৭
হিন্দী ভাষাভাষী	৭৩২৯২	৮১২৫৯	২৬২৪৮৬
শতকরা হার	৭.৭৮	৫.১৫	৮.৫১
সাঁওতালী	৩৯৪২৮	৯১৫৩৫	১৫০৬৪২
শতকরা হার	২.৫৭	৫.৮০	৪.৮৮
উর্দু	১২০৯	১০৬২৫	৭৩৮০৭
শতকরা হার	০.০৮	০.৬৬	২.৩৯
উড়িয়া			১৭৫১১
শতকরা হার	...	...	০.৫৬
নেপালী	...	...	৫৪৫৯
শতকরা হার	...	...	০.১৭

উড়িয়া ও নেপালীদের অধিকাংশই floating অর্থাৎ অস্থায়ী। উড়িয়াদের ও নেপালীদের নারী-পুরুষের হারের দ্বারাই এটা সমর্থিত হয়। উড়িয়াদের ১৭৫১১ জনের মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র ২০৩৮ অর্থাৎ পুরুষদের অনুপাতে ১১.৬৩ শতাংশ আর নেপালীদের ৫৪৫৯ জনের মধ্যে নারী ১৩৪৩ মাত্র অর্থাৎ ২৪.৫০ শতাংশ। এই সমস্ত উড়িয়া ও নেপালীদের অধিকাংশ জীবিকার সন্ধানে এই জেলায় আসে ও কাজ বা ব্যবসা শেষ হয়ে গেলেই দেশে ফিরে যায়। উড়িয়াদের অনেকেই মাটি কাটার কাজে বা রান্নাবান্নার কাজে খুবই দক্ষ। আবার কেউ কেউ পাথরের থালা-বাটিও বিক্রি করতে আসে। নেপালীদের পুরুষ ও মেয়ে উভয়েই শীতের দিনে উলের পোশাক, কম্বল ও উল নিয়ে আসে। আবার মরসুম শেষ হলেই দেশে ফিরে যায়। কাবুলি-ও এ জেলায় কিছু কিছু দেখা যায়, তারা সাধারণত হিং জাতীয় জিনিস, কাপড়-এর ব্যবসা করতে আসে। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে ধারে বিক্রয় করে আর বৎসরান্তে টাকা আদায়ের সময় সুদশুদ্ধ আদায় করে নিয়ে দেশে ফিরে যায়। তবে অবশ্য কিছু কিছু কাবুলি এ জেলায়

সুদের কারবার জমিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে ও এখানে ঘরবাড়ি পেতেছে। সাঁওতাল, উড়িয়া, কাবুলি এদের অধিকাংশই নিজেদের মধ্যে যথাক্রমে সাঁওতালি, উড়িয়া ও কাবুলিদের দেশীয় ভাষায় কথা বলে কিন্তু বাঙালীদের সঙ্গে কাজ চালাবার জন্যে ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলে। কেউ কেউ আবার বাংলাটা ভালভাবে রপ্ত করে নেয়। এদেশের যাঁরা বনেদী মুসলমান তাঁরা নিজেদের মধ্যে উর্দুতে ও বাইরের লোকের সঙ্গে বাংলায় কথা বলেন।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে অষ্ট্রিকদের পরে আসে দ্রাবিড়ভাষী ও ব্রহ্ম-তিব্বতীয় অর্থাৎ মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী। এই সমস্ত জাতিকে পরাভূত করে যারা এ জেলায় বসবাস করে তাদের বংশধরেরাই বাংলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এই সমস্ত বর্ণ হিন্দুদের পূর্বপুরুষ।

জেলার ভৌগোলিক পরিবেশ, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংঘাত ও গ্রামজীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি বিচার করলে জেলার অধিবাসীদের ভাষায় বৈচিত্র্যের সূত্র মিলবে।

G. A. Grerson-এর মতে সদর, কালনা, কাটোয়ার বাংলা ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে গ্রাম-শহরের শিক্ষিত ও উচ্চবর্ণের মানুষ বিধিসম্মত প্রামাণিক বাংলায় কথা বলে। প্রাকৃত অপভ্রংশ অর্থাৎ বাংলার কেন্দ্রীয় শাখা থেকে এই ভাষার উদ্ভব। আর আসানসোল দুর্গাপুর মহকুমার ল্যাটেরাইট অঞ্চলের উপরিউক্ত শ্রেণীর ভাষা মাগধী অপভ্রংশ; পাশ্চাত্যশাখা থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ কিছুটা বিহারী টান লক্ষ্য করা যায়। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, নারী ও নিম্নশ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে গ্রামেগঞ্জে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে নানা আঞ্চলিক ভাষা গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত আঞ্চলিক ও দেশী ভাষার অধিকাংশ অষ্ট্রিক ভাষা থেকে উদ্ভূত। আজও জেলার গ্রামের নিম্নশ্রেণীর মানুষ ও অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে গণনার ক্ষেত্রে 'এক কুড়ি', 'দুই কুড়ি', 'তিন কুড়ি' এবং 'চার কুড়ি' বা ৮০-তে এক পণ গণনার রীতি আছে। এই রীতি অষ্ট্রিক থেকে উদ্ভূত। সাঁওতালী ভাষায় উপুন/পণ কথার অর্থ চার, পরিবর্তিত অর্থ ৮০। পণ, গোণ্ডা/গোণ্ডা অষ্ট্রিক শব্দ। জেলার আঞ্চলিক ও দেশীয় শব্দ ভাণ্ডারের কতকগুলি শব্দের নমুনা দেওয়া হলো যেগুলির উৎস অষ্ট্রিক ভাষা।

খাঁ-খাঁ করা, খাঁখার দেওয়া (যেমন গলা খাঁকারি), বাখারি (চেরা বাঁশ) বা বাতা, বাদুর, কানি (ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা), ঠেঙ্গ বা ঠ্যাং (পায়ের নিম্নভাগ, যেমন ঠ্যাং ছড়িয়ে বসা), ছোট, খোস, ঠোঁট, পাগল, বাসি, ছাঁচ, ছাঁচতলা, কলি (চুন), ডোম্বী/ ডোম, চাঙ, চোঙা (চোঙ্গা প্যান্ট), বোয়াল (মাছ), দা (—জল), দামু (পবিত্র—যেমন দামুদর নদী), বেগুন, পগার (পগার পার করে দেওয়া), গড়

(গড়তালিত), বরজ (পানের), লাউ, কলা, কামরাঙা, ডুমুর, দহ/দ (জলের গর্ত), ঢেঙিক/ঢেঁকি, মোটো/মোটা, ছুছু (আচারঙ্গ সূত্র—তুতু), চুচু (কুকুর বা কুকুর ডাকার শব্দ), জুলি (নয়ন জুলি—রাস্তার ধারে নালা), জোল, ভিটা, কুণ্ডু (দ্রাবিড় ভাষাজাত)

ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের মতে (বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব) আর্য ও অনার্য ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর এই টানা ও পড়িয়ান মিলাইয়া হিন্দু সভ্যতার বস্ত্রবয়ন করা হইল।

এছাড়া জীবনের প্রথমার্ধে সরকারী চাকরীর সুবাদে জেলার বিভিন্ন অংশে ঘুরতে হওয়ায় সেইসব অঞ্চলের ইতর (আদি অর্থে) মানুষজনের সঙ্গে মিশে কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দ ও প্রবাদ সংগ্রহ করেছিলাম। তার কিছু নমুনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তালিকাগুলি পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
মুন্‌কি করা	মন কেমন করা	চাঁচি	খুব ঘন ক্ষীর
কেরাচিনি	কেরাসিন তৈল	ছেরাদ্দ	শ্রাদ্ধ
মরিচ বা ঝাল	শুকনা লঙ্কা গোল মরিচ	বছরকি	বাৎসরিক পিন্ডদান
ছাঁচি তেল	সরিষার তেল	থোয়া	রাখা
পুস্ত	পোস্ত	জান	প্রাণস্বরূপ
হুঁপো বা মোষের শিং	চিচিঙ্গা	বাপজান	স্নেহের সম্বোধন
মাছের ঝালদে	ঝাল দিয়া	বিয়োন	প্রসব হওয়া
ফেনাভাত	ফেন শুদ্ধ ভাত	জল করা	মাঠের জল ভরা
বীচ করা বা টানা	ধানের বীজ ধান তোলা	খেঁড়ো	তরমুজ জাতীয় সব্জী বিশেষ
কদু	লাউ		
চোঁচালি	বাখারী চাঁচার অবশিষ্ট	মরাই	ধানের গোলা
ভুঁড়	মরাই বাঁধার ভিত	ভাটি দেওয়া	খড়ের চাল-এর খড়ের ওপর খড় বিছানো
পালুই দেওয়া	খড়ের গাদা	ভরম দেওয়া	খড়ের গাদার মুদুনি
এক মেটে	একবার মাটি ধরান	দু মেটে	দ্বিতীয়বার মাটি ধরান
নিকোন	গোবরমিশ্রিত জল দিয়ে মেঝে পরিষ্কার	মারুলি	সকালবেলায় উঠানে বা বার দরজায় গোবরজল দিয়ে গোলাকৃতি পরিমার্জন
ছড়া দেওয়া	গোবরজল ছিটানো		
মাটা	Cheese	শ্বেতপুরুতে	পুনর্নবা বিশেষ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
গয়লানটে	শাকবিশেষ	গাধাপুরুতে	শাক বিশেষ
নাদ	গরুর বিষ্ঠা	ডিঙ্‌লি	মিষ্টি কুমড়া
গইলে পাইলেছে	গলে পালিয়েছে	আবঙ্‌	সাদাসিধে
আদেখ্‌লেপনা	লালসাপ্রবণ	পাল খাওয়ানো	গাই গরুকে ষাঁড় দেখানো
গরু গরম হওয়া	গরুর Heat আসা	আটন	দেবতার বেদী
আকা	উনান	আঁদারে পাঁদারে	এখানে সেখানে
আনকো	অপরিচিত	আঁদুটি	অন্ধকার
আঁজির	পেয়ারা বিশেষ	খড়িটে করা	মাটির দেওয়ালে মাটির পলস্তরা লাগানো
ঘ্যাঁট	কচুকুমড়ো ঘাঁটা তরকারী	লাবড়া	ঘাঁটা তরকারী
সরসরি	লাউ-এর তরকারী বিশেষ	নারব	পারব না
মাগের ভেড়ো	স্ত্রৈণ	পেঁচোয় পাওয়া	শিশুদের রোগ বিশেষ
টক্‌	অম্বল	রগড়	রসিকতা
বাগান চচ্চড়ি	ছেঁচড়া জাতীয় তরকারী	নেওটা	স্নেহের
গুমোর	গর্ব	গরম হওয়া	গর্ব করা বা রেগে যাওয়া
আদি পদি	শেষ	আকাবাকি	তাড়াতাড়ি
একলা ষেঁড়ে	ঈর্ষাকাতর	ভাগা দেওয়া	মাছের ভাগ দেওয়া
আজল	সাদাসিধে, বোকা	আজুলি	সাধাসিধে স্ত্রী
আজলামো	ন্যাকামো	আতানে বাতানে	নির্জনে

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
আদার-বাদার	জঙ্গল	আন	আত্মসম্মান
আড়োল	যে ষাঁড়কে ভাল ভাবে মুষ্কহীন করা হয় নাই	আওবাতুলি	অর্ধবাতুল
আবোর্	অবোধ	আইবুড়ো	অবিবাহিত
কুইলে বাছুর	ছোট, নবজাত	আড়মোড়ভাঙ্গা	অলস্য ঝেড়ে ফেলা
কোঁক কুক্ষি	গর্ভ, জরায়ু	কুয়েলাগা	পোকালাগা
কয়ো	কাক	কেঁটেলি	বাহাদুরি
হাবাগোবা	যে চালাক চতুর নয়	গাড়া	পোঁতা
গাঁদি লাগা মাছের	জমায়েত হওয়া	গগানো	রোগে পড়ে থাকা
ঘসি	ঘুঁটে	গাঁতাপড়া	পালাপড়া
দোঁক	রাস্তার মাঝে গভীর গর্ত	কড়ুইরাঁড়ী	বাল্যবিধবা
ভুলুক	ছোট গর্ত	হাঁড়োল	বড় গর্ত
জাড়াচ্ছে	শীত লাগছে	চেংড়া	ফাজিল ছেলে
চ-চ	চল চল	মুখ ওল	মুখ ভারী
আগুড়	বাতার তৈরী অস্থায়ী দরজা	চা	তাকানো
নিড়ানো	ধানের ক্ষেতের আগাছা তোলা	পাখ্না	ধানের জমিতে দ্বিতীয় চাষ
ভুজনো	অন্নপ্রাশন	ঢেমনি	অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক
চেল্লান	চিৎকার করা	গাছ উলে যাওয়া	ফল পাকতে শুরু করা
ফলনা	অমুক	গেঁড়াকল	কূট কৌশল
		ডোক্লা	অবিমৃষ্যকারী, যে অযথা নষ্ট করেন

বারো অধ্যায়



বাসগৃহ

সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে যেদিন থেকে জনগোষ্ঠী যাযাবর ও পশুচারণ বৃত্তি ত্যাগ করে বসতি স্থাপন করে, সেদিন থেকেই বাসগৃহ নির্মাণের সূচনা। বাসগৃহ নির্মাণে স্থানীয় উপকরণই প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে রাজা-রাজড়াদের ব্যাপার আলাদা। তাদের প্রাসাদ, গড় নির্মাণের জন্য ইট, পাথর, চুন এসব ব্যবহৃত হয়। আগেও হত। অবশ্য আজকাল ইটের থেকে প্রাচীনকালের ইটের আকার আয়তন সব আলাদা।

আউসগ্রাম থানার ৫২ নং পাণ্ডুক মৌজা ও নিকটবর্তী গোস্বামীখণ্ডের ঢিবি খননকার্যের ফলে যে সব গৃহের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে তার থেকে জানা যায় গৃহতল ছিল ল্যাটেরাইট কাঁকর পেটানো, চুনের আস্তরণ দেওয়ায় কাঠের খুঁটির গর্তের ছাপযুক্ত; পোড়া মাটির ফলকও পাওয়া গেছে। এখানে যে চোদ্দটি মানব-সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে কতকগুলিতে মুণ্ডহীন নরকঙ্কাল ও আর কয়েকটিতে যে মুণ্ড সমন্বিত কঙ্কাল পাওয়া গেছে তাদের আবার পায়ের নীচের দিকটা কাটা। এইসব নরকঙ্কাল পরীক্ষা করে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ যে মত প্রকাশ করেছেন সেগুলি পর্যালোচনা করলে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, স্থানটি ছিল সাঁওতাল বা অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এবং এদের বাসগৃহের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তার থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে এদের বাড়ী ছিল মাটির তৈরী, গৃহতল বা মেঝে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা ও কাঁকর দিয়ে পেটানো, বাঁশ ও কাঠের খুঁটি সম্বলিত পাতার ছাউনি। গৃহগুলি খুব সম্ভবত গোলাকার, আয়তাকার বা বর্গাকার ছিল। যে দালান বা প্রাসাদের নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি সম্ভবত পরবর্তী কোন এক ঐতিহাসিক যুগের কিংবদন্তীর পাণ্ডুরাজার রাজপ্রাসাদ ও গড়। প্রাসাদ নির্মাণে বৃহৎ কিন্তু পাতলা আয়তনের ইট ব্যবহৃত হত। নিকটবর্তী গোস্বামীখণ্ডে যে স্থাপত্য ও দেবায়তন এবং যে শিখিবাহন কার্তিকেয় ও সূর্যমূর্তি পাওয়া গেছে তার থেকে অনুমান, এখানকার স্থাপত্য পরবর্তী কোন এককালের খুব সম্ভবত দশম শতাব্দীর পাল ও সেন যুগের।

ভাতার থানার বাণেশ্বরডাঙায় খননকার্যের ফলে যে বিচ্ছিন্ন গৃহতল ও খুঁটির চিহ্ন পাওয়া গেছে, তার থেকে অনুমান হয় ঘরগুলি ছিল প্রাগৈতিহাসিক কালে অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত জাতির ছোট আয়তনের কুঁড়েঘর।

১৯৬৩ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এককড়ি দাসের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মঙ্গলকোট থানার মঙ্গলকোট গ্রামে পাকা ইটের দেওয়ালের ওপর ৮′/৪′ আয়তনের ছাদ ছিল। তাছাড়া এখানে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মৌর্যযুগের তাম্রমুদ্রাও পাওয়া গেছে। কাজেই অনুমান হয় এখানকার ঘরগুলি মৌর্যযুগের বা তারও কিছু আগের। ভাতার থানার দেবপুর-শ্রীপুরের ঢিবির খননকার্যের ফলে যে ইটের নমুনা পাওয়া গেছে সেগুলির আয়তন বেশ বড়, দেড় ফুট বাই এক ফুট। জনশ্রুতি এখানে দেবপ্রসাদ বলে এক রাজার প্রাসাদ ও গড় ছিল। বর্ধমানের গোদা মৌজায় একটা ঢিবির মত আছে। প্রবাদ—ঐখানে কিংবদন্তীর রাজা গদাধরের প্রাসাদ ছিল।

এই সমস্ত দৃষ্টান্ত ও নিদর্শন থেকে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যে জনবসতির পরিচয় পাওয়া যায় তাদের অধিকাংশ অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত জাতি। তারা ছোট ছোট মাটির কুঁড়ে ঘরে বাস করতো। পরবর্তীকালে যখন সামন্ত রাজারা এই অঞ্চল দখল করে রাজত্ব গড়ে তোলে তারা ইটের প্রাসাদ ও গড়, দেবায়তন প্রভৃতি নির্মাণ করিয়ে রাজত্ব চালায়।

বর্তমান কালে জেলার পল্লীগ্রামের অধিকাংশ বাড়ীই মাটির তৈরী। এখানকার বসবাসকারী পরিবারের অধিকাংশেরই বাড়ী এক কক্ষ বিশিষ্ট বা দুই কক্ষ বিশিষ্ট। এগুলি সাধারণত দরিদ্র বা দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী ব্যক্তিদের। দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাড়ীগুলি নিম্নমধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের। তিন, চার ও পাঁচ কক্ষ বিশিষ্ট গৃহের সংখ্যা আনুপাতিক হারে খুবই কম। অবশ্য কক্ষের সংখ্যা নির্ভর করে পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি ও পরিবারের লোকসংখ্যার ওপর। ১৯৬১ সালের একটি সরকারী সার্ভের রিপোর্টে দেখা যায় গ্রামের পরিবারে লোকসংখ্যা গড়ে ৫.২৫ ও শহরে ঐ সংখ্যা ৪.৯২। দ্রুত শিল্পায়নের ও শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শহরে তো বটেই গ্রামেও ছোট ছোট পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবার-পরিকল্পনা জোরদার করার ফলে মধ্যবিত্ত, ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিটি পরিবার তিন কি চার জনের মধ্যে সীমিত রাখার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার আছে, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বা মুসলমান পরিবারের মধ্যে পরিবার-পরিকল্পনার প্রভাব বিশেষ পড়ে নাই।

১৯৬১ সালের জনগণনার রিপোর্ট থেকে গৃহীত নীচের সারণীতে বিভিন্ন কক্ষের গৃহবিশিষ্ট পরিবারের একটা চিত্র পাওয়া যাবে।

	জেলার পরিবারের সংখ্যা	গ্রামাঞ্চল পরিবারের সংখ্যা	শহরাঞ্চল পরিবারের সংখ্যা	জেলার মোট পরিবারের সংখ্যার অনুপাতের বিভিন্নকক্ষের গৃহবিশিষ্ট মোট পরিবারের হার
	১,১৮,৩১৫	৯৬,৫০৩	২১,৮১২	
এক কক্ষ বিশিষ্ট পরিবার	৭০,২১৭	৫৮,২২৯	১১,৯৮৮	৫৯.৩৪ শতাংশ
২ কক্ষ বিশিষ্ট	২৯,২৫৪	২৩,১৮০	৬,০৭৪	২৪.৭২ („)
৩ কক্ষ বিশিষ্ট	৯,৪১৪	৭,৪৯০	১,৯২৪	৭.৯৫ („)
৪ কক্ষ বিশিষ্ট	৫,৬৫৯	৪,৭৬৪	৮৯৫	৪.৭৮ („)
৫ কক্ষ বিশিষ্ট	৩,৬৭৮	২,৭৪৭	৯৩১	৩.১০ („)

এককক্ষ বিশিষ্ট মাটির বাড়ীর মধ্যে শ্রমিক, ভিক্ষুক, সাঁওতাল, ডোম, বাগ্‌দী প্রভৃতি হতদরিদ্রদের ছিটেবেড়া দেওয়া বাড়ী অর্থাৎ কঞ্চি দিয়ে দেওয়ালের কাঠামো করে কাদার আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া বাড়ী, যার চাল খড়কুটো বা তালপাতা দিয়ে ছাওয়ানো বাড়ীও আছে। অন্যান্য নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের বাড়ীর দেওয়াল ২০ ইঞ্চি থেকে ২৪ ইঞ্চি প্রশস্ত; ৭′/৮′ উচ্চ হয়। এই সব বাড়ীর মাটির চালের কাঠামো পুরানো তালগাছ চেরাই করে যে কাঁড়ি পাওয়া যায়, তাই দিয়ে তৈরী হয়। এর উপর বাঁশ চিরে বাখারি বা বাতা বিছিয়ে দেওয়া হয়। যাদের ক্ষমতা নেই তারা সমস্ত কাঠামোটাই বাঁশ ও বাতা দিয়ে সারে। এর ওপর খড় দিয়ে ছাউনি হয়। নদীর ধারে যাদের বাড়ী, তারা ছাউনির জন্য কেশে ঘাসও ব্যবহার করে। নিম্নশ্রেণীর ও দরিদ্রদের বাড়ী এক চাল বিশিষ্ট বা দুই চাল বিশিষ্ট; অন্যান্য বাড়ী সবই চার চালের হয়। আবার যাদের বাড়ীর সঙ্গে দেবালয় আছে তাদের দেবালয়ের সামনে আটচালা করা হয়। এর চারদিক খোলা, উপরে চারচালের ২/৩ হাত নীচে উপরের চালের সমান্তরাল ভাবে চারদিক আর চারটি চাল নামানো হয়। পূর্বে সৌখিন ও উচ্চবিত্তদের বাড়ী যদিও ছিল মাটির কিন্তু সে মাটির বাড়ী দেখবার মত। সেসব বাড়ীর ছাউনির কারুকার্যই আলাদা। বারান্দা বা দাওয়ায় নকশাকাটা কাঠের খুঁটি, খুঁটির মাথায় অপূর্ব কারুকার্য-শোভিত কাঠের পদ্মফুল, কাঠের হাতি, ময়ূর প্রভৃতি বসান। খুঁটিগুলির মাথায় চালের নীচে লম্বালম্বি ঘরের আয়তন অনুযায়ী ১০′/১২′ লম্বা নকশাকাটা সর্দল। চালের

ছাউনির নীচে সর্দল থেকে মুদুনি (beam) পর্যন্ত ১০′/১২′ লম্বা চার পাঁচটি বিভিন্ন রঙ করা শরকাটি বেতের চিলতে দিয়ে আটি বেঁধে জ্যামিতিক নক্‌শায় সাজানো কাঠামো।

লম্বা খড় দিয়ে ছাওয়ানো—এই সমস্ত চালের মাথাবাঁধা ও ছাঁচকাটার "রূপসী কাজ" এক অপূর্ব শিল্পকর্ম। এই সমস্ত বারুই (head labour)-এর কাজ জেলার লোকশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। বর্তমানে উচ্চফলনশীল ছোট ছোট ধান গাছ থেকে যে খড় পাওয়া যায়, তা দিয়ে এরকম চাল ছাওয়া সম্ভব নয়। খড়ের অভাব, দক্ষ বারুইশিল্পীর অভাবের ফলে, এই চালশিল্প আজ লোপ পেতে বসেছে। তাছাড়া এখন জমিতে দু'বার এমন কি তিনবারও ফসল হচ্ছে। গ্রামেও কিছু লোকের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হয়েছে; ফলে সাধারণ মধ্যবিত্তদের মধ্যে 'করগেট' শীট, এ্যাসবেস্টস শীট বা বার্ণপুর অথবা মগরার টালি দিয়ে ঘরের চাল তৈরীর একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই সমস্ত মাটির বাড়ীর অধিকাংশই একতলা; তবে দ্বিতল বা 'মাঠ কোঠা' বাড়ীও দেখা যায়; দুই তলা তৈরী করতে মাটির পাতলা টালি বা কাঠের তক্তা বিছানো হয়। করগেটের বা এ্যাসবেস্টস-এর তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোতলার ওপরেও টালি বা কাঠের সিলিং করা হচ্ছে। এইসব ঘরের দেওয়ালগুলিও দেখবার মতো। প্রথমে মাটি, বালি ও খড়কুটো খুব ছোট ছোট করে কেটে (দেশীয় ভাষায় যাকে বলে ছানি) কিংবা তুষ বা পাট কুচো দিয়ে ভালো করে পা দিয়ে থেসে দেওয়ালে একমেটে করা, তার ওপর বালি ও মাটি চালুনিতে চেলে নীট পালিশ করার মতো পালিশ করা। এর উদ্দেশ্য এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা, এরকম তুষুটি করা বা উলুটি করা বাড়ী ১০০ বছরও টেকে। এর ওপর whiting বা কলি চুন ফেরানো। বাইরের দেওয়াল ও ঘরের মেঝের দেওয়ালের ডেডো, দরজা, জানলা, খুঁটির বেশীর ভাগই আলকাতরা দেওয়া। তবে এত খরচ করে বাড়ী করতে কেউ চাইছে না। কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রামেও সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরা অনেকেই একতলা বা দোতলা দালান বাড়ী পছন্দ করছে। এরকম খড়িটে করা ও white wash করা বাড়ী ছাড়া অন্য সব মাটির বাড়ীতে অবশ্য রঙ করা থাকে না, কিন্তু একটা রেওয়াজ ছিল; দুর্গাপূজার আগে সমস্ত ঘর ঝেড়ে ধানভুঁই থেকে পলি আনিয়ে তাই দিয়ে দেওয়াল নিকানো। দরজা ও জানলা, খুঁটি ডেডোতে অবশ্য আলকাতরা দেওয়া এই সব বাড়ীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ ছাড়া বাইরের সদর দরজা বা প্রাচীরের সংলগ্ন দরজার দুপাশে একাধিক রঙ গুলে পদ্মফুল ইত্যাদি ছবি আঁকারও সৌখিনতা ছিল। যুগের সঙ্গে তাল রেখে এইসব লোকশিল্পও লোপ পাচ্ছে। সাঁওতাল বা নিম্নশ্রেণীর লোকেদের বাড়ীতে অবশ্য এখনও এরকম গৃহসজ্জারীতি কোথাও

কোথাও দেখা যায়। দরিদ্র শ্রেণী, দলিত ও শ্রমিকদের অবস্থা যথাপূর্বং তথা পরম। তাদের ঘর আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে, কোনরকমে মাথা গোঁজার একটা আস্তানা মাত্র।

শহরের অধিকাংশ বাড়ীই ইটের দালান :_ একতলা, দুইতল বা ত্রিতল। আবার যেখানে Multistoreyed Building গড়ে উঠেছে সেখানে একটা Building-এ শত শত পরিবারের বাস। এই বাড়ীর এক একটা Flat-এ সাধারণত দুটি Living Room, একটি Drawing Room, একটি Kitchen, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট Dining ও Bath। শহরের ধনী ও ব্যবসাদারদের বাড়ীর অধিকাংশই মোজাইক টালি বসানো, বাড়ীর সামনে গাড়ীবারান্দা, ফুলের বাগান ও গ্যারেজ; কিছু কিছু বাড়ীতে দেখা যায়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—চাতুর্বর্ণ্যাং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ (৪/১৩)। গীতার এই বাণীর বাস্তব রূপায়ণ জেলায় অনেক পল্লীতেই দেখা যায়। এই সব জাতি অনুযায়ী এক একটি পাড়া গড়ে উঠেছে। ঠিকানাও সেইমত লেখা হয়। যেমন—ব্রাহ্মণ পাড়া, কায়স্থ পাড়া, বাউড়ী পাড়া, বাগ্‌দী পাড়া, মুসলমান-পাড়া ইত্যাদি। ঐসব ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আগুরি, সদ্‌গোপ প্রভৃতি বর্ণ হিন্দুদের বসতি বা পাড়া সাধারণত গ্রামের মধ্যস্থলেই। বাগ্‌দী, ডোম, মুচি, মুসলমান প্রভৃতিদের বসতি গ্রামের প্রান্তসীমায় পৃথক পাড়ায়। তবে জনসংখ্যা বিশেষ করে মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং শিক্ষা বিস্তারের ও শহরের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে জাতিভেদপ্রথার কঠোরতাও শিথিল হচ্ছে ও মুসলমান, কোটালদের বাড়ী এখন উচ্চবর্ণের পাশাপাশি গড়ে ওঠার প্রবণতা রোধ করা যাচ্ছে না—এ তরঙ্গ রোধিবে কে? শহরের প্রান্তে ডোম, সাঁওতাল, মেথর, কাগজ কুড়ুনির বস্তি—এক চালা, দু'চালা ছিটে বেড়া দেওয়া মাটির ঘর;—ঘন বস্তি। কিছু কিছু স্থানে লম্বা ৫/৬ পরিবারের থাকার উপযুক্ত ইটের বস্তিবাড়ী। এক একটি পরিবারের জন্য এক বা দুই কক্ষ যুক্ত ঘর; এরকম ৪/৫ টি পরিবারের জন্য রান্নাঘর ও একটি মাত্র শৌচাগার; চারিধারে এরকম লম্বালম্বি বস্তিবাড়ীর মাঝখানে একটি টিউবওয়েল। এগুলি সাধারণত কোন কয়লাখনি বা শিল্প কারখানার মালিকদের—তাদের কারখানা বা খনির শ্রমিকদের জন্য। আবার কোথাও দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের জন্য পৃথক কোয়ার্টার। আলোবাতাসহীন অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে গড়ে উঠেছে এইসব বস্তি।

১৯৪৫ সালের ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ড. এস. আর. দেশপাণ্ডে, কস্ট অব্ লিভিং ইনডেক্সের ডাইরেক্টর কয়লাখনি অঞ্চলে কুলীদের অবস্থা সম্পর্কিত এনকোয়ারি রিপোর্টে কুলী ধাওড়া'র যে বিবরণ দেওয়া আছে সেটা

আরও দুর্দশাগ্রস্ত। পিঠে পিঠে লাগানো ধাওড়া, মেঝে সাধারণত কাঁচা। কামরা প্রতি লোকসংখ্যা ৪ থেকে ১০। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পানীয় জলের ব্যবস্থা ইঁদারা বা পুকুর। স্যানিটারী নাই বললেই হয়। পরে অবশ্য আসানসোল মাইনস্ বোর্ড অব্ হেল্থের নির্দেশিকামতে এইরকম ধাওড়ার কিছুটা উন্নতি হয়।

গৃহ নির্মাণের বিভিন্ন উপাদান এবং বিভিন্ন প্রকারের ছাউনি, ছাদ ও দেওয়ালের গঠন অনুযায়ী জেলার গৃহের ধারণা নিম্নের সারণী থেকে পাওয়া যাবে। (১৯৭১ সালের সার্ভে অনুযায়ী)

মোট জনসংখ্যার শতকরা হার	জেলায় গৃহের সংখ্যা	গ্রাম	শহর
	৭,৯৭,৪০০,	৫,৯০,৫৬৫,	২,০৬,৮৩৫
শতকরা হার		৭৪.০৫	২৫.৯৫
ছিটে বেড়া দেওয়া বাড়ী	২০, ৪৮৫	১৫,৮৮৫	৪,৬০০
শতকরা হার		৭৭.৫৪	২২.২৬
মাটির বাড়ী	৪,৭১,১৭৫	৪,৩৮,৩৮০	৩২,৭৯৫
শতকরা হার		৯৩	৭
ইটের বাড়ী	২,৯৫,১২০	১,৩২,০৬৫	১,৬৩,০৫৫
শতকরা হার		৪৪.৭৮	৫৫.২২
করগেট ছাউনি-যুক্ত বাড়ী	২,৮৬০	১,৪৭০	১,৩৯০
সিমেন্ট কংক্রিট	২,০০০	১৫৫	১,৮৪৫

চাল ও ছাদের গঠন অনুযায়ী

	জেলায় গৃহের সংখ্যা	গ্রাম	শহর
খড়ের ছাউনি	৪,১৩,১৮৫	৩,৮২,৬১৫	৩০,৬৭০
করগেট শীটের ছাউনি	৭৬,৬৪০	৫৮,৬৯৫	১৭,৯৪৫
ইট, চুন সুরকি	১১,৯০০	৫,৩২৫	৬,৫৭৫
Concrete R.B.C	১,৯০,০৫৫	৭৪,৮৫০	১,১৫,২০৫
বস্তিবাড়ী প্রধানত দুর্গাপুর ও আসানসোল শিল্পাঞ্চলে	১.০৫,২৪২		

তেরো অধ্যায়



পোশাক-পরিচ্ছদ

কোঁচা লম্বা ক্যাচা টান
তবে জানবে বর্ধমান।

মতান্তরে, কাছা লম্বা কোঁচায় টান
জানবে তবে বর্ধমান।

বর্ধমান জেলার অধিবাসীদের পোশাকের এই বৈশিষ্ট্য বর্তমানে ছড়ায়/প্রবাদে পর্যবসিত। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্ধমানবাসীর সাজপোশাকেরও বিবতন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"নতুন নতুন কালের প্রেরণায় নতুন নতুন রূপ আপনাকে ব্যক্ত করতে থাকে এবং এই উপায়েই কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তবে সে আপনার শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। সেই পরিবর্তমান আদর্শের অনুবৃত্তির দ্বারা পুরাতন কালের ভিত্তির উপরেই নতুন কালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে।" মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাঙালী হিন্দুদের চিরাচরিত পোশাক ধুতি আর চাদর। এই ধুতির এক তৃতীয়াংশ কাছার জন্যে ছাড় দিয়ে কোমরে শক্ত করে জড়িয়ে, ছেড়ে রাখা ১/৩ অংশে পিছনে কোমরে টান করে গুঁজে কাছা দেওয়া হয়। বাকী ২/৩ অংশ ২" মত তুনট করে সামনে কোঁচা দেওয়া হয়। গায়ে চাদর জড়ানো হত, পায়ে থাকতো খড়ম বা তালতলার চটি। তবে পল্লীগ্রামের বেশীর ভাগ লোকই খালি পায়েই চলাফেরা করত। গ্রামের পুরোহিত শ্রেণীর বা প্রাচীনপন্থীর কেউ কেউ এই রকম পোশাক পরলেও, এখনও সাধারণ মানুষ গ্রামের মধ্যে চলাফেরা করার সময় ধুতি, ফতুয়া বা গেঞ্জি আর চটি ব্যবহার করে। গ্রামের বাইরে যাবার সময় ধুতি, ধুতির নীচে অন্তর্বাস, গেঞ্জি, শার্ট বা পাঞ্জাবি ও পায়ে চটি, স্যাণ্ডেল বা পাম্প সু ব্যবহার করে। যুবক ও

প্রৌঢ়রা প্যান্ট, হাওয়াই শার্ট বা English Style Shirt, বুট জুতো, কাবলী স্যাণ্ডেল এইসব ব্যবহার করে। স্কুলের ছাত্ররা স্কুলড্রেস বা বাড়ীতে পাতলুন বা পায়জামা বা হাফপ্যান্ট পরে। অধিকাংশ যুবক ও বয়স্কদের বাড়ীতে লুঙ্গি বা ছোট ধুতি আর গায়ে গেঞ্জি বা ফতুয়া পরার রেওয়াজ হয়েছে। পায়ে সাধারণত হাওয়াই চটির খুব চলন হয়েছে। জামার মধ্যে নানা চিত্র-বিচিত্র রঙীন হাওয়াই শার্টই বেশী পছন্দ। আবার শহরে ছেলে ছোকরাদের মধ্যে চলন হয়েছে হাঁটু পর্যন্ত হাফ পাতলুন যার চলতি নাম 'বারমুডা'। যুবকদের প্যান্টের প্যাটার্নের পরিবর্তন হচ্ছে বছর বছর—একটা নতুনত্ব আনার প্রচেষ্টা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সিনেমা-নায়কদের পোশাকের অন্ধ অনুকরণ—চোঙাপ্যান্ট, ঢোলাপ্যান্ট। শহরে তো যুবতীদের মধ্যে টাইট প্যান্ট ও টাইট হাওয়াই শার্টের প্রচলন হয়েছে—অবশ্য Ultra modern family-এর মেয়েদের মধ্যে।

পল্লীগ্রামে ৫০/৬০ বছর আগেও কায়স্থ, বৈদ্য, উগ্রক্ষত্রিয় (আগুরি), সদ্‌গোপ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের বয়স্ক মেয়েরা চওড়া পাড় মিলের শাড়ী ব্যবহার করতো। বাইরে বের হবার সময় অবশ্য সেমিজ (বর্তমানের কতকটা ম্যাক্সির মত) অন্তর্বাস হিসেবে পরতো, তার ওপর ধনেখালি, টাঙ্গাইল-এর চওড়া পাড় সাদা শাড়ী ব্যবহার করতো। পায়ে জুতোর বালাই ছিল না। সধবাদের হাতে লোহা, শাঁখা, সিঁথি ও কপালে সিঁদূর ছিল অপরিহার্য। যুবতী মেয়েরা রঙীন তাঁতের শাড়ী, ব্লাউজ ও শায়া বা পেটিকোট পরে বের হতো। আর বয়স্ক বিধবারা শুধু থান ধুতি কিংবা সরু চুল পাড় বা নরুন পাড় ধুতি পরতো; ব্লাউজ, শায়া, জুতোর কোন ব্যবহার ছিল না। ছোট ছোট মেয়েরা ফ্রক, প্যান্টি আর ছেলেরা ইজের হাফ শার্ট পরতো। আর ২/৩ বছরের ছেলেমেয়েদের ছোট প্যান্টই যথেষ্ট ছিল। অনেক ক্ষেত্রে উলঙ্গ হয়েও ঘুরে বেড়াতো।

তারপর ধীরে ধীরে শহরের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-পুরুষ সবার পোশাকের পরিবর্তন হতে থাকে। মেয়েদের সেমিজের জায়গা নিয়েছে ব্রেসিয়ার, হাতকাটা বা কনুই পর্যন্ত ব্লাউজ, শায়া। যুবতী মেয়েদের পছন্দ ভয়েল, মাদ্রাজী, নানা রঙের প্রিন্টের মিডি, ম্যাক্সি, মিনি; আর বাইরে বের হতে হলে সালোয়ার পাঞ্জাবী আর একটা ওড়নার মত চাদর; পায়ে হিল-উঁচু সৌখিন জুতো। হিন্দু বিধবাদের থান বা নরুন পাড় কাপড়ের বদলে ইঞ্চি পাড় শাড়ী, শায়া, ব্লাউজ পায়ে চটি। যুগের সঙ্গে তাল রেখে সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের অনুকরণে দিন দিন পোশাকের বিবর্তন ঘটে চলেছে। ইংরেজরা গেছে

যত দিন যাচ্ছে তাদের Culture-এর অনুকরণে পোশাকেও ইংরেজী

কালচারের অনুপ্রবেশ ঘটতে চলেছে। কিন্তু এই বাংরেজী পোশাকের ব্যঙ্গ করে কোন কবির কলম থেকে আর বের হচ্ছে না—"পরের মুখের শেখা বুলি পাখির মতো কেন বলিস, পরের ভঙ্গী নকল করে নটের মতো কেন চলিস?" এ ধারা চলবে—এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

নিম্নবর্ণের পুরুষদের ছোট ধুতি, হাফ শার্ট ও হাওয়াই, কাঁধে গামছা পায়ে হাওয়াই চপ্পল। যুবকদের মধ্যেও প্যান্ট, লুঙ্গি, গেঞ্জি ও হাওয়াই চপ্পল। মেয়েদের রঙীন তাঁতের শাড়ী, শায়া, ব্লাউজ, বয়স্কারা এখনও সাদা শাড়ীই পরেন। সাঁওতালদের ছেলেদের মধ্যে প্যান্ট, হাওয়াই, স্যান্ডেল চল হয়ে গেছে। বয়স্কদের ছোট কাপড় নেংটির মতো কোমরে জড়ানো, গায়ে গামছা, খালি পা এখনও পছন্দ। মেয়েদের রঙীন শাড়ী, ব্লাউজ মাথায় রুপোর গয়না পরার খুব শখ। বয়স্ক সাঁওতাল মেয়ে ছোট ইঞ্চিপাড় কাপড় কোমরে জড়ানো ও বুকের ওপর এক টুকরো পিঠ পর্যন্ত জড়ানো। জেলার মুসলমান পুরুষরা রঙীন লুঙ্গি, পাযজামা, হাওয়াই শার্ট বা হাফ শার্ট পরে। নমাজের সময় প্রতিটি মুসলমানকে সাদা টুপি —অভাবে রুমাল মাথায় জড়িয়ে নমাজ করতে হয়। অভিজাতগণ চুড়িদার, পায়জামা, জোব্বা বা শেরওয়ানি ও মাথায় ফেজটুপি, পায়ে নাগরা জুতো পরে বাইরে বের হন; ঘরে লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে থাকেন। মেয়েরা শাড়ী, ব্লাউজ, শায়া, ব্রেসিয়ার পরে। বাইরে বের হলে অনেকেই বোরখা পরে, যুবতী ও ছোট ছোট মেয়েরা সালওয়ার পায়জামা ও ওড়না পরে। তবে বোরখার প্রচলন ক্রমেই কমে আসছে। বিবাহিত মহিলারা হিন্দুদের মতো শাঁখা সিঁদুর লোহা ব্যবহার করে না, তবে হাতে কাঁচের চুড়ি ও কপালে অনেকে টিপ ব্যবহার করে।

চোদ্দ অধ্যায়



জাতি

বিষ্ণুপুরাণে আছে—পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ সত্যধ্যানপরায়ণ জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথমে সত্ত্বগুণবহুল প্রজাগণ জন্মিয়াছে। বক্ষ হইতে রজোগুণপ্রধান প্রজাসকল উৎপন্ন এবং রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন প্রজাগণ উরুদেশ হইতে জাত। হে দ্বিজ সত্তম। ব্রহ্মা পাদদ্বয় হইতে তমঃপ্রধান অন্য প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতেই এই চাতুর্বর্ণ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে মুখ, বক্ষঃস্থল, উরু ও পাদ হইতে উৎপন্ন।

কিন্তু গীতা অনেক Practical; গীতায় ভগবান বলেছেন চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ। অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।

কোন জাতি প্রথমে এ জেলায় বসতি স্থাপন করেছিল সে সম্বন্ধে এখনও তর্কের অবকাশ আছে। গ্রীক বিবরণ থেকে জানা যায় গঙ্গারীডিতে ডোম, বাগদী প্রভৃতি অন্ত্যজের বাস ছিল। ঐতরেয় আরণ্যকের "বয়াংসি বঙ্গবগধশ্চের পাদাঃ" পদের 'বগধা' থেকে যদি বাগ্‌দী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় তাহলে এখানকার আদিম জাতি বাগ্‌দী বলেই ধরতে হয়। মহাবীর তীর্থঙ্করের পিছনে কুকুর লেলানোর বিষয়টিতেও বাউড়ী, বাগ্‌দীদের টোটেমের পরিচয় মেলে। খননকার্যের ফলে দুর্গাপুরে যে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে এবং পাণ্ডুরাজার ঢিবি, সাঁওতালডাঙ্গা, বাণেশ্বরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে যে নরকঙ্কাল ও অন্যান্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তার থেকে নৃতাত্ত্বিক বিচারে অনুমান করা হয় যে, এ জেলায় আর্যদের আগমনের পূর্বে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত নিষাদ ও সাঁওতালদের বসবাস ছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে নিষাদ জাতির পরে আসে দ্রাবিড় ও ব্রহ্মাতিব্বতীয় বা মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠী। রাজপোতাডাঙ্গায় পোড়া চাল ও তুষের নমুনা পাওয়া গেছে, সাঁওতালডাঙ্গায় ও বাণেশ্বরডাঙ্গায় অনেক প্রস্তর, হাড় ও অস্ত্রশস্ত্রের অংশবিশেষ

পাওয়া গেছে। এইসব নমুনা থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ জেলায় যে জাতিই বাস করুক তাদের উপজীবিকা ছিল পশুপালন, কৃষি ও যুদ্ধবিদ্যা। দামোদরের দক্ষিণে বাগ্‌দী রাজা শনি ভাঙ্গড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালু ডোম ছিল ধর্মমঙ্গলোক্ত ইছাই ঘোষের সেনাপতি। এই আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে অতি প্রাচীনকালে এখানে বাগ্‌দী, ডোমদের প্রাধান্য দেখা যায়। পরে অবশ্য গোপদের প্রাধান্য দেখা যায় গোপভূমে। এই গোপভূমে এককালে বর্তমান গোপ (গয়লা) ও সদ্‌গোপদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপত্তি ছিল। গোপ রাজাদের কীর্তিকাহিনী এখনও সুয়াতা, ভালকী, অমরাগড়, কাঁকসা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

প্রাচীন অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত ও দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলীয়দের পরাভূত করে যাঁরা এদেশে বসতি স্থাপন করেন তাদের বংশধরেরাই জেলায় আজকের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি অ্যালপাইন গোষ্ঠীভুক্ত বর্ণহিন্দুর পূর্বপুরুষ। তবে প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থর সংখ্যা ছিল কম। ফলে অনার্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে বর্ণসংকরের সৃষ্টি হয়।

স্মৃতিগ্রন্থের লেখকরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে ভারতীয় সমাজকে বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময় এই গোষ্ঠীর বাইরে অসংখ্য বর্ণ, জন, কোম বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক বর্ণ ও কোমের মধ্যে ছিল অসংখ্য স্তর ও উপস্তর। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে চতুর্বর্ণ বহির্ভূত অসংখ্য বর্ণ ও কোম গোষ্ঠীভুক্ত নরনারীর সঙ্গে বর্ণহিন্দুদের যৌন মিলনের ফলে বিচিত্রতর বর্ণসংকর সৃষ্টি হয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছাড়াও ছিল অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) ও করণ (কায়স্থ), তারপর শংখকার (শাঁখারী) মোদক (ময়রা), তন্তুবায়, দাস (চাষী), কর্মকার ইত্যাদি সংকর বর্ণের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত জাতিকে উত্তম সংকর জলচল জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বল্লালচরিতের কাহিনী অনুসারে স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, ধীবর, রজকদের জল-অচল মধ্যমসংকর পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে উত্তম সংকরের সংখ্যা ২০। এগুলি হচ্ছে করণ (কায়স্থ), অম্বষ্ঠ (বৈদ্য), উগ্র (উগ্রক্ষত্রিয়), মাগধ সূত (চারণ বা সংবাদবাহী), তন্তুবায় (তাঁতী), গন্ধবণিক (গন্ধ দ্রব্য বিক্রেতা), নাপিত, গোপ (লেখক), কর্মকার, তৌলিক (গুবাক ব্যবসায়ী), কংসকার (কাঁসারী), শংখকার (শাঁখারী), দাস (চাষী), বারুজীবী (বারুই-পানের বরজ ও পান উৎপাদনকারী), মোদক, মালাকার, সূত (চারণ গায়ক), রাজপুত্র (রাজপুত?) তাম্বুলী (পান বিক্রেতা) এই কুড়িটি বর্ণ সংকরের মধ্যে নয়টি জলচল নবশাখ।

যেমন : তেলী, মালী, তাম্বুলী।
কামার, কোমর, পেটিলী (মোদক),
গোছ (বারুজীবী), নাপিত, গোছালী (বারুই),
নবশাখের হেঁয়ালী।

মধ্যম সংকরের সংখ্যা ছিল বারটি—তক্ষণ (খোদাইকর), রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আভীর (গয়লা), তৈলকারক (কলু), ধীবর, শৌণ্ডিক (শুঁড়ি), নট, শাবাক (বৌদ্ধ?), শেখর (?), জালিক (জেলে) এরা জল-অচল।

অধম সংকরের সংখ্যা ছিল নয়টি—মলেগ্রাহী (?), কুড়র (?), চণ্ডাল, বরুড় (ব-উড়ী/বাউড়ী), তক্ষ, চর্মকার, ঘাটজীবী (পাটনী), ডোলাবাহী (দুলে), মল্ল (মালো); এরা জল-অচল এবং এদের বাসস্থান গ্রামের প্রান্তসীমায় পৃথক পাড়ায়।

উত্তম সংকর ও মধ্যম সংকরদের মধ্যেও অনেকে উচ্চবর্ণের কাছে ছিল অবাঞ্ছিত; এদের প্রতি অবজ্ঞার প্রমাণ মেলে—

কামার, কোমর, ধুবি,
গাঁ-বাইরে থুবি,
মাঝে মাঝে দু এক ঘা দিবি,
তবে ডাকলে হাঁকলে পাবি।

মনে হয় কোন সময় সমাজের উচ্চবর্ণের আজ্ঞাবহ না হওয়ায় ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশত এই তিন জাতির প্রতি এই উষ্মা।

ব্রাহ্মণ : ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা বিদ্যমান ছিল, এখনও আছে। এই কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে আদিশূর মতান্তরে বল্লালসেনের নাম যুক্ত। আদিশূর গৌড়ের রাজা বলে কথিত। গৌড় মূলত মালদহ ও মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন স্থান বলে উল্লিখিত হলেও পরে বর্তমানের মধ্য ও দক্ষিণ রাঢ়ের কিছু অংশ গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য বাংলায় কোন বেদজ্ঞানী ব্রাহ্মণ না মেলায় আদিশূর কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচ জন কায়স্থ আনিয়ে রাজ্যে বসবাস করান। সেই সময় থেকেই কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে গাঞী বিভাগও জড়িত। গাঞীর উদ্ভব গ্রাম থেকে। যে গ্রামে যে ব্রাহ্মণ বসবাস করতেন সেই গ্রামের নাম অনুসারে তিনি গাঞীর পরিচয় গ্রহণ করতেন। বন্দ্য, ভট্ট, চট্ট প্রভৃতি গ্রামের নামের সঙ্গে উপাধ্যায় বা আচার্য জড়িত হয়ে বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, চট্টোপাধ্যায় এইসব কুলীন শাখার উদ্ভব।

শাস্ত্রমতে আদিতে কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন নয়টি গুণসম্পন্ন—আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠা শান্তিস্তপোদানম্ নবধা কুললক্ষণম্। ভাষার ক্ষেত্রে

যেমন বৈদিক ছান্দস্ লোকমুখে ব্যবহৃত হতে হতে অপভ্রংশ, প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হয়, কুলীনদের ক্ষেত্রেও তাদের সংখ্যা সীমিত থাকায় বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণে ভঙ্গ কুলীনদের উদ্ভব হয়। কুলীনদের মধ্যেও আবার উত্তম, মধ্যম শ্রেণীর বিভাগ হয়।

মুখুজ্যে কুলীন বড়, বন্দ্যোঘটী সাদা।
তার মধ্যে বসে আছে চট্টো হারামজাদা।

ভঙ্গ হতে হতে অগ্রদানীর মত নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণের উদ্ভব, যাদের কাজ ব্রাহ্মণদের আদ্যশ্রাদ্ধে মৃতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত পিণ্ড ভক্ষণ করা। কুলীনদের সংখ্যা সীমিত হওয়ার জন্য সমাজে বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি সামাজিক অনাচারেরও উদ্ভব হয়। বাংলা কাব্যেও এর উল্লেখ আছে। "পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যোবংশ খ্যাত"—ভা. চ. "পরম কুলীন ঘরে দেহরূপবতী"—ক চ., "বিয়ে করে ক্ষীর খেয়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে। কুলীনের নাম করলে গাটা নেকার নেকার করে"—প্রচলিত ছড়া; 'কুলীন পিতা, কুলের গোলে, ফেলে দিলেন বুড়ার গলে'—সত্যেন্দ্রনাথ।

জনগণের আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধনের জন্য সেকালের রাজা-মহারাজারা, জমিদার ধনী বণিক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদের গ্রামে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর জমি দান করে বসতি করাতেন। জেলায় ব্রাহ্মণরা অধিকাংশই রাঢ়ী শ্রেণীভুক্ত, অল্প সংখ্যক বৈদিক ব্রাহ্মণ। রাঢ়ীব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত—যেমন কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, সান্ডিল্য, সাবর্ণ গোত্রীয়।

বাগ্দী : ব্রাহ্মণদের পরেই সংখ্যার দিক দিয়ে বাগ্দী বা ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের স্থান। এদের অধিকাংশই শ্রমিক, কৃষক বা বর্গাদার কৃষক। এরা তপসিলী জাতিভুক্ত। এরাই ঐতরেয় আরণ্যকের 'অবগধা'। এদেরই পূর্বপুরুষ মহাবীর বর্ধমানের পিছনে 'চু চু' করে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। ডোম, শবর, বাগ্দী এরা অন্ত্যজ জাতিভুক্ত, গ্রামের প্রান্তে পৃথক পাড়ায় এদের বসতি। প্রাচীন বৌদ্ধ চর্যাপদে ডোম, চণ্ডাল ও শবরের কিছু বিবরণ আছে। এরা শহরের বাইরে বাস করতো—বাঁশের ঝুড়ি বানাত, তাঁত বুনতো। বাগ্দীদের অনেকেই ঘরামি ও চাষের কাজে নিযুক্ত হয়; এদের মেয়েরা উচ্চবর্ণের বাড়ীতে 'ঝি' এর কাজ করে, ছেলেরা বাগালী করে—গৃহস্থের গরু চরায়। এদের অনেকেই ভাল লাঠি খেলাতে, রণ পায়ে চলতে দক্ষ—এদের মধ্যে তেঁতুলে বাগ্দীরা রাইবেশের নাচ জানতো—অনেকে ডাকাতিও করতো বলে প্রবাদ। বর্তমানে এরা ভাদু গান গায়। তোষলা ব্রত করে। মেয়েরা বাঁশের ফ্রেমে আঁটা জাল ঘাড়ে করে বিল ছেঁচে মাছ ধরে।

বাউরী : বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে বাউরীরা অধম সংকর গোষ্ঠীভুক্ত বরুড় (ব-উড়ী) জাতি। এরাও অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত। এদের অধিকাংশ কৃষি-শ্রমিক, কিছু চাষবাস করে, তবে সে ২/১ বিঘা মাত্র। এরাও গ্রামের বাইরে পৃথক পাড়ায় বাস করে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে এদিকে অমর করে রেখেছেন। বাউরী যোগায় দোলা—ক. চ.-৪৮।

সদ্‌গোপ : সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে বাগ্‌দী বাউরীদের পরেই আসে সদ্‌গোপ। সদ্‌গোপদের মধ্যে কোনার উপাধিধারীরাই কৌলীন্যের দাবী করে। এই সদ্‌গোপরাই একদিন আউসগ্রাম থানার গোপভূম পরগনায় বাস করতেন। বিনয় ঘোষের মতে বর্ধমানের গোপভূম অঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকে সদ্‌গোপ ও গোপদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপত্তি ছিল। বন্য যাযাবরের স্তর থেকে তারা এই অঞ্চলের সভ্যতাকে পশুপালন ও কৃষির স্তরে উন্নীত করেছিলেন। দলপতি, গোষ্ঠীপতি, কৌমপতি থেকে তাদের মধ্যে অনেকে রাজাও হয়েছিলেন। গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজবংশের ইতিহাস বর্ধমান তথা রাঢ়ের এক গৌরবময় যুগের ইতিহাস। আজও সেই অতীতের স্মৃতিচিহ্ন ভালকী, অমরার গড়, কাঁকসা, রামগড় ও গৌরাঙ্গপুর অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বর্তমানে অনেকে কৃষি ও কৃষি-শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত।

বৈদ্য : দ্বাদশ শতকের আগে এদেশে বৈদ্যজাতির অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভরত মল্লিক ব্যাস ও শঙ্খ স্মৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠের অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে এটা অনেকেই স্বীকার করেন না। বৈদ্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (বিদ্য+অন্) বিদ্যাবান পণ্ডিত। নাবিদ্যানাস্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্কচিৎ (কাত্যায়ন)। বর্তমানে বৈদ্য বলতে আয়ুর্বেদ বিদ্যাবিৎ কবিরাজদের বোঝায়—রোগহর, বিষহর, শল্যহর, কৃত্যহর ভেদে বৈদ্য চতুর্বিধ। "বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি, কহে ব্যাধিভেদ"—ভারতচন্দ্র। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বৈদ্যগণ শিক্ষাদীক্ষায় পাণ্ডিত্যার্জন করে নানাবিধ White Color Job-এ নিযুক্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাটোয়ার নিকট শ্রীখণ্ডে বৈদ্যগণ শ্রীচৈতন্যর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভক্তিবাদ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যদের অনেকেই রাজ-বৈদ্য ছিলেন। চৈতন্যের প্রভাবে সেখানে ভক্তিবাদের বন্যা বয়ে যায়। রাজযোগ ও ভক্তিযোগ মিলিত হয়ে শ্রীখণ্ডের বৈদ্যদের প্রতিপত্তি আজও সমানভাবে বিদ্যমান। আলমপুরের সেনবরাটগণ জমিদারী উচ্ছেদের আগে এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। মানকরের বৈদ্যগণ প্রাচীন যুগ থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ধারক ও বাহক। মানকরে মল্লিকপাড়ার কবিরাজবংশ বর্ধমান রাজপরিবারের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। বর্ধমান

শহরে স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই অনেক বৈদ্য কবিরাজ সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতার পরে জেলায় বিভিন্ন শহরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অনেক বৈদ্য-পরিবার শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বাহক। কালনা থানার বৈদ্যপুর নাম থেকে এখানকার বৈদ্যদের প্রভাব অনুমিত হয়। অনেক বৈদ্য নিজদিগকে ব্রাহ্মণ সমপর্যায়ভুক্ত বলে প্রচার করেন। এঁদের বেশীর ভাগই উচ্চশিক্ষিত ও সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত। জেলায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয় ও সদ্‌গোপদের সঙ্গে বৈদ্যগণ জেলার বিশেষ প্রভাবশালী গোষ্ঠী। মুকুন্দরামও এঁদের উল্লেখ করেছেন।

বৈদ্যজা রসতত্ত্ব/গুপ্ত, সেন, দাস, দত্ত/বটিকায় কার যশ/কেহ প্রয়োগের বশ।

ক্ষত্রিয় : জেলায় ক্ষত্রিয়দের সংখ্যা খুব বেশী নয়। বর্তমানে যেসব ক্ষত্রিয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তাঁদের অধিকাংশই সঙ্গতিসম্পন্ন, জোতদার ও সমাজে বিশেষ প্রভাবশালী। বর্তমানে জমিদারী উচ্ছেদের পর এঁদের সেই পূর্বের প্রভাব অনেকটাই ম্লান। এঁদের বেশীর ভাগই পাঞ্জাব, রাজপুতনা ও উত্তরপ্রদেশ থেকেই মানসিংহের সেনাবাহিনীর সঙ্গে এসে এদেশে থেকে যান। আবার রাজপরিবারের সঙ্গম রায়ের মতো ক্ষত্রিয় বর্তমান পাকিস্তানের লাহোরের কোট্‌লী মহল্লা থেকে আগ্রা ও শ্রীক্ষেত্র হয়ে কম্বলের ব্যবসা করতে করতে সরকার সরিফাবাদের সদর কার্যালয় বর্ধমান শহরে আসেন ও প্রথমে বর্ধমান থেকে ১০ কিমি দূরে রাইপুর বৈকুণ্ঠপুরে বসতি স্থাপন করেন এবং খাদ্যশস্য ও মহাজনী কারবারে লিপ্ত হন। এঁর অধস্তন পুরুষ আবু রায় মোগল সম্রাটের আস্থাভাজন হয়ে নগরকোটাল ও রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত হন। আবু রায়ের বংশধরগণই বর্ধমান শহরে নগর পত্তন করেন ও বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস; বর্ধমানের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রসঙ্গে তার বিবরণ দেওয়া যাবে। বর্ধমানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষত্রিয় পরিবার এই রাজপরিবার। এই পরিবারের শাখা-প্রশাখা শহরের মিঠাপুকুর, ময়ূরমহল ও নতুনগঞ্জ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। উখরা, সাঁকো, মেমারী অঞ্চলেও কিছু ক্ষত্রিয় পরিবার আছেন। প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষত্রিয় বংশের মধ্যে সদর মহকুমার চক্‌দিঘির সিংহরায় পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রবাদ—বুন্দেলখণ্ড থেকে পঞ্চদশ / ষোড়শ শতকে ভিখারী সিং ব্যবসাসূত্রে এখানে আসেন ও ক্ষত্রিয়বংশের পত্তন করেন। ভিখারীর অধস্তন সপ্তম পুরুষ সারদাপ্রসাদ সিংহরায় কৃষ্টিবান জমিদার ছিলেন। মেমারী, সাঁকো অঞ্চলেও কিছু কিছু ক্ষত্রিয় আছে। বর্তমানে এঁদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং অধ্যাপনা, শিক্ষকতা, ওকালতি, ব্যবসা প্রভৃতি White Color Job-এ নিযুক্ত।

উগ্রক্ষত্রিয় : বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জাতি পর্যায়ে উগ্রক্ষত্রিয়দের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবাংলার প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আগুরী এই জেলাতেই বাস করেন। জাতির বিবর্তনের ইতিহাসে জেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় এঁদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হতো; এখনও অব্যাহত আছে। কিন্তু এই আগুরী বা উগ্রক্ষত্রিয় কারা? ক্ষত্রিয় অভিধা থেকে এঁদের সামরিক ও প্রশাসনিক গুণের সূত্র মেলে। কারও মতে এঁদের আদি নিবাস ছিল রাজস্থানে। মানসিংহের সৈন্যদলের সঙ্গে এঁরা এসেছিলেন বর্ধমান জেলায়, পরে এখানেই বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু আগরী অর্থে অগ্রহারিক ধরলে এই প্রশ্নের একটা সহজ সমাধান সূত্র মেলে। অগ্রহারিকের অর্থ সামন্ত রাজা, এঁদের উপাধি রায়, মণ্ডল, সামন্ত, চৌধুরী, পাল তাই প্রমাণ করে। বৃত্তি ও কর্ম অনুসারে উপাধির পরিচয় আমরা পরবর্তী যুগে নবাবী আমলেও পাই। আচার্য যদুনাথ সরকার তাঁর History of Bengal Vol. II-তে এর উল্লেখ করেছেন। বক্সী (পোস্ট মাস্টার), সরকার, কানুনগো, সাহানা (পুলিশ প্রিফেক্ট), চাকলাদার, তরফদার, মুন্সী, লস্কর এবং খাঁ এইসব পুরানো সরকারী পদবীর প্রচলন এখনও বাঙালী হিন্দু পরিবারে দেখা যায়। এইসব পদবী থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এঁদের পূর্বপুরুষেরা নবাবী আমলে কি ধরনের কাজ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। পাল যদি আগুরীদের পদবী হয়, তাহলে পালবংশের গোপাল এঁদেরই কারো মধ্য হতে নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে এবং এই জাতির মধ্য থেকেই সামন্ত, চৌধুরী পদে লোক নিয়োগ করা হত। ভারতচন্দ্রও তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে এঁদেব উল্লেখ করেছেন— 'আগরী প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।' মুকুন্দরামেও পাই—'আগরী নিবাসপুরে, মন্দ কর্ম নাহি করে।' 'কৃত্তিবাসের রামায়ণ'-এর উত্তরকাণ্ডে আছে—"শূদ্র আগরি হৈল ক্ষেত্রীতে।" মনে হয় গোপভূমে গোপদের পতনের পর থেকেই জেলায় আগরীদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। বর্তমানে আগরীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী ও জোতদার। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ করে ধান চালের ব্যবসায় লিপ্ত আছে। জেলায় এঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রবাদে পরিণত। এঁদের অনেকেই শিক্ষাদীক্ষায় খুবই উন্নত। এঁদের দুই শ্রেণী—জানা ও সূত। জানাদের বেশীর ভাগ কৃষিকার্যে লিপ্ত; সূতদের মধ্যে থেকেই অনেকে বড় বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সার্জেন হিসেবে শহরে সুপ্রতিষ্ঠিত। জেলার মণ্ডলগ্রাম, ধান্যখেড়ুর, চৈতন্যপুর, ক্ষীরগ্রাম, মন্তেশ্বর, দেনুড়, মহাচাঁদা কুসুমগ্রাম, বিঘড়া, পুটশুড়ি অঞ্চলে আগরীদের প্রাধান্য। জমিদারী উচ্ছেদের পর অনেকেই জমির মোহ ছেড়ে দিয়ে শহরে white colour job-এ সুপ্রতিষ্ঠিত। 'জানা'-শ্রেণীভুক্ত উগ্রক্ষত্রিয়গণ

কৌলীন্য দাবী করেন। এর সমর্থনে তাঁরা বলেন বিবাহের সময় জানাদের উপবীত ধারণ করতে হয়। কিন্তু সূত শ্রেণীর মধ্যে এই উপনয়ন অনুষ্ঠানের রীতি নাই। District Census Handbook—Bardhaman-তে 1991 এঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—In Bardhaman district there is a caste called Ugra-Kshatriya or Aguri who take initiative in all social and cultural activities of the district. The person belonging to such caste are hard working and enterprising. Both in agricultural and industrial fields they have made the district important in the economic map of West Bengal.

কায়স্থ : সামাজিক ক্ষেত্রে কৌলীন্যের বিচারে জেলায় ব্রাহ্মণদের পরেই কায়স্থদের স্থান। প্রাচীন শাস্ত্রপুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র এবং বিভিন্ন লিপিতে এঁদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে কায়স্থ ও করণ সমার্থক দেখা যায়। কাশীদাসী মহাভারতে এঁদের উল্লেখ আছে—"কায়স্থকুলেতে জন্ম..." (বঙ্গবাসী দ্বিতীয় সংস্করণ ২৭৪)। বিষ্ণুসংহিতায় আছে—ইহারা লেখনবৃত্তি; রাজার বিচারালয়ে লেখকের (মুহুরী) কার্য ইহাদের বৃত্তি। ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসানে পাই—রক্ষ ঠাকুরানী, কায়স্থ যতেক আছে। মুকুন্দরাম বলেছেন—বিচারিয়া কেহ দেখে, কাগজ কায়স্থ লেখে। চৈতন্যভাগবতে দেখি—কায়স্থে কি কর ব্যাখ্যান। চন্দেল্লরাজ ভোজবর্মার অজয়াগড় লিপিতে করণ ও কায়স্থকে সমার্থক বলা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকাকার-এর মতে কায়স্থরা ছিলেন হিসাবরক্ষক।

গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের দুইটি পট্টোলীয় লেখনে এঁরা নিজদিগকে কায়স্থ ও 'করণিকোগ্‌গতো' বলে পরিচয় দিয়েছেন। 'করণ' করার অর্থ খোদাই যন্ত্র। ইতিহাসের গোড়ার দিকে নরুন জাতীয় যন্ত্রের দ্বারা খোদাই করে লেখা হত। তাই মনে হয় পরবর্তীকালে করণ ও কায়স্থ সমার্থক হিসেবে বিবেচিত হন। কুলজী গ্রন্থের মতে আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পঞ্চ ভৃত্য এসেছিলেন তাঁরাই ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি কুলীন কায়স্থদের আদি পুরুষ।

বর্তমানে গ্রাম অপেক্ষা শহরেই বেশীর ভাগ কায়স্থের বাস দেখা যায়। গ্রামেগঞ্জে যেখানে ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ ও এঁদের বাস দেখা যায়, সেখানে এঁরা বড় বড় জোতদার বা জমির মালিক। সেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয় ও সদ্‌গোপদের মতো এঁদেরও প্রতিপত্তি দেখা যায়। অবশ্য শহরে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উগ্রক্ষত্রিয়দের মতো এঁদের প্রাধান্য দেখা যায় না। এখানে এঁদের অনেকেই করণিক, উচ্চ রাজকর্মচারী, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি কর্মে

নিযুক্ত। ভারতচন্দ্র তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মধ্যে বর্ধমানের যে সমাজচিত্র এঁকেছেন সেখানেও এঁদের উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি, কহে ব্যাধিভেদ।
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি,
আগরী প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকব।

অনেকে আবার কায়স্থদিগকে চাণক্যের মত কুটবুদ্ধিসম্পন্ন বলে মনে করেন। বাংলা প্রবাদে এর প্রতিফলন দেখা যায়—কায়েত ম'লে জলে ভাসে, কাক বলে কোন ছলে আছে।

মুকুন্দরামের উদ্ধৃতি দিয়ে কায়স্থ প্রসঙ্গ শেষ করি :

প্রসন্ন সবার বাণী
লেখাপড়া সবে জানি
সর্বজন নগরের শোভা

কৈবর্ত : দাশ, ধীবর, কেওট, জেলে বিভিন্ন নামে কৈবর্তদের পরিচয়। বিষ্ণুপুরাণে কৈবর্তদিগকে ব্রাহ্মণ্যসমাজ-বহির্ভূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মনুস্মৃতি অনুসারে নিষাদ পিতা ও আয়োগ মাতার সন্তানরা নৌকর্মজীবী, মাগধ, দাস বা কৈবর্ত নামে পরিচিত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৈবর্তগণ শূদ্রার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে সংকর জাতিবিশেষ। শুক্লযজুর্বেদে কৈবর্তের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত রামায়ণে "কেবর্ত্তানাংশতংশতম্" এর উল্লেখ পাই। কাশীদাসী মহাভারতে—"অপূর্ব দেখিয়া রাজা হইল বিস্ময়। কৈবর্ত্তে তনয়া দিয়া লইল তনয়।" "কৈবর্তীজননী যার" এই সমস্ত উল্লেখ থেকে অনুমান হয় : কৈবর্তরা কোন আর্যপূর্ব কোম বা গোষ্ঠী ছিলেন এবং তাহারা ক্রমে আর্য সমাজের নিম্নস্তরে স্থান লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধ জাতকেও কেবত্ত অর্থাৎ কৈবর্ত-এর উল্লেখ আছে। রাঢ় দেশীয় বাঙালী স্মৃতিকার ভবদেব কৈবর্তদিগকে রজক, চর্মকার, নট ও ভিল্লদের সঙ্গে অন্ত্যজ পর্যায়ভুক্ত করেছেন। অমরকোষেও দাস ও ধীবরদিগকে কৈবর্ত বলা হয়েছে। পাল আমলে কৈবর্তনায়ক দিব্যোক পালরাজ দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে কৈবর্তদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কৈবর্ত ও মাহিষ্যগণ উভয়েই স্মৃতি ও পুরাণে ক্ষত্রিয়পিতা ও বৈশ্যমাতার সন্তান বলে উল্লেখিত হয়েছে। এর থেকে মনে হয় কৈবর্ত ও মাহিষ্য একই জাতি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বলা হয়েছে ধীবর সংসর্গহেতু

কৈবর্তগণ পতিত হইয়া ধীবরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বল্লালচরিতে দেখা যায় বল্লালসেন কৈবর্তদিগকে 'জলাচরণীয়' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনকালের মত বর্তমানকালেও কৈবর্তগণ হালিক ও জালিক। জালিক বৃত্তি অনুসারে মৎসজীবী কৈবর্ত কেওট বা জেলে কৈবর্ত এবং কৃষিজীবী কৈবর্ত বা হেলে-কৈবর্ত দু'ভাগে বিভক্ত। একাদশ-দ্বাদশ শতকেও কৈবর্তরা এদেশে কেবট্ট নামে পরিচিত হতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। সদুক্তি কাব্যামৃত গ্রন্থে (১২০৬) কেবট্ট কবি পপীপকৃত সুমধুর গঙ্গাস্তবের একটি পদ সংকলিত আছে।

বর্তমান জালিয়া কৈবর্তদের শতকরা ৫৮.৬০ ভাগ মৎস্যজীবী, ৩১.২০ ভাগ প্রান্তিক চাষী এবং ১৩.৮৫ ভাগ চাষী।

কংসবণিক : কংসকার বা কাঁসারী। এঁরা জলচল উত্তম সংকর পর্যায়ভুক্ত। এঁরা কাঁসার পণ্য প্রস্তুত করে। বর্ধমান-নতুনগঞ্জে কাঁসারী-পটিতে অনেক কাঁসারীর দোকান ছিল, বর্তমানে এঁদের সংখ্যা সীমিত। দাঁইহাট, কাটোয়ায় অনেক কাঁসারীর বাস। বনপাশ কামারপাড়া পূর্বে কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত ছিল কিন্তু এঁরা কেউ কংসবণিক পর্যায়ভুক্ত নয়। এঁরা জাতিতে কর্মকার, বর্তমানে বৃত্তিতে এঁদের অধিকাংশই স্বর্ণকার। স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গ থেকে অনেক কংসবণিক উদ্বাস্তু হয়ে এ জেলায় শহরে বসতি স্থাপন করেছেন এবং কাঁসার ব্যবসায় ছেড়ে অন্য নানা ব্যবসায় নিযুক্ত।

মোদক : মোদককার বা ময়রা। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে এঁরা উত্তম সংকর পর্যায়ভুক্ত ক্ষত্রিয় হতে শূদ্রজাত জাতি। বর্ধমান শহরের দত্ত পরিবারের অনেকে মোদক সম্প্রদায়ভুক্ত! প্রবাদ কাঞ্চননগরের মোদক সীতানাথ নন্দী বর্ধমানের বিখ্যাত সীতাভোগের আবিষ্কর্তা। আবার তেঁতুলতলা বাজারের নগেন্দ্রনাথ নাগের পূর্বপুরুষই এই বিখ্যাত মিষ্টান্ন আবিষ্কারের দাবীদার। সীতাভোগের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য যদি মাপকাঠি ধরা যায়, তা হলে সীতানাথের দাবীই গুরুত্বপূর্ণ। মোদকবংশের দেবী দত্ত মশাইও সীতানাথের নাম সমর্থন করেন। বিষয়টি বিতর্কমূলক। জেলার প্রায় সমস্ত গ্রামে ও শহরে মোদকদের বসতি। তবে বর্তমানে অনেকে পৈতৃক বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করে নানা বৃত্তিতে নিযুক্ত। আবার ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয়, সদগোপ, কর্মকার, এমন কি অনেক অন্ত্যজ জাতি নিজেদের জাতিগত বৃত্তি ছেড়ে "মোদককারে"র বৃত্তি নিয়েছেন।

তেলী, তিলি : তৈল উৎপাদক বা তৈল ব্যবসায়ী হিন্দুজাতি। যারা ঘানিতে তেল ভাঙে, পল্লীগ্রামে এরা কলু, গড়াই বা সিধাই নামে সাধারণত পরিচিত।

সাধক রামপ্রসাদ এই কলু জাতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। "মা আমায় ঘুরাবি কত। কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।" তেল বলতে এখানে সরষের তেলকেই বুঝতে হবে। যারা তৈল ব্যবসায়ী, তারাই তেলী বলে পরিচিত। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে যদু কুণ্ডু তেলীর উল্লেখ আছে। "যদু কুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা।" বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে পাই "তিলির ভাঙিল তেল।" এর থেকে মনে হয় পূর্বে তিলিরা বিদেশে সমুদ্রযাত্রা করতেন, বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতেন। তেলীগণ জলচল নবশাখভুক্ত সম্প্রদায়। "তেলী, মালী, তাম্বুলী।"

গন্ধবণিক : বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে গান্ধিক বণিক (গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ী বণিক বর্তমানে গন্ধবণিক) উত্তম সংকর পর্যায়ভুক্ত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে অম্বষ্ঠ হ'তে রাজপুত্রীর গর্ভে ইহাদের জন্ম। এঁরা মসলা ব্যবসায়ী, এই ব্যবসায়েই এঁদের লক্ষ্মীলাভ। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে চম্পকনগরের সাধু চন্দ্রধরের 'সপ্তডিঙা মধুকর' দিয়ে বাণিজ্য-যাত্রার উল্লেখ আছে। বর্ধমান জেলার বুদবুদ থানার ২০নং চম্পাইনগরীই চাঁদ বেনের চম্পকনগর বলে অনুমান করা হয়। গ্রামের মধ্যে দু'টি উচ্চ ঢিবি নাকি চাঁদ সদাগরের বাসগৃহ। ক্ষেমানন্দও তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে চম্পকনগরের চাঁদ বেনের উল্লেখ করেছেন—"চম্পকনগরে বৈসে চাঁদ সদাগর। মনসার সহিত বাদ করে নিরন্তর।" বাসুলীমঙ্গলে কাঞ্চননগরের গন্ধবণিক ধূসদত্তের উল্লেখ আছে—বর্ধমান হৈতে বেনে আইসে ধূসদত্ত। সর্বজনে গায় যার কুলের মহত্ত্ব। বেনে ধূসদত্ত ও গুণদত্ত ছিলেন বণিক সমাজের প্রতিভূ। বাসুলীমঙ্গল থেকে জানা যায় সেকালে জেলার সমস্ত বণিককে নিয়ে মনে হয় বণিক সঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল—গুপ্তযুগে এরকম Traders' Guild-এর উল্লেখ আছে। উজানীনগরের বণিকশ্রেষ্ঠ ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে বিভিন্ন স্থান থেকে বণিকদের সমাগম হয়েছিল। যেমন—কাঞ্চননগরের ধূসদত্ত, গুণদত্ত ছাড়া চম্পাই নগরের চাঁদ সদাগর, কর্জনার বেনে নীলাম্বর, গণেশপুরের বেনে সনাতন চন্দ, ও ভাই গোপাল গোবিন্দ, দশঘড়ার বাসুলা (লাহা), সাঁকোর বেনে শঙ্খ দত্ত, কাইতির যাদবেন্দ্র দাস, জাড়গ্রামের রঘু দত্ত, বড়শুলের হরি দত্ত, সিতলপুরের রাম রায় ও তাঁর নয় ভাই, নাড়ুগ্রামের রাম দত্ত, পাঁচড়ার চণ্ডীদাস খাঁ, খণ্ডঘোষের বাসুদত্ত, গোতানের মধু দত্ত ও তাঁর ভাই মাধব, যাদব, হরি, শ্রীধর ও বলাই—"আসেন সাধুর শ্বশুর নামে লক্ষপতি। একে একে বণিকের কত কব নাম, সাতশত বেনে আইসে ধনপতি ধাম।" এই সাতশত বণিকদের নিয়ে সঙ্ঘ গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। গন্ধেশ্বরী এঁদের আরাধ্য দেবতা। "গন্ধেশ্বরী প্রথমে বরিল সাবধানে।"—বিপ্রদাস-পিপ্পলাই।

বর্তমানে বর্ধমানে রানীগঞ্জ বাজার, ইছলাবাদ, বড়শুল, মোহনপুর, জগদাবাদ প্রভৃতি অনেক স্থানে গন্ধবণিকের বাস। এঁদের বেশীর ভাগ ধান চাল ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য, বেনেতি মসলা, কাপড়ের খুচরা ও পাইকারী ব্যবসা করেন। আবার অনেকে উচ্চ শিক্ষালাভ, অধ্যাপনা, শিক্ষকতা, সরকারী চাকুরী, ব্যবসা প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত।

সুবর্ণবণিক : সুবর্ণবণিক বলতে সুবর্ণের বাণিজ্যকারক, সাধারণ অর্থে সোনার বেনেদের বোঝায়। পরাশর পদ্ধতির মতে "কাংস্যকারচ্চ মানিক্যাং সুবর্ণ জীবিকো ভবৎ।" কাংস্যকার হতে মণিকার স্ত্রীতে, মতান্তরে অম্বষ্ঠ হতে বৈশ্যায় এঁদের উৎপত্তি। ইহারা ধনোৎপাদক শিল্পী ও ব্যবসায়ী হলেও বৃহদ্ধর্মপুরাণে উত্তম সংকর বলে গণিত হন নাই। এঁরা মধ্যম সংকর বা অসৎ শূদ্র পর্যায়ের। কিন্তু ১৯৮২ সালে ৭ই আগস্ট দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্তব্রত পালিতের—"বনেদী বণিক সুবর্ণবণিক" প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যদিও হান্টারের স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্টস অব্ বেঙ্গল বা ১৮৮১ সালের আদমসুমারীতে এঁদেরকে নিম্নবর্ণের বলে প্রচার করা হয়েছে কিন্তু পুরাণ, স্মৃতি ও শ্রীমদ্ভাগবত থেকে শ্লোক তুলে ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত সুবর্ণবণিক জাতির ইতিহাস প্রণেতা নিমাইচন্দ্র শীল প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সুবর্ণবণিকরা নিম্নবর্ণের অনার্য সন্তান নন—এঁরা বৈশ্য বা বণিক গোত্রীয। তাঁর মতে সুবর্ণবণিকদের আদি পিতা সনক আঢ্য। এই ধনাঢ্য সনক বৌদ্ধধর্ম প্রসারে বিচলিত হয়ে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতকে অযোধ্যা ছেড়ে বাংলাদেশে আদিশূরের দরবারে চলে আসেন। তাঁর সঙ্গে আসেন ষোলটি মুখ্য বণিক পরিবার। এঁরা হলেন দে, দত্ত, আঢ্য, শীল, সিংহ, ধর, বড়াল, পাল, নাথ, পালিত, মল্লিক, নন্দী, বর্ধন, দাস, লাহা ও সেন। আগে তিরিশটি গৌণ বৈশ্য পরিবারও সঙ্গী হন। এই সনক আঢ্য রাজা আদিশূরের যজ্ঞে কণৌজ থেকে পাঁচ জন সদ্‌ব্রাহ্মণ আনাতে সাহায্য করেন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব লাভ করেন। এঁরা ছিলেন সোনার ব্যাপারী বা সুবর্ণবণিক। ঢাকার কাছে যে গ্রামে এরা বসতি করেন তার নাম হয় সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁ। বল্লালসেনের সঙ্গে বিবাদের ফলে এঁরা এপার বাংলায় কোন্নগর, সপ্তগ্রাম ও অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েন। রাঢ় অঞ্চলে অধুনালুপ্ত নদীখাত বরাবর উজানীনগর, চম্পাইনগর, কর্জনায় এদের প্রধান বসতি ছিল। আদিতে স্বর্ণশিল্পী হলেও পরে নানা ব্যবসা-বাণিজ্য ও চিকিৎসাশাস্ত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মেডিকেল কলেজে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের শব ব্যবচ্ছেদে আপত্তি থাকলেও সুবর্ণবণিকদের আপত্তি ছিল না। তাই ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ত্রিশ বৎসর মেডিকেল কলেজের রেজিষ্টারে কৃতকার্যের তালিকায় এদের

সংখ্যাধিক্য। পরবর্তীকালে একচেটিয়া ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থ ("At first prohibitive, next aggressive, then suppressive, it has become repressive setting bounds to native ambition for anything approaching commercial rivalry"—ভোলানাথ চন্দ্রের জবানবন্দী) সুবর্ণবণিকদের বাণিজ্যের প্রতিপত্তি গ্রাস করে। বর্তমানে এঁরা স্বর্ণশিল্পী ও নানা বাণিজ্য এমন কি শিক্ষকতা, অধ্যাপনা, ডাক্তারী প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত। বনপাশ কামারপাড়ার কর্মকারগণ জাতিতে সুবর্ণবণিক না হলেও এঁদের অধিকাংশ স্বর্ণশিল্পে নিযুক্ত, বর্ধমান শহরে তো বটেই ভারতের নানা স্থানে এঁদের স্বর্ণশিল্পের ব্যবসা বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে।

তাম্বুলী : বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে তাম্বুলী বা তামলী জাতি উত্তম সংকর পর্যায়ভুক্ত। জাতিগত পেশা পানচাষ ও পানের ব্যবসায়। তেলী, মালি, তাম্বলী নবশাখভুক্ত জলচল। বর্ধমান জেলায় প্রাচীনকাল থেকেই মানকর, উজানিনগর, চম্পাইনগর, তালিত, দে-পাড়া প্রভৃতি অনেক গ্রামে তাম্বুলীর বাস ছিল। কাজেই মনে হয় এ জেলায় পানচাষও হত। বর্তমানে জেলায় বিভিন্ন গ্রামে বিশেষত মানকর, বুদবুদ, গলসী, মঙ্গলকোট, সদর থানায় অনেক গ্রামে কিছু কিছু তাম্বুলী আছে। কিন্তু পানচাষ প্রায় উঠেই গেছে। এখন তাম্বুলীগণ প্রায় জাতিগত বৃত্তি ছেড়ে নানা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত। অনেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে শিক্ষকতা, সরকারী চাকুরী প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত আছেন।

তাঁতী : তন্তুবায় বা তাঁতী বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে উত্তম সংকর পর্যায়ভুক্ত। ইহারাও জলচল জাতি। মনুসংহিতায় (৮৩৯৭) তন্তুবায় বা কৌলিকদের উল্লেখ আছে। পরাশর পদ্ধতিতে আছে—মণিবন্ধান্‌মণিকার্যাং তন্তুবায়াশ্চ জজ্ঞিরে। অতি প্রাচীনকাল থেকে সদর থানা, মেমারী, মানকর, কালনা, কাটোয়া ও জামালপুর থানায় অনেক তাঁতীর বাস ছিল, এখনও আছে। মানকরে এক সময় ৪৬০ ঘর তাঁতী তসরের কাপড় বুনতো। এখানকার তসরের চেলি দেশে-বিদেশে চালান যেত। সদর থানার জগদাবাদে এক সময় বিয়ের জোড় তৈরী হত। ৬০/৭০ বছর আগে এখানে ৭/৮ টাকায় যে পাটের জোড় পাওয়া যেত দেশেবিদেশে তার কদর ছিল। বড়শুলে অনেক তাঁতীর বাস ছিল। ভাতার থানার মোহনপুরে এখনও তাঁতীর বাস। তবে কাপড় আর বিশেষ তৈরী হয় না। কম্বুলেরা এখনও কম্বল তৈরী করে। কাটোয়া, কালনা থানার অনেক জায়গায় তাঁতের কাপড়ের এখনও কদর আছে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে E. W. Collins-এর এক রিপোর্টে দেখা যায় মেমারীতে ঐ সময় ২০০ ঘর তাঁতী ছিল তারা সিল্কের গরদ তৈরীতে নিযুক্ত

ছিল। বছরে তারা ৩৫,০০০ টাকা মূল্যের গরদ বুনতো। বর্ধমান জেলায় ঐ সময় রেশম শিল্পজাত বস্ত্রের উৎপাদন ১,২৫,০০০ টাকা মূল্যের ৩,০০,০০০ গজ ছাড়িয়ে যেত। জেলায় অবশ্য রেশম-কীট গুটিপোকার চাষ হত না। ছোটনাগপুরের জঙ্গল থেকে সরবরাহ্ হত। তারপর সিংভূমের জঙ্গল সাফ হতে লাগলো। রেশমের তন্তুর সরবরাহ্ কমে গেল। জেলার তাঁতের সংখ্যাও কমতে লাগলো। তাঁত গেলেও মেমারী, রাধাকান্তপুর, বেড়ুগ্রাম, জামালপুর, হিজলনা, শ্রীপুর, বাগ্‌টিকরা, ঘোড়ানাশ, মুসফুলী, চাঁদুলী, সিঙ্গরি, শ্রীবাটী, গোপকাঞ্জি, মাধবপুর, মন্তেশ্বর ও কাটোয়া এবং কালনা মহকুমায় এখনও অনেক তাঁতীর বাস ও সুতীর শাড়ী, ধুতি তৈরী হয়। বর্তমানে Synthetic-এর দৌরাত্ম্যে ও মিডিম্যাক্সির জোয়ারে জেলায় তাঁতশিল্পে ভাটা পড়েছে। তাই তাঁতীদের বেশীর ভাগ শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে নানা বৃত্তি গ্রহণ করছে।

ধোপা, ধোবা বা রজক : কাপড়-চোপড় কাচা ও ইস্ত্রি করে পাট করা এদের বৃত্তি। গ্রামসমাজের একসময় এরা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জাতি। সমাজপতিরা সামাজিক অনাচারের অজুহাতে কাউকে সমাজচ্যুত করতে হলে, তার ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দিত। তখন "ধোপা-নাপিত বন্ধ করা" একটা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। ১৯৬১ সালের জনগণনায় দেখা গেছে জেলার ধোপার সংখ্যা ছিল সমগ্র জেলার লোকসংখ্যার ০.৫১ শতাংশ, এরা তপসিলী জাতিভুক্ত। গ্রামেগঞ্জে ধোপার কাচানো পোশাক ব্যবহারের সেরকম রীতি নেই। শহরে বা উন্নত পল্লীতে অনেক উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক লণ্ড্রী খুলেছে কিন্তু তাতে ধোপার প্রয়োজন কমে নাই, বরং বেড়েছে। অথচ এই সমাজবন্ধুদের প্রতি উচ্চবর্ণের জাতিদের জাতক্রোধ কেন বোঝা দুষ্কর। এদের সম্বন্ধে যে প্রচলিত ছড়া আছে তাতেই এইজাত ক্রোধ স্পষ্ট হয়ে যায় :

কামার কোমর ধুবি
গাঁ বাইরে থুবি
মাঝে মাঝে দু'এক ঘা দিবি
তবে ডাকলে হাঁকলে পাবি।

ভূঁইয়া : ধোপাদের মত ভূঁইয়ারাও তপসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে ১৯৬১ সালে জনগণনা অনুসারে ধোপাদের চেয়ে এঁরা সংখ্যায় কিছু অধিক, জেলার জনসংখ্যার ০.৫৭ শতাংশ। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এদের উল্লেখ দেখা যায়। ময়নামতীর গানে আছে "ভূঞা হইয়া গৌরব করে ধনে আর জনে।" কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও এদের উল্লেখ আছে। 'যত ভূঞা রাজা-মিলি ধরাইল, ছাতি।' কিন্তু এখানে সামন্তরাজা

অর্থে ভূঁইঞা ব্যবহৃত। ভক্তমাল গ্রন্থে যে ভূঁইঞার উল্লেখ পাই—" (তথা এক দস্যু) ভূঞা করি, খ্যাত হয় হাত গণনাতে—এখানে ভূঁইঞা উপাধি বিশেষ। ভূঁইয়া জাতি অর্থে নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক সম্প্রদায়ভুক্ত তপসিলী জাতি—এদের বেশীর ভাগের আসানসোল, রানীগঞ্জ ও দুর্গাপুর থানা অঞ্চলে বসতি। অনেকে আবার পুরুলিয়া, মানভূম, সিংভূম অঞ্চল থেকে কাজের খোঁজে এসে থেকে গেছে। এদের ১.৩৪ শতাংশ খনিতে, খাদে, বৃক্ষসৃজন ও মৎস্যচাষে অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজে নিযুক্ত। বাকী অংশের বেশীর ভাগ ভূমিহীন ও কৃষি-শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। মাত্র ৩.৫ শতাংশ ভূঁইয়ার সামান্য কিছু জমি-জায়গা আছে।

মুচি বা চর্মকার : এরা বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে অধম সংকর পর্যায়ের উপবর্ণ বিশেষ। এরা বর্ণাশ্রম বহির্ভূত ও অস্পৃশ্য। গ্রামের প্রান্তে বাস। মৃত পশুর চর্মমোচন করাই এদের বৃত্তি। চৈতন্য মহাপ্রভু এদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে। শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যাজে।' মুচি, চর্মকার বা রুইদাস একই জাতি, একই বৃত্তি। জেলায় লোক সংখ্যার ২.৭৫ শতাংশ মুচি। বর্তমানে এরা জুতা তৈরী বা জুতা মেরামতির কাজ করে থাকে। অনেকে আবার ছাতাও মেরামত করে। কেউ কেউ ঢাক বা ঢোল বাজাতেও দক্ষ। কিন্তু ঢাক, ঢোল বাজানোর ডাক বছরের সব সময় আসে না; তাই এদের মধ্যে অনেকে কৃষি-শ্রমিক বা বর্গাদার হিসেবে জমি চাষ করে। এদের ছেলেরা জুতা পালিশ করে কিছু উপার্জন করে। শহরাঞ্চলে অনেকে কলকারখানায় দিনমজুরী খাটে। এরাও তপসিলী জাতিভুক্ত।

নমঃশূদ্র বা কোটাল : এরাও তপসিলী জাতি। বাউড়ী, বাগ্দীদের মত গ্রামের একপ্রান্তে এদের বসতি। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে এদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২.৪২ শতাংশ। নমঃশূদ্রদের ৩৩.৭৮ শতাংশ বছর খোরাকীর উপযুক্ত অল্প জমির মালিক, আবার অনেকে বর্গাচাষও করে। ২৫ শতাংশ কৃষিশ্রমিক বা ঘরামির কাজ করে। শহরে তারা কলকারখানা বা দোকানে দিন-মজুরীর কাজ করে। দেশ বিভাগের পর অনেক নমঃশূদ্র বাংলাদেশ থেকে এসে এ জেলার বসতি স্থাপন করেছে।

ডোম : মৎস্যসূক্ততন্ত্র মতে ডোম অস্পৃশ্য সংকীর্ণ জাতিবিশেষ। এরা চণ্ডাল নামেও পরিচিত। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে চণ্ডাল বা চাঁড়াল অধম সংকর বা অন্ত্যজ জাতি। গুপ্তযুগেও এদের বাস নির্দিষ্ট হত গ্রামের এক প্রান্তে শ্মশানের ধারে। এদের ছায়া স্পর্শ করলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় গ্রন্থে কয়টি

তথাকথিত নীচ জাতি চণ্ডাল, ডোম, শবর-এর উল্লেখ আছে। বহুপদের একটি পদে ডোম্বী বা ডোমপত্নীর উল্লেখ আছে।

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহেরি কুড়ি আ (কুঁড়েঘর)
তান্তি (তাঁত) বিকণঅ ডোম্বি অরব্রনা চাংগেড়া। (বাঁশের চাঙাড়ি)

ডোমেরা সাধারণত নগরের বাইরে উচ্চ পর্বতের উপর (উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী) কুঁড়েঘর বেঁধে বাস করে, বাঁশের তাঁত ও চাঙাড়ি তৈরী করে বিক্রয় করে।

চতুর্দশ চর্য্যার শেষ টীকায় ডোম্বীকে নৈরাত্মদেবী বলে বর্ণনা করা হয়েছে— পরিচর্য্যা মাত্রে ইনি ভক্তকে ভবসমুদ্র পার করেন। বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী এবং "বাইশ কবি মনসা"য় ডোমনীরূপ চণ্ডীর যে খেয়া পারাপারের কথা আছে তার মূল মনে হয় চর্য্যার ডোম্বীর ভবসমুদ্র পারের কথার পুনরাবৃত্তি। শ্মশানে শবদাহ, শববস্ত্র গ্রহণ, ধুচনী, ডালা, কুলা ইত্যাদি বিক্রয়, ইহাদের বৃত্তি। রাঢ়দেশের পুরাণ কাহিনী, ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় ডোমরা রাজার সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত হত। ধর্মমঙ্গলে কালু ডোম ছিল লাউসেনের সেনাপতি। এ জেলায় ডোমেদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১.২১ শতাংশ। গ্রামে ডোমরা ঝুড়ি, কুলো, চাঙাড়ি, তালপাতার ছাতি, তালপাতার বাঁশি এবং ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করে। ডোমেদের অনেকে ঢাক, ঢোল, সানাই বাজানোয় খুবই দক্ষ। গ্রামে-গঞ্জে পুজোবাড়ীতে বাজনা বাজায়, বিবাহ উপনয়নে নহবৎ বাজায়, অনেকে ঢোল বাজানোর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কারও পায়। শহরে ডোমেদের অধিকাংশ মেথরের কাজ করে, ময়লা ফেলে, পায়খানার ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করে, ড্রেন পরিষ্কার করে, রাস্তায় ঝাড়ু দেয়, শ্মশানে শবদাহ করে। এতেও পেট ভরে না। বাজনা বাজিয়ে মাস চলে না। তাই অনেকে কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করে। শহরে মিস্ত্রির কাজ, কুয়ো ঝালাই-এর কাজ, রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে যোগাড়ের কাজও করে। এরাও তপসিলী জাতিভুক্ত।

শুঁড়ি : শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি মদ্যবিক্রেতা অন্ত্যজ জাতি-বিশেষ। প্রাচীনকালে পানবণিক নামেও পরিচিত ছিল। পরাশর পদ্ধতি মতে কৈবর্ত হতে গন্ধিক কন্যায় এদের উৎপত্তি। হিতোপদেশে এদের উল্লেখ আছে। পয়োহপি শুঁণ্ডিকী হস্তে দারু নীত্যভিধীয়তে। অর্থাৎ শুঁড়ির হাতের জলও মদ রূপে গণ্য হয়। ১৯৬১ সালে জনগণনার সময় এদের সংখ্যা ছিল মোট লোকসংখ্যার ০.৫৮ শতাংশ। মদ্য তৈরী বা মদ্য বিক্রয় এদের জাতিগত পেশা হলেও বর্তমানে অনেকে ঘরামির কাজ

করে। ৪৭.৬৫ শতাংশ প্রান্তিক চাষী, ১৩.৩৩ শতাংশ খনি, ইটখোলা, বালির খাদ, মাছধরা, গাছকাটা এইসব কাজে নিযুক্ত। কেউ কেউ ছোটখাট ব্যবসাও করে। এরাও তপসিলী জাতিভুক্ত।

পটুয়া : বর্ধমান থেকে কিছু দূরে বর্ধমান কাটোয়া রেলপথের ধারে কৈচরের কাছে এক শ্রেণীর পটুয়া বাস করে—যারা না-হিন্দু, না মুসলমান। ২৪ পরগনা জেলার আখড়াপুঞ্জীর পটুয়াদের মত কিংবা উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মত এরা রাম, লক্ষ্মণ, বলাই, কানাই প্রভৃতি হিন্দুনাম আবার রহিম, মজিদ, মুশা প্রভৃতি মুসলমান নামও ব্যবহার করে। মুসলমানদের মত এরা দিনে বিবাহ করে, ৪১ দিনে এদের অশৌচান্ত হয়, তালাকও দেয়। আবার মেয়েরা হিন্দুমেয়েদের মত লোহা, সিঁদুর ব্যবহার করে। শীতলা মনসার মানত করে। মৃতদেহ কবর দেয়। হিন্দুমুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের এক অদ্ভুত প্রতীক এই পটুয়াজাতি। মশাগ্রামেও কিছু পটুয়া আছে। আউসগ্রাম থানার দরিয়াপুরে ঢোকরা শিল্পীরাও এইরকম না-হিন্দু না-মুসলমান।

Statesman পত্রিকার ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯৯ সংখ্যায় Naved Zahir-এর একটি রিপোর্টে পাটনায় শক্রয়ন (Shakrawan) অঞ্চলে এরূপ এক মিশ্র সংস্কৃতির বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

A staunchly Muslim family in Bihar, which goes by Hindu names and worships Hindu gods is keeping alive a bizzare tradition of catching snakes (Saanp Kadna or sanke hypnosis) that challenges scientific fact. *** According to Nat (Suresh Nat also known as Khurshid) who worships Lord Shiva while being a Muslim, the verses he chants are a family secret passed along from generation to generation. ....Goats, Chicken and Pigeon are sacrificed and country liquor offered to Masaan Baba, whom the family considers the lord of the burial ground. ...সত্য সেলুকাস! কি বিচিত্র এই দেশ!

হাড়ি : (সং-হড্ডি প / হাড়িপ / হাড়ি) এরাও নীচ অন্ত্যজ জাতি। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে এদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ০.৯০ শতাংশ। এরা সাধারণত ঝুড়ি, চাঙাড়ি তৈরী করে। শূকরপালনও অনেকের বৃত্তি। পূর্বে হাড়িদের মেয়েরা গর্ভবতী নারীদের প্রসব করাত, বাঁশের চাঁচালী দিয়ে সদ্যোজাত শিশুর নাড়ি কাটতো ও প্রসূতির সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকতো, এর ফলে শিশুদের

কাছে মাতৃত্বের মর্যাদা পেত এবং সপ্তমাতার মধ্যে এক মাতা হিসেবে গণ্য হত। আদৌ মাতা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নিকা। ধেনু, ধাত্রী (ধাইমা) তথাপৃথ্বী সপ্তেতে মাতরঃ স্মৃতাঃ। এ বৃত্তি ছিল পৌরোহিত্যের মত বংশানুক্রমিক। এর সুবাদে হাড়ি মায়েরা প্রতি উৎসব-পার্বণে পল্লীর প্রতিটি বাড়ী থেকে মুড়ি মুড়কি ভাত নিয়ে যেত। বর্তমানে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে ও প্রতি গ্রামের কাছাকাছি Health centre গড়ে ওঠায় হাড়িদের মেয়েদের এই বৃত্তির অবসান হয়েছে। এখন এরা অদক্ষ শ্রমিক ও কৃষিশ্রমিক হিসাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ্ করে।

ডঃ অশোক মিত্রের সম্পাদনায় 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে জেলার বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের তালিকা দেওয়া আছে। বইটি এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। কাজেই সেই তালিকা থেকে বোঝা যাবে কত বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি জেলায় বাস করে। তবে আশার কথা শিক্ষার অগ্রগতি ও বিজ্ঞান-চেতনা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা অনেক কমে আসছে। তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে জেলার তপসিলী জাতি ও উপজাতিসহ্ প্রায় ১৫৮ টি জাতি ও উপজাতি আছে। তালিকাভুক্ত বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি যেমন প্রাচীন হিন্দু সমাজের বর্ণভিত্তিক গোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে তেমনি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর (যেমন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি) পরিচয়জ্ঞাপক। তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী, আগুরী, উগ্রক্ষত্রিয়, একাদশ তিলি, একাদশ তেলী, ওরাঙ, কর্মকার, কলু, কলে, কাপালিক, কাপালী, কামার, কাহার, কাহাল, কায়স্থ, কান্দ, কাঁসাই, কুইরী, কুমার, কুরী, কুর্মী, কুশ, কুশমেটে, কেওড়া, কেদল, কেয়ট, কৈবর্ত, কোঙার, কোটাল, কোল, কোড়া, ক্ষত্রিয়, ক্ষেত্রী, খয়রা, খাসী, খুনিয়া, খ্রীষ্টান, গণক, গন্ধবণিক, গরাই গাড়োয়াল, গুড়া, গোপ, গোয়ালা, ঘাটোয়াল, ঘাসী, ঘুনিয়া, চণ্ডাল, চর্মকার, চামার, ছত্রী, ক্ষত্রিয়, ছুতার, জেলে, জোলা, ডোম, তপসিল হিন্দু, তাম্বুলী, তাঁতী, তেলী, তেঁতুলে বাগ্‌দী, দুর্লভ, দুলে, দেবনাথ, দেশওয়ালী, দেশ পুরোহিত, দ্বাদশ তিলি, ধীবর, ধুনিয়া, ধোপা, নবশাখ, নমঃশূদ্র, নাপিত, পদ্মান, পরামানিক, পল্লবগোপ, পাটকার, পোদ্, পোদ্দার, প্রামাণিক, বণিক, বর্গক্ষত্রিয়, বর্ণক্ষত্রিয়, বর্ণহিন্দু, বাউনী, বাউড়ী, বাগ্‌দী, বাগল বা বাগাল, বাদ্যকার, বারুই, বারুজীবী, বায়েন, বেনে, বেলুতি, বৈদিক ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ভট্টরায়, ভুঁইয়া, ভূমিজ, ভূমিহার, মণ্ডল, মাহাতো, ময়রা, মাঝি, মাল, মালাকার, মালী, মালো, মাড়োয়ারী, মাহারী, মাহালী, মাহিষ্য, মুচি, মুন্ডা, মুসলমান, মুড়া,

মেটিয়া, মেটে, মেথর, মোদক, যাদব, যুগী, যোগী, রজক, রাজওয়ার, রাজপুত, রাজবংশী, রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, রুইদাস, বেওয়ানী, লোহার, শাঁখারী, শুঁড়ী, শূদ্র, সদ্গোপ, সৎ চাষী, সরাই, সর্দার, সহিস, সামন্ত, সাহা সাঁওতাল, সিধাই, সুণ্ডিত, সুবর্ণবণিক, সুমণ্ডল, সূত্রধর, সেটগুল, মৌমণ্ড, স্বর্ণকার, স্যাকরা, হাড়ী, হিন্দু।

আমার মনে হয় এই তালিকায় বিভিন্ন নামে পরিচিত বা একই জাতিকে বিভিন্ন নাম অনুসারে একাধিক বার দেখানো হয়েছে। যেমন ছুতার ও সূত্রধর একই জাতি, রুইদাস ও মুচি একই জাতি, স্বর্ণকার ও স্যাকরা, সিধাই, গড়াই ও কলু, নাপিত ও পরামাণিক, শুঁড়ি ও প্রামাণিক, কোটাল ও নমঃশূদ্র ইত্যাদি একই জাতি।

Dist. Census Hand Book—Bardhaman-এ পশ্চিমবঙ্গের তপসিলী জাতি ও উপজাতির যে তালিকা আছে তার মধ্যে অনেকগুলিই কিন্তু উপরের তালিকাভুক্ত হয় নাই। অবশ্য এমন হতে পারে, ঐসব জাতি এ জেলায় বাস করে না। কিন্তু জীবিকার সন্ধানে এই সব জাতির মধ্যে বিভিন্ন জেলায় চলাচল বেশীই হয় এবং কাজের সন্ধানে জেলায় এসে অনেকে এখানে থেকেও যায় কাজেই যে সব জাতির নাম উপরের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় নাই সেগুলির নাম নীচে দেওয়া হল।

তপসিলী জাতি : বাহেলিয়া, বাইতি, বান্তার, বেলদার, ভোগতা, ভুঁইমালী, চৌপাল, দাবগড়, দামাই (নেপালী), দোয়াই, দোশাদ, গোনর্হি, হালালখোর, কাদার, কামি (নেপালী), কাঁদরা, কান্জার।

তপসিলী উপজাতি : অসুর, বাইগা, বেদিয়া, ভূটিয়া, শেরপা বা টোটো, বীরহোর, বীরজিয়া, চাকমা, চেরো, চিক বারিক, গোঁদ, গরাইত, হাজাঙ, হো, কারমালি, খারওয়ার, খোঁদ, কিষান, লেপচা, লোধা বা খেরিয়া, লোহাতা বা লোহ্রা, মাঘ, মালপাহাড়িয়া, মেচু, নাগেশিয়া, পাড়হাইয়া, রাঙা, সৌরিয়া, পাহারিয়া, শবর, ম্রু।

পনের অধ্যায়



ধর্ম

বর্ধমান জেলার অধিবাসীদের আচরিত ধর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বর্তমানে এখানে প্রচলিত ধর্মের মধ্যে দুটিই প্রধান—হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্ম। এছাড়া খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বনকারীদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। অল্প সংখ্যক জনগণের মধ্যে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আচরণ দেখা যায়।

নীচের সারণী থেকে ১৯০১ থেকে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন জনগণনা বৎসরের তালিকা থেকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হ্রাস-বৃদ্ধির একটা চিত্র পাওয়া যাবে।

জনগণনা বৎসর	১৯৭১	১৯৬১	১৯৩১	১৯০১
জেলার লোঃ সঃ	৩৯,১৬,১৭৪	৩০,৮২,৮৪৬	১৫,৭৫,৬৯৯	১৫,৩২,৪৭৫
হিন্দু ধর্মাবলম্বী	৩২,১৯,৬৪২	২৫,৯৮,৮৭৫	১২,৩৮,৮৭২	১২,২১,০২৭
শতকরা হার	৮২.২১	৮৪.৩০	৭৮.৫২	৭৯.৬৭
ইসলাম ধর্মাঃ	৬,৭২,২২৭	৪,৬৭,৬৬৯	২,৯২,৪৭১	২,৮৭,৩৩৯
শতকরা হার	১৭.১৬	১৫.১৭	১৮.৫৬	১৮.৭৫
খ্রীষ্ট ধর্মাঃ	১০,৪০৯	৭,৯৬৩	৫,৪৪০	২,৯৬০
শতকরা হার	০.২৭	০.২৬	০.৩৪	০.১৯

এই তো গেল প্রধান তিন ধর্মাবলম্বীদের বর্তমানের একটা মোটামুটি চিত্র।

কিন্তু পাণ্ডুরাজার ঢিবির খননকার্যের ফলে জেলায় সিন্ধু সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক এক প্রাচীন তাম্রোপোলীয় সভ্যতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে বাণেশ্বরডাঙ্গা, সাঁওতালডাঙ্গা ও ভরতপুরের খননকার্যের ফলে প্রাগৈতিহাসিক ও বৌদ্ধ যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সমস্ত নিদর্শনের চতুর্দশ কার্বন C-14 পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে অন্তত তৃতীয় স্তর বা চতুর্থ

স্তরের নিদর্শনগুলি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০–২০০০ বৎসরের প্রাচীন। এখন প্রশ্ন সেই সময়কার জনগণের ধর্ম কি ছিল বা আদৌ ছিল কিনা। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর "বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে আর্যসভ্যতা এ দেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু তার পূর্বে এ দেশে যারা বাস করতো তাদের ধর্মমত জানবার উপায় নাই। অবশ্য ডাঃ মজুমদারের বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। আর পাণ্ডুরাজার ঢিবির খননকার্য শুরু হয় ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে। যদিও ডাঃ মজুমদারের বইটির পরবর্তী সংস্করণে এই খননকার্যের উল্লেখ আছে কিন্তু বিশদ আলোচনা নাই। কিন্তু তিনি মন্তব্য করেছেন, যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলির সাহায্যে আর্য জাতির সঙ্গে সংস্পর্শের পূর্বে বাঙালীর কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের মনে হয় কৃষ্টি ও সভ্যতা ধর্মকে বাদ দিয়ে নয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ধর্ম : পাণ্ডুরাজার ঢিবির তৃতীয় স্তরে যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তার কার্বন-১৪ পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এখানকার সে যুগের সভ্যতার উন্মেষকাল ১৫০০–২০০০ খ্রীষ্টপূর্ব। সিন্ধু ও অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর তীরে সিন্ধু সভ্যতার যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার উন্মেষকাল পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০। কাজেই পাণ্ডুরাজার ঢিবির সভ্যতা ও সিন্ধুসভ্যতা প্রায় সমসাময়িক। মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কৃত নিদর্শনের মধ্যে মাতৃকা-মূর্তির ছোট ছোট শিলমোহর পাওয়া গেছে। স-ককুদ বৃষ এবং তিনটি মস্তক ও দুইপাশে ২টি শিং ও পশু সম্বলিত শিলও পাওয়া গেছে। স-ককুদ বৃষ শিবের বাহন, ত্রি-মূর্তি ও দুটি শিং ত্রিনেত্র ও ত্রিশূলের প্রতীক বলে অনুমিত হয়। এখানে গাছ ও পশুর প্রতীক সমন্বিত শিলও আবিষ্কৃত হয়েছে। ৬/৬/৯৭ তারিখে The Telegraph পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় হরপ্পা Dholava Veera Camp থেকে Project Director R. S. Bisht যে খননকার্য চালান তার ফলে মুণ্ডহীন ধ্যানরত পশুপতির শিল পাওয়া গেছে। এই সব নিদর্শন থেকে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় জনগণের মধ্যে উর্বরতার প্রতীক মাতৃকাদেবীর এবং Proto-Shiva-cult বা আদিম শৈবতন্ত্র প্রচলিত ছিল। *পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর "পূজাপার্বণের উৎসকথা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—প্রত্ন-* প্রস্তরকালের ছোট ছোট যে সমস্ত আদিম ভাস্কর্যের নিদর্শন আমরা পেয়েছি তার সব কটিই কৃষি আবিষ্কারের বহু হাজার বছর আগের শিল্পীদের সৃষ্টি। এই মূর্তিগুলি আদিম মানুষের মাতৃকা চেতনার লব্ধ ফল। এই সমস্ত মাতৃকা প্রত্নতাত্ত্বিক পরিভাষায় যাদের নাম "ভেনাস-ফিগারাইনস্", নির্মিত হয়েছিল

কমবেশী ২০,০০০ বছর আগে তো বটেই।... মাতৃকাতন্ত্রের ভৌগোলিক ব্যাপ্তি প্রায় সারা পৃথিবী জুড়েই ঘটেছিল।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির খননকার্যের ফলে যে সব নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে তাদের নাসিকার গঠন কতকটা সাঁওতালদের নাসিকার অনুরূপ। কিন্তু এর থেকে অনেকে অনুমান করেন এখানকার অধিবাসীরা ছিল সাঁওতাল। সাঁওতালদের একমাত্র টোটেম উপাসনা ছাড়া নিজস্ব কোন ধর্মের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্যান্য উন্নততর জাতির নরকঙ্কালের সঙ্গে এখানকার নরকঙ্কালের দৈহিক উচ্চতা, করোটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, নাসিকার উন্নতির তুলনামূলক আলোচনা করলে সিদ্ধান্ত করতে অসুবিধা হয় না যে এখানে সাঁওতালদের থেকে উন্নততর নরগোষ্ঠীর বসতি ছিল। Bulletin of Antrhropoligical Survey of India Vol. XIX-এর Human Skeletal Material Excavated at Pandu Rajar Dhibi অধ্যায়ে বিভিন্ন জাতির নরকঙ্কালের বিভিন্ন অংশের যে পরিচয় দেওয়া আছে তার থেকে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায়। পরিমাপের সারণী নীচে দেওয়া গেল।

	পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নরকঙ্কাল মি.মি.	ব্রাহ্মণদের নরকঙ্কাল মি.মি.	কায়স্থদের নরকঙ্কাল মি.মি.	সাঁওতালদের নরকঙ্কাল মি.মি.
দৈহিক উচ্চতা	১৬৮৫.২০	১৬৫০.৪৩	১৬৮৩.০০	১৬০৬.০০
করোটির দৈর্ঘ্য	১৮০.৭৫	১৮২.১৩	১৮৫.০০	১৮২.৬০
বাগ্‌দীদের দৈর্ঘ্য	১৮০.৩৮			
করোটির প্রস্থ	১২৬.৫০	১৪০.৯৬	১৪২.২০	১৪১.০০
বাগ্‌দীদের প্রস্থ	১৩৫.৯২			
নাসিকার উচ্চতা	৪৪.০০	৫০.৭০	৪৬.৭০	৪৬.৪০

এই সারণী পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে পাণ্ডুরাজার ঢিবির নরকঙ্কালের আয়তনের সঙ্গে কায়স্থদের কঙ্কালের আয়তনের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু করোটির আয়তনের দিক দিয়ে বিচার করলে বাগ্‌দীদের সঙ্গে খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

পল্লব সেনগুপ্তের তথ্যে বিশ্বাস করতে হলে প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকেই বা তারও পূর্ব থেকে মাতৃকাতন্ত্র জগতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছিল। বর্ধমান জেলা জগতের বাইরে নয়। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি পর্যালোচনা করলে এই তথ্যের সমর্থন মেলে।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির খননকার্যের ফলে তৃতীয় স্তরে মুণ্ডবিহীন পশুর পোড়ামাটির প্রতিকৃতি; দীর্ঘকণ্ঠী পক্ষী (ময়ূর?) ও স-ককুদ বৃষের শিল পাওয়া গেছে। এ ছাড়া উর্বরতার প্রতীক পোড়ামাটির ভগ্নমাতৃকা মূর্তিও পাওয়া গেছে। স-ককুদ বৃষ ও পশুপক্ষী শিবের বাহন, মাতৃকামূর্তি মাতৃতন্ত্রের প্রতীক। কাজেই সিদ্ধান্ত করতে অসুবিধা নেই যে পাণ্ডুরাজার ঢিবি অঞ্চলে Shiva-Sakti cult বা শৈব ও মাতৃতন্ত্র প্রচলিত ছিল। পশুমূর্তি উপাস্য দেবতার Totem হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া এগুলির দ্বারা এখানকার জনগণের মধ্যে animism বা সর্বপ্রাণবাদ, সর্ব জড় ও প্রাণীর মধ্যে অধ্যাত্ম আরোপেব তত্ত্ব সমর্থন করে। এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, এখানকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যদি এই animism বা সর্বপ্রাণবাদ সমর্থিত হয়, তাহলে প্রমাণিত হয় আর্যগণ তাঁদের বৈদান্তিক সূত্র 'তত্ত্বমসি' বা জীব, জড় ও ব্রহ্মের একত্ব-তত্ত্বের সূত্র এই প্রাক-আর্যদের animism থেকে পেয়েছিল।

আনন্দবাজার পত্রিকার ২৫.১.৯৪ তারিখের একটা সংবাদে দেখা যাচ্ছে আমেরিকার লুইসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানী সুভাষ কাক 'ভিসটাস অফ অ্যাষ্ট্রনমি' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে ঋকবেদে সূর্য, চাঁদ ও গ্রহ উপগ্রহের কক্ষপথের সংকেতলিপি থেকে প্রমাণ করেছেন যে আর্যরা আজ থেকে প্রায় ৯০০০ বছর আগে ভারতে এসেছিলেন। যদিও জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের এ. কে. বাগ বিষয়টি খতিয়ে না দেখে এ তথ্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে চান না, তবু প্রশ্ন জাগে আর্যরা যদি ৯০০০ বছর আগে ভারতে এসে থাকেন, তাহলে এ জেলাতেও আর্যদের আগমন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বেই ঘটেছিল, তা যদি সত্য হয় তাহলে আদিম অধিবাসী হবেন আর্যরা ও পাণ্ডুরাজার ঢিবির অধিবাসীরা আর্যদের সংস্পর্শে এসে এই সর্বপ্রাণবাদ তত্ত্ব গ্রহণ করে। অবশ্য সমস্তই এখন অনুমান, এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখনও সময় আসে নাই।

এখন বর্ধমান জেলার আধ্যাত্মিকতার ধারা সম্বন্ধে সামগ্রিক আলোচনা করে প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্ম ও দেবদেবী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। আধ্যাত্মিকতা একটি সূক্ষ্ম ধারণা; এর প্রকৃত অর্থ ও আদর্শ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নাই। তবে একটা কথা পরিষ্কার যে অনাদিকাল থেকে কোন না কোন সূত্রে ধর্মকেই আশ্রয় করেই আধ্যাত্মিকতা গড়ে উঠেছে। এই ধর্ম নিয়েও যুগে যুগে দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্ব, হিংসা, প্রতিহিংসা ঘটে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা বিশেষ ধরনের দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই একটা জাতির ধর্মমত গড়ে ওঠে। কোন জাতির এই আধ্যাত্মিকতাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দু-একটি মুখ্য ধারা থাকে, তার সঙ্গে

যুক্ত হয় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারা-উপধারা। এইভাবে কোন জাতির আধ্যাত্মিক মানস গড়ে ওঠে ও ধীরে ধীরে তা পুষ্টিলাভ করে। কিন্তু মূল ধারার সঙ্গে যখনই অন্য একটি ভিন্নধারা যুক্ত হয় তখনই শুরু হয় সংঘাত, সংঘাতের পর চলতে থাকে সমন্বয় ও সমীকরণ।

আগেই বলা হয়েছে আর্যদের এদেশে আসার আগে আর্যেতর জাতির মধ্যে মাতৃপূজার প্রাধান্য ছিল। তার কারণ ছিল, তখন সন্তানের পিতৃপরিচয় ছিল অনিশ্চিত, মায়ের পরিচয়েই ছেলের পরিচয় ছিল। কিংবা এও হতে পারে যে, তখনকার আর্থিক জীবন ছিল সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর, মাটিকে তখন লোকেরা 'মা' বলেই মনে করত; তাই ভূদেবীর আরাধনার প্রাধান্য ছিল।

বৈদিক আর্যরা ছিলেন পিতৃতান্ত্রিক। তাদের দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি পুরুষ দেবতারই প্রাধান্য। এই মাতৃতান্ত্রিকতা ও পিতৃতান্ত্রিকতার সংঘাতের ফলেই ধীরে ধীরে মাতৃকাতন্ত্র ও শৈবতন্ত্রের দুটি মূল ধারা আমাদের আধ্যাত্মিকতার মধ্যে বয়ে চলেছে। বর্ধমানের আধ্যাত্মিকতা বিশ্লেষণ করলে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির মত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মেরও মিলন ঘটেছে বর্ধমানে। মানকরের হিতলাল মিশ্রের বাড়ীতে বঙ্গাক্ষরে হস্তলিখিত বৈদিক পুঁথি ছিল। এর থেকে মনে করবার কারণ আছে, এককালে এখানে বৈদিক ধর্মের প্রাধান্য ছিল। জেলার জাতির মধ্যে খুব কম সংখ্যক হলেও বৈদিক ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব বর্তমান। পার্শ্বনাথের মূর্তি যে হারে আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে জৈনধর্মের প্রাধান্যও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বাঁকুড়া, বর্ধমান ও পুরুলিয়ার সীমান্তে জৈন ধর্মাবলম্বী শরাক জাতির বাস। আসানসোল, রানীগঞ্জ, বর্ধমান শহরে যে সব মাড়োয়ারী জাতি বাস করে তাদের মধ্যে অনেকেই জৈন ধর্মাবলম্বী। সাত-দেউলিয়া গ্রামে মহাবীর তীর্থঙ্করের অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। মঙ্গলকোট থানার বাবলাডিহি-শঙ্করপুরের ন্যাংটাশ্বরের মূর্তি প্রকৃতপক্ষে জৈন তীর্থঙ্করেরই মূর্তি। অনেকে অবশ্য বলেন মহাবীরকে এ জেলার লোক ভাল চোখে দেখে নাই। তাই তার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। কুকুর হচ্ছে বাউড়ী-বাগ্‌দীদের 'টোটেম'। এ অঞ্চলে মহাবীর বিশেষ কৌমের কাছে ভাল ব্যবহার না পেলেও অন্যের কাছে তো পেতে পারেন। তা না হলে এখনও তিনি পূজা পাচ্ছেন কি করে। অনেকের মতে বর্ধমানের নামের সঙ্গে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের পূত স্মৃতি জড়িত। কাজেই এ জেলায় জৈনধর্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

বাণেশ্বরডাঙ্গায় ঢিবির শীর্ষস্তরে চারচাল মন্দির ও একটা স্তূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্তূপটি জৈন কিংবা বৌদ্ধস্তূপ বলেই অনুমান করা হয়। পানাগড়

রেলস্টেশন থেকে ৭ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে দামোদর নদীর বামতীরে ভরতপুরে ৩০,০০০ বর্গমিটার ব্যাপী টিবিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতের পুরাতত্ত্ববিভাগের যৌথ উদ্যোগে যে খননকার্য চালান হয় তাতে যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার থেকে নব তাম্রপলীয় যুগের ও লৌহযুগের সভ্যতার অস্তিত্ব ছাড়াও ৯ম/১০ম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সমর্থিত হয়।

আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন ধারা

মাতৃকাতন্ত্র : বর্ধমানে আধ্যাত্মিক মানসে মাতৃতান্ত্রিকতারই প্রাধান্য দেখা যায়। তান্ত্রিক সাধনার পীঠস্থান এই বর্ধমান। সাধক কমলাকান্তের সাধনার ক্ষেত্র, এখানে রয়েছে কমলাকান্তের কালীবাড়ীতে। বর্ধমানে সর্বমঙ্গলা, কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী, কাঁদড়ার বহু লক্ষ্মী, কালিকা, রক্ষাকালী, মাজিগ্রামের শাকম্ভরী, কলিগ্রামের জয়দুর্গা, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, শুশুনা ও নারানপুরের তারাক্ষ্যা, হরিবাটির রক্ষাকালী, নারকোলডাঙ্গার জগৎগৌরী, বোঁয়াই-এর বোঁয়াইচণ্ডী, অমরারগড়ের শিবাখ্যা, কাইতির বাণেশ্বরকালিকা, পালসিটের জগদ্ধাত্রী, অমরপুরের জয়চণ্ডী, কাটোয়ার সিদ্ধেশ্বরী, কালনার অম্বিকা, হালদা পাহাড়ের শিখরভূমের কল্যাণেশ্বরী ছাড়া ও জেলার এখানে ওখানে খণ্ডেশ্বরী কালী, আরখাই চণ্ডী, কলাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, নাটাই চণ্ডী, উড়নচণ্ডী, এলাই চণ্ডী, খাগড়া চণ্ডী, রূপাই চণ্ডী, কুলাই চণ্ডী, খাড়া চণ্ডী, আটক চণ্ডী জেলার আধ্যাত্মিকতার মানসে মাতৃতান্ত্রিকতা ও Sakti Cult-এর প্রাধান্য সূচিত করে। মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে যেসব দেবদেবীর উল্লেখ আছে তার থেকেও এই শক্তিতন্ত্রের প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য কালিকা, মনসা, লক্ষ্মী, চণ্ডীকা, শাকম্ভরী, তারাক্ষ্যা সবই শক্তিরূপিণী ও অভিন্ন। মনসামঙ্গলে দেখি চাঁদ সদাগর যখন 'পদ্মার' পূজা করতে অস্বীকৃত হলেন তখন দৈববাণী হয়।

পদ্মাবতী পূজা কর চান্দ সদাগর
একই মূর্তি দেখ সব না ভাবিও আর
যেই জান ভগবতী সেই বিষহরি;
পদ্মার প্রসাদে আমি ভবসিন্ধু তরি ।।

এ জেলায় শুধু যে মনসাই মূলত শক্তিরূপা রয়ে গেছেন তাই নয়—শীতলা, ষষ্ঠী, কমলা, বাশুলী প্রভৃতি সব দেবীই শক্তিরূপা। ভৃগুরাম দাস তাঁর ষষ্ঠীমঙ্গলে উল্লেখ করেছেন।

দুর্গানামে ষষ্ঠী পূজি আশ্বিনে আনন্দ।
যেই বর মাগে পায় নাই তার সন্দ ॥

কুব্জিকাতন্ত্রে রাঢ়ের তথা বর্ধমানে ডাকার্ণবের নয়টি পিঠের উল্লেখ আছে।

শৈবতন্ত্র : শৈবতন্ত্রের প্রাধান্যও কম নয়। এ জেলায় এমন গ্রাম ও শহর খুব কমই আছে যেখানে একাধিক শিবলিঙ্গ ও শিবের মন্দির নাই। বর্ধমানেই রয়েছে সর্বমঙ্গলাবাড়ীর দ্বাদশ শিব; শ্যামসায়রের পাড়ে ঈশানেশ্বর; নবাবহাটের ১০৮ শিব; কড়ুই-এর জলতলবাসী বুড়োশিব; আলমগঞ্জের ভিখারী বাগানে ১৯৭২ সনে নব আবিষ্কৃত বিশিষ্ট খিলানে তৈরী ৯ টন ওজনের মহাশিব—বর্ধমানেশ্বর; কেতুগ্রামের অনাদিলিঙ্গ শিব, বিল্বেশ্বর শিব, কালরুদ্র শিব; কাটোয়ার বাণলিঙ্গ, বাবা বৃদ্ধশিব, কালিন্দীনাথ; মঙ্গলকোটের ন্যাংটেশ্বর শিব, দেউলেশ্বর শিব, মন্তেশ্বরের মহেশ্বর; মেমারীর অনাদি লিঙ্গ শিব, ফটিকেশ্বর, জলেশ্বর; জামালপুরের অনাদি লিঙ্গ, কাশীনাথ, ভুবনেশ্বর, রামেশ্বর; কাইতির বাণেশ্বর; খণ্ডঘোষের স্বয়ম্ভু শিব, মৃত্যুঞ্জয়, ভাতারের বুড়োশিব; গলসীর মানিকেশ্বর, মল্লিকেশ্বর, আদাড়েশ্বর, ভৈরব, বৃদ্ধশিব; আউসগ্রামের খড়োশ্বর মহাদিদেব, সমোরনাথ, বুদ্ধেশ্বর; কাঁকসার আদিনাথ; রানীগঞ্জের ভৈরব; অণ্ডালের কালাগ্নিরুদ্র; জামুরিয়ার নীলকণ্ঠ; মাজিগ্রামের কালিন্দীনাথ; বারিশিয়ালীর কাশীনাথ; গোপালপুর (দেনুড়)-এর গোপীনাথ; ইকরার ভোলানাথ, কুলীনগ্রামের রামনাথ; কামারপাড়ার আটকোণা মন্দিরের শিব; কালনা বরাকরের পাঁচশিব, এরকম প্রায় পাঁচশোর অধিক শিব জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মহেঞ্জোদরো, হরপ্পার, পাণ্ডুরাজার ঢিবির জনগণের protoshiva cult-এর Tradition আজও সমানভাবে বয়ে চলেছে।

বৌদ্ধধর্ম : বৌদ্ধধর্ম এখানেও সহজিয়াতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বৌদ্ধসহজিয়াবাদ রামাই পণ্ডিতের বিধান। তারাদেবী তো বৌদ্ধ প্রভাবিত বলেই পরিচিত। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার আদিমূর্তি বলে যা দেখানো হয় সেটি বর্তুলাকার বৌদ্ধ মূর্তি। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা জলতলবাসিনী বৌদ্ধদেবী। তারা বা তারাক্ষ্যাদেবী বৌদ্ধদেবী বলে পরিচিতা। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয়—বৌদ্ধ সহজিয়াই হোক, জৈনই হোক আর ধর্মপূজাই হোক, কেউ এখানকার শিবশক্তিকে গ্রাস করতে পারে নাই। বরং উল্টোটাই ঘটেছে। শিব ও শক্তিতন্ত্র জৈন, বৌদ্ধ, সহজিয়ার ধর্মঠাকুরকে গ্রাস করে নিজ স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। যেমন ঘটেছে শঙ্করপুরের ন্যাংটাশ্বরের বেলায়, যেমন ঘটেছে বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা ও ক্ষীরগ্রামের জলতলবাসিনীর যোগাদ্যার ক্ষেত্রে। আবার কোথাও ঘটেছে উভয়-তন্ত্রের সমন্বয়, বুড়োশিবের বুড়ো

আর ধর্মরাজের 'রাজ'-এর সমন্বয় ঘটেছে জামালপুরের বুড়োরাজের ক্ষেত্রে। জামালপুরের বুড়োরাজের মতো কুড়মুনের শিবঠাকুরের গাজন হয়। পুঁতিগন্ধময় নরমুন্ড নিয়ে সন্ন্যাসীদের পৈশাচিক নৃত্য এই গাজনের বিশেষ আকর্ষণ। রায়না থানার নাড়ুগ্রামের নাড়েশ্বরেরও ময়ূরপঙ্খী নিয়ে গাজন হয়। বোড়ো বলরামের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের দেবকল্পনার সমন্বয় ঘটেছে। ধর্মরাজ কূর্মমূর্তিতে অধিকাংশ গ্রামে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এখনও পূজা পান। সুহারীর ধর্মরাজের গাজনে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের সমান অধিকার। ভাতারের সন্নিকটে বেলডাঙ্গার ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তি। বনপাশ কামারপাড়ার ধর্মরাজের গাজনে আগে শুয়োর বলি হত—মদের ভাঁড়ার নিয়ে সন্ন্যাসীদের নৃত্য ছিল বিশেষ আকর্ষণ।

বৈষ্ণব সহজিয়াবাদ : শৈব ও শাক্ত ধর্মের প্রসার ছাড়াও বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য আছে বর্ধমানে। কড়চা প্রণেতা মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য পরিক্রমার সহচর গোবিন্দদাসের বাস ছিল কাঞ্চননগরে। 'কুলীনগ্রামের কথা কহনে না যায়। শূকর চড়ায় ডোম, সেও কৃষ্ণ গায়।' শ্রীখণ্ড, কোগ্রাম, দেনুড়, ঝামটপুর বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। কালনার একচাকা গ্রামে শ্রীখোলের উদ্ভব হয়। ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে।

এছাড়া ধর্মপূজার মতো মনসাও এখানে সর্বত্র পূজিতা। গোবিন্দপুর, হাসনহাটি, গাংপুর, দেপুর, আমোদপুর, মণ্ডলগ্রাম, নারকেলডাঙ্গা, কামারপাড়া, সিঙ্গুর, আটকেটিয়া, পিড়তলী প্রভৃতি গ্রাম মনসাপূজার পীঠস্থান। এই কূর্মপূজা বা সর্পপূজা প্রকৃতপক্ষে টোটেম পূজা এবং এগুলি সাধারণত নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই বেশী প্রচলিত। তবে ইতর ভদ্র সব শ্রেণীর মানুষই এই পূজায় অংশগ্রহণ করে। বর্ধমানের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির শিবতন্ত্র ও শক্তিতন্ত্রের দুটি মূলধারার সঙ্গে জৈন, বৌদ্ধ, সহজিয়া, বৈষ্ণব, টোটেম পূজার বিভিন্ন ধর্মের উপধারা মিশে মূল ধারাকেই পুষ্ট করেছে। তাতে মূল ধারার কোন পরিবর্তন হয় নাই।

বিভিন্ন ধর্ম ও দেবদেবী

শাক্ত-ধর্ম ও শাক্ত-সম্প্রদায় : রাঢ় বাংলা শক্তি উপাসনার প্রাধান্য সর্বজন-স্বীকৃত। বর্ধমান জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। শক্তি উপাসনার সঙ্গে শৈব সাধনা নীতিগত ভাবে সংযুক্ত। অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা এই ধারণার মূর্তরূপ। 'হরগৌরী ঘুচে হল অর্ধনারীশ্বর' (বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়)। এই শাক্তধর্মের মধ্যে মূল ধারায় রয়েছে পার্বতী-গিরিজা-উমা-দক্ষ কন্যা সতী, রয়েছে দশমহাবিদ্যা। সতীর দেহাংশ অবলম্বনে সারা দেশ জুড়ে যে একান্নপীঠ তার নয়টি পশ্চিমবঙ্গে ও বর্ধমান

জেলায় তিনটি—কোগ্রাম উজানীতে দেবী মঙ্গলচণ্ডী, ভৈরব কপিলাম্বর; কাটোয়ার কাছে কেতুগ্রাম থানায় অট্টহাসে দেবী ফুল্লরা, ভৈরব বিল্বেশ্বর এবং ক্ষীরগ্রামে দেবী যোগাদ্যা, ভৈরব ক্ষীরকন্টক। শক্তিদেবীর কত নামেই না পরিচয়। অসুরনাশিনী চণ্ডী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, অভয়দায়িনী অভয়া, মঙ্গলাকারিণী সর্বমঙ্গলা, আর আছে করালবদনা কালিকা। মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী, তারাক্ষ্যা, শাকম্ভরী সকলেই মূলদেবীর রূপভেদমাত্র। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রানুসারে আকৃতি ও প্রকৃতিতে পৃথক হলেও ইহারা মূলত এক। নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্। তথাপি তৎ-সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম। (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১ম অঃ ৬৪) অর্থাৎ সেই মহামায়া নিত্যা। জন্মমৃত্যুরহিতা আবার এই জগৎ প্রপঞ্চই তাঁহার বিরাট মূর্তি। তিনি সর্বব্যাপী ও নিত্যা হইলেও তাঁহার বহু প্রকার আবির্ভাবের বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ করুন (সুরথ রাজার প্রতি মেধা ঋষির উক্তি)।

কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তিনি উপজাতি সম্ভূতা উর্বরতার প্রতীক। জেলায় কালিকাদেবী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিতা। বরাকর থানার হালদা পাহাড়ে দেবীস্থান বা মাইথনে তিনি কল্যাণেশ্বরী, বর্ধমানে সর্বমঙ্গলা, কাঞ্চননগরে কঙ্কালেশ্বরী, পূর্বস্থলী থানার ১৮৬ নং নসরতপুরে তিনি বাগদেবী, কিন্তু সরস্বতী নয়, তিনি শস্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী—উর্বরতার প্রতীক। ধান্যখেড়ুরের কালী ও শুশুনিয়ার তারাক্ষ্যাও আসলে কালীমূর্তি। অম্বিকাকালনার চামুণ্ডা দেবী সিদ্ধেশ্বরী; মানকরের আনন্দময়ী, পঞ্চকালী, বড়কালী; বড়বেলুনের বড়-মা; তকীপুরের বড়কালী, আর আছে প্রায় প্রতি গ্রামেই রক্ষাকালী।

শক্তিপূজার কালিকার পরে দুর্গাদেবীর প্রাধান্য। দুর্গাদেবীর মধ্যে ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার নাম আগেই করতে হয়। ক্ষীরগ্রাম মহাপীঠস্থান।

ভূতদাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্টকঃ
যুগাদ্যায়াং মহাদেব দক্ষাঙ্গুলং পদো মম।

পুরাণমতে দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে উন্মত্তবৎ নৃত্য করতে থাকেন, বিষ্ণু সেই দেহ চক্রদ্বারা ছেদন করেন। দেহের বিভিন্ন অংশ দেশের বিভিন্ন স্থানে পড়ে। সেই সব স্থান হয় মহাপীঠস্থান। ক্ষীরগ্রামে পড়ে দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ, দেবী যোগাদ্যা ভৈরব ত্রিপুরেশ ক্ষীরকন্টক। জলতলবাসিনীদেবী শস্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। রামায়ণে দেবীকে পাতালবাসিনী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃত্তিবাসের যোগাদ্যা বন্দনায় পাই : 'মাথায় প্রতিমা করি আন্যা হনুমান। অবনী মণ্ডল মধ্যে ক্ষীরগ্রাম নাম।' কষ্টিপাথরে ক্ষোদিত দেবীর দশভূজা

দুর্গামূর্তি। ক্ষীরগ্রামের পশ্চিমে ঢেকুর গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীদেবী দিক্‌কারী। দশভূজা দুর্গামূর্তি। কেতুগ্রামের বহুলা মহাপীঠ, এখানে দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক, ভৈরব কার্তিক গণেশ সহ দেবী দুর্গার মূর্তি। অট্টহাসে দেবী ফুল্লরা, ভৈরব বিল্বেশ্বর; কালনায় সিদ্ধেশ্বরী মহিষমর্দিনী দুর্গা। তবে বাসন্তীর প্রচলন খুব বেশী নাই।

জেলায় প্রায় প্রতিটি গ্রামেই চণ্ডীপূজার প্রচলন আছে। এই চণ্ডীর বিভিন্ন নাম—বোঁয়াইচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, কুলাইচণ্ডী, পাতাইচণ্ডী, একাইচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, ঘাগরচণ্ডী এবং এমনি কত চণ্ডী। অনেক গ্রামে দেবীর থানে দেবী চিত্রে আঁকা হয়, কোথাও গাছের নীচে মূর্তি নির্মাণ করে কিংবা পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়ার প্রতীকে দেবীর পূজা হয়। সমস্ত চণ্ডীর মধ্যে কোগ্রামের মঙ্গলচণ্ডী, পাতাইহাটের পাতাইচণ্ডী, একাইহাটের একাইচণ্ডী খুবই জাগ্রত বলে প্রবাদ। এদের পূজায় উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ সকল জাতিই অংশগ্রহণ করতে পারে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য হল মুকুন্দরামের দামুন্যার কবিবংশের আরাধ্যাদেবী সিংহবাহিনী চণ্ডীদেবী। ধাতুনির্মিত চতুর্ভুজা অপূর্ব মূর্তি—দেবীর ওপরের দুই হাতে পদ্ম ও চক্র এবং নীচের হাতে ত্রিশূল, পদতলে সিংহ ও মহিষাসুর। মূর্তিটিকে ভট্টাচার্য বংশের পারিবারিক উৎসবের সময় ছোটবৈনানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাচীন মূর্তিটি অবশ্য চুরি যায়। কিছুকাল পূর্বে মূর্তি নির্মিত হয়। মাজিগ্রামের শাকম্ভরীও চণ্ডীমূর্তি, শ্রীখণ্ড বা বিদ্যাখণ্ডের খণ্ডেশ্বরীও চণ্ডীদেবী।

শৈবধর্ম : শিব ও রুদ্র—রক্ষক ও সংহারক। শিব আবার মহাযোগী মহেশ্বর, তিনিই মহাদেব। ত্রিপুর ধ্বংসের পর শিব দেবতাদের অর্ধেক তেজ গ্রহণ করেন। এর ফলে তার বল অন্য সকল দেবতাদের অপেক্ষা অধিক এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হন। শিব ও মহাদেবের নাম বেদে পাওয়া যায় না কিন্তু রুদ্রের উল্লেখ আছে। এই রুদ্রই মহাদেব ও শিবে পরিণত হয়েছে। ধ্যানমগ্ন মহাদেবের বর্ণনা এইরূপ—তাঁর ললাটে তৃতীয় নয়ন, তার উপর অর্ধচন্দ্র, মাথায় জটা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণসার মৃগচর্ম, গলদেশে সর্পের উপবীত, হস্তে ত্রিশূল, পিনাক ও ডমরু। কিন্তু বর্তমানে তিনি প্রায় সর্বত্র গৌরীপট্ট সমন্বিত লিঙ্গ মূর্তিতে পূজিত; কোথাও জৈন দিগম্বর মহাবীরের মূর্তি। লিঙ্গমূর্তিরও প্রকারভেদ লক্ষিত হয়। কোথাও অনাদি লিঙ্গ, কোথাও সাধারণ লিঙ্গ, আবার চতুর্মুখ লিঙ্গ, মুখলিঙ্গ; ত্রিশূলাকৃতি লিঙ্গ, জেলার বিভিন্ন স্থানে তিনি বিভিন্ন নামে পূজিত হয়। এদের মধ্যে পাণ্ডবেশ্বরের রাঢ়েশ্বর, বিল্বেশ্বরে বিল্বেশ্বর, বর্ধমানে বর্ধমানেশ্বর, ঈশ্বানেশ্বর, মিত্রেশ্বর; পাতুনের জলেশ্বর; কুড়মুনের ঈশানেশ্বর; কোগ্রাম-উজানির কপিলেশ্বর। শ্রীখণ্ডের ভূতনাথ, মানকরের মানকরেশ্বর ও কাটোয়ার ঘোষেশ্বর, কড়ুই এর বুড়োশিব, বাবলাডিহির

ন্যাংটেশ্বর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জেলার প্রায় ২১টি স্থানে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন হয়। গাজন অর্থে গর্জন বোঝায়। জয় বাবা মহাদেব বলে ভক্তগণ গর্জন কবেন। চড়কপর্বে শিবের গাজন উৎসব হয়। অধিক দিন থাকলে গাজন, কেবা করিত শিবের ভজন, সে গাজনে সন্ন্যাসী কি হত? (দাশরথি রায়)। গাজন উপলক্ষে মেলাও বসে। 'মেলা বসবে গাজন তলার হাটে' (রবীন্দ্রনাথ)। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, এখন প্রবাদে পরিণত। কুড়মুনের ঈশানেশ্বরের গাজনে আবার নরমুণ্ড নিয়ে সন্ন্যাসীদের পৈশাচিক নৃত্য হয়।

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে শিবরাত্রি উৎসব পালিত হয়। বাবলাডিহিতে ন্যাংটেশ্বর ও নবাবহাটের ১০৮ শিবের মন্দিরে শিবরাত্রি উপলক্ষে বিরাট মেলা, যাত্রা-গান, কীর্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়। সধবা, বিধবা, বিশেষত কুমারী মেয়েরা সারাদিন নির্জলা উপবাস করে ব্রতপালন করে। কুমারীরা সাধারণত শিবের মতো স্বামী পাবার প্রার্থনায় এদিন শিবরাত্রিব্রত পালন করে।

'নীলের ঘরে দিতে বাতি। জল খাও গে পুত্রবতী।' চৈত্র মাসের সংক্রান্তিব পূর্বদিন পুত্রবতী নারীরা সারাদিন উপবাস করে সন্ধ্যায় শিবের স্থানে ঘি-এর প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে তবে উপবাস ভঙ্গ করেন।

সূর্য-উপাসনা : সূর্য বৈদিক দেবতা, পৌরাণিক দেবতাও বটে। কিন্তু বর্ধমান জেলার সূর্য-উপাসনা একরকম নাই বললেই হয়। গলসী থানার সাঁকো গ্রামে একটি দালান মন্দিরে ঊষাদিত্য নামক সূর্য বিগ্রহের নিত্য সেবা-পূজা হয়। সূর্য একাধারে শস্যের ও শক্তির দেবতা। প্রবাদ—ঊষাদিত্য-এর কাছে মানত করলে দুরারোগ্য ব্যাধিও ভাল হয়। বর্তমানে ঊষাদিত্যের এই দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা 'কালী-বুড়ী-চণ্ডী' গ্রহণ করেছে। ব্রাহ্মণদের সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানে সূর্যপূজা ও সূর্যার্ঘ্যদান অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া ব্রাহ্মণ সন্তানদের যখন উপনয়ন হয়, তাকে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয়—যেটি প্রকৃত পক্ষে সূর্যকে বন্দনা—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। অর্থাৎ সর্বলোক প্রকাশক সর্বব্যাপী সেই পূর্ণমণ্ডল জগৎ প্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান কবি—যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করেছেন। মন্ত্রগুলি সাবিত্রী অর্থাৎ সূর্যের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত।

গণপতিপূজা ও গাণপত্য সম্প্রদায় : সূর্য-উপাসনার মত গণপতি উপাসনার চলন এ জেলায় বিশেষ নাই। অবশ্য প্রতিটি পূজা-অনুষ্ঠানের প্রথমেই গণেশের পূজা কর্তব্য। পঞ্চদেবতার শীর্ষ স্থানে গণপতির স্থান। গণপতি সর্বসিদ্ধিদাতা। ব্যবসায়ীদের হালখাতা গণপতিপূজা দিয়ে সূচিত হয়। তাছাড়া প্রতিদিন সকাল

সন্ধে গণপতির মূর্তিতে ধূপদীপ দান ব্যবসায়ীদের নিত্য কর্ম। শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব দিনে কিছু কিছু স্থানে গণপতির মূর্তি এনে পূজার প্রচলন আছে।

ধর্মরাজ : ঘনরাম চক্রবর্তীর মতে গোলকপতি বিষ্ণু ধর্মরূপে মর্তে আবির্ভূত। ধর্ম অনাদি অনন্ত ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্মমূর্তি। এই মূর্তিতেই ধর্মরাজ পূজিত হয়। 'দেবতা দেহারা না ছিল পূজিবাক দেহ। মহাশূন্য মধ্যে পরভূর নাহি আর কেহ'। ময়ূরভট্টের মতে শিলারূপে রহে বিষ্ণু বল্লুকার তীরে। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে 'বল্লুকার চম্পা' নদী বা অজয়নদের জলকুলা নদীর তীরে যক্ষ মন্দির 'বৈর্যাবর্ত চৈত্য' হচ্ছে সাতগেছিয়া বঁড়োয়া গ্রামের বর্তমান ধর্মমন্দিরের পুরাতন স্তূপাবলী। ডঃ সুকুমার সেনের মতে রাঢ় গ্রামের অধিদেব ছিলেন ধর্ম—প্রধান গ্রামদেব। তিনি রাজশক্তির প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরানো তাম্রপট্ট লিপি মল্লসারুলে পাওয়া গেছে। তার প্রথম শ্লোকে ধর্মদেবতার বন্দনা। বাঁকুড়া জেলার নাম হয়েছে ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়ের নাম থেকে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ধর্মঠাকুরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। এককালে ধর্মঠাকুর প্রাক-আর্য-অধিবাসী কোমের দেবতা ছিলেন। আদিতে তিনি ছিলেন অনার্য দেবতা। পরে একে একে বৈদিক বরুণ, অশ্ববাহিত সূর্য, উদীচ্য বেশী অর্থাৎ বুট পরিহিত ঘোড়ায় চড়া মিহির বা সূর্য, পৌরাণিক কূর্মাবতার ও কল্কি অবতার প্রভৃতির সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে বর্তমান ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত হয়ে প্রধানত রাঢ় অঞ্চলেই পূজা লাভ করছেন। মহাভারতে বকরূপী ছদ্মবেশী ধর্মরাজ যম। সুফল ও বৃষ্টির জন্য ধর্মপূজার বিধান আছে। দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগ ও বাতব্যাধি নিরাময়ের জন্য ধর্মের কাছে মানত করার রীতি আছে। অনেক জায়গায় বন্ধ্যা নারী ধর্মের নিকট সন্তান কামনা করে পূজা দেন। পরবর্তীকালে শিব ও ধর্ম এক হয়ে গেছে। নিরঞ্জন-নিরাকার-মহাদেব-মহেশ্বরম্। শরণং পাপ খণ্ডনং ধর্মরাজ নমোস্তুতে। বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে জামালপুরের বুড়োরাজ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—বুড়ো শিবের 'বুড়ো' আর ধর্মরাজের 'রাজা', দুইয়ে মিলে বুড়োরাজ। 'রাঢ়ের ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' প্রসঙ্গে সংস্কৃতি-তত্ত্বের দিক দিয়ে জামালপুরের বুড়োরাজের গুরুত্ব যে কতখানি অনুসন্ধানী ও কৌতূহলীরা তা বুঝতে পারবেন। রাঢ়ের অন্যতম গণদেবতা তথাকথিত অনুন্নত সমাজের ধর্মঠাকুরকে ক্রমে হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ দেবতা শিবঠাকুর আত্মসাৎ করে ফেলেছেন। জামালপুরের বুড়োরাজের কোন ইট পাথরের মন্দির নাই। মাটির চালা ঘরে দেবতা প্রতিষ্ঠিত। বৈশাখী-পূর্ণিমায় বাবার মহাপূজা হয়। হাজার যাত্রী সমবেত হয়। পাঁঠাবলির তো অন্ত নাই—হাঁস ও

শূয়োর বলিও হয়। তবে কোন বলিই দেবতাকে উৎসর্গ করা হয় না। মন্দিরের চারপাশে যত্রতত্র বলি হয়। গোপভূমের শ্যামরূপাগড়ের কাছে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল খ্যাত ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বরী ঘোষের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে।

চৌদিকে পাহাড় বেড়িবাড়ী গড়
দুর্গম গহন কাটি।
করিয়া চত্বর বসাল নগর
রাজার বসত বাটি। (ঘনরাম)

জেলার অল্পবিস্তর প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই ধর্মঠাকুরের পূজা ও গাজন হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—জামালপুর থানার জাড়গ্রামের কালু রায়।

জাড়গ্রামের কালু রায় দেউড়ীতে বাড়ী
জামা জোড়া খাসা ঘোড়া উত্তম পাগড়ী ॥

এখানে মন্দিরে জোড়া ঘোড়ার ওপর স্থাপিত সিংহাসনে চতুষ্কোণ ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া আছে পাতুনের ধর্মরাজ, মন্তেশ্বরের দুটি ধর্মঠাকুর, খুদকুরীর ধর্ম, বল্লুকার ষাঁড়েশ্বর আদি ধর্মঠাকুর, ভাতার থানার বেলগ্রামের কূর্মমূর্তিতে ধর্মরাজ, পারহাটের ধর্মরাজ, রামজীবনপুর, শ্রীপুর, দাদপুর, ইছাবাছা, মেদগাছি, শশঙ্গা, বড়শুল, মানকর, বেলুট, বসুধা, উখরা—কোথায় নাই ধর্মরাজ?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাগ্‌দী, নাপিত, বাউড়ী, এরাই সেবাইত বা কোথাও কোথাও পুরোহিত। আবার কোথাও পুরোহিত ব্রাহ্মণ, সেবাইত বাগ্‌দী বা নাপিত, বাউড়ী।

স্বর্গীয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অমরকোষে বুদ্ধদেব ধর্মরাজ বলে উল্লিখিত হওয়ায়, "ধর্মরাজকে বুদ্ধের রূপান্তর" বলে উল্লেখ করেছেন। এই কারণেই ধর্মরাজের মহাপূজা ও গাজন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কিন্তু এই মত সমর্থন করেন না। তাঁর মতে ধর্মঠাকুরের পূজা কোন সংস্কৃতিবান ব্রাহ্মণদের দ্বারা হয় না। অস্ট্রিক ভাষায় ধর্ম কূর্মের নামান্তর। আর অধিকাংশ ধর্মমূর্তি কূর্মরূপ। আবার অনেক পণ্ডিত ধর্মরাজকে বৈদিক দেবতা সূর্য থেকে রূপান্তরিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। যাই হোক, ধর্মঠাকুর এখন জেলাবাসীর ইতর-ভদ্র-জনজীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জেলার প্রায় ১৫টি গ্রামে ধর্মরাজের মহাপূজা, গাজন ও মেলার অনুষ্ঠানই এর প্রমাণ।

মনসা : মনসা সর্পদেবী বিষহরি। দেশ পত্রিকার ১৯৭৭ সালে ২২শে অক্টোবর সংখ্যায় একটি আলোচনায় দেখা যায়—খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতক হতে এদেশে জৈন

ধর্মের জোয়ার আসে। তার প্রভাব জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথ, পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ, মহাবীরের মূর্তি নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে—রাঢ় অঞ্চলে। পার্শ্বনাথের শাসনযক্ষিণী পদ্মাদেবী যেহেতু সর্পবাহনা ও সর্পভূষিত। তাই তিনিও সর্পদেবী মনসা রূপে পূজা পেয়ে আসছেন। মনসাদেবী সর্পমন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীদেবী ইনি জরৎকারু মুনির স্ত্রী, আস্তিকের মাতা এবং বাসুকির ভগ্নী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে (কশ্যপঃ) 'মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবীং, তাং মনসাং সসৃজে ততঃ। তপসা মনসা তেন বভুব মনসা চ সা।' কশ্যপ ব্রহ্মার উপদেশে সর্পমন্ত্রসমূহের সৃষ্টি করিয়া তপোবলে মন দ্বারা ইহাকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবী রূপে উৎপাদন করেন—এই হেতু ইনি মনসা। মনসার প্রিয় বৃক্ষ—সুহি বা সিজু গাছ। যেখানে মন্দির ও মূর্তি নাই সেখানে সিজুগাছতলায় কিংবা কোন গাছের নীচে সিজুর গাছের ডাল ও সর্পচিহ্নিত কলসীতে দেবীর মূর্তি কল্পনা করে পূজা হয়। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা থেকে আরম্ভ করে কোথাও প্রথম পঞ্চমী, কোথাও শেষ বা পঞ্চম পঞ্চমীতে মনসা পূজা ও ঝাপান হয়। কোথাও আবার শ্রাবণ-সংক্রান্তি বা ভাদ্রের সংক্রান্তিতে মূর্তি গড়ে পূজা হয়। মনসাপূজার অঙ্গ ঝাপান—মনসাপূজা সাপুড়েদের সাপ খেলার উৎসব। মনমথ চড়ই ঝাঁপানে (পদকল্পতরু)। সর্প খেলে ঝাঁপানীয়া ওঝা (ক্ষেমানন্দ)। বিভিন্ন স্থানে মনসা বিভিন্ন নামে পূজিতা—মণ্ডলগ্রাম, নারিকেলডাঙ্গা ও মতিলপাড়ায়-জগৎগৌরী; উপলতি, উদয়পুরে বেহুলা, কোথাও ঝড়েশ্বরী বা ঝংকেশ্বরী, কোথাও বা ঝাকলাই বুড়ী, আবার কোথাও বিষহরি, মনসা, শঙ্খিনী, ব্রহ্মাণী। জেলার অধিকাংশ স্থানেই মনসাপূজার প্রচলন, কোথাও পাষাণ বা ধাতু মূর্তি, কোথাও মাটির মূর্তি গড়ে পূজা; আর কোথাও সিজু গাছ ও সর্পের মূর্তিসহ কলসী বা কোথাও ছোট ছোট মাটির ঘোড়া ও সিজুডালে মনসার পূজা। এ পূজা-প্রচারকে কেন্দ্র করে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মনসামঙ্গল রচনা আরম্ভ হয়। বর্ধমান জেলার কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গলের বিখ্যাত কবি। মনসার পূজার পীঠস্থান জুঝুটি, গোবিন্দপুর, বর্ধমান, গাংপুর, দেপুর, আহমদপুর, হাসানহাটি, বৈদ্যপুর ও পীরতলি, কালনা, কেজা প্রভৃতি। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে এই সব গ্রামের মধ্য দিয়েও বেহুলা, বাঁকা, বল্লুকা, গাঙ্গুর নদী দিয়ে বেহুলার যাত্রার বর্ণনা আছে।

বৈষ্ণবধর্ম : জেলার যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত তার প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য ও প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীচৈতন্যের সময় থেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম জেলায় প্রসার লাভ করে। অবশ্য এর পূর্বে নৈহাটীর স্থানীয় জমিদারের দেওয়ান, যাঁর জন্ম সপ্তগ্রামে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে, নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পত্তন করেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। নরহরি ছিলেন জাতি ও

পেশায় বৈদ্য। তিনি ছিলেন গৌড়ের সুলতানের রাজবৈদ্য। তিনি শ্রীখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীখণ্ড হয়ে ওঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পীঠস্থান। কাটোয়ার কাছে ঝামটপুরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজেরও বৈদ্যবংশে জন্ম। চৈতন্যচরিতামৃতই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে ইতিহাসের সততার অভাব আছে; জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্য জীবনের একনিষ্ঠ ইতিহাস আছে কিন্তু চৈতন্যদর্শন যথেষ্ট নাই। কিন্তু কৃষ্ণদাসের চরিতামৃতে চৈতন্যদেব ও চৈতন্যমতাদর্শের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

ষোড়শ শতকের প্রখ্যাত বৈষ্ণব পীঠস্থানগুলির মধ্যে বৈদ্যখণ্ড বা শ্রীখণ্ড, কণ্টকনগরী বা কাটোয়া এবং অম্বিকা কালনা অন্যতম। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর কয়েকদিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেছিলেন—

চব্বিশ বৎসর শেষে সেই মাঘ মাস
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিয়া ভ্রমণ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ৩য়)

নিত্যানন্দ ভ্রমণ করেছিলেন গঙ্গার উপকূলবর্তী অঞ্চলে। ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম আম্বুয়া তাঁর বাণীতে মুখর হয়ে উঠেছিল।

এই মতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া মুলুকে
বিহরেন নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে।

আম্বুয়া মুলুকই অম্বিকা কালনা। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ শ্রীখণ্ডে এসে নরহরির নিকট মধু পানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন বলে প্রবাদ। যে পুষ্করিণীর জল নরহরি তাঁদের পান করতে দিয়েছিলেন সে পুষ্করিণী আজও মধুপুষ্করিণী বলে খ্যাত।

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গুরু কেশবভারতী ও চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস দেনুড়গ্রামে বাস করতেন। 'বাল্যকালে কেশবের দেন্দুরাতে স্থিতি। বৃন্দাবন দাসের হয় যেথায় বসতি।' বৈষ্ণবকবি জ্ঞানদাসের কেতুগ্রাম থানার কাঁদড়া শ্রীপাট ছিল। 'রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়। তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়। (ভক্তিরত্নাকর) জ্ঞানদাস ছিলেন নিত্যানন্দের শিষ্য।

শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ রামানন্দ বসুর শ্রীপাট কুলীনগ্রাম বৈষ্ণবতীর্থ স্থান। এখানে গৌড়েশ্বরের সভাসদ মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্র যাবার পথে তিনদিন কুলীনগ্রামে অবস্থান করেছিলেন। 'গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়। তাঁহা এক বাক্যে আছে মহাপ্রেমময়। নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। এই বাক্যে বিকাইলাম তাঁর বংশের হাত।' (চৈ.চ.)

'কুলীনগ্রামের কথা কহনে না যায়। শূকর-চড়ায়-ডোম সেও কৃষ্ণ গায়।' কালনা, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, অগ্রদ্বীপ, বাঘনাপাড়া, দেনুড়, ঝামটপুর, উজানিনগর, কোগ্রাম ও দামুন্যা বৈষ্ণব তীর্থস্থান। জেলার বিভিন্ন স্থানে আজও বিভিন্ন তিথি বা নির্দিষ্ট দিনে বৈষ্ণব উৎসব পালিত হয়। দধিয়া বৈরাগীতলায় গোপাল দাস বাবাজীর তিরোধান উপলক্ষে মাঘ মাসে যে মেলা হয় তাতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। কেন্দুড় গ্রামে বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব, কাটোয়ার কালিকাপুরে শ্রীগঙ্গা গোস্বামীর আবির্ভাব উপলক্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে মহোৎসব, কালনাগ্রামে আষাঢ় মাসে ভোলানাথ মাতার মহাপূজা, শ্রাবণ মাসে কুলীনগ্রামে মহোৎসব, আশ্বিন মাসে উত্তর ঝামটপুরে মহোৎসব, অগ্রহায়ণে নরহরি সরকারের শ্রীখণ্ডে তিনদিন মেলা ও মহোৎসব। মাঘ মাসে রামচন্দ্র গোস্বামীর তিরোধান উপলক্ষে মহোৎসব। ফাল্গুন মাসে বাঘনা পাড়ায় বলরামকৃষ্ণ জিউ-এর দোলযাত্রা ও মহোৎসব।

শ্রীচৈতন্যেব দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সঙ্গী কড়চা-লেখক গোবিন্দ কর্মকারের বাড়ী কাঞ্চননগর—'বর্ধমানে কাঞ্চননগর মোর ধাম। শ্যামদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম।' এখানে গোবিন্দদাসের স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। কাটোয়া থানার চাকুন্দীর গঙ্গাধর ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য, বিখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য তাঁর পুত্র। কাঁদড়ার জ্ঞানদাস-এর আবির্ভাব মহোৎসব হয় পৌষ পূর্ণিমায়। মানকরে কনৌজ ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ মন্দির বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। খণ্ডঘোষ থানার কৈয়রে শ্রীচৈতন্যের দ্বাদশ পার্ষদের অন্যতম অভিরাম গোস্বামী এখানকার বেতসবনে বিশ্রাম করেছিলেন। তাঁর শিষ্য বেদগর্ভ কৈয়রে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন—পরে গোপালবাড়ী, বলরামবাড়ী ও মাধববাড়ী তিনটি স্থানে রাধাকৃষ্ণ বলরামের দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়—দোল ও ঝুলনে মহোৎসব হয়। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব জেলার সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

কার্তিক পূজা : কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে জেলায় বিভিন্ন স্থানে কার্তিক পূজার প্রচলন আছে। কোথাও বা পৈতৃক অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আবার কোথাও বা বাধ্য হয়ে গ্রামে ও মফস্বলে এক রকমের রসিকতা হচ্ছে—কার্তিক পূজার আগের দিন রাত্রে অপুত্রক দম্পতির বাড়ীতে তাঁদের বন্ধুবান্ধব বা পাড়াপ্রতিবেশী নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করে কার্তিকের মূর্তি কিনে গোপনে ফেলে দিয়ে আসেন। সকালে উঠেই এই মূর্তি দেখে দম্পতি পূজা করতে বাধ্য হয় এবং সংস্কার অনুযায়ী কেউ আজীবন—কেউ বা অন্তত চার বৎসর পূজার ব্যবস্থা

করেন। কার্তিক অযোনিসম্ভবা—জন্মবৃত্তান্ত কৌতূহলোদ্দীপক। শিব মতান্তরে রুদ্র তারকাসুর নিধনের জন্য বলবান সন্তান কামনায় সংগত হলেন। শিববীর্য স্খলিত হলো ভূমিতে, ভূমি সেই বীর্যের প্রবল শক্তি সহ্য করতে না পেরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন। অগ্নি নিক্ষেপ করলেন শরবনে—সেখানেই জন্মালেন কার্তিক। ছ'জন কৃত্তিকা তাঁকে স্তন্যপান করালেন—কার্তিক হলেন ষড়ানন। আবার শিবের তেজ ক্ষরিত বা স্কন্ন হয়েছিল বলে অপর নাম স্কন্দ। এছাড়া তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—দেবসেনাপতি, সুব্রহ্মণ্য, বিশাখ, মহাসেন, গুহ, কুমার সেন, নিগমেয়, জয়ন্ত ও সনৎকুমার। তিনি মহাভাগ, ময়ূরাসন, কাঞ্চনকান্তি, শক্তিহস্ত, বরদ, শত্রুবিনাশী, প্রসন্ন, সন্তান প্রদায়ক সালংকার ও ষড়ানন। কিন্তু কেন তাঁকে সন্তান প্রদায়ক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে? তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ 'ভারতকোষ'—দ্বিতীয় খণ্ডে কার্তিক 'মাতৃগর্ভ হইতে ভ্রূণাপহারিণী অনুচারীদের অধিনায়ক' রূপে পূজিত হতেন। বর্তমানে গণিকাপল্লীতে এই পূজা ক্ষীয়মান। কাটোয়ার সাজশিল্পী ধর্মদাস মোহন্ত এর কারণ হিসাবে বলেন—'কাটোয়ার সেই বাবুও নেই, বোতলও নেই কার্তিকও নেই।' সুজিত চৌধুরীর একটি নিবন্ধে গণিকাদের মধ্যে এই কার্তিক পূজার প্রচলন সম্বন্ধে একটা মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—তাঁর মতে 'পুরাণে উল্লিখিত ব্যভিচারী কার্তিকের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গণিকাদের এক গূঢ় সংযোগ আছে।' এটা স্বীকৃত যে, মাতৃপ্রধান সমাজের নারী-পুরোহিতরা পুরুষপ্রধান সমাজে গণিকায় পরিণত হয়েছিলেন। কার্তিক আরাধনার সঙ্গে পতিতাদের সংশ্রব পুরুষশাসিত সমাজের নিকট নারী-পুরোহিতের সেই আত্মসমর্পণের স্মারক-আরোপিত মূল্যবোধের প্রবহমান চাপে তাদের চেতনায় আজ নাগর হিসাবে চূড়ান্ত কামনার ধনে পরিণত। আর 'অ্যাডোনিস গার্ডেন' সৃষ্টি করে পতিতারা কৃষিজীবী সমাজ কর্তৃক ন্যস্ত—আদি সেই গৌরবময় পুরোহিত-বৃত্তির পরিপ্রেক্ষিত ভ্রষ্ট অনুবর্তন করেন মাত্র। অনেকের মতে কার্তিকের মত নাগরদের রমরমা যাতে বাড়ে সেই কারণেই গণিকাদের কার্তিক-প্রীতি। বর্তমানে গণিকাদের কার্তিকপূজায় ভাটা পড়লেও কাটোয়ার গণিকালয় চুনড়ি পাড়ায় এখনও ন্যাংটা কার্তিকপূজা হয়। বর্ধমান শহরে পতিতালয় বলে এক কালে খ্যাত মহাজনটুলিতে কার্তিকপূজা হতো। এখন এখানে তাদের সংখ্যাও সীমিত, আর কার্তিকের মোহও বিগতকালের ইতিহাস।

যাই হোক, শিল্পে একদেশিকতার মত যেমন চন্দননগর, ভদ্রেশ্বরে জগদ্ধাত্রী পূজা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, কার্তিকপূজাও তেমনি কাটোয়া আর বাঁশবেড়েতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অবশ্য এখনও জেলার অন্যান্য গ্রামে-গঞ্জে দুই একটা বনেদী

বাড়ীতে পুজোর প্রচলন আছে। আর গ্রাম্য-রসিকতার শিকার হয়ে বাড়ীতে কার্তিক ফেলে দিলে বাধ্য হয়েই গৃহস্থকে পুজোর ব্যবস্থা করতে হয়—গোপন বাসনা—যদি কার্তিকের দয়ায় মনোবাসনা পূর্ণ হয়, গৃহিণীর কোলে কার্তিকের মত একটা 'ছেলে' আসে। কাটোয়া কিংবা বাঁশবেড়েতে কার্তিক এখন গণিকালয়ের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে পাড়ার ক্লাবের ছেলে ছোকরাদের বারোয়ারী তলায় জাঁকিয়ে বসেছেন। বাঁশবেড়ের কার্তিক তো প্রবাদে পরিণত—'কার্তিক কাঁসারি উদ্‌গেড়ে। এই তিন নিয়ে বাঁশবেড়ে।'

কাটোয়ার নিকটবর্তী খাজুরডিহিতে আমার মাসীমার কাছে শুনেছি কাটোয়ায় কত রকমের কার্তিক হতো। এখনও তার কিছু কিছু অস্তিত্ব আছে। যেমন লড়ায়ে কার্তিক, নেংটা কার্তিক, ধেড়ে কার্তিক, বাবু কার্তিক, খোকা কার্তিক, ষড়ানন কার্তিক, সাত ভাই কার্তিক। সে যাই হোক যোদ্ধা-কার্তিকের বাবরি আর সিঁথিকাটা চুল যেমন বেমানান, তেমনি বে-মানান বাবু কার্তিকের তীর ধনুক হাতে শিখিবাহন মূর্তি। কুমার কুমারীদের মধ্যে কার্তিক মঞ্চে প্রবেশ এককালে নিষিদ্ধ ছিল। এখন বারোয়ারী পূজার দৌলতে এদেরই রমরমা। গণিকাপল্লীতে যেমন এককালে কার্তিকপূজার বহুল প্রচলন ছিল তেমনি বাধ্যতামূলক ছিল নপুংসকদের হাততালি দিয়ে ঢোলক বাজিয়ে নাচ। কার্তিকপূজার উৎসব সাঙ্গ হয় কার্তিকের লড়াইয়ের পর্ব দিয়ে। কবে থেকে এই লড়াই-এর শুরু তার বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৯৭২ সালের 'সাপ্তাহিক কাটোয়া' পত্রিকার এক নিবন্ধে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। 'কবে থেকে এই লড়াই তা নিয়ে দুটো মত প্রচলিত রয়েছে। প্রথম মতের সমর্থকদের ধারণা, কাটোয়ার আড়ম্বরপূর্ণ এই কার্তিকপূজার সূতিকাগার এখানকার রক্ষিতালয়গুলি। সেদিনের রক্ষিতাদের কামনা বাসনার রূপ দিয়েছিল সেদিনের সওদাগরেরা। কালক্রমে রক্ষিতা হ'ল গৌণ এবং সওদাগরী বাবুরাই এ-ব্যাপারে হয়ে উঠলো প্রধান'। এখন বিসর্জনের সময় বিভিন্ন পাড়ায় কার্তিক নিয়ে গোটা শহর ঘোরানো হয় এবং এই সময় এই বিসর্জনের আড়ম্বর নিয়ে চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রদর্শনী। এটাই এখন কার্তিকের লড়াই বলে চলে যাচ্ছে। কার্তিকপূজার অঙ্গ হিসেবে বেদীতে ধান ছড়িয়ে তার উপরে কার্তিকের অধিষ্ঠান, এক সরা আতপ তণ্ডুলসহ অন্যান্য নৈবেদ্যের আয়োজন, অন্যান্য উপকরণের মধ্যে তীরধনুক, লৌহ, খড়্গ, মাদুর, বালিশ বিধানের মধ্যে কি শস্যের দেবতা কার্তিক, প্রজননের দেবতা কার্তিক ও যোদ্ধা কার্তিক—কার্তিকের এই তিন মূর্তির কল্পনা করা হয়েছে? দেবী সরস্বতীর মত কার্তিকও চিরকুমার। এই জন্যই কি কার্তিকের সঙ্গে বীরত্ব ও লাম্পট্য জড়িত? তবু

কার্তিকপূজা চলছে, চলবে। অন্তত পক্ষে দুর্গাপূজা, কালিপূজার রেশ কাটানোর পর মদ্যপানের খোঁয়াড়ী ভাঙার মত এই জাতীয় পূজা আমাদের যুবসমাজের বেকারত্ব ও হতাশা ভোলার একটা তাৎক্ষণিক উপায়। কার্তিক মাসের সংক্রান্তি কার্তিকপূজার জন্য নির্দিষ্ট হলেও কাটোয়ার আশেপাশে চাঁড়ুলি, সেরান্দি, পূর্বস্থলী, কাষ্ঠশালী, ইটেগ্রাম, ক্ষীরগ্রাম প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে কার্তিকের সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজা হয় না। ৮ই অগ্রহায়ণের পর কোন একদিনে নবান্ন উপলক্ষে 'নবানে কার্তিক' পূজা হয়। আবার অনেক গ্রামে নবান্নের উপলক্ষে অন্নপূর্ণা পূজাও হয়।

ইসলামধর্ম : "মশা, মাছি, মুসলমান। তিন নিয়ে বর্ধমান।" এই প্রবাদে বর্ধমান শহরে মুসলমানদের আধিক্য সূচিত করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম পবিত্র ইসলাম। পয়গম্বর হজরত মহম্মদ (৫৭০—৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে)-এর জন্মের চল্লিশতম বর্ষে প্রচারিত ধর্ম। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ৪টি নিয়ম পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রার্থনা—আগে হাত, মুখ, নাক, মুখমণ্ডল, বাহু কনুই পর্যন্ত তিনবার, মাথার উপরিভাগ, দাড়ি, কান, ঘাড় ও পা একবার করে জল দিয়ে ধোয়া অবশ্য কর্তব্য—অজু করার পরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাটিতে কিছু বিছিয়ে নামাজ করা বিধেয়। মক্কার দিকে মুখ করে দিনে পাঁচবার নামাজ হয়, তার পূর্বে মৌলভী মসজিদের মিনার থেকে আজান দিয়ে সময় জানিয়ে দেন। সুবা বা ভোরের নামাজকে বলে ফজর দুহ্‌র, দুপুরের নামাজকে বলে জোহর, আসরি বা বিকালের নামাজ আসর, মঘরিব বা সন্ধ্যার নামাজ মঘরিব, রাত্রির নামাজকে বলে এশা। সমবেত প্রার্থনা হয় শুক্রবার বারটায়—জুম্মার নামাজ। তাছাড়া প্রধান প্রধান উৎসব যেমন পয়গম্বরের ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনা যাত্রার দিন মহরম মাসের দশম দিনে নববর্ষ বা মহরম, পয়গম্বরের জন্মদিন ফতেহা-দোয়াজ-দাহম (রবি : আউঃ এর ১২ তারিখ), দীর্ঘ ৩০ দিন উপবাস পালন করে অমাবস্যার পর চাঁদ দেখে ইদ্‌ল ফিতর উৎসব এবং ইদ্-উল-অহজা বা বকরিদ এই সব অনুষ্ঠানের পূর্বে একদিন রোজা (উপবাস) রেখে উৎসবের দিন দানখয়রাত ও সমবেত নামাজ কর্তব্য। ইদল্ ফিতরই সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। একমাস রোজা ও চরম সংযম পালন করার পর দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখে নতুন পোশাক পরিধান করে গোটা মুসলমান সমাজ উৎসবে মেতে ওঠে। মহরম শোকের উৎসব—হাসান-হোসেনের অকাল মৃত্যুতে শোকপালনই এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান ইসলামের পাঁচটি মৌলিক নীতি মেনে চলেন—এগুলি হলো ১. বিশ্বাস, বিশেষ

করে আল্লাহ ও পয়গম্বর হজরত মহম্মদের একত্বে বিশ্বাস, ২. দিনে পাঁচবার নামাজ বা প্রার্থনা, ৩. জাকত বা দান ৪. রমজান মাসে ৩০ দিনের দিন কঠোর ভাবে নির্জলা উপবাস পালন, ৫. সম্ভব হলে মক্কায় হজ করা। মুসলমানদের সাধারণত ৪টি সম্প্রদায়—শিয়া, সুন্নী, সুফী ও ইসমাইলী। বর্ধমানে অবশ্য শিয়া ও সুন্নীদের প্রাধান্য। তবে সুন্নীরাই প্রধান সম্প্রদায়। শিয়াগণ সমস্ত মুসলিম অঞ্চলে থাকলেও তাঁরা সুন্নীদের তুলনায় সংখ্যালঘু। এই সুন্নীগণ হানাফি সম্প্রদায়ভুক্ত। শিয়া ও সুন্নীদের বিভাগ সম্বন্ধে The new popular Encyclopedia, Vol. IX (1903) এ Mohammed নামক প্রতিবেদনের অংশবিশেষ উল্লেখ করলে এদের উৎসব সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হবে। Almost immediately after the death of Mohammed a dispute arose among the followers as to his successor. A strong party was in favour of Ali, the husband of the prophet's daughter Fatima, but he was not chosen until a lapse of twenty three years, during which time the throne had been occupied by Abu Bekr, Omar and Osman. Yet a tradition that the first three caliphs were unsurpers has prevailed to the present day among a large number of Muslims and hence the first ground of dessension between the sunnites and shiaites, the later being the followers of Ali, while the former accept the legitimacy of the first three caliphs. Other points of difference soon cropped up. The shiaites place Ali at least on a level with Mohammed; the Summites place a wide interval between the prophet and every other mortal (P. 286)

বর্ধমান জেলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার শুরু হয়—ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার উদ্দিনের গৌড় বিজয়ের পর। গৌড় বিজয়ের পরই ধীরে ধীরে বর্ধমান ও অন্যান্য অঞ্চল মুসলিম শাসনে আসে। জেলায় প্রাচীন অধুনা-পরিত্যক্ত অনেক মসজিদ, দরগা, খানকা ও আস্তানার ধ্বংসাবশেষ এর প্রমাণ। কালনার অনতিদূরে শাশপুর জেলার মুসলিম সমাবেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে মসজিদ-ই জামিয়ার নিকট মজলিস সাহেবের খনন করা মজলিস-সাহিব-কি-দিঘি বর্তমান। এই মসজিদের নিকট মজলিস পীর সাহেবের আস্তানা রয়েছে। মাঘ মাসের প্রথম দিনে এখানে উরস উৎসব পালিত হয়। মঙ্গলকোট থানার মঙ্গলকোট গ্রাম সুফী সম্প্রদায়ের আঠার আউলিয়ার আস্তানা। এখানে পীর পাঞ্জাতনের উরস উৎসবে বিরাট মেলা হয়। দুর্গাপুর মহকুমার কাঁকসা থানা প্রধানত মুসলমান প্রধান। এখানকার শিলামগ্রামেও পীরের আস্তানা আছে। তুর্ক-

আফগান বিজয়ের বহু পূর্বে অবশ্য অষ্টম-নবম শতাব্দীতে পীরসাহেব শাহ্-খাজা-খিজির রুশী বর্ধমানে পদার্পণ করেন ও বর্ধমান শহরের নিকটে আস্তানা গড়েন।

শাহ্-খাজা-খিজির-রুশীর পর বর্ধমানে ধর্ম প্রচারের জন্য সুদূর কাবুল থেকে আসেন খক্কর সাহেব। তিনি আস্তানা গাড়েন খুব সম্ভবত বর্তমান রাজপ্রাসাদের মধ্যে যেখানে Fort বা দুর্গ ছিল তারই এক অংশে। এখানেই তাঁর দেহান্ত ঘটে ও তাঁকে দুর্গের একাংশে সমাধিস্থ করা হয়। সেইজন্য যখন মহারাজ মহতাবের আমলে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান রাজপ্রাসাদ মহতাব মঞ্জিল নির্মিত হয়, তখন খক্কর সাহেবের সমাধিস্থলটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করে রাখা হয়। এই মাজারে হিন্দু-মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রতি বৎসর ১৭ই ফাল্গুন খক্কর সাহেবের বাৎসরিক উরস উৎসব পালিত হয়।

খক্কর সাহেবের পর ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ধর্মপ্রচারের জন্য আসেন বহরাম সক্‌কা। সক্কা শব্দের অর্থ জলদানকারী। তিনি খুব সম্ভবত সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বহরাম সক্কা কিন্তু আসল নাম নহে। তাঁর বাল্যকালের নাম শাহ্ওয়ার্দি। তুরস্কের তাব্রিজ থেকে তাঁরা দুই ভাই পারস্যের পথে কাবুলে আসেন ও মোগল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। সেখানে কান্দাহারে শিশু আকবরের খাত্না ধর্মীয় উৎসবে যোগদানের পর তাঁর মনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে ও রাজকার্য পরিত্যাগ করে তৃষিত জনগণের মধ্যে জলদানব্রত গ্রহণ করেন ও বহরাম সক্কা নামে পরিচিত হন। এর পর আগ্রায় দীর্ঘকাল অবস্থান করে সিংহল যাবার পথে বর্ধমানে এসে পুরাতন চক এলাকায় যোগী জয়পালের আস্তানায় আশ্রয় পান। জয়পালও তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়েন ও বহরামের নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। এই আস্তানাতেই বহরামের দেহান্ত ঘটে ও এখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। চান্দ্রমাসের রজব (এপ্রিল) এর ২২-২৪ তারিখে সক্কার উরস উৎসব পালিত হয়। পায়রাখানার ধারেই আছে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আজিম-উস-শানের নির্মিত জুম্মা মসজিদ (১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে)। তাছাড়া আছে হিজরি ১২৮০ (১৮৬৭–১৮৭০) অব্দে হাজী বুদ্ধুর নির্মিত মসজিদ। গোটা বর্ধমান শহরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রাচীন মসজিদ। গোদায় আছে তিন গম্বুজ-বিশিষ্ট বড় মসজিদ। এর দ্বারা শহরে তৎকালে ইসলাম ধর্মের রমরমা প্রমাণিত হয়।

জেলার অন্যত্র পীরের উরস উৎসব ও মেলার বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন কাটোয়ার রাধাকৃষ্ণপুরে খাদিম বিবির তিরোধান উপলক্ষে উরস ও মেলা, মেমারী থানার বড়রে পীর শাহ্ গিয়াসুদ্দিনের দরগা ও উরস উৎসব, বর্ধমান রাইগ্রামে গোরাচাঁদ পীরের উরস ও মেলা, মঙ্গলকোটের পিলশোঁয়া গ্রামের আউলচাঁদের

সমাধি ও মেলা, রায়না থানার উচালনে মকদমপীরের পৌষ মাসে উরস, সুয়াতা-ভালকীতে বহ্মান পীরের পৌষসংক্রান্তি ও উত্তরায়ণে উরস ও মেলা। এই মহম্মদ বহমান পীর বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের (হিজারি ৯১৬ অব্দ) খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে (১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) সমসাময়িক ছিলেন। তিনি গোপভূমে ধর্মপ্রচার করতে উদ্দেশ্যে অমরাগড়ের শিবাখ্যা মন্দিরে তৎকালে প্রচলিত নরবলি বন্ধ করতে এসে গোপরাজার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন ও প্রাণ হারান। এখানে সুয়াতার মেহালা পুষ্করিণীর পূর্ব দক্ষিণ কোণে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। বহমান পীর সম্পর্কে ডঃ অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা ৫ম খণ্ডে' উল্লিখিত আছে—'শোনা যায় বহমান পীরের প্রকৃত নাম সৈয়দ মহমুদ-বহমনী, বহমান রাজ বংশধর। ধর্মযুদ্ধে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। ...বহমান পীরের সমাধি মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের উপরে প্রস্তরফলকে তোগরা অক্ষরে অনেকগুলি আরবী শব্দ অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। সমাধিমধ্যস্থ একটি ফলকে মনে হয় কোরান শরীফের আয়েত লেখা আছে। তার নীচে আবুল মজঃফর আলাউদ্দিন এই নাম ও সন ৯১৬ হিজরি উৎকীর্ণ আছে। ইহা হতে মনে হয় আলাউদ্দিন হিজরি দশম শতকে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করে সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ নামে প্রসিদ্ধ হন এবং মহম্মদ বহমান পীর তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। উৎসবের দিন সমাধির বাহিরে রক্ষিত দক্ষিণ-পশ্চিম কোণস্থিত দামামাটি চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সকাল ও সন্ধ্যায় বাজান হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে হিন্দু-মুসলমান অনেকে পীরপুকুরে স্নান করে ও দরগায় সিন্নী ও হাজত্ দিয়া থাকে।'

বহমান পীর সম্পর্কে সৈয়দ আব্দুল হালিম সাহেবের 'ইসলামের ইতিহাস' গ্রন্থে কিছুটা ভিন্ন তথ্য পাই।

তাঁর মতে ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে সহীদ মাহমুদ শাহ বাহমানী দাক্ষিণাত্য থেকে এখানে এসেছিলেন। ...মাহমুদ শাহ এই অঞ্চলে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু স্থানীয় কালীপূজক হিন্দু শাসক—যিনি নরবলি দিতেন তাঁর সঙ্গে এক সংঘর্ষে এই দরবেশ নিহত হন। তাঁর বর্তমান সমাধি-গৃহে আরবী-তুঘরা লিপিতে যে আয়াত লেখা আছে তার তারিখ 'বৎসর দুই এবং নয় শত (হিজরী ৯০২, ১৪৯৬–৯৭ খ্রীষ্টাব্দ)'। ইহার লেখক কাজী মিনাজী।

যাই হোক, বিষয়টি বিতর্কমূলক। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে।

পরিশেষে বর্ধমান শহরের সংলগ্ন খাজা আনোয়ার বেড়ের আনোয়ার শাহেবের মাজারের কথা উল্লেখ করে ইসলাম প্রসঙ্গ শেষ করি। খাজা আনোয়ার

ছিলেন দিল্লী-সুলতান ফারুক শিয়ারের সেনাপতি। শোভা সিং-এর আক্রমণে বর্ধমানের মহারাজ কৃষ্ণরাম নিহত হলে তাঁর পুত্র জগৎরাম ঢাকায় গিয়ে বাংলায় ইব্রাহিম খানকে সমস্ত বিষয় অবগত করেন। ইব্রাহিম প্রথমে এ বিষয়ে গুরুত্ব না দিলেও পরে পুত্র জবরদস্ত খানকে রহিম খানের বিদ্রোহ দমন করতে বর্ধমান পাঠান। জবরদস্ত খান যুদ্ধে নিহত হন। তখন ইব্রাহিমের পরিবর্তে আজিম-উস-শান বাংলার সুবাদার হন। নতুন সুবাদার রহিম খানের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে চান ও খাজা আনোয়ারকে দূত হিসাবে রহিম খানের শিবিরে প্রেরণ করেন। কিন্তু খানের বিশ্বাসঘাতকতায় রহিম খানের সঙ্গে যুদ্ধে আনোয়ার বর্ধমান দুর্গের নিকট নিহত হন।

ফারুক শিয়ার সম্রাট হয়েই বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে পোদ্দারহাট মৌজায় খাজা আনোয়ারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক বিরাট সমাধি নির্মাণ করেন। বর্ধমান শহরের দক্ষিণাংশের এই মৌজার নাম হয় খাজা আনোয়ার বেড় (জে. এল. নং ৩৫), এটি বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত। এখানে নবাব বাড়ী ও নবাব বাড়ীর ভিতর দর্শনীয় জলটুঙ্গিসহ অন্যান্য অনেক জিনিস পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানকার খাজা বেড়সাহেবের মাজার মুসলমান সম্প্রদায়ের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

১৯৭১ সালে জেলায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল ৬৭২১৮৭ অর্থাৎ সমগ্র জেলার লোকসংখ্যার ১৭.১৫ শতাংশ। এই সংখ্যা এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ আমার মতে এদের মধ্যে একাধিক বিবাহ প্রথা, জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথার প্রতি ধর্মীয় বাধা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—‘নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার কারণ, হিন্দু ভদ্রসমাজ এ শ্রেণীদিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।’

খ্রীষ্টধর্ম : ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন আর্মি অফিসার চার্লস ষ্টিয়ার্ট ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে আসেন। তিনি চার্চ মিশনারী সোসাইটির অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। বর্ধমানে তাঁর আসার উদ্দেশ্য ছিল এ জেলায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। এই প্রচারের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষাবিস্তার। কারণ এর মাধ্যমেই ছোট ছোট শিশুদের ‘মগজ ধোলাই’-এর ব্যবস্থা সহজতর হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কিছুটা জমি অধিগ্রহণ করে সেখানেই স্কুল, অনাথ আশ্রম, খ্রীষ্টের ভজনালয়, মিশন অফিস ও বাসগৃহ নির্মাণ করেন। বৈকুণ্ঠপুরে (সদর থানার জে.এল. ৯১) সম্ভবত কাজ শুরু করেছিলেন। কারণ লঙ্ সাহেবের বর্ধমান সম্পর্কিত বিবরণে দেখা যাচ্ছে, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি গির্জা নির্মিত হয়েছিল। পরে অবশ্য

কোন কারণে এটি ধ্বংস হয়ে যায়। এই বিবরণ থেকে আরও জানা যায়, ঐ সময় বর্ধমানের গোলাপবাগের কাছে একটি গির্জা নির্মিত হয়েছিল। মনে হয় এইখানেই ষ্টিয়ার্ট সাহেব জমি অধিগ্রহণ করে Chapel সহ অনাথ আশ্রম ও স্কুল নির্মাণ করেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ মিশনারী সোসাইটি কালনাতেও কাজ শুরু করে এবং কালনায় একটা মিশন গঠন করে, কিন্তু সংগঠনের দুর্বলতা কিংবা অর্থাভাবের জন্য এখানে মিশনের কাজ বেশী দিন চালানো যায় নাই। এরপরে অবশ্য স্কটল্যাণ্ডের ফ্রি চার্চ সোসাইটির প্রটেষ্টান্ট মিশন এখানে নতুন করে কাজ শুরু করে ও প্রথমেই দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে জনগণকে মিশনের প্রতি আকৃষ্ট করেন। এর ফলে মিশন জনগণের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এরপর ইংল্যাণ্ড জেনানা মিশন উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বর্ধমান, কালনা ও মানকরে নতুন করে কাজ শুরু করে এবং কিছু মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গের নারীদের দীক্ষিত করতে থাকে। কিন্তু টাকার অভাবে বর্ধমানের মিশনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য মানকর ও কালনার কাজ চালু রাখা সম্ভব হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার জ্যাকুইশ বর্ধমান মহারাজার কাছ থেকে বর্তমান হেড পোষ্ট অফিসের দক্ষিণ দিকে সাড়ে বার টাকা (১২.৫০ টা.) খাজনায় কিছু জমি বন্দোবস্ত নিয়ে এখানকার প্রাচীন গির্জাটি নির্মাণ করেন। ফাদার সাড়ে বার টাকায় প্রায় পাঁচ বিঘে জায়গা বন্দোবস্ত নেন। দক্ষিণ দিকের বিজয়তোরণ ও উত্তরে বর্তমান হেড পোষ্ট অফিস এই বন্দোবস্তভুক্ত জায়গা ছিল। পরে উত্তর দিকের অংশ অধিগৃহীত হয় ও সেখানে হেড পোষ্ট অফিস গড়ে ওঠে। দক্ষিণ দিকের কিছু অংশ চার্চকর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিজ দেওয়াও হতে পারে আবার রাস্তা নির্মাণের জন্য অধিগৃহীতও হতে পারে। অধিগ্রহণ বা লিজ দেওয়ার পর চার্চের দখলে থাকে প্রায় ৬০ শতক জমি। বছর চার-পাঁচ আগে এই ৬০ শতক থেকে আবার দক্ষিণ দিকের ৩৪ শতক লিজ দেওয়া হয়েছে। চার্চের অর্থাভাবই এর কারণে হওয়াই স্বাভাবিক।

১৮৭২–৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমান ক্যাথলিক মিশন আসানসোলে একটি প্রধান গির্জা নির্মাণ করে ও একজন বিশপের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে। পরের বছর মিশন এই শহরে একটা কনভেন্ট স্কুলও স্থাপন করে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েসলিয়ান মেথোডিষ্ট মিশন আসানসোলে এখানকার প্রোটেস্টান্ট নাগরিকদের জন্য একটি গির্জা নির্মাণ করে। এই ভাবে এই দুই চার্চের মিশন কর্তৃক আসানসোলের আশেপাশের অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাজ জোর কদমে চলতে থাকে। এই সব অঞ্চলে এই সমস্ত ধর্মান্তরিত নিম্নবর্ণের মানুষ ও উপজাতিদের

জন্য তিনটি Chapel বা ভজনালয়ও নির্মিত হয়। এই সময়ে রানীগঞ্জেও গির্জা নির্মিত হয়। স্টেশনের কাছে গির্জাপাড়া লেনই এর সাক্ষ্য বহন করছে। বর্ধমানে বি. বি. ঘোষ রোডে দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর বিপরীতে যে প্রোটেস্টান্ট গীর্জা রয়েছে সেটিও মনে হয় এই সময়েই এখানে নির্মিত হয়েছিল।

এই ভাবে জেলার বিভিন্ন ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট্ মিশন পৃথক পৃথক ভাবে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং ধর্মান্তরিত করার জন্য প্রধানত শ্রমিকশ্রেণী তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ ও সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিদের বেছে নেয়। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েসলিয়ান মিশন কিছু জনকল্যাণমূলক কাজও করেছিল। যেমন—আসানসোল মহকুমায় কুষ্ঠ রোগীদের জন্য আশ্রম ও অনাথ শিশুদের জন্য Orphanage—এই সব শিশুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। এর মূল উদ্দেশ্য কিন্তু এই সব কুষ্ঠ রোগী ও অনাথ শিশুদের ধর্মান্তরিত করা। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জেসুটদের ক্যাথলিক সোসাইটি এখানে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করে ও ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য সেমিনারীও গড়ে তোলে। কিন্তু এদের কাজ কয়েক বছর পরেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন মিশন সেখানে St. Patrik's School নামে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে ক্রমে আসানসোল মহকুমা মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের এক উর্বর ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আরও মিশন আসতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে Methodist Episcopal Society নামে এক Protestant Mission এখানে প্রচারের কাজ শুরু করে দেয়। কিছু কিছু মিশনারী হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা, হিন্দুধর্মের কুসংস্কার, হিন্দুদের ভূতপ্রেতে বিশ্বাস সম্বন্ধে স্বদেশে বিদেশে প্রচার করে। এদেশের অশিক্ষিত নিম্নবর্ণের মানুষদের মনে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিদ্বেষ জাগরিত করতে ও একমাত্র যীশুই তাদের ত্রাণ করতে পারে, এই মনোভাব সৃষ্টি করতে থাকে। এই সমস্ত নিম্নশ্রেণীর জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমে কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ, যেমন—চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষাদান, এদের পল্লীতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলা—এই সব কাজের দ্বারা এদের মন জয় করে তাদেরকে দীক্ষিত করতে থাকে।

অবশ্য এদের দ্বারা যে জনকল্যাণমূলক কাজ করা হয়, বিশেষত শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে, তার অবদানও কম নয়। এডাম সাহেবের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ঊনবিংশ শতকে জেলায় ৯৩১ টি পাঠশালা ছিল, তার মধ্যে ১৩টি মিশনারী স্কুল। ১৮৩০-৪০ সালের মধ্যে বর্ধমান শহরে ২টি ও কালনার জাপতে ১টি মিশনারী স্কুলের বিবরণ পাওয়া যায়। বর্ধমান মিশনারীদের উদ্যোগে "১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মাতাপচন্দ্র বাহাদুরের এবং কোন

সাহেব লোকের অনুকূলতায় শ্রীযুক্ত রেবরেন্দ ওয়াইও ব্রেখৎ সাহেবের যত্নে সি. এম. এস. স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।" ১৮৩৪-৩৭ এর মধ্যে কলকাতার Ladies Society-র সহযোগিতায় ও ইউরোপিয়ান মহিলাদের উদ্যোগে এ জেলায় চারটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এগুলির সবই ছিল মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত। Rev. I. I. Weifbrecht-এর উদ্যোগে বর্ধমান ও কালনার জাপতে এবং Rev. W. Carey এর উদ্যোগে কাটোয়ায় একটি করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৭৫। এর মধ্যে ৩৬ জন ছিল ক্রীশ্চান। ধর্মশিক্ষাই ছিল প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। সেই দিন থেকে নিম্নবর্গের মানুষদের ধর্মান্তরিত করার কাজের Tradition আজও চলে আসছে। আমার মনে হয় এই সব নিম্নশ্রেণীর জাতিদের মধ্যে ক্রীশ্চান হওয়ার প্রবণতার প্রধান কারণ "হিন্দু ভদ্রসমাজ এই শ্রেণীদিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।" ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী এ জেলায় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল ৭৯৬৩, আর ১৯৭১ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ১০৪০৩। অর্থাৎ দশ বৎসরে বৃদ্ধির হার ৩০.৭১%। বর্তমানে এ জেলায় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ঠিক কত তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবে আমার মনে হয় বৃদ্ধির পূর্ব হার বজায় থাকলে বর্তমানে এদের সংখ্যা কম বেশী ১৭০০০ হওয়া স্বাভাবিক।

অন্যান্য ধর্ম : হিন্দু, ইসলাম, ক্রীশ্চান এই তিন প্রধান ধর্ম ও তাদের বিভিন্ন উপবিভাগ ছাড়া জেলায় শিখ, জৈন ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীও কিছু লোক বাস করে, কিন্তু তাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। শিখধর্মাবলম্বীর সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ২৬.০% জৈনদের সংখ্যা ০.০২৩% ও বৌদ্ধদের ০.০১%। এই সংখ্যা—বিশেষ করে জৈন ও বৌদ্ধদের সংখ্যা দিন দিন কমছে বই বাড়ে নাই।

ষোল অধ্যায়



জেলার রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর "বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন "গুপ্তযুগের পূর্বে প্রাচীন বাংলার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলন করার উপাদান এখন পর্যন্ত আমরা পাই নাই। ভারতীয় ও বিদেশীয় সাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উক্তি হইতে আমরা ইহাব সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাই। কিন্তু কেবলমাত্র ঐগুলির সাহায্যে সন তারিখ ও ঘটনা সম্বলিত কোন ইতিহাস রচনা সম্ভবপর নহে।"

ডঃ মজুমদারের বাংলাদেশের ইতিহাস প্রথম প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩৫২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। কিন্তু তারপর রাঢ় অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিণ রাঢ় সুহ্মভূমি অঞ্চলে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি বিশ্লেষণ করলে প্রস্তর যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীর ক্রমবিবর্তন ও সেই সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা পর্যন্ত জেলার একটা ধারাবাহিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের সূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে না। তবে সন তারিখের নিরিখে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তার সপ্রমাণ তথ্য হয়ত উপস্থাপিত করা সম্ভব হবে না। তবে অনুমান নির্ভর মোটামুটি একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভবও হবে না।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভেদিয়া রেল স্টেশন থেকে মাইল চার পশ্চিমে আউসগ্রাম থানার পাণ্ডুক গ্রামে অজয় নদের তীরে রাজাপোতাডাঙ্গা নামে একটা ঢিবির উৎখনন শুরু হয়। ১৯৬৫ পর্যন্ত চারবার উৎখনন হয়। ডঃ মজুমদারের 'বাংলাদেশের ইতিহাস' এই উৎখননের বহু পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পুস্তকটির ষষ্ঠ সংস্করণে এই উৎখনন ও উৎখনন থেকে যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক

নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে তার সামান্য আলোচনা সংযোজিত হয়েছে কিন্তু তার রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশদভাবে আলোচনার অবকাশ প্রত্যাশিত নয়।

দুর্গাপুর থানার অন্তর্গত বীরভানুপুরে খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার অব্দের মেসোলিথিক বা শেষ প্রস্তর ক্ষুদ্রাশ্মীয় যুগের আয়ুধের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাছাড়া দামোদর তীরবর্তী দেজুড়ী, মলানদীঘি, গোপালপুর, শিবপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও পরবর্তী প্রস্তর যুগের বহু অস্ত্র ও অন্যান্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই আবিষ্কার নিঃসন্দেহে জেলার সেই প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার যুগের মানবসভ্যতা বিবর্তনের ওপর আলোকপাত করবে। এই আয়ুধ ও নিদর্শনগুলিকে মোটামুটি ভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। পশু শিকারের উপযোগী আয়ুধ ও কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি।

বীরভানুপুরে দামোদর তীরবর্তী অঞ্চলে আবিষ্কৃত নিদর্শনের সংখ্যা কমবেশী ২৮২। এদের মধ্যে আছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি আয়ুধ, তীক্ষ্ণধার আয়ুধ। ছিদ্র করার যন্ত্র, খোঁদবার যন্ত্র ও চাঁছবার যন্ত্র। এই সব যন্ত্র বিশ্লেষণ করলে সিদ্ধান্ত করতে অসুবিধা হয় না যে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে দামোদর তীরবর্তী এই অঞ্চল ছিল গভীর জঙ্গলে পূর্ণ আর জঙ্গলগুলি ছিল বাঘ, সিংহ, ভালুক, চিতা, বন্যমহিষের বিচরণ ক্ষেত্র এবং এযুগের আদিকাল থেকে অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত জনগণ পশু শিকারীর যাযাবর জীবনযাপন করতো। পরবর্তী পর্যায়ে এই জনগোষ্ঠী food gatherer-এর বৃত্তি ত্যাগ করে food producer-এর বৃত্তি গ্রহণ করে। অর্থাৎ যাযাবর জীবন ত্যাগ করে পশুপালন ও খাদ্যোৎপাদনের কাজে লিপ্ত হয়। ধীরে ধীরে এরা দানাপাথর বা কোয়ার্টজ-এর নির্মিত আয়ুধ পরিত্যাগ করে তামার ও লোহার ব্যবহার আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়। এই ভাবে প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকে তাম্রাশ্মীয় যুগ ও লৌহযুগে জনগোষ্ঠীর ঘটে উত্তরণ।

১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাণ্ডুক গ্রামে অজয় নদের দক্ষিণে রাজপোতাডাঙ্গায় চারবার উৎখনন কার্য চালিয়ে চারটি স্তর থেকে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির কার্বণ-চতুর্দশ (C-14) পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে যে সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জদাড়ো, হরপ্পা, মেহেরগড়, মধ্যভারত, রাজস্থান, লোথাল প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন খ্রীষ্টাব্দ ১৫০০–২০০০ পূর্বের তাম্রাশ্মীয় সুপ্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল, তেমনি আজ থেকে ৩৫০০ বছর পূর্বে বর্ধমান জেলার অজয় নদের তীরে ও সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক এক উন্নত তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল।

এই সমস্ত জিনিসপত্রের মধ্যে আছে ঈষৎ লালচে, হালকা বাদামী, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্র, helmet shaped মৃৎপাত্র, রোদে শুকানো কাঠকয়লায়

পোড়ানো ইটের তৈরী দুর্গ, রাজগৃহের নিদর্শন, ক্ষুদ্রাশ্মীয় হাতিয়ার, তামার বঁড়শী, বর্শার ফলক, হরিণের শিঙে তৈরী তীর, সছিদ্র জলহস্তীর দাঁত, পোড়ামাটির ভগ্ন মাতৃমূর্তি, সককুদ বৃষের শিল, দীর্ঘকণ্ঠ ময়ূর জাতীয় পক্ষীর পোড়ামাটির প্রতিকৃতি, করোটিবিহীন শবদেহ, পূর্ব এশিয়া ও ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের মত কুম্ভ সমাধিতে পায়ের অঙ্গুলিবিহীন শবদেহ ইত্যাদি। এছাড়া পাওয়া গেছে ভূমধ্যসাগরস্থ ক্রীটদ্বীপে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের পূর্বে নির্মিত শিলের মত steatite পাথরের উপর চিত্রাক্ষর (hiero glyphs and Pictograph) সমন্বিত কিছু শিল, যেগুলি থেকে সেকালে অজয় নদীর তীরবর্তী এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ক্রীট দ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার বিষয় সমর্থিত হয়। এছাড়া কুনুর নদীর তীরে মঙ্গলকোট, খড়ী নদীর তীরে বানেশ্বরডাঙ্গা, সাঁওতালডাঙ্গা, রূপনারায়ণ-হুগলী নদীর সঙ্গমস্থলে উৎখননের ফলে প্রাগৈতিহাসিক বহু নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

এই সমস্ত নিদর্শন বিশ্লেষণ করলে সিন্ধুতীরের মহেঞ্জদারো, হরপ্পা, মেহেরগড়, আমেদাবাদের লোথাল, রাজস্থান, মধ্য ভারতের প্রাগৈতিহাসিক সুপ্রাচীন মহান সভ্যতার সঙ্গে অজয়ের তীরবর্তী রাজপোতাডাঙ্গা, কুনুরের তীরে মঙ্গলকোট, খড়ির তীরে বানেশ্বরডাঙ্গা, সাঁওতাল ডাঙ্গা, রূপনারায়ণ ও হুগলীর সঙ্গমস্থলের সুপ্রাচীন সভ্যতার এক যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এর থেকে সিন্ধু সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক জনগোষ্ঠীর সমাজজীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বর্ধমান জেলার দামোদর-অজয়-কুনুর-খড়োশ্বরী তীরবর্তী সভ্যতা সম্পর্কে অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে ভূমধ্যসাগরের উত্তরে ক্রীট দ্বীপের steatite hierogliphs শিলের অনুরূপ পাণ্ডুপাজার ঢিবিতেও চিত্রাঙ্কিত steatite পাওয়া গেছে। তার থেকে পণ্ডিতেরা এ-অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাম্রলিপ্তি বন্দরের মাধ্যমে ক্রীট-দ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের সম্ভাব্যতা অনুমান করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক রিডলেও খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে বাংলার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের যোগাযোগ সমর্থন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। I date the Seal of AETEA Circa 1500 BC. Stratigraphical evidence suggest the Phaistos Disc. to be circa 1700 BC.

This seal together with Minoan type vases from Tamralipta, the helmet shaped vase, terracotta boat and other finds from Pandu Rajar Dhibi, point to a strong link between India and crete during the middle of the second millenium BC." রিড্‌লে ক্রীটের

মিনিয়ান সভ্যতার যুগে এই রকম শিলের চিত্রাঙ্কন থেকে AETEA মিনিয়ন রেখালিপির পাঠোদ্ধার করে কোন নাবিকের নাম অনুমান করেছেন। (The seal of AETEA and the Minoan Script—Michael Ridley). Ridley এর মত পরেশ দাশগুপ্ত ও অতুল সুর সমর্থন করেছেন। ক্রীটদ্বীপ ছাড়াও তাম্রলিপ্তি বন্দর দিয়ে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে এখানকার জনগোষ্ঠীর সেই প্রাচীন যুগেও যে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল সে কথাও অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সমর্থন করেছেন।

এই সমস্ত অঞ্চলে উৎখননের ফলে যে বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে সুপ্রাচীন সভ্যতার একটা বিবর্তনেব ধারার সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রাথমিক স্তরের নিদর্শন অজয়-কুনুর-খড়োশ্বরী নদীর সভ্যতার জনগোষ্ঠীর যাবাবর ও পশুশিকারীর জীবনযাত্রার বার্তা বহন করে। দ্বিতীয় স্তবের নিদর্শন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এরা ক্রমশ যাযাবরের বৃত্তি ছেড়ে পশুপালন ও কৃষিকার্যের বৃত্তি গ্রহণ করে। এই ভাবে এদের যাযাবর জীবন থেকে ঘটে গ্রামীণ জীবনে উত্তরণ। এই বিবর্তন অবশ্য একদিনে হয় নাই। দুই ধারার মধ্যে দীর্ঘ দিনের ব্যবধান অবশ্যই ছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ গোষ্ঠীর নিদর্শন এখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে নগরায়ণের উন্মেষ ও বহির্ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত বহন করে।

এই সব অঞ্চলের ছাঁচে ঢালা নগর পরিকল্পনা প্রমাণ করে যে এখানে ধীরে ধীরে একটা কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সেই শাসনব্যবস্থা প্রাচীন গ্রীসের মত রাজতান্ত্রিকও হতে পারে আবার প্রজাতান্ত্রিক বা গোষ্ঠীতান্ত্রিক এর মত একটা স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থাও হতে পারে। ইউরোপীয় গবেষকগণ হরপ্পার নগর-দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখে অনুমান করেছেন, এই সমস্ত দুর্গে একজন শাসক বা রাজা অবস্থান করতেন। রাজপোতডাঙ্গাতেও এরকম এক নগরদুর্গের নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাহলে এখানেও রাজা বা কোন এক ধরনের শাসক থাকতো বলে অনুমান করা যেতে পারে। তবে আমার মনে হয় রাজতন্ত্রের ধারণা গড়ে ওঠার জন্য আর্য সভ্যতার উন্মেষ বা মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার লুইসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বৈজ্ঞানিক সুভাষ কাকের তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজ্ঞানী কাক 'ডিসটাস অব এ্যাষ্ট্রনমি' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে আর্যদের ভারত আগমন নিয়ে এক তথ্য উপস্থাপিত করেছেন। বিজ্ঞানী কাক সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ উপগ্রহের কক্ষপথ সম্পর্কে ঋগ্‌বেদের এক সংকেত-লিপি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে আর্যরা আজ থেকে প্রায় ৯০০০ বছর

আগে ভারতে এসেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দ্বারাও তাঁর এই নতুন তথ্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। আর্যরা যে চারহাজার বছর আগে ভারতের এসেছিলেন কাকের এই তথ্য সেই ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেও এদেশে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা ছিল—এ তথ্যও প্রথম জানা গেছে কাকের গবেষণা থেকে। অবশ্য বিষয়টিকে আরও খতিয়ে না দেখে এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে চান না জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের এ. কে. বাগ। কাকের এই তথ্য যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আবার নতুন করে লিখতে হবে। তখন মহেঞ্জদারো, হরপ্পা বা পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রাচীন সভ্যতার গৌরব ম্লান হয়ে যাবে। (দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫.১.৯৪) তখন নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অসুবিধা হবে না যে আর্যদের রাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত থেকে মহেঞ্জদারো বা দামোদর-অজয় সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক জনগোষ্ঠী তাদের মধ্যেও রাজতন্ত্র চালু করেছিল।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মার্টিমার হুইলার মনে করেন এই সমস্ত অঞ্চল ছিল এক একটি সাম্রাজ্য ও কেন্দ্রে ছিল পুরোহিত রাজা (Priest-King)। ইনি Divine Rights of King বা দৈবী অধিকারের জোরে রাজ্যশাসন করতেন। এইচ. ডি. শাওখালিয়ার মতে সিন্ধুসভ্যতার শাসন ছিল এক দৃঢ় উদারনৈতিক স্বৈরশাসকের হাতে। সিন্ধু-শাসন সম্পর্কে শাওখালিয়ার মন্তব্য যদি সত্য হয়, তাহলে অজয়-কুনুর-খড়্গেশ্বরীর প্রাচীন সভ্যতার যুগেও অনুরূপ শাসন প্রবর্তিত থাকা অসম্ভব নয়, কারণ সভ্যতার মধ্যে একটা যোগসূত্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করেছেন। মাইকেল রিড্‌লের মন্তব্যও একথাই প্রমাণ করে।

German News পত্রিকার ১৫ই অক্টোবর ১৯৮৮ সংখ্যায় Aachen এর Technical University এর মহেঞ্জদারো রিসার্চ প্রজেক্টের ডাইরেক্টার অধ্যাপক Michael Jansen মহেঞ্জদারোর নিদর্শন বিশ্লেষণ করে এখানকার শাসন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তার সঙ্গে কিন্তু শাওখালিয়ার বা হুইলারের মন্তব্য মেলে না। Jansen তাঁর The Riddle of the Indus Civilisation প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—"The non-existence of temples or palaces means the absence of centres of theocratic or Political powers. This points towards a non-organised society without a strongly centralised rulership. It seems a different kind of society—a society organised without strong power centres. 'All, I can say', he suggested with scholarly caution, 'is that we avoid saying that it was a proto

democratic system'. What we find is the sudden appearance around 4050 BC of urban centres in a huge body of sites, called the pre or early Harappan. "These like the Kot Diji, Amri and Sothicultures have many similarities to the Indus valley. What is fascinating is that the pottery, seals and burnt bricks found at distant sites are of the same pattern and type of manufacture, what is new is that cities are large, close to the river and have perfect water supply...This culture seems to be characterised by a strong need for expansion and exchange." আমার মনে হয় Prof. Jansen এর এই সিদ্ধান্ত বর্ধমান জেলার নগরকেন্দ্রিক অজয়-দামোদর-কুনুর-খড়োশ্বরীর সুপ্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগে জেলার কোন নির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারিত ছিল বলে মনে হয় না। না থাকাটাই স্বাভাবিক; জেলার বর্তমান অংশে অর্থাৎ দামোদর অজয় বরাকর ভাগীরথী পরিবেষ্টিত সীমানার মধ্যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এই জঙ্গলের মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ, বন্যমহিষ, চিতার মত বন্যজন্তুর সঙ্গে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক বা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত নিষাদ জাতির ছিল সহাবস্থান। এরা যাযাবর Food gatherer। এদের শাসন ছিল দলপতির শাসন। তারপর জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির অনুপ্রবেশ ঘটে। এদের পরাভূত করে আলপাইন জাতির আধিপত্য স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে বন কেটে বসতি গড়ে ওঠে। মানুষ Food gatherer থেকে Food producer-এ পরিণত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় এদেরই যেন বন্দনা-গান গেয়েছেন।

গাহি তাদের গান
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিনাঙ্ক কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি তলে
এস্তা-ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।
বন্য শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা মৃত্যু ভীষণাধরা
যাদের শাসনে হল সুন্দর কুসুমিত মনোহরা।
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যাঘ্র ময়ূর সিংহ বিবরের ফণী লয়ে।

গোষ্ঠীশাসন থেকে Proto-Democratic ও পরে Priest King এর রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়। যার প্রতিফলন দেখা যায় মহাবংশের সীহবাহুর (সিংহবাহু) রাঢ় দেশে আগমন ও সীহপুরে নগর প্রতিষ্ঠা। সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সেন করেন রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

মহাকাব্যের যুগ—রাজতন্ত্র : মহাকাব্যের যুগেও ছিল রাজতন্ত্র। মহাভারতের আদিপর্বে, সভাপর্বে ও ভীষ্মপর্বেও বঙ্গাধিপ এমন কি রাঢ় সুহ্ম-এর রাজাদের উল্লেখ আছে। আদিপর্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় 'ধৃষ্টদ্যুম্নেন রাজ্ঞান্ নাম কথনম্' অংশে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে এর সমর্থন মেলে।

অংশুমাং শ্চেকিতানশ্চ শ্রেনিমাংশ্চ মহাবলঃ।
সমুদ্রসেন পুত্রশ্চ চন্দ্রসেনঃ প্রতাপবান্ ॥
জলসন্ধঃ পিতাপুত্রৌ বিদন্তো দণ্ড এব চ।
পৌন্ড্রকো বাসুদেবশ্চ জগদত্তশ্চ বীর্য্যবান ॥
কলিঙ্গতাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা।
মদ্ররাজস্তথা শল্যঃ সহপুত্রো মহারথঃ।

(ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন—হে ভগিনি! অংশুমান শ্রেনিমান্, চেকিতান, সমুদ্রসেনের পুত্র প্রতাপবান চন্দ্রসেন, জলসন্ধ, বিদন্ত ও তৎ পুত্র দণ্ড, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত পত্তনাধিপতি, মদ্ররাজ-শল্য ও তৎপুত্র রুক্নাম্মদ, রুদ্ররথ, কৌরব্য সোমদত্ত... তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন।)

সভাপর্বেও সুহ্মরাঢ়-এর রাজাদের উল্লেখ আছে—

ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম
কৌশিকী কচ্ছনিলয়ম্ রাজানঞ্চ মহৌজসম্ ॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজসুপাদ্রবৎ ॥
সমুদ্রসেন, নির্জ্জিত্য চন্দ্র সেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানম্ কর্ব্বটাধিপতিং, তথা ॥
সুহ্মানামধিপশ্চৈব যে চ সাগর-বাসিনঃ।
সর্বান্ ম্লেচ্ছানাং-শ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ ॥

নীলকণ্ঠ টীকায় সুহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'সুহ্মাঃ রাঢ়ঃ'।

তৎপরে মহাবল মহাবীর (ভীমসেন) দিগ্বিজয় উপলক্ষে পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকী কচ্ছবাসী মহৌজা (মহাতেজস্বী) রাজা, এই দুই-পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে ও সুহ্মাদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগর কূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করলেন।

মহাভারতের ভীষ্মপর্ব থেকেও শ্লোকের উদ্ধৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

ভীষ্মপর্ব

অষ্টমযুদ্ধদিবসে হৈড়ম্ববাক্যে একনবতিতমোধ্যায়ঃ
ততো দুর্য্যোধনো রাজা ঘটোৎকচমুপাদ্রবৎ।। ৯
প্রগৃহ্য বিপুলং চাপং সিংহবদ্বিনদন্মুহুঃ।
পৃষ্ঠতোনুযযৌ চৈনং স্রবদ্ভিঃ পর্ব্বতোপমৈঃ।। ১০
কুঞ্জরৈর্দশসাহস্রৈর্ব্বঙ্গা-নামধিপঃ স্বয়ম্
তমাপতন্তং সংপেক্ষ গজাণীকেন সংবৃতম্।। ১১
পুত্রং তব মহারাজ চুকোপস নিশাচরঃ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষনম্।। ১২
রাক্ষসানাঞ্চ রাজেন্দ্র দুর্যোধন বলস্য চ।
গজানীকঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য মেঘবৃন্দমিবোদ্যতম্।। ১৩
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধা রাক্ষসাঃ শস্ত্রপানয়ঃ
নদন্তো বিবিধান্নাদান্ মেঘাইব সবিদ্যুতঃ।। ১৪
শরশক্ত্যৃষ্টি নারাচৈর্নিঘ্নন্তো গজযোধিনঃ।
ভিন্দি পালৈস্তথা শূলৈর্ম্মুদ্‌গবৈঃ সপরশ্বধৈঃ।। ১৫
পর্ব্বতাগ্রেশ্চ বৃক্ষৈশ্চ নিজঘ্নন্তে মহাগজান্।
ভিন্নকুম্ভান্ বিরুধিরান্ ভিন্নাগাত্রাংশ্চ বারণাম্।। ১৬
অপশ্যাম মহারাজ বধ্যমানন্নিশাচরৈঃ।
তেষুপ্রক্ষীয়মানেষু ভগ্নেষু গজযোষিষু।

"তখন মহারাজ দুর্যোধন সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গাধিপতি মদস্রাবী পর্বত সদৃশ সহস্র কুঞ্জর সমভিব্যবহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ দুর্যোধন গজসৈন্য পরিবৃত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন রাক্ষসগণ ও দুর্যোধন-সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। শস্ত্রপাণি নিশাচরগণ সেই মেঘবৃন্দ সদৃশ গজসৈন্য সন্দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় বিবিধ প্রকার শব্দ করিয়া ধাবমান হইয়া শর, শক্তি নারাচ, ভিন্দিপাল, শূল মুদগর ও পরশুদ্বারা গজযোধিগণকে এবং পর্বত শৃঙ্গ ও বৃক্ষ সমুদয় দ্বারা মহাগজদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। সংগ্রামস্থলে নিশাচরগণ কর্তৃক নিহন্যমান (নিহত) ভিন্ন কুম্ভ (বিদীর্ণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভগ্নতালুদেশ), ভিন্নগাত্র, রক্তাক্ত কলেবর অসংখ্য মাতঙ্গ দৃষ্ট হইতে লাগিল।"

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে যে বঙ্গাধিপের দশসহস্র রণকুঞ্জরের উল্লেখ আছে তার সঙ্গে গ্রীক পর্যটক প্লিনির গঙ্গারিডিজাতির উল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রীকলেখক মন্তব্য করেছেন, ভারতবর্ষে বহুজাতির বাস। তন্মধ্যে গঙ্গারিডিজাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ (অথবা সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী)। ইহাদের চারিসহস্র বৃহৎকায় সুসজ্জিত রণহস্তী আছে, এই জন্যই অপর কোন রাজা এই দেশ জয় করতে পারে নাই। স্বয়ং আলেকজান্ডার (খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দ) এই সমুদয় হস্তির বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার দুরাশা ত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ মজুমদার মন্তব্য করেছেন— ভীষ্মপর্বের বঙ্গাধিপের দশসহস্র রণকুঞ্জর বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইহা ও গঙ্গারিডিই এর সহিত বাঙালীর অভিন্নতা সমর্থন করে।

এই অভিমত যদি সত্য হয় তাহলে মহাভারতের বর্ণনা ও গ্রীক ঐতিহাসিকের বিবরণ একই যুগকে সূচিত করে। মহাভারতের কালনির্ণয় সম্পর্কে পণ্ডিত সত্যব্রত শ্যামস্বামী তাঁর নিরুক্ত-এর ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন যে মহাভারত খুব সম্ভব ২৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত হয়েছিল এবং রচিত হয়েছিল পাণিনির বহু পূর্বে। ভাণ্ডারকর, পাণিনির কাল ৭ম খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলে মত প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিত দীক্ষিত রাজতরঙ্গিণীর সূত্র থেকে বলেছেন যে মহাভারতের যুদ্ব হয়েছিল কলিযুগের ৬৫৪তম বৎসরে অর্থাৎ শকাব্দ অনুসারে কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর শেষে, সেই অনুসারে ৩১৭৯ + ১৯২১ = ৫১০০ – ১৯৯৯ = ৩১০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। বৃহৎসংহিতায় আছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যে বৎসর হয় সে বৎসর সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘায় অবস্থান করেছিল। সেই অনুসারে ৩১০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ সমর্থিত হয়। ডঃ জয়সওয়াল পুরাণের মত উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন মহাভারতের যুদ্ব ১৪২৪ খ্রীষ্টপূর্ব অনুষ্ঠিত হয়। H. C. Roychowdhury এর মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও পরীক্ষিতের জন্ম ৯ম খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। পৌরাণিক অভিধানে সুধীর সরকার মহাশয় মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মত উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে মহাভারত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় অব্দ থেকে পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছে। আমার মতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মহাভারতের যে কাল নির্ণয় করেছেন সেটাই সঠিক, ডঃ মজুমদারও এই মত সমর্থন করেছেন। মহাভারতের আদিপর্ব, সভাপর্ব ও ভীষ্মপর্বের আখ্যান থেকে অনুমান করা যেতে পারে মহাভারত রচনার যুগে এমনকি তার পূর্ব থেকেই বঙ্গদেশ অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। কখনও কোন পরাক্রান্ত রাজা দুই তিনটি খণ্ডরাজ্য একত্রিত করে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেন নাই; যেমন অঙ্গরাজ কর্ণের অধীনে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকাংশ ভাগ নিয়ে এক বিশাল যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উড়েছিল।

ডঃ H. C. Roy Choudhury তাঁর Political History of Ancient India-তে যে Kurusangha এর উল্লেখ করেছেন তার থেকেও এই মত সমর্থিত হয়। মহাভারতের ও ড. রায়চৌধুরীর এই মত যদি সমর্থন করা যায় তাহলে মহাভারতের যুগে রাঢ় বা সূহ্ম কর্ণের শাসনাধীনে ছিল। এই অংশ কোন সামন্ত রাজার দ্বারা শাসিত হতো। গঙ্গারিডি সম্পর্কে ডঃ হেমচন্দ্র রায় তাঁর History of India-তে মন্তব্য করেছেন, when we enquire into the history of different political and geographical divisions of this region (Bengal & Bihar), such as Magadha, Videha, Anga, Banga, Samatata, Pundra, Gauda, Radha, Sumha etc., We find that from the beginning of imperialism in the 5th and 4th centuries B.C. concepting political disintigration, they have been generally under the administration of one Government.

গঙ্গারাঢ়ী : সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিবিধ প্রবন্ধে 'বাংলার কলঙ্ক' অধ্যায়ে লিখেছেন—"মেগাস্থিনিসের ঐ Gangaridae শব্দ গঙ্গারাঢ়ী শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে ক্রমে গঙ্গারাট্ বা গঙ্গারাঢ় হইবে। ক্রমে সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ পরিত্যক্ত হইয়া রাঢ় শব্দে প্রচলিত থাকিবে।" রোমান কবি ভার্জিলও (আঃ ৩০ খ্রীষ্ট পূর্ব) তাঁর Georgics (III 27) কাব্যে গঙ্গারিডির উল্লেখ করেছেন।

গ্রীকগণের লেখার মধ্যে গঙ্গারিডির পশ্চিমে প্রাসিয়র নামে আর এক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের রাজধানী ছিল পালিবোথরা (বর্তমান পাটলিপুত্র)। কাজেই গঙ্গারিডিই যে বর্তমান রাঢ় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। তাঁদের লেখায় আরও দেখা যায় যে এই দুই গঙ্গারিডি ও প্রাসিয়র এক রাজার অধীনে ছিল। এই তথ্য থেকে মহাভারতের কর্ণ কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কিছু অংশ নিয়ে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সমর্থন মেলে। বর্তমান বর্ধমান জেলার তখন সীমানা নির্ধারিত ছিল না। বর্ধমান জেলা ছিল—সূহ্ম বা দক্ষিণ রাঢ় রাজ্যভুক্ত। কাজেই বর্ধমান জেলা তখন কর্ণের যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত ছিল বলেই অনুমান।

নন্দবংশের শাসন : রাজতন্ত্র : আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ও নন্দবংশের মহাপদ্মনন্দের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। নন্দরাজা বাঙালী ছিলেন বলে অনেক পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের রাঢ় অঞ্চল শক্তিশালী নন্দবংশের অধিকারভুক্ত ছিল। মহাপদ্মনন্দকে নিয়ে নন্দবংশে মোট নয় জন রাজা রাজত্ব করেন। মহাপদ্মনন্দের ৮ পুত্রের মধ্যে শেষ বংশধর (মতান্তরে ভ্রাতা) ধননন্দের নাম পাওয়া যায়। গ্রীকদের মধ্যে তাঁর নাম ছিল আগ্রামেস

(Xandrames) উগ্রসেনের গ্রীকরূপ; গঙ্গারিডিই তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। আগ্রামেসদের সৈন্যবাহিনীতে ২৩,০০০ অশ্ব, ২ লক্ষ পদাতিক, ২০০০ রথ, ৩০০০–৬০০০ সুশিক্ষিত গজবাহিনী ছিল। গ্রীক দেওয়া তথ্য থেকে রাঢ় অঞ্চল যে নন্দরাজাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। ধননন্দকে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মৌর্য-রাজ্য স্থাপন করেন এবং উগ্রসৈন্য বা প্রাসী ও গঙ্গারিডির তিনি অধীশ্বর হন। মহাস্থানগড়ের ব্রাহ্মী শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে বঙ্গদেশ তথা দক্ষিণ রাঢ় বা/বর্ধমান জেলাও তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। কি ভাবে শাসিত হতো এই বিশাল সাম্রাজ্য? H. C. Roychowdhuri তাঁর Political History of Ancient India এবং ডঃ মজুমদারের বাংলাদেশের ইতিহাস ও History and culture of India (Bharatiya Vidya Bhawan) থেকে মৌর্য শাসন-পদ্ধতির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাঁর গোটা সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ বা বিষয়ে ভাগ করেছিলেন। প্রদেশ বা বিষয়ের শাসনভার ছিল প্রদেষ্ট্রির উপর। গ্রীক লেখকগণ Agronomoi নামক জেলাশাসক ও Astyonomoi নামক নগরেব কমিশনারদের নাম উল্লেখ করেছেন। মহামতি অশোকের সময় জনপদ বা প্রদেশ ও জেলার শাসনভার ছিল রাজুক ও 'প্রাদেশিক' নামক কর্মচারীর উপর। প্রতিবেদক (Reporter) মারফৎ সম্রাট প্রদেশ বা জেলার শাসন বিষয়ে গোপন সংবাদ পেতেন। 'অষ্টাদশ তীর্থ' ছিলেন উচ্চতম রাজকর্মচারী। এঁদের সর্বোচ্চ ছিলেন মন্ত্রিন্ (Chief minister)। মহাস্থান-এর ব্রাহ্মীলিপি থেকে জানা যায় মৌর্য শাসনের কালে জেলার শাসনভার মহামাত্র নামক রাজকর্মচারীর ওপর ন্যস্ত ছিল। জেলা বা প্রদেশের বিচারের ভার ছিল মহামাত্র বা রাজুকের অধীনে এক ট্রাইবুন্যালের ওপর। Statesman পত্রিকায় ১।৬।৯৯ তারিখের জলধর মল্লিকের Kautiliya on consumer Rights নামক প্রবন্ধে দাবী করা হয়েছে যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ২য় ও ৪র্থ খণ্ডে বিক্রেতাদের প্রতারণা থেকে ক্রেতাদের রক্ষার জন্য ক্রেতা সুরক্ষা আইন (১৯৮৬) এর মত বিভিন্ন নির্দেশ লিপিবদ্ধ ছিল। সে নির্দেশ রাজ্যের সর্বত্র প্রযোজ্য ছিল।

মহাকাব্যের যুগেও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেওয়া হত। তখন ১০০০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত একটি জনপদ, যার শাসন কর্তৃত্বে ছিল অধিপতি নামক কর্মচারী। গ্রামের ওপর শাসনবিভাগ ছিল নগর, নগরের ওপর বিষয় আর সবার ওপরে ছিল জনপদ। এর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে কর্ণ যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেছিলেন তার জেলাগুলিও বিষয় নামে অভিহিত হত এবং শাসনপদ্ধতিও

ছিল মৌর্য যুগের অনুরূপ। এই বিকেন্দ্রীকরণের Tradition সেই কৌটিল্যের যুগ থেকে গুপ্তযুগ ও পালযুগের ধারা আজও সমানভাবে বর্তমান।

কুষাণ যুগ : চীনা ঐতিহাসিকের বিবরণ থেকে জানা যায় কুষাণ বংশের কণিষ্ক "টিয়েন চো" বা ভারতের প্রকৃত অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে কণিষ্কের রাজ্য সারনাথ বা বারাণসী ছাড়িয়ে পূর্বে পাটলিপুত্র, পশ্চিম বাংলা এমন কি উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুষাণ-মুদ্রা বাংলাদেশের তমলুক ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলেও পাওয়া গেছে। অবশ্য একথাও ঠিক যে কোন রাজার মুদ্রার আবিষ্কারের দ্বারা সেই অঞ্চলে সেই রাজার আধিপত্য প্রমাণিত হয় না। কোন কোন রাজার মুদ্রা নানা কারণে অন্য রাজ্যে নীত হতে পারে। তবে মঙ্গলকোটের উৎখননের ফলে এখানে কুষাণ ও শুঙ্গবংশের অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। Vincent Smith তাঁর History of India-এ (1907 Edn) উল্লেখ করেছেন—শুঙ্গ বংশের পুষ্যমিত্র বৃহদ্রথ মৌর্যকে হত্যা করে সমগ্র মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন ও সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর হন। পুষ্যমিত্র এই প্রসঙ্গে তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্রকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন Smith তার উল্লেখ করেছেন। "From the Sacrificial enclosure the commander-in-chief Pushpamitra sends the message to his son Agnimitra who is in territory of vidisa... Accordingly, I will now sacrifice, having had my horse brought back to me by my grandson."

পুষ্যমিত্র এই ভাবে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করে সমগ্র উত্তর ভারতের আধিপত্য কায়েম করেন। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে, দক্ষিণ রাঢ় বা বর্ধমান জেলা অঞ্চলে শুঙ্গবংশের আমলে মৌর্য শাসনের অনুরূপ শাসনব্যবস্থা বলবৎ ছিল। ১৯৯০ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখের Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে অমিতা রায় মঙ্গলকোট অঞ্চলে উৎখনন কার্য চালান। এই উৎখননের ফলে যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে দলনেত্রী অমিতা রায় তাঁর Historical Archaeology of India গ্রন্থে Archacology of Mongolkote প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—

The evidence of ruin of brick structures scattered all over the village including the stray remains of antiquities and Pot-sherds found all over, strongly suggests a most flourishing stage of history in this region from the Kushana periods onwards. Excavations have revealed massive structures all made in bricks, belonging both to the Kushana and the Guptas.

কাজেই কেবলমাত্র কুষাণ-মুদ্রাই নয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের দ্বারাও প্রমাণ করা যেতে পারে যে মৌর্য শাসনের পর রাঢ়-বর্ধমান অঞ্চলে কুষাণ ও গুপ্তশাসন অব্যাহত ছিল এ বিষয়ে অধ্যাপক শশিভূষণ দাসগুপ্ত ও ডঃ বরুণ দে বর্ধমান গেজিটিয়ারে (১৯৯৪) যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য—"There is no reason to believe that Radha-Vardhamana country ceased to be a constituent part of the successive empires of the northern India—the Kunanas and the Guptas."

কণিষ্কের পরবর্তী বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, জাস্ক এদের রাজ্যও was not less extensive than that of the traditional patron of Asvaghosha (Dr. Mazumdar)। কুষাণ বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা প্রথম বাসুদেব। কুষাণদের পর শক ও ম্লেচ্ছ শাসনের শেষ দিকে "পরকলত্রকামুক" শাসকদের অত্যাচারে দেশ শ্মশানে পরিণত হয়। তখন হয় গুপ্ত রাজবংশের উদ্ভব।

গুপ্ত শাসন : গুপ্তবংশের প্রথম রাজার নাম পাওয়া যায় শ্রীগুপ্ত—তিনি সম্ভবত একজন সামান্য সামন্তরাজ ছিলেন। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-এ লোক নামক রাজার উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধগ্রন্থ আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প খ্রীষ্টীয় ৮ম–৯ম শতকে রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থ অনুসারে গুপ্তদের আদি বাসস্থান ছিল বর্ধমান জনপদ। এই গ্রন্থে ৬৪০–৪২ শ্লোকে আছে।

অন্তমেব যুগে যুগে নৃপেন্দ্র-শ্রীনু তত্ত্বতঃ
সমুদ্রাখ্য নৃপশ্চৈব বিক্রম-শ্চৈব কৃত্তিতঃ
মহেন্দ্র নৃপবরম্ মুখ্য সকারাখ্যো মতঃ পরৎ ॥

ডঃ কল্যাণকুমার গাঙ্গুলীর মতে সমুদ্র নামক রাজার দ্বারা গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমের দ্বারা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, মহেন্দ্র দ্বারা কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য এবং শকর দ্বারা শকারী স্কন্দগুপ্তকে বোঝায়। তবে শ্রীনু দ্বারা শ্রীগুপ্তের নির্দেশ মেলে। মুলকল্পের কাহিনী ঐতিহাসিকের স্বীকৃতি পায় নাই। কিন্তু একথা তো সত্য যে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা সমতট (পূঃ বাংলা), দাবক (আসামের নওগং) ও কামরূপ পর্যন্ত এবং পুরাণ মতে বাংলার কতিপয় জেলায় বিস্তৃত ছিল। ১৩১৮ সালের অজয়ের প্রবল বন্যায় পাণ্ডুরাজার ঢিবির ক্ষয়প্রাপ্ত অংশে একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। যার এক পৃষ্ঠে রাজমূর্তি ও অপর পৃষ্ঠে লক্ষ্মীমূর্তি অঙ্কিত। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রাতেও বীণাবাদনরত রাজার মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত মুদ্রাতে যে রাজমূর্তি অঙ্কিত দেখা যায় তার নীচে "গুপ্ত" ব্রাহ্মী অক্ষরে যে লেখা আছে প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার পাঠোদ্ধার করেছেন—নরেন্দ্রগুপ্ত। হর্ষ শিলালিপি থেকে পরবর্তী গুপ্তরাজবংশের (Later Guptas) কৃষ্ণগুপ্ত থেকে

আরম্ভ করে ১১ জন ও চালুক্য শিলালিপি থেকে আরও তিনজন পরবর্তী গুপ্ত রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নরেন্দ্রগুপ্ত চালুক্য লিপির একজন হতে পারেন। কিংবা ২য় চন্দ্রগুপ্ত-এর কন্যা পার্বতীদেবীর পুত্র বাকাটকরাজা নরেন্দ্র সেনও হতে পারে। ঐতিহাসিক দীক্ষিতের Archaeological Survey of India—Annual Report 1927–28 অনুসারে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে খ্রীষ্টীয় ৩য় শতকের ক্ষোদিত লিপি থেকে জানা যায় এখান থেকে ২৫ মাইল দূরে পুষ্করণ বা পোখরানে রাজা চন্দ্রবর্মণ রাজত্ব করতেন। তাঁর পিতার নাম সিংহবর্মণ। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে চন্দ্রবর্মণের উল্লেখ আছে। মনে হয় ইনিই সেই চন্দ্রবর্মণ যাকে সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত করেন। চন্দ্রবর্মার রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ষষ্ঠ শতাব্দীর একটা শিলালিপি থেকে জানা যায় ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় চন্দ্রবর্মা-ফোর্ট নামে একটি দুর্গ ছিল। এই দুর্গের নামকরণ যদি চন্দ্রবর্মার নাম অনুসারে হয় তাহলে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে চন্দ্রবর্মার রাজত্ব বাঁকুড়া থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ রাঢ় বা বর্ধমান জনপদেরও তিনি রাজা ছিলেন। প্রাচীন দিল্লীতে একটি লৌহস্তম্ভ আছে। উন্মুক্ত স্থানে থাকলেও আজ পর্যন্ত তার গায়ে মরিচা পড়ে নাই। এই স্তম্ভে ক্ষোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে চন্দ্র নামক রাজা বঙ্গের সমগ্র সম্মিলিত রাজশক্তিকে পরাজিত করেন। তাঁরই স্মৃতিতে এই লৌহস্তম্ভ। এই চন্দ্রকে নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। এই চন্দ্র যেই হোন, মান্দাসোর লিপির মাড়ওয়ারের পোখরানের রাজা নরসিংহবর্মন-এর ভাই চন্দ্রবর্মন-ই হোন, আর গুপ্ত সম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যই হোন কিংবা যেখানে এই মেহরলি লৌহস্তম্ভ পাওয়া গেছে সেই হিমালয়ে পাদদেশের কোন স্বাধীন রাজ্যের রাজাই হন, মেহরলি স্তম্ভলিপি থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে গুপ্তযুগের প্রাক্কালে বঙ্গে একাধিক স্বাধীন রাজ্য ছিল ও বাইরের কোন শক্তির আক্রমণের সময় আত্মরক্ষার জন্য এঁরা সম্মিলিতভাবে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন।

সমুদ্রগুপ্ত যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে জয় করেছিলেন তা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৮০–৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ), তারপর প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৩–৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) ও স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫–৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) ও স্কন্দগুপ্তের পুত্র ২য় কুমারগুপ্ত (৪৬৭–৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) এর আমলেও দক্ষিণরাঢ়সহ সমগ্র বঙ্গদেশ গুপ্ত শাসনাধীনে ছিল। স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পর তঁর মধ্যমভ্রাতা পুরুগুপ্ত শ্রীবিক্রম সিংহাসনে বসেন। পুরুগুপ্তের তিন পুত্র—নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, বুধগুপ্ত ও বৈন্যগুপ্ত পূর্ব অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ত্রিপুরা থেকে তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এই ত্রিপুরা-র সঠিক অবস্থান নির্ণয়

করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু নালন্দা শিল থেকে জানা যায় বৈন্যগুপ্ত মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। এর থেকে মনে হয় বুধগুপ্তের মৃত্যুর পর বৈন্যগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। গুণাইঘর (Gunaighar) তাম্রশাসন থেকে জানা যায় বৈন্যগুপ্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শান্তিদেবের সম্মানে অবলোকিতেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিদান করেছিলেন। এর বেশী বৈন্যগুপ্ত সম্বন্ধে আর বিশেষ জানা যায় না। গুণাইঘর তাম্রশাসনের তারিখ, ৫০৭-৫০৮ খ্রীষ্টাব্দ, কাজেই ঐ সময় পর্যন্ত বা তার কিছু পরও বৈন্যগুপ্ত রাঢ় অঞ্চলের শাসন পরিচালনা করেছিলেন। গুণাইঘর তাম্রশাসনের দুতক (executor) ছিলেন মহারাজা মহাসামন্ত বিজয়সেন। কাজেই মনে হয় বৈন্যগুপ্ত যখন বুধগুপ্তের পর মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করে মগধের সিংহাসনে বসেন তখন মহারাজা মহাসামন্ত বিজয়সেন তাঁর সামন্তরাজা হিসেবে রাঢ় বা বর্ধমান ভুক্তির শাসনকর্তা ছিলেন।

যশোধর্মন : অন্তর্বিদ্রোহ ও হূনজাতির পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থাৎ বৈন্যগুপ্তের পর গুপ্ত সম্রাটগণ ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়েন। মান্দাসোর লিপি থেকে জানা যায় এই সময়ে যশোধর্মন নামে একবীর সমগ্র আর্যাবর্তে আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর জয়স্তম্ভের লিপি থেকে জানা যায় তিনি পূর্বে ব্রহ্মপুত্র হতে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। এই তথ্য সত্য হলে স্বীকার করতে বাধা নাই যে পশ্চিমবাংলা ও রাঢ় অঞ্চল ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যশোধর্মনের অধীনে ছিল। সমসাময়িক লিপি থেকে জানা যায় যশোধর্মনের পক্ষে মান্দাসোর থেকে পূর্বাঞ্চলের এত দূরের রাজ্যশাসন বেশী দিন সম্ভব হয় নাই। ফলে এই সময়ে রাঢ় অঞ্চলসহ প্রায় সমগ্র পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফরিদপুর প্লেট থেকে জানা যায় বৈন্যগুপ্তের পর রাঢ় ও বর্ধমানভুক্তি অঞ্চলে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের শাসন কায়েম ছিল।

ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব : ঐতিহাসিক বি. পি. সেনের মতে যশোধর্মনের রাজত্বের পর ধর্মাদিত্য বর্ধমানভুক্তিসহ সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের শাসনাধিকার লাভ করেন। মহারাজা বিজয়সেনের শিল সমন্বিত মল্লসারুল তাম্রশাসন থেকে এটা সমর্থিত হয়। গুণাইঘর তাম্রপত্রেও এই বিজয়সেনের নামের স্বাক্ষর আছে। মনে হয় মহারাজ মহাসামন্ত বিজয়সেন সামন্ত রাজা হিসেবে বিভিন্ন সময়ে সমতট ও বর্ধমানভুক্তি অঞ্চলে কখনও বৈন্যগুপ্ত এবং কখনও ধর্মাদিত্যের অধীনে দূতক ও সামন্তরাজা হিসেবে আঞ্চলিক শাসনকর্তা ছিলেন। পার্গিটারের মতে গোপচন্দ্র প্রথমে সিংহাসনে বসেন নাই। প্রথম শাসক ছিলেন

ধর্মাদিত্য তারপর গোপচন্দ্রের ও সমাচারদেবের হাতে শাসন কর্তৃত্ব যায় এবং এদের তিনজনের শাসনকাল ছিল ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কোটালিপাড়ার পাঁচখানি ও গলসীর নিকট মল্লসারুলের একটি তাম্রশাসনে এই সমুদয় স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের বিবরণ পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেনের মতে মহারাজ বিজয়সেন ছিলেন মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের উপরিক বা মহাসামন্ত। এই বংশ বেশ কিছুকাল বর্ধমানের পশ্চিমে ও উত্তর অংশে রাজত্ব করেছিল, যার স্মৃতি হয়তো সিংভূম পরগনার সঙ্গে জড়িত।

বিজয়সেন : মল্লসারুল তাম্রপত্রখানি গলসীর ২১ মাইল দূরে মল্লসারুল (জে. এল. ৬৬) মৌজার এক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় পাওয়া যায়। তাম্রশাসনের বিষয়বস্তু হল বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত বক্কত্তক বীথির অধিকরণের নিকট বৎসস্বামী নামক ব্রাহ্মণকে পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত বেতাবত্তা গ্রামে আটকুলা বাপ ভূমি ক্রয়েচ্ছুক হয়ে পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের ধর্মষড়ভাগ (১/৬ অংশ) ধর্মার্জনের জন্য দান করেন। দাতা বা executor ছিলেন মহাসামন্ত বিজয়সেন। সামন্তরাজা হলেও ভূমি ক্রয়, বিক্রয় ও দান বিষয়ে তাঁর অধিকার (আমমোক্তার নামা) ছিল। এই লিপিতে কয়েকটি গ্রামের নাম আছে। এই নামের অনেকগুলিই ডঃ সুকুমার সেন উদ্ধার করেছেন। মল্লসারুলের প্রাচীন নাম ছিল আম্রগর্তিকা।

তাম্রশাসনে লিখিত নাম	বর্তমান নাম	অঞ্চল বা গ্রাম
গোধগ্রাম	গোহগ্রাম	গলসী (জে. এল. ৭০)
বক্কত্তক	বাক্তা	থানা : গলসী (জে. এল. ৯৬)
কোড়ডবীর	কোড়ডে	বর্ধমান (জে. এল. ৬৪)
অধিকরক	আদরা	গলসী (আদরাটি-৭৮)
কবিস্থবা টক	কইতাড়া	থানা : গলসী (জে. এল. ৭৪)
খণ্ডজোটিকা	খারজুলি	বর্ধমান থানা (জে. এল. ৫৫)
মধুযাটক	মওড় / মহড়া	গলসী (জে. এল. ১১০)
শাল্মলীকালীখাটক	সিমলাড়া/সিমনারি	গলসী (জে. এল. ৭৭)
বিন্ধপুর	বিজুর	মেমারী থানা (জে. এল. ১২)

মৌর্য শাসনের মত তৎকালে রাজস্ব, প্রশাসন, জনকল্যাণ প্রভৃতি কাজের জন্য বিভিন্ন পদে নিযুক্ত পদাধিকারীর নাম তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে।

উর্ণস্থানিক—রেশম ও পশম-জাত পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য দ্রব্যের তত্ত্বাবধায়ক।

অগ্রহারিক—রাজপ্রদত্তভূমি ভোগকারীর ভূমির তত্ত্বাবধায়ক, অনেকের মতে সামন্ত রাজা।

আবাসস্থিক—রাজকীয় আবাসগৃহ, মন্দির প্রভৃতির তত্ত্বাবধায়ক বর্তমানের Estate officer.

পট্টালক—গ্রামের Notary public অর্থাৎ দলিল, কাগজপত্র প্রমাণকারী সরকারী কর্মচারী।

চৌরদ্বরণিক—শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার উচ্চপদস্থ কর্মচারী S. P. বা Police কমিশনার পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মচারী।

দেবদ্রোণী-সম্বন্ধ—দেবমন্দির ও সরোবরের তত্ত্বাবধায়ক।

হিরণ্যসামুদায়িক—স্বর্ণসংগ্রহকারীদের নিকট রাজস্ব আদায়কারী।

কাত্তাকৃতিক—উৎপন্ন দ্রব্যের রাজস্ব আদায় আধিকারিক।

কুমারামাত্য—মন্ত্রী পর্যায়ভুক্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী।

উপরিক—প্রাদেশিক শাসনকর্তা।

বিষয়পতি—জেলা অধিকর্তা (District Magistrate) ।

বাহ্নায়ক—পরিবহন অধিকর্তা (Director of Transport) ।

আবসথিক—সম্ভবত গ্রামপ্রধান।

ভোগপতিক—দলিল সম্পাদনকারী আধিকারিক (District Register) ।

তদ্যায়ুকুক—Additional District Magistrate বা S. D. O. পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মচারী।

আয়ুক্তক—Governor of a District ।

উপরিউক্ত রাজকর্মচারীর বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে সেই সুদূর অতীতেও প্রশাসন বিভাগে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি প্রচলিত ছিল এবং বিভিন্ন বিভাগের জন্য বিভিন্ন অধিকরণের শীর্ষে একজন করে উচ্চ পদাধিকারী কর্মচারীর হাতে সেই বিভাগের প্রশাসনের ভার ন্যস্ত ছিল। বর্তমানের মত সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত রাজস্ব আধিকারিক, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, শুল্ক বিভাগ, পরিবহন বিভাগ, কুটীর শিল্প, দলিল নিবন্ধ আধিকারিক, মহকুমা শাসক, পুলিশ

সুপারিন্টেন্ডেন্ট, বিভিন্ন অফিসারের বিভিন্ন অধিকরণ ও দপ্তর ছিল। সমস্ত প্রশাসনের উর্ধ্বে ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সামন্তরাজা।

ডঃ এ. কে. সুরের মতে ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব যথাক্রমে তিন ও চোদ্দ বছর রাজত্ব করেন। সমাচারদেবের পর আরও দু'জন শাসনকর্তার নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন পৃথুজবীর বা পৃথুবিরাজা ও শ্রীসুধন্যাদিত্য। এই সমতট অঞ্চলে রত বংশের দুই জন শ্রী জীবনধারণ রত ও শ্রী শ্রীধরণ রত এবং খড়্গা বংশের চারজন খড়্গোাদ্গম, জাতখড়্গা, দেবখড়্গা ও রাজ রাজভট্ট এই অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। এদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে গৌড়, সমতট, রাঢ় ও বর্ধমানভুক্তি অঞ্চল বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। দেশের নানা স্থানে এ যুগের যে সব স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায় তাতে এদের নামও পাওয়া যায়।

শশাঙ্ক : ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ শশাঙ্কের উত্থান বাংলাদেশের তথা রাঢ় বাংলার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করে। শশাঙ্কের জন্মবৃত্তান্ত রহস্যময়। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে দেখা যায় শশাঙ্ক ছিলেন ব্রাহ্মণ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে শশাঙ্ক বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে শশাঙ্ক গুপ্তবংশজাত ছিলেন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কনিষ্ঠপুত্র গোবিন্দগুপ্তের বংশধর মহাসেনগুপ্তর পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। যাই হোক, গুপ্ত শাসনের দুর্বলতার সুযোগে তিনি স্বাধীন বাংলার প্রতিষ্ঠা করেন ও কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করেন। জয়রামপুরের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় শশাঙ্কের পূর্বেও স্বাধীন বঙ্গরাজ্য উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এর থেকে ডঃ মজুমদার অনুমান করেছেন শশাঙ্ক এই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের ভিত্তির উপরেই তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রাচীন রোহিতাশ্বের (রোটাশগড়) গিরিগাত্রে 'শ্রীমহা সামন্ত শশাঙ্ক' এই নামটি ক্ষোদিত আছে। এর থেকে ডঃ মজুমদার মন্তব্য করেছেন—"এই শশাঙ্ক ও গৌড়রাজ শশাঙ্ক যদি অভিন্ন হন তাহলে স্বীকার করতে হয় যে শশাঙ্ক প্রথমে একজন মহাসামন্ত ছিলেন; অনেক ঐতিহাসিক এর থেকে অনুমান করেন যে শশাঙ্ক প্রথম জীবনে মৌখীরীরাজের মহাসামন্ত ছিলেন। এটা অনুমান মাত্র। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে মহাসেনগুপ্ত মগধ ও গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। গুপ্তবংশের পতনের পরে শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন নরপতি রূপে রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করেন। উনবিংশ শতকেও সমগ্র বঙ্গদেশ গৌড় নামেই অভিহিত হত। বাণভট্ট, হর্ষচরিতে শশাঙ্ককে "গৌড়াধম বা গৌড়ভুজঙ্গ" বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথমে মগধ, মুর্শিদাবাদ,

বর্ধমান, বীরভূম ছিল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পরে তিনি বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা জয় করেন। R. D. Banerjee তাঁর History of Orissa-তে এর উল্লেখ করেছেন : Sasanka's dominions extended from the northern part of Murshidabad district to that of Balasore. মেদিনীপুর তাম্রশাসনে আছে—শশাঙ্কের অধীনে শ্রীসোম দত্ত দণ্ডভুক্তিসহ উৎকল শাসন করতেন। অন্য একটি তাম্রশাসনে দণ্ডভুক্তির শাসক হিসাবে মহাপ্রতিহার শুভকৃতি-র নাম পাওয়া যায়। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের উৎকলের একটি তাম্রশাসনে গঞ্জাম জিলাস্থিত কোঙ্গোদের শৈলোদ্ভব বংশীয় রাজার "চতুরুধিমখিলবীচিমেখলা দ্বীপ গিরি পত্তনবর্তী" বসুন্ধরার অধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীশশাঙ্কের মহাসামন্ত বলে উল্লেখ আছে। কাজেই অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে এই সমস্ত মহাসামন্তদের কেউ শশাঙ্কের অধীনে বর্ধমান ভুক্তির শাসকও ছিলেন। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে উল্লেখ আছে শশাঙ্ক ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। হিউয়েন সাঙ ৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্ট অব্দে বোধগয়া পরিদর্শনে গিয়ে লিখেছিলেন যে অনতিকাল পূর্বে শশাঙ্কের আদেশে বোধিবৃক্ষ ছেদন করা হয়। এছাড়া আর্যমঞ্জুশ্রীতেও উল্লেখ আছে যে বৌদ্ধগয়ায় একটি মন্দির থেকে বৌদ্ধমূর্তি সরাতে আদেশ দেবার ফলে শশাঙ্কের সর্বাঙ্গে ক্ষত হয় ও তাঁর শরীরের মাংস পচে যায় এবং অল্পকাল মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। কাজেই অনুমান যে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের অনতিকাল পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়। ফার্গুসন, কানিংহাম ও হিউসেন সাঙ্ এর বিবরণ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে কর্ণসুবর্ণ, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোহর এমন কি তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

মাৎস্যন্যায় : আর্যমঞ্জুশ্রীতে পাই শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ কলহ ও বিদ্রোহে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ফলে একাধিক রাজার অভ্যুদয় ঘটে। এদের মধ্যে কেউ এক সপ্তাহ কেউ একমাস রাজত্ব করেন। শশাঙ্কের পুত্র মানব ৮ মাস ৫ দিন রাজত্ব করেছিলেন। এই অন্তর্বিদ্রোহ-ই শশাঙ্কের বিশাল রাজ্যের শক্তি নষ্ট করে ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রশস্ত করে। এর পরবর্তী একশত বৎসর সমগ্র বাংলাদেশ তথা রাঢ়ের বুকে নেমে আসে অন্ধকার যুগ। বিন্ধপ্রদেশের এই সময়ের অধীশ্বর দ্বিতীয় জয়বর্ধনের একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে কলিঙ্গের শৈল বংশোদ্ভূত জয়বর্ধনের প্রপিতামহের ভ্রাতা সমগ্র পুণ্ডবর্ধন জয় করেছিলেন। কিন্তু এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তিব্বত দেশীয় লামা তারানাথ তাঁর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গ্রন্থে ভঙ্গল (বাঙ্গলা) দেশের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে বঙ্গাল দেশে

পালবংশের পূর্বে চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ রাজত্ব করতেন। ললিতচন্দ্র চন্দ্রবংশের শেষ রাজা। "এই অবস্থায় বহু বৎসর যাবৎ ভঙ্গল দেশে কোন রাজা না থাকায় লোকের অত্যন্ত দুর্দশা হইল। তখন নেতৃবর্গ একত্র হইয়া একজন রাজা নির্বাচন করিলেন। কিন্তু এক নাগকন্যা ভূতপূর্ব রাজা গোবিন্দচন্দ্রের (মতান্তরে ললিত চন্দ্রের) রানীর রূপ ধরিয়া ঐ রাজাকে রাত্রে হত্যা করেন। ***চুন্দাদেবীর এক ভক্ত স্বেচ্ছায় রাজপদে নির্বাচিত হইয়া রাত্রে ঐ রাক্ষসীর রূপধারিণী নাগিনীকে লগুড়াঘাতে নিহত করেন। কৃতজ্ঞ লোকেরা তাঁহাকে 'গোপাল' এই নামে রাজপদে বরণ করিল"। কিন্তু তারানাথের এই অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নহে।

কনৌজের রাজকবি বাকপতিরাজের প্রাকৃত ভাষায় রচিত 'গৌড়বাহে'র বিবরণ অনুসারে কনৌজের রাজা যশোধর্মন মগধের রাজাকে হত্যা করেন ও সমগ্র বাংলাদেশ তাঁর শাসনাধীনে আনেন। ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য যশোবর্মনকে পরাজিত করেন ও বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। তারপর বাংলাদেশে পূর্ণ অরাজকতা বা মাৎস্যন্যায় চলতে থাকে। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন "বর্ধমান মানেই পশ্চিমবঙ্গ। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বাংলাদেশ বৃহৎ প্রদেশে বিভক্ত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ। দক্ষিণ প্রদেশের প্রধান নগর বর্ধমান অনুসারে—এদেশের নাম হয়েছিল বর্ধমান ভুক্তি।"

পালবংশ : মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষণ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ।
শী গোপাল ইতি ক্ষিতীশ শিরসাং চূড়ামনিস্তং সুতঃ॥

(খালিমপুর তাম্রশাসন)

দুর্বলের প্রতি সবলের (অত্যাচারমূলক) মাৎস্যন্যায় (অরাজকতা) দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ (প্রজাগণ) যাঁকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়া (রাজা নির্বাচিত করিয়া দিয়াছিল) নরপাল-কুল চূড়ামণি গোপাল নামক সেই রাজা (বাপ্যট) হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বাপ্যট নামে এক সেনাপতির পুত্র গোপাল)। গোপালের প্রতিষ্ঠিত পালবংশ প্রায় তিনশত বৎসর বাংলাদেশ শাসন করেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপালের মুঙ্গের লিপি থেকে জানা যায় যে গোপাল বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে গোপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গকে সংহত করেন। খালিমপুর লিপি অনুসারে ধর্মপাল উত্তর ভারতের নানা অঞ্চল জয় করে কনৌজে যে দরবার করেন সেই দরবারে উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলের রাজারা সমবেত হয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্য জানান। মুঙ্গের লিপি ও গুজরাটী কবি সোঢ্ঢলের "উদয় সুন্দরী কথা" কাব্যে খালিমপুর লিপির তথ্য সমর্থিত হয়েছে। অনেকে অবশ্য

ধর্মপালের সমস্ত রাজাদের উপর আধিপত্য স্থাপন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ডঃ মজুমদারের মতে বাংলা ও বিহার ধর্মপালের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল এবং এর বাইরের অন্যান্য রাজ্যে তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনাধিকার না থাকলেও এই সমস্ত রাজ্যের রাজা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে তাঁকে ত্রিশক্তি ভাগ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিহার নাগভট্টের কাছে মুঙ্গের যুদ্ধে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। পরে অবশ্য রাষ্ট্রকুটাত্মজা রণ্ণাদেবীর সূত্রে রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় গোবিন্দ ধর্মপালের সাহায্যে আসেন ও তাঁদের মিলিত শক্তি প্রতিহাররাজ নাগভট্টকে পরাজিত করে। কিন্তু ডঃ মজুমদারের মতে ধর্মপাল প্রথমে বেতসীবৃত্তি অনুসরণ করে নাগভট্টের বশ্যতা স্বীকার করে নেন কিন্তু নাগভট্ট দক্ষিণ ভারতে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল উত্তর ভারতে নিজ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এর মধ্যে তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই। কবি সোঢ্‌ঢলের মতে ধর্মপাল ছিলেন 'উত্তরপথস্বামিন্'।

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল ৮১০ খ্রীষ্ট অব্দে পালসিংহাসনে বসেন ও ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর সময়ে তাঁর রাজ্য আসাম থেকে কাশ্মীর সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত উড়িষ্যা এমনকি সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুঙ্গের লিপির ১৪নং শ্লোকে এর সমর্থন মেলে। গৌড় রেখমালাতেও এর উল্লেখ আছে।

> আ-গঙ্গা-গম মহীতাৎ
> সপ্রন্যা শূন্যাম্
> আ-সেতোঃ প্রথিত
> দশাস্যকেতু কীর্তেঃ... (মুঙ্গের লিপি শ্লোক ১৫)

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে গোপাল, ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে রাঢ় অঞ্চল তথা বর্ধমান ভুক্তি পালরাজাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। দেবপালের পর থেকে পাল রাজশক্তির গৌরব ম্লান হতে থাকে। কারণ পালরাজশক্তি ক্রমশ ব্রাহ্মণমন্ত্রী দর্ভপাণি ও কেদার মিশ্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকায় ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু হয়।

দেবপালের মৃত্যুর পর ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল সিংহাসনে বসেন। কিন্তু সিংহাসন আরোহণের বছর চার পরেই তিনি পুত্র নারায়ণ পালের হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেন। নারায়ণ পাল ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। প্রথম ভোজরাজের পুত্র মহেন্দ্র পালের একটি লিপি থেকে জানা যায় নারায়ণ পালের রাজত্বের (৮৫৪–৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ) সপ্তদশ বৎসরে

প্রতিহার রাজশক্তি ক্রমশ পূর্বদিকে অগ্রসর হয় ও একে একে বিহার ও উত্তরবঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করে। রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ষ তাঁকে ৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত করেন। পালশক্তি বঙ্গ ও রাঢ়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়।

নারায়ণ পালের পর তাঁর পুত্র রাজ্যপাল (৯০৮-৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ) ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন ও ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র প্রতিহাররাজকে পরাজিত করলে রাজ্যপালের পুত্র দ্বিতীয় গোপাল বিহার পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। ইর্দা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তাঁর সময়ে কম্বোজ রাজবংশ দক্ষিণ রাঢ় বা বর্ধমান ভুক্তির কিছু অংশ দখল করে কম্বোজ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। ইর্দা ও ভাতুরিয়া তাম্রশাসনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে রামপরাক্রম রাজ্যপাল নামে এক রাজা অঙ্গ, সুহ্ম ও অন্যান্য অংশ দখল করেন। এর থেকে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয় না যে দ্বিতীয় গোপাল অথবা তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের সময় দক্ষিণ রাঢ় বা বর্ধমান ভুক্তি পাল রাজার হাতছাড়া হয় । চোল বংশীয় রাজেন্দ্র চোলদেবের তিরুমালাই লিপি অনুসারে চোল শক্তি উৎকল জয় করে দণ্ডভুক্তি বা দাঁতনের পথে বাংলায় প্রবেশ করেন ও ঝটিকা আক্রমণ করে দক্ষিণ রাঢ়ের সামন্ত রাজা রনশূর ও বাংলার গোবিন্দচন্দ্রকে পরাস্ত করেন। এঁদের উর্ধ্বতন রাজা (অধিরাজ) প্রথম মহীপাল ভীত হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন। তখন রাজেন্দ্র চোলদেব বাংলার পরাজিত রাজন্যবর্গকে মাথায় করে গঙ্গাজলের কলস নিয়ে চোলদেশে যেতে বাধ্য করেন। এই জলে রাজেন্দ্র চোলদেবের অভিষেক হয় ও তিনি গঙ্গোইকোণ্ড বা গঙ্গা বিজেতা উপাধি ধারণ করেন। দক্ষিণ রাঢ়দেশ বা বর্ধমান ভুক্তি কিছুকাল চোল অধিকারে থাকে। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলচুরীর আক্রমণে মহীপালের রাজ্যের কিছু অংশ হাতছাড়া হয়।

প্রথম মহীপালের পর নয়াপাল (১০২৭-১০৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) পাল সিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলে কর্ণ কলচুরীর আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ-দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় পালরাজ ও কলচুরীর মধ্যে এক সমঝোতা হয়। এরপর তৃতীয় বিগ্রহপাল ১০৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন ও ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর সময়ে পুনরায় কলচুরীর আক্রমণ হয় ও শেষে কলচুরীরাজ কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে বিগ্রহপালের বিবাহের ফলে যুদ্ধ বন্ধ হয়। এই সময় চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ও উড়িষ্যার সোমবংশী রাজার আক্রমণে পালশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে সামন্ত শক্তিগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় মহীপালের (১০৭০-৭১) কুশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে কৈবর্ত জাতীয় দিব্যোকের নেতৃত্বে সামন্তশক্তি যৌথভাবে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ঘোষণা করে। দিব্যোক ২য় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্রভূমিতে আধিপত্য বিস্তার করেন। দ্বিতীয় মহীপালের পতন ও দিব্যোকের অভ্যুত্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক উপাদান হলো সন্ধ্যাকর নন্দীর দ্ব্যর্থক কাব্য 'রামচরিত'।

ন্যায়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৫৪-৭২) ও তৃতীয় বিগ্রহ পালের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে বর্ধমান ভুক্তিতে পাল শক্তির বিশেষ প্রভাব ছিল না। তৃতীয় বিগ্রহপালের তৃতীয় পুত্র রামপাল বরেন্দ্র অধিকার করে পালশক্তির হৃত গৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার করেন। দিব্যোকের পুত্র ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রামপালকে যে সমস্ত সামন্ত রাজা সাহায্য করেছিলেন 'রামচরিতম্'-এ তাদের চোদ্দ জনের নামের উল্লেখ আছে। এর থেকে বর্ধমান ভুক্তির সেই সময়ের শাসনের কিছু হদিস মেলে।

১) বীরুগুন বা বীরগুন—'দক্ষিণ সিংহাসন চক্রবর্তী'। ইনি ছিলেন কোটাটবীর রাজা। বিষ্ণুপুরে কোটেশ্বর নামে একটা গ্রামের সঙ্গে কোটাটবীর নামের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। পঞ্চানন মণ্ডলের মতে বর্ধমান জিলার আউসগ্রাম থানার সুয়াতা ভাল্কী বা ভাল্কীকোটই কোটাটবীর। এখানে অরণ্য অঞ্চল বর্তমান। কারও কারও মতে বাঁকুড়ার কোতলপুর ও খণ্ডঘোষ থানা নিয়ে গঠিত অঞ্চল কোটাটবীর। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে এই অঞ্চল উড়িষ্যার গড়জাত প্রদেশ।

২) জয়সিংহ—দণ্ডভুক্তির রাজা। দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণে দাঁতন। ইনি উড়িষ্যার রাজা কর্ণকেশরীকে পরাজিত করেন।

৩) বিক্রমরাজ—বিক্রম। রামচরিতে আছে বিক্রম ছিলেন—'দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ' ও 'বালবলভী তরঙ্গ'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বালবলভী মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতার প্রাচীন নাম। দেবগ্রাম নদীয়া জেলায় অবস্থিত। ডঃ মজুমদারের মতে দেবগ্রাম শিয়ালদহ লালগোলা লাইনে দেবগ্রাম স্টেশনের অদূরে দেবগ্রাম নামক গ্রাম। দেবগ্রাম কৃষ্ণনগর থেকে ৪০ মাইল দূরে।

৪) লক্ষ্মীশূর—অপর মন্দার ও বনাঞ্চলের প্রভু বর্তমানের গড়মান্দারণ। ইহার উপাধি ছিল 'সমস্তাটবিক সামন্তচক্র চূড়ামণি'। ডঃ মজুমদার উল্লেখ করেছেন যে মহীপালের সমসাময়িক লোক-প্রসিদ্ধ দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূর বংশীয় কেহ হতে পারেন।

৫) শূরপাল—কুজবতীর রাজা। কুজবতী নয়া দুমকার ১৪ মাইল উত্তরে।

৬) রাজা রুদ্রশিখর—তৈলকম্পের রাজা—মানভূম জেলার তেলকুপি।

৭) ভীমযশ—মগধ ও পীঠির রাজা। ইনি কান্যকুব্জ রাজের সৈন্য পরাস্ত করেন।

৮) ভাস্কর বা মদকল সিংহ—উচ্ছালের রাজা। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডলের মতে উচ্ছাল বর্তমানে রায়না থানার উচালন। কারও কারও মতে বীরভূম জেলার জৈন উছিয়াল পরগনাই উচ্ছল।

৯) ঢেক্করী রাজ প্রতাপসিংহ—অক্ষয়কুমার মৈত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ঢেক্করী অজয় নদীর তীরে আউসগ্রাম থানার ঢেকুরগড়। গৌরাঙ্গপুরে ঢেকুররাজ ইছাই ঘোষ-এর মন্দির আছে। ঢেকুরগড় একসময় গোপভূমের ঈশ্বর বা ইছাই ঘোষের রাজধানী ছিল।

১০) নরসিংহার্জুন—কয়ঙ্গল মণ্ডলের অধিপতি। রাজমহলের ২০ মাইল দক্ষিণে কাঙ্কজোল।

১১) চণ্ডার্জুন-সঙ্কটগ্রাম—পঞ্চানন মণ্ডলের মতে রায়না থানার সঙ্কটগ্রাম থেকে শক্তিগড় পর্যন্ত অঞ্চল সঙ্কট রাজ্য। কারও কারও মতে সাতগাঁও সরকারের সংকোট পরগনা—রামচরিতের সঙ্কটগ্রাম।

১২) বিজয়রাজ—নিদ্রাবলীরাজ। বিজয়রাজই ডঃ মজুমদারের মতে সম্ভবত সেন বংশের বিজয়সেন।

১৩) দ্বোরপবর্ধন—কৌশাম্বীরাজ। পঞ্চানন মণ্ডলের মতে কালনা থানার কুসুমগ্রামই কৌশাম্বী। আবার কারও কারও মতে কৌশাম্বী বগুড়া বা রাজশাহী জিলায় অবস্থিত ছিল।

১৪) সোম—পদুবন্ব—অনেকের মতে হুগলীর পৌনম।

উপরের তালিকা সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রধানত মগধ ও রাঢ়দেশের সমস্ত রাজগণই রামপালকে সাহায্য করেছিলেন। তবে একথা ঠিক যে রামপালের প্রধান রাষ্ট্র সহায়ক ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশীয় মহন বা মথন। তিনি ও তাঁর দুই পুত্র মহামণ্ডলিক কাহ্নদেব ও সুবর্ণদেব এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতিহার শিবরাজকে সঙ্গে নিয়ে রামপালের সঙ্গে যোগ দেন।

রামচরিতের এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে একাদশ শতকে পালবংশের গৌরব যখন ম্লান হয়ে এসেছে তখন রাঢ় অঞ্চলে বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে শিখরভূমে রুদ্রশিখর, গোপভূমে প্রতাপসিংহ, দক্ষিণাংশে জয়সিংহ ও উত্তরাংশে নরসিংহার্জ্জুন-এর অধিকারভুক্ত ছিল। নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ সম্বন্ধে বিতর্ক আছে—বিজয়রাজ যদি সেনবংশের বিজয়সেনই হন, তাহলে দেওপাড়া লিপির তথ্যানুসারে তিনি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাঢ় অঞ্চলের হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন, কাজেই নিদ্রাবলী রাঢ় অঞ্চলের কোন স্থান হওয়াই স্বাভাবিক। রামগঞ্জ তাম্রশাসনে বলা হয়েছে—

তস্যা ঈশ্বর ঘোষ এষ তনয় হে—
ধামা জয়ত্যেকো দুর্ধর সাহসঃ কিম্
পরং কান্ত্যা জিত্যেন্দুদ্যুতিঃ
যস্য প্রেজিত শৌর্য্য নির্জিতরি পোঃ

"চন্দ্রের দ্যুতিকেও ঈশ্বর ঘোষের কান্তি হার মানায়—তাঁর শৌর্য-বীর্যের তুলনা হয় না।" দিনাজপুর জিলার, রানীর শাঁকাইল থানার অন্তর্গত রামগঞ্জের এই তাম্রশাসন খানি মহামণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ কর্তৃক তাঁর রাজত্বের ৩৫ বৎসরে ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রপত্র। এতে যে বংশাবলী দেওয়া আছে তাতে দেখা যায়—ধূর্তঘোষ ও তাঁর পুত্র মহান যোদ্ধা ছিলেন (জগতি গীত মহাপ্রতাপঃ), ধূর্তঘোষের পুত্র বালঘোষ ও বালঘোষের পুত্র সম্ভাবা ধবলঘোষ। ধবলঘোষের পুত্র ঈশ্বরঘোষ। তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন—কিন্তু মহামণ্ডলিক নামেই পরিচিত ছিলেন, রাজা উপাধি ধারণ করেন নাই। কাজেই এই সম্বৎ তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত বলে মনে হয় না। তাঁর রাজ্য ছিল ঢেক্করী, এই ঢেক্করী আউসগ্রাম থানার জঙ্গলমহলে অজয় নদীর তীরে গোপভূমের ঢেকুরগড় হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাম্রশাসনে উল্লিখিত জটোদা নদী অজয় বলেই মনে হয়।

রামচরিতমে যে ঢেক্করী রাজ প্রতাপসিংহের কথা আছে তাঁর সঙ্গে ঈশ্বর ঘোষের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক উঠতেই পারে। বিনয় ঘোষের মতে বাংলার সামন্ত রাজাদের সিংহ উপাধি ও রাজপুত ক্ষত্রিয়দের সিংহের কতখানি গুরুত্ব সেটা ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। প্রতাপসিংহ যে ঘোষ বংশ নন সেকথাও সঠিকভাবে বলা যায় না। ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষের বাংলা পরিচয় সম্বন্ধে ধর্মমঙ্গলে আছে—

সোমের পরম বন্ধু বাঁধে বীরপনা।
তাহার উপরে তুমি হয়ে যাও সানা।

নাগড়া নিশান দিল লিখি পরওয়ানা।
বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দনা।
কোলে পুত্র কেবল ইছাই কুলচাঁদ—

এখানে দেখা যাচ্ছে ইছাই বা ঈশ্বর ঘোষের পিতা সোমঘোষ অথচ রামগঞ্জ তাম্রশাসনে দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর ঘোষ ধবলঘোষের পুত্র। তাহলে ধবলঘোষ ও সোমঘোষ কি একই ব্যক্তি? মনে হয় ধর্মমঙ্গল কাব্য অপেক্ষা তাম্রশাসনের দাবীই সমধিক। কারণ মঙ্গলকাব্য রচয়িতাগণ কাব্যরচনা কালে কুলপঞ্জী মিলিয়ে কাব্য লেখেন বলে মনে হয় না। ঈশ্বর ঘোষ মহীপালের সমসাময়িক সামন্তরাজ।

মহীপালের রাজত্বকালে চোল ও কলচুরী আক্রমণে পালরাজ শক্তির বিপর্যয় ঘটে। সেই সুযোগে ঈশ্বর ঘোষ গোপভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে ঢেকুরগড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। এই গোপদের শৌর্যবীর্যের কাহিনী অতুলনীয়। এদের লোকসেনার বীরত্বের কাহিনী ধর্মমঙ্গল কাব্যে সুবিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গৌরাঙ্গপুরের দেউল ইছাই ঘোষের দেউল নামে সুপরিচিত। ডঃ মজুমদারের মতে এর নির্মাণকাল পঞ্চদশ শতক বা তার পরে। কাজেই মনে হয় গোপবংশীয় পরবর্তী কোন রাজা এই দেউল নির্মাণ করে পূর্বপুরুষ ইছাই ঘোষের নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

গোপভূমের সদগোপ রাজবংশ : অজয় ও দামোদরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে শৈলান্তরীপ সদৃশ শিলাভূমির প্রান্তদেশে শেরগড় ও গোপভূমের মধ্যে সেলিমপুর ও সেনপাহাড়ী পরগনা নিয়ে গোপভূম গঠিত। গোপভূমে সদ্‌গোপ বংশীয় রাজাদের দীর্ঘদিন শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। রামগঞ্জ তাম্রশাসন অনুসারে এই বংশের প্রথম বীরের নাম পাওয়া যায় ধূর্তঘোষ। তাঁর পুত্র বালঘোষ। বালঘোষের পুত্র ধবলঘোষ এবং ধবলঘোষের পুত্র ঈশ্বরঘোষ বা ইচ্ছাইঘোষ-এর কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সদ্‌গোপ বংশের যে রাজার নাম এখনও স্থানীয় লোকমুখে কীর্তিত হয় তিনি হলেন মহেন্দ্রঘোষ বা মাহেন্দীরাজা। তাঁর সময়ে সদ্‌গোপ শক্তি কাটোয়ার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই সদগোপ বংশ দীর্ঘদিন এমন কি মোঘল আমলেও বর্ধমান রাজবংশের অধীনে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। মাহেন্দীরাজা মানকরের কাছে অমরারগড়ে দুর্গ নির্মাণ করে শাসন করতেন। তাঁর উপাস্য দেবী শিবাক্ষ্যা। এখনও অমরারগড়ের সেই দুর্গ রাজপ্রাসাদের নিদর্শন দেখা যায়। শিবাক্ষ্যা দেবী আজও পূজিত হন। গোপবংশের দুটি শাখা দামোদরতীরে ভরতপুরে ও কঙ্কেশ্বর বা কাঁকসায় সরে গিয়ে তাঁদের অধিকার স্থাপন করেন। মুসলমান আক্রমণে এঁদের অস্তিত্ব লোপ পায়। রামচরিতমের সামন্ত রাজবংশের তালিকায় গড় মান্দারণের লক্ষ্মীশূরের উল্লেখ আছে। এই শূরদের মধ্যে আদিশূর এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য বাংলায় কোন বেদজ্ঞানী ব্রাহ্মণ না মেলায় তিনি কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আনিয়ে তাঁর রাজ্যে বসবাস করান। কুলপঞ্জিকায় আছে—

আসীৎ পুরা মহারাজ আদিশূর প্রতাপবান্।
আনীতবান্ দ্বিজান্ পঞ্চ পঞ্চ—গোত্র সমুদ্ভবান্ ॥

আদিশূর এই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। ক্রমে ক্রমে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়, তার ফলে তারা কতক রাঢ়দেশে

কতক বারেন্দ্রভূমে বাস করতে লাগলেন। এই বাসস্থানের নাম অনুসারে তারা রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণীতে পরিচিত হতে থাকে। আইন-ই-আকবরী-তে আছে আদিশূরের একাদশ বংশধর ৭১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে আদিশূরের পুত্র ভূশূর-এর রাজধানী ছিল শূরনগর—মন্তেশ্বর থানার শূরোগ্রাম। ভূশূরের পর এই বংশের ক্ষিতিশূর, অবনীশূর, আদিত্যশূর, ধরাশূর, অনুশূর, যামিনীশূর, রণশূর, বরেন্দ্রশূর, প্রদ্যুম্নশূর ও প্রদ্যুম্নশূরের পুত্র রামচরিতমের লক্ষ্মীশূর। এদের মধ্যে আদিত্যশূর উত্তর রাঢ়ে সিংহেশ্বর-এ এবং ধরাশূর ও অনুশূর গড়মান্দারণে রাজ্য স্থাপন করেন। একমাত্র ভূশূরের বংশই বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় মহীপালের পর রামপাল ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। রামপাল রাজা হওয়ার পরই দিব্যের পুত্র ভীমের কাছ থেকে বরেন্দ্র উদ্ধার করতে উদ্যোগী হন। এসময়ে বিভিন্ন সামন্ত রাজা তাঁকে সাহায্য করেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে লক্ষ্মীশূর একাদশ শতকের শেষের দিকে গড়মান্দারণের শাসক ছিলেন। তিনি শূর বংশের শেষ বংশধর। আইন-ই-আকবরীর মতে আদিশূর প্রতিষ্ঠিত শূর বংশের একাদশ বংশধর পর্যন্ত রাজত্বকাল ৭১৪ বৎসর। তাহলে আদিশূরের রাজত্বকাল হতে হয়—চতুর্থ শতকের শেষ দিকে। তাছাড়া ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসনে আছে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হতে রাঢ়ে ব্রাহ্মণ বসতি শুরু হয়েছিল। ডঃ মজুমদারের মতে আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূরের সময় রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের মোট সংখ্যা ছিল ঊনষাট। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে দেখা যায় ক্ষিতিশূরের আবির্ভাবকাল যদি ৫ম শতকের প্রথম দিকেও হয় তাহলে তাঁর পৌত্র যে ৯ম শতাব্দীতে দেবপালের দ্বারা আক্রান্ত হন এটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কাজেই মনে হয় একমাত্র রণশূর ব্যতীত আদিশূরের কাহিনীর কোন ঐতিহাসিকতা নাই। কারণ রাজেন্দ্র চোলদেবের তিরুমালাই লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের রাজা রণশূরের নাম পাওয়া যায়।

১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামপালের মৃত্যুর সঙ্গেই পাল সাম্রাজ্যের গৌরব সূর্য অস্তমিত হয়। এই সুযোগে রাঢ় অঞ্চলে সেন-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সেন রাজাদের আদিবাসস্থান কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এঁরা দাক্ষিণাত্যের ক্ষত্রিয় বংশজাত ও চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ও তৃতীয় সোমেশ্বরের আমলে চালুক্য বাহিনীর সঙ্গে বাংলায় আসেন ও বাংলায় থেকে যান।

আবার অনেকের মতে রাজেন্দ্র চোলদেব যে বাহিনী নিয়ে বাংলায় অভিযান করেন তাদের সঙ্গে এঁরা বাংলায় আসেন ও রাঢ় অঞ্চলে থেকে যান। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়। ডঃ ভাণ্ডারকরের মতে যাঁরা আগে ছিলেন ব্রাহ্মণ কিন্তু পরে ক্ষত্রিয়

বৃত্তিগ্রহণ করে ক্ষত্রিয়ে পরিণত হন, দক্ষিণ ভারতে তাঁরাই 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলে পরিচিত হন। নৈহাটী লিপি অনুসারে এঁরা ছিলেন চন্দ্রবংশীয়। কাজেই এদের পরিচয় সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। তবে এঁরা যে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন, পরে বাংলায় এসে বসবাস করেন সে সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত। পৌরাণিক মতে এঁদের আদিপুরুষ ছিলেন বীরসেন। কিন্তু রাঢ় অঞ্চলে বিখ্যাত সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সামন্তসেনের নামই উল্লিখিত হয়। তাঁর পুত্র হেমন্তসেন, দেওপাড়া লিপিতে কিন্তু তাঁর কোন রাজা উপাধি নাই। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে মহারানী বলা হয়েছে। এর থেকে অনুমান হয় হেমন্তসেন কোন সামন্তরাজের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন ও তাঁর শ্বশুর বা দাদাশ্বশুরের সামন্তরাজ পদে অধিষ্ঠিত হন। হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ঐ বিজয়সেনই সম্ভবত রামচরিতমের সামন্তরাজা নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ। নিদ্রাবলীর অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে নিদ্রাবলী রাজশাহীর নিদ্রাবলী গ্রাম। বীরভূম জেলার পাইকোর গ্রামে একটি প্রস্তরস্তম্ভের শীর্ষদেশে মনসাদেবীর মূর্তি ও গাত্রে কয়েকটি লিপি খোদিত আছে। এই পঙ্ক্তি লিপির অনেক অক্ষর বিলুপ্ত—যেটুকু পড়া যায় তাতে দেখা যায়.....রাজেন শ্রী বিজয়সেনেন। অর্থাৎ রাজা বিজয়সেন মূর্তিটির প্রতিষ্ঠাতা। এর থেকে ডঃ মজুমদার অনুমান করেন যে নিদ্রাবলীর রাজা বিজয়রাজ ও বীরভূম অঞ্চলের সামন্তরাজ বিজয়সেন অভিন্ন। তাছাড়া হেমন্তসেন রাঢ় অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন—কাজেই নিদ্রাবলীর অবস্থান রাঢ় অঞ্চলেই হওয়াই সম্ভব। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি উমাপতি ধরের দেওপাড়া লিপি ও বিক্রমতাম্রপট্ট থেকে জানা যায় যে বিজয়সেন শূর বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করে নিজ শক্তি বাড়ান। উড়িষ্যারাজ অনন্তরাজ চোড়গঙ্গ দক্ষিণবঙ্গে অভিযান চালালে সম্ভবত বিজয়সেন তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন ও দক্ষিণবঙ্গের বর্মণ বংশকে বিধ্বস্ত করেন।

সেনবংশ : রামপালের মৃত্যুর পর পালবংশের দুর্বলতার সুযোগে বিজয়সেন নিজের রাজ্য সীমা বাড়িয়ে নেন। দেওপাড়া লিপি থেকে জানা যায় তিনি গৌড়ের রাজা মদনপালকে পরাজিত করে গৌড় অধিকার করেন। তাঁর রাজ্যসীমা পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে কলিঙ্গ ও পশ্চিমে কোশীগণ্ডক পর্যন্ত ছিল। প্রায় ৬০ বৎসর কাল (১০৯৫-১১৫৮) তিনি বাংলার শান্তিশৃঙ্খলা ও স্থিতি রক্ষা করেন। ব্যারাকপুর তাম্রপট্টে তাঁর রাজত্বকালের যে তারিখ দেওয়া আছে সেটি ৩২ কি ৬২ নিয়ে বিতর্ক আছে। যতদূর সম্ভব মনে হয় তারিখটি ৬২ সেক্ষেত্রে তাঁর রাজত্ব ১০৯৫-১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দ সমর্থিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বল্লালসেন

(১১৫৮–১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) সেন-সিংহাসনে বসেন। নৈহাটি তাম্রপট্ট ও আনন্দভট্ট রচিত বল্লালচরিতে তাঁর রাজত্ব সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। তিনি মগধ ও মিথিলা জয় করেন। তাঁর আমলে রাঢ়, বারেন্দ্রী, মগধ ও মিথিলা তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। সম্ভবত বাগড়ী বা সুন্দরবন-মেদিনীপুর অঞ্চলও তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল।

প্রবাদ—বল্লালসেন হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা, প্রবর্তন করে বাংলার হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথাকে তীব্রতর করে তোলেন। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন সম্পাদিত 'বল্লালচরিতে'র বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে বাংলার সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা না করায় তিনি তাঁদেরকে নিম্নজাতিতে পরিণত করেন। যখন দেশের পশ্চিম দিগন্ত থেকে বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, তখন নিজের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার জন্য সমস্ত বাঙালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ না করার ফল তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেনকে ভোগ করতে হয়েছিল। বখ্‌তিয়ার খিলজী যখন বাংলা আক্রমণ করেন তখন লক্ষ্মনসেন তাঁর বিরুদ্ধে জনসাধারণের সমর্থন পান নাই। বল্লালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন (১১৭৯–১২০৭ খ্রীষ্টাব্দ) সেন-সিংহাসনে বসেন।

মিনহাজ্-উদ্দিন-এর তবাকৎ-ঈ-নাসিরী গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কাহিনীর কথা আছে। 'খিলজী-বংশীয় তুরস্ক সেনানায়ক বখতিয়ার দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিহার প্রদেশ জয় করেন। এই সময় রায় লখমনিয়া রাজধানী নদীয়াতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর সময় তিনি মাতৃগর্ভে। তাঁহার জন্মকালে দৈবজ্ঞগণ গণনা করিয়া বলিল যে যদি এই শিশুর এখনই জন্ম হয়, তবে সে কখনই রাজা হইবে না, কিন্তু আর দুই ঘন্টা পরে জন্মিলে সে ৮০ বৎসর রাজত্ব করিবে। এই কথা শুনিয়া স্বীয় আদেশে রাজমাতার দুই-পা বাঁধিয়া মাথা নীচের দিকে করিয়া তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখা হইল। শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নামান হয়, কিন্তু পুত্র প্রসবের পরই তাঁর মৃত্যু হইল। রায় লখমনিয়া ৮০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং হিন্দুস্থানের একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন।'

লোকমুখে শোনা মিনহাজের এই কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাঁর রাজত্বকালের ৮ খানি তাম্রশাসন ও তাঁর সভাকবিদের রচিত স্তুতিবাচক শ্লোক থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায়—পিতামহ বিজয়সেন অথবা পিতা বল্লালসেনের আমলে লক্ষ্মণসেন কৌমারে গৌড়ে অভিযান করে 'গৌড়েশ্বরের শ্রীহরণ' করেছিলেন। এই হিসাবে তবাকৎ-ই-নাসিরীর কাহিনী যে 'তাঁর পিতার মৃত্যুর সময় তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন'—নিছকই গালগল্প হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া তাঁর পিতার মৃত্যুর সময় তিনি যদি মাতৃগর্ভে, তাহলে

বল্লালের সিংহাসন কি শূন্য ছিল? এ সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারও মন্তব্য করেছেন— 'মীন্‌হাজুদ্দিনের নদীয়া অভিযান কাহিনী সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যে বিশ্বাসী লোকেরা তাঁহাকে সংবাদ যোগাইয়া ছিল তাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি কতদূর ছিল, তাহা লক্ষ্মণসেনের অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁর ৮০ বৎসর রাজত্বের কথা হইতেই বোঝা যায়।'

লক্ষ্মণসেন সমগ্র বাংলার আধিপত্যকে সম্পূর্ণ করে 'গৌড়েশ্বর' উপাধি নেন। তাছাড়া 'অরি-রাজ-মর্দন-শঙ্কর' ও 'পরমবৈষ্ণব' উপাধিও গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব কবি জয়দেব তাঁর রাজসভায় ছিলেন। তাঁর কয়েকটি শিলালিপি থেকে জানা যায় তিনি গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ ও কাশী জয় করেন। গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্রকে তিনি বিতাড়িত করেন। কিন্তু চৌহানদের পতনের পর গাহড়বালরাই ছিল তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে বাংলার প্রধান রক্ষা প্রাচীর। লক্ষ্মণসেন গাহড়বালদের আক্রমণ করে দুর্বল করে ফেলায় তুর্কীরাই সহজেই গাহড়বালদের পরাজিত করে মগধ ও বাংলায় ঢুকে পড়ে। কাজেই লক্ষ্মণসেনের গাহড়বাল আক্রমণ ছিল একটা Historical Blunder, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের সর্বপ্রধান ঘটনা তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজীর বাংলা অভিযান। বখতিয়ারউদ্দীন সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবকের অধীনস্থ চুনার অঞ্চলে জায়গীরদারী করতেন। তিনি ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিহার অভিযান করেন ও প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস করে সেখানকার বৌদ্ধভিক্ষুকদের হত্যা করেন। 'বিহার' থেকেই প্রদেশের নাম হয় বিহার। এরপর বখ্‌তিয়ার বাংলা অভিযানের উদ্যোগ নেন। আচার্য যদুনাথ সরকারের History of Bengal Vol-II-তে বখতিয়ারের আক্রমণের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

During the dry season of the year 1201 A.D. a troop of foreign cavalry was riding with loose reins towards the city of Nudia. When the sun was at the meridian these men, only nineteen in number, slackened the momentum of their ride before the city gate and assumed the placid demeanour of merchants. The strangers slowly proceeded unchallenged through the city to the palace of the king Lakshmanasena where all of a sudden they drew their swords and as the Muslim historian puts it, began the holy war. All was now tumult and panic within the palace as well as in the city outside. when the old monarch just seated at his meal, learnt that the assailants had already dashed into his palace

and the inner apartments, he hurriedly took to flight and got into a boat which sailed down the river for some refuge in East Bengal. The victory of Bakhtyar was completed "when the whole army arrived and the entire city was brought under control'.

N.B. The reign to which Rai Lakhmaniya fled from Nadia is named in the T. N. (Tabaqat-i-Nasiri) as Bang wa-s-k-n-at. Bang means East Bengal and the second place name is a copyist's error for sil-hat i.e. Sylhat.

বখতিয়ার কবে নদীয়া আক্রমণ করেন যে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। যদুনাথ সরকারের মতে ১২০১ খ্রীষ্টাব্দ, চার্লস স্টুয়ার্টের মতে ১২০৩-৪। এছাড়া কেউ বলেছেন ১১৯২-৯৩, আবার কারও মতে ১১৯৮-৯৯। ডাঃ মজুমদারের মতে সম্ভবত ১২০৪ অব্দে বখতিয়ার খিলজী নদীয়া আক্রমণ করেন।

বখতিয়ারের নদীয়া আক্রমণ সম্পর্কে মীনহাজউদ্দিনের বিবরণ যেমনি অবাস্তব তেমনি অসঙ্গতিপূর্ণ। বখতিয়ার বিহার থেকে নদীয়া এলেন অথচ তার কোন সংবাদ রাজদরবারে পৌঁছাল না এ তথ্য যেমন অবিশ্বাস্য, অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ১৯জন অশ্বারোহী বিনা বাধায় একেবারে লক্ষ্মণসেনেব মধ্যাহ্নভোজনের সময় তাঁর অন্দরমহলে উপস্থিত হলো এতথ্যও তেমনি হাস্যকর।

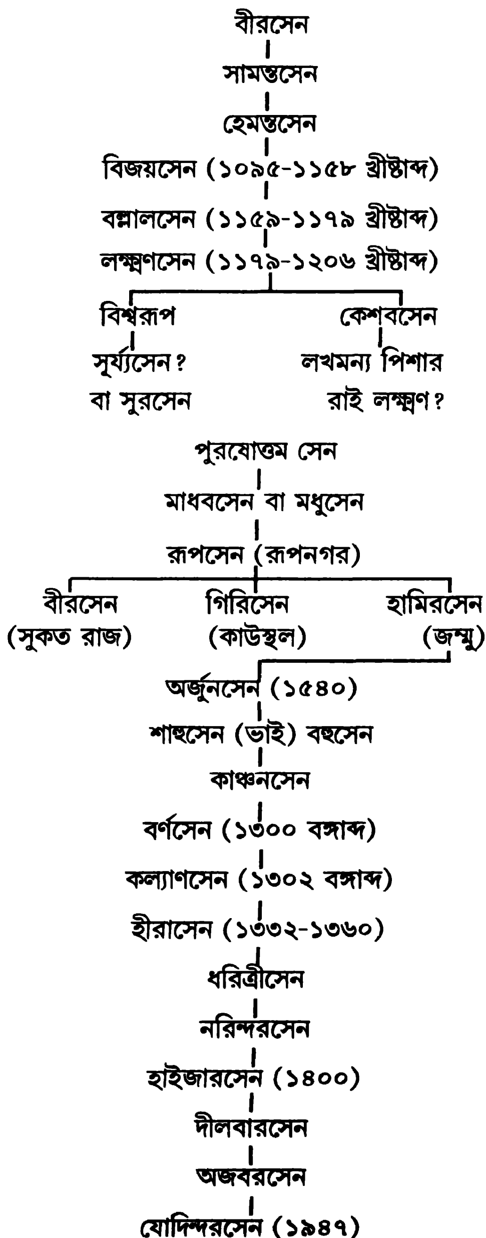
তবে বখতিয়ার যে নদীয়া আক্রমণ করেছিলেন সেটা সম্ভবত ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে এটা ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত। কিন্তু নদীয়া জয়ের কতদিন পর বখতিয়ার লক্ষ্মণাবতী জয় করেন ও সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন, মীনহাজউদ্দিন সে বিষয়ে নীরব। মুসলমান যুগের সূচনায় মালদহ জিলার লক্ষ্মণাবতী গৌড় নামে পরিচিত ছিল। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ়াপুরী গৌড়ের অন্তর্গত ছিল বলেই বর্ণিত হয়েছে; 'অনর্ঘ রাঘব' নাটকে (৮ম শতক) গৌড়ের রাজধানী চম্পা বলা হয়েছে। এই চম্পার অবস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকের মতে বর্ধমানের উত্তর-পশ্চিমে দামোদর তীরে সম্ভবত গলসী থানায় অবস্থিত ছিল। আবার কারও মতে প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। অঙ্গদেশের অবস্থান বর্তমান ভাগলপুরের কাছাকাছি ছিল। একাদশ শতকের একটা শিলালিপিতে অঙ্গদেশ গৌড়রাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে There is no evidence that Nabadwip was ever the permanent capital of the Sena Kings. বখতিয়ার নবদ্বীপে কয়েকদিন থেকে লুণ্ঠন কার্য সম্পন্ন করে, বাংলার ঐতিহাসিক রাজধানী (historic capital) গৌড় লক্ষ্মণাবতীর দিকে তাঁর সুপরিকল্পিত অভিযান চালান।

কাজেই এই সময়ে দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল বা বর্ধমান ভুক্তিতে সেনরাজাদের সামন্তরাজের প্রত্যক্ষ শাসনে শান্তিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে।

বখতিয়ারের নদীয়া আক্রমণের পরও লক্ষ্মণসেন দুই তিন বৎসর রাজত্ব করেছিলেন—এই সময়ের দু-খানি তাম্রশাসনে যে লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় তাতে এ সময়ে রাঢ় অঞ্চলের গুরুতর রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের কোন আভাসই পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র যে ম্লেচ্ছ ও যবনদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন তারও উল্লেখ তাম্রশাসন ও সমসাময়িক কবির বর্ণনায় পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন। ইদিলপুর তাম্রশাসনের দশম শ্লোক অনুসারে লক্ষ্মণসেনের পরই বিশ্বরূপই সিংহাসনে বসেন। বিশ্বরূপ ও কেশবের পৃথক পৃথক তাম্রশাসনে দেখা যায় বিশ্বরূপকে 'অরিরাজ বৃষভাঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর' ও কেশবের তাম্রশাসনে তাঁকে 'অরিরাজ অসহ্যশঙ্কর গৌড়েশ্বর' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উভয়েই যবনান্বয়-প্রলয়-কাল-রুদ্র উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কাজেই মনে হয় উভয়েই পরপর সিংহাসনে বসেন ও উভয়ে উত্তরবঙ্গের মুসলমান তুর্কী অভিযানকারীদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন। কারণ মীনহাজউদ্দিনের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় তুর্কীগণ উত্তরবঙ্গ অধিকার করলেও বহুদিন পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ দখল করতে পারে নাই। বিশ্বরূপ ও কেশব উভয়ের শাসনকাল ছিল ২৫ বৎসর। কেশবের মৃত্যু হয় ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে। মদনপাড়া তাম্রশাসনে কুমার সূর্য ও কুমার পুরুষোত্তম সেনের উল্লেখ আছে। পঞ্চরক্ষা নামক বৌদ্ধগ্রন্থ হতে জানা যায় যে গ্রন্থখানি ১২১১ শকে পরমেশ্বর পরমসৌগত পরমমহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর মধুসেনের রাজ্যে লিখিত হয়েছিল। কিন্তু এই মধুসেনের সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা জানা যায় না। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের একটি মসজিদের ভগ্নপ্রস্তর খণ্ডে একটি সংস্কৃত লিপির কিছু অংশে এক চন্দ্রসেনের নাম দেখা যায়। কিন্তু এরও কোন পরিচয় জানা যায় না। ৩০।৭।৯৪ তারিখের পাক্ষিক দেশ পত্রিকার একটি প্রবন্ধে প্রবন্ধ-রচয়িতা মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সেনবংশের যে তালিকা দিয়েছেন তার থেকে জানা যায় যে তুর্কী বিজয়ের পরও বাংলা তথা ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যে সেন উত্তরাধিকারী রাজাগণ শাসন করেন। তিব্বতীয় লামা তারানাথ সেনবংশীয় লবসেন, কাশসেন, মনিতসেন ও রাথিকসেন, লবণসেন, বুদ্ধসেন, হরিতসেন ও প্রতীতসেনের উল্লেখ করেছেন। তারানাথ কথিত বুদ্ধসেনই সম্ভবত পীঠীপতি বুদ্ধসেন। তারানাথের এই বংশ-তালিকার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণপত্র নাই। কিন্তু দেশ পত্রিকায় প্রায় ১৪টি ঐতিহাসিক উৎস ও তথ্য বিশ্লেষণ করে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গেও তারানাথের বিবরণের কোন মিল নেই।

দেশ পত্রিকা (৩০।৭।৯৪) এর তালিকা :-



বৈদ্যপুরের এক রাজার নাম পাওয়া যায়—কিঙ্করমাধবসেন। তিনি সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকে রাজত্ব করতেন। তিনি নিজেকে সেন রাজাদের মত ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতেন। তিনি প্রথম জীবনে হুগলীর ফৌজদারের রাজস্ব আদায়কারী দিয়া-অল-দীন-খাঁর পেশকার ছিলেন। বৈদ্যপুরের অনতিদূরে বল্লালদীঘি সেনবংশের স্মৃতি বহন করছে। কিন্তু মধুসূদন মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত তালিকায় কিঙ্করমাধবসেনের নাম নাই—কিন্তু মাধবসেন বা মধুসেন আছে। ইনিই যদি কিঙ্করমাধবসেন হন তাহলে বুঝতে হবে সেনবংশ এই জেলাতেও বিস্তৃত ছিল তবে এটা অনুমান মাত্র। এর থেকে বোঝা যায় সেন উপাধিকারী কিছু রাজা জম্মু, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যে ও এ-জেলাতেও আধিপত্য করেছেন এবং এখনও নিজদিগকে গৌড়রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলে দাবী করেন।

যাই হোক, বখতিয়ার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। নদীয়া অভিযানের পর বখতিয়ার বাংলার প্রাচীন রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তিব্বত অভিযান করেন। কিন্তু এই অভিযান ব্যর্থ হয়। করপত্তনে তিনি সংবাদ পান ৫০,০০০ তুর্কী সৈন্য তাঁর জন্য ওত পেতে আছে। ফেরার পথে কামরূপের রাজার কাছে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। এরপর দিনাজপুর জিলার দেবকোটে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা হিন্দুরাজশক্তি কিছুদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এ বিষয়ে আচার্য যদুনাথ সরকারের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

The disastrous failure of Bakhtyar deeply affected the subsequent course of history of Bengal for half a century. The Hindu Powers found a respite and a longer lease of life. Severe losses in man-power arrested the expansion of the Muslim principality of Gaur...Demoralisation seized the khiljies, treachery and dissensions became rife in the land when luck deserted Bakhtyiar. Shame and remoarse made him avoid society, and perhaps a lurking suspicion of murder haunted his mind. A consuming fever attacked him and the conqueror of Bengal was hovering between life and death, Ali Mardan is said to have murdered the dying hero with a thrust of his dagger about three months after his return to Devkot in 602 A.h. (1206) বখতিয়ার যখন লক্ষ্মণাবতীতে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি প্রয়োজনীয় সৈন্যসহ মহম্মদ সিরানকে দক্ষিণ রাঢ় অধিকারের জন্য প্রেরণ করেন।

কিন্তু বখ্‌তিয়ারের আকস্মিক মৃত্যুতে সিরানের রাঢ় অভিযান ব্যর্থ হয়। দীর্ঘকাল ধরে উড়িষ্যার হিন্দুরাজাদের রাঢ়ের অধিকার নিয়ে সংঘর্ষ হয়। কিন্তু তুর্কীশক্তি উড়িষ্যার হিন্দুরাজাদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হন ও লক্ষ্মণাবতীতে ফিরে গিয়ে শাসন কর্তৃত্ব হাতে নেন। এই সময় দক্ষিণ রাঢ় ও বর্ধমান-ভুক্তির অধিকাংশ অঞ্চল হয় স্বাধীন সামন্তরাজের শাসনে থাকে কিংবা উড়িশার হিন্দুরাজাদের অধীনস্থ কোন সামন্তরাজা কর্তৃক শাসিত হতে থাকে। উড়িষ্যায় এ সময় গঙ্গাবংশীয় তৃতীয় অনন্তদেব রাজত্ব করছিলেন। তিনি তাঁর সেনাপতি বিষ্ণুর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। দক্ষিণ রাঢ়ে তখন মাৎস্যন্যায়ের অবস্থা। বিষ্ণু দক্ষিণ রাঢ় জয় করে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশের কর্তৃত্ব কায়েম করেন। এ সময়ে সিরানের পর আলিমর্দান লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে বসেন কিন্তু আলিমর্দানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমীরগণ তাঁকে হত্যা করেন ও গিয়াসউদ্দিন ইয়াজকে সিংহাসনে বসান। ইয়াজ সুশাসক ছিলেন। ইয়াজ অধিকৃত লক্ষ্মণাবতী ও উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণ রাঢ়ের সীমানা কিন্তু সঠিকভাবে নির্ধারণ সম্ভব হয় নাই। এ সম্পর্কে যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন। In the absence of inscriptions or widely scattered mint-names any definition of the boundaries of the kingdom of Lakhnawati at the close of Sultan Ghyasuddin Khilji's reign cannot but be of a hypothetical nature. Within Bengal proper the Sultanate of 'Iwaz consisted of Sarkars— Lakhnawati, Purniah, Tajpur, Panjrah, Ghoraghat, Barbakabad (a new acquisition) the Western part of Bazuha, (portions of Rajsahi and Bogra) on the north and east of the Ganges; Tanda, Sharifabad (Nagar Birbhum a new acquision), a portion of Sulaimanabad (Burdwan, a new acquision South of that river. It should however be clearly understood that the dominion of 'Iwaz over this vastract meant only that there was no first rate Muslim or Hindu power within this boundary to dispute his title".)

আচার্য সরকারের এই তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয় না যে, তৃতীয় অনন্তদেবের সেনাপতি বিষ্ণু গিয়াসুদ্দিনের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন নাই ও বর্ধমান (সেলিমাবাদ) ইয়াজের শাসনাধীনেই ছিল। তাছাড়া রজনীকান্ত চক্রবর্তীর গৌড়ের ইতিহাসের বিবরণ যে—ইয়াজ বর্ধমান থেকে শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত রাজপথ নির্মাণ করেন—এই ঘটনার সত্যতায় সন্দেহ করার কোন কারণ নাই।

গিয়াসুদ্দিন ইয়াজ ১২১১-২৫ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫ বৎসর বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সমস্ত গৌড়ের ওপর ছিল তাঁর আধিপত্য। গৌড় ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। গঙ্গার পশ্চিমে রাঢ় ও পূর্বে বারেন্দ্র। জাজনগর (উড়িষ্যা) ও বঙ্গ (পূর্ব বাংলা), কামরূপ ও ত্রিহুত তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল। তবে যদুনাথ সরকারের মতে এ সব অঞ্চলে বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলে যে সব ছোট ছোট সামন্তরাজা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতেন তাঁরা লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তার আক্রমণের সময় বেতসীবৃত্তি অবলম্বন করতেন অর্থাৎ ইয়াজের আক্রমণের সময় তাঁর অধীনতা মেনে নিতেন আবার ইয়াজ ফিরে গেলেই স্বাধীনভাবে মাথা তুলে রাজত্ব করতেন কিংবা উড়িষ্যার হিন্দু রাজা গঙ্গাবংশীয় রাজাদের অধীনতা মেনে নিতেন।

মুঘল আধিপত্যের পূর্বে কখনই তুর্কী সৈন্যদল সমগ্র বাংলাদেশ আয়ত্তে আনতে পারে নাই বা যেখানে তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানেও তা দৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

এই ভাবে প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক পাণ্ডুরাজার ঢিবির যুগ থেকে জেলার রাজনৈতিক শাসনে যুগ যুগান্তর কেটে গেছে। জেলায় আর্যদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সংকর জাতির উৎপত্তি হয়েছে, 'মহাবীর বর্ধমান' জেলায় পর্যটন করেছেন, বুদ্ধদেব বা তাঁর শিষ্যরা জেলায় বিহার করেছেন পানাগড়ের কাছে ভরতপুর—যার সাক্ষ্য বহন করছে, মহাকাব্যের কর্ণের অঙ্গ, বঙ্গ রাঢ়কে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। নন্দবংশ, মৌর্য বংশ, শুঙ্গ বংশ—তাঁদের আধিপত্যের জাল সুবিস্তার করেছে জেলায়। অনেকের অনুমান কুষাণ রাজ্যের বিজয়রথ মথুরায় এসেই থেমে থাকে নাই আরও পূর্বে গৌড় পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। গুপ্তরাজাদের আদি নিবাস তো বর্ধমান অঞ্চলেই বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের শাসন তো সমগ্র গৌড়ে বিস্তার লাভ করেছিল। মৌখরি বংশের ঈশানবর্মার একটি লিপি থেকে জানা যায় তিনি গৌড়গণকে পরাজিত করে তাদেরকে সমুদ্রতীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। সমুদ্রের উল্লেখ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে তখন বর্ধমানসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ গৌড়ের অন্তর্গত ছিল।

ফরিদপুর ও মল্লসারুল তাম্রশাসনে সুহ্মরাঢ়ে আবির্ভাব হয়েছে গোপচন্দ্র, সমাচারদেব ও ধর্মাদিত্যে-র ও তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমগ্র বাংলাদেশে, যার মধ্যে ফরিদপুর থেকে বর্ধমানসহ সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল গোপচন্দ্রের একক আধিপত্য। দামোদরের দক্ষিণ তীরে পানাগড়ের দক্ষিণে পোখরানে বর্মারাজবংশের সন্তান সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মার আধিপত্যের সন্ধান

মিলেছে। এর পরে এসেছে মহারাজ শশাঙ্কের স্বাধীন গৌড় যার রাজ্যের বিস্তার ছিল সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত। শশাঙ্কের পর দীর্ঘদিন বাংলার অন্যান্য অংশের ন্যায় রাঢ় বাংলায় চলেছে মাৎস্যন্যায়ের অরাজকতা। এরপর পালবংশ ও সেন-রাজাদের শাসন। এমনি ভাবেই,

"কতকাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদূর অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।
এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল
এসেছে মোগল,
বিজয়রথের চাকা
উড়িয়েছে ধূলিজাল, উড়ায়ে বিজয় পতাকা।"

সতের অধ্যায়



প্রাচীন যুগের শাসন-ব্যবস্থা

প্রাগৈতিহাসিক পাণ্ডুরাজার ঢিবির সুপ্রাচীন সভ্যতার যুগে জেলার শাসন ব্যবস্থা ঠিক কিরূপ ছিল তার বিশেষ সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সমসাময়িক সিন্ধুসভ্যতার শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের আনুমানিক সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে জেলার প্রাগৈতিহাসিককালের রাজনৈতিক শাসন অনুমান করা যেতে পারে। সেসময় বৈদিক যুগের Kingship বা রাজতন্ত্র গড়ে ওঠার মত সামাজিক বিবর্তনের স্তরে এখানকার সভ্যতা উন্নীত হয় নাই। এখানকার শাসনতন্ত্রে Proto-democratic গোষ্ঠীতন্ত্র-এর প্রাধান্যই সূচিত হয়। কয়েকটি পরিবার মিলে ছিল গোষ্ঠী ও কয়েকটি গোষ্ঠী মিলে গোষ্ঠীপতি নির্বাচিত করতো। গোষ্ঠীদের নিয়েই গঠিত হত বর্তমান পঞ্চায়েতের মত কোন Proto-democratic প্রতিষ্ঠান। গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বে এই পঞ্চায়েত শাসনকার্য পরিচালনা করতো। এরাই আইন তৈরী করতো, বিচার করতো, ব্যবসা-বাণিজ্যের তদারকি করতো, শুল্ককর নির্ধারণ করতো, জমিজমার বিলি বন্দোবস্ত করতো। বৈদিক সভ্যতা বাংলায় অনুপ্রবেশের ফলে এদেশে গড়ে উঠেছে Kingship বা রাজতন্ত্র। আত্রেয় ব্রাহ্মণে আছে—এতস্যাম্ প্রাচ্যাম্ দিশি যে কে চ প্রাচ্যানাম্ রাজানঃ সাম্রাজ্যায়ৈব তে ভিঃ সিঞ্চন্তে... In the eastern quarter, whatever kings there are of the eastern peoples, they are anointed for overlordhip (samrijya)...(Political Hist. of India. H. C. Roy Choudhury).

মহাকাব্যের যুগে এই রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মৌর্যযুগের শাসন এ অঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছিল। মহাস্থানগড়ের শিলালিপি থেকে জানা যায় মৌর্য শাসকদের এ অঞ্চলের শাসন পরিচালন করতেন মহামাত্র নামে রাজকর্মচারী। প্রতিবেদক ও গুপ্তচরের মাধ্যমে সপারিষদ মহারাজ প্রদেশ ও ভুক্তির শাসন

পরিচালনা সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করতেন। জেলার শাসনভার ছিল 'প্রদেষ্টির' হাতে। গ্রাম শাসন করতেন গ্রামীণ। স্থানীয় শাসনের দায়িত্ব ছিল সমাহর্তার ওপর, তিনি রাজস্ব ও শুল্ক আদায়, মদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দান (license)-এ সমস্তই পরিচালনা করতেন।

গুপ্তশাসনের সময় শাসনব্যবস্থার একটা সর্বাঙ্গীণ রূপের তথ্য পাওয়া যায়। এ সময়ের অসংখ্য লিপি, তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, সমগ্র বাংলাদেশকে কতকগুলি ভুক্তিতে বিভক্ত করা হত। ভুক্তিকে বিষয়, বিষয়কে মণ্ডল ও মণ্ডলকে গ্রামে বিভক্ত করে সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হত। ভুক্তির শাসনভার ছিল উপরিকের ওপর। উপরিক তাঁর অধিকরণ থেকে শাসন পরিচালনা করতেন। তাঁর অধিকরণে বিভিন্ন বিভাগ ছিল; এক এক বিভাগে এক এক শ্রেণীর কর্মচারী, যেমন ভোগপতিক, পত্তলক, চৌরদ্ধরণিক, আবাসাথিক, হিরণ্য-সমুদায়িক, ঔরণস্থানিক, কর্তাকিতিক, দেবদ্রোনিসম্বন্ধ, কুমারামাত্য, অগ্রহারিক, তদযুক্তক, বহনায়ক, বিষয়পতি প্রমুখ কর্মচারী উপরিকের অধীনে আপন আপন বিভাগের পরিচালনা করতেন। মল্লসারুল তাম্রশাসনেও বিভিন্ন পদে নিযুক্ত কর্মচারীদেব উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের নামের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, বর্তমান শাসন-ব্যবস্থায় সে তালিকার সঙ্গে গুপ্তশাসনের অধিকর্তার অনেকাংশে মিল আছে।

বিষয়পতিকে নিযুক্ত করতেন উপরিক বা কখনও কখনও এঁবা স্বযং সম্রাটেব দ্বারা নিযুক্ত হতেন। বিষয়ের শাসন-কর্তৃত্ব পরিচালিত হত বিষয়াধিকরণ থেকে। এর প্রধান কর্মচারী ছিলেন বিষয়পতি। অন্যান্য অফিসার ছিলেন নগর শ্রেষ্ঠী, প্রথমকুলিক, প্রথম কায়স্থ। মনে হয় প্রথম কায়স্থ ছিলেন বর্তমানের Chief Secretary or Office Superintendent পদমর্যাদা সম্পন্ন অফিসার। নগর শ্রেষ্ঠী, প্রথম কুলিক ও প্রথম সার্থবাহ ছিলেন বণিক সংঘের (Guild) প্রতিনিধি। আর ছিলেন পুষ্টপাল, বর্তমানে Land Registration Officer.

বীথির (মহকুমা) শাসনকার্য পরিচালনার জন্য পৃথক অধিকরণ ছিল। বীথির অধিকরণের অফিসার ছিলেন মহত্তর, খদ্গী, বহনায়ক। গ্রামে শাসনের জন্য ছিল অষ্টকুলাধিকরণ, বর্তমান অঞ্চল পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুরূপ। অষ্টকুলাধিকরণের শাসন পরিচালনা করতেন আটজন অফিসার—এঁরা ব্রাহ্মণ, মহত্তর কুটুম্ব প্রভৃতি আটটি সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্বাচিত হত। গ্রামের প্রধান কর্মচারী ছিল গ্রামিক বা গ্রামপ্রধান। গুপ্তশাসন দুর্বল হয়ে পড়লে জেলার বিভিন্ন

অঞ্চলে সামন্তরাজ গড়ে ওঠে। এঁদের কেউ কেউ মহারাজাধিরাজ বা ভট্টারক উপাধি গ্রহণ করতেন।

পাল আমলাতন্ত্র আরও জটিল আকার ধারণ করে। এসময়ে রাজ্যের প্রধান কর্মচারী ছিলেন মন্ত্রী বা সচিব। রাজা সব বিষয়ে তাঁর পরামর্শের ওপর নির্ভর করতেন। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র উপযুক্ত হলে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হতেন। রাজার অন্যান্য সন্তান 'কুমার' নামে অভিহিত হতেন। সমসাময়িক লিপি ও তাম্রশাসন থেকে জানা যায় কুমারদিগকে সাধারণ শাসন বিভাগে বা সামরিক বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হত। সচিব বা মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মহাসন্ধিবিগ্রহিক, রাজামাত্য, মহাকুমারামাত্য, দূতক, মহাসেনাপতি, মহাপ্রতিহার, মহাদণ্ডনায়ক, মহাদৌসন্ধানিক, মহাকর্তা-কৃতিক, মহাক্ষপালিক, অমাত্য প্রভৃতি মন্ত্রী পর্যায়ের কর্মচারী এক এক বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত হতেন। অফিসার পর্যায়ের প্রধান ছিলেন অধ্যক্ষ, তিনি ছিলেন নৌকাধ্যক্ষ বা নবাধ্যক্ষ; বালাধ্যক্ষ প্রভৃতি বিভাগের ডাইরেক্টর বা অধিকর্তা। যে অঞ্চলে সামন্ততন্ত্র গড়ে উঠেছিল সেখানে সামন্তগণের উপাধি ছিল সামন্ত, মহাসামন্ত, রাজন, রাজন্যক, রণক; এদের মধ্যে অনেকে অনন্ত-সামন্তচক্র, আটবিক-সামন্তচক্র চূড়ামণি প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হতেন। এই সামন্ততন্ত্র গড়ে ওঠার ফলে প্রজাগণ দিন দিন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলছিল। আর এর ফলেই পালবংশের পতন ত্বরান্বিত হয়।

সেন-রাজাদের শাসনেও পাল-শাসনতন্ত্র বজায় ছিল। কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে রাজার প্রায় একশত মন্ত্রী থাকতেন, এদের প্রধান ছিলেন মহামাত্তক। অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম ছিল—বৃহদুপরিক, মহাভৌগিক, মহাভোগপতি, মহাধর্মাক্ষ্য, মহাসেনাপতি, মহাগনস্থ, মহামুদ্রাধিকৃত, মহাসর্বাধিকৃত, মহাবলাধকরণিক ইত্যাদি। এঁর সকলেই পৃথক পৃথক দায়িত্বে থাকতেন। মহামহত্তক ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মহাসন্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মহাক্ষপাতলিক ছিলেন Accountant General, আইনকানুনের দায়িত্বে ছিলেন মহাপ্রতিহার। তবে সেন আমলে গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থায় শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। পাল আমলের মত কোন গ্রামিকের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেই পরিষদীয় শাসনতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের ধারা আজও বজায় আছে, নতুন নামে, নতুন আঙ্গিকে।

দ্বিতীয় পর্ব

সুলতানী আমলে বর্ধমান

মোগল যুগে বর্ধমান

মধ্যযুগে বর্ধমান

অর্থনৈতিক অবস্থা

ধর্ম ও সমাজ

মধ্যযুগের সাহিত্য

মধ্যযুগের বর্ধমানে স্থাপত্য শিল্প ও ভাস্কর্য্য

আঠার অধ্যায়



সুলতানী আমলে বর্ধমান

সুলতানী শাসন : সেনবংশীয় লক্ষ্মণসেন যখন বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখনই দিল্লীর তুর্কী-সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবকের সেনাপতি বাংলা আক্রমণ করেন ও ইসলামের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেন। সেটা ছিল ১২০৪ সালের কথা। কিন্তু মুঘল শাসনের পূর্ব পর্যন্ত কখনই তুর্কী শাসন সমগ্র বাংলায় সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষভাবে লক্ষ্মণাবতী, উত্তর ও পূর্ব বাংলায় তুর্কী শাসন অব্যাহত রাখলেও দক্ষিণ রাঢ় ও বর্ধমান অঞ্চলে উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজাদের শাসন অব্যাহত ছিল। তাঁদের নিযুক্ত সামন্তরাজারাই প্রত্যক্ষ ভাবে এ অঞ্চলের শাসনের দায়িত্বে ছিল। দিল্লীর শাসনকর্তা নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহের আমলে বাংলার শাসনকর্তা মুগিস্‌উদ্দিন য়ুজবকের পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। য়ুজবকের মৃত্যু হয়েছে ১২৫৭ সালে। তার আগে দিল্লীর সিংহাসনে একে একে এসেছেন ইলতুৎমিস (১২১১–'৩৬), রুকনুদ্দিন রাজিয়া (১২৩৬–১২৪০), মুজিউদ্দিন বাহমান শাহ (১২৪০–'৪২), আলাউদ্দিন মামুদশাহ (১২৪২–৪৬) ও তাঁর পর এসেছেন নাসিরুদ্দিন মামুদশাহ (১২৪৬–'৬৫)। এই ৩৫ বছরের মধ্যে লখনৌতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন একে একে গিয়াসুদ্দিন ইয়াজ (১২১৩–'২৭), ইলতুৎমিসের পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (১২২৭–'২৮), ইখতিয়ার-উদ্দিন, মালিক বলকা, আলাউদ্দিন জানী, সৈফুদ্দিন আইবক, য়ুগানতৎ, ইজুদ্দিন তুগরল তুগান খান। য়ুজবক তুগরলের শাসনকালেই তিনবার জাজনগর (উড়িষ্যা)-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়। প্রথম দুবার জাজনগরের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়, কিন্তু তৃতীয়বার তাঁরাই য়ুজবক তুগরলের বাহিনীকে পরাজিত করে ও য়ুজবকের একটি বহুমূল্য শ্বেতহস্তীকে নিয়ে যায়। পরবৎসর য়ুজবক উর্মুদন রাজ্য আক্রমণ করেন। এই রাজ্যের অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মুগিস্‌উদ্দিন

যুজবকের সমস্ত মুদ্রায় লেখা আছে 'নদীয়া ও অর্জবদন' এর ভূমিরাজস্ব হইতে প্রস্তুত। কিন্তু এই অর্জবদনকে কেউ বর্ধনকোট, কেউ বর্ধমান, কেউ বা উর্মদনের বিকৃত রূপ বলে বর্ণনা করেছেন। রাঢ় অঞ্চলের উপর মুগিসউদ্দিনের আধিপত্য বিস্তারের ফলে উড়িষ্যার গঙ্গরাজ নরসিংহদেবের সঙ্গে আবার বিরোধ উপস্থিত হয়। নরসিংহের জামাতা সাবেনতরের নেতৃত্বে নরসিংহদেবের সৈন্যবাহিনী মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের উপর আধিপত্য বিস্তার করে উর্মদন (?)-এ ঘাঁটি স্থাপন করেন। আগেই বলা হয়েছে উর্মদন বর্ধনকোট বা বর্ধমান বা কারও কারও মতে গড়মান্দারণও হতে পারে। কিন্তু শেষবারের যুদ্ধে উড়িষ্যার সৈন্য প্রতিরোধে ব্যর্থ হয় ও দক্ষিণরাঢ় লক্ষ্মণাবতীর অধীনস্থ হয়। ১২৫৭-'৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার জালানউদ্দিন মসুদ জানী, ইজ্জুদ্দিন বলবন য়ুজবকী, তাজুদ্দীন আর্সলান খান ও তাঁর পুত্র তাতার খান লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এদের শাসনকালের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার সূত্র পাওয়া যায় নাই।

এদের পর শেরখান (১২৬৯), আমির খান (১২৬৯–৭৮) বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। আমির খানের পর মুগিসুদ্দিন বা তুঘ্রিল দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের ডেপুটি হিসেবে লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে বসেন ও অল্প দিনের মধ্যে বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও জাজনগরে আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হন ও উড়িষ্যা থেকে প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে এসে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তুঘ্রিলের স্বাধীনতা ঘোষণায় বলবন খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন ও প্রথমে অলপ্তগীন বা আমির খানের নেতৃত্বে ও দ্বিতীয়বার মানিক তার্ঘীর নেতৃত্বে তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু বলবন তুঘ্রিলের কাছে পর্যুদস্ত হয়। অবশেষে ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে বলবন স্বয়ং এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তুঘ্রিল তখন বর্ধমান ও দক্ষিণ রাঢ়ের ওপর দিয়ে জাজনগরের দিকে পলায়ন করেন। বলবন তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে জাজনগরে তাঁকে পরাজিত করেন, এখানেই তুঘ্রিলের মৃত্যু হয়।

এর পর তিনি লখনৌতে ফিরে লখনৌতির বাজার মধ্যে এক ক্রোশ জুড়ে সারি সারি বধ্যমঞ্চ নির্মাণ করে তুঘ্রিলের আত্মীয় স্বজন, অমাত্য, ক্রীতদাস সবাইকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে বধ করেন ও কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে লখনৌতির সিংহাসনে বসিয়ে দিল্লী ফিরে যান। বর্ধমান ও দক্ষিণ রাঢ় বুগরা খানের অধীনস্থ হল। C. Stewart এর The History of Bengal থেকে জানা যায় বুগরা খানের রাজ্যসীমা বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বলবন দিল্লী ফিরে যাবার সময় তাঁকে একান্তে ডেকে পূর্ববঙ্গ জয় করার, মদ্যপান

না করার ও বিলাসব্যসনে গা ভাসিয়ে না দেবার জন্য শপথ করান ও কঠোরভাবে এ উপদেশ মেনে চলার পরামর্শ দিয়ে যান। এর থেকে বোঝা যায় পূর্ববঙ্গ তাঁর অধীনে ছিল না, আর পিতার উপদেশ মেনে তিনি পূর্ববঙ্গ জয়ের চেষ্টাও করেন নাই। নাসিরুদ্দিনের সময় থেকেই বাংলাদেশে বলবন বংশের আধিপত্যের সূচনা।

বুগরা খান হিজরী ৬৮০-৬৮৬ অব্দ (১২৮১-'৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। পিতার আদেশ মেনে কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন পরিত্যাগ করেন নাই। বুগরা যখন লখনৌতিতে আমোদপ্রমোদে জীবনযাপন করছিলেন, তাঁর নিযুক্ত লেফটানেন্টরা তাঁর রাজত্বের বিভিন্ন ভুক্তির শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। এমন কি বলবনের আদেশ শিরোধার্য করে Arsa-in-Bangala (সাঁতগা রাজ্য) ও Iqlim-in-Bangala (Sonargaon) অঞ্চল রাজ্যভুক্ত করেন নাই। সপ্তগ্রাম থেকেই বর্ধমান অঞ্চল শাসিত হত। এ থেকে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে বুগরার সময় তাঁর শিথিল শাসনব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বর্ধমান ও দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের স্থানীয় শাসকগণ কার্যত স্বাধীন ভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বলবনের মৃত্যু হয়। বুগরা খান স্বাধীন হন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রকাশ ও খুৎবা পাঠ করাতে থাকেন। মুদ্রার সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায় বুগরার পর বুগরা খানের দ্বিতীয় পুত্র রুকনুদ্দীন কাইকাউস ৬৯০–৬৯৮ হি বা ১২৯১–১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লখনৌতির সুলতান ছিলেন। কাইকাউসের অধীনস্থ এক রাজপুরুষ জাফর খানের নামাঙ্কিত দুটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে রুকনুদ্দীন পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। রুকনুদ্দিন শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশকে চার ভাগে ভাগ করেন। যথা—বিহার, সপ্তগ্রাম, দেবকোট, বাংলা বা পূর্ববঙ্গ। উত্তররাঢ় ছিল লখনৌতির শাসনাধীনে আর দক্ষিণ রাঢ় ও বর্ধমান অঞ্চল ছিল সপ্তগ্রামের অধীনে। সপ্তগ্রামের ভূস্বামী বিদ্রোহ ঘোষণা করায় উলুগ্-ই-আজম জাফর সপ্তগ্রাম অধিকার করেন, স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে বর্ধমান ও হুগলী সীমান্তে ভূদেব নামে এক হিন্দু রাজা ছিলেন। তাঁরই হাতে সম্ভবত বর্ধমানের শাসনভার ছিল। এই ভূদেবের সঙ্গে জাফর খান গাজীর সংঘর্ষ হয় ও জাফর খানের মৃত্যু ঘটে। যদুনাথ সরকারের মতে সাতগাঁ অধিকারের প্রথম অবস্থাতেই তিনি শহীদ হন (৬৯৮ হিজরী) কয়েক বৎসরের মধ্যেই। কুরশীনামা গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে জাফর খান গাজীর পুত্র ও উত্তরাধিকারী উগ্হান্ খান হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যান ও তাঁকে (ভূদেব?) পরাজিত

করে ধর্মান্তরিত করেন ও তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। যদুনাথ সরকারের মতে ইনিই সম্ভবত লখীসেরাই লিপিতে উল্লিখিত জিয়াউদ্দিন উলুঘ খান।

বাংলায় ইসলামী শাসন বিস্তারের ফলে পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, গড়মান্দারণ ও বর্ধমান জেলার পাটুলী, চুরুলিয়া, দিশের গড়, আউসগ্রাম, গোপভূম, সুয়াতা-ভাল্‌কী অঞ্চলের হিন্দু রাজগণ সমবেতভাবে ইসলামের প্রসার রোধ করতে ব্যর্থ হন ও তাঁদের সীমিত শক্তি নিয়ে তুর্কী আক্রমণের মোকাবিলা করতে না পেরে অনেকেই ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হন, এমন কি এই সব হিন্দুরাজাদের নির্মিত মন্দিরগুলিও তুর্ক-আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায় নাই। এগুলির মধ্যে অধিকাংশ মন্দিরকেই মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। মঙ্গলকোটের মসজিদ, জৌগ্রামের অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের গঠনশৈলী নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আটকোণা মন্দিরের প্রমাণ মেলে।

এই সময় দিল্লীর সুলতানীতে নাসিরুদ্দিনের গোপন পরামর্শমত কাইকাউস সুলতান নাজিমুদ্দিনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন কিন্তু তিনিও বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেন নাই; ৬৮৯ হিজরীর মহরম মাসে তিনি খিলজীদের হাতে নিহত হন। এর সঙ্গে বাংলাতে বলবনী শাসনের ইতি ঘটে ও ফিরোজী শাসনের সূচনা হয়। ১৩০১-১৩২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ। তিনি পূর্ববর্তী শাসকদের রাজ্যের আয়তন বজায় তো রেখেছিলেনই। পরন্তু সাতগাঁ, ময়মনসিংহ, সোনার গাঁ ও সিলেট পর্যন্ত রাজ্যসীমানা বিস্তার করেন। এর থেকে বোঝা যায় বর্ধমানসহ দক্ষিণরাঢ় অঞ্চলও তাঁর শাসনাধীনে ছিল। তাঁর ছিল ছয় পুত্র—শিহাবুদ্দিন বুগড়া শাহ, জালালউদ্দিন মামুদ শাহ, গিয়াসুউদ্দিন বাহাদুর শাহ, নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিম শাহ, হাতেম খান্ ও কৎলু খান। এদের মধ্যে হাতেম ছিলেন বিহারের শাসনকর্তা। অন্যান্য পুত্রদের মধ্যে শিহাবুদ্দিন, জালালুদ্দিন, গিয়াসুদ্দিন ও নাসিরুদ্দিন-এর নামের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই চারজনের সকলেই ১৩০৭ থেকে ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কখনও ফিরোজের অধীনস্থ হিসাবে, আবার কখনও স্বাধীনভাবে লখনৌতির সিংহাসনে বসেছিলেন। ফিরোজ ও শিহাবুদ্দিন লখনৌতে ছিলেন। ফিরোজের একটি শখ ছিল নিজের নামানুসারে নগরীর নামকরণ করা। তাঁর সময়ে পাণ্ডুয়া ও ত্রিবেণীর নাম হয় ফিরোজাবাদ। কাজেই অনুমান হয় তাঁর অধীনস্থ শিহাবুদ্দিনকে পাণ্ডুয়া (ফিরোজাবাদ) কিংবা সপ্তগ্রামে অধিষ্ঠিত করে দক্ষিণরাঢ় অঞ্চলের শাসনভার তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন। শামসুদ্দিন ফিরোজ সুশাসক ছিলেন; তাঁর সময় বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের শাসন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয়। ১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দে

তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর জীবিতকালে তাঁর পুত্রগণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ এলাকা শাসন করার ও নিজ নামে মুদ্রা প্রকাশ করার অধিকার লাভ করেছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ্ অন্য সব ভাইদের হত্যা করে লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করেন। কেবল নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিম আত্মগোপন কবে থাকায় নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। বাহাদুর শাহ ১৩১৫–'২৫ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন ও তাঁর পর নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিম ১৩২৭ পর্যন্ত শাসনকার্য চালান। তাঁর সঙ্গেই ফিরোজশাহী বা মামলক বংশের অবসান ঘটে। আচার্য যদুনাথের কথায় : Thus lived and died Shamsuddin Firoz Shah, the founder of a new Mamluk dynasty in Bengal after the extinction of the house of Balbans. He died full of years of glory and a fame which has now been buried deep under debris of time.

তোগলকী শাসন : শুরু হল তোগলকীর অধীনে শাসন। দিল্লীব সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক ইতিমধ্যে বিহারের ত্রিহুত জয় করেন। এই সময় নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিম শাহ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে দিল্লীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। গিয়াসুদ্দিন তুঘলক তাঁর পালিত পুত্র তাতারখানকে বাহিনীসহ বাংলায় পাঠান। লখনৌতির যুদ্ধে বাহাদুর শাহ পরাজিত হয়ে পূর্ব বাংলায় পলায়ন করেন। কিন্তু সুলতানী বাহিনী তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে বন্দী করে। গিয়াসুদ্দিন তুঘলক বাংলাকে তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন ও নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিমকে লখনৌতির ও তাতারখানকে সোনার গাঁও-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাতার বাহরামখান উপাধি নিয়ে সোনার গাঁও-এর সিংহাসনে বসেন। এ সময়ে বর্ধমানসহ দক্ষিণ রাঢ়ের শাসন ছিল সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ইজ্জুদ্দীন য়াহিয়া-এর অধীনে। মহম্মদ বিন্ তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে বসার পর বাংলার শাসনব্যবস্থার সংস্কার করেন। এই সংস্কারের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাংলার শাসকরা যাতে ক্ষমতাশীল ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার সাহস পায়। এর জন্য তিনি বাংলার শাসন-ক্ষমতা ভাগ করে একাধিক প্রশাসক নিয়োগ করেন। তিনি দক্ষিণ রাঢ়ের শাসন লখনৌতি থেকে পৃথক করেন ও মালিক ইজ্জুদ্দীন য়াহিয়াকে সপ্তগ্রামে নিয়োগ করেন। মহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বের শেষ দিকে বাহাদুর শাহ আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তাতারখান তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। য়াহিয়া সম্ভবত ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পরই তুঘলক শাসনের অবসান ঘটে ও বাংলায় মুবারক শাহীবংশের পত্তন হয়। এই বংশের আলাউদ্দিন আলী

শাহ ১৩৪১–'৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লখনৌতির শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ইলিয়াস শাহীবংশের শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৫২–'৫৭ পর্যন্ত লখনৌতির শাসক ছিলেন। তিনি ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে তাঁর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সপ্তগ্রামও তাঁর শাসনাধীনে ছিল। সপ্তগ্রামে তাঁর নামের মুদ্রা পাওয়া গেছে। ইলিয়াস শাহের সময় তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ (১৩৫৭–৫৯) গৌড়ের শাসনকর্তা ছিলেন। সপ্তগ্রামে তাঁর নামে রজতমুদ্রা নির্মিত হত। ইলিয়াস শাহের সময় থেকে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার সুলতানগণ দিল্লীর অধীনতামুক্ত থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতেন। ইলিয়াস ত্রিহুত, নেপাল জয় করে দক্ষিণবঙ্গের ভিতর দিয়ে সুরক্ষিত পুরী আক্রমণ করে চিল্কা পর্যন্ত অগ্রসর হন। উড়িষ্যারাজ তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন নাই। তিনি চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। দিল্লী দখল করতে না পারায় তাঁর আক্ষেপের সীমা ছিল না। তাঁর এই আকস্মিক উত্থানে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তুঘলক শঙ্কিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং ত্রিহুত হয়ে পাণ্ডুয়া জয় করেন। ইলিয়াস তখন শঙ্কিত হয়ে পাণ্ডুয়ার উত্তরে মাটির তৈরী সুরক্ষিত একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফিরোজ দুর্গ ভেদ করতে না পেরে দুর্গের বাইরে অপেক্ষা করেও দুর্গজয় করতে পারলেন না। ইলিয়াস সপ্তগ্রাম টাকশালে তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা নির্মাণ করান ও ভাগীরথীর পশ্চিমে রাঢ়াঞ্চলে তাঁর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ (১৩৫৭–৮৯) পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলে রাঢ় অঞ্চল পাণ্ডুয়ার শাসনাধীনে ছিল। সপ্তগ্রামের টাকশালে তাঁর নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা নির্মিত হত। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর গৌড়ের ইতিহাস থেকে জানা যায় সিকন্দরের আমলে মুকুট রায় (১৩৩৮–৬৫) নামে এক হিন্দুরাজা রাঢ়ের পূর্বাঞ্চলে শাসন করতেন। তাঁর রাজ্য পাবনা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহের পাঞ্জা লাভ করেন ও পূর্বধূলায় (পূর্বস্থলীতে) রাজধানী স্থাপন করে দক্ষিণ রাঢ়সহ দক্ষিণাঞ্চলের বিরাট ভূখণ্ডের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। অবশ্য এই কাহিনীর সত্যতার বিশেষ সমর্থন পাওয়া যায় না। যেখানে দিল্লীর সুলতান একাধিকবার সিকান্দারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েও তাঁকে বাগে আনতে পারেন নাই সেখানে সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে এক হিন্দুরাজা তাঁকে অগ্রাহ্য করে দিল্লীর সুলতানের পাঞ্জাবলে তাঁর নাকের ডগায় শাসনকার্য চালাবেন এটা অবিশ্বাস্যই মনে হয়। যদি এই সময় মুকুট রায় নামক কোন শাসকের অস্তিত্ব থাকে তো তিনি ছিলেন শামসুদ্দিন ও

সিকান্দারের অধীনস্থ কোন বড় জমিদার। যাই হোক, ফিরোজ তুঘলক যখন শামসুদ্দিন ও সিকান্দারকে জয় করতে ব্যর্থ হন, তখন তাঁর বঙ্গবাসী এক কর্মচারী আজেম হুমায়ুন হৈবতখান এগিয়ে আসেন ও তাঁর বাকচাতুর্যপূর্ণ মধ্যস্থতার দ্বারা ফিরোজ ও সিকান্দারের মধ্যে একটা মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করতে সমর্থ হন। এই সন্ধির দ্বারা ফিরোজ সিকান্দারের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়।

কথিত আছে সিকন্দর শাহ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র গিয়াসুদ্দিন আজমেব সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন (১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে)। গিয়াসুদ্দিন আজম পিতার রক্তে হাত রাঙিয়ে সিংহাসনে বসেন (১৩৮৯–১৪০৯) ও প্রায় ২০ বৎসর রাজত্ব করেন।

গিয়াসুদ্দিনের পর তাঁর পুত্র সৈফুদ্দিন হামজা শাহ্ (১৪১০–'১২) সুলতান-উস্-সালাতিন (রাজাধিরাজ) উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় না। কথিত আছে তিনি তাঁর ক্রীতদাস শিহাব কর্তৃক নিহত হন। শিহাব শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ নাম নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন। রাজপুত্র না হয়েও শিহাবুদ্দিন যে রাজসিংহাসন লাভ করেছিলেন এর পশ্চাতে বাজশাহীর ভাতুড়িয়ার ক্ষমতাশালী সামন্তরাজা গণেশের বিশেষ হাত ছিল। এই গণেশই ইলিয়াস শাহের দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং বায়াজিদ ও আলাউদ্দিন শাহের অযোগ্যতার সুযোগে রাজ্যে সর্বময় কর্তৃত্ব অর্জন করেন। দুই বৎসর রাজত্ব করার পর শিহাবুদ্দিন পরলোকগমন করেন। অনেকের মতে রাজা গণেশই তাঁকে হত্যা করিয়ে ছিলেন। শিহাবুদ্দিন বায়াজিদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসেন। আলাউদ্দিন তখন শিশু মাত্র। কাজেই তাঁকে নামে মাত্র সিংহাসনে বসিয়েই গণেশই রাজত্ব করতে থাকেন। আলাউদ্দিন সম্ভবত একবৎসর সিংহাসনে ছিলেন। কারণ মাত্র ৮১৭ হিজরা (১৪১৪–১৫ খ্রীষ্টাব্দ) এর তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গণেশ দনুজমর্দন দেব নামগ্রহণ করে বাংলার মসনদে বসেন। ইলিয়াস বংশের এখানেই ইতি। ইলিয়াস শাহীর পতন সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ সরকারের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। "The only story of Bengal in the Ilyas Shahi age that remained in the people's memory in after times was that its sovereigns passed their lives in enjoyment of luxury, ease and pleasure, only taking care not to give offence to the Sovereign of Delhi. No history could be made by such well fed sleepers. Even the correct length of their successive regions came to be forgotten, because one Sultan was just like another in indolence

and futulity. If history be a record of change, there was no history in Bengal during those hundred years; the hands had stopped on the dial face of time in that land of Lotos-eaters on the throne."

রাজা গণেশ ও তাঁর বংশ : ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের বিলাসিতা, আরামপ্রিয়তা ও অকর্মণ্যতার সুযোগে বর্ধমানসহ সমগ্র দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের ইতিহাসে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এসময় মনে হয়— এই অঞ্চলের সামন্তরাজগণ প্রাধান্য অর্জন করেন।

গৌড়ের ইতিহাস ও রিয়াজ-উস-সালাতিনের বিবরণ থেকে এই সময়ে হিজলীর হিন্দুরাজা, রাঢ়ের পূর্বাঞ্চলের মুকুট রায় ও উড়িষ্যার কপিলেন্দ্রদেবের এই অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারের কথা জানা যায়। ইলিয়াসশাহী বংশের পতনের পরে রাজা গণেশ (১৪১৫, ১৪১৭–১৮ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়ের সিংহাসনে বসেন, তাঁর ইতিহাস রহস্যময়—কোন ঐতিহাসিকই পক্ষপাতহীন বিস্তৃত তথ্য দেন নাই। তবাকৎ-ই-নাসিরী, তারিখ-ই-ফিরিস্তা, রিয়াজ-উস-সালাতিন এবং এদের ওপর ভিত্তি করে লেখক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছরের ইতিহাস' ও রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস' (মধ্যযুগ : চতুর্থ পরিচ্ছেদ) চীন সম্রাটের সদস্য শিং-ছা-শ্যং-লাল গ্রন্থ ও দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা বিশ্লেষণ করে ও যদুনাথ সরকারের পুনর্গঠিত ইতিহাস পর্যালোচনা করে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে রাজা গণেশ উত্তরবঙ্গের ভাতুড়িয়া অঞ্চলের এক জমিদার ছিলেন। ইলিয়াস শাহী বংশের গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ, সৈফুদ্দিন হামজা শাহ, শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ ও আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে গণেশ বাংলার রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই গণেশই ফার্সী পুঁথি ও ডঃ বুকানন হামিল্টনের বিবরণে উল্লিখিত কানক্, গানস্ বা গণেশ। ইনিই আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যুত বা সম্ভবত হত্যা করে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন ও দনুজমর্দনদেব নাম ধারণ করেছিলেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় ও ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টাশালী উভয়ের মতেই গণেশ ও দনুজমর্দনদেব একই ব্যক্তি। হিজরা ৮২০, ৮২১ সনে সুবর্ণগ্রাম ও চাটি গ্রামের টাকশাল থেকে প্রকাশিত তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। কিন্তু সপ্তগ্রাম বা রাঢ় অঞ্চলে তাঁর কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। সেকারণে অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে তিনি আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নাই ও এই অঞ্চল উড়িষ্যারাজ কপিলেন্দ্রদেবের অধিকারভুক্ত ছিল। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয় তাঁর 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রিয়াজ-উস্-সালাতিনের বিবরণের

উপর নির্ভর করে উল্লেখ করেছেন গণেশ যদু বা জালাউদ্দিনের রাজত্বকালে (১৪৩৪-৪২) তাঁরা গৌড়ের সিংহাসন ও উত্তরবঙ্গ নিয়ে বিশেষ বিব্রত ছিলেন, সেকারণ রাঢ় অঞ্চলের ঘটনাবলীতে সমসাময়িককালে রচিত ইতিহাসের সাক্ষ্য নীরব।' এছাড়া তাঁর মতে—গণেশের পুত্র জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে দনুজমর্দনদেব নামক একজন হিন্দুরাজা পাণ্ডুয়া হতে মুসলমান সেনাপতিকে বিতাড়িত করে দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করেন। এই দনুজমর্দনদেব চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর নামাঙ্কিত রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল মুদ্রার নির্মাণকাল ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং সম্ভবত ঐ সময়ে তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাঙ্গালার ইতিহাসে (২য় খণ্ড) গণেশ যদু ও দনুজমর্দনকে পৃথক ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেছেন।

Buchanan-Hamiltan-এর দিনাজপুরের বিবরণ থেকে পাওয়া যায় শিহাবুদ্দিন ৩ বৎসর শাসন করেন—Then Ganesh, a Hindu and hakim of Dinwaj (Perhaps a petty Hindu chief of Dinajpur) seized the Government.

কিন্তু রিয়াজ-উস-সালাতিন বা উপরিউক্ত বিবরণকে আচার্য যদুনাথ সরকার বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন নাই। তিনি মন্তব্য করেছেন—The above legends about Rajah Ganesh reduced to writing 370 years after his death (in the Rayajus-Salatin and the Pandua manuscript of Buchanan) prove to be pious fraud when confronted with some reasonable accounts given by Nizam-ud-Din Ahmed and Firista.

সুখময় মুখোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র মজুমদার আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্ব ১৪১৪ এবং গণেশ বা দনুজমর্দনদেবের রাজত্বকাল ১৪১৫ ও ১৪১৭-১৮ বলে চিহ্নিত করেছেন। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী-মশাই গণেশ যদু বা জালালউদ্দিনের রাজত্বকাল (১৪৩৪-৪২) এবং চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দনুজমর্দনদেবের মুদ্রার কাল ১৪১৭-১৮ উল্লেখ করেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় ও রমেশ মজুমদার উভয়েই গণেশ ও দনুজমর্দনদেবকে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেছেন। আচার্য যদুনাথ সরকারও গণেশ আর দনুজমর্দনদেবের অভিন্নতা স্বীকার করেছেন। Burdwan Gazetteer 1954-তে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও ডঃ বরুণ দে মন্তব্য করেছেন—The identification of Ganesh with Dunujamardana Deb was first proposed by Dr. Nalinikanta Bhattasali and this view has been further elaborated by

Sukhomoy Mukhopadhyay. এই সমস্ত বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর বিবরণ ভ্রান্ত বলেই মনে হয়। বর্ধমান গেজেটিয়ার থেকে আরও জানা যায় যে বর্ধমানের এই সময়ে রাজনৈতিক ইতিহাস কুহেলিকাচ্ছন্ন। এসময় জেলার একটা বিরাট অংশ ঘন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল অবশ্য লখনৌতির অধিকারে ছিল।

১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে গণেশের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহেন্দ্রদেব বাংলার সিংহাসনে বসেন। 'চণ্ডীচরণ পরায়ণ' মহেন্দ্রদেবের নামাঙ্কিত ১৩৪০ শকাব্দের মুদ্রা পাওয়া গেছে। মুদ্রার সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে প্রমাণিত হয় যে ১৪১৮-র এপ্রিল থেকে ১৪১৯-এর জানুয়ারি পর্যন্ত নয় মাসের মধ্যে দনুজমর্দনদেব, মহেন্দ্রদেব ও জালালউদ্দিন —এই তিনজন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দিন আহমদ শাহ সিংহাসনে বসেন ও প্রায় ১৮ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তাঁর দুই ক্রীতদাস ছিল—শাদীখান ও নাসির খান। শাদীখান শামসুদ্দিনকে হত্যা করেন ও নাসিরউদ্দিনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। নাসিরউদ্দিন এই ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বভাগেই জানতে পেরে নিজেই শাদীখানকে হত্যা করেন ও বাংলার সিংহাসনে বসেন। বাংলায় শুরু হলো মহম্মদশাহীবংশ ও হাবসী রাজত্ব।

মহম্মদ শাহী বংশ : সপ্তগ্রামে নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহের মুদ্রা পাওয়া গেছে; এর থেকে বর্ধমানের ওপর তাঁর আধিপত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। নাসিরুদ্দিন-এর রাজত্বকাল আনুমানিক ১৪৩৬ থেকে ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর রাজত্বকালের মধ্যেই ১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দের উড়িষ্যারাজ কপিলেন্দ্রদেবের একটি লিপি থেকে জানা যায় যে উড়িষ্যারাজ কপিলেন্দ্রদেব নিজেকে গৌড়েশ্বর ও 'মল্লিক পরিসা' বিজেতা বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আচার্য যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন যে বাংলার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে উড়িষ্যারাজ দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন ও ইসলামী আধিপত্য ভাগীরথীর সীমান্তে সীমাবদ্ধ ছিল।

নাসিরুদ্দিনের পুত্র রুকনুদ্দিন ১৪৫৫–১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মুসলমান আক্রমণের সময় থেকে জেলার সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে যে অন্ধকার নেমে এসেছিল গণেশ-দনুজমর্দনদেবের সময় থেকে তার পুনরুজ্জীবন ঘটতে থাকে। রুকনুদ্দিন বরবাকশাহ সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচয়িতা কুলীনগ্রামের মালাধর বসু তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। রুকনুদ্দিন তাঁকে 'গুণরাজখান' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজখান।' কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন গুণরাজের পোষ্টাসুলতান ছিলেন য়ুসুফ শাহ। কিন্তু এ মত সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ য়ুসুফ শাহের

রাজ্যারম্ভের একবছর আগে কাব্য রচনা শুরু করেই কবি কাব্যে 'গুণরাজখান' ভনিতা ব্যবহার করেছেন। 'তেরশ পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন'; রুকনুদ্দিনের রাজত্বকাল ১৪৫৫-১৪৭৮। য়ুসুফ শাহের কাল ১৪৭৪-১৪৮০। রুকনুদ্দিন ১৪৭৪-৭৬ পর্যন্ত পুত্র শামসুদ্দিন য়ুসুফ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেছিলেন। মালাধর বসুর পুত্র-ও সুলতানের কাছ থেকে 'সত্যরাজখান' উপাধি পান। এ বিষয়ে যদুনাথ সরকারের মন্তব্য বর্ধমান জেলার তৎকালীন ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করবে। Barbak showed great interest in Bengali literature. The poet Maladhar Basu, who commenced his 'Sri Krishna Bijoy' in saka 1395 (1473) records with gratitude the receipt of patronage from the 'Goureswara' who honoured him with the title of 'Gunaraj Khan'. On the poet's son also, he tells us, the King conferred the title of 'Satya raj khan'. The fact that the poet was a resident of Kulingram, Burdwan district, would tend to suggest the long inclusion of that area in Barbak's dominion.

হাবসী রাজত্ব : মহম্মদ শাহী বংশের শেষ রাজা জালালউদ্দিন ফতেশাহ ১৪৮১-৮২ থেকে ১৪৮৭-৮৮ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর মুদ্রা থেকে জানা যায় জালাউদ্দিনের অপর নাম ছিল হোসেন শাহ। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে ফতেশাহের রাজত্বকালে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত আছে। তাঁর রাজত্বকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব (১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি)।

এরপর ফতেশাহকে হত্যা করে খোজা বারবক সুলতান শাহজাদা নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। শুরু হল বাংলায় হাবসী শাসনের সূচনা। কয়েকমাস রাজত্ব করার পর হাবসী খোজা মালিক ইদিল ফতেশাহকে হত্যা করে সৈফুদ্দিন ফিরোজশাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। কালনায় প্রাপ্ত তাঁর দুটি লিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে বর্ধমান জেলার সমগ্র অংশ না হলেও জেলার পশ্চিম গাঙ্গেয় অংশে তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি ১৪৮৭ থেকে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ এই তিন বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি পাইকদের হাতে নিহত হন। এরপর দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালের মধ্যে আবিষ্কৃত তিনটি মুদ্রার মধ্যে একটি বর্ধমান জেলার কালনায় পাওয়া গেছে। যদুনাথ সরকারের মতে এর থেকে বর্ধমান জেলায় এমন কি উড়িষ্যার সীমান্ত পর্যন্ত তাঁর রাজ্যবিস্তার সমর্থিত হয়। কোন মুদ্রাতেই তাঁর

পিতৃপরিচয় পাওয়া যায় নাই। তিনিও পাইকদের দ্বারা নিহত হন, তাঁর পরে হাবসী শামসুদ্দিন মুজাফর শাহ্ সিংহাসনে বসেন ও ১৪৯১-৯৩ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি সৈয়দ হোসেনের পাইকদের দ্বারা নিহত হন। এইখানেই হাবসী রাজত্বের অবসান ও হোসেন শাহী রাজত্বের সূচনা।

হোসেন শাহী বংশ : সৈয়দ হোসেন আলাউদ্দিন শাহ্ নাম নিয়ে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে বসেন ও ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। নানা দিক দিয়ে তাঁর রাজত্বকাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বুকানান হ্যামিলটন মার্টিন-এর Eastern India এবং পাণ্ডুয়ায় প্রাপ্ত একটি পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে হোসেন ধর্মান্তরিত হিন্দুরাজা জালালুদ্দিন বা যদু কর্তৃক বিতাড়িত সুলতান ইব্রাহিমের পৌত্র। তিনি রংপুর জেলার দেবনগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইব্রাহিম কামতাপুরে আশ্রয় গ্রহণ করলে হোসেন সেখানেই বড় হতে থাকে, পরে তিনি গৌড়ের পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তাঁর জন্ম আরবে। তিনি তাঁর পিতা সৈয়দ আসরফের সঙ্গে ভারতে আসেন ও জঙ্গিপুর জেলায় একানী চাঁদপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি স্বর্ণমুদ্রা এবং মালদা ও মান্দারণ লিপি থেকে জানা যায় তিনি ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন ও খলিফাতুল্ল্যাহ্ উপাধি ধারণ করেন। রিয়াজ-উস-সালাতিন ও বুকানন মার্টিন-এর আবিষ্কৃত পাণ্ডুয়ার অনামী ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে উড়িষ্যার সীমান্ত পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কাজেই বর্ধমানসহ সমগ্র দক্ষিণ রাঢ়ও তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল বলেই অনুমিত হয়। এ ছাড়া তাঁর রাজ্য মগধ, কামতাপুর ও আসাম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের নামাঙ্কিত বহু মুদ্রা বর্ধমান জেলার বহু স্থানেই আবিষ্কৃত হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত এবং সুয়াতা, মঙ্গলকোট ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে তাঁর নির্মিত মসজিদলিপি এবং গড় মান্দারণ, আউসগ্রাম, কালনা, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম থানায় ও জেলার বিভিন্ন স্থানের মসজিদ গাত্রে ক্ষোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে সমগ্র বর্ধমান জেলা তাঁর শাসনাধিকারে ছিল। তাঁর সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। এদেশে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সমন্বয় ঘটিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন, বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে তা নবজাগরণের সূচনা করে। পূর্বে অমরারগড়ের শিবাক্ষ্যা দেবীর মন্দির হজরত বহমন্ পীরের সমাধির পূর্বদিকে মেহালা নামক পুষ্করিণীর পূর্ব-দক্ষিণ কোণে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান। বহমান পীরের সমাধির প্রবেশদ্বারের উপরে এক প্রস্তর ফলকে তোগড়া অক্ষরে অনেকগুলি আরবী শব্দ

দেখা যায়; এছাড়া সমাধির অভ্যন্তরের আর একটি প্রস্তর ফলকে কোরান শরীফের আয়েতের নীচে আবুল মজঃফর আলাউদ্দিন এই নাম ও হিজরী ৯১৬ সনের উল্লেখ আছে। এই থেকে অনুমান করা হয় আলাউদ্দিন হিজরী দশম শতকে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নামে প্রসিদ্ধ হন ও মহম্মদ বাহমন তাঁর সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি এই মসজিদ নির্মাণ করান। বর্ধমান জেলা যে হোসেনের শাসনাধিকারে ছিল এটিও তার একটি প্রমাণ। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ পুরী আক্রমণ করেছিলেন এবং পুরী আক্রমণের সময় বর্ধমানের উপর দিয়ে বাদশাহী সড়ক ধরে গিয়েছিলেন বলেই জনশ্রুতি। অনেকের ধারণা এই বাদশাহী সড়ক বস্তুত তাঁর সময়েই নির্মিত হয়েছিল। হোসেনের কামরূপ, কামতা ও জাজনগর জয়ের ৯১০ হিঃ স্মারক মুদ্রা, রিয়াজ-উস-সালাতিনের বিবরণ, ত্রিপুরার রাজমালাগ্রন্থ থেকে হোসেনের পুরীজয় সমর্থিত হয়।

আবার জীবন দেবাচার্যের "ভক্তি ভাগবত" অনুসারে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র বাংলার সুলতানকে পরাজিত করে ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন। প্রতাপরুদ্রের শিলালিপি ও তাম্রশাসনেও দেখা যায় গৌড়েশ্বর প্রতাপরুদ্রের কাছে পরাজিত হয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন ও কোন রকমে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

আবার কটক রাজবংশাবলী ও জগন্নাথ মন্দিরের ইতিহাস সম্বলিত মাদলা-পঞ্জী অনুসারে প্রতাপরুদ্রের দক্ষিণ অভিযানের সময় তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গৌড়েশ্বর ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে কটক ও পুরী আক্রমণ করেন এবং জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করে প্রায় সব দেবমূর্তিকে নষ্ট করেন। কেবলমাত্র জগন্নাথদেবের মূর্তিকে চড়াই গুহায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ পেয়েই দ্রুত গতিতে রাজ্যে ফিরে আসেন ও হোসেনকে আক্রমণ করে তাঁকে গড়মান্দারণ পর্যন্ত নিয়ে যান। হোসেন গড়মান্দারণে আশ্রয় নিলে প্রতাপ সেটিকে দখল করেন। পরে প্রতাপরুদ্রের এক কর্মচারী গোবিন্দ বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতাপ মান্দারণ হতে বিতাড়িত হন। কিন্তু পরে প্রতাপ বিদ্যাধরকে ডাকিয়ে এনে তাঁকে রাজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদ দেন। ফলে হোসেন ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। মহাত্মা শিশিরকুমারের 'অমিয় নিমাইচরিত' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে উল্লেখ আছে যে শ্রীচৈতন্য ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপ থেকে শ্রীক্ষেত্র যাবার পথে জাজনগর সীমান্তে হোসেন ও প্রতাপরুদ্রের এই যুদ্ধের সংবাদ পান। চৈতন্যভাগবতেও এর উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠির জানার (মালীবুড়ো) রচিত "শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য" গ্রন্থেও প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে গোবিন্দ বিদ্যাধরের ষড়যন্ত্রের উল্লেখ আছে। তবে

সেখানে দেখা যায় যে গোবিন্দ বিদ্যাধর সিংহাসনের লোভে প্রতাপরুদ্র ও পরে তাঁর পুত্রদ্বয়—কালু-আদেব ও কলাডু-আদেবকে ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করেন ও ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন ও ভোই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এই ষড়যন্ত্র পরবর্তী কালের কোন যড়যন্ত্র হতে পারে।

উপরি উক্ত বিবরণ থেকে হোসেন শাহের উড়িষ্যা আক্রমণ সম্বন্ধে বিভ্রান্তি ঘটাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন সালের উল্লেখ থেকে এই বিভ্রান্তি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদি কটকরাজ বংশাবলী, মাদলাপঞ্জী ও চৈতন্যভাগবত বিশ্বাস করতে হয় তাহলে গড়মান্দারণ থেকে হোসেনকে প্রতাপরুদ্রের বিতাড়ন ও বর্ধমানসহ দক্ষিণ রাঢ় অন্ততঃ পক্ষে গঙ্গাতীর পর্যন্ত উড়িষ্যারাজের অধিকারযুক্ত হওয়া প্রমাণিত হয়। গৌড়েশ্বর হোসেনের ৯১০ হিজরার জাজনগর জয়ের স্মারকমুদ্রা, কটকরাজ বংশাবলী ও মাদলাপঞ্জীর বিবরণ পর্যালোচনা করলে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয় না যে হোসেন প্রথমে উড়িষ্যা জয় করেন। কিন্তু প্রতাপরুদ্র দক্ষিণ অভিযান থেকে ফিরে এসে হোসেনের অধিকার থেকে উড়িষ্যাকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। যুধিষ্ঠির জানার "শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য" থেকে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে। তবে প্রতাপরুদ্রের জয় উড়িষ্যার সীমান্ত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং হোসেনের রাজ্য সীমা বর্ধমানসহ দক্ষিণরাঢ় এবং দক্ষিণবঙ্গের ও উড়িষ্যার প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হোসেন শাহের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তিনি ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁর মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে তাঁর আঠারজন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাহকে শাহাজাদা পদে অভিষিক্ত করেন ও তাকে নিজ নামে মুদ্রা· প্রকাশের অধিকার দেন। তাঁর রাজ্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় ও মোগলসম্রাট বাবরের রাজত্বের সূচনা। এরপর বাবর নিজের রাজত্ব কিছুটা সামলিয়ে বিহারের ঘর্ঘরা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন ও গোগরার যুদ্ধে আফগানদিগকে পরাজিত করেন। ফলে আফগান সর্দারদের অনেকেই পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাবর নসরতের কাছে দূত প্রেরণ করেন। নসরৎও বাবরের কাছে অনেক উপহার পাঠিয়ে তাঁর বন্ধুত্ব কামনা করেন। বাবর তাঁর সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করতে চান ও তিনটি শর্তের উল্লেখ করেন। নসরৎ এই শর্ত মানতে অস্বীকৃত হলে বাবরের সঙ্গে নসরৎ-এর যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধে বাঙ্গালী পল্টনের কামান চালানোর দক্ষতা দেখে বাবর মুগ্ধ হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নসরৎ পরাজিত হন ও বাবরের তিন শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুনও বাংলা আক্রমণের উদ্যোগ নেন। নসরৎ তখন

চাণক্যনীতি অবলম্বন করে বাবরের শত্রু গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের কাছে দূত পাঠিয়ে জোট বাঁধেন। নসরতের রাজত্বের অন্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা পর্তুগীজ বণিকদেব বাংলায় ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা। নসরৎ সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। নসরতের রাজ্যের আয়তন সমগ্র বাংলাদেশ, ত্রিহুত, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শেষ জীবনে খোজা আততায়ীর হাতে নসরতের মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ্ ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন ও মাত্র এক বৎসব রাজত্ব করেন। কালনার এক মসজিদের লিপি থেকে জানা যায় তাঁর এক উজির উলুঘ মসনদ খান মালিক কালনার ঐ মসজিদ নির্মাণ করেন। এরপর হোসেন শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ সিংহাসনে বসেন ও ১৫৩৩-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসন পরিচালনা করেন। নসরৎ শাহের রাজত্বের শেষদিকে তিনি হোসেন শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে বাংলা শাসন করেছিলেন ও নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন।

এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিহারের সাসারামের আফগান জায়গীরদার শের খাঁর গৌড় আক্রমণ। তিনি ঝাড়খণ্ডের পথে অগ্রসর হয়ে একরূপ বিনা বাধায় মানভূম, বর্ধমান, বীরভূম অতিক্রম করে গৌড় অধিকার করেন। এ সময় চুরুলিয়া দুর্গের পতন হয়, আসানসোল মহকুমার অজয় ও দামোদরের মধ্যবর্তী শেরগড় পরগনা শের খাঁর এই বিজয়ের সাক্ষ্য বহন করছে। গিয়াসুউদ্দিন উপায়ান্তর না দেখে তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে শের খাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। শের খাঁ তখনকার মত ফিরে গেলেও পরে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোসাহেব খানকে 'খাওয়াস খান' উপাধি দিয়ে গৌড় অধিকার করতে পাঠান। এই অভিযানের সময় শের খানের পুত্র জালালখান গিয়াসুদ্দিনের পুত্রদের বন্দী করেন। এরপর শেরখান গিয়াসুদ্দিনের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে পরাজিত করেন। গিয়াসুদ্দিন শেরখানের বিরুদ্ধে হুমায়ুনের সাহায্য চান। হুমায়ুন সঙ্গে সঙ্গে শেরখানের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। এক দিকে গিয়াসুদ্দিন অন্যদিকে হুমায়ুনের সৈন্য এই সাঁড়াশী আক্রমণের মধ্যে পড়ে শের খান বাধ্য হয়ে সসৈন্যে রোটাস দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গিয়াসুদ্দিনের সময়েই পর্তুগীজরা বাংলায় প্রথম বাণিজ্যের ঘাঁটি নির্মাণ করেন। গিয়াসুদ্দিন প্রথমে পর্তুগীজদের কাছে উপহার পেয়ে সন্দিগ্ধ হন ও তাঁদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে বন্দী করেন। ইতিমধ্যে দিয়াগো রেবেলো নামে এক পর্তুগীজ নায়ক গোয়া থেকে তিনটি জাহাজসহ সপ্তগ্রামে আসেন ও মাহমুদকে বন্দী পতুর্গীজদের মুক্তি দিতে বলেন। গিয়াসুদ্দিন শেরখানের বিরুদ্ধে সাহায্য চান।

পর্তুগীজ সৈন্য নিয়ে গিয়াসুদ্দিন তেলিয়াগাড়ী গিরিপথ দিয়ে শেরখানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে থাকলে জালালুদ্দিনের দ্বারা অবরুদ্ধ হন। পর্তুগীজ সৈন্য শেরখানকে 'গরিজ' (তেলিয়াগাড়ী) দুর্গ ও ফারান্ডুজ (পাণ্ডুয়া?) শহর অধিকার করতে দিল না। কিন্তু গিয়াসুদ্দিন শেরখানকে পরাজিত করতে পারলেন না। গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ পর্তুগীজদের বীরত্ব দেখে তাদেরকে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে দুটি শুল্কগৃহ স্থাপনের অনুমতি দিলেন। এরপরেই গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যু হয়। এদিকে সুযোগ বুঝে হুমায়ুন একরূপ বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করলেন (১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই)। গিয়াসুদ্দিন এইভাবে খাল কেটে কুমীর এনে বাংলাদেশে পর্তুগীজদের অত্যাচার ও মোগল আধিপত্যের ব্যবস্থা করে দিলেন। হোসেন শাহীবংশের এইখানেই যবনিকাপাত ঘটে ও মোগল শাসনের সূচনা হয়।

সুলতানী যুগে জেলার শাসন-পদ্ধতি : ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজী প্রথম বাংলাদেশে ইসলামী শাসনের সূচনা করেন। ১২০৪ থেকে ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ নামে দিল্লীর অধীন থাকলেও দক্ষিণ রাঢ় ও বর্ধমান অঞ্চলে দীর্ঘদিন উড়িষ্যার আধিপত্য বজায় ছিল। এ অঞ্চল তাদের সামন্ত রাজাদের দ্বারা শাসিত হত। ইসলামী শাসনে দেশকে কতকগুলি ইক্তায় বিভক্ত করা হত। ইক্তার শাসনকর্তা ছিল মোক্তা। মুগিসউদ্দিন য়ুজবকের সময় রাঢ় অঞ্চল সুলতানী শাসনের আওতায় আসে।

১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ তুঘলক বাংলাদেশ অধিকার করেন ও দেশকে লখনৌতি, সোনার গাঁও ও সাত গাঁও—এই তিনটি ইক্তায় বিভক্ত করেন। দক্ষিণ-রাঢ় ও বর্ধমান অঞ্চল সপ্তগ্রাম ইক্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুলতানের দরবার কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হত। কৃত্তিবাসের আত্ম-কাহিনীতে সভার মনোরম বিবরণ পাওয়া যায়। সভায় পাত্র, মিত্র, সভাসদ, উজির, আমীররা উপস্থিত থাকতেন। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে ছত্রী উপাধিধারী এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। গুণরাজ খান, মালাধর বসু, কেশব খান প্রভৃতি কর্মচারীরা ছত্রীর পদ অলংকৃত করতেন। সুলতানের চিকিৎসক ছিলেন বৈদ্য জাতীয় হিন্দু; এর উপাধি ছিল অন্তরঙ্গ। সুলতানের সচিব বা Private Secretary ছিলেন দবীর-ই-খাস।

ইক্তাগুলিকে শাসনের সুবিধার জন্য ইকলিমে ও ইক্‌লিমকে মুলুকে ভাগ করা হত। যে শহরে দুর্গ থাকত না তাকে বলা হত 'কসবাহ্', আর দুর্গযুক্ত শহরের নাম ছিল খিট্‌টাহ্। সীমান্ত 'ঘাঁটিকে' থানা বলা হত। রাজস্ব বিভাগের নিম্নস্তরে ছিল মহাল। কয়েকটি মহাল নিয়ে 'শিক' গঠিত হত, শিকের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিল শিকদার। দু'ধরনের রাজস্ব আদায় করা হত। লুণ্ঠন লব্ধ বা গনীমাহ্ ও খরজ্ বা

খাজনা। সুলতান বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের খরজ আদায়ের দায়িত্ব বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ওপর অর্পণ করতেন। হোসেন শাহ্ সপ্তগ্রাম মুলুকের খরজ আদায়ের ভার দিয়েছিলেন হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদারকে। সপ্তগ্রাম মুলুকের জন্য খরজ ধার্য ছিল বিশ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা সুলতানের প্রাপ্য ও বাকী আট লক্ষ আদায়কারীর প্রাপ্য। সে যুগে খরজ ছাড়াও হাটকর, ঘাটকর, পথকর প্রচলিত ছিল।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোগলযুগের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে সুলতানের শাসন কোনদিন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সিংহাসনের অধিকার নিয়ে ষড়যন্ত্র, হত্যা লেগেই থাকতো। পরিবর্তনশীল শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতার সুযোগে ইক্তা, ইকলিম ও মুলুকের স্থানীয় সামন্ত ও জমিদারগণ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে ভুতুরিয়ার শাসনকর্তারা শক্তিশালী হয়ে উঠে দীর্ঘ দিন শাসন করেছিলেন। মল্লভূমির-মল্লরাজ, সামন্তভূমের সামন্তরাজদের মত বর্ধমান জেলার গোপভূমের সদ্গোপরাজ, মঙ্গলকোট, দেবপুর, গোদা প্রভৃতি অঞ্চলের সামন্তরাজগণ আপন আপন অঞ্চল শাসন করতেন। মল্লভূমের রাজধানী ছিল বিষ্ণুপুর, কিন্তু এদের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল সাঁওতাল পরগনার দামিন্-ই-কোণ, মেদিনীপুরের কিয়দংশ, বর্ধমানের কিয়দংশ ও বাঁকুড়া জুড়ে। এই বংশের সামন্তদের মধ্যে আদিমল্ল, জয়মল্ল, কালুমল্ল, বীর হাম্বিরের নাম উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এদের প্রতাপ অব্যাহত ছিল। সামন্তভূমের সামন্তদের রাজধানী ছিল ছাতনায়। বর্ধমান জেলার গোপভূম পরগনার সদ্গোপ রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল ভাল্কী, সুয়াতা, অমরারগড়, কাঁকসা, মঙ্গলকোট, ঢেক্করী ও নীলপুরে। সদ্গোপ রাজাদের মধ্যে ধূর্তঘোষ, বালঘোষ, ধবলঘোষ ছিলেন খুবই প্রতিপত্তিশালী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত এদের প্রতিপত্তি অব্যাহত ছিল। জনশ্রুতি বর্ধমানরাজ চিত্রসেন দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহের এক ফরমান বলে 'গোয়ালাভূম' বা গোপভূম পরগনার অধিকার পেয়েছিলেন। এই মহম্মদ শাহ ছিলেন ঔরঙ্গদেব-পুত্র মোয়াজ্জেম বা প্রথম বাহাদুর শাহের পৌত্র রোশন আখতার (মহাম্মদ শাহ্)। এই গোপভূম পরগনার বিস্তৃতি ছিল দামোদর ও অজয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সেন পাহাড়ী, সেলিমপুর পরগনা, মঙ্গলকোট ও কাটোয়ার দক্ষিণ পর্যন্ত। গোপভূমের সদ্গোপরাজ ঈশ্বর ঘোষের বংশধরগণ সেলিমপুর, ভরতপুর ও কাঁকসায় প্রথমে মোগলদের অধীনে ও পরে বর্ধমানরাজের অধীনে আপন অঞ্চলে শাসনকার্য চালান। কাঁকসার দুর্গ পরে সৈয়দ বোখারী দখল করেন। এঁর বংশধরগণ পরবর্তীকালে বর্ধমান রাজের অধীনে আয়মাদার হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

উনিশ অধ্যায়



মোগল যুগে বর্ধমান

হোসেন শাহী বংশের গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন একরূপ বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করেন। গৌড়ের জলহাওয়ার উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়ে তিনি গৌড়ের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করেন জন্নতাবাদ (স্বর্গীয় নগর); কারণ তাঁর মতে গৌড়-এর অর্থ গোড় বা কবর। তবে এই নাম বেশী দিন চলে নাই। হুমায়ুন বাংলার বিভিন্ন অংশে তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারীদের জায়গীর দান করেন ও যাতে জায়গীরদারগণ তাঁর বিরুদ্ধে মাথা তুলে উঠতে না পারে সে কারণে প্রতি জায়গীরে সৈন্য মোতায়েন রাখেন ও নিজে রাজধানীতে ভোগবিলাসে মত্ত থাকেন। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পান তাঁর ভাই মির্জা হিন্দোল আগ্রায় বিদ্রোহ করেছে, তখন হুমায়ুন জাহাঙ্গীর কুলি বেগকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করে নিজে গৌড় ত্যাগ করেন। চৌসায় শেরখান হুমায়ুনকে·আক্রমণ করেন, হুমায়ুন পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। শেরখান শূর বাংলার দিকে অগ্রসর হয়ে বাংলা দখল করেন ও ফরিদুদ্দীন আবুল মুজাফর শেরশাহ্ নাম নিয়ে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। এক বৎসর গৌড়ে বাস করার পর আবার হুমায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে শেরশাহ হুমায়ুনকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করে দেশ ছাড়া করেন। শেরশাহ্ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। বাংলায় খিজির খাঁ শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে শেরশাহ্ সংবাদ পান যে খিজির খান স্বাধীন সুলতানের মত আচরণ করছেন। তখন তড়িৎ গতিতে পঞ্জাব থেকে গৌড়ে এসে খিজিরকে পদচ্যুত করেন ও ফজিলৎকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বর্ধমান অঞ্চলও তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। পুরাতনচক এলাকায় কালমসজিদের তাঁর প্রশংসাধন্য ৯৫০ হিজিরার (১৫৪৩–'৪৪) শিলালিপি-ই তার সাক্ষ্য বহন করছে। তিনি বর্তমান জি. টি. রোডের কিয়দংশ নির্মাণ করেন। অবশ্য সোনার গাঁ থেকে বর্ধমান পর্যন্ত রাজপথ আগেই নির্মিত হয়েছিল। তিনি আংশিক সংস্কার করান মাত্র এবং রাস্তার পাশে সরাইখানা ও মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন।

শেরশাহের পর তাঁর পুত্র জালালখান সুর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু শেরশাহের পরবর্তী বাদশাহ্‌দের অক্ষমতা ও আত্মকলহ হুমায়ুনকে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের সুযোগ করে দিল। এসময় শেরশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মুবারিজ খান মহম্মদ শাহ্ আদিল (আদিলি) নাম ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর অত্যাচারে আফগানদের আভ্যন্তরীণ কলহ চরমে ওঠে ও আঞ্চলিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকে। এই সুযোগে আফগান মুহম্মদ খান সামসুদ্দিন গাজী নাম নিয়ে বাংলার সুলতান হন ও আরাকান, জৌনপুর দখল করে আগ্রার দিকে অগ্রসর হলে মহম্মদ আদিলের হিন্দু সেনাপতি হিমুর দ্বারা ছাপরাঘাটে আক্রান্ত ও যুদ্ধে নিহত হন। এই বিজয়ের পরে আদিল শাহ, শাহবাজ খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সামসুদ্দীন মুহম্মদ খান গাজীর পুত্র খিজিরখান গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে এলাহাবাদের অদূরে ঝুশির শাসনকর্তা হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন ও বাংলা আক্রমণ করে শাহবাজকে পরাজিত করে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন।

গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ (১ম)-এর সময়ে বর্ধমান জেলার কালনায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। বাহাদুর শাহ-এর মৃত্যুর পর ভ্রাতা জালান শাহ্ গিয়াসুদ্দিন (দ্বিতীয়) নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ৩য় গিয়াসুদ্দিনের রাজত্বকালে আফগানিস্তানের করনানী বংশের তাজখান বাংলা আক্রমণ করেন ও গিয়াসুদ্দিনকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। শুরু হয় করনানী বংশের শাসন। ফলে বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটে।

করনানী বংশের পাঠান জাতির একটি শাখার সর্দার তাজখান তাঁর আদি নিবাস বঙ্গাশে (কুররম্) থেকে দিল্লীতে এসে শেরশাহের প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন। মহম্মদ আদিল শাহের সময় তিনি দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে আসেন ও ভাই ইমাদ সুলেমান ও ইলিয়াসের সঙ্গে মিলিত হন। তারা আরও অগ্রসর হলে আদিলের হিন্দু সেনাপতি হিমু তাদের পরাজিত করেন। তখন তাজ ও হিমু বাংলায় পালিয়ে এসে জাল, জুয়াচুরি, জোরজবরদস্ত করে পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে আধিপত্য বিস্তার করেন।

তাজখান কিছুদিন রাজত্ব করার পর মারা যান ও তাঁর ভাই সুলেমান সিংহাসনে বসেন ও ১৫৬৫ থেকে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি রাজ্যের সীমা দক্ষিণে পুরী, পশ্চিমে শোননদী ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। সুলতান ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ, শক্তিশালী ও নিষ্ঠাবান শাসক। বাংলার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তিনি টান্ডাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁর সময়

দিল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন আকবর। সুলতান আকবরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে ও রাজপ্রতিনিধি খান-ই-জামান ও খান-ই-খানানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে শান্তিতে রাজত্ব চালান। The peace which he was able to enforce on this fertile province rapidly increased his revenue and he devoted his leisure to promoting his subjects' happiness by doing justice (J.S) এই সময়ে প্রতিবেশী রাজ উড়িষ্যার গজপতি বংশীয় পুরুষোত্তমদেব ও প্রতাপরুদ্রদেবের মৃত্যু হয় এবং অমাত্য ও সেনানায়কদের আভ্যন্তরীণ কলহে রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। কথিত আছে প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর সিংহাসনের লোভে প্রতাপরুদ্র ও তাঁর পুত্রদ্বয় কালু-আদেব ও কলাড়ু-আদেবকে হত্যা করে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন ও ভোই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো) রচিত 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' নামক গ্রন্থ থেকে এ তথ্য জানা যায়। কিন্তু ভোইবংশের দুর্বলতার সুযোগে হরিচন্দন মুকুন্দদেব (যিনি তেলিঙ্গ মুকুন্দদেব নামে অধিক পরিচিত) রাজপুত্র রঘুরাম জেনাকে পদচ্যুত করে ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন দখল করেন ও রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। মুকুন্দদেব বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর অভিযান করে সাতগাঁও পর্যন্ত অগ্রসর হন ও গঙ্গার কূলে একটি ঘাট নির্মাণ করান।

সম্রাট আকবর যখন ১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর অভিযানে ব্যস্ত, সেই সময় সুলেমান সুযোগ বুঝে পুত্র বায়াজিদ ও ভূতপূর্ব মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ সিকন্দর উজবকের নেতৃত্বে এক বাহিনী উড়িষ্যায় মুকুন্দরামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুকুন্দরাম ছোট রায় ও রঘুভঞ্জের নেতৃত্বে রায়াজিদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু ছোট রায় ও রঘুভঞ্জই মুকুন্দরামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মুকুন্দরামকে হত্যা করেন ও রঘুভঞ্জ সিংহাসনে বসেন।

সুলেমানের এক সেনাপতি কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে আফগান সৈন্যের এক অশ্বারোহী বাহিনী দ্রুত গতিতে পুরীর দিকে অগ্রসর হয়। কালাপাহাড় পুরী আক্রমণ করে জগন্নাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন ও মূর্তিগুলি টুকরো টুকরো করে নোংরা স্থানে নিক্ষেপ করেন (১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

এই কালাপাহাড়কে নিয়ে অনেক কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। আকবর নামা ও বদায়ুনীর নন্তখৎ-উৎ-তওয়ারিন্ থেকে জানা যায় কালাপাহাড় ছিলেন আফগানী জন্ম-মুসলমান। ডাকনাম ছিল রাজু। এই রাজু নাম থেকেই যত বিপত্তি। কারণ রাজু হিন্দু নামও হতে পারে। (শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের অন্যতম নায়ক ইন্দ্রনাথের ডাকনাম ছিল রাজু)। এই রাজু নাম থেকে কালাপাহাড়কে নিয়ে নানা গালগল্প

গড়ে ওঠে। কথিত আছে রাজুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা হয়। সে সেই চেষ্টা প্রতিহত করার কামনায় সব দেবদেবীর কাছে ধর্না দেয় তাকে বাঁচাবার জন্য, কিন্তু কোন দেবদেবী তাকে রক্ষা না করায় ধর্মান্তরিত হয়ে সে আক্রোশে দেবদেবীকে অস্বীকার করে মূর্তি ভাঙা শুরু করে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য এই, প্রকৃত জন্ম-মুসলমান কালাপাহাড় ইসলাম শাহের রাজত্বকাল থেকে শুরু করে দাউদ করনানীর সময় পর্যন্ত বাংলার সৈন্যবাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন। রাজু ছাড়াও পঞ্চদশ শতকে আর এক কালাপাহাড়ের (২য়) পবিচয় পাওয়া যায়। এই কালাপাহাড় ছিল সিকান্দার শূরের ভাই। শূব সুলতানদের রাজত্বকালে কালাপাহাড় মন্দির ধ্বংসের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও কথিত আছে ১৫৪৭-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ আক্রমণ করে 'হাজো' ও কামাখ্যাদেবীর মন্দির ধ্বংস করে।

১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বায়াজিদ্ সিংহাসনে বসেন কিন্তু তাঁর উদ্ধত আচরণের জন্য তিনি অমাত্য ও আত্মীয়বর্গের মধ্যে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং শেযে অমাত্যদের হাতে বন্দী ও নিহত হন। এরপর সুলেমানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদ সিংহাসনে বসেন। দাউদ ছিলেন উদ্ধত প্রকৃতির, দুশ্চরিত্র ও মদ্যপ; তিনি আকবরের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোযণা করেন। তখন আকবর দাউদকে দমন করার জন্য মুনিম খাঁ-এর নেতৃত্বে বিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। মুনিম খাঁ বিনা বাধায় সুরজগড়, মুঙ্গের, ভাগলপুর অধিকার করে তেলিয়াগেড়ির গিরিপথে এক ব্যূহ রচনা করেন। দাউদ খান--খানান ও ইসমাইল খাঁর নেতৃত্বে এক প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করেন ও মুনিম খান-এর মুখোমুখি হন এবং সাময়িক ভাবে মুনিম-এর আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু মজনুন খাঁ কাকশালের নেতৃত্বে মোগল অশ্বারোহী বাহিনী রাজমহল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে তেলিয়াগেড়ির পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হওয়ায় দাউদ পশ্চাদ্অপসরণ করতে বাধ্য হন। মুনিম খাঁ বিনা বাধায় ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী টান্ডা দখল করেন। দাউদ করনানী সাতগাঁ হয়ে উড়িষ্যা পালিয়ে যান। মুনিম্ও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে বর্ধমানে এসে ঘাঁটি গাড়েন ও এখান থেকে দাউদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন।

এদিকে মাহমুদ খান ও মুহম্মদ খান নামক দুই আফগান নায়ক সেলিমপুর নগর অধিকার করে নেন। ইতিমধ্যে রাজা টোডরমলের নেতৃত্বে এক বিরাট মোগল-বাহিনী মুহম্মদ খানকে নিহত ও মাহমুদ খানকে পরাজিত করে সেলিমপুর অধিকার করেন। এদিকে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ কুলীখান বরলাস সাতগাঁর দিকে অগ্রসর হলে আফগানরা সাতগাঁ ছেড়ে পালিয়ে যায় ও বরলাস বিনা বাধায়

সাতগাঁ দখল করেন। দাউদ এসময় গড়মান্দারণ থেকে ২০ মাইল দূরে দেবরাকসায়ী গ্রামে শিবির ফেলেছিলেন। কিন্তু রাজা টোডরমল গড়মান্দারণে শিবির স্থাপন করেছেন খবর পেয়েই দাঁতনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত হরিপুরের দিকে পশ্চাৎপদসরণ করেন। এদিকে বরসালের মৃত্যুর খবর পেয়ে মুনিম খাঁ বর্ধমান থেকে সৈনবাহিনী নিয়ে রাজা টোডরমলের সঙ্গে যোগ দেন।

দাউদ খান তখন হরিপুরের জঙ্গলে পরিখা পরিবেষ্টিত দুর্গ নির্মাণ করে আত্মরক্ষার পথ খোঁজেন। টোডরমল ও মুনিমখানের যৌথ বাহিনী ঘুরপথে গিয়ে সুবর্ণরেখা তীরে দাঁতনের ৯ মাইল দূরে তুকরোই গ্রামে দাউদকে আক্রমণ করেন। দাউদ প্রথমে কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও শেষে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন ও উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। টোডরমলের বাহিনী তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলে দাউদ আত্মসমর্পণ করেন। তখন টোডরমল তাঁকে উড়িষ্যায় জায়গীর দান করে সমগ্র বাহিনী নিয়ে টান্ডায় ফিরে যান। কিন্তু দাউদ আবার বিদ্রোহ করলে মোগল-বাহিনীর সঙ্গে রাজমহলে তার প্রবল যুদ্ধ হয়। দাউদ পরাজিত ও বন্দী হন; তাঁর মাথা কেটে আকবরের কাছে পাঠান হয়।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদের মৃত্যুর সঙ্গে বাংলা তথা বর্ধমানে আফগান শাসনের অবসান হয় ও মোগল সম্রাটের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও মাঝে মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে জেলার কোথাও কোথাও আফগান সর্দাররা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকে কিন্তু সামগ্রিকভাবে কেউ আর মাথা তুলে উঠতে পারে নাই।

মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলাদেশে একজন সুবাদার নিযুক্ত হন এবং কালনা, মঙ্গলকোট, সপ্তগ্রাম, গড়মান্দারণ ও বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে সেনা বিভাগ স্থাপিত হয়। কালনায় এ সময় দু'টি দুর্গের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বর্ধমানে এখন যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যালয় ও উইমেন্স কলেজ রয়েছে সেখানেও একটি দুর্গ স্থাপিত হয়। এই সমস্ত সেনানিবাসের নিকটবর্তী অঞ্চলে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু অন্যত্র দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। আটশত বৎসর পর বর্ধমানের বুকে আবির্ভাব ঘটে দ্বিতীয় মাৎস্যন্যায়ের।

দাউদখানকে নিহত করার পরে পরপর খান-ই-জাহান ও মুজাফ্ফার খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। উড়িষ্যায় এসময় পাঠান শাসক কৎলু খান সুলেমান করনানীর অনুগতদের সঙ্গে জোট বেঁধে শক্তি বৃদ্ধি করেন ও মেদিনীপুর, হুগলী, বাঁকুড়া অধিকার করে বর্ধমানে এসে ঘাঁটি গাড়েন ও এখান থেকে বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন। মুজাফ্ফার খানের মৃত্যুর পর ১৫৮০-৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসর বাংলাদেশ আকবরের ভ্রাতা মীর্জা হাকিমের সমর্থক

বিদ্রোহী সেনাধ্যক্ষের অধিকারে ছিল। এরপর ১৫৮৩ অব্দে খান্-ই-আজম— মীর্জা-আজিজ কোকাহ্ ও অস্থায়ীভাবে ওয়াজির খান সুবেদারী চালান।

কিন্তু কৎলু খানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ওয়াজির খানকে সরিয়ে শাহবাজ খানকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পাঠানদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে—তাদেরই একটা দল বর্ধমান ও হুগলীতে লুণ্ঠন কার্য চালায় ও টাণ্ডার দিকে অগ্রসর হয়। তখন শাহবাজ একদল সৈন্য নিয়ে টাণ্ডা থেকে তাড়া দিলে তারা অজয় নদী পার হয়ে মঙ্গলকোট চলে আসে। পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে মোগল সৈন্য প্রথমে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নাই। পরে টাণ্ডা থেকে আরও সৈন্য এসে শাহবাজের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় মোগল-বাহিনী পাঠানদের মঙ্গলকোট থেকে বিতাড়িত করে মঙ্গলকোটের মাটির দুর্গ দখল করে। কৎলু খান উড়িষ্যায় ফিরে যান ও সেখানেই নিরুপদ্রবে রাজত্ব করতে থাকেন। রণক্লান্ত মোগল-বাহিনী বর্ধমানে আশ্রয় নেন।

১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সুবার শাসন সংক্রান্ত কিছু সংস্কার করা হয়। শাসনকার্য কতকগুলি বিভাগে ভাগ করা হলো ও প্রত্যেক বিভাগে এক একজন কর্মচারীর ওপর প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়। সর্বোপরি থাকেন সুবাদার; তাঁর অধীনে রাজস্ব বিভাগে দেওয়ান, সৈন্য বিভাগে বক্সী, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের দায়িত্বে থাকেন কাজী, নগররক্ষা বিভাগে কোতোয়াল নিযুক্ত হন।

সরিফাবাদ পরগনা, মান্দারণ, সাতগাঁয়ের অংশ ও সেলিমাবাদের অংশ নিয়ে সৃষ্ট হয় বর্ধমান জেলা। নতুন ব্যবস্থা অনুসারে ওয়াজির খান প্রথম সিপাহ্-শালার (পরে সুবাদার নামে অভিহিত) নিযুক্ত হন। কিন্তু এক বৎসর মধ্যে তাঁর মৃত্যু হলে সৈয়দ খান সুবেদার নিযুক্ত হন ও ১৫৮৭ থেকে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য চালান। সৈয়দ খানের সাত বৎসর শাসনকালে আবার পাঠান ও জমিদারগণ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তখন ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করে পাঠান হয়।

বাংলার জলবায়ু মানসিংহের সহ্য না হওয়ায় তিনি সৈয়দ খানকে টান্ডায় ডেপুটি হিসেবে নিযুক্ত করে নিজে বিহারে ঘাঁটি গাড়েন। ইতিমধ্যে উড়িষ্যার কৎলু খান কলকাতার অদূরে জাহানাবাদ সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ শুরু করেন। মানসিংহ তাঁর পুত্র জগৎসিংহকে কৎলুকে দমন করতে পাঠান। কিন্তু জগৎসিংহ কৎলুর হাতে বন্দী হন। ইতিমধ্যে কৎলুর মৃত্যু হলে আফগানরা জগৎসিংহকে ছেড়ে দেন ও মানসিংহের সঙ্গে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্তানুসারে আফগানদের উড়িষ্যা ছেড়ে দেওয়া হয়; তবে আফগানদের সম্রাট আকবরের নামে মুদ্রা প্রকাশ করতে হবে ও জগন্নাথ মন্দিরের ওপর আধিপত্য

ত্যাগ করতে হবে। মানসিংহের শাসনকালে সরিফাবাদ. সেলিমাবাদ ও মান্দারণ পরগনায় অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বর্ধমান জেলায় মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ও শান্তি বজায় থাকে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কিন্তু অন্য কথা বলে। রাজনৈতিক দিক থেকে যুদ্ধবিগ্রহ বা আফগানদের বিদ্রোহের আশঙ্কা হয় তো কিছুটা কমে ছিল। কিন্তু এক এক পরগনায় সরকার, পোদ্দার, ডিহিদারদের অত্যাচারে জনজীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

সহর সেলিমাবাদ তাহাতে সজ্জনরাজ
নিবসে নেউগি গোপীনাথ
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
মিরাস (নিবাস?) পুরুষছয় সাত।
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে লোলভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল মহীপ
অধর্মী রাজারকালে প্রজার পাপের ফলে
খিলাত পাইল মামুদ সরিপ।
উজির হইল রায় জাদা বেপারি বৈশ্যের খদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল ঐরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনের কাঠায় কুড়া
নাঞি মানে প্রজার গোহারি।
সরকার হইল কাল খেলভূমি লিখে নাল
বিনি উব্‌গারে খায় ধুতি।
জোতদার হইল যম টাকায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য খায় দিন প্রতি।
ডিহিদার আবুদ খোজ টাকা দিলে নাঞি রোজ
ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইল বন্দি
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।

মুকুন্দরামকে বিশ্বাস করতে হলে মানসিংহের সুবাদারির কালে জমিদার ছিল গোপীনাথ। সম্ভবত রাজস্ব ঠিকমত জমা দিতে না পারায় তাকে বন্দী করে রাখা হয়। প্রজাকে জমি বন্দোবস্ত কালে এমনভাবে জমি জরীপ করা হত যাতে ২০ কাঠার জায়গায় ১৫ কাঠায় এক বিঘা হয় আর অনাবাদী বা ডাঙ্গা জমিকে আবাদী

জমি বলে বিলি করা হত। জোতদারের কাছে টাকা কর্জ কবতে গেলে এক টাকার স্থলে সাড়ে তেরআনা দেওয়া হত ও সুদ দৈনিক এক পযসা অর্থাৎ এক টাকার সুদ বৎসবে পাঁচ টাকা দশ আনা বা ৫.৬২টা। সমসাময়িক রূপরামের ধর্মমঙ্গলেও জমিদার ও সিপাহীদের অত্যাচাবের বিবরণ পাওয়া যায়।

আকবরের শাসনকালে গিয়াসবেগ নামে এক তাতার দেশীয় মুসলমান তাঁর স্ত্রী, সদ্যোজাতা সুলক্ষণা ও অসামান্যা রূপবতী কন্যাকে নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আসেন এবং তাঁর আত্মীয় আসফখানেব চেষ্টায় সম্রাট আকবরের মনসবদার ও পরে গৃহ-অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হঠাৎ একদিন শাহজাদা সেলিম গিয়াসবেগের গৃহে তার রূপবতী কন্যা মেহেরুন্নিসাকে দেখে তার রূপমুগ্ধ হন ও তাঁকে বিবাহ করতে আগ্রহী হন। কিন্তু সম্রাট তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে শের আফগানের সঙ্গে মেহেরুন্নিসার বিবাহ দেন।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবব সম্রাট আকবরের মৃত্যু হয ও ৩রা নভেম্বর সেলিম নুরুদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীব নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। এই সময় শের আফগান বর্ধমানের জায়গীরদার বা ফৌজদার ছিলেন। শেব আফগান সপরিবারে বর্ধমানেই বসতি করেন। বাংলার সুবাদার মেহেরুন্নিসাকে লাভ করার বাধা হতে পারেন ভেবে জাহাঙ্গীর বাংলাদেশ থেকে মানসিংহকে সরিয়ে তাঁর ধাতৃভ্রাতা (Foster Brother) কুতুবুদ্দিন খান কোকাকে বাংলাব সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। কুতুবুদ্দিন বর্ধমানে শিবির স্থাপন করে, শের আফগানকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আদেশ দেন।

জাহাঙ্গীর বুঝেছিলেন শের আফগানকে পৃথিবী থেকে না সরাতে পারলে মেহেরুন্নিসাকে লাভ করা যাবে না। এর আগেও জাহাঙ্গীর একাধিকবার শের আফগানকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন কিন্তু শের আফগানের বীরত্বের কাছে সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। অধ্যাপক ব্লক-ম্যানের মতে কুতুবুদ্দিন ও শের আফগানের সাক্ষাৎকার বর্ধমান রেল স্টেশনের পূর্বে গঞ্জ-ই-শহীদ্দান-এ (বর্তমানের সাধনপুরে) অনুষ্ঠিত হয়। শের আফগান পূর্ব থেকেই কুতুবুদ্দিনের ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত ছিলেন; কাজেই তিনি দুজন অনুচর নিয়ে কুতুবের শিবিরে যান। কিন্তু শের আফগান কুতুবের শিবিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কুতুব শের আফগানকে আক্রমণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে শের আফগান বীর বিক্রমে কুতুবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কুতুবুদ্দিন কোকাকে হত্যা করেন। কিন্তু তিনি নিজেও পরিত্রাণ পান নাই। সুবাদারেব অম্বা খাঁ নামক এক কাশ্মীরী সেনাপতি অতর্কিতে শের আফগানকে আক্রমণ করেন ও যুদ্ধে শের নিহত হন। এরপর নূরজাহান দিল্লীতে

মুঘল হারেমে প্রেরিত হন। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী তাঁর 'বর্ধমান—ইতিহাস ও সংস্কৃতি (২য় খণ্ড)' গ্রন্থে জাহানাবাদের তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গৌরদাস বসাকের ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে একটি Notes-এর উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে মন্তব্য করেছেন যে বারা খাঁ নামক সুবাদারের একজন অন্যতম সহকারী মেহেরুন্নিসাকে আগ্রায় প্রেরণের সাহায্য করার জন্য জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে সুলেমাবাদের রাজস্ব আদায়ের ভার পান। কিন্তু এই তথ্যের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে বারা খাঁ সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিকর বিবরণ পাওয়া যায়—সে আলোচনা পরে করা যাবে।

যাই হোক মেহেরুন্নিসা দিল্লীর হারেমে কয়েক বৎসর অবস্থান করার পর জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ও মেহেরুন্নিসা নূরজাহান নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হন। ক্রমশ তিনি সমস্ত শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করে Defacto সম্রাজ্ঞী হয়ে ওঠেন। শের আফগান ও কুতুবদ্দিনের মৃতদেহ পীরবাহারামে সমাধিস্থ করা হয়। ময়ূরমহলের পাশে এই সমাধিক্ষেত্র বর্ধমানের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে উঠেছে।

কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর কুলীবেগ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয় ও তাঁর স্থলে ইসলাম খাঁ সুবাদার হয়ে মানসিংহের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে মনোনিবেশ করেন। তাঁর পাঁচ বৎসর শাসনকালে এদেশে মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য মোগল সম্রাটের ক্ষমতা এই সময়ে রাজধানীসহ কয়েকটি সৈন্যের ঘাঁটি ও তার চতুর্দিকে বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ঘন ঘন সুবাদার বদলের ফলে, ছোট বড় জমিদার ও পাঠান নায়করা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। তাছাড়া সেবাষ্টিন গঞ্জেলো নামক এক পর্তুগীজ নায়কের নেতৃত্বে সন্দীপে পর্তুগীজরা খুবই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে ও আরাকানদের সঙ্গে চক্রান্ত করে বাংলা আক্রমণের চক্রান্ত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম খাঁ রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এ ছাড়া উড়িষ্যাতেও আফগান-শাসক ওসমান খানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ইসলাম ওসমানের বিরুদ্ধে সুজিতখানের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। ওসমান পরাজিত হন ও আফগান অত্যাচার স্থায়ীভাবে দমিত হয়। ইতিমধ্যে ইসলাম খান চিস্তীর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই কাশিম খান চিস্তী বাংলার সুবাদার হন (১৬১৪–১৭) ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে। এ-সময় বর্ধমানের ফৌজদার ছিলেন ইফ্‌তিখর খান। তাঁর সময়ে হিজলী, মেদিনীপুর ও চন্দ্রকোণার জমিদারগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তখন ইফ্‌তিখর তাঁর পুত্র মির্জা মাক্কির নেতৃত্বে এক বাহিনী পাঠিয়ে তাদের দমন করতে পাঠান। কিন্তু তিনি এদের বিরুদ্ধে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নাই। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে

মির্জা মাক্কি বর্ধমান ও রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং বীরভূম ও চন্দ্রকোণার জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন।

এদিকে সুবাদার কাশিম খান নিম্নবঙ্গে পর্তুগীজ ও আরাকানদের অত্যাচার বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁকে সরিয়ে নূরজাহানের আত্মীয় ফতেহ্-ই-জঙ্গ ইব্রাহিম খানকে বাংলার সুবাদার করে পাঠানো হল। বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত হন নূরজাহানের আর এক আত্মীয় মহম্মদ বেগ অবকাশ। তাঁর সময়ে হিজলীর ফৌজদার বিদ্রোহী হলে মহম্মদ বেগ বর্ধমান হতে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে হিজলীর ফৌজদার বাহাদুর খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালান। বাহাদুর পরাজিত হন ও তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন। ধীরে ধীরে দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের শাসনের ক্ষেত্রে বর্ধমানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নূরজাহান জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র খুরমের (যিনি পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান নামে সিংহাসনে বসেন) ক্ষমতা খর্ব করলে খুরম বিদ্রোহী হন। খুরম তখন ছিলেন দাক্ষিণাত্যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাপ্তী পার হয়ে উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হন। উড়িষ্যার শাসনকর্তা ছিলেন মির্জা আহম্মদ বেগ খান। খুরমের আক্রমণের সংবাদ পেয়েই আহমদ বর্ধমানে পালিয়ে আসেন ও সেখান থেকে রাজমহলে গিয়ে আশ্রয় নেন। খুরম একরূপ বিনা বাধায় উড়িষ্যা দখল করেন। বাংলার সুবাদার ফতে-ই-জঙ্গ ইব্রাহিম খাঁ তাঁকে দমন করার কোন প্রচেষ্টাই করেন নাই। বর্ধমানের ফৌজদার তখন মির্জা শালে; তিনি খুরমের আক্রমণ প্রতিহত করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন কিন্তু খুরমের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন নাই। তখন বৈরাম বেগ বর্ধমানের জায়গীরদার নিযুক্ত হয়ে আসেন। এসময় হুগলীর পর্তুগীজ গভর্নর ছিলেন মাইকেল রেড্রিগুয়েজ। খুরম তাঁর কাছে কিছু কামান ও ইউরোপীয় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে দূত পাঠান। কিন্তু রেড্রিগুয়েজ খুরমকে সাহায্য করে মোগল সম্রাটের বিরাগ ভাজন হতে চান নাই। খুরম তখন মঙ্গলকোটে কিছুদিন অবস্থান করে শক্তি সংহত করে রাজমহলের দিকে অগ্রসর হন। বাংলার সুবাদার ইব্রাহিমের সৈন্যগণ তখন বাংলার চারিদিকে রাজস্ব সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। যাই হোক খুরমের রাজমহল থেকে অভিযান করার সংবাদ পেয়ে ইব্রাহিম সৈন্য সংহত করে খুরমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন ও তাঁকে গঙ্গা অতিক্রম করতে বাধ্য করেন। খুরম স্থানীয় জমিদার ও আফগান সর্দারদের সহযোগিতায় কিছু নৌকা যোগাড় করে গঙ্গা পার হয়ে ইব্রাহিমের মুখোমুখি হন। যুদ্ধে ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হন। খুরমের প্রভুত্ব সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদার, জায়গীরদার ও ফৌজদার তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন।

বাংলাদেশে খুরমের বিদ্রোহের খবর পেয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহজাদা পারভেজ ও সেনাপতি মহব্বৎখাঁর নেতৃত্বে ৪০,০০০ সৈন্যর এক বিরাট বাহিনী খুরমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সংবাদ পেয়েই খুরম বর্ধমানে ফিরে আসেন ও এখানে কয়েক মাস অবস্থান করার পর আবার দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হন। খুরম যখন মঙ্গলকোটে অবস্থান করছিলেন তখন সেখানকার এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি দানিশমন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ও খুরম তাঁর গুণমুগ্ধ হন। পরবর্তীকালে দানিশ সম্ভবত শাহজাহানের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে মঙ্গলকোটে হিজরী ১০৬৫ সনে (১৬৫৪–৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

খুরম বাংলাদেশ ত্যাগ করলে মহাব্বৎ খাঁ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর পুত্র খানেজাদ খানকে তাঁর ডেপুটি নিযুক্ত করেন। মহাব্বৎ খাঁর মৃত্যুর পর মুকাররম খান ও ফেদাই খান পর পর বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে খুরম শাহজাহান নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন ও কাশিমখান বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন।

শাহজাহান সম্রাট হয়েই কাশিমখানকে হুগলীর পর্তুগীজদের দমন করার জন্য কড়া নির্দেশ দেন। শুধু হুগলীতেই নয় চট্টগ্রাম ও বাংলার উপকূলে পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কাশিম হুগলী থেকে পর্তুগীজদের উৎখাত করার জন্য বিরাট প্রস্তুতি নেন। এমন সময় হিজলীর জমিদার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কাশিমখান বর্ধমান থেকে আর একটি বাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। গঙ্গার মুখ বন্ধ করার জন্য শ্রীপুর থেকে এক নৌবাহিনী প্রেরিত হয়। মুকসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) থেকে আর এক বাহিনী এসে বর্ধমান বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই যৌথ বাহিনী সহজেই পর্তুগীজদের পরাজিত করে হুগলী দখল করতে সমর্থ হন। পর্তুগীজগণ তাদের কতকগুলি যুদ্ধজাহাজে অগ্নি সংযোগ করে পালিয়ে যায়, বাকী কতকগুলি জাহাজ মোগল-বাহিনীর অধিকারে আসে। ৪০০০ পর্তুগীজকে বন্দী করে আগ্রায় প্রেরণ করা হয়। এদের কতক ইসলামধর্ম গ্রহণ করে মুক্তি পায়, আর যে সমস্ত পর্তুগীজ ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাদেরকে হত্যা করা হয়। হুগলী বন্দর বাংলার বন্দর রূপে গড়ে ওঠে।

কাশিমখান-এর মৃত্যুর পর আজমখান মীর মুহম্মদ বক ও ইসলাম খান মাশাদী পর পর বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। এদের সময় বাংলার কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা জানা যায় না। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা-শুজা-বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হয়ে আসেন। শুজা প্রথমেই রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। শুজার বয়স ও অভিজ্ঞতা দুই-ই ছিল অল্প।

সেকারণে সম্রাট তাঁর শ্বশুর ও সভাসদ আজিমখানকে শুজার পরামর্শদাতা রূপে প্রেরণ করেন। শুজা তাঁকে তাঁর ডেপুটি সুবাদার হিসেবে ঢাকায় প্রেরণ করেন। তাঁর শাসনকালে শাহজাহানের সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) পর্যন্ত বাংলায় মোটামুটি শান্তি বজায় ছিল। এই ৭৯ বৎসরের মধ্যে বাংলায় তিনজন সুবেদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—মহম্মদ শুজা (১৬৩৯–৫৯), শায়েস্তা খান (১৬৬৪–৬৮) ও ঔরঙ্গজেবের পৌত্র শাহজাদা আজিমুদ্দিন [পরে যিনি আজিম-উস-শান নামে পরিচিত হন (১৬৯৭–১৭১২)]।

এযুগের ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস। শুজার সুদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ শাসনের ফলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়। শুজার শাসনকালে বর্ধমান অঞ্চলে যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্মমঙ্গলেও তার উল্লেখ করেছেন।

রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা
পরম কল্যাণে যত আছিল (সে) প্রজা
বর্ধমানে যবে ছিল খালিপে হাকিম
(তার) পরাজয় হইল দক্ষিণে মহিম।

এবিষয়ে আচার্য যদুনাথ সরকারের মন্তব্য বেশ উপভোগ্য—'During Shuja's viceroyalty Bengal had the dubious happiness of living a country without a history, if history has been rightly defined by its greatest master in the modern world as "little more than the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind". (Gibbon Ch. 3)

পূর্বে বলা হয়েছে যে শাহজাহান সম্রাট হয়েই হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করেছিলেন ও হুগলীকে মোগলদের বন্দর রূপে গড়ে তুলেছিলেন। শুজার সুবাদারীর কালে বাংলায় এমন কিছু আকস্মিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেছিল, বর্ধমানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে যার ফল সুদূর প্রসারী হয়েছিল। রাজমহলে আসার আগে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শুজার কন্যার বস্ত্রে আগুন ধরে যাওয়ায় শাহজাদা-কন্যা ভীষণভাবে অগ্নিদগ্ধা হন। তখন সুরাট থেকে Hopwell জাহাজের ইংরেজ সার্জেন Dr. Gabriel Boughton-এর মোগল দরবারে ডাক পড়ে।

Dr. Gabriel-এর চিকিৎসায় শাহাজাদী সুস্থ হন। আর এর পুরস্কার স্বরূপ গাব্রিয়েল বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের ফরমান লাভ করেন। পর বৎসর শুজা রাজমহলে সুবাদার হয়ে এলে এখানেও গাব্রিয়েল শুজার হারেমের এক মহিলার কঠিন অসুখ সারিয়ে তোলেন; ফলে শুজার বদান্যতায় ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে

ইংরেজ কোম্পানীর হুগলীতে ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয় ও কোম্পানীর বাংলা লুঠের পথ প্রশস্ত হয়। ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন লাভের পর বাংলায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের ফলাও কারবার শুরু হয়ে যায় ও ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা থেকে কোম্পানীর রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৫০,০০০ পাউন্ড মূল্যমানে দাঁড়ায়। পর বৎসর এই রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৩০,০০০ পাউন্ড। শাহজাদা শুজার শাসনকালে সম্রাট শাহজাহানের সময়েই বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত লাহোর শহরের কৌটলীমহল্যার ভাগ্যান্বেষী ছেত্রী তৎকালে বৈকুণ্ঠপুরে অবস্থানরত সঙ্গম রায়ের পৌত্র আবু রায়, সম্রাট শাহজাহানের সৈন্যদল ঢাকা যাবার পথে খাদ্য ও রসদের অভাবে বর্ধমান অবস্থান করতে বাধ্য হলে, সৈন্যদিগকে খাদ্য ও রসদ সরবরাহ করে তাদের ঢাকা যাবার পথ সুগম করে দেন। ফলে শাহজাহানের ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফরমান বলে আবু রায় বাৎসরিক ৫৩২ টাকায় (সিক্কায়) বর্ধমান শহরের পশ্চিম প্রান্তে রেকাবি বাজার, মোগলটুলি ও ইব্রাহিমপুরের রাজস্ব আদায়ের অধিকারসহ চৌধুরী ও নগর কোতয়ালের পদ লাভ করেন।

আবু রায়ই বর্ধমান রাজবংশের প্রথম পুরুষ, যিনি এই পদ লাভ করে সামান্য খাদ্যশস্য ও টাকা লেনদেনের ব্যবসায়ী হয়ে ছেত্রী বংশকে রাজবংশে উন্নীত হবার পথ প্রশস্ত করেন। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিযোগে শুজা নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর মীরজুমলা বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হয়ে আসেন। মীরজুমলার মৃত্যুর পর শায়েস্তা খান বাংলার সুবেদার হন (১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে)। মাঝখানে ১ বৎসর বাদ দিলে শায়েস্তা ২২ বৎসর কাল বাংলার সুবেদারী পদে আসীন ছিলেন।

আকবরের সময় থেকেই বাংলায় বার-ভূঁইঞাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন কি তাদের মধ্যে বিদ্রোহও শুরু হয়ে যায়। মানসিংহ অনেক চেষ্টা করে তাদেরকে কিছুটা দমন করেন। কিন্তু সুযোগ ও সুবিধা পেলেই তারা আবার মাথা তুলে উঠে বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন। ভূঁইঞাদের মধ্যে মুশা খান ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। ভূষণার সত্রাজিৎ, যশোরের প্রতাপাদিত্য, বাখরগঞ্জের রামচন্দ্র, ভুলুয়ার অনন্ত মানিক্য—এই সমস্ত ভূঁইঞাদের বিদ্রোহের ফলে বাংলার আকাশ হয়ে উঠেছিল দুর্যোগপূর্ণ। এছাড়া বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তের রাজমহল থেকে ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ মোগলরাজশক্তির বিরুদ্ধবাদী নায়কদের অধীনে ছিল। মল্লভূম ও বাঁকুড়ার বীর হাম্বির, হিজলীর সেলিম খান, পাঁচেতে শামস্ খান—এঁরা মুখে বশ্যতা স্বীকার করলেও কার্যকালে সুবাদারের ডাক অগ্রাহ্য করার সাহস রাখতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দিল্লী থেকে বিশাল মোগলবাহিনী

ভূঁইঞা ও নায়কদের দমন করার জন্য বাংলায় প্রেরিত হয়। এই বাহিনী ঢাকা যাবার পথে বর্ধমানে ছাউনী ফেলে। কিন্তু ছাউনীতে এসময় প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তখনই তেজারতী কারবারী আবু রায় তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও রসদ সরবরাহ করেন আর এরই বিনিময়ে সম্রাটের সুনজরে পড়ে। ফলে খাদ্য-ব্যবসায়ী থেকে ঘটে রাজবংশে উত্তরণ।

আবু রায় তখন বৈকুণ্ঠপুর থেকে উঠে এসে বর্ধমানের পশ্চিম প্রান্তে কাঞ্চননগরে গৃহ নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশই একদিন সমগ্র বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ জমিদারে পরিণত হয়ে এদেশের ভূমি ব্যবস্থায় ও জেলার শাসন পরিচালনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এর বিশদ বিবরণ পরের অধ্যায়ে।

শায়েস্তা খানের পর ঔরঙ্গজেবের ধাত্রীপুত্র অপদার্থ খান-ই-জাহান বাহাদুর বাংলার সুবেদার হয়ে হলেন। এক বৎসরের মধ্যেই অপদার্থতার দায়ে তিনি পদচ্যুত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ইব্রাহিম খান। ইব্রাহিমের সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটালের চন্দ্রকোণা বিভাগের চিতুয়া বরোদার জমিদার শোভা সিংহের বিদ্রোহ। এসময় বর্ধমান চাকলার রাজস্ব আদায়কারী জমিদার ছিলেন আবু রায়ের প্রপৌত্র কৃষ্ণরাম রায়। শোভা সিংহ পার্শ্ববর্তী স্থানে ব্যাপক ভাবে লুঠতরাজ শুরু করেন। শোভা সিংহ কলকাতার উপকণ্ঠ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ বণিকরা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ছুটে আসেন বর্ধমানে ইব্রাহিম খানের কাছে। ইব্রাহিম খান তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা যেমন করে পারে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। ইংরেজরা ছুটল কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ করতে। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের সূচনার সাক্ষী হয়ে রইল বর্ধমান। শোভা সিংহের সঙ্গে যোগ দেন বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ, চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ ও উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খান। এঁদের আক্রমণে গঙ্গার তীরবর্তী ১৮০ মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড শোভা সিংহের হস্তগত হয়।

কৃষ্ণরাম শোভা সিংহের শক্তির গুরুত্ব না বুঝে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে শোভা সিংহের আক্রমণ প্রতিহত করতে অগ্রসর হন ও দামোদর নদীর তীরে মূলকাটি নামক স্থানে যুদ্ধ করে শোভা সিংহের হস্তে নিহত হন (জানুয়ারী ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে)। শোভা সিংহ বর্ধমান দখল করেন। এরপর তিনি রাজপ্রাসাদে ঢুকে কৃষ্ণরামের মহিষী ও রাজকন্যাদের বন্দী করে তাদের সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করলে তাঁরা সম্মান রক্ষার্থে জহর ব্রত পালন করে আত্মঘাতিনী হন। রাজকুমারী সত্যবতীর ছুরিকাঘাতে শোভা সিংহ নিহত হন।

শোভা সিংহের মৃত্যুর পর রহিম খান রহিম শাহ নাম নিয়ে বর্ধমানের সিংহাসনে বসেন ও শোভা সিংহের অধিকৃত গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেন। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম কোন রকমে আত্মরক্ষা করে ঢাকায় পলায়ন করেন ও নবাব-সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই সংবাদ পেয়েই নিজের পৌত্র আজিম-উস-শানকে বাংলার সুবেদার করে পাঠালেন ও জগৎরামকে সাহায্য করার নির্দেশ দিলেন।

আজিম-উস-শান পাটনায় পৌঁছিয়েই সংবাদ পেলেন যে, ইব্রাহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খান বিদ্রোহীদের প্রায় দমন করে এনেছেন। আজিম অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে জবরদস্ত খানকে আর না অগ্রসর হতে পরামর্শ দেন। জবরদস্ত খান সুবেদারের মনোগত বাসনা বুঝতে পেরে তাঁর পদে ইস্তফা দেন।

জবরদস্ত খান পদত্যাগ করার পর জেলার বিদ্রোহীরা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে ও বর্ধমানের কয়েক মাইল দূরে শিবির স্থাপন করে হুগলী, নদীয়া অঞ্চলেও লুঠতরাজ চালান। এই বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ছিলেন রহিম শাহ্। আজিম-উস-শান তখন আমোদপ্রমোদে মশগুল ছিলেন। শহরের নিকটে রহিম শাহের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে তাঁর চৈতন্যোদয় হয়। কিন্তু শাহজাদা রহিম শাহের বিদ্রোহ দমনে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে তাঁকে ভর্ৎসনা করে এক পত্র পাঠান ও জানিয়ে দেন যে তিনি আত্মসমর্পণ করলে তাঁর সব অপরাধ মার্জনা করা হবে। কূটকৌশলী রহিম এক চাল চাললেন। তিনি সুবেদারকে জানিয়ে দিলেন তিনি যদি তাঁর প্রধান উজিরকে তাঁর শিবিরে পাঠিয়ে দেন, তা হলে তার সঙ্গে আলোচনা করে সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করবেন। নির্বোধ শাহজাদা রহিম শাহের কৌশল বুঝতে না পেরে কিছু সৈন্যসহ তাঁর প্রধান উজির খাজা আনোয়ারকে রহিমের নিকট প্রেরণ করলেন। খাজা আনোয়ার রহিমের শিবির দ্বারে পৌছিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনার কোন আয়োজন নাই দেখে, রহিমের আমন্ত্রণ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হন ও সৈন্যসহ বর্ধমান দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। রহিম শাহ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাহিনী নিয়ে আনোয়ারের পশ্চাদ্ধাবন করেন। আনোয়ার তাঁর স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেন। কিন্তু রহিমের বিরাট বাহিনীর কাছে তিনি পর্যুদস্ত হন ও রহিমের বিরাট বাহিনী তাঁকে হত্যা করে। খাজা আনোয়ারের মৃতদেহ বর্ধমান শহর থেকে ২ মাইল দূরে পোদ্দারহাট মৌজায় সমাধিস্থ করা হয়; আনোয়ারকে শহীদের সম্মান দেওয়া হয়। পোদ্দারহাটের নাম হয় খাজা আনোয়ার বেড়। সম্রাট ফারুকশিয়ার আনোয়ারের সমাধিক্ষেত্রে প্রায় ১০ বিঘা জমির ওপর বিশাল সমাধিক্ষেত্র নির্মাণ করিয়ে দেন।

খাজা আনোয়ারকে হত্যার পরই রহিম শাহ্ শাহজাদার শিবিরের দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হন। শাহাজাদা তাঁকে বন্দী করতেন। কিন্তু শাহজাদার হামিদ খান কুরেশী নামক এক আরব কর্মচারী রহিমকে শাহজাদার শিবিরে প্রবেশ করবার সুযোগ না দিয়ে স্বয়ং তাঁর সম্মুখীন হন ও নিজেকে শাহ্জাদা রূপে পরিচয় দিয়ে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। হামিদের অতর্কিত আক্রমণে রহিম নিহত হন। তাঁর সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁরা আত্মসমর্পণ করে ও শান্তি স্থাপিত হয়।

আজিম-উস-শান এরপর নিহত কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরামকে তাঁর পিতার পদে অধিষ্ঠিত করেন। হামিদ খান কুরেশী বুন্দশীল ও শিলেহ-এর ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং তাঁকে শামসের খান বাহাদুর উপাধি দানের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমোদন করা হয়। শাহজাদা বর্ধমানে একটি মসজিদ নির্মাণ করান ও আমজনতার মধ্যে খয়রাতি বিতরণ করেন।

এরপর আজিম-উস-শান অর্থনৈতিক সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। হুগলী বন্দরের রপ্তানী দ্রব্যের ওপর মুসলমানদের ২.৫ শতাংশ, হিন্দুদের ৫ শতাংশ ও খ্রীষ্টানদের ৩.৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেন ও অন্তর্বাণিজ্যের ওপর 'সৈর' নামক শুল্ক স্থাপন করেন। রপ্তানী বাণিজ্যের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি করার ফলে ইংরেজ বণিকদের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কারণ পূর্বের ফরমান অনুসারে তারা বাৎসরিক একটা নির্দিষ্ট থোক শুল্কের পরিবর্তে হুগলী বন্দর থেকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েছিল।

১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বর্ধমান শহরেই বর্তমান কলকাতা শহরের জন্ম ও পরিকল্পনা রচিত হয়। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুবাদার আজিম-উস-শানের কাছ থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাত্র ১৬০০০ টাকার বিনিময়ে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় করেন। এ বিষয়ে সাংবাদিক যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গ অভিধানে লিখেছেন, 'কোলকাতা শহর পত্তনের দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ আগষ্ট ধরা হয়। কারণ ঐদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জব চার্নক কোলকাতার মাটিতে পা দেন। কুঠি স্থাপনের জন্য হুগলী নদীর পূর্ব তীরে কোলকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি গ্রাম তিনটি বেহালা বড়িষার জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরীর কাছ থেকে মাত্র ১৩০০ টাকা দিয়ে নেন।' Encyclopaedia Britanica 9th Edn. (1890) এর volume 4, p.656-তে দেখা যায়; In 1689-90 the Bengal Servants of the East India company determined to make it their head quarters. In 1696

they built the original Fort William and in 1700 they formally purchased the three villages of Sutanuti, Govindapur and Calcutta from prince Azim, son of Emperor Aurangazeb.

উভয় তথ্যই সম্পূর্ণ সত্য নয়, অর্ধ সত্য মাত্র। The Statesman পত্রিকার ২৪শে এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখের সংস্করণে প্রথম পৃষ্ঠায় কলকাতা ক্রয়ের যে বিবরণ ও দলিল-এর photo copy প্রকাশিত হয়েছে সেটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Cal. April 19 (1998). Job Charnock could not build Calcutta, he died seven years before the East India Co. bought the land from a Sabarna Roy Chowdhury, Zamimdar. Popular belief has it that Charanock bought three villages, Sutanuti, Govindapur and Kalikata in 1690 on behalf of the company and founded the city.

But a photocopy of the sale deed received last December by descendants of the Zamindar shows that deal was signed on 10 November, 1698. Charnock had died on 10 January 1692...The agent who signed the document written in persian on the company's behalf was Charnock's son-in-law, Sir Charles Eyre. The deed reads "We conjointly have sold and made a true and legal conveyance of the village Dihi Kalkatah and Sutanuti within the Jurisdiction of Parganah Amirabad and village Govindapur under the jurisdiction of parganas Paegan and Kalikatah to the English company with rents and uncultivated land and ponds and groves and rights over fishing and woodlands and dues from residents, artisans together with lands appertaining there, to be bounded by the accustomed notorious and usual boundaries the same being owned and possessed by us for the sum of one thousand and three hundred rupees coin of this time". The four Sabarna Roy Choudhury singatories were Ramchanda, Mohandeb, Pran and Rambhadra. Documents of the family's present home in Barisha say that Mohandeb was then 19 and Rambhadra two. The law needed them to be at least 21.

...Family records say the Roychoudhuries had turned down the company when it first approached them, with an offer to buy three villages. The company then moved Mughal Emperor in Delhi and after paying a nazarana of Rs. 16000 got permission (Farman) to buy the land.

এই সময় শাহজাদা আজিমুদ্দিন বর্ধমান শিবিরে অবস্থান করছিলেন। কাজেই কোম্পানী নিশ্চয়ই রায় চৌধুরীদের কাছ থেকে প্রত্যাখাত হয়ে শাহাজাদা আজিমুদ্দিন-এর কাছে আসেন ও তাকে ১৬০০০ টাকা নজরানা দেন এবং তাঁর 'নিশান' (পাঞ্জা) বলে এই লেনদেন সম্পন্ন হয়। Atul Sur তাঁর History and culture of Bengal গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন under the Prince's "Nishan" (Panja or Authority of Permission) these three villages were purchased from the local Zamindars. কাজেই এই সমস্ত তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে এই বর্ধমানেই ১৬০০০ টাকার বিনিময়ে শহর কলকাতার জন্ম-পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। বাংলার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এই ফরমান ও নিশান-এর প্রভাব গুরুতর ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল এবং সূচনাস্থল হিসেবে বর্ধমান তার সাক্ষ্য বহন করছে।

আজিম-উস-শান ১৬৯৭ থেকে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন। তাঁর শাসনকালে এবং সুপারিশক্রমে ঔরঙ্গজেব ১৬৯৯ সালে যে ফরমান প্রদান করেন তার ফলে জগৎরাম ৪৫টি পরগনা বা মহলের রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেন। জগৎরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্তিচাঁদ (১৭০২—৪০) আজিমের সুপারিশ বলেই ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক সনদ বলে ৪৯টি মহলের জমিদারী ও খেতাব লাভ করেন।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর সম্রাট হন বাহাদুর শাহ্। আজিম-উস-শানের পর বাংলার সুবাদার হন পরপর শাহজাদা-ফরখুণ্ডা (শিশু) ও মীরজুমলা বা মুজাফ্ফর জঙ্গ। কিন্তু এদের দুজনের কেউ কোনদিন বাংলায় আসেন নাই। এঁদের সুবাদারীর কালে বাংলার প্রকৃত শাসনকর্তা (De facto) ছিলেন সহকারী শাসনকর্তা মুর্শিদ-কুলি-খান। তাছাড়া নতুন দিওয়ান বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলে মুর্শিদকুলি খানই বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত হন।

মুর্শিদকুলী-খান ছিলেন জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ। ছোটবেলায় তাঁকে হাজি শফি ইসপাহানীর কাছে বিক্রয় করা হয়। হাজি তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন, নাম হয় মহম্মদ হাদি। এই শফি খান ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর দেওয়ান হন এবং মধ্যে কিছুদিন ১৬৭৮ ও ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলারও দেওয়ান হয়েছিলেন। মহম্মদ হাদি এই সূত্রে তাঁর কাছে দেওয়ানির কার্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বাংলার দেওয়ান হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করার পর তিনি সমগ্র বাংলার রাজ্য শাসনের পূর্ণ দায়িত্ব লাভ করেন। তাছাড়া মুকসুদাবাদ, মেদিনীপুর, বর্ধমান (১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ) ও পরে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন।

মুর্শিদকুলি খান দেওয়ানীর দায়িত্ব নিয়েই দেখলেন সমস্ত খাস জমিই কর্মচারীদের জায়গীরে পরিণত। তাদের প্রায় সকলেই অকর্মণ্য ও বিলাসী। রাজস্ব নিয়মিত কোষাগারে জমা পড়ে না। তিনি সমস্ত প্রকার রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার নিযুক্ত করলেন। জমিদার রইলেন নামে মাত্র। ইজারাদারগণ যাতে আদায় করা রাজস্ব আত্মসাৎ করতে না পারে সেকারণে রাজস্বের পরিমাণমত অর্থ সিকিউরিটি হিসেবে জমা রাখতে হত। এছাড়া তিনি কিছু নতুন হিন্দু জমিদারও নিযুক্ত করলেন, কারণ মুসলমান জমিদারদের ওপর বিশেষ ভরসা রাখতে পারলেন না। এই ভাবে বাংলায় এক নতুন হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। অবশ্য বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের জমিদারগণ পূর্ববৎই রইলেন। নতুনের মধ্যে নাটোর, দিঘাপতিয়া, মুক্তাগাছা প্রভৃতি কয়েকটি মহলের নতুন জমিদারের সৃষ্টি হল। মুর্শিদকুলি খানের অধীনে ষোল জন খুব বড় জমিদার ছিলেন। ৬১৫টি পরগনার খাজনা এরাই আদায় করতেন। বর্ধমানের জমিদার ছিলেন সবার শীর্ষে। জগৎরাম ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে এক বিশ্বাসঘাতকের হস্তে নিহত হন। তাঁর ছিল দুই পুত্র—কীর্তিচাঁদ রায় ও মিত্রসেন রায়। কীর্তিচাঁদ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন ও মিত্রসেনের জন্য রাজকোষাগার থেকে মাসিক তঙ্কার ব্যবস্থা হয়। আগেই বলা হয়েছে কীর্তিচাঁদ ঔরঙ্গজেবের এক সনদ বলে ৪৯টি মহলের জমিদারী ও খেতাব লাভ করেছিলেন। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খান দেওয়ান হলে তাঁর আনুকূল্যে কীর্তিচাঁদ পিতামহ কৃষ্ণরাম রায়ের আমলের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাঁদের জমিদারী দখল করে নেন। বিষ্ণুপুর, চন্দ্রকোণা, বরোদা, চিতুয়া ও মনোহরশাহী পরগনা তাঁর জমিদারীভুক্ত হয়। ৫৭টি পরগনা নিয়ে কীর্তিচাঁদের জমিদারী এক রাজ্যের রূপ ধারণ করে। হুগলী জেলার তারকেশ্বর মন্দিরসহ বলঘরা বাজার (বালিগড়ী) পরগনাও কীর্তিচাঁদের জমিদারীর অধিকার ভুক্ত হয়। এরপর তিনি নতুন জমিদারীর জমিদার হিসেবে নিজের নাম নথিভুক্ত করার জন্য মুর্শিদাবাদে সুজাউদ্দিনের কাছে যান। কীর্তিচাঁদের এই ক্ষমতাবৃদ্ধি সুজাউদ্দিনের পছন্দ ছিল না। সে কারণে প্রথমে তিনি কিছুটা বিফল হলেও পরবর্তীকালে নূতন জমিদারীর জন্য নাম রেজেস্ট্রী করাতে সফল হয়েছিলেন। বর্ধমানের রাজস্ব দাঁড়ায় সর্বাধিক। তাঁর জমিদারীর ৫০০০ বর্গমাইল আয়তনের জন্য তিনি নবাবের কোষাগারে রাজস্ব জমা দিতেন ২০,৪৭,৫০৬ টাকা। এতৎ সত্ত্বেও বর্ধমান জেলায় আরও কতকগুলি ছোট ছোট আঞ্চলিক জমিদারীর সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন সাতসৈকার রনজিৎ ভট্টঠাকুর, খাজুরডিহির দর্পনারায়ণ রায়, মীরহাট—পাতিলপাড়া-বৈদ্যপুর-নারকেলডাঙ্গায় নন্দীপরিবার, হুগলীর কিঙ্করমাধব সেন।

এদের হাতে প্রায় ১৬০০ পরগনার খাজনা আদায়ের ভার ছিল। বড় বড় জমিদারদের অনেকে রাজা উপাধিতে ভূষিত হতেন। কীর্তিচাঁদের পুত্র চিত্রসেন এক ফরমান বলে 'রাজা' উপাধি পান। ত্রিলোকচাঁদ রায় ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আহম্মদ শাহের ফরমান বলে মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহারের অনুমতি লাভ করেন।

নবাবী আমল : মুর্শিদকুলি খান ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে জুন মারা যান। তাঁর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁর জামাতা মহম্মদ সুজাউদ্দিন খান সুজাউদ্দৌল্যা আসফ্-জঙ্ নাম নিয়ে মুর্শিদকুলির স্থলাভিষিক্ত হন। মুর্শিদকুলি যখন প্রথম বাংলা ও উড়িষ্যার দেওয়ান ও নায়েব নাজিম নিযুক্ত হন; তখন সুজাউদ্দিন ছিলেন উড়িষ্যার ডেপুটি গভর্ণর। তখন থেকেই শুরু, শ্বশুর-জামাতার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। মুর্শিদকুলির কন্যা জিনৎ-উন্-নেসা ছিলেন ধর্মপরায়ণা নারী আর সুজা ছিলেন দুশ্চরিত্র ও লম্পট। সে কারণে শ্বশুর-জামাই-এর সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠছিল। মুর্শিদকুলি যখন দেখলেন তাঁর দিন ফুরিয়ে আসছে তখন তিনি তাঁর পৌত্র সরফরাজ খানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার জন্য সম্রাটের অনুমোদন চেয়ে পাঠান। এর ফলে সম্রাট সরফরাজকে বাংলা ও উড়িষ্যার দেওয়ান বলে ঘোষণা করলেন। এদিকে সুজাও নিশ্চিন্তে বসেছিলেন না। হাজি-আহম্মদ ও আলিবর্দী নামক দুই ভ্রাতার পরামর্শে সুজা মুর্শিদাবাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন এবং মুর্শিদের দিন ঘনিয়ে এসেছে জানতে পেরেই এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করলেন। এদিকে দিল্লীর সম্রাটের এক বিশ্বাসভাজন ওমরাহ সম-সাম-উদ্দৌলাহ্ খান-ই দৌড়ান, এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্রাট তাঁর পূর্ব নির্দেশ বাতিল করে সুজাউদ্দিনকে বাংলা ও উড়িষ্যার দিওয়ান নিযুক্ত করেন। সুজা মেদিনীপুর সীমান্তে পৌঁছেই সম্রাটের এই নির্দেশ পান। সুজা দ্রুত মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হয়ে সরফরাজকে না জানিয়েই সোজা চিহিল-সুতন (Palace of Forty Pillars)-এ প্রবেশ করে নিজেকে বাংলা, উড়িষ্যার দিওয়ান বলে ঘোষণা করেন (জুন ১৭২৭)। তাঁর অনুগ্রহে হাজি-আহম্মদ ও আলিবর্দী রাজস্ব বিভাগের বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং আলমচাঁদ ও ধনকুবের জগৎশেঠ ফতেচাঁদ রাজ দরবারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিহার বাংলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সুজা বাংলাদেশকে দু'ভাগে ভাগ করলেন এবং দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ নিজের শাসনাধীনেই রাখলেন। কাজেই বর্ধমানের শাসন কর্তৃত্ব সুজার অধীনেই রইলো। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খান বাংলার নবাব হন (মার্চ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি ছিলেন অপদার্থ ও নবাবী পদের অযোগ্য। ফলে রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সুযোগে আলীবর্দী পাটনা থেকে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ

যাত্রা করেন ও মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে গিরিয়ায় শিবির স্থাপন করেন। গিরিয়ার যুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন। আলিবর্দী বাংলার নবাবী দখল করেন এবং দিল্লীর দরবারে, মুর্শিদাবাদের উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিদের এবং সরফরাজের আত্মীয়বর্গের মধ্যে নানা উপঢৌকন বিতরণ করে, নিজ অধিকার কায়েম করেন। নিজের উপকারকের পুত্রকে এভাবে হত্যা করে আলিবর্দী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক চরম বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কচিহ্ন এঁকে দিলেন, যার ফল তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে কড়ায়-গণ্ডায় উশুল করতে হয়েছিল। এবিষয়ে আচার্য যদুনাথ সরকারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

"The Bengal revolution of 1739–40 was significant episode not only in the history of that Province but also in that of the decadent Mughal empire. It is a clear violation of the grossly vitiated atmosphere of the age and of the effects of treachery, **ungratefulness** and inordinate ambition... A Nemesis followed it, when his favourite grandson and successor Siraj-ud-daulah fell a victim to the same forces which had worked to cause the ruin of **Sarfaraj**. It might very well be said that the battle of Palassey was the reply of divine justice to the battle of Giria".

ঠিক এই সময়ে—বর্ধমানে কীর্তিচাঁদের পুত্র চিত্রসেন রায় ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের রমজান মাসে দিল্লীর সম্রাট মহাম্মদ শাহের ফরমান বলে 'রাজা' উপাধিসহ বর্ধমান চাকলার জমিদারী পান। নবাব আলিবর্দীর ফরমান বলে আরসা পরগনার পূর্বতন জমিদার গোবিন্দদেবের পুত্র অধিকার-চ্যুত হন ও আরসা পরগনা চিত্রসেনের জমিদারী ভুক্ত হয়। চিত্রসেন জমিদারী সুরক্ষার জন্য রাজগড়ে ও সেনপাহাড়ীতে দুর্গ নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ধমানে বর্গী হাঙ্গামা। এই হাঙ্গামার প্রধান কারণ মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহের দুমুখো নীতি। তিনি আলিবর্দীকে দিলেন বাংলার নবাবীর ফরমান আর মারাঠা পেশোয়া প্রথম বাজীরাওকে দিলেন সুবে বাংলার চৌথ আদায়ের অধিকার। এই দুমুখো ভ্রান্তনীতির ফলেই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও চাকলা বীরভূমের জনগণকে বর্গী হাঙ্গামার শিকার হতে হয় ও এইসব অঞ্চলের জনগণের দুঃখদুর্দশা চরমে ওঠে।

বর্গী হাঙ্গামা : এসময় নবাব আলিবর্দী কটকে একটা বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে হরকরার মুখে সংবাদ পান নাগপুর থেকে ভোঁসলা রাজার ২০,০০০ মারাঠা সৈন্য বাংলার অভিমুখে আসছেন। এরা দ্রুত পদে অগ্রসর হয়ে বর্ধমানে প্রবেশ করে। আলিবর্দীও আর কাল বিলম্ব না করে দ্রুত এসে বর্ধমানে রানীসায়রের পাড়ে শিবির স্থাপন করেন। নবাবের সঙ্গে মাত্র তিন হাজার অশ্বারোহী

ও এক হাজার পদাতিক আর মারাঠাদের সঙ্গে ২০,০০০ অশ্বারোহী বর্গীর সৈন্য। সহজেই তারা নবাবের শিবিরকে ঘিরে ফেলে শিবিরের একাংশ পুড়িয়ে দেয়। চিত্রসেন বর্ধমানকে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ও বর্ধমান শহর থেকে ৫ মাইল উত্তরে তালিতে মাটির দুর্গ নির্মাণ করেন। মারাঠা নেতা ভাস্কররাম নবাবকে শিবিরে অবরুদ্ধ রেখে বর্ধমান শহরকে কেন্দ্র করে ১০ মাইল অঞ্চলে ব্যাপক লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার শুরু করে। এই অত্যাচার সম্পর্কে সমসাময়িক কবি গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল।
বরগির ভয়-এ সব পলাইল॥
চাইর দিগে লোক পলাএঃ ঠাঞি ঠাঞি।
ছর্ত্তিস বর্ণের লোক পলাএ তার অন্ত নাঞি॥
এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগি দেয় তবে সাড়া।
সোনা রূপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া।
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কার বধএ পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
অঙ্গুলে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ॥
একজনে ছাড়ে তারে আরজনা ধরে।
রমণের ভয়ে ত্রাহি শব্দ করে॥
এইমত বরগি কত পাপ কর্ম কইরা।
সেইসব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগি গ্রামে সাধাএ।
বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥
* * * *
কাহুকে বাঁধি বরগি দিআ পিঠ মোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া॥
রূপি দেহ, দেহ বোলে বারে বারে।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥
কাহুকে ধরিয়া বরগি পখইরে ডুবাএ।
ফকের হইএগা তবে কারু প্রাণ জাএ॥

Holwell-কে উদ্ধৃত করে আচার্য যদুনাথ সরকার বর্গীর অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন। Every evil attending destructive war, was felt by this unhappy country in the most eminent degree...A scarcity of grain in all parts, the wages of labour greatly enhanced; trade foreign and inland, labouring under every disadvantage and oppression" বর্ধমান-রাজের সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে উদ্ধৃতি করে আচার্য সরকার লিখেছেন। Shahu Rajah's troops are niggard of pity, slayers of pregnant women and infants, of Brahmanas and the poor, fierce of spirit, expert in robbing the property of every one and committing every kind of sinful act... বাণেশ্বরের চিত্রচম্পু খণ্ডকাব্য থেকে আরও জানা যায় যে বর্গীদের ব্যাপক লুঠতরাজে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বর্ধমান-রাজ চিত্রসেন ভাগীরথীর পূর্বতীরে মূলাজোড়ের নিকট কাউগাছি গ্রামে পলায়ন করেন।

তারিখ-ই-বাংলায় একই বিবরণ পাওয়া যায়। আলিবর্দী কোনমতে শিবির থেকে পালিয়ে মুর্শিদাবাদে পৌঁছালেন। বর্ষাকালে পাটনা ও পূর্ণিয়া থেকে সৈন্য এনে বর্ষাশেষে কাটোয়া আক্রমণ করলেন। মারাঠারা লুঠপাটের টাকায় খুব ধুমধাম সহকারে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিল। আলিবর্দীর সৈন্যদল হঠাৎ দুর্গানবমীর দিন প্রাতঃকালেই নিদ্রিত মারাঠা সৈন্যদের আক্রমণ করে। মারাঠারা ভয়ে পালিয়ে যায়। ভাস্কর পণ্ডিত মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হন ও পথের পাশে গ্রামে ব্যাপক লুঠতরাজ করতে করতে কটকে পৌঁছান ও কটক অধিকার করেন।

কিন্তু আলিবর্দী স্বয়ং কটকে ভাস্করের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে কটক দখল করেন ও ভাস্করের বাহিনীকে চিল্কা হ্রদ পার করে দিয়ে বিজয়গর্বে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে বাংলা ও উড়িষ্যার চৌথ আদায়ের অধিকার পান এবং নাগপুরের মারাঠারাজ রঘুজী ভোঁসলেকে ঐ অধিকার প্রদান করেন। রঘুজী ও পেশোয়া বালাজী রাও-এর মধ্যে ছিল অহি-নকুল সম্পর্ক। এখন মারাঠা অত্যাচার থেকে বাংলাকে রক্ষা করার জন্য আলিবর্দী বালাজীর শরণাপন্ন হলেন। ফলে রঘুজী যখন ভাস্কর পণ্ডিতকে নিয়ে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বাংলার অভিমুখে অগ্রসর হলেন, বালাজীও বিহারের মধ্য দিয়ে সাঁওতাল পরগনায় প্রবেশ করলেন ও সেখান থেকে বীরভূমের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদ পৌঁছালেন। আলিবর্দী ও পেশোয়ারের মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে চৌরিয়াগাছিতে সাক্ষাৎ হলো (৩০শে মার্চ ১৭৪৩)। উভয়ের আলোচনায় স্থির হলো নবাব মারাঠারাজ সাহুকে চৌথ দেবেন ও বালাজীকে সামরিক ব্যয় বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দেবেন।

বিনিময়ে বালাজী বাংলাকে মারাঠাদের অত্যাচার মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। রঘুজী তখন কাটোয়ায়। তিনি সংবাদ পেয়েই বীরভূমের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু বালাজী তাঁর পশ্চাৎধাবন করে তাঁকে বাংলার বাইরে তাড়িয়ে দিলেন। মাস ন'য়েক বাংলাদেশ মারাঠা উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পেল। চিত্রসেন কাউগাছি থেকে বর্ধমানে ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে সাহু ভোঁসলে ও পেশোয়াকে ডাকিয়ে তাদের মধ্যে চৌথ ভাগ করে দিলেন। বাংলা, উড়িষ্যা ও বিহারের পূর্বভাগ পড়লো রঘুজীর ভাগে। এরপরই ভাস্কর পণ্ডিত আবার মেদিনীপুরে প্রবেশ করলেন। আলিবর্দীর পেশোয়াকে দেওয়া ২২ লক্ষ টাকা জলে গেল ভেবে আলিবর্দী প্রমাদ গুণলেন। আলিবর্দীর সৈন্যদলের অধ্যক্ষ মুস্তাফা খানের পরামর্শে নবাব, ভাস্করের সঙ্গে 'শঠে-শাঠ্যং' নীতি নেওয়াই সমীচীন মনে করে ভাস্করকে তাঁর শিবিরে আহ্বান করলেন। ভাস্কর তখন আউসগ্রাম থানার দিগনগরে অবস্থান করছিলেন। মুস্তাফা খান প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে ভাস্করের শিবিরে উপস্থিত হন। মুস্তাফা খান কোরান স্পর্শ করে শপথ করে তাঁকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। সলিমুল্লার মতে মুস্তাফা কোরানের পরিবর্তে কাপড়ে জড়ান ইটের ওপর হাত রেখে শপথ নিয়েছিলেন। কিন্তু আচার্য যদুনাথ সরকার এ কাহিনীর সত্যতা অস্বীকার করেছেন। যাই হোক এরপর বহরমপুর ক্যান্টনমেন্টের অদূরে গঙ্গার পূর্বতীরে মানকরায় ভাস্কর তাঁর ২১ জন সেনানায়ককে নিয়ে নবাব শিবিরে প্রবেশ করলেন। অমনি ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ মুস্তাফার নির্দেশে ভাস্করসহ তাঁর ২১ জন সেনানায়ককে হত্যা করা হয়। মারাঠা সৈন্য বাংলাদেশ ত্যাগ করে। এই চক্রান্তকে সফল করার জন্য নবাব মুস্তাফাকে বিহারের শাসনকর্তার পদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু নবাব তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন না করায় মুস্তাফা আবার রঘুজী ভোঁসলেকে বাংলা আক্রমণ করতে আহ্বান করেন। নবাব সংবাদ পেয়েই মুস্তাফার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন; মুস্তাফা পাটনার কাছে যুদ্ধে পরাজিত হন কিন্তু রঘুজী এই ফাঁকে বর্ধমানে চলে আসেন ও বর্ধমানের রাজকোষ থেকে সাতলক্ষ টাকা লুঠ করেন ও বীরভূমে বর্ষাকালটা কাটিয়ে বিহারে মুস্তাফার সঙ্গে যোগ দেন। নবাব-সৈন্য বিহারে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করেন কিন্তু এই অবসরে উড়িষ্যার ভূতপূর্ব নায়েব মীরহাবিব সহযোগে মারাঠা সৈন্য মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন। আলিবর্দী দ্রুত গতিতে তাঁর মোকাবিলা করার জন্য মুর্শিদাবাদে এলে রঘুজী কাটোয়ায় চলে আসেন ও আলিবর্দীর হাতে পরাজিত হয়ে নাগপুরে ফিরে যান। আলিবর্দী এর পর মীরহাবিবকেও পরাজিত করেন। উড়িষ্যা উদ্ধার করার জন্য সেনাপতি

মীরজাফরকে প্রেরণ করেন কিন্তু বালেশ্বর হতে মীরহাবিবের সঙ্গে মারাঠা সৈন্য অগ্রসর হলে মীরজাফর বর্ধমানে পালিয়ে আসেন। আলিবর্দী বর্ধমানে এসে মারাঠাদের হাত থেকে বর্ধমান জেলাকে রক্ষা করলেন। উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর মারাঠাদের হাতেই রইল। এরপর আলিবর্দী দেখলেন মারাঠাদেরকে চৌথ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাই তিনি নাগপুরে দূত পাঠিয়ে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করেন ও বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দেবার বিনিময়ে তাদের হাত থেকে বাংলাকে সুরক্ষিত করেন।

চিত্রসেন বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেন নাই। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর খুল্লতাত মিত্ররাম রায়ের পুত্র ত্রিলোকচাঁদ রাজগদিতে বসেন। মোগল সম্রাট ফরমান জারি করে ত্রিলোকচাঁদের সিংহাসন লাভ অনুমোদন করেন। চিত্রসেন রায় ও রাজা ত্রিলোকচাঁদ মারাঠাদের ভয়ে কিছুকাল বর্ধমান ত্যাগ করায় বঙ্গদেশের প্রধান রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারীর আর্থিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাজস্ব আদায় ব্যাহত হয়। সমগ্র জেলা শ্মশানে পরিণত, গ্রামগুলি জনশূন্য। নবাবের রাজকোষ শূন্য। বর্ধমানের রাজকোষের অবস্থাও শোচনীয়। বর্গীর অশ্ব তুঁতের চারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার ফলে বর্ধমানের মানকর, মেমারী, কালনায় রেশমশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। Holwell এর মন্তব্য They (The Marathas) committed the most horrid devastation and cruelties, fed their horses and cattle with mulberry plantations and thereby irreparably injured the silk manufacture. A general face of ruin succeeded. Many of the inhabitants, weavers and husbandmen, fled. The arangs (silk and cloth factories and emporia) were in great degree deserted; the lands untilled... The manufacturers of the arangs received so injurious a blow at this period, that they have ever since lost their original purity and estimation; and will probably never recover them again." বেনিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে ছিল। মারাঠাদের প্রতিরোধের অজুহাত দেখিয়ে তারা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করে। বণিকগণ ২৫,০০০ টাকা চাঁদা তুলে কলকাতা রক্ষার জন্য মারাঠা ডিচ নামে পয়ঃপ্রণালী খনন করান।

ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে কোম্পানীর সম্পর্ক ভাল ছিল না। তারা অন্যায় ভাবে রাজার এক গোমস্তাকে কয়েদ করে। বর্ধমানরাজ চাকলা বর্ধমানে কোম্পানীর কুঠি ও ব্যবসা বন্ধের আদেশ দেন। কিন্তু নবাব একতরফাভাবে কোম্পানীর

অভিযোগের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বর্ধমানরাজকে তিরস্কার করেন। কোম্পানীর সঙ্গে রাজার বিরোধের কারণ বিষয় সম্পত্তি ও বকেয়া খাজনা। ব্রিটিশরা ত্রিলোকচাঁদের কলকাতার সম্পত্তি মেয়রকে দিয়ে বাজেয়াপ্ত করে। শেষে নবাবের মধ্যস্থতায় একটা মীমাংসা হয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দী মারা যান। দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা নবাব হন। এর পরের ইতিহাস বাংলা তথা ভারতের দুশো বছরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ইতিহাস।

পলাশীর প্রান্তরের রঙ্গমঞ্চে যে যুদ্ধের প্রহসনের দ্বারা এই পট পরিবর্তন ঘটেছিল তার খলনায়ক ছিল রর্বাট ক্লাইভ আর ষড়যন্ত্রের গ্রিন রুম ছিল মুর্শিদাবাদ। কিন্তু ষড়যন্ত্রে বর্ধমানের অবদানও কম ছিল না। ষড়যন্ত্রের পরিকাঠামো যখন সম্পূর্ণ তখন ক্লাইভ ১৩ই জুন ১৭৫৭ মাত্র ৩০০০ সৈন্য যাদের মধ্যে মাত্র ৮০০ ইউরোপীয় নিয়ে হুগলী, বর্ধমানের পাটুলি ও কাটোয়া হয়ে নবাবের রাজধানীব দিকে যাত্রা করলেন। ক্লাইভ খুব সম্ভব ১৪ই জুন কাটোয়ায় উপস্থিত হন। কাটোয়ায় আসার উদ্দেশ্য ছিল, কাটোয়া (শাঁকাই) কিল্লাদারের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করা। কাটোয়া দুর্গের কিল্লাদার ছিল সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অন্যতম খলনায়ক মীরজাফরের একান্ত অনুগত। ইতিমধ্যে ভারতীয় সিপাইরা স্থলপথে ও ও ইউরোপীয় বাহিনী নৌকাযোগে যাত্রা করে ১৭ই জুন পাটুলি পৌছান; ১৮ই আর এক বাহিনী অগ্রদ্বীপে শিবির স্থাপন করে। ১৯শে ক্যাপ্টেন আয়ারকূটের নেতৃত্বে আর এক বাহিনী কাটোয়ায় পৌছান ও ক্লাইভের পূর্ব পরিকল্পনা মত কাটোয়ার বহির্ভাগে শাঁকাই এর কিল্লাদারকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। এর পর দুর্গের বাইরে চলে যুদ্ধের প্রহসন। কিল্লাদার দুর্গের সম্মুখ ভাগে অগ্নিসংযোগ করে পশ্চাদদ্বার দিয়ে পলায়ন করে। কেল্লার মধ্যস্থ গোলাবারুদ, কামান ও ১০,০০০ সৈন্যের এক বছরের রসদ ক্লাইভের হস্তগত হয়। বাকী কিছু সৈন্য গভীর রাতে কাটোয়ায় পৌছায় ও এখানে দু'দিন অপেক্ষা করে। কিন্তু কেন এই অপেক্ষা? যদুনাথ সরকার এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। Clive was filled with anxiety as he gazed at an uncertain future...upto this time he had received nothing but bare promises from Mir Jarfar....and he hesitated to risk the fortunes of the company on the bare word of a man who was a traitor to his own Sovereign. So he first thought of holding his present position at Katwa (instead of crossing the Ganges and advancing on Murshidabad) till the end of the rainy season". কিন্তু সিরাজের নিয়তির লিখন কে রোধ করবে? তাই ক্লাইভ হঠাৎ মত পরিবর্তন করে

২২শে জুন কাটোয়া থেকে যাত্রা করে রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে অভিযান চালিয়ে মধ্য রাত্রে পলাশী পৌঁছান। পরদিনই হল যুদ্ধের প্রহসন আর একদিনের এই প্রহসনেই ঘটল বাংলা তথা ভারতের এমন কি পূর্ব গোলার্ধের বৈপ্লবিক পট পরিবর্তন; ইতিহাস যার নীরব সাক্ষী। Thursday the 23rd of June 1757 exactly one year and two days after the Nawab's capture of Calcutta witnessed a battle which was destined to revolutionise the life of India and indirectly and slowly that of Eastern hemisphere (J. Sarkar). গিরিয়ার যুদ্ধে সিরাজের মাতামহ সরফরাজকে হত্যা করে যে পাপ করেছিলেন পলাশীর প্রান্তরে তাঁরই দৌহিত্র সিরাজকে করতে হল তার প্রায়শ্চিত্ত। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! সিরাজের পতনের পর ব্রিটিশের ক্রীড়নক মীরজাফর নামেমাত্র নবাব হন। রাজকোষ প্রায় শূন্য। ষড়যন্ত্রের অঙ্গীকার মত কোম্পানীকে টাকা দিতে না পারায় অবশেষে জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় চুক্তির অর্ধেক টাকা দেওয়া স্থির হয়। মীরজাফর নগদ টাকার পরিবর্তে নদীয়া সহ চাকলা বর্ধমানের কিছু অংশের রাজস্ব হস্তান্তর করেন। ত্রিলোকচাঁদ তখন বর্ধমানের জমিদার। সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তাতে ত্রিলোকচাঁদ নাক গলান নাই। তাই নবাবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে চিড় ধরে নাই। কোম্পানীর কিন্তু বর্ধমানের রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয় নাই। বর্ধমানরাজই রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে থাকেন। মীরজাফর চুক্তিবদ্ধ সব টাকা দিতে না পারায় এবং ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অপরাধে পদচ্যুত হন ও তাঁর জামাতা মীরকাশিম নবাব হন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ক্লাইভ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মীরকাশিম মেদিনীপুর, চট্টগ্রামসহ চাকলা বর্ধমান দেওয়ানী স্বরূপ কোম্পানীকে দান করেন। বর্ধমানের রাজকোষ তখন শূন্য প্রায়। বর্গীর হাঙ্গামায় ৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। এর ওপর মীরকাশিমের ধার্য বিপুল কর দেওয়ার ক্ষমতা ত্রিলোকচাঁদের ছিল না। কোম্পানীকে নিজের রাজকোষের দুরবস্থার কথা জানিয়েও কোন ফল হল না। ফলে ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে কোম্পানীর ইতস্তত খণ্ডযুদ্ধ হতেই থাকল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজার সৈন্য কোম্পানীর ২০০ জন সিপাহীকে পরাস্ত করেন। এরপর ত্রিলোকচাঁদ বীরভূমের জমিদারের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নেন। দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম ও মারাঠা সেনাপতি শিউভাট এই বিদ্রোহে মদত দিলেন। ক্লাইভের পরে কিছুদিন হলওয়েল ও পরে ভ্যানসিটার্ট তখন কোম্পানীর গভর্নর। কোম্পানী মীরকাশেমের কাছে ত্রিলোক ও বীরভূমের জমিদার আসদ-উজ্জমানের এই বিদ্রোহের সংবাদ পান। তখন কোম্পানী মেজর হোয়াইট-এর নেতৃত্বে

ত্রিলোকের বিরুদ্ধে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। মীরকাশিম যখন নিজেই কোম্পানীর কর্তৃত্বের পাশ ছিন্ন করার পরিকল্পনা করছিলেন তখন তাঁর পক্ষে বর্ধমানরাজকে মদত না জুগিয়ে কোম্পানীকে এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ দেওয়া একটা ঐতিহাসিক ভুল বলেই আমার ধারণা। শেষ মুহূর্তে শাহ আলমও পিছিয়ে যান। ত্রিলোকচাঁদ ও আসদ-উজ্জমান সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন কিন্তু 'সন্ন্যাসী ও ফকির' নিয়ে গড়া রাজার সৈন্য কোম্পানীর সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। বর্ধমানের দক্ষিণে সঙ্গতগোলার যুদ্ধে বর্ধমান-রাজ ও বীরভূম-রাজের যৌথ বাহিনী পরাজিত হয়। সুচতুর ইংরেজ কোম্পানী কিন্তু ত্রিলোকের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলেন না। বরং ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় The English however perhaps wisely chose to look upon the Rajas as still their friends and confirmed in Zamindari on terms much below the real revenue due to want of money and other reasons (Hist of Freedom Movement in India Vol. 1)। হায় মীরকাশিমও যদি বর্ধমান-রাজের বিদ্রোহের সংবাদ কোম্পানীকে না দিয়ে তাঁকে কোম্পানীর বিরুদ্ধে মদত দিতেন ও পরে বাংলার সমস্ত জমিদারকে গোপনে সঙ্ঘবদ্ধ করে সম্রাট শাহ্ আলম ও অযোধ্যার সুজাউদ্দৌলার সহযোগিতার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা না করে বক্সারে যুদ্ধে কোম্পানীর মুখোমুখি হতেন, তাহলে হয়ত বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। কিন্তু ইংরেজরা সুচতুর ও দূরদর্শী, তাই মনে হয় মীরকাশিমের শাসনব্যবস্থা ও মতিগতি ঠিক অনুধাবন করতে না পেরে, বাংলার সর্বময় কর্তৃত্ব লাভের কথা তেমনভাবে ভাবতে পারে নাই। তাই ত্রিলোকচাঁদ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ভাব নিতে কোম্পানীর এই দ্বিধা। ত্রিলোকচাঁদ কিন্তু কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি মত টাকা দিতে পারলেন না। কোম্পানীর পক্ষে তখন গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট বর্ধমানের জন্য রেসিডেন্ট পদ সৃষ্টি করে জনস্টনকে প্রথম রেসিডেন্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পদে নিযুক্ত করে বর্ধমানে পাঠালেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর অধিকারে আসার সময় বর্ধমানের রাজস্ব ধার্য হয়েছিল ৩১,৭৫,৩৯১ সিক্কা টাকা। তিন বছরের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪১,৭২,০০০ সিক্কা টাকায়। জনস্টন খাজনা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে জমিদারীর কিছু অংশ নিলামে বিক্রি করার ব্যবস্থা করেন। ফলে হুগলী ও বর্ধমান জেলায় কয়েকটি নতুন ছোট জমিদারের সৃষ্টি হয়।

শীঘ্রই স্বাধীনচেতা মীরকাশিম ইংরেজদের সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়েন। বাণিজ্যিক শুল্ক ও রপ্তানী সংক্রান্ত ব্যাপারে শীঘ্রই কোম্পানীর সঙ্গে নবাবের

বিরোধ চরমে ওঠে; যার চরম পরিণতি বক্সারের যুদ্ধ ও মীরকাশিমের পরাজয়। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধের পর কার্যত ইংরেজ বাংলার শাসন কর্তৃত্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা পেলেও আইনত (de Jure) ক্ষমতা পান নাই। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী মোগল সম্রাটের কাছ থেকে রাজস্ব ও ভূসম্পত্তি বিষয়ক মামলার নিষ্পত্তির অধিকার অর্থাৎ দেওয়ানি লাভ করে। এর ফলে বাংলার শাসন ব্যাপারে কোম্পানীর সার্বভৌমত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

ইতিমধ্যে ক্লাইভ দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্নর হয়ে ভারতে ফিরে আসেন। তাঁর দ্বিতীয়বার গভর্নর থাকাকালে কোম্পানীর সঙ্গে ত্রিলোকের সম্পর্কের উন্নতি ঘটতে থাকে। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহের এক ফরমান বলে ত্রিলোকচাঁদ রাজ বাহাদুর ও চার হাজার মনসবদারী লাভ করেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ হাজার মনসবদারী লাভ করেন ও তিন হাজার অশ্বারোহীসহ বন্দুক রাখার ও রণবাদ্যের অধিকার পান। সম্রাট তাঁকে মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন। এর পরের বর্ধমান জেলার ইতিহাস, বর্ধমান মহারাজাধিরাজ বংশের ইতিহাস। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত।

কুড়ি অধ্যায়



মধ্যযুগে বর্ধমান

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট : বক্‌সারের যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তথা বর্ধমান অঞ্চলে প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরের অধিককালের (১২০৪—১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) ইসলামী শাসনের অবসান ঘটে। এই সাড়ে পাঁচশো বছরের মধ্যে ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর অভিযানের সঙ্গে সূচনা হয়েছে ইসলামী শাসনের। তারপর একে একে এসেছে সুলতানী রাজত্বের খলজী বংশ, বলবনী বংশ, ফিরোজ শাহী, মুবারক শাহী, ইলিয়াস শাহী, বায়াজিদ শাহী, মুহম্মদ শাহী ও হাবসী বংশের হোসেন শাহী বংশের শাসন। এরপর মোগল সম্রাটের অধীনস্থ্ সুলতান ও নবাবী বংশের রাজত্বকাল। মধ্যে কিছুদিন ছিল রাজা গণেশ বা দনুজমর্দনদেবের হিন্দুশাসন যার প্রায় সূচনার সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জনের বাজনা বেজে যায়।

ভূখণ্ড : ভুক্তি থেকে জেলা : এই সাড়ে পাঁচশো বছরের শাসনকালে বর্ধমান অঞ্চলের ভূখণ্ডের পরিবর্তন ঘটেছে একাধিকবার। গুপ্তযুগের বর্ধমান ভুক্তির উল্লেখ পাই তাম্রশাসনের "পুনোত্তর জনপদাধ্যাসিতায়াম্ সতত ধর্মক্রিয়া বর্দ্ধমানায়াং বর্দ্ধমানভুক্তৌ" উল্লেখের মধ্যে। কিন্তু ইসলামী শাসনে কেন্দ্রীভূত গৌড় শাসনব্যবস্থায় ভুক্তি, বিষয় বা জেলার অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তীকালে লখনাবতী বা পাণ্ডুয়া, সাঁতগা, কিংবা রাজমহল থেকে গোটা দেশ শাসন করা সম্ভব না হওয়ায় সুবর্ণভূমি বা সোনার গাঁ ও সপ্তগ্রাম এই দুই উপবিভাগে দেশকে ভাগ করে শাসনকার্য পরিচালনা করা হত। বর্ধমান জেলা শাসিত হত সপ্তগ্রাম থেকে। এরপর শেরশাহের শাসনকালে বঙ্গদেশকে যখন কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়, তখন বর্ধমান জেলার বর্তমান ভূখণ্ড বর্ধমান, কালনা, সেলিমাবাদ, মঙ্গলকোট ও সরিফাবাদ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায় মোগল সম্রাট সমগ্র বঙ্গদেশকে একটি সুবায় পরিণত করেন। ১৫৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুবা বিভক্ত হয়

১৯টি সরকারে। মহল বর্ধমান গড়ে উঠেছিল সরকার সুলেমাবাদ, সরকার সাতগাঁ ও সরকার মান্দারণ এর মধ্যবর্তী স্থলে।

মহল : আইন-ই-আকবরীতে আছে বর্ধমান মহল ছিল সরকার সরিফাবাদের অন্তর্ভুক্ত; এর রাজস্ব ছিল ৪৬৯০৩.৫ আকবর শাহী রৌপ্য মুদ্রা। শাসিত হতো ফৌজদারের কার্যালয় থেকে। বর্তমান মহতাব মঞ্জিল ও উইমেন্স কলেজ নিয়ে বর্ধমান গড় তৈরী হয়েছিল। এখান থেকেই শাসনকার্য পরিচালিত হত। এই ব্যবস্থা মোটামুটি ভাবে ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত বহাল ছিল। সুজার সময় বর্ধমান মহলকে চাকলা বর্ধমান করা হয়। সমগ্র সরিফাবাদ, সুলেমাবাদের অধিকাংশ অংশ, সাতগাঁর কয়েকটি পরগনা ও মান্দারণের প্রায় অর্ধাংশ নিয়ে চাকলা গঠিত হয়। এর অধীনে থাকে ৬১টি পরগনা। West Bengal District Records থেকে চাকলা পরগনাগুলির নাম পাওয়া যায়। ১. বর্ধমান, ২. খন্ডঘোষ, ৩. সেরগড়, ৪. ছুটিপুর, ৫. রাণীহাটি, ৬. রাইপুর, ৭. ইন্দ্রাণী, ৮. চন্দ্রকোণা, ৯. ভুরশুট, ১০. সাতসৈকা, ১১. বালিগড়ি, ১২. বন্দিপুর, ১৩. চৌমহ, ১৪. পাইকান, ১৫. ধাড়সা, ১৬. বালীডাঙ্গা, ১৭. সাহাবাদ, ১৮. বাঘা, ১৯. গোপভূম, ২০. নলহি, ২১. হাভেলি, ২২. অম্বোয়া, ২৩. ধেঞা, ২৪. বরদা, ২৫. চিতুয়া, ২৬. বোড়ো, ২৭. পাণ্ডুয়া, ২৮. পৈনান, ২৯. আরসা, ৩০. হাতীকান্দা, ৩১. শিখরভূম, ৩২. পাটুলী, ৩৩. সমরশাহী, ৩৪. সেলামপুর, ৩৫. বাগড়ী, ৩৬. মনোহরসাহী, ৩৭. পলাশী, ৩৮. মহম্মদপুর, ৩৯. ব্রাহ্মণভূম, ৪০. জাহানাবাদ, ৪১. বয়ড়া, ৪২. এক্তারপুর, ৪৩. খোসলপুর, ৪৪. বালিয়া, ৪৫. চন্দননগর, ৪৬. খালোড়, ৪৭. কুবিজপুর, ৪৮. সেনপাহাড়ী, ৪৯. চম্পানগরী, ৫০. মজফরশাহী, ৫১. আজমৎশাহী, ৫২. ফৈজলপুর, ৫৩. আমিরাবাদ, ৫৪. জাহাঙ্গিরাবাদ, ৫৫. মণ্ডলঘাট, ৫৬. পাটমহল, ৫৭. সেলিমাবাদ, ৫৮: হাভেলী মান্দারণ, ৫৯. মজফ্‌ফরপুর, ৬০. শাহসিলামপুর, ৬১. জয়পুর।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৬৭৫–৯৬) ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আবলজাফর মহাম্মদ মহীঅদ্দিন আলমগীর বাদশাহ গাজীর কাছ থেকে অতি শুভক্ষণে ২৪ রবিয়ল আখের ৩৮ জুলুসে লিখিত (১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) ফরমানে যে সব পরগনা ও গয়রহার জমিদারী লাভ করেন তার তপসিলে নিম্নলিখিত পরগনাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়।

তপসিল মহল : সরকার সরিফাবাদ এলাকা পরগনা বর্ধমান ও গয়রহা-বাঘা সাহাবাদ সুজাপুর, রেকাবিবাজার, বাজার এব্রাহিমপুর, আজমত শাহী,

সুধারপুর, হাবিলি ও গয়রহা, সরকার সেলিমাবাদ-চৌমহা, হেয়াতপুর, সাহাপুর, মাজমপুর।

কিসমৎ হাবেলি....লক্ষ্মীপুর, মনখুর, বাগদায়না।

সেনপাহাড়ী ও গয়রহা—মতালক সরকার মান্দারণ, সেনপাহাড়ী, মানকুন্ডি, আমিরাবাদ, সেরগর ও সলিমপুর-মায় সেরকেন্দা, আমিরপুর। গোয়ালভুম, সাহপুর মহাল, আজমপুর, হোসেন ফহোহ, মানিয়াকুন্ডি, সুধানগরী, জাঁহাবাদ। এই ভূসম্পত্তির মধ্যে সেনপাহাড়ি পরগনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাঢ়ভূমির সমৃদ্ধশালী এই ভূখণ্ডে সুদৃঢ় দুর্গ 'শ্যামরূপার গড়' অবস্থিত ছিল।

কৃষ্ণরাম এর সঙ্গে নিজবালিয়া অধিকার করেন। কীর্তিচাঁদ (১৭০৭–৪০) এর আয়তন আরও বৃদ্ধি করেন। তখন চাকলার বিস্তৃতি দাঁড়ায় উত্তরে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের অংশ, দক্ষিণে কাঁসাই নদীর তীর বরাবর রূপনারায়ণপুরের মোহানা, পূর্বে সাতসৈকা বাদে ভাগীরথীর তীর, পশ্চিমে পঞ্চকোট। এরপর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বিষ্ণুপুরের কিছু অংশ বর্ধমান চাকলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতী নদীর পূর্ব উপকূল ও সাতসৈকা পরগনা বর্ধমান চাকলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এই চাকলা বিশাল আয়তন ধারণ করে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই চাকলার আয়তন কাটছাঁট করে বর্ধমান জেলার সৃষ্টি হয়।

শাসন-ব্যবস্থা : সুলতানী আমলে ছিল কেন্দ্রীভূত শাসন। সে সময় কালনা, সেলিমাবাদ, বর্ধমান ও মঙ্গলকোট অঞ্চলে ফৌজদার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন। পরে শেরশাহের শাসনকালে বাংলা সরকারকে বিভিন্ন পরগনায় ভাগ করা হয় ও পরগনার শাসনকর্তা হন শিকদার, আমিন, কাজী প্রভৃতি। পরে সাতগাঁ থেকে বর্ধমান শাসিত হত ও শাসনকর্তার অধীনে থাকত ইজারাদার, জমিদার প্রভৃতি পদাধিকারী। চৈতন্যচরিতামৃত থেকে জানা যায় সপ্তগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তার অধীনে হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্ধন মজুমদার ছিলেন জমিদার।

আকবরের সময় সুবার শাসনকর্তা ছিল সুবাদার, রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিল দিওয়ান, পে-মাস্টার—বক্‌সী; নিম্নতর কর্মচারী ছিলেন—বাদশাই মনসবদার, কোতোয়াল, কাজী, সদরআমিন, বিতিক্‌চি, আলমগুজার বা Revenue Collector—এই সমস্ত নিম্নতর কর্মচারী ছিলেন জেলার দায়িত্বে। কিছু অধস্তন কর্মচারী এদের সাহায্য করতেন। গ্রামের শাসনে ছিল মকদ্দম বা

Headman—এছাড়া আমিন (measurer), কারকুন ও বিতক্‌চি বা Statistician। কানুনগো রাজস্ব জমা দেবার হিসাব রাখতো। পোদ্দার ছিল জেলার কোষাধ্যক্ষ। এছাড়া কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে ডিহিদার, খলিফ, উজীর, রায়জাদা, এই সব কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়।

ভূমি রাজস্বই ছিল সরকারের প্রধান আয়। মোটামুটি তিন শ্রেণীর জমি ছিল। ১) খালিসা শরিফা বা প্রত্যক্ষ সরকারের অধীন, ২) কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য জায়গীর, কতকটা চাকরানের মত, ৩) প্রাচীন জমিদার বা সামন্ত রাজার জমি। খালিসা জমির রাজস্ব সরকারী কর্মচারীরাই আদায় করত, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইজারাদারদের মেয়াদি ইজারা দেওয়া হত, এরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রাজস্ব দেবার পরিবর্তে এক একটা পরগনার ইজারা নিতেন।

পাঠান যুগের যে সমস্ত স্বাধীন রাজা মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন তাঁরা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

মুর্শিদকুলিখানের সময় এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়। ইজারাদারদের হাতেই রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পিত হল। জমিদাররা নামে মাত্র রইলেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হিন্দুদের মধ্য থেকেই এই ইজারাদার নিযুক্ত হত। সৃষ্টি হল এক নতুন হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়। কর্নওয়ালিস যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করলেন তখন এই ইজারাদারদের উত্তরাধিকারীরাই স্থায়ী জমিদারে পরিণত হল। পরবর্তীকালে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে এই শ্রেণীর আনুগত্যের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট।

একুশ অধ্যায়



অর্থনৈতিক অবস্থা

ইসলামী শাসনের ঠিক আগে সম্ভবত প্রাচীন কালের মুদ্রাবই চলন ছিল; তবে ছোটখাট কেনা ব্যাপারে কিংবা শ্রমিকদের মজুরী দেওয়ার ব্যাপারে কড়িরই চলন ছিল বেশী। মুসলমান যুগে প্রত্যেক স্বাধীন সুলতান নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কন করতেন। রূপার মুদ্রার নাম ছিল টঙ্ক—যার থেকে বর্তমান টাকা এসেছে। K. K. Datta তাঁর Hist of Bengal Subah-তে মন্তব্য করেছেন—অষ্টাদশ শতাব্দীতে চার পাঁচ হাজাব মতান্তরে আড়াই হাজার কড়ি এক টাকাব সমান ছিল। কিন্তু ধাবাপাতের নিয়ম অনুসাবে কড়ি কড়িতে ৫ গণ্ডা বা এক পয়সা ও ৮০ কড়িতে এক আনা বা ছয় নয়া পয়সা এবং ১২৮০ কড়িতে এক টাকা হওয়ার কথা। মানসিংহের আমল থেকে প্রজাদের ওপর শোষণ খুব বেড়ে যায়। মুর্শিদকুলির আমল থেকে প্রচুর অর্থ দিল্লীতে রাজস্ব হিসেবে পাঠানো হত। আট কোটি/নয় কোটি পরিমাণ রূপার মুদ্রা গাড়ী বোঝাই করে দিল্লীতে চালান যেত। শোষণের ফলে রৌপ্যমুদ্রার চলন কমে যায়—সাধারণ লোকের হাতে টাকা বিশেষ থাকত না। মুদ্রার চলন কমে যাওয়ার ফলে অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে Deflation দেখা দেয়। জিনিসপত্রের মূল্য কমে যায়, সাধারণ লোকেব জিনিষ কেনবার মত পয়সা থাকতো না। মুকুন্দরামে কিছুটা আভাস আছে। দুর্বলার বেসাতি অংশে এই দরের চিত্র কিছুটা আভাসিত।

বাজারে কর্পূর নাই চাহি বুলি ঠাঁই ঠাঁই
যতনে পাইলুঁ পাঁচ তোলা
পাঁচ কাহনের দর, পঁচিশ কাহন কর
আলু কচু শাক পাত, আদি নানা বস্তু জাত
চারি কাহনের লৈনু কলা।

নিল চারি কাহন আষ্ট পণে।
তৈল ঘি লবঙ্গ ছেনা, পাঁচ কাহনের কেনা
খাসি নিল আট কাহনে।

এক পণ : আশিটি কড়ি, ১৬ পণ—১ কাহন অর্থাৎ এক কাহন কড়ি—১২৮০ কড়ি যার মূল্যমান এক টাকার সমান।

ফুল্লরার বারমাস্যা সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের অভাব ও দারিদ্র্যের এক মর্মন্তুদ করুণ কাহিনী :

অনল সমান পোড়ে চইতের খরা
চালু সেরে বাঁধা দিনু মাটির পাথরা।
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।

এই দুর্দশার কারণ ডিহিদার ও অন্যান্য রাজকর্মচারীর অত্যাচার ও উৎপীড়ন। চণ্ডীমঙ্গলের দামুন্যায় মুকুন্দরামের সাত পুরুষের বাস ছিল। কৃষির দ্বারা জীবনযাপন করতেন, কিন্তু ডিহিদারের অত্যাচারে তাকে গ্রাম ছাড়তে হয় ও চরম দুর্দশায় পড়তে হয়।

তৈল বিনা কৈলু স্নান করিলু উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।

মানিকচন্দ্রের গানেও শাসক শ্রেণীর অত্যাচারের কাহিনী আছে। সুলতানী আমলেও জিনিসপত্রের এই সস্তা দরের কথা জানা যায়। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইবন বতুতার বিবরণের তালিকা থেকে তৎকালীন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর জানা যায়।

দ্রব্য	**পরিমাণ**	**মূল্য (বর্তমানের নয়া পয়সার মানে)**
চাউল	একমণ	১২ পয়সা (নয়া)
ঘি	এক মণ	১৪৫ পয়সা বা ১ টাকা ৪৫ পয়সা
চিনি	,,	৭৩ পয়সা
উত্তম কাপড়	১৫ গজ	২০০ পয়সা বা ২ টাকা
দুগ্ধবতী গাভী	১টি	৩০০ পয়সা বা ৩ টাকা
ভেড়া	১টি	২৫ পয়সা

এমন কি এক বৃদ্ধ; তার স্ত্রী ও ভৃত্যের খাদ্যদ্রব্যের জন্য বছরে ব্যয় হত এক টাকা (স্বর্ণমানের হিসেবে সাত টাকা)

রাজধানী মুর্শিদাবাদে ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ছিল নিম্নরূপ :

খুব ভাল বাঁশ ফুল চাউল প্রথম শ্রেণী	—	প্রতি টাকায় ১ মণ ২০ সের
খুব ভাল বাঁশ ফুল চাউল দ্বিতীয় শ্রেণী	—	প্রতি টাকায় ১ মণ ২৩ সের
খুব ভাল বাঁশ ফুল চাউল তৃতীয় শ্রেণী	—	প্রতি টাকায় ১ মণ ৩৫ সের
মোটা চাউল (দোশনা ও পূরবী)		প্রতি টাকায় ৪ মণ ২৫ সের
মোটা চাউল (মুশসারা)		প্রতি টাকায় ৫ মণ ২৫ সের
মোটা চাউল (কুরশালী)		প্রতি টাকায় ৭ মণ ২০ সের
উৎকৃষ্ট গম প্রথম শ্রেণী		টাকায় ৩ মণ
উৎকৃষ্ট গম দ্বিতীয় শ্রেণী		টাকায় ৩ মণ ৩০ সের
উৎকৃষ্ট তৈল প্রথম শ্রেণী		টাকায় ২১ সের
উৎকৃষ্ট তৈল দ্বিতীয় শ্রেণী		টাকায় ২৪ সের
উৎকৃষ্ট ঘৃত প্রথম শ্রেণী		টাকায় ১০.২৫ সের
উৎকৃষ্ট ঘৃত দ্বিতীয় শ্রেণী		টাকায় ১১.২৫ সের
কার্পাস তূলা প্রতি মণ		২ টাকা—২.৫০ টাকা

শায়েস্তা খানের আমলেও জিনিসপত্রের দাম সস্তা ছিল। যদুনাথ সরকার এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

It is related that during his Government grain was so cheap that rice was sold at the rate of 640 lbs (i.e. eight maunds) weight to the rupee...

As for the cheapness of grain during his viceroyalty it need not excite any surprise. About 1632, Father Sebastien Manrique during his travels in Bengal found rice selling five maunds to the rupee.

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের 'সাহিত্য প্রকাশিকা (৩য় খণ্ড)' গ্রন্থ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বর্ধমান শাখার মুখপত্র ১৩৬৯ সালের 'রাঙামাটি' ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে ১৬৭৫—১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে দুর্ভিক্ষের সময়ের অবস্থা ও জিনিসপত্রের মূল্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মহারাজ কৃষ্ণরাম রায়ের সময় বর্ধমানে দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারক্লিষ্ট প্রজাগণের ক্লেশ নিবারণের জন্য মহারাজ বর্ধমানে 'কৃষ্ণসায়র' নামক এক বিশাল পুষ্করিণী খনন করান ও শ্রমিকদের এক ঝুড়ি মাটি কাটার জন্য এক কড়ি হিসেবে মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

'মহারাজ ত্রিলোকচাঁদের সময় ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, বহুলোক অন্নাভাবে মারা যায়। সে সময়ে বঙ্গদেশে যে দরে শস্যাদি বিক্রয়

হয়েছিল তা নিচে দেওয়া গেল। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর কৌন্সিল প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর রজর ড্রেক সাহেবের কাছে যে রিপোর্ট দেন তা থেকেই এই তা উদ্ধৃতি করা হয়েছে।

১৭৫১ সালের অক্টোবরের খাদ্যশস্যের দর

শস্য	প্রতি টাকা	ওজন
সর্বোৎকৃষ্ট চাউল	১	৩৫ সের
সর্বোৎকৃষ্ট গম	১	১ মণ ১৭ সের
সাধারণের ব্যবহার উপযোগী চাউল	১	১ মণ ১৭ সের
বুট (ছোলা)	১	১ মণ
আটা	১	২৪ সের
তৈল	১	৮ সের

১৭৫২ সালের অক্টোবরে খাদ্যশস্যের তালিকা

শস্য	প্রতি টাকা	ওজন
সর্বোৎকৃষ্ট চাউল	১	১২ সের
সর্বোৎকৃষ্ট গম	১	১৯ সের ১১ ছটাক
সাধারণের ব্যবহার উপযোগী চাউল	১	২২ সের
বুট (ছোলা)	১	১৫ সের ২ ছটাক
ময়দা	১	৫ সের
তৈল	১	৩ সের ১০ ছটাক

(১৬ ছটাক = ১ সের)

(১ সের = ৯৩৭.৫ গ্রাম)

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় শ্রমজীবীদের মজুরী বেড়ে দাঁড়ায় ২ পণ ১৫ গণ্ডা কড়ি (১৮ নয়া পয়সা); এর মধ্যে সর্দারের দস্তুরী ছিল শ্রমিক পিছু চার গণ্ডা কড়ি (.০৫ পয়সা)। মোটের উপর মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের অবস্থা ভাল ছিল না তবে মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হয়ত ছিল না কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মানুষদের দুর্দশার অন্ত ছিল না।

রাজস্ব : ভূমি-রাজস্বই ছিল সুবার প্রধান আয়। জমি ছিল তিন শ্রেণীর : ১. খালিসা—শরিফা অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীন, ২. জায়গীর—কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য বেতনের পরিবর্তে চাকরাণ ও ৩. প্রাচীন জমিদার বা সামন্ত রাজার জমি। খাজনা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, ইজারাদার নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেবার অঙ্গীকারে এক একটা পরগনা নির্দিষ্ট মেয়াদের কড়ারে ইজারা বন্দোবস্ত নিত ও প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে কড়ায় গণ্ডায় খাজনা

আদায় করতো। জমিদার ছিলেন নামে মাত্র। ইজারাদারগণ যে রাজস্ব আদায় করতো সেই পরিমাণ টাকার জন্য আগেই জামিনস্বরূপ খত সই করে দিতে হত। সংগৃহীত রাজস্বের একটা অংশ ইজারাদারের প্রাপ্য ছিল।

মুসলমান জমিদারেরা বেশীর ভাগই রাজস্ব আত্মসাৎ করতো, সেকারণে মুর্শিদকুলি খান হিন্দু জমিদার নিযুক্ত করেন। এই ভাবে এক নতুন হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। অবশ্য বর্ধমান, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের পূর্ব জমিদারই বহাল থাকেন।

যে সমস্ত ইজারাদার বা জমিদার যথাসময়ে ঠিকমত রাজস্ব জমা দিত, তারা নবাবের কাছ থেকে যথেষ্ট সদয় ব্যবহার পেত। যারা ঠিক মত রাজস্ব জমা দিত না তাদের দুর্গতির সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাদের কাছারী ঘরে বন্ধ করে রাখা হত, খাদ্য, পানীয় কিছুই দেওয়া হত না। অনেক সময়ে মলমূত্র ত্যাগ ঐ ঘরেই করতে হত। এমন কি বিষ্ঠাপূর্ণ গর্তে ডুবিয়ে রাখা হত। এর নাম ছিল বৈকুণ্ঠ দর্শন। অনেক হিন্দু জমিদার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পরিত্রাণ পেতেন। বর্তমানের দস্তিদার, সরকার, বক্সী, কানুনগো, চাকলাদার, তরফদার, লস্কর, হালদার, উপাধিধারী হিন্দুদের পূর্বপুরুষগণ নবাবী আমলে ঐ সব পদে নিযুক্ত ছিলেন।

অনেক সময় অনেক হিন্দু জমিদার নবাবের দ্বারা তুচ্ছ কারণেও বন্দী হতেন। মুকুন্দরাম বলেছেন :

প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইল বন্দী
হেতু কিছু নাহি তার ত্রাণে।

রাজস্বের সঙ্গে আবওয়াব বা বে-আইনী করও আদায় করা হত। জাহাঙ্গীর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত সকলেই এই আবওয়াব বাতিলের ফরমান জারি করেছিলেন। এর থেকেই এই আবওয়াবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এই রকম কিছু আবওয়াবের উল্লেখ চণ্ডীমঙ্গলে উল্লিখিত আছে। এই সব আবওয়াব বাতিল করে কালকেতু কৃষকদের তাঁর গুজরাট নগরে বসতি করতে উৎসাহিত করেছিল

শুন ভাই বুলান মণ্ডল
... ...
আমার নগরে বৈস, জত ভূমি চাষ চষ
... ...
সাত সন বই দিয়া কর।
সেলামী বাস গাড়ি নানা বাবে জত কড়ি
নাহি দিহ গুজরাট দেশে।

পার্বণি পঞ্চক-জাত গুড়া লোন সানা ভাত
ধান কাটি কলম কসুরে।
জত বেচ চালু ধান তার নাহি দিব দান
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে।

'বাবে' অর্থ খাতে, 'সেলামী বাঁশগাড়ী'—বেড়া দেওয়ার জন্য কর, 'পার্বণী পঞ্চক উৎসব উপলক্ষে পাঁচজনের দেয় কর। 'গুড়ালোন সানা ভাত' অর্থ নৌকোর কাঠামো, নুন তৈরী ও তাঁতের জন্য দেয় শুল্ক। 'ধানকাটি' : ধানকাটার জন্য দেয় কর। 'কলম কুসুরে' অর্থ হিসাব নিকাশ ভুল হওয়ার সম্ভাবনার কিছু বেশী খাজনা আদায়। এছাড়া ধান বিক্রি করার সময় তার অংশ দাবিও অন্যতম কর।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধেও এই রকম আবওয়াবের উল্লেখ পাই : 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্তের 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' প্রবন্ধে 'যথাকালে অনাদায়ী রাজস্বের নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি (সুদ) বাটা, বাটার বৃদ্ধি, আগমনী, পার্বণি, হিসাবানা প্রভৃতি; এছাড়া 'ভূস্বামির ভবনে বিবাহ, আদ্যকৃত্য, দেবোৎসব...উপস্থিত হইলে প্রজাদের অনর্থপাত উপস্থিত, তাহারদিগকেই ইহার সমুদায় বা অধিকাংশ ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়। ইহা 'মাঙ্গণ' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এ ছাড়াও ছিল প্রজাদের গৃহে উৎসব উপলক্ষে 'শুল্ক'। প্রজাদের কুকর্মের 'বাজে আজায়' ইত্যাদি। লাঙ্গল ভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে জমির জরিপ ও উৎপন্ন শস্যভিত্তিক রাজস্বের উল্লেখও মুকুন্দরাম করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে।

'প্রজার পাপের ফলে' মামুদ সরীপের কাজ হচ্ছে—প্রথমত পনের কাঠায় কুড়া-নাহি মানে প্রজার গোহারি'। দ্বিতীয়ত 'খিলভূমি লেখে নাল'। খিল জমি ছিল অনাবাদি অনুর্বর ডাঙ্গা জমি আর লালজমি বর্তমানের শালি জমি। অত্যাচারী ভাঁড়ু দত্ত লাঙল পিছু খাজনা নেবার পরিবর্তে প্রজাকে ভূমি অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ ধানে খাজনা দিতে বলেছেন।

তাড় বালা দিবে মান দিবে হে বলদ ধান
উচিত কহিতে কিবা ভয়।
জিনিতে প্রজার মায়া পত্র নিবে এক ছিয়া
বন্দে বন্দে যেন প্রজা রয়।
যখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম ফন্দ
দারিদ্র্যের ধানে নিবে নাগা।
খাইয়া তোমার ধন না পালায় কোন জন
অবশেষে নাহি পাও দাগা।

বর্ধমানের কবি মুকুন্দরামের বিবরণ কৃষকদের দুর্দশার ও শোষণের সমকালীন প্রতিচ্ছবি। আবার এক শ্রেণীর জমিদার ছিল যাদের বলা হত 'বনকাটি জমিদার'; যে সমস্ত ব্যক্তি বনজঙ্গল পরিষ্কার করে, প্রথমেই সেই জমিকে আবাদ যোগ্য করে তুলতো, তাদেরকে অধিকার দেওয়া হত এবং তাদের কাছ থেকে বছর তিনেক কোন রাজস্ব নেওয়া হত না। সপ্তদশ শতকে রচিত 'সারদামঙ্গলে' এর উদাহরণ আছে।

যাহার রাজা সেই অরাজত্ব জমি।
সেই গ্রাম আমারেই ইজারা দেহ তুমি ॥

তিন বৎসরের কৃষি নাহি রাজকর।
বনকাটা বেরুন্যা যে বসাল্য নগর ॥

জমিদার ছাড়া সম্পদশালী কৃষকও ছিল; তাদের বলা হত 'খুদ-কশ্‌খ' এদের কারও চার পাঁচটি লাঙলের চাষ ছিল, তারা মজুর খাটিয়ে জমি চাষ করাতো। পদ্মপুরাণে দেখা যায় চাঁদ সদাগর মজুরের কাজ করেছিলেন। নিয়োগকর্তা মণ্ডল কিষাণ।

এত শুনিয়া মণ্ডলিয়া কহে চাঁদের কাছে।
আগে কর্ম করিবার ভাত পাবে পাছে।
এতেক ভাবিয়া মণ্ডল মনে মনে পাছি।
ধান্য নিড়াইতে চান্দের হাতে দিল কাঁচি ॥

চাষবাস ছাড়া মধ্যযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও ফলাও কারবার ছিল। বর্ধমান জেলার অনেক বণিক এই ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলাও কারবার চালাতো। বণিকেরা দ্রব্য বিনিময়ের ব্যবসা করতো। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ধনপতি সদাগর সিংহলের রাজাকে এর বিবরণ দিয়েছেন।

বদলাশে নানা ধন আন্যছি সিংহলে
যে দিলে যে হয় তাহা শুন কুতুহলে ॥
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাবো নারিকেল বদলে শঙ্খ
বিরঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে শুঁটের বদলে ডঙ্ক (টঙ্ক?)

লবঙ্গ বদলে সৈন্ধব দিবে জোয়ানি বদলে জিরা
আতঙ্গ (আকন্দ) বদলে মাতঙ্গ (মাকন্দ) দিবে
হরিতাল বদলে হীরা ॥

আকন্দ সম্ভবত অর্কপুষ্প বা অর্কফল আর মাতঙ্গ-মোতি বা গজমুক্তা। বিড়ঙ্গ হচ্ছে কৃমিনাশক উদ্ভিজ ঔষধ বিশেষ। শুঁট হচ্ছে শুষ্ক আদা, টঙ্ক হচ্ছে মুদ্রা। এই বিবরণ থেকে অনুমিত হয় এ জেলা বা বাংলাদেশ থেকে সিংহলে কুরঙ্গ (হরিণ), নারিকেল, কৃমিনাশক ঔষধ, শুষ্ক আদা, লবঙ্গ, অর্কফল রপ্তানি হত আর সিংহল থেকে এ দেশে তুরঙ্গ (অশ্ব), শঙ্খ, লবঙ্গ, মুদ্রা, সৈন্ধব, লবণ, জিরা, গজমুক্তা আমদানি হত।

বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে চম্পক নগরের সাধু চন্দ্রধরের সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিয়ে বাণিজ্য যাত্রার উল্লেখ আছে। বর্ধমান জেলার বুদবুদ থানার চম্পাইনগর চাঁদ সদাগরের চম্পকনগর বলে অনুমান করা হয়। বাসুলীমঙ্গলে কাঞ্চননগরের বণিক ধূসদত্তের উল্লেখ আছে। বেনে ধুসদত্ত ও গুণদত্ত ছিলেন বণিক সমাজের প্রতিভূ।

ধনপতির পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে জেলার বহু বণিকের সমাবেশ হয়েছিল।

বর্ধমান হৈতে বান্যা আসে ধূসদত্ত
সর্বজন গায় যার কুলের মহত্ত।
কর্জনার হরি লা, আইল নীলাম্বর
নয় ভাই নয় ঘোড়া অনেক লস্কর ॥

রামদত্ত আইল যার বাড়ী নাড়ু গাঁ
পাঁচড়ার বান্যা আইল চণ্ডীদাস খাঁ
আইল বাসু লা (লাহা?) যার বাড়ী খাঁড় ঘোষ (খণ্ডঘোষ?)
কুলশীল ব্যবহারে নাহি যার দোষ।
গোতানের ধূসদত্ত আইল পাঁচ ভাই
যাদব, মাধব, হরি, শ্রীধর, বলাই।

ধূসদত্তের বাপের শ্রাদ্ধে যোলশো বেনে নিমন্ত্রিত ছিল। তখন শঙ্খদত্তই ছিল সবচেয়ে সম্মানীয়; সে-ই সর্বাগ্রে মালাচন্দনের অধিকারী কারণ তখন চাঁদবেনে জন্মায় নাই।

ধনে মানে কুলে শীলে চাঁদো নহে বাঁকা (হীন)
বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা।

বর্ধমান সম্বন্ধে হলওয়েল লিখেছেন যে দিল্লী ও আগ্রার পগেয়া ব্যাপারীরা প্রতি বৎসর এখান থেকে সীসক, তামা, টিন, লঙ্কা, বস্ত্র প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে কিনতো ও তার পরিবর্তে নগদ টাকা বা আফিম, সোরা বা অশ্ব বিনিময় করতো। পগেয়ারা সম্ভবত পাগড়িওয়ালা হিন্দুস্থানী বণিকদের নাম। কলকাতার পগেয়াপট্টী এদের স্মৃতি বহন করছে।

বাইশ অধ্যায়



ধর্ম ও সমাজ

জেলাব প্রাচীন যুগ আর মধ্যযুগের ধর্মের মধ্যে একটা বিবাট ফারাক। অতি প্রাচীনকালে ছিল অষ্ট্রিক জাতিব বাস। নানা প্রকাব পশু, ষাঁড়-এর টোটেম পুজোই তখন প্রচলিত ছিল বলেই মনে হয়। এরপর জেলায় মহাবীর বর্ধমান বিচরণ করলেও কিংবা ভরতপুরের মত স্থানে স্থানে বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হলেও এই দুই ধর্মের প্রভাব জেলার জনগোষ্ঠীব মধ্যে বিশেষ পড়ে নাই। মুসলমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণভাবে এক 'হিন্দু' কথাই এখানকার জাতি ও ধর্মকে চিহ্নিত করতো। চর্যাপদকর্তা সিদ্ধাচার্যগণের কেহ বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন কিনা কিংবা সিদ্ধাচার্যদের প্রবর্তিত বৌদ্ধ সহজিয়া তন্ত্রের কোন প্রভাব জেলাবাসীদের মধ্যে পড়েছিল কিনা তা জানার কোন উপায় নেই। যদি কিছু বৌদ্ধ সহজিয়া বা জৈন ধর্মাবলম্বী থেকেও থাকতো তাবাও হিন্দুধর্মের সংগে মিশে হিন্দুই হয়ে গিয়েছিল।

মুসলমানদের আগমনের ফলে জেলায় ইসলাম ধর্মের ঘটে অনুপ্রবেশ। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের যেমন বসবাস ঘটলো তেমনি অনেক হিন্দুকেও জোর করে ধর্মান্তরিত করে মুসলমান করা হল। অনেকে যদু থেকে জালালুদ্দিনে পরিণত হল। আজ ৭০০ বছর ধরে হিন্দু আর মুসলমান পাশাপাশি বাস করলেও দুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজ পৃথক রয়েই গেছে।

চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তন করে উভয় ধর্মের মধ্যে কিছুটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু উভয় ধর্ম ও সমাজের মৌলিক পার্থক্য দূর করতে পারেন নাই, আজও দুই-এর পৃথক সত্তা বজায় আছে।

সমাজে প্রধান সম্প্রদায় ছিল শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব আর ইসলাম। হিন্দুসমাজে পুরাণ ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীর পূজা তো প্রচলিত ছিলই, তাছাড়া তুর্কী

বিজয়ের পরবর্তী অনিশ্চয়তার ফলে বিশেষ করে নিম্নশ্রেণী হিন্দুদের ভাগ্যে কখন কি ঘটবে তার ঠিক ছিল না। মানুষের চোখে দেবদেবীও স্বৈরাচারী, কখন কার সর্বনাশ করবেন, কখন কাকে ধনে জনে ভরিয়ে দেবেন, তার ভরসা নাই। তাই আত্মসমর্পণেই লাভ, আত্মবিশ্বাসে ভরসা নাই। এরই প্রেক্ষাপটে মনসা, চণ্ডী, ধর্ম প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবী হিন্দু উচ্চবর্ণের পৌরাণিক দেবদেবীর পাশে ধীরে ধীরে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন।

জেলার হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিন জাতিরই প্রাধান্য ছিল। মুকুন্দরামের দামুন্যা ছিল—

কুলে শীলে নিরবদ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য
দামুন্যায় সজ্জন প্রধান।

মুকুন্দরাম মঠপতি বর্ণবিপ্রগণের উল্লেখ করেছেন। যে সমস্ত বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুসমাজে মিশে যেতে চেয়েছিল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ পুরোপুরি ভাবে তাদেরকে গ্রহণ করে নাই, মনে হয় এরাই মুকুন্দরামের মঠপতি বিপ্রবর্ণ। বর্ধমান জেলায় উগ্রক্ষত্রিয়দের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদের সম্বন্ধে পূর্বে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কারও কারও মতে এঁরা মানসিংহের সৈন্যদলের সাথে রাজস্থান থেকে এ জেলায় বসতি স্থাপন করেন। আবার অগ্রহাবিকের অর্থ সামন্তরাজা বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এদের উপাধি রায়, মণ্ডল, চৌধুরী তাই প্রমাণ করে। বৃত্তি অনুসারে উপাধির পরিচয়ের কথা আচার্য যদুনাথ সরকার উল্লেখ করেছেন। বক্‌সী (পো মাষ্টার), সরকার, কানুনগো (রাজকর্মচারী), সাহানা (পুলিশ প্রিফেক্ট), চাকলাদার, তরফদার, মুন্সী, খাঁ ইত্যাদি। ভারতচন্দ্রও বর্ধমান নগরীতে বিভিন্ন জাতির কথা উল্লেখ করেছেন।

কায়স্থ বিভিন্ন জাতি-দেখ রোজগারি
বেনে, মনি, গন্ধ, সোনা, কাঁসারি, শাঁখারি;
গোয়ালা, তামুলী, তিলী, তাঁতি, মালাকার,
নাপিত, বারুই, কুরী (চাষা), কামার, কুমার।
আগরী প্রভৃতি (ময়রা) আর নাগরী যতেক
যুগী, চাসা, ধোমা, চাসা-কৈবর্ত অনেক॥
সেকরা, ছুতার, নুড়ী, ধোবা, জেলে শুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র॥

কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর।
বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্তক অনেক॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আচরিক (আচার্য্য, দৈবজ্ঞ?), সগুনী (ব্যাধ বা শকুন শাস্ত্রবিৎ), ঝালিয়া (ঐন্দ্রজালিক), বাদিয়া (সাপুড়ে) প্রভৃতি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলিও বৃত্তিগত জাতি বলেই মনে হয়। মধ্যযুগে জেলায় তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের নানা কারণে কিছুটা সামাজিক মর্যাদা লাভ হয়েছিল। মানিকচন্দ্র রাজার গানে রাজা গোবিন্দচন্দ্র এক হাড়ি জাতীয় গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার আদেশ পান। শূন্যপুরাণ রচয়িতা ডোম জাতীয় রামাই পণ্ডিত ধর্মের পুরোহিত ছিলেন। ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের সেনানী ছিলেন বীর কালু ডোম।

সমাজে কঠোর জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, স্ত্রীলোকের বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ নিষেধ, কৌলীন্য প্রথা, সতীদাহ সবই পূর্ববৎ ছিল। এই সমস্ত কুসংস্কার, সামাজিক নিষ্ঠুরতা, অনাচার উচ্ছেদ করা একা চৈতন্যের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এর জন্যে আমাদের রামমোহন-বিদ্যাসাগর মহাশয়দের আবির্ভাবের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছিল।

তেইশ অধ্যায়



মধ্যযুগের সাহিত্য

তুর্কী আমলের তামস যুগের অবসানে সুবিস্তীর্ণ মধ্যযুগের বিভিন্ন পর্বে মানুষ স্থিতিশীল ও কূপমণ্ডুক হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে মানুষ যখনই আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেল তখনই তার মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠলো। এই বিকাশ বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। এই বিভিন্ন ধারার বিভিন্ন রূপ হচ্ছে মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ-কাব্য, চরিতকাব্য ও পদাবলী সাহিত্য। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন উপধারা হল—মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ও অন্নদামঙ্গল কাব্য। অনুবাদ-কাব্যের সার্থক স্ফূরণ ঘটেছে কাশীদাসী মহাভারত আর কৃত্তিবাসী রামায়ণে। চৈতন্যদেব আর চৈতন্য-পার্ষদদের জীবনী নিয়েই গড়ে উঠলো চরিতকাব্য, আর পদাবলী সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু চণ্ডীদাস। এই চণ্ডীদাস বাঁকুড়ার ছাতনার না বীরভূমের নানুরের কিংবা বর্ধমানের কেতুগ্রামের—সে নিয়ে তর্কের শেষ নাই। আবার পদাবলীর চণ্ডীদাস নিয়েও সমস্যা—বড়ু, দ্বিজ, দীন আদি—কত চণ্ডীদাস? শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর্ধমান জেলার বনপাশ গ্রামের দীন-চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে চণ্ডীদাস সমস্যায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে এর বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন। এই নবাবিষ্কৃত পুঁথিতে মোট ১২০২ পদ আছে। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীন চণ্ডীদাসের ১২০২টি পদ লোকচক্ষুর গোচরীভূত করে চণ্ডীদাস সমস্যার এক নতুন দিক খুলে দিয়েছেন। তাহলে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের চণ্ডীদাসকে নিয়ে কেতুগ্রামের দাবীর সঙ্গে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের বনপাশের দীন চণ্ডীদাস চণ্ডীদাস সমস্যায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন করলো। সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের দীন চণ্ডীদাসের পদগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় বনপাশের এই পালাগান রচয়িতা দীন চণ্ডীদাস উত্তর-চৈতন্য

যুগের কবি। সাহিত্যরত্ন মহাশয়ও এই মত প্রকাশ করেছেন। এই উত্তর-চৈতন্যযুগের দীন চণ্ডীদাস নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন ও খুব সম্ভব তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কবি।

চণ্ডীদাস নিয়ে তর্কের শেষ না থাকতে পারে কিন্তু কুলীনগ্রামের মালাধর বসুকে নিয়ে কোন তর্কের অবকাশই নাই। মালাধর কুলীনগ্রামের প্রতিপত্তিশালী বসু বংশের আদি বসু থেকে অধঃস্তন ২৪শ পুরুষ; কাজেই তিনি যে বর্ধমানেরই লোক সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকার কথাই নয়। তিনি গৌড়েশ্বর শামসুদ্দিন ইউসুফ সাহেবের কাছ থেকে 'গুণরাজখান' উপাধি পান। তিনি বাংলার লোককল্যাণ সাধনের জন্য বাংলা ভাষায় প্রথম ভাগবত রচনা করেন।

ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালী রচিয়া।

তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৪০২ শকাব্দ বা ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ; হিঁয়ালি-বর্জিত রচনাজ্ঞাপক শ্লোকে কোন বামাগতি নাই—

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।

মালাধর বসুর কাব্যের ও কবিকৃতির মূল্যায়ন করেছেন স্বয়ং চৈতন্যদেব—

গুণরাজ কিল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য আছে মহা প্রেমময়॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ, মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইলাম তাঁর বংশের হাথ॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সে-ও মোর প্রিয় অন্যজন বহু দূর।
কুলীন গ্রামের কথা কহনে না যায়।
শূকর চড়ায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একটি পদের—'কানু বলে সত্য কহি বিনোদিনীরাই। নবীন কাণ্ডারী আমি নৌকা নাহি বাই'—উদ্ধৃতি দিয়ে মন্তব্য করেছেন—'এই খানে প্রাণের খেলা, মাধুর্যের এক নবপন্থা ....ভালবাসার মাহাত্ম্যে আরাধ্য ও আরাধকের এই চিত্ত-সংযোগ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অভিনব বস্তু। এই কাব্যের এই স্থানের মৌলিক রসধারায় অনুবাদের কৃত্রিমতা নাই। ভালবাসার শাস্ত্র ভাগবতের পর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে আর একটু অগ্রসর হইয়াছিল। স্বীকার করিতেই হইবে। এই দানলীলা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না।'

মালাধরের সমসাময়িককালে বর্ধমানের বাংলা সাহিত্যে দুটি বিশেষ ধারা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়—একটি মঙ্গলকাব্যের ধারা আর একটি বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিতকাব্যের ধারা।

মনসামঙ্গল : সপ্তদশ শতকের মনসামঙ্গলের চৈতন্যপ্রভাবিত শক্তিশালী কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষেমানন্দ তাঁর নাম, কেতকাদাস তাঁর উপাধি। মনসার আর এক নাম কেতকা। কিআ পাতে জন্ম নিল 'কেতকাসুন্দরী।' মনসাকে তিনি 'কেতকাসুন্দরী' বলে প্রণাম নিবেদন করেছেন। তাই নিজের নামের পাশে 'কেতকাদাস' উপাধি ধারণ করে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। তাঁর কাব্যে বেহুলা নদীতে মান্দাসের যাত্রাপথে যেসব গ্রামের বর্ণনা আছে তার বেশীর ভাগই বর্ধমান জেলায়। দামোদরের পুরানো খাত বেয়ে বেহুলার মান্দাস ভেসে যাচ্ছে বাঁকা-বেহুলা-বল্লুকার নীরে। জুঝাটি, গোবিন্দপুর, বর্ধমান, গাংপুর, মণ্ডলগ্রাম, দেপুর, নেয়াদা, আদমপুর (আমদপুর), হাসনহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর। এগুলি এখনও বর্ধমান জেলায় মনসাপূজার প্রধান পীঠস্থান। চাঁদবেনের বাণিজ্যপথের বর্ণনাতেও অনেক ভৌগোলিক স্থানের নাম পাওয়া যায়। কেতকাদাস কখনও কখনও তাঁর কাব্যকাহিনীকে জগতীমঙ্গল বলেছেন।

জগতীমঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ গায়
এত দূরে মনসামঙ্গল হৈল সায়।

কেতকাদাস তাঁর মনসামঙ্গলে যে আত্মকাহিনী দিয়েছেন, তার থেকে জানা যায় যে কবির পিতার নাম শঙ্কর মণ্ডল; ইনি সম্ভবত স্থানীয় শাসনকর্তা (ফৌজদার) বারা খাঁর কর্মচারী ছিলেন। যুদ্ধে বারা খাঁর মৃত্যু হলে শঙ্কর মণ্ডল মুস্কিলে পড়েন এবং তাঁকে স্বগ্রাম ত্যাগ করে জগন্নাথপুরে গিয়ে সেখানকার জমিদারের কাজ গ্রহণ করতে হয়।

শুন ভাই পূর্ব কথা দেবী হইল বরদাতা
সহায় পূর্বক বিষহরি
বলিভদ্র মহাশয় চতুর্ভুজ সম হয়
তাহার তালুকে ঘর করি।
তাহার রাজতি শেষে চলি গেল স্বর্গদেশে
তিন পুত্রে দিয়া অধিকার

তিন পুত্র অল্পবয় প্রসাদ গুরু মহাশয়
তালুকের করে লেখাপড়া
তাহার কলমবশে প্রজা নাহি চাষ চষে
সোমনগর হইল কাঁথড়া।
রণে পড়ে বারা খাঁ বিপাকে ছাড়িতে গাঁ
যুক্তি করি জননীজনক।
... ...
শুনহ মণ্ডল তুমি উপদেশ বলি আমি
গ্রাম ছাড় রাত্রের ভিতরে।
... ...
নিজ গ্রাম ছাড়ি যাই জগন্নাথ-পুর পাই
হেন কালে নিশি অবসান।

শঙ্কর মণ্ডলের পূর্ব নিবাস সোমনগর বা 'কাঁদড়া'; পর নিবাস জগন্নাথপুর ঠিক কোথায় ছিল তা নিশ্চিন্তভাবে জানা যায় না। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকার ৭ম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় যতীন্দ্রমোহন দেখিয়েছেন সম্ভবত তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত জগন্নাথপুরই শঙ্কর মণ্ডলের পরনিবাস। সেকারণে হুগলী জেলা কেতকাদাসকে দাবী করে। কিন্তু কেতকাদাসের আত্মকাহিনী ও বারা খাঁর কাহিনী ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে এ যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না এবং কেতকাদাস যে বর্ধমান জেলারই অধিবাসী ছিলেন সে দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে 'যে বার খাঁ রণে পড়িল বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন সেই বারা খাঁ বর্ধমান সিলিমাবাদ পরগনার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম ভট্টাচার্যকে বিশ বিঘা মৌরসি জমি দিয়াছিলেন। কবিকঙ্কণের বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় উক্ত দানপত্রখানি কতক দিনের জন্য আমার কাছে রাখিয়াছিলেন। বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হন ও তৎপর কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল রচিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।' শিবরামের দানপত্রের তারিখ ১লা ফাল্গুন ১০৪১ সাল অর্থাৎ ১৬৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার পলাশডাঙ্গা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে পানাগড় স্টেশনের দুই মাইল দক্ষিণে সিমালপুর গ্রামে বারা খাঁর সমাধি আছে। চাঁদ সদাগরের স্থান বলে প্রসিদ্ধ চম্পাইনগর এখান থেকে পাঁচ মাইল পূর্বে অবস্থিত। এ সম্পর্কে

সাহিত্যাচার্য সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—'বারা খাঁর সমাধি বর্ধমানের কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে অনুমান করা হয়।' কিন্তু তাঁর মতে হুগলী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে ও বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে কোথাও ছিল।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে (৩য় খণ্ড ১ম পর্ব) লিখেছেন কবির পিতা শঙ্কর স্থানীয় ফৌজদার বারা খাঁর অধীনে কাজ করতেন। যুদ্ধে বারা খাঁ নিহত হলে কবির পিতা অসুবিধায় পড়েন ও গ্রাম ত্যাগ করে জগন্নাথপুরে যান ও সেখানকার ভারমল রায়ের জমিদারী কর্মে নিযুক্ত হন ও আশ্রয় পান। অধ্যাপক যতীন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে পানাগড় রেল স্টেশনের আড়াই মাইল উত্তরে কাঁকসা গ্রামই ক্ষেমানন্দের কথিত 'কাঁদড়া' গ্রাম। শঙ্কর মণ্ডল যদি বারা খাঁর সেলিমাবাদে কাজ করতেন তা হলে তাঁর নিবাস সেলিমাবাদে অর্থাৎ বর্ধমান জেলায় হওয়াই স্বাভাবিক। বারা খাঁ কিছুদিন সেলিমপুরে বাস করে মাধবপুর থানার কোটশিমুলে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে বাস করেন ও রাজস্ব আদায় করতে থাকেন। কাজেই কেতকাদাসের আদি নিবাস হুগলীর পশ্চিমে বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার কাঁসরাও হতে পারে। যাই হোক কেতকাদাসের আদিনিবাস কাঁকসাই হোক, কাঁদড়াই হোক বা জামালপুর থানার কাঁসরাই হোক কোনটাই বর্ধমান জেলার বাইরে নয়। কাজেই হুগলী জেলার দাবী কোন ক্রমেই টেকে না।

মনসামঙ্গলের অপর এক কবি বিষ্ণুপালের পুঁথি উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূম অঞ্চলে পাওয়া গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলের কোথাও কোথাও এখনও বিষ্ণুপালের 'মনসামঙ্গল' প্রাচীন রীতিতে গাওয়া হয়। এর থেকে বিষ্ণুপালকেও বর্ধমানের কবি বলেই ধরা যেতে পারে। তার কাব্যের ভাষায় পুরোপুরি বর্ধমানের আঞ্চলিক কথ্যভাষার 'বাচাল' ধরনের ছড়াগানের পদ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

> 'ফিরই মাধাই (মনসার বাহন) আওরি আওরি (বাড়ী বাড়ী)
> হিন্দু মুসলমান চিনিবারে নারি
> ভাই সবার হাতে ছুরি কাটারি।'

মনসামঙ্গলের আর এক কবি রসিক মিশ্র। ক্ষেমানন্দের মত রসিক মিশ্রও মাঝে মাঝে তাঁর কাব্যকে 'জগতীমঙ্গল' বলেছেন। রসিক মিশ্রের পৈতৃক বাড়ী বর্ধমানের উত্তর-পশ্চিম অংশে সেনভূম পরগনায় কাঁকুটে নন্দনপুর গ্রামে। পিতার নাম প্রসাদ, পিতামহ মহেশ, প্রপিতামহ কালিদাস তাঁর উপাধি ছিল শ্রীকবিবল্লভ।

প্রসাদ মিশ্রির বালা
সেবি জগতী কামনা।
রসিক তাহার নাম
পাঞ্চালিকা অনুপাম।
আখড়া শালেতে থানা
শ্রী কবিবল্লভ বাণী।

রসিক পরবর্তীকালে মল্লভূমের আখড়াশালে গিয়ে বাস করেছিলেন।

চণ্ডীমঙ্গল : চণ্ডীমঙ্গলের খ্যাতিমান কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাব্য 'অভয়ামঙ্গল' ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৫৪৪–৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত।

শহর সেলিমাবাদ তাহাতে সজ্জনরাজ
নিবাস নেউগি গোপীনাথ
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
মিরাজ (নিবাস?) পুরুষ ছয়সাত ॥

কবি তাঁর কাব্যের সূচনা দামিন্যাতেই করেছিলেন। তাঁর কাব্য মধ্যযুগের বর্ধমানের সমাজজীবনের বিশ্বস্ত কোষগ্রন্থ। বর্ধমানের গৌরব কবিকঙ্কণ।

ধর্মমঙ্গল : ধর্মমঙ্গল কাব্যের দুই প্রধান কবি রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী; দুজনেই বর্ধমানের মানুষ। রূপরামের পৈতৃক নিবাস দামুন্যা থেকে প্রায় মাইল ছয় উত্তরপশ্চিমে কাইতির পাশে শ্রীরামপুর। তাঁর কাব্যের নাম অন্নদামঙ্গল। কবির পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবর্তী, মাতা দময়ন্তী। কবির কাব্যের রচনাকাল ১৫৭১ শকাব্দ বা ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।

শাকে শীমে জড় হৈল যত শক হয়।
তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়।
রসের উপরে রস তাহে রসদেহ (৯৯৯ হিজরী)
এই শকে গীত হইল খেল করি নেহ।

রূপরাম যৌবনাবস্থায় শাকনাড়া গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগিশের পিতামহ সোদর মণিরাম তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে কিছুকাল পাঠ নিয়েছিলেন। শেষে এক হাড্ডিপা (হাড়ি) তনয়ার প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়লে অধ্যাপক তাঁকে পুঁথির পাটা ছুঁড়ে মারেন ও আসন থেকে উঠিয়ে দেন। সেদিন থেকেই গুরু-শিষ্য সম্পর্ক শেষ।

এরপর কবি ঘুরতে ঘুরতে পলাসন বিলে ধর্মঠাকুরের আদেশ পেয়ে কাব্য লেখেন। রূপরামের কাব্য বর্ধমান জেলার নানা স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে 'ধর্মমঙ্গল' রচয়িতা কবিদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ছিলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। তাঁর লেখা ধর্মমঙ্গল সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেছিল। তাঁর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলা কইয়ড় পরগনার কৃষ্ণপুর গ্রামে—বর্ধমান শহর থেকে মাইল আষ্টেক দূরে দামোদরের দক্ষিণ তীরে। পিতা গৌরীকান্ত, মাতা সীতা। ঘনরাম মহারাজ কীর্তিচাঁদের (১৭০২-৪০ খ্রীষ্টাব্দ) আশ্রিত ও বৃত্তিভোগী ছিলেন।

জগৎ রায় পুণ্যবন্ত পুণ্যের প্রভায়,
মহারাজ চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্র রায়
আর্শীবাদ করি তায় বসিয়া বারামে
কইয়ড় পরগনা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে।

তাঁর গুরু ছিলেন শ্রীরামদাস—"শ্রীরামদাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম।" কাব্যের শেষে হেঁয়ালিতে কাব্যরচনার সমাপ্তিকাল আছে—৮ই অগ্রহায়ণ ১৬৩৩ শকাব্দ (১৭১১) শুক্রবার।

শক লিখে রাম গুণ-রস-সুধাকর
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।
সুলক্ষ বলক্ষা পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি
যামসাংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি॥

ঘনরাম একটি ছোট সত্যনারায়ণ পাঁচালী লিখেছিলেন—নাম সত্যনারায়ণ রসসিন্ধু। ইহাতেও মহারাজ কীর্তিচাঁদের উল্লেখ আছে। পুঁথিটি বর্ধমান সাহিত্য সভা কর্তৃক ১৩৫১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

ধর্মমঙ্গলের আর এক কবি নরসিং বসু। তাঁর নিবাস ছিল পানাগড় ইলামবাজার সড়কের অজয় নদীর সেতুর মুখে বসুধা গ্রামে। তিনিও মহারাজ কীর্তিচাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর কাব্য আরম্ভ হয় ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে।

অধিকারী দেশের শ্রীকীর্তিচন্দ্র রায়
জগজনে যাহার যশের গুণ গায়।

ধর্মমঙ্গলের আর এক কবি হৃদয়রাম সাউ-এর নিবাস ছিল ভাতার থানার বনপাশ কামারপাড়া থেকে মাইল দুই পূর্বে খুরুল গ্রামে। খুরুল অবশ্য ছিল হৃদয়ের মামার বাড়ী কিন্তু শিশুকালে অনাথ হয়ে তিনি এখানেই মামার কাছে মানুষ হন। তাই খুরুলই ছিল তাঁর কাছে জন্মভূমিতুল্য—

নিরজনে চরণে সদাই অভিলাষ।
ইহা গাইল হৃদয় সাউ খুরুলে যার বাস।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম রচয়িতা রামকান্ত রায়ের নিবাস ছিল দামোদরের ৩/৪ ক্রোশ দক্ষিণে সেহারা গ্রামে। তিনি বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্রের (১৭৭০-১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁব আত্মকাহিনীতে অষ্টাদশ শতকের দক্ষিণ রাঢ়ের চাষী পরিবারের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়।

নিবাস সেহাড়া গ্রাম পুরুষ বিস্তব।
সামিল সমরশাহি পরগনা ভিতর।
বর্ধমান চাকলা হস্তিনা বরাবর
শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র রায় যাহার ঈশ্বর।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ের কবি শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের গ্রন্থের নাম 'নিরঞ্জনমঙ্গল'। তাঁর সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই। তবে খণ্ড পুঁথি বর্ধমানের পশ্চিমে গোপভূমি অঞ্চলে পাওয়া গেছে। তাঁর রচনায় ইছাই ঘোষের পিতা সোম ঘোষকে শ্যামরূপার উপাসক বলা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য; তাঁর কাব্যে ভাষাগত আঞ্চলিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—

নিরঞ্জন মঙ্গলচণ্ডীর ইতিহাস
সোম ঘোষে কহিলা সিদ্ধি চণ্ডীদাস।
উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীদাস করে বেদধ্বনি
এক মনে সোম ঘোষ পূজেন ভবানী।

এই সমস্ত তথ্য থেকে শ্রীশ্যাম পণ্ডিতকে বর্ধমানের কবি বলে দাবী করা অযৌক্তিক হবে না।

সীতারাম দাস তাঁর ধর্মমঙ্গল রচনা কবেছিলেন ১০০৪ মল্ল সালে অর্থাৎ ১৬৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। কবি ছিলেন জাতিতে কায়স্থ; নিবাস সুখসায়ের মাতুলালয় ইন্দাস। তিনি মনসামঙ্গল পুঁথিও রচনা করেছিলেন—সেখানে তাঁর যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে জানা যায়—তাঁর পিতা দেবীদাস ও মাতা কেনুবতি।

সীতারাম দাস গায়　　　পড়িয়া দেবীর পায়
এইবার দুঃখ কর দূর।
দেবীদাস যার পিতা　　　কেনুবতি যার মাতা
দয়া কর শঙ্কর গোঁসাঞী।

সুখসায়ের ও ইন্দাস বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত। সে কারণে এ জেলা সীতারামকে তাঁদের জেলার কবি বলে দাবী করতে পারে। কিন্তু সীতারাম যখন

কাব্যরচনা করেন তখন বাঁকুড়া জেলার অস্তিত্বই ছিল না। বিষ্ণুপুর, মান্দারণ, ইন্দাস সরকার নিয়ে বর্ধমান চাকলা গড়ে উঠেছিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এক সরকারী আদেশ বলে বর্ধমান থেকে ভেঙে বাঁকুড়া জেলার সৃষ্টি হয়। সেই হিসাবে বর্ধমান জেলা সীতারামকে জেলার কবি বলে দাবী করতেই পারে। এই যুক্তিতে বাঁকুড়ার দাবী ধোপে টেকে না।

মঙ্গলকাব্যের পর আসে অনুবাদসাহিত্য। অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে কাশীরাম বর্ধমান জেলাকে গৌরাবান্বিত করেছেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার সিঙ্গিগ্রামে এঁর জন্ম—কবির উপাধি দেব, জাতিতে কায়স্থ। পিতার নাম কমলাকান্ত। কাশীরামের দুই ভাই অগ্রজ গদাধর ও অনুজ কৃষ্ণদাসও কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। একাধিক পুঁথি বিচার করে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে ষোড়শ শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের প্রথমে তিনি সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণে 'ভারত পাঁচালী' রচনা করেন; তবে বিভিন্ন পুঁথি থেকে জানা যায় তিনি গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নাই—

আদি সভা বন বিরাটের কত দূর
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর।

পাঁচালীর বাকী অংশ রচনা করেন কবিপুত্র দ্বীপায়ন দাস ও ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম। কাশীরাম কিন্তু মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। ভাবানুবাদ করেছেন। যদি তিনি আক্ষরিক অনুবাদ করতেন তাহলে বোঝা যেত বাঙালীর মৌলিক প্রতিভার অভাব ঘটেছে। কবির সম্বন্ধে মাইকেল মধুসূদনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান
হে কাশী! কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষের দিকে 'হিন্দুস্থ শিখরভূমি ভবন ভুলুই গ্রামে বন্দ্যঘটী বিপ্রের নফর' জগৎরাম— রাম রায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামপ্রসাদের সহযোগিতায় 'বৃহত্তম রাম-কথা নিবন্ধ' 'অদ্ভুত রামায়ণ' রচনা করেন। পিতাপুত্রে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' নামক দেবীলীলাও রচনা করেন। বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জের কাছে দামোদর নদীর দক্ষিণ তীরে ভুলুই গ্রামে জগৎরামের নিবাস ছিল। ভুলুই ছিল সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে বর্ণিত বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে শিখরভূম পরগনার অন্তর্ভুক্ত। জগৎরামের অদ্ভুত রামায়ণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— এটি নয় কান্ডে বিভক্ত—আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কা,

পুষ্কর, রামরাস ও উত্তরাকান্ড। রামায়ণ সম্পূর্ণ হয় ১৭১২ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে (১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ)। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যও নয়টি সর্গে বিভক্ত।

জগদ্রামী রামায়ণের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে মেঘনাদের একজন সহধর্মিণীর চিত্র আঁকা হয়েছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে সুলোচনা। দেশ পত্রিকার ৬ই মার্চ ১৯৮২ সংখ্যায় প্রমীলার উৎস প্রবন্ধে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—'এই জগদ্রামী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত মেঘনাদ-পত্নী (প্রমীলার) যে চরিত্র আছে, আমাদের ধারণা তাই প্রমীলা চরিত্রের উৎস বলে পরিগণিত হবার যোগ্য। ...মেঘনাদপূর্ব বাঙলা কাব্যে মেঘনাদ-পত্নীর এই একটি স্বাধীন চরিত্র চিত্রিত হয়েছে যার পরিণতিও প্রমীলার পরিণতির অনুরূপ, পতির সঙ্গে চিতারোহণ, জগদ্রামের সুলোচনা চিতারোহণের বর্ণনা—

শ্বশুর শাশুড়ী পদে প্রণাম করিল।
... ...
নতি করি বলে সতী না করি এ ভয়।
এই বলি চিতাপাশে করিল বিজয় ॥
রাম রাম বলি সতী চিতায় চাপিল।
পতি হস্ত মস্তক আপন কোলে নিল ॥
এ সময়ে দশানন বলয়ে রাক্ষসে।
চিতায় ঢালছে ঘৃত কলসে কলসে ॥

মেঘনাথ বধের সহমরণ দৃশ্যে প্রথমে/কহিল বাহকে। সুগন্ধ চন্দন কাষ্ঠ ঘৃত ভারে ভারে। এর পর প্রমীলা—

প্রণমিয়া গুরুজনে মধুর ভাষিণী
চিতায় আরোহী সতী (ফুলাসনে যেন)।
বসিলা আনন্দমতি পতি পদতলে।
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য—

বর্ধমানের গর্ব যে, জগদ্রাম 'রেনেশাঁসের প্রেরণাদীপ্ত নারীমুক্তির বাণীবাহক' মধুসূদনকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। মধুসূদন জগদ্রামের কাব্য থেকে প্রমীলার সহমরণের এই চিত্র পেয়েছিলেন এবং বৈচিত্র্যের খাতিরে এটি আর ত্যাগ করতে পারেন নাই।

মানকরের সন্নিকট মাড়োর রঘুনন্দন গোস্বামী 'রামরসায়ন' রচনা করেন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে।

অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' নামক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কোন কাব্যের ও হরিভক্তিচন্দ্রিকা এবং জীবনীগ্রন্থ কর্ণানন্দের অনুবাদ করেছিলেন কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মালিহাটী গ্রামের যদুনন্দন দাস। অনুবাদ ছাড়াও যদুনন্দন বিদ্যাপতির কোন কোন পদের ভাব বিস্তার করেছিলেন।

ফারল মল্ল তোরল হার
কহহি কহব তাই করএ বিহার।
ভনয়ে বিদ্যাপতি ইহ রসরায়
ইহ অবশেষ যদুনন্দন গায়।

বর্ধমান থেকে মাইল ছয় উত্তরে তালিত গ্রামের 'কবীন্দ্র' ভট্টাচার্য সংস্কৃতে 'উদ্ধবদূত' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। এক অজ্ঞাতনামা কবি এই কাব্যকে বাঙলায় রূপান্তরিত করেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর "বিলাপ কুসুমাঞ্জলি" অনুবাদ করেছিলেন শ্রীখণ্ডের কৃষ্ণচন্দ্র দাস; বইটির নাম 'বিলাপ বিবৃতিমালা'।

শ্রীখণ্ডের অধিবাসী রামগোপাল দাস 'রাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী' নামে প্রথম পদ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বইটি 'বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম' শক অর্থাৎ ১৫৯৫ শকাব্দের বৈশাখ থেকে কার্তিক মাসের রচনা।

অষ্টাদশ শতকেও দু-চারখানি চৈতন্যজীবনী লেখা হয়েছিল। এর মধ্যে বর্ধমান জেলার উত্তর অংশে কুলনগরের প্রেমদাস এর 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী' উল্লেখযোগ্য। প্রেমদাসের আসল নাম পুরুষোত্তম মিশ্র, উপাধি সিদ্ধান্তবাগীশ। প্রেমদাস পুরুষোত্তমের গুরুদত্ত নাম। এঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বংশীশিক্ষা'।

কাটোয়ার কয়েক ক্রোশ উত্তরে টেঞা বৈদ্যপুর গ্রামের 'বৈষ্ণবদাস' গীত কল্পতরু বা পদকল্পতরু নামে বিরাট পদসংহিতা রচনা করেছিলেন। এই বৈষ্ণব-পদাবলী-সরিৎসাগর রচয়িতার আসলনাম গোকুলানন্দ সেন। বৈষ্ণবদাস তাঁর সঙ্কলের ইতিহাস দিয়েছেন—

নানা পর্য্যটনে পদ-সংগ্রহ করিয়া
তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া।
সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল।
এই গীত কল্পতরু নাম কৈলুঁ সার।
পূর্বরাগাদি ক্রমে চারি শাখা তার।

এই বিরাট গ্রন্থে এক শত ত্রিশ জনেরও বেশী মহাজনের তিন হাজারের বেশী পদ সংগৃহীত আছে। বিশ্বনাথ, নরহরি, রাধামোহন, বৈষ্ণবদাস এই চার পদাবলী সংকলয়িতার সকলেই উত্তররাঢ়ে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসী।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দুই দশকের পদকর্তাদের মধ্যে বর্ধমান জেলার নিবাসী কাঁদরার গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের পুত্র শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের নাম উল্লেখযোগ্য। কীর্তন গানের সমকালীন রীতি উদ্ভাবনে চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের অনেকখানি অবদান ছিল। চন্দ্রশেখর শশিশেখরের অনেকপদ প্রাচীন মৈথিলী বা ব্রজবুলি পদ নিয়ে গঠিত আবার সংস্কৃত ব্রজবুলি মিশ্র ভাষারও প্রয়োগ দেখা যায়।

কোকিল অবহু মধুর (মধু) ভাখহু গগনে উদয় করু চন্দর
পাঁচ বাণ অব লাল শত হউ মলয়-সমীর বহু মন্দা।
আজু কুঞ্জে অলি লাখ লাখ ঝঙ্করু বহুক দক্ষিণ পবনে
বসন্তঋতু অব নীতিনীতি হউ চন্দ্রশেখর পরমাণে।

সংস্কৃত ব্রজবুলি মিশ্র পদ—

রাধা ॥ কস্তং শ্যামলবাসা
উদ্ধব ॥ হরিকিঙ্কর হাম উদ্ধব নামা।

শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের বংশধর জগদানন্দ পদাবলী সংগ্রহ করেন। তাঁর পদাবলীর সঙ্কলয়িতা ছিলেন কালিদাস নাথ। তিনি পরে সেনভূম পরগনায় জোকলাই গ্রামে বসতি করেন। তাঁর রচনার নমুনা—

দশন কুন্দকুসুম নিন্দু বদন জিতল শরদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরম ঘরমে প্রেমসিন্ধু প্যারী।

পদে অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি।

বলরাম চক্রবর্তী কবিশেখরের রচনার নাম 'কালিকামঙ্গল'। ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গলের মত এ কাব্যের বিষয়বস্তু বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী। পুঁথির শেষাংশ খণ্ডিত। সম্ভবত ইনি সপ্তদশ শতকের কবি। তাঁর নিবাস দক্ষিণরাঢ় বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে বলেই মনে হয়। তাঁর কাব্যের দিগ্‌বন্দনায় জেলার দেবদেবীর প্রাধান্য—কিরীটকোণার দেবী, বালিডাঙ্গার রাঢ়েশ্বরী, ভাণ্ডারার চামুণ্ডা, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ইত্যাদি। বলরামের পিতা দেবীদাস আচার্য, মাতা কাঞ্চনী।

কাহিনীতে সুন্দরের পিতা গুণসাগর, মাতা গুণমতী, বাসস্থান উৎকল দ্রাবিড় দেশ মানিকানগর। বিদ্যার পিতা বীরসিংহ মাতা কুন্তী নিবাস বর্ধমান। বলরামের রচনা সরল, পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্যতাবর্জিত।

চরিতকাব্য : চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের অধিকাংশের বসবাস ছিল বর্ধমান জেলায়। বাংলা ভাষায় এই মৌলিক জীবনী-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চারখানি —বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের

চৈতন্যমঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। চারজনই বর্ধমানের গৌরব।

কবি বৃন্দাবন দাসের ব্যক্তি পরিচয় সম্বন্ধে সবিশেষ জানা যায় না। তিনি গুরু নিত্যানন্দের তিরোধানের পর বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার দেনুড়ে বসবাস করেন। মাতা ছিলেন শ্রীনিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী বালবিধবা নারায়ণী। প্রচলিত আছে বৃন্দাবন দাসের জন্মকে সামাজিক করার জন্য চৈতন্যদেব তাঁর চর্বিত তাম্বুল প্রসাদরূপে নারায়ণীকে দেন ও গর্ভের সন্তানকে আর্শীবাদ করেন। সেই আর্শীবাদ নিয়েই বৃন্দাবন জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত ষোড়শ শতকের প্রথমার্দ্ধে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর কাব্যের নাম চৈতন্যভাগবত। গ্রন্থখানা তিনখণ্ডে বিভক্ত। মহাপ্রভুর শৈশব থেকে নীলাচল গমন পর্যন্ত তাঁর জীবনের ইতিহাস এই গ্রন্থে বিধৃত। এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য—ইতিহাসের সত্যতা। চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থের মূল্যায়ন করেছেন—

মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।

চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের কবি লোচনদাসের বাড়ী ছিল মঙ্গলকোটের কাছে কোগ্রামে। পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতা সদানন্দী পাঠান্তরে অরুন্ধতী। জাতিতে বৈদ্য। তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার।

চৈতন্যমঙ্গলের আর এক কবি জয়ানন্দ। তাঁর আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় বর্ধমান জেলার আমাইপুরায় তাঁর জন্ম। পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতা রোদিনীদেবী। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ডঃ সুকুমার সেনের মতে সাতগেছিয়া থানার বড়োয়ার কাছে যে আমাইপুরা—সেটিই কবির জন্মস্থান।

বর্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে
আমাইপুরা তার নাম
তাহে সুবুদ্ধি মিশ্র গোঁসাঞির পূর্বশিষ্য
তার ঘরে করিল বিশ্রাম।

চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাবার পথে গৌড় যাত্রাপথে মান্দারণ থেকে সুবুদ্ধি মিশ্রের ঘরে উপস্থিত হয়ে ছেলেকে 'গুয়ে' বলে ডাক দেন। জয়ানন্দের ডাক নাম ছিল গুয়ে। চৈতন্যদেব সুবুদ্ধি মিশ্রের ঘরে বিশ্রাম করেন ও গুয়ের নাম পরিবর্তন করে জয়ানন্দ রাখেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি রচিত হয়।

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কাটোয়ার কাছে ঝামটপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ভগীরথ, মাতা সুনন্দা। কবি নিত্যানন্দের ভক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দের আদেশে তিনি বৃন্দাবন যান ও সেখানে রূপসনাতন, রঘুনাথ প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যের কাছে বৈষ্ণব ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বৃন্দাবনের মহাজনমণ্ডলীর আদেশেই তিনি শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবন অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত যেইজন শুনে। তাহার চরণ ধূঞা করি মুঞি পানে।' তাঁর কাব্য সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—'চৈতন্যচরিত হিসাবে কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তত্ত্ব বিচার, সবদিক দিয়াই চৈতন্যচরিতামৃত শ্রেষ্ঠ।'

কবি জ্ঞানদাস বর্ধমান জিলার বাঁদরাগ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে ১৫৩০ খৃঃ এ জন্মগ্রহণ করেন—

কবি কুলে যেন রবি জ্ঞানদাস তুল্য কবি
জ্ঞানদাস বিদিত ভুবনে।

তাঁর ভণিতায় চারি শত পদ পাওয়া গেছে। হৃদয়ের গভীর তলের মর্মকথাকে তিনি বাণীবদ্ধ করেছেন—'রূপলাগি আঁখি ঝরে, গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে, প্রতি অঙ্গ মোর।'

'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' গোবিন্দদাসও বর্ধমানের কবি। ষোড়শ শতকের পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাসের কাটোয়ার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। পিতা চিরঞ্জীব সেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন ছিলেন। শ্রীনিবাসের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণববিনয়বশতঃ তিনি 'দাস' উপাধি গ্রহণ করেন। কাব্যসিদ্ধির পুরস্কার স্বরূপ লাভ করেন কবি 'কবিরাজ' উপাধি। গোবিন্দদাসের ভণিতায় সাত শতে'রও বেশী পদ পাওয়া গেছে। এর অধিকাংশ ব্রজবুলিতে রচিত, ব্রজবুলিতেই তাঁর উৎকর্ষ। তাই তো তিনি 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'। বিদ্যাপতির পদ অলঙ্কার বহুল, গোবিন্দদাসের অভিসার পদে প্রাণাবেগ ও আত্মবিশ্বাস।

কণ্টক গাড়ি, কমল সম পদতল, মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি
গাগরি বারি, ঢালি করি পিছল, চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।

এমন নিখুঁত অবলোকন ও চিত্রায়নের শিল্পী দ্বিতীয় বিদ্যাপতি কবিরাজ গোবিন্দদাস।

গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ-ও সুকবি ছিলেন। তিনিও শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। এঁর একটি মাত্র পদ পাওয়া গেছে—পদটি সংকীর্তনামৃতে সংকলিত। পিতার মত তিনিও ব্রজবুলির ধাঁচে কাব্যরচনা করতেন বলে ধারণা।

তব ধরি মনসিজ হানয়ে বাণ
নয়নে কাহ্ন বিনু না হেরিয়ে আন।
দিব্য সিংহ কহে শুন ব্রজরামা
রাই কাহ্ন একতনু দুই এক ঠামা।

দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যামও ব্রজবুলি পদ রচনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন। ইহার 'গুরু পূজাঞ্জলি গোবিন্দরতি মঞ্জরী'তে সংস্কৃত শ্লোকের সূত্রে অনেকগুলি ব্রজবুলি পদ গ্রথিত আছে।

এছাড়া পূর্বস্থলী দোখায়িরার মনোহর দাস, বলরাম দাস, কাঁদড়ার জ্ঞানদাস, সেনভূমের জোকলাই গ্রামের—জগদানন্দ, পাটুলীর বংশীবদন চট্ট, অম্বিকা কালনার কৃষ্ণদাস, ঘনশ্যাম দাস, কাউগ্রামের পরমেশ্বরী, মালিহাটীর যদুনন্দন দাস, শ্রীখণ্ডের দামোদর সেন, রামগোপাল দাস প্রমুখ কবিদের পদাবলী সাহিত্যে অবদান উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে কাঞ্চননগরের গোবিন্দদাস কর্মকারের কড়চার বিষয় কিছু আলোচনা দরকার। গোবিন্দদাস ছিলেন বর্ধমানের সন্নিকট কাঞ্চননগরের শ্যামদাস কর্মকারের পুত্র। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পর থেকে দক্ষিণভাবত ভ্রমণ পর্যন্ত চৈতন্যদেবের জীবনের প্রামাণিক গ্রন্থ এই 'গোবিন্দদাসের কড়চা'। এটি ১৮৯৫-তে জয়গোপাল গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে 'গোবিন্দের লেখায় এমন একটু সারল্যমাখা সত্যপ্রিয়তা আছে, যাহাতে কড়চাখানা ফটোগ্রাফের ন্যায় সুন্দর ও বিশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়। অশিক্ষিত সরল ভৃত্য প্রভুর খড়ম দুইখানা স্কন্ধে করিয়া কিছু প্রসাদ ভক্ষণের লালসার সঙ্গে ঘুরিতেন, তিনি বাগ্‌দেবীর বরে চির-যশস্বী হইয়া ব্যাস ও বাল্মীকির উত্তরাধিকারী হইবেন এমন কোন অহংকারের ভাব তাঁর রচনার আবেগপূর্ণ সারল্য পরাভূত করিতে পারে নাই। আমরা নানা কারণে এই পুস্তকখানি চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করি।' কিন্তু মৃণালকান্তি ঘোষ ও দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যবাসী অমৃতলাল শীল, গোবিন্দদাসের কড়চাকে জাল বলে মন্তব্য করেছেন। অমৃতলাল শীলের মতে কড়চা যিনি লিখেছিলেন তিনি যোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর লোক হতেই পারেন না—তিনি অত্যন্ত আধুনিক ব্যক্তি।

ডঃ সুকুমার সেন-ও এর প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এ নামে কোন লোক ছিল না ও দাক্ষিণাত্যেও যায় নাই। 'যুক্তিতর্কের উপরে বিশ্বাসকে স্থান না দিলে গোবিন্দদাসের কড়চাকে খাঁটি বলা অসম্ভব।' তবে গোবিন্দদাস যে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের কদিন আগে ও পরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন এ কথা তো ঠিক—

মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য আর গোবিন্দ কর্মকার
মোর সংগে আইস কাঁটোয়া গঙ্গাপার।

অথবা, মুকুন্দ গোবিন্দানন্দ সংগে নিত্যানন্দ
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে পার হইলা গৌড়েশ্বর।

গোবিন্দদাসের কড়চা হয়তো তর্কাতীত নয় কিন্তু কড়চায় যে ভাবে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে বা গোবিন্দ যে কাঞ্চননগরের অধিবাসী ছিলেন এসব বিচার করলে কড়চাকে একেবারে জাল বলে উড়িয়ে দেওয়া মুস্কিল। হয়ত কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত থাকতে পারে বলেই ধারণা।

কুলনগরের প্রেমদাস-এর 'বংশীশিক্ষা'র কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'বংশীশিক্ষা থেকে জানা যায় জাহ্নবার পুত্র কৃতক ও শিষ্য রামচন্দ্র 'কড়চা', 'অনঙ্গমঞ্জরী সম্পুটিকা' ও 'পাষণ্ডদলন' রচনা করেন। রামচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীনন্দনের তিন পুত্র—রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশব যথাক্রমে 'বংশীবিলাস' 'শ্রীবল্লভ লীলা' ও 'কেশবলীলা' রচনা করেছিলেন। শেযোক্ত গ্রন্থ দুটি পদাবলী। শ্রীখণ্ডের নরহরি ও কুলিয়ার ছকড়ি চট্ট ও বংশীবাদন প্রায় একই সময়ে সাধনাঘটিত পদ লেখেন। বাঘনাপাড়ার পাটে এঁদের শিষ্যপরম্পরায় এই সাধনা (বৈষ্ণব উপাসনায় তান্ত্রিক পূজার উপাদান) ঘটিত পদরচনা পদ্ধতি চলে আসে। রাগাত্মিক পদাবলীর 'চণ্ডীদাস' বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন 'শ্রীবড়ু ঠাকুর'। 'বিপ্র-কুলে জন্ম ধীর শ্রীবড়ু ঠাকুর, নিবাস শ্রী শালডাঙ্গা মনসবপুর।' মনসবপুর বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার ৭৩ নং মৌজা। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ইনি বড়ু চণ্ডীদাস হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।' তা যদি হয় চণ্ডীদাস সমস্যায় নানুর, ছাতনা, কেতুগ্রাম, বনপাশের সংগে মনসুবপুর আর একমাত্রা যোগ করল। অকিঞ্চন দাস বিবর্তবিলাস লিখেছিলেন। বিবর্ত-বিলাসে চণ্ডীদাসের ভণিতায় অনেকগুলি পদ আছে।

শাক্ত পদাবলী : শাক্ত পদাবলীর রচয়িতা হিসেবে কালনার কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের নাম করতে হয়। এঁর মামার বাড়ী ছিল খানা জংশন স্টেশন থেকে মাইল তিন দূরে চান্না গ্রাম—কমলাকান্তের সাধন পীঠ। প্রবাদ আছে 'যদি যাবি

চান্না। ঘরে উঠবে কান্না।' কথিত আছে একবার মাতুলালয় চান্না আসার পথে ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় ঠেঙ্গাড়ে দস্যুদের দ্বারা কমলাকান্ত আক্রান্ত হন—তখন সাধক কমলাকান্ত গেয়ে উঠলেন—

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি—তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি দেখে হলেম সাহস-ভাঙ্গা
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদ কালে কেউ কোথাও নাই।
ঘর বাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা।

এই সঙ্গীতে পাষাণ-হৃদয় ডাকাতদের প্রাণ গলে গেল—লুটিয়ে পড়লো সাধকের পদতলে—মাতৃনামে ধন্য হল দস্যুদল।

কমলাকান্ত ছিলেন মহারাজ তেজচন্দ্রের আশ্রিত, তিনি 'সাধকরঞ্জন' নামে তান্ত্রিক যোগ নিবন্ধ রচনা করেন। মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ ১২৬৪ সালে কমলাকান্তের পদাবলী ছাপিয়ে প্রকাশ করেন—এতে ২৬৯টি পদ আছে। শাক্ত কবি নীলাম্বর চক্রবর্তী প্রায় চারশো শাক্তগীত রচনা করেন—তাঁর নিবাস ছিল দেবীপুরের সন্নিকট আলিপুর গ্রাম। নবাই ময়রা (১১৯৯–১২৫১ বঙ্গাব্দ) অপর এক শাক্তকবি—তাঁর শাক্তগানে কালী ও কৃষ্ণের পার্থক্য দূর হয়ে যায়। অম্বিকা কালনার নিকটবর্তী বাঁদমুড়া গ্রামের দাশরথি রায় (১৮০৬–৫৭) শেষ ও শক্তিশালী পাঁচালীকার। তাঁর পিতা দেবীপ্রসাদ ও মাতুল রামজীবন চক্রবর্তী। দাশরথি ছোটবেলা থেকে তাঁর মাতুলালয় পিলা গ্রামে মানুষ হয়েছিলেন। কবি-গায়িকা অক্ষয় বাইতিনীর নিকট তাঁর শিক্ষা। বয়সে বড় হলেও বাইতিনী দাশুর প্রণয়িনী ছিল। বাইতিনী দাশরথীর দলে গাঁথনদারের কাজ করতো। দাশরথির পাঁচালীর পালাগুলি দশখণ্ডে প্রকাশিত হয়। কিছু পালা অশ্লীল পর্যায়ে পড়ে। এগুলি ছাড়া দাশরথি পালাগানের অনুপ্রাস যমকের ঝঙ্কার ও সুরের লালিত্য লোককে মুগ্ধ করে দিত।

মম মানস-সদা ভঞ্জ দ্বিজচরণ পঙ্কজ
দ্বিজরাজ করিলে দয়া বামনে ধরে দ্বিজরাজ।
হরিতে অসাধ্যব্যাপি বৈদ্যনাহিপান, পান বিধি
সে রোগের ঔষধি কেবল ব্রাহ্মণের পদরজ।

(জন্মাষ্টমী পালা)

পৌরাণিক বিষয় ছাড়াও সমসাময়িক সামাজিক ঘটনাও তাঁর পালাগানে বিধৃত ছিল।

বিধবা বিবাহ্ কথা
কলির প্রধান স্থান কলিকাতা
নগরে উঠেছে অতি রব...
ক্ষীরপাই নগরে ধাম
ধন্য গণ্য গুণধাম
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক
তিনি কর্তা বাঙ্গালীর
তাতে আবার কোম্পানীর
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক।

ধোয়াবনীর গীতরত্ন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (কণ্ঠ মশাই) কৃষ্ণযাত্রার পালা রচনায় সিদ্ধহস্ত। তিনি দাশরথির ভাবশিষ্য। হেতমপুরের জমিদার রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তীর বাল্যজীবনী অবলম্বনে তিনি 'বাল্যলীলাকৃত' রচনা করেন।

বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের সভাপণ্ডিত 'চিত্রচম্পূকাব্য' রচয়িতা বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার শেষ বয়সে বর্ধমান জেলার নিশিড়াগড়ে বাস করতেন। তাঁর চিত্রচম্পূ কাব্যে বর্ধমানে বর্গী হাঙ্গামার, লুঠতরাজের ও নৃশংস অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী পাওয়া যায়। বাণেশ্বরের বর্ণনায় আছে।

যান্ত্যেকেন দিনেন যোজশতং হীনাস্ত্রংদীনানাং স্ত্রিয়োঃ
বালান্ ঘ্নন্তি হরন্তি বিত্তমখিলং, সাধ্বীশ্চ সীমন্তিনঃ।

(বর্গীরা) একদিনে এক শত যোজন যায়, নিরস্ত্র দরিদ্র স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে হত্যা করে। সতী সাধ্বী স্ত্রীলোককে অপহরণ করে সমস্ত সম্পদ হরণ করে। যদুনাথ সরকারও প্রত্যক্ষদর্শী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের চিত্রচম্পূতে বর্ণিত বর্গীদের অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন—Shahu Raj's troops are niggard of pity, slayers of pregnant women and of Brahmans and the poor, fierce of spirit, expert in robbing property of every one and committing every kind of sinful act. Their main strength lies in their marvelously swift horses.

মহারাজ ত্রিলোকচাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাষ্ঠশালী গ্রামের ব্রজকিশোর রায় কাব্য রচনা করেন। মহারাজ প্রতাপচাঁদ নিজে শ্যামাসঙ্গীত রচনা করতেন। পরাণচাঁদ কাপুর 'হরিহরমঙ্গল' রচনা করেন।

সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ পূজার অঙ্গ হিসাবে সত্যনারায়ণ-পাঁচালী রচনা করেন—পাটুলি নারায়ণপুরের মৌজিরাম ঘোষাল, মন্তেশ্বর-ভারুহা গ্রামের দ্বিজ

গিরিধর (১০৭০ সাল), ধাত্রীগ্রামের কৃষ্ণকান্ত, নাশিগ্রামের কাশীনাথ ভট্টাচার্য, মীরহাটের গোপাল ভট্টাচার্য। ঘনরামের সত্যনারায়ণ-পাঁচালীর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে জানাই বর্ধমানের সাহিত্যের ইতিহাসের বিশাল ও ব্যাপক ক্ষেত্রে কত সাহিত্যিক, কবি, পালাকার নীরবে সাহিত্যসাধনা করে গেছেন, কত কবির কাব্য যে অজ্ঞাত থেকে গেছে, কত পুঁথি যে নষ্ট হয়ে গেছে, এসবের ইতিহাস জেলার রচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই। যে কয়েকজনের সাহিত্যকৃতি আলোচনা করা গেছে তাও সম্পূর্ণ নয়। তাঁদের সাহিত্যকৃতির সামান্য কিছু উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। এর জন্যে একটা অপরাধবোধ বিবেককে পীড়া দেয়। তবে আমি সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে বসি নাই—সে দুঃসাহসও আমার নাই। 'ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাসকে যত নিরাপদ দূরত্বে পরিত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল'—এই সান্ত্বনা সম্বল করেই এই মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রসঙ্গ সাঙ্গ করি।

চব্বিশ অধ্যায়



মধ্যযুগের বর্ধমানে স্থাপত্য, শিল্প ও ভাস্কর্য

মধ্যযুগের সুলতানী আমলে, মোগলযুগে ও নবাবী আমলে বর্ধমান জেলায় যা কিছু স্থাপত্যের নিদর্শন, তা আছে হিন্দুআমলের মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে, আর আছে সুলতান ও নবাবদের নির্মিত মসজিদ ও সমাধি ভবনের মধ্যে।

সুলতানী আমলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির মিলন পারসীক ও সারা-সেনীয় শিল্পরীতির সঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পরীতির সমন্বয় দেখা যায়। এর ফলে মসজিদে বাংলার চালাঘরের আদলে খিলান তৈয়ারী, আবার হিন্দু মন্দিরে গম্বুজের আকারে চূড়া তৈরী রীতির প্রচলন ঘটে। মুঘল স্থাপত্যের মূল শিকড়ও ভারতীয় প্রথায় গাঁথা ছিল। ফলে মুঘল স্থাপত্য অনেক পরিমাণে সুলতানি যুগের স্থাপত্যের উত্তরাধিকার লাভ করে। ভারতে মুঘল শাসন স্থাপনের আগেই ভারতীয় স্থপতিরা এই শিল্পকলায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিল। তাছাড়া স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রভাবও সুস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ে। মসজিদ স্থাপত্য সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন—"A mixed style of architecture characterised by the use of bricks in the main, the subsidiary use of stone, the use of pointed arches on short pillar and the muslim adaptation of the traditional Hindu temple style of curvilinear cornices copied from bamboo structures and of beautifully carved Hindu symbolic decorative designs like the lotus."

ইসলামী মসজিদ ও মাজার স্থাপত্যের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

মসজিদ-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য :

১) এগুলি প্রধানত ইষ্টকনির্মিত, অবশ্য কোন কোন স্থানে স্তম্ভ ও প্রাচীরের বহিরাবরণে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষত আর্দ্র

অঞ্চলে মসজিদকে আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করার জন্য ভিত্তিমূলে এক সারি পাথর বসান হয়েছে। ইটের গাঁথনি মজবুত করার জন্য চুনের ব্যবহারের প্রচলনও পরিলক্ষিত হয়।

২) দালান বাড়ীতে চারকোণে চারটি ইটের ও পাথরের ওপর অর্ধবৃত্তাকার খিলান নির্মিত হত। ইট বা পাথরগুলি সমান্তরাল ভাবে একটির পর একটি না বসিয়ে কোণাকুণি ভাবে পাশাপাশি সাজিয়ে খিলান (arch) ও বড় বড় গম্বুজ নির্মাণও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হিন্দুযুগের অনুকরণে দেওয়ালের গায়ে সামনের খিলানে নানারকম লতাপাতা, জ্যামিতিক নক্সাও খোদাই করা হত।

৩) দুই এক ক্ষেত্রে ছাদের ওপর গম্বুজের পাশে খড়ের চালের ঘরের মত ছোট ছোট কক্ষও দেখা যায়। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নানা আকারের মিনা করা কাচের মত মসৃণ টালি বা ছোট আকারের ইট ব্যবহার করা হত। তবে এরকম স্থাপত্যের সংখ্যা খুবই কম। যাও বা ছিল কালের করাল গ্রাসে তাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জেলার যত্রতত্র কিছু জীর্ণ অট্টালিকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তবে তার কোন ইতিহাস জানা যায় না।

সুলতানী আমলের যে সব মসজিদ নির্মিত হয়েছিল তাতে চালাঘর স্থাপত্যের প্রভাব স্পষ্ট। বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে খাজা আনোয়ার সাহেবের মসজিদ ও আজিম উস-শানের জুম্মা মসজিদে ইসলামী স্থাপত্য ও চালা মন্দিরের স্থাপত্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

কোন কোন মসজিদ একটি বড় আকারের গম্বুজ ও চার কোণে স্তম্ভ সমন্বিত, আবার কোন কোন মসজিদ তিনটি বড় আকারের গম্বুজ ও মিনার সমন্বিত। গোদা মৌজার কমলসায়রের সন্নিকটস্থ মসজিদে তিন গম্বুজ ও মিনার দেখা যায়।

সমাধিক্ষেত্র কোথাও কোথাও ৪০/৫০ ফুট উঁচু—এগুলি মোগল স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। দুই এক বিরল ক্ষেত্রে মসজিদের সঙ্গে ইমামবাড়া, ফুলবাগান ও কেয়াড়িও পরিদৃষ্ট হয়। মসজিদে গম্বুজের সংখ্যা কোথাও চার, কোথাও ছয় আবার কোথাও দশ। কোন মসজিদে টেরাকোটা শিল্পেরও কাজ স্পষ্ট। অনেক মসজিদে আবার হিন্দুমন্দিরের মালমসলা ব্যবহারের নিদর্শন দেখা যায়। নতুন হাটের বড়বাজারের মসজিদে, কাটোয়ার আলমখানের মসজিদে যে হিন্দুমন্দিরের মালমসলা, টেরাকোটা ও ফলক পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছিল তার নিদর্শন আজও বর্তমান। আদিনা মসজিদের ধ্বংসের মধ্যে এরকম অনেক হিন্দু দেবদেবীর পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে।

বেড়ের খাজা আনোয়ারের সমাধি, পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের মত প্রায় দশ বিঘা জায়গা জুড়ে নির্মিত। সম্রাট ফারুকশিয়ার আনোয়ারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এটি নির্মাণ করান। এর মধ্যে পঞ্চাশ ফুট উচ্চ সমাধিগৃহ, তিন গম্বুজওয়ালা মসজিদ, ইমামবাড়া, পুষ্করিণী, ফুলবাগিচা, কেয়াড়ি, বেগম মহল, জলটুঙ্গী—সব কিছুই ছিল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেকালের স্থাপত্যের এই অপূর্ব নিদর্শন প্রায় ধ্বংস হতে বসেছে। নবাববাড়ী আজ ভিখিরি বাড়ীতে পরিণত।

বর্ধমান শহরে পুরাতন চকে হিজরী ৯৫০ (১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)-এ শেরশাহের নির্মিত কালা মসজিদ, পায়রাখানার গলির মধ্যে আজিম-উস-শানের ১১১১ হিজরী (১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দের) তিন-গম্বুজ বিশিষ্ট জুম্মা মসজিদ, ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে (১১১৫ হিজরী) সম্রাট ফারুকশিয়ারের যাঁড়খানাগলিতে তিন-গম্বুজ বিশিষ্ট নুরানী মসজিদ, পুরাতন চকে বহরাম সক্কার সমাধিগৃহ ও শের আফগানের সমাধি, পুরাতন চকের মোড়ে রাজবাড়ীর এলাকার ভিতর খোক্কর সাহেবের মাজার, বড় বাজারের রাস্তায় হাজীবুদ্ধ নির্মিত এক-গম্বুজ মসজিদ, ইছলাবাদের পূর্বাংশে (৫নং) ১১১৫ হিজরী (১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ) তিন-গম্বুজ মসজিদ, কাটোয়ার বাগানে পাড়ায় চারটি মিনারসহ ছয়-গম্বুজের শাহ আলমের আমলের মসজিদ (যার প্রবেশদ্বারে প্রস্তরখণ্ডে হিন্দু দেব-দেবীর ক্ষোদিত মূর্তিসহ তোরণ) জেলার মসজিদ সমাধি স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। জেলার অন্যান্য মসজিদের স্থাপত্যের বিচারে নিম্নলিখিত মসজিদগুলি উল্লেখের দাবী রাখে—

কালনার খাশপুর পল্লীতে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত দশ-গম্বুজ বিশিষ্ট জামিয়া মসজিদ (অধুনা গম্বুজগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত), মঙ্গলকোট থানার কুরুম্বার তিন-গম্বুজ ও চার মিনার বিশিষ্ট মসজিদ, কেতুগ্রামের বাইলা ও কুলুট গ্রামের হোসেন শাহর আমলের মসজিদ, মঙ্গলকোটের সম্রাট শাহজাহানের গুরু মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের ১০৫৬ হিজরীতে (১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) নির্মিত মসজিদ, সেলিমাবাদ, কাইতি, উচালন, খণ্ডঘোষ, কোটশিমুল, পহলানপুর, এনায়েৎপুর, সুয়াতা, রসুলপুরের মসজিদ, পানাগড়ের কাছে শিলামপুরের বারা খাঁর মাজার ও মসজিদ, চুরুলিয়ার মসজিদ—এই সমস্ত মসজিদ ও মাজার মুসলিম প্রত্নতত্ত্বের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন।

মন্দির-স্থাপত্য : বাংলা তথা বর্ধমান জেলার নিজস্ব মন্দির শিল্পের যে ধারা অজ্ঞাতকাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এসেছে সে হচ্ছে চালা মন্দির। মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত এ জেলায় জনসাধারণের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে নির্মিত চালাঘরের পরিকল্পনা মন্দির প্রকরণে গৃহীত হয়েছে। চালা প্রকরণটিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়।

দোচালা, চারচালা ও আটচালা। এই চালামন্দির প্রকরণে স্থানীয় অন্য প্রকরণের ঘটেছে সমন্বয়—ফলে মন্দির শিল্পে একটা বিশিষ্ট রীতি গড়ে উঠেছে। এখনও গ্রামেগঞ্জে এরকম মাটির খড়ের চারচাল মন্দিরে, কোথাও কোথাও বা করগেটের চারচাল মন্দিরে, শিবলিঙ্গ বা নারায়ণ শিলা পূজিত হতে দেখা যায়। জামালপুরের বুড়োরাজ ও মন্তেশ্বরের করন্দা গ্রামের মহিষমর্দিনী এই রকম মাটির চালা ঘরে অধিষ্ঠিত। পরে যখন ইট বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পাথর উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকলো, তখন বাংলার হিন্দুযুগের নিজস্ব দেউল মন্দির শিল্পরীতিই গৃহীত হল।

চালা প্রকরণের ক্ষেত্রে দোচালা ও আটচালারই প্রাধান্য বেশী। চারচালার বিস্তৃতি কিছুটা সঙ্কুচিত। যেখানে চারচালা শিল্পরীতিকে একটা বিশিষ্ট প্রকরণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানেও এই রীতি নানা ক্রমবিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়ে জেলার মন্দিরশিল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এরপর ইটের তৈরী মন্দিরে পোড়ামাটি-সজ্জা বা টেরাকোটার ঘটেছে অনুপ্রবেশ।

এই টেরাকোটা শিল্পচর্চা যে আদিম ঐতিহ্যবাহী সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আদিম শিল্পরূপের অভিব্যক্তি ঘটেছে টেরাকোটায়। বর্ধমান জেলায় পাণ্ডুরাজার ঢিবির খননকার্যের ফলে যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধ্যে এই আদিম টেরাকোটার অনেক নির্দশন মিলেছে। মাটিকে প্রয়োজনমত হাতে গড়ে বা ছাঁচে ঢেলে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে রূপদান করে রোদে শুকিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে পাণ্ডুরাজার ঢিবির শ্বেতাঙ্গ বা কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত লোহিতোজ্জ্বল অলংকৃত মৃৎপাত্র এই টেরাকোটারই আদিমরূপ। এই নিদর্শনের মধ্যে দেখা যায় বাস্তব জগতের দৃশ্যাবলীও খোদাই করে আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। বাংলার অন্যান্য স্থানে খননকার্যের ফলে এই রকম টেরাকোটার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এরপর মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণযুগের মধ্য দিয়ে ক্রমবিবর্তনের ধারায় প্রবাহিত হয়ে গুপ্তযুগে এই আদিম টেরাকোটা একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সুলতানী আমলে এই রীতির প্রচলনে কিছুটা ভাটা পড়লেও একবারে এর ধারা স্তব্ধ হয়ে যায় নাই। বরং পারসিক রীতির সঙ্গে প্রাচীন রীতির সম্বন্বয়ে একটা নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। মধ্যযুগে যখন এই শিল্প ক্রমবির্বতনের মধ্য দিয়ে একটা উন্নত পর্যায়ে পৌঁছায়, তখনও দেখা যায় আধ শুকনো মাটির ফলকের উপর স্বল্প গভীরে মূর্তিগুলো খোদাই করে ভালভাবে শুকিয়ে ভাটিতে পোড়ানো হত। এইভাবে চমৎকার পোড়ামাটি ভাস্কর্যের ছাঁচ যাকে ইংরাজীতে বলে Terracota Plaque, তাই তৈরী হত। এই ছাঁচে মাটির মূর্তি তৈরী করে

লাল মাটির রঙ দিয়ে ভাটিতে পোড়ান হত। ১৬শ শতক থেকে ১৮শ শতক পর্যন্ত জেলার মন্দির গাত্রে যে সমস্ত পোড়ামাটির অলংকরণ দেখা যায়; তাদের অধিকাংশকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। ১) রামলীলা, ২) কৃষ্ণলীলা, ৩) পৌরাণিক অন্যান্য দেবদেবী যেমন মহিষ-মর্দিনী মূর্তি কখনও একক কখনও পরিবার সমন্বিত, চণ্ডীমূর্তি ইত্যাদি ৪) সমকালীন সমাজ জীবনের চিত্র।

বর্ধমান জেলায় যে সমস্ত মন্দির রয়েছে তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে দেউলরীতি অবলম্বন করা হয়েছে। এই দেউলরীতিকেও বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **নীড় দেউল বা ভদ্র দেউল** : এই মন্দিরের ছাদ উপর্য্যুপরি কতকগুলি সমান্তরাল চতুষ্কোণ স্তরের সমষ্টি, প্রতি দুই স্তরের মধ্যভাগের অন্তর্নিহিত দ্বিতীয় বিভাগটি স্পষ্ট। স্তর যত উপরে উঠতে থাকে সুস্পষ্ট বিভাগ সমন্বিত ক্রমশ সরু হতে থাকে। সর্বোচ্চ স্তরের উপর একটি স্তূপ বা শিখর স্থাপিত হয়। মন্দিরের সামনে জগমোহন। এ শ্রেণীর মন্দির এ জেলায় বিশেষ নাই। তবে এর থেকেই একশিখর বা বহুশিখরযুক্ত রত্ন-মন্দিরের উদ্ভব হয়ে থাকবে। জেলার রত্ন-মন্দিরগুলিই এই ভদ্রমন্দিরের সর্বাধুনিক সংস্করণ। রত্নমন্দিরগুলির অধিকাংশই পঞ্চরত্ন, তবে নবরত্ন এমন কি পঁচিশরত্ন মন্দিরও বিরল নয়। কালনার লালজী মন্দির, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, গোপালজীর মন্দির পঁচিশরত্ন। এগুলি ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এই ত্রিতল মন্দিরের প্রথম তলে প্রতি কোণে তিনটি, দ্বিতীয় তলের প্রতি কোণে দুটি, তৃতীয় তলের প্রতি কোণে একটি ও সর্বোপরি কেন্দ্রীয় শিখর—এই নিয়ে পঁচিশ শিখরের সন্নিবেশ।

(২) **শিখরে ঢাকা মন্দির** : চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের প্রাচীরের গা থেকে উচ্চ শিখরের দিকে চারটি চাল উঠে ঈষৎ বেঁকে সংলগ্ন হয়ে যায়। এই সংযোগস্থল একটা গোলাকার প্রস্তরখণ্ডে আবদ্ধ করা হয়। শিখরের গায়ে কারুকার্য খচিত থাকে। একে রেখ-দেউলও বলে। এই রকম রেখ-দেউল আছে বরাকর, আড়া, উখরা, কুমারডিহি, বীর-ভানুপুর ও শীতলপুরে। বরাকর বেগুনের আকৃতিবিশিষ্ট বেগুনিয়ার তিনটি শিবমন্দির সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে নির্মিত। এই সব মন্দির ও কল্যাণেশ্বরীর মন্দির প্রস্তরনির্মিত রেখ-দেউল। বরাকরের একটি মন্দির ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, বাকীগুলি হিন্দুযুগের ৮ম শতাব্দীর হতে পারে। বরাকরের মন্দিরের 'Structural and architectural beauty' অতুলনীয়। গারুই গ্রামের মন্দির প্রস্তরনির্মিত চৌচালা। দেবীপুরের কল্যাণেশ্বরীর মন্দির প্রস্তরনির্মিত

পীড়াদেউল প্রকৃতির। ইষ্টক নির্মিত রেখ-দেউল মন্দির দেখা যায় সাতদেউলিয়ার জৈন মন্দিরে। কুলীনগ্রামের গোপেশ্বর শিবমন্দিরে, বৈদ্যপুরের কৃষ্ণ ও শিবমন্দিরে। আমোদপুরের মদনগোপাল ও রাধামাধব মন্দিরও ইষ্টকনির্মিত রেখ-দেউল। এদের মধ্যে কুলীনগ্রামের মন্দির ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। আমোদপুরের মন্দির ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাকীগুলো সপ্তদশ শতক বা অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত। কামারপাড়ার আটকোণা দেউলেশ্বর শিবমন্দির ও বুড়ো শিবের মন্দির ইষ্টকনির্মিত রেখ-দেউল। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার মন্দির ও কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরীর মন্দির অষ্টাদশ শতকের ইষ্টক নির্মিত নবরত্ন রেখ-দেউল। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মন্দির ১৮শ শতকের ইষ্টক নির্মিত রথাকৃতি গম্বুজ সমন্বিত রেখ-দেউল। জেলায় এরকম রেখ-দেউল মন্দিরের সংখ্যা শতাধিক।

মন্দিরগুলি সাধারণত অঙ্গন থেকে তিন/চার ফুট উঁচু চতুষ্কোণ বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোথাও কোথাও ওঠবার সিঁড়িও আছে। বর্ধমান থানার কয়রাপুরের দেবীর মন্দির, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে এরকম সিঁড়ি ও সম্মুখে নাটমন্দির আছে। কোন কোন শিখর দেউল মন্দির স্ট্যাকো পদ্ধতি বা টেরাকোটা পদ্ধতিতে অলংকৃত ভাস্কর্য সমন্বিত। এই সব টেরাকোটার মধ্যে প্রথম দিকে লতাপাতার চিত্র ব্যবহৃত হত। পরবর্তী কালে দুর্গার দশভুজামূর্তি, বিষ্ণুর দশ অবতার, যক্ষ-যক্ষিণী, মিথুন, নানা সমাজচিত্রের মূর্তি। কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরে (নির্মাণকাল ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) উপবিষ্ট রাম ও সীতার এবং যুদ্ধরত রাম-রাবণের মধ্যে দুর্গাচিত্র টেরাকোটা। বনপাশ কামারপাড়ায় দেউলেশ্বর শিবের আটকোণা শিবমন্দিরে এরকম রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী থেকে নানা ঘটনার নানা মূর্তি, সমাজচিত্র, যক্ষযক্ষিণী মূর্তির অলঙ্করণ বর্তমান। হালদা পাহাড়ে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির রেখ-দেউল (মতান্তরে পীড়া দেউল) পদ্ধতিতে নির্মিত। বোরো বলরামের মন্দির ভূমি থেকে ১৪ ফুট উঁচুতে আশি ফুট বাই ৬৫ ফুট (৮০'×৬৫') চত্বরের উপর চল্লিশ ফুট উঁচু পঞ্চাশ বর্গফুট পীড়া দেউলরীতির প্রবেশদ্বার দোচালা আকৃতির। পুতুণ্ডার (বর্ধমান থানা) রায় পরিবারের ১৭৯২ থাকে নির্মিত পীড়াদেউল মন্দিরের স্থাপত্য দেখবার মত।

(৩) **জোড়াবাংলা মন্দির** : মন্দির স্থাপত্যের আর এক রীতি জোড়াবাংলা মন্দির। কালনার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ও বর্ধমান কাঞ্চননগরের শিবদুর্গা জোড়াবাংলামন্দির একই সময় (১৬৬৩-৬৪ শকাব্দ) একই রীতিতে ও একই মিস্ত্রী শ্রীরামচন্দ্র দ্বারা নির্মিত; ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মন্দিরের প্রবেশদ্বারে জোড়াবাংলারীতি ও পশ্চাৎ ভাগে দোচালা রীতি গৃহীত হয়েছে।

রথমন্দির : বর্ধমান জেলায় দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে নির্মিত রথমন্দির নাই। তবে জেলার নিজস্ব রীতিতে গর্ভগৃহসহ ত্রিরথাকৃতি মন্দিরের নিদর্শন ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মন্দির। এই মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ গম্বুজাকৃতি অর্ধমণ্ডপ ও জোড়াবাংলা রীতিতে নির্মিত প্রবেশদ্বার। মন্দির নির্মাণে ইসলামীয় প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। মেমারী থানার আমোদপুরের খাঁপুকুরের পাড়ে ১৪৯৪ শকে নির্মিত গোপাল জিউ-এর ত্রিরথাকৃতি শিখর দেউল মন্দির, এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১৫ ফুট, উচ্চতা ৩০ ফুট, মন্দির টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত।

চৌচালা মন্দির : গারুই-এর প্রস্তরনির্মিত চৌচালা মন্দির কতকটা হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্র মন্দিরের অনুরূপ। এর শীর্ষদেশের শিখর অষ্টকোণ, এটি বাঁকানো কার্নিশযুক্ত ছাদওয়ালা সৌধের আকৃতি-বিশিষ্ট।

বাঘনাপাড়ার গোপেশ্বর শিবমন্দিরও চারচালা রীতিতে গঠিত। এর ঊর্ধ্বভাগে টেরাকোটা অলংকরণ, সম্মুখে নাটমন্দির। বেলেপাথরে নির্মিত কীর্তিমুখসহ রত্নমালা ক্ষোদিত ৩'×১' ফুট শিলাফলক গোপেশ্বর মন্দির ও কৃষ্ণবলরাম মন্দিরের মধ্য পথে প্রতিষ্ঠিত—স্থাপত্যের এ এক অপূর্ব নির্দশন।

পালসিটের হাটতলায় ১৫' (পনের ফুট) উচ্চ চারচালা শিবমন্দির ১৭৯৮ শকাব্দে নির্মিত। বর্ধমান থানার কলিগ্রামে জয়দুর্গার মন্দির ও রায়না থানার বলাগড়ের দশ ফুট বাই দশ ফুট ও পনের ফুট উচ্চ শিবমন্দির চারচালা রীতিতে নির্মিত।

আটচালা মন্দির : কুলীনগ্রামের গোপেশ্বর শিবমন্দির ১৪২০ শকাব্দে নির্মিত ইটের তৈরী আটচালা পদ্ধতিতে নির্মিত প্রাচীনতম মন্দির। মঙ্গলকোট থানার ইটা গ্রামের দুটি আটচালা ও চারটি চারচালা মন্দির আছে, কাটোয়া থানার কাঁটারিয়া গ্রামের মকরমুখ শিবমন্দির আটচালা পদ্ধতিতে নির্মিত; এটি টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত। দেবীপুরেও (মেমারী থানা) শিবমন্দির আটচালা।

এছাড়া বর্ধমান কাঞ্চননগরে বারদুয়ারী তোরণ মধ্যযুগী স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। পাণ্ডুরাজার ঢিবির অনতিদূরে গোস্বামীখণ্ডে ২১.১৫ মি. × ১১.৪০ মি. প্রত্নস্থলের মধ্যে ৮.৪০ মি. × ৬.২৫ মি. ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত দেবায়তন, পানাগড়ের সন্নিকটে ভরতপুরে ৪১.৬'×৪১.৬' বর্গাকার প্রত্নক্ষেত্রের উপর পঞ্চরথ পরিকল্পনায় নির্মিত পোড়া ইটের ৩৩টি স্তরবিশিষ্ট সাত ফুট উচ্চ বৌদ্ধস্তূপ বর্ধমান জেলার প্রাচীন স্থাপত্যের এক বিরল নিদর্শন। অনেকের মতে এই স্তূপটিই তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তূপ। অবশ্য এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। স্তূপটি

সম্বন্ধে West Bengal District Gazetteers Bardhaman 1994-এ মন্তব্য করা হয়েছে "The style of the construction as well as the antiquities, indicates that the stupa complex of the Bharatpur was built in the 7–9th century A.D by the Buddhist community. And this type of stupa is so far the first of its kind in West Bengal."

মূর্তি-ভাস্কর্য : বর্ধমানে মূর্তি-ভাস্কর্যের নিদর্শন যেমন মন্দির গাত্রে গ্রথিত আছে, তেমনি আছে মন্দিরাভ্যন্তরে দেবদেবীর মূর্তির রূপকল্পনায়। মূর্তি-ভাস্কর্যের নিদর্শন আছে জৈন মূর্তি, অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি, চামুণ্ডা, মনসা, সর্বমঙ্গলা, তারাক্ষ্যা ও শাকম্ভরীর মূর্তির রূপায়ণে। পোড়ামাটি ও পাথরের ওপর প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাস্কর্য বেশী কাজ লক্ষ্য করা যায়, মূর্তি নির্মাণে ভঙ্গি ও মুদ্রার ব্যবহার এই ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য। কিছু কিছু মূর্তি ব্রোঞ্জ, কাঁসা, পিতল ও অষ্টধাতু ঢালাই করে তৈরী করা হত। এই মূর্তিগুলির সজীবতা ও সূক্ষ্মকাজ জেলার ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। মূর্তিগুলির ভঙ্গি, হাতের মুদ্রা, পোশাকের ছাঁদ ও ভাঁজ অর্জিত রুচির পরিচয় বহন করে। কিছু কিছু মূর্তির মধ্যে লোকশিল্পের ছাপও সুস্পষ্ট। দৈবীভাব ও শিল্পসুষমা প্রকাশেও মূর্তিগুলি অনন্য। বেশীর ভাগ মূর্তি কষ্টিপাথরে তৈরী। মূর্তিগুলি হয় পৃষ্ঠপটের গায়ে ভর দিয়ে ক্ষোদিত কিংবা স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট। নারীমূর্তির উন্নত বক্ষ, গুরু নিতম্ব, হাতের মুদ্রা শাস্ত্রসম্মত। পুরুষমূর্তি সিংহ গ্রীব, বৃষস্কন্ধ, ক্ষীণ কটি লক্ষ্যণীয়। এই সব দেবদেবীর মূর্তি রূপায়ণে তান্ত্রিক চিন্তা, সুঠাম ভঙ্গি, উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি, ইন্দ্রিয়তার অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। এই সব মূর্তি পরিকল্পনায় ছিল ইংরাজীতে যাকে বলে—Sublime idealism combined with highly developed sense of rythm and beauty, vigour and refinement.

ভরতপুরে খননকার্যের ফলে স্পর্শমুদ্রায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তির্ গঠন ও ভাস্কর্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের দ্বারা নির্মিত নবম/দশম শতাব্দীর ভাস্কর্যের নিদর্শন।

সাঁকোর (গলসী থানা) 'ঊষাদিত্য' নামের সূর্য মূর্তিতে দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ছাপ বলে অনুমিত হয়। এখানকার মৃত্তিকা গহ্বর থেকে প্রাপ্ত বিষ্ণু বাসুদেবের প্রস্তর মূর্তি ৯ম/১০ম শতকের পালযুগের ভাস্কর্য্যের ঐতিহ্যবাহী; জামালপুর থানার সাঁচড়া গ্রামের খননকার্যের দ্বারা প্রাপ্ত লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি এক অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন। দ্বাদশ বাহু সমন্বিত ও শিরে অষ্টনাগ শোভিত প্রায় ৬ ফুট ৪ ইঞ্চির বেলে পাথরের এই মূর্তির দুই পাশে দুটি হস্তীর উপর উপবিষ্ট দুই যক্ষ মূর্তি ৯ম/১০ম শতকের ভাস্কর্যের সৃষ্টি। কালনা থানার পাতুন গ্রামের

পাত্রেশ্বর মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে এককালে বহু মূর্তি স্তূপীকৃত ছিল—এর অনেকগুলিই নষ্ট হয়েছে কিংবা অপহৃত হয়েছে। বিনয় ঘোষ মহাশয় পাতুন পবিভ্রমণকালে এই সব স্তূপীকৃত মূর্তির মধ্যে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি, অবলোকিতেশ্বব, লোকেশ্বর বিষ্ণু (নানা রূপে), সূর্য, গণেশ, ধর্মরাজের কূর্মমূর্তি অষ্টভুজ ও দশভূজ লোকেশ্বর বিষ্ণুর মূর্তি সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যেব উল্লেখ কবেছেন—রাখালদাস বলেছেন এই লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তিগুলি বিষ্ণুর রূপভেদ এবং এর মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। লোকেশ্বর বিষ্ণু যুগ-সন্ধিক্ষণের দেবতা। বোড়োর বলরাম এইরূপ লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি। কাষ্ঠনির্মিত এই বলরাম-এর মূর্তি সাত/আট হাত উঁচু দণ্ডায়মান, হাত চোদ্দটি, মাথায় সর্পফণার ছাতি, বিগ্রহের পশ্চাতে চালচিত্রে ছবি আঁকা। বিনয় ঘোষের মতে কৃষ্ণহীন বলরামেব কাঠের বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের কালে বা পরে সম্ভব নয়। তাঁর মতে এই মূর্তি ষোড়শ/সপ্তদশ শতকের আগেকার। বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মূর্তিকে বিষ্ণুর রূপভেদ বলেছেন এবং এর মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবকল্পনার সমন্বয় ঘটেছে বলে তিনি এ মূর্তির নাম দিয়েছেন লোকেশ্বর বিষ্ণু। এই জেলার গড়ুই গ্রামেও এরকম মূর্তি আছে। ফরিদপুর থানার প্রতাপপুর গ্রামে ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত কৃষ্ণপ্রস্তরে ক্ষোদিত তারা ও জাঙ্গুলী মূর্তি এবং মিথুন মূর্তিতে বৌদ্ধতান্ত্রিক ভাবনার মিলন-মিশ্রণের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। একসময় পালযুগের বৌদ্ধ ও হিন্দুতান্ত্রিক দেবদেবীর মধ্যে পারস্পরিক মিলন ও আত্মীকরণ যে ঘটতে থাকে মন্তেশ্বরে চামুণ্ডা, কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী ও অম্বিকা কালনার সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্তি তার উজ্জ্বল স্মৃতি বহন করছে। জৈন দেব-দেবীও এই সমন্বয়ের সামিল হয়েছিল। অম্বিকা কালনার অম্বিকা খুব সহজেই বাংলার দুর্গার ধ্যানমূর্তিতে লীন হয়ে গেল। কালনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্তি কিন্তু সিংহবাহিনী দুর্গা নন। যিনি অম্বিকা তিনিই দুর্গা ও সিদ্ধেশ্বরী। তাই সহজেই এই মিলন ঘটেছে। বিনয় ঘোষ মহাশয়ের মতে অম্বিকা কালনার অম্বিকা জৈন দেবী ছিলেন, পরে হিন্দু শক্তিপূজার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে সিদ্ধেশ্বরী রূপ পরিগ্রহ করে। এই রকম ৯ম/১০ম শতকের পালযুগের ভাস্কর্যের ঐতিহ্যবাহী মূর্তি মাজিগ্রামের শাকম্ভরী ও শুশুনার তারাক্ষ্যা, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ও কলিগ্রামের জয়দুর্গা।

মাজিগ্রামের শাকম্ভরী চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ ও ত্রিশূল। কোন অসুর বা দেবদেবী নাই। মূর্তিটির দেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন, মোম দিয়ে এঁটে রাখতে হয়; চক্ষু দুটি শ্বেত পাথরের আলাদা বসান, মধ্যে

কালোপাথরে চোখের মণি, কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত মূর্তির অপূর্ব ভাস্কর্য। তবে সর্বদা তেল সিঁদুর মাখিয়ে রাখতে হয়, নইলে নষ্ট হবার ভয়।

শুশুনার তারাক্ষ্যা মূর্তি কষ্টিপাথরে ক্ষোদিত, দেবী ত্রিনয়নী চতুর্ভুজা দক্ষিণে ঈষৎ বিনত জটামুকুলিত সুডৌল মুখমণ্ডল। মহাপদ্মের দুইথাক পাপড়ির উপর অধিষ্ঠিতা, দক্ষিণ চরণ ভগ্নভাবে সিংহপৃষ্ঠে ন্যস্ত, বাম চরণ একটি পদ্মের উপর রক্ষিত, বামদিকে ঊর্ধ্ব হস্ত দ্বারা মহাদেবকে বেষ্টন করে নিজ অঙ্কে শয়ন অবস্থায় স্তন পান করাচ্ছেন; বামদিকে নিম্নহস্ত উপরের দিকে উত্থিত, দক্ষিণ দিকে ঊর্ধহস্তটি নীচের দিকে নেমে এসেছে, নিম্নের হস্ত উপরের দিকে উত্থিত। এই হস্তে আছে একটি গদা। দেবীর নিম্নাঙ্গ রক্তবস্ত্র শোভিত, ঊর্ধাঙ্গ উন্মুক্ত। দুই পাশে জয়া-বিজয়ার মূর্তি, পিছনে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, উচ্চতা ২ গজ ১ ফুট ৩ ইঞ্চি।

এখানে আর একটি মূর্তি আছে সে মূর্তিটিও অদ্ভুত-দর্শন। চতুভুর্জ ত্রিনয়নী—২টি হস্তি দুপাশ থেকে দেবীর মস্তকে জলসিঞ্চন করছে—নাসিকাটি কিঞ্চিৎ ভগ্ন। কতকটা চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানে বর্ণিত কমলেকামিনীর অনুরূপ—স্থানীয় লোকের মতে এটি গজলক্ষ্মী।

নারিকেলডাঙ্গার জগৎগৌরীর মূর্তিও ৯ম/১০ম শতকের বলে অনুমান করা হয়। পালযুগের ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন। কোষ্ঠী পাথরে খোদাই করা মূর্তি—দেবী সিংহের উপর উপবিষ্টা—সিংহের পৃষ্ঠে দেবী পদ্মাসনা। দক্ষিণ চরণ ঝোলান; বাম চরণের হাঁটু মোড়া; বামক্রোড়ে একটি শিশু, শিশুটিকে গণেশ বলে মনে করা হয়। দেবী শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছেন। দেবীর মাথার ওপর অষ্টনাগের ছত্র—দেবীর পদতলে ছিন্ন মুণ্ড—মুণ্ডটি কলির বলে প্রসিদ্ধি। দেবী কলি-নাশিনী। জগৎগৌরী মনসা কিন্তু নারিকেলডাঙ্গার জগৎগৌরী মনসা ও দুর্গার মিশ্রিত মূর্তি।

কাঞ্চননগরে কঙ্কালেশ্বরী অষ্টভূজা চামুণ্ডার মূর্তি—মূর্তির মস্তকে একটি হস্তী, পদতলে দেবাদিদেব শায়িত অবস্থায়। এ মূর্তির বৈশিষ্ট্য হল মানবদেহের শিরা-উপশিরা ও কঙ্কালের ন্যায় কষ্টিপাথরে ক্ষোদিত; অপূর্ব দর্শন মূর্তি। এটিও ৯ম/১০ম শতকের বলেই অনুমান করা হয়। ভাস্করের শারীরবিদ্যার (Anatomy) জ্ঞান প্রশংসনীয়।

বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলার মূর্তিও ১১" x ৮" কষ্টিপাথরে ক্ষোদিত সিংহবাহিনী অষ্টাদশভুজা অষ্টাদশ প্রহরণধারিণী দেবীদুর্গার মূর্তি—অপূর্ব সুষমামণ্ডিত। মূর্তিটি গঠন ও শিল্প সৌন্দর্য ৯ম/১০ম শতকের পাল-ভাস্কর্যের ঐতিহ্যবাহী।

এই সমস্ত দেবীমূর্তি ছাড়াও শিবের বিভিন্ন মূর্তি কল্পনায় ও অন্যান্য দেবতার মূর্তির গঠনশৈলীর মধ্যেও জেলার অপরূপ ভাস্কর্যের নিদর্শন মেলে। কেতুগ্রাম থানার নৈহাটি গ্রামেব প্রস্তর-ক্ষোদিত কালরুদ্রের মূর্তির ভাস্কর্য শিল্পসুষমামণ্ডিত। পদ্মাসনে শবের উপর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান রুদ্রদেবের বামপদ অগ্রে ন্যস্ত—চতুর্ভুজ, দক্ষিণ করে নরমুণ্ড ও খট্টাঙ্গ, বাম করে ত্রিশূল; স্কন্ধদেশের কাছে দুটি অপ্সরা মূর্তি অর্ধশায়িত অবস্থায় শূন্যে অবস্থিত—অপূর্ব ভাস্কর্য।

নিরোলের অষ্টভুজ গণেশমূর্তিও প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন।

বর্ধমানের আলমগঞ্জের কাছে ভিখিরিবাগানে নব আবিষ্কৃত ১৮ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট খিলানে তৈরী মহাশিব বর্ধমানেশ্বর। বর্ধমানে মতিবাগে প্রাপ্ত সপ্তম শতকের অষ্টমুখলিঙ্গ শিব, কাঞ্চননগরে প্রাপ্ত বৈশ্রবণ মূর্তি, বাঘনাপাড়ার এক মুখলিঙ্গ সদাশিব মূর্তি, রাইগ্রামের বরাহমূর্তি, সিজনার বিষ্ণুমূর্তি ও নবগ্রহমূর্তি—এগুলি জেলার ভাস্কর্যের বিরল নিদর্শন। কুড়মুনের ঈশানেশ্বর শিব ত্রিশূলাকৃতি। রায়ান গ্রামের দক্ষিণেশ্বর শিবমন্দিরের সুনিপুণ টেরাকোটার কাজ মন্দির-স্থাপত্যের নিদর্শন। বাঘনাপাড়ার রুদ্রভাগে দশভূজা মূর্তি ক্ষোদিত গোপীশ্বর শিবলিঙ্গ, বরাকরের একপাশে হেলান মৎস্য মূর্তিসহ পাঁচটি শিবলিঙ্গ ও গণেশ মূর্তিসহ শিবলিঙ্গ মূর্তি-ভাস্কর্যের বিরল নিদর্শন।

বর্ধমানের অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে কীর্তিচাঁদ কর্তৃক নির্মিত বারদুয়ারী তোরণ, মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করছে। কামারকিতার বিশাল গড় বাড়ী, সেনপাহাড়ী দুর্গ শেরগড়, চুরুলিয়া দুর্গ এর ধ্বংসাবশেষ, কাঁকসার ঢেকুরের শ্যামরূপা—গড় ও অমরাগড়ের ধ্বংসাবশেষও মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করছে। এখন প্রশ্ন এই সব অপূর্ব ভাস্কর্য, এই অপরূপ স্থাপত্যের নির্মাতা কারা? এঁরা সকলে আমাদের জেলার স্থপতি ও ভাস্কর কিংবা প্রতিবেশী জেলার? বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যখন আমার বাবা বেঁচে ছিলেন তাঁর কাছে শুনেছিলাম—কামারপাড়ার আটকোণা দেউলেশ্বর শিবমন্দিরের নির্মাণ করেছিলেন আমাদেরই গ্রাম হরিবাটী (মৌজা বনপাশ) গ্রামের দ্বিজপদ সূত্রধরের প্রপিতামহ। আমাদের বংশের বাড়ীর সংলগ্ন বকুলতলার তিনটি শিখর দেউল শিবমন্দিরের তিনটি শিবলিঙ্গ আনা হয়েছিল বারাণসী থেকে। পঞ্চাশের দশকে আমার সহকর্মী সমর চৌধুরীর কাছে শুনেছিলাম যোগাদ্যার আদিমূর্তি পুকুর থেকে চুরি যায় ও পরে ঠিক অনুরূপ মূর্তি এ জেলারই নবীন ভাস্কর দ্বারা নির্মিত হয়। দাঁইহাটের এই নবীন ভাস্কর বর্ধমানের গোপাল বিগ্রহের মূর্তি ও অনেক স্থানের ভাস্কর্যের নির্মাতা ছিলেন।

বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে পাতুনের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—দেবদেবীর মূর্তির বৈচিত্র্য ও নির্মাণকুশলতা দেখলে একথাও বোঝা যায় যে বাংলাদেশে ভাস্কর-শিল্পের কতখানি উন্নতি হয়েছিল। প্রধানত পালরাজাদের আমল থেকেই বাংলার ভাস্কর্যকলার চরম বিকাশ হয়। নতুন নতুন দেবদেবীর আবির্ভাবের ফলে এবং অসংখ্য 'সাধন' ও 'ধ্যান' অনুযায়ী মূর্তি নির্মাণের তাগিদে ভাস্কর্যের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে বাংলাদেশের সেই ভাস্কররা কোথায় ছিলেন, কোথায় গেলেন তাঁরা? মূর্তি গড়ার জন্য ভাস্কররাও নিশ্চয়ই ছিলেন এবং ভাস্কর-প্রধান গ্রামও ছিল, গ্রামে স্টুডিও ছিল। বর্ধমান জেলার দাঁইহাট ও পাতুন গ্রাম তার অন্যতম সাক্ষী।' পাঁচুণ্ডি, দেবকুণ্ড, বনপাশ, কেতুগ্রাম, নতুনগাঁ, দাঁইহাট, সাতগেছিয়া, পিলশোঁয়া, সোনামুখী প্রভৃতি স্থানেও ভাস্করদের বসতি ছিল। কুলিনগ্রামের বৃষ জনৈক নেপাল মিস্ত্রী নির্মাণ করেছিলেন। বনপাশ কামারপাড়ার গোলকনাথ, বদন মিস্ত্রি ও বর্তমান কালের ত্রিভঙ্গ রায়, কেতুগ্রামের বংশীধর রাজ, সোনামুখীর রামহরি মিস্ত্রি আর কালনা থানার পাতুনের ভাস্কর—এঁরা জেলার ভাস্কর্য শিল্পে অবদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সোনামুখী বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলায় অস্তিত্ব ছিল না। বিষ্ণুপুর, মান্দারণ, সোনামুখী বর্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালনা ও কাঞ্চননগরের জোড়াবাংলা মন্দির জনৈক 'শ্রীরামচন্দ্র' নির্মাণ করেছিলেন। ইনি ১৬৬৩ শকাব্দের সোনামুখীর ভাস্কর। দাঁইহাট কাটোয়া মহকুমায়। পাতুন কালনা কাটোয়ার প্রায় সীমান্তে। কাজেই কাটোয়াতেও ভাস্করদের বাস ছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। পালযুগের বিট পাল, ধীমান ভাস্করদের ঐতিহ্যবাহী এই সমস্ত ভাস্কর, এই সমস্ত মসজিদ মন্দির ও বিগ্রহের মধ্যে চিরস্মরণীয় আছেন আর যতদিন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আছে, যতদিন মন্দির বিগ্রহ আছে ততদিন এই সমস্ত শিল্পীও অমর হয়ে থাকবেন।

যাবদ্বর্ধমান : স্যাৎ যাবদ্‌মন্দির-বিগ্রহৌ
যাবৎ প্রত্নতত্ত্ববিভাগশ্চ তাবদেব ভাস্করাঃ।

(হেরেস উইলসনের অনুসরণে)।

তৃতীয় পর্ব

রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা—রাজবংশানুচরিত

আধুনিক যুগে জেলার শাসনব্যবস্থা

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন (শহরাঞ্চল)

গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন

রাজস্ব ব্যবস্থা

আইন আদালত

মুক্তি সংগ্রামে বর্ধমান ও জেলা কংগ্রেসের ভূমিকা

জেলার কৃষক সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

আধুনিক যুগে সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি

জেলার শিক্ষার সেকাল ও একাল

বর্ধমান জেলার ক্রীড়াচর্চা

জেলার অর্থনৈতিক চিত্র

শিল্প

স্বাস্থ্য পরিষেবা

পরিবহন ও যাতায়াতের ব্যবস্থা

পঁচিশ অধ্যায়



রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা—রাজবংশানুচরিত

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৫—এই ৩০০ বছরের বর্ধমানের ইতিহাস—বর্ধমান রাজবংশের ইতিবৃত্ত—রাজবংশানুচরিত। এই সময়ের মধ্যে দিল্লীর মোগল সামাজ্যের শাহজাহানের রাজত্বের গৌরবময় যুগের ঘটে অবসান, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে ধ্বনিত হয় মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্তিম সুর। ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা ও অদূরদর্শিতা এই পতনকে করে ত্বরান্বিত। সারা ভারতে চলে রাজনৈতিক ডামাডোল—মারাঠী জাতির উত্থান, রাজপুত-বিদ্রোহ, শিখ-বিদ্রোহ, সৎনামী-বিদ্রোহ। সারা ভারত অগ্নিগর্ভ। শেষে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে দিল্লীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এক রাজনৈতিক শূন্যতা (Political vacuum)। সেই শূন্যতলে এলো 'দলে দলে লৌহ বাঁধা পথে অনলবিশ্বাসী রথে প্রবল ইংরেজ', এলো ফরাসী, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকের দল। বাংলায় শুরু হল স্বাধীন নবাবী আমল—মুর্শিদকুলি খান, সুজাউদ্দিন, সরফরাজ খান, আলিবর্দী ও সিরাজউদ্দৌল্লার রাজত্ব—বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা হলেন মীরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, ক্লাইভের ষড়যন্ত্রের শিকার। বিশ্বাসঘাতকতার জাল বিস্তৃত হল পলাশীর প্রান্তরে—'বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর'। ভারতের দিবাকর হল অস্তমিত। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে।' ভারত তথা বাংলার এই রাজনৈতিক পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থার সামিল হল বর্ধমান। বর্ধমানে শুরু হল লাহোরের কোটালী মহল্লার ক্ষেত্রীবংশজাত রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত। রাঢ়বাংলার মধ্যমণি বর্ধমানের এসময়কার ইতিহাস রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত প্রায় এক ও অভিন্ন বললেই হয়।

সঙ্গম রায় : ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদ—দিল্লীর মসনদে মহামতি আকবর, মোগল সম্রাট একের পর এক রাজ্যজয় করে চলেছেন—মেবার, সুরাট, উড়িষ্যা, বাংলাদেশ একে একে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হচ্ছে।

বাংলায় দাউদ খানের মৃত্যুর পর আফগান শাসনের অবসান হল; সঙ্গে সঙ্গে মোগল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলার সুবাদার শাহবাজ খান; উড়িষ্যায় পাঠান শাসক কৎলু খাঁ—তিনি সুলেমান করনানীর অনুগতদের সংগে নিয়ে জোট বেঁধে একে একে মেদিনীপুর, হুগলী, বাঁকুড়া অধিকার করে বর্ধমানে এসে ঘাঁটি গাড়েন, এমন কি মঙ্গলকোট পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সেখানকার দুর্গে কিছু সৈন্য রেখে বর্ধমানে চলে আসেন। ইতিমধ্যে টাণ্ডা থেকে মোগল বাহিনী এসে শাহবাজ খানের সঙ্গে যোগ দেয়। এই যৌথ বাহিনী মঙ্গলকোট থেকে কৎলুর সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করে বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হন। কৎলু বেগতিক বুঝে উড়িষ্যায় ফিরে যান। মোগলবাহিনী বর্ধমান দুর্গে আশ্রয় নেয়। দিল্লী, বাংলা, উড়িষ্যা ও বর্ধমানের এই রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় সুদূর লাহোরের কোটল্লা থেকে ক্ষেত্রীবংশজাত এক ভাগ্যান্বেষী যুবক সঙ্গম রায় বের হলেন তীর্থদর্শনে। আগ্রা হয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীক্ষেত্রে পদার্পণ করলেন। সেখান থেকে হয়তো তিনি কৎলু খাঁর বর্ধমান জয়ের কথা ও বর্ধমানের সমৃদ্ধির কথা শুনেছিলেন। সেখান থেকে বাদশাহী সড়ক ধরে যাত্রা করলেন বর্ধমানের উদ্দেশ্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা ছিল সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ। আর বর্ধমান ছিল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা চাকলা। এরই আকর্ষণে কত বিদেশী বণিক বাংলায় এসেছে, অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এদেশের সম্পদের ভাগ নিয়ে দেশে ফিরে গেছে, আবার অনেকে থেকেও গেছে। Bengal was perhaps the most flourishing province in the whole of India....Almost every year a large number of Persians, Abyssians, Arabs, Chinese, Turks, Moors, Jews, Georgians, Armenians and merchants from some of the parts of Asia poured in Bengal. (R.C Majumdar) সঙ্গম রায়ও এলেন। দামোদর তীরে এসে হয়ত লক্ষ্য করলেন নদীর বুকে বজরা ও অজস্র নৌকায় পণ্যের সম্ভার। এ অঞ্চলে বাণিজ্যের সম্ভাবনায় তাঁর বুকে আশার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দামোদর পার হয়ে দেখলেন চারিদিকে সবুজের সমারোহ। বর্ধমান পৌঁছে হয়তো লক্ষ্য করেছিলেন এখানকার রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিবেশ। তাই এখান থেকে দশ মাইল উত্তরে অধুনালুপ্ত বল্লুকার তীরে বেলেরা—বৈকুণ্ঠপুরে স্থিত হলেন—বর্ধমান রাজ পরিবারের আদিপুরুষ ক্ষেত্রীবংশোদ্ভুত সঙ্গম রায়। 1910 খ্রীষ্টাব্দের District Gazetteer, Burdwan থেকে জানা যায় এখানে স্থিত হয়ে সঙ্গম শুরু করেছিলেন টাকা লেনদেনের সুদী বা মহাজনী কারবার, আর খাদ্যশস্যের কেনাবেচার ফলাও ব্যবসা। তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নাই এই খাদ্যশস্যের কারবারই একদিন এনে দেবে তার

পৌত্রের ওপর ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ। 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দেবে রাজদণ্ড রূপে।' কবে এই সঙ্গম রায় বর্ধমানে পদার্পণ করেছিলেন সঠিক ভাবে জানা যায় না, তবে অনুমান করা যায়। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ-এর এক ফরমান বলে সঙ্গমের পৌত্র আবু রায় তিনটি পরগনার রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আবু যখন ফরমান পান তখন তিনি নিশ্চয় প্রৌঢ় ছিলেন। তখন তাঁর বয়স যদি চল্লিশের কোঠায় হয়, তাহলে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬০৫-১০এর মধ্যে। তাঁর পিতা বঙ্কুবিহারী তখন নিশ্চয়ই ত্রিশের কোঠায়। কাজেই বঙ্কুবিহারীর জন্ম ধরা যেতে পারে ১৬০৫-১০এর ৩০ বা আরো কয়েক বৎসর আগে। কাজেই সঙ্গম রায় ষোড়শ শতকের সাত-এর দশকে বর্ধমানে পদার্পণ করেন বলে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

বঙ্কুবিহারী রায় : সঙ্গমের পুত্র বঙ্কুবিহারী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে বৈকুণ্ঠপুরে পিতার তেজারতি ও খাদ্যশস্যের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেটা নিশ্চিন্তভাবে বলা হয়।

ইতিমধ্যে দিল্লীর সম্রাট আকবরের মৃত্যু হয়েছে। পুত্র জাহাঙ্গীর দিল্লীর মসনদে। কিন্তু সম্রাট হয়েও জাহাঙ্গীরের মনে শান্তি পাই। কারণ আচার্য যদুনাথের ভাষায়—"his home was dark, because she who was coveted as the light of his Harem and was destined afterwards to blaze forth as the light of the world (Nur-i-Jahan) was illuminating the humble tent of her lawful husband Sher-Afkan Istajlu—a petty Turkish Jagirdar of Burdwan."

কাজেই মেহেরুন্নিসার এই lawful husband-কে পৃথিবী থেকে সরাতে না পারলে জগতের আলো সম্রাটের হারেমকে আলোকিত করবে না। পরিকল্পনা-মাফিক জাহাঙ্গীর তাঁর ধাত্রীভ্রাতা কুতুবুদ্দিন খান কোকাকে পাঠালেন বাংলার সুবাদার করে। সুবাদার হিসেবে তিনি প্রথম বর্ধমানে পা দিয়েই জায়গীরদার শের আফগানর সাক্ষাৎ প্রার্থী হন। বর্ধমান রেল স্টেশনের পূর্বে গঞ্জ-ই-শহীদ্দানে (বর্তমান সাধনপুরে) কুতুবুদ্দিন ও শের আফগানের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। শের আফগান পূর্ব থেকেই কিছুটা ষড়যন্ত্রের আঁচ করে কিছু সৈন্য সঙ্গে নিয়ে কুতুব শিবিরে হাজির হন। কিন্তু কুতুবুদ্দিনের অতর্কিত আক্রমণে শের আফগান নিহত হন। মেহেরুন্নিসা দিল্লীতে মোগল হারেমে প্রেরিত হলেন। কিছু দিন পরই জাহাঙ্গীরের Lawful Begum মেহেরুন্নিসা হলেন মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহান (জগতের আলো)। এসব ইতিহাস আগেই বর্ণিত হয়েছে।

আবু রায় [১৬৫৭-১৬৬৫ (?)] : জাহাঙ্গীরের পরে দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন শাহজাহান। তখন বাংলা সুবাদার শাহজাদা সুজা। সপ্তদশ শতকের পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলায় একটা বিদ্রোহ দেখা দিলে সেই বিদ্রোহ দমন করার জন্য সম্রাট এক মোগল বাহিনী ঢাকায় প্রেরণ করেন। বর্ধমানে পৌঁছানর পর বাহিনীর রসদে টান পড়লো। ফলে এখানেই গোটা বাহিনীকেই ছাউনী ফেলতে হয়। সৈন্য শিবিরে হাহাকার। বৈকুণ্ঠপুরের বঙ্কুবিহারী রায়ের পুত্র আবু রায়ের ভাগ্যাকাশে তখন বোধহয় বৃহস্পতি তুঙ্গে। সৈন্য শিবিরে রসদের অভাবের কথা আবুর কাছে পৌঁছাতেই আবু স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এলেন রসদের সম্ভার নিয়ে। মোগল সৈন্যবাহিনীর সমস্যা মিটলো; রসদের সম্ভার নিয়ে সৈন্যবাহিনী রওনা হল ঢাকা অভিমুখে।

বাংলার সুবাদার শাহজাদা সুজা আবুর এই অযাচিত সহায়তার কথা মোগল সম্রাটকে জানান ও এই সঙ্গে আবুকে একটা জমিদারী দিয়ে পুরস্কৃত করার জন্য সুপারিশও করেন। এ সময়ে রাম রায় নামে এক ব্যক্তি বর্ধমান চাকলার জমিদার ছিলেন বলে জনশ্রুতি। সুজার সুপারিশে হিজরী ১০৬৪ সনে (ইংরাজী ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) এক ফরমান জারী করে মোগল সম্রাট শাহজাহান আবু রায়কে সরকার সরিফাবাদ-এর ফৌজদারের অধীনে ৫৩২ টাকার (সিক্কা) বিনিময়ে বর্ধমান চাকলাব রেকাবি বাজার, মোগলটুলি ও ইব্রাহিমপুরের রাজস্ব আদায়ের অধিকার ও বর্ধমান চাকলার কোতোয়ালি পদ দান করেন। রাম রায়ের জমিদারী গেল। বর্ধমান রাজবংশের ভিত্তি স্থাপিত হল। আবু বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড ধরলেন। মহাজনী ও খাদ্যশস্যের কারবারী আবু রায় হলেন রেকাবি বাজার, মোগলটুলি ও ইব্রাহিমপুরের জমিদার ও বর্ধমান চাকলার নগর কোতোয়াল। খুব সম্ভবত ঘোড়সওয়ারের ব্যবহার্য জিনিসপত্র সরবরাহের বাজার বর্তমানে নতুন-গঞ্জই ছিল রেকাবি বাজার। আবু করিৎকর্মা লোক—অল্প সময়ের মধ্যেই সরকার সরিফাবাদের ফৌজদারের নেক নজরে পড়ে যান। পিতার এই কর্মকুশলতার ফলভোগ করেন পুত্র বাবু রায়। জনশ্রুতি সে সময় শ্রীপাট বাঘনাপাড়া বর্ধমান জমিদারীভুক্ত ছিল। কাননবিহারী গোস্বামীর মতে আবু রায় বাঘনাপাড়ার কবিরাজ রামচন্দ্র গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদকর্তা শ্রীশচীনন্দনকে রাধানগর গ্রামখানি দান করেন। কিন্তু এই মত বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ সবেমাত্র জমিদারী পেয়ে গ্রাম দান করবেন এটা গালগল্প ছাড়া কিছু নয়। কবি রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর 'শিরস্ক' নামক চতুর্দশপদী কবিতায় আবুকে বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিপুরুষ বলে আবু রায়ের প্রশস্তি গেয়েছেন। ...আবু

রায়! তোমার দ্বারায় / বর্দ্ধমান রাজবংশ স্থাপিত হইয়া / ভুবন-প্রসিদ্ধ এবে এই বাঙ্গালায় / পূর্ণরূপে যশ ব্যাপ্ত গগন ছাইয়া।...

বাবু রায় [১৬৬০(?)-১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ (?)] : আবু রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাবু রায় উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার জমিদারীর রাজস্ব আদায় এর স্বত্ব অর্জন করেন। তাঁর আসল নাম কিষাণ বাবু; কিন্তু বাবু রায় নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর থেকে জমিদারী চালান অসুবিধা বিবেচনা করে তিনি বৈকুণ্ঠপুর থেকে বাস উঠিয়ে বর্ধমান শহরের পশ্চিমে কাঞ্চননগরে বসতি স্থাপন করেন। তবে এ বিষয়ে অনেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কারো কারো মতে আবু রায়ই বৈকুণ্ঠপুর থেকে উঠে এসে বর্ধমানের বর্তমানের লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরের দক্ষিণে গৃহ নির্মাণ করে বসতি করেন। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ফরমান বলে বাবু রায় ১,০০,২৬২ সিক্কা টাকায় (প্রায় তিন লক্ষ টাকা) রাজস্ব বন্দোবস্তে বর্ধমানসহ আরও তিনটি পরগনার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ করেন। শুরু হল বর্ধমান রাজ জমিদারী এস্টেটের।

ঘনশ্যাম রায় [১৬৭০ (?)-১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ] : বাবু রায়ের পুত্র ঘনশ্যাম রায়। কিন্তু যদুনাথের ধর্মপুরাণে বলরাম রায় ও কৃষ্ণরামের উল্লেখ আছে।

মরিল বলরাম রায় অরাজক পুরী
সেই কালে কৃষ্ণরাম নিল বসুন্ধরী।

ঘনশ্যামের পুত্র কৃষ্ণরাম রায়। তাহলে কি ঘনশ্যামের আর এক নাম বলরাম? কিংবা বলরাম ও কৃষ্ণরাম দুই ভ্রাতা? তা যদি হয়, এমনও হতে পারে, বলরামের অকাল মৃত্যুর পর কৃষ্ণরাম জমিদারী লাভ করেন, কিন্তু কোন ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা যদুনাথের ধর্মপুরাণের বিবরণ সমর্থিত হয় না। ঘনশ্যাম সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে পিতার জমিদারী ও চৌধুরী পদে বহাল ছিলেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঘনশ্যামের সবচেয়ে বড় কীর্তি বর্ধমান শহরের জনগণের হিতার্থে প্রায় দশ একর জায়গার উপর শ্যামসায়র নামে বৃহৎ পুষ্করিণী খনন। শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথির এক বর্ণনা থেকে জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাবার পথে বর্ধমানে নামেন ও শ্যামসায়রের উত্তর-পূর্বদিকে ঈশানেশ্বর শিবমন্দির সংলগ্ন অতিথি নিবাসে অবস্থান করেন। এই অতিথি নিবাসের কাছে ছিল কাঁটাবন। শিবের প্রিয় কাঁটাবন দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ ভাবে পুলকিত হন।

কি কন্টকবন তার নাম নাহি জানি,
পূজিলে তাহার বন বড় তুষ্ট শূলপাণি।

কন্টক লইয়া মত্ত যাইল পূজায়।
অবশেষে মহেশ পদে কন্টক প্রদান।

তাছাড়া মহারাজা বিজয়চাঁদের আমলে শ্যামসায়রের চাঁদনীতে ১৯২৫ সালে ৮ই মে মহাত্মা গান্ধী অবস্থান করেছিলেন। এই সব দিক দিয়ে বিচার করলে ঘনশ্যাম রায়ের শ্যামসায়ের খনন সার্থক হয়েছিল বলা যায়। বর্ধমান শহরের শ্যামবাজার ও শ্যামলাল মহল্ল্যা আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে।

কৃষ্ণরাম রায় (১৬৭৫–১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দ) : দিল্লীর মসনদে আলমগীর ঔরঙ্গজেব আর সুবে বাংলায় তাঁরই মাতুল শায়েস্তা খানের শাসন। সিংহাসনে বসার পূর্বে ও পরে দু'দফা মিলিয়ে ঔরঙ্গজেবকে দীর্ঘ ২৬ বৎসর দাক্ষিণাত্যে কাটাতে হয—অধিকাংশ সময় বিজাপুব, গোলকুণ্ডা আর মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে কাটে। এই দীর্ঘদিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকাব ফলে মোগল বাজকোষে টান পরে। ফলে ঔরঙ্গজেবের সুবাদাব শায়েস্তা খান আসল তোমরজমা ও খলিফাজমার পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে মনসবদার ও জায়গীরদারের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হয় ও অধিক বাজস্ব দেবার অঙ্গীকারে খালি জমির রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নতুন নতুন জমিদার শ্রেণীর ওপর ন্যস্ত হয়। একটি পরগনায় দুটিব বেশী চৌধুরী থাকলেই তাদের পদচ্যুত করার আদেশ দেওয়া হয়। সুবে বাংলার মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণরামেরই ৫০টি পরগনার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল।

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খান বাংলার সুবেদারী থেকে বিদায় নেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন সম্রাটের ধাত্রীপুত্র খান-ই-জাহান কিন্তু অপদার্থতার জন্য তাঁকেও বিদায় নিতে হয়। ইব্রাহিম খান নতুন সুবাদার হয়ে আসেন।

১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘনশ্যাম রায়ের দেহান্ত হয় ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণরাম পৈতৃক সম্পত্তি ও পদবীর উত্তরাধিকারী হন। আবু রায় থেকে এই ক্ষেত্রীবংশের রাজ-আনুগত্য শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত। কৃষ্ণরামও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনিও পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান ও ইব্রাহিম খান এবং দিল্লীশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নাই। বিশেষ আস্থাবান বিবেচিত হওয়ায় বঙ্গেশ্বর তাঁকে অনেক ভূসম্পত্তি দান করেন। দিল্লীশ্বরও তাঁকে কম অনুগ্রহ করেন নাই। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁকে কতকগুলি পরগনার জমিদারী ও চৌধুরী খেতাব দিয়ে সম্মানিত করেন। যে ফরমানে বাদশাহ গাজী কৃষ্ণরামকে এই জমিদারী ও খেতাব দিয়েছিলেন তার অবিকল বঙ্গানুবাদ পরের পাতায় দেওয়া হল :—

মোহর

(আবল জাফর মহাম্মদ মহী অদ্দিন আলমগীর বাদশাহ্ গাজী)

অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য ফরমানে প্রচারিত হইল যে—বঙ্গদেশের সুবার এলাকাধীন পরগনে বর্ধমান ও গয়রহার জমিদারি চৌধুরাই বাবুর পৌত্র কিষণরামকে প্রদান করিলাম। কৃষিকার্যের উৎকর্ষতা সাধন, প্রজাগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন, কোন প্রকার নতুন কর গ্রহণ না করা এবং নিকটবর্তী স্থান সমূহে কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, তৎপ্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখাই তাহার কর্তব্য। সরকারের প্রাপ্য দুই লক্ষ টাকা নজরানা, ধার্য কিস্তি অনুসারে উল্লিখিত সুবার ধনাগারে প্রদান করে। বর্তমান ও ভাবী হাকিম, কারকুণ ও মোৎসদ্দিদিগের কর্তব্য যে. ইহাকেই পরগনা হায়ের জমিদার ও চৌধুরী বলিয়া মান্য করেন এবং ইহার জন্য প্রতি বৎসর নতুন সনন্দ দাখিল করিতে না বলেন।

২৪ রবিয়ল আখের, ৩৮ জুলুসে লিখিত হইল। (ইং ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ)

তপসিল মহল।

সরকার সরিফাবাদ এলাকা পরগনা বর্ধমান ও গয়রহা বাঘা, সাহাবাদ, সুজাপুর, রেকাবিবাজার, বাজার এব্রাহিমপুর, আজমত সাহি, সুধারপুর।

হাবিলি ও গয়রহা— সরকার সলিমাবাদ—

চৌমহা, হেয়াতপুর, সাহাপুর, মাজমপুর।

কিসমত হাবেলি—

লক্ষীপুর, মনখুর, বাগদায়না;

সেনপাহাড়ি ও গয়রহা

মতালক সরকার মন্দারণ

সেনপাহাড়ি, মানকুণ্ডি, আমিরাবাদ, সেরগর ও সলিমপুর, মায় সের কেন্দা

আমিরপুর

গোয়ালাভূম

সাহাপুর মহাল—

আজমপুর, হোসেন ফতোহ, মানিয়াকুন্তি, সুধানগরী, জাঁহাবাদ। এই ভূসম্পত্তির মধ্যে সেনপাহাড়ি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাঢ়ভূমির সমৃদ্ধশালী এই ভূখণ্ডে সুদৃঢ় দুর্গ শ্যামরূপার গড় অবস্থিত ছিল।

এছাড়া সুবাদার ও ফৌজদারদের অপদার্থতা ও অকর্মণ্যতার সুযোগে কৃষ্ণরাম পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য রাখারও অনুমতি লাভ করেন।

এরপর তিনি ভুরশুট, মনোহর শাহী, চন্দ্রকোণা ও বলাগড়ের জমিদারী লাভ করেন। এই সমস্ত পরগনার অধিকার লাভ করায় তিনি এক বিশাল অঞ্চলের জমিদার রূপে গণ্য হয়েছিলেন।

এই সনদ লাভের পূর্বেই কৃষ্ণরাম হুগলী জেলার নিজবালিয়া পরগনা অধিকার করেন ও সন্নিকটস্থ রসপুর আক্রমণ করেন এবং সেখানকার জমিদার কবি রামচন্দ্র কবিচন্দ্রের কুলদেবতা রাধাবল্লভকে জোর পূর্বক দখল করে নিয়ে এসে বর্ধমানে প্রতিষ্ঠা করেন। কবি রামচন্দ্র কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন' কাব্যে এর উল্লেখ আছে। কবিচন্দ্রের প্রতি কৃষ্ণরাম রায়ের ঋণাত্মক ভূমিকা ছাড়াও একটা ধনাত্মক ভূমিকা ছিল—সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।

এছাড়া কৃষ্ণরাম কিছু কিছু ছোট ছোট জমিদারের জমিদারীও গ্রাস করেছিলেন বলে মনে করা হয়। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতম্'-এ কৃষ্ণরামের এই রকম এক আগ্রাসন নীতির বিবরণ পাওয়া যায়— 'এতস্মিন্নেব সময়ে বর্ধমান নৃপবিষয়ানন্তর্বর্ত্তি চেতুয়েতি প্রসিদ্ধ দেশাধিপত্য শোভাসিংহ নৃপস্যপুরং বর্ধমান-নৃপেন কৃষ্ণরাম রায়েন লুণ্ঠিতং।' কিন্তু ক্ষিতীশ বংশাবলির এই বিবরণের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। বরং শোভা সিংহ যে বিদ্রোহী হয়ে পার্শ্ববর্তী জমিদারদের জমিদারীতে লুণ্ঠন কার্য চালিয়েছিলেন—এই তথ্যের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। আচার্য যদুনাথ সরকার তাঁর History of Bengal Vol. II এ মন্তব্য করেছেন—Shova sing, a Zamindar of Cheto-Barda in the Ghatal Subdivision of Medinipur, took to plundering his neighbours about the middle of 1695. শোভা সিংহ ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতিনের বর্ণনায় শোভা সিংহের বিদ্রোহের আগে গোটা রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে শোভা সিংহের বিদ্রোহ রাজ্যব্যাপী সংকট থেকে জাত। প্রজাদের মধ্যে এই বিদ্রোহে সমাজে নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের বিদ্বেষের খানিকটা ভূমিকা ছিল। কারও কারও মতে শোভাসিংহ ছিলেন নিম্নবর্ণের বাগদি বা বহিরাগত ক্ষত্রি। তিনি ব্রাহ্মণদের ভয় দেখিয়ে বা নানা ভাবে প্রলুব্ধ করে সমাজে একটা প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেছিলেন। স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে তিনি আত্মীয়বন্ধনে বদ্ধ হতে উদ্যোগী হন। তিনি বিষ্ণুপুরের নিম্নবর্ণের রাজপরিবারে কন্যার বিবাহ দেন। সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ শোভা সিং-এর এই সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াসকে ভাল চোখে দেখে নাই। কিন্তু নিম্নবর্ণের প্রজারা ছিলেন শোভা সিংহের পক্ষে। সম্পদশালীদের প্রতি রাজ্যব্যাপী

কৃষকদের এই তীব্র আক্রোশ এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। এর ফলে শোভা সিংহের সৈন্যবাহিনীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুঘলরাজ-বিরোধী কৃষকরা যোগ দেয়—ইংরেজদের ফ্যাক্টরী রেকর্ডে এর প্রমাণ আছে। (Revolt of Shova Sing—a case study—Aniruddha Roy.)

১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম চৌধুরী পদ লাভ করেন ও রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে মোগলদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। সেকারণে বাংলাব নবাবের দরবারে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। বিদেশী বণিকদের কাছে কৃষ্ণ রায় মুখ্য ইজারাদাররূপে পরিচিত ছিলেন। চৌধুরী কৃষ্ণরামের এই অভাবনীয় সৌভাগ্যে—প্রতিবেশী জমিদারগণ যে বিশেষ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠবেন—এটাই স্বাভাবিক। দিল্লীর বাদশাহের কৃষ্ণরামের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহে বিচলিত বোধ করে প্রতিবেশী জমিদারগণ্ ভাবলেন যে বাদশাহের অঙ্গুলি হেলনে তাঁদের জমিদারীও একদিন বর্ধমানে কৃষ্ণরামের জমিদারীভুক্ত হয়ে যেতে পারে। সে কারণে প্রতিবেশী জমিদারবর্গ মিলিতভাবে কৃষ্ণরামের ধ্বংসের জন্য উদ্যোগী হলেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শোভা সিংহ বর্ধমান-সহ নিকটবর্তী অন্যান্য জমিদারী লুণ্ঠন ও অধিকারের পরিকল্পনা করলেন। এই ষড়যন্ত্রের সামিল হলেন শোভাসিংহের কন্যার বিবাহ সূত্রে আত্মীয় বিষ্ণুপুরের জমিদার রাজা গোপাল সিংহ এবং চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ! কিন্তু দিল্লীর বাদশাহের অনুগৃহীত জমিদারের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে গেলে যে সমর-শক্তির প্রয়োজন তা চিতুয়া-বরোদা, বিষ্ণুপুর ও রঘুনাথপুরের যৌথবাহিনীর ছিল না। সেকারণে তাঁরা উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খানের সহযোগিতা চাইলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মোগল শাসন বাংলা ও উড়িষ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এ অঞ্চলে পাঠানগণ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। কাজেই মোগলদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে পাঠানরা যে হাত মেলাবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। শোভা সিংহ গয়রহা পাঠানদের এই মনোভাবের সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। কিন্তু কেবলমাত্র লুণ্ঠন বা মোগল বিদ্বেষই যে রহিম খানকে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে হাত মেলাতে প্রলুব্ধ করেছিল একথা মনে করলে ভুল হবে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের দীর্ঘ ৩৬ বৎসর যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে মোগল-কোষাগার শূন্যপ্রায়। চারিদিকে বিদ্রোহ; এই বিদ্রোহের সামিল মারাঠা, রাজপুত, জাঠ, সৎনামী ও শিখরা। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ঘন্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বিদেশী বণিকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে—ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হুগলীতে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেছেন; চন্দননগরে ফরাসীরা ঘাঁটি গেড়েছে। কাজেই রহিম

খানের দৃষ্টি পড়লো বাংলার মসনদের দিকে। কি জানি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে কতক্ষণ? কিন্তু এককভাবে তিনি তাঁর সমরশক্তির ওপর ভরসা করতে পারলেন না। তাই শোভা সিংহ গয়রহা ষড়যন্ত্রকারীদের আহ্বানে তিনি নিজের শক্তিবৃদ্ধির আশা দেখলেন। ষড়যন্ত্রকারীর দল একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তড়িৎ গতিতে বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হয়ে বর্ধমান আক্রমণ করেন। কৃষ্ণরাম বাইরের কোন সাহায্য প্রার্থনার অবকাশই পেলেন না। এই বিপদে হুগলীর ফৌজদারের তরফ থেকেও কোন সাহায্য এসে পৌঁছাল না। কৃষ্ণরাম তাঁর মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোমুখি হলেন। সলিমুল্লার মতে এই যুদ্ধ চন্দ্রকোণায় অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধে কৃষ্ণরাম নিহত হন বাংলা ১১০২ সাল পৌষ মাস অমাবস্যা তিথি (ইংরাজী ১৬৯৬, জানুয়ারী) কৃষ্ণরাম নিহত হওয়ার পর বিদ্রোহীদল সাতদিন ধরে মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্ধমান শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যাপক লুঠতরাজ চালালেন ও শেষে বর্ধমান শহরে প্রবেশ করে কৃষ্ণরামের রাজপ্রাসাদ অবরোধ করলেন। রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে ২৫ জন কর্মচারী ও অনুচরদের হত্যা এবং রাজকোষাগার লুণ্ঠন করে, সদলবলে হুগলীর দিকে অগ্রসর হলেন।

কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম আত্মরক্ষা ও পিতৃহন্তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে স্বয়ং স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে নদীয়া-রাজের কাছে আশ্রয় লাভের জন্য মাটিয়ারিতে উপস্থিত হন। তিনি স্ত্রী ব্রজকিশোরী, পুত্র কীর্তিচাঁদ ও মিত্রসেনকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়েছিলেন কিনা বা কার আশ্রয়ে তাঁদের রাখেন সে বিষয়ে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। খুব সম্ভবত নদীয়ারাজের আশ্রয়প্রার্থী হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ জগৎরামের গন্তব্য ছিল জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকা—সেখানকার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁকে বিষয়টি অবগত করান ও পিতৃহন্তা শোভা সিংহ ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রণোদিত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর সরাসরি ঢাকা যাওয়া প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তিনি তা না করে যখন নদীয়ারাজের আশ্রয়প্রার্থী হন তখন সম্ভাবনা থেকেই যায় যে স্ত্রীপুত্রকে নদীয়ারাজের আশ্রয়ে রাখার জন্যই সরাসরি ঢাকা না গিয়ে প্রথমে মাটিয়ারিতে উপস্থিত হন। পরে সেখান থেকে স্বয়ং ঢাকা যাত্রা করেন। তবে ফল বিশেষ হয় নাই।

ঢাকার সত্তর বছর বয়স্ক নবাব এবিষয়ে তেমন গুরুত্ব দিলেন না। এর ফল অবশ্য তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এই নিষ্ক্রিয়তা, অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতাই তাঁর সিংহাসন-চ্যুতির কারণ হয়। যাই হোক ইব্রাহিম

খান জগৎরামের কাছে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে বিদ্রোহীদেব সমরশক্তির ওপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে জগৎরামের সঙ্গে একজন মুসলমান সেনাপতির অধীনে কিছু সৈন্য দিয়ে বর্ধমানে প্রেরণ করেন। শোভা সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে ঐ সেনাপতি নিহত হন।

এই সময় যশোহর, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুরে ও হিজলীর ফৌজদার ছিলেন নুরুল্ল্যা খান। তাঁর প্রধান কার্যালয় ছিল যশোহরে। ইব্রাহিমের সেনাপতির মৃত্যুর পর নুরুল্ল্যাকে শোভা সিংহের মোকাবিলা করার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু নুরুল্ল্যা খানের প্রধান কাজ ছিল ব্যক্তিগত ব্যবসা—ফৌজের ভার ছিল তাঁর জামাতা লাল খাঁর ওপর। কিন্তু লাল খাঁ ছিলেন একেবারে অপদার্থ। তাঁর পক্ষে শোভা সিংহের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব হয় নাই। এমতাবস্থায় নুরুল্ল্যার ওপরই শোভা সিংহের মোকাবিলা করার দায়িত্ব পড়ে। নুরুল্ল্যা শোভা সিংহের বাহিনীর বিশালতা দেখে প্রাণভয়ে 'যঃ পলায়তে স জীবতি' নীতি গ্রহণ করে একেবারে সোজা হুগলী দুর্গে আশ্রয় নেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা দুর্গ ঘিরে ফেললে নুরুল্ল্যা খান তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে কাপুরুষের মত দুর্গের পিছনের দরজা দিয়ে পলায়ন করেন (১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ ২২শে জুলাই)। শোভা সিংহ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে হুগলী শহরে ঢুকে লুঠতরাজ শুরু করে। নুরুল্ল্যা দুর্গ থেকে বের হয়ে নদীপথে চুঁচুড়ায় পৌঁছান ও ওলন্দাজ বণিকদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ওলন্দাজ কুঠির ৩০০ সৈন্যের বাহিনী স্থলপথে শোভা সিংহকে আক্রমণ করেন। একই সঙ্গে তাদের দুটি জাহাজ থেকে দুর্গের প্রাচীরের দিকে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। বিদ্রোহীদের ছিল ২০০ অশ্বারোহী ও ৩০০ পদাতিক। ওলন্দাজ সৈন্যের এই সাঁড়াশী আক্রমণের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে শোভা সিংহ দুর্গের পশ্চাদ্ দ্বার দিয়ে পলায়ন করেন। কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম তীরের বিরাট অঞ্চল শোভা সিংহের দখলে রয়ে গেল। তারা প্রতিদিন চন্দননগর পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলে লুঠতরাজ চালাতে থাকে। শুধু লুঠতরাজ করে তারা ক্ষান্ত থাকে নাই। হুগলীকে কেন্দ্র করে গঙ্গার তীর ধরে বিস্তীর্ণ এলাকায় নৌবাণিজ্যের চুঙ্গিকর ও শুল্ক আদায় করতে লাগলেন ও তার বিনিময়ে বিদেশী বণিকদের নিয়মিত বাণিজ্যের অনুমতি দিলেন। শোভা সিংহকে হুন্ডী সরবরাহ করতে জগৎশেঠ বংশের পূর্বপুরুষ মহাজন গোকুলচাঁদ এগিয়ে আসেন। এর থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শোভা সিংহ একটা এলাকায় স্থায়ী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটা গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে দিল্লীর বাদশাহ তাঁকেই বর্ধমানের জমিদারী দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রহিম খানকে হুগলীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়ে

স্বয়ং বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হন। শোভা সিংহের লক্ষ্য বাংলার সুবেদারী নয়—তিনি জানতেন সে ক্ষমতা তাঁর নেই—তিনি উচ্ছিষ্টতেই সন্তুষ্ট। তাই তিনি দ্রুত গতিতে বর্ধমানের দিকে যাত্রা করলেন ও প্রথমেই বর্ধমানে রাজপ্রাসাদ অবরোধ করে প্রাসাদে প্রবেশ করেই নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন। কৃষ্ণরাম হত, জগৎরাম পলাতক। রহিম খান গয়রহা হুগলী অঞ্চলে লুণ্ঠন কার্যে ব্যস্ত। কাজেই শোভা সিংহের এখন অবাধ রাজত্ব।

শোভা সিংহ ছিলেন অতিশয় নীচ ও লম্পট প্রকৃতির—নারী লোলুপতা তাঁর রক্তে। কাজেই তিনি প্রহরীদের কৃষ্ণরামের অন্দরমহলের সমস্ত নারীদের বন্দী করে তাঁর সম্মুখে হাজির করার আদেশ দিলেন। এই সময় রাজবাড়ীর অন্দরমহলে তের জন নারীর নাম পাওয়া যায়—কুন্দদেবী, ফোতাদেবী, বিমোদেবী, লছমীদেবী, আনন্দদেবী, কিশোরীদেবী, কুঞ্জদেবী, জিতুদেবী, লাজোদেবী, মুলুকদেবী, পাতোদেবী, দাসোদেবী ও কৃষ্ণাদেবী। এই রমণীদের শেষের ছয়জন কৃষ্ণরামের সদ্য বিধবা স্ত্রী। এই নামের মধ্যে জগৎরামের স্ত্রী ব্রজকিশোরীদেবীর নাম নেই; এর থেকে অনুমান হয় জগৎরামের সঙ্গে তিনিও রাজপ্রসাদ থেকে গোপনে বের হয়ে নদীয়ারাজের কাছে আশ্রয় লাভ করেছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা পূর্ব থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে শোভা সিংহের সম্মুখে উপস্থিত হলে তাদের চরম লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হবে—মান ইজ্জৎ সব কিছু খোয়াতে হবে। কাজেই এই লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা চরম পন্থাই বেছে নিয়েছিলেন। শোভা সিংহের অনুচর অন্তঃপুরে যে দৃশ্য দেখলেন তা তারা কল্পনাই করতে পারেন নাই। তের জন রাজঅন্তঃপুরবাসিনীই জহর অর্থাৎ বিষ পান করে আত্মঘাতী—তাদের মৃতদেহ ধূলায় পড়ে—যেন 'এক গুচ্ছ তাজা গোলাপ অকালে ঝরে' পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। জেলার তথা বাংলার এই প্রথম ও শেষ জহরব্রত বর্ধমানের বুকে অনুষ্ঠিত হয় ১১০২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে (জানুয়ারী ১৬৯৬) অর্থাৎ কৃষ্ণরাম নিহত হওয়ার ৭ দিন পর।

এই তের জন রাজমহিষী আত্মঘাতী হলেও একজন তখনও অন্দরমহলে জীবিত—রাজকুমারী সত্যবতী। এই সংবাদ শুনে শোভা সিংহ নিশ্চয়ই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। একে অপরূপা সুন্দরী রাজনন্দিনী, তার ওপর কুমারী। এই রাজনন্দিনীর অপরূপ রূপলাবণ্যের কাহিনী তখন কিংবদন্তীর মত প্রচলিত, কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে—চোখের সামনে তেরজন মাতৃস্থানীয়াদের আত্মঘাতী হতে দেখেও সত্যবতী সে পথে গেলেন না কেন? তিনি

কি এর পরিণতি বুঝতে পারেন নাই? তা নয় চোখের সামনে তাঁর মাতা ও মাতৃস্থানীয়াদের আত্মঘাতী হতে দেখে তিনি নিশ্চয়ই প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠেছিলেন। সত্যবতী এখনও জীবিত একথা জানতে পেরে শোভা সিংহের কামনাদীপ্ত চোখ জ্বলে উঠলো—বর্ধমান বিজয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এই মুহূর্তে তাঁর করতলগত। প্রহরীর ওপর আদেশ হল অচিরাৎ সত্যবতীকে বন্দিনী করে তাঁর সম্মুখে হাজির করতে। বন্দিনীর ভুবনমোহিনী রূপ দেখে শোভা সিংহ বিমুগ্ধ মোহগ্রস্থ। শোভা সিংহের মধুর সম্ভাষণে রাজনন্দিনী নিরুত্তর—অতএব মৌনং সম্মতি লক্ষনম্—মনে করে কামোন্মত্ত শোভা সিংহ দু'হাত বাড়িয়ে রাজনন্দিনী সত্যবতীকে বুকের কাছে টেনে নিতে এগিয়ে এলেন। রাজনন্দিনী নিশ্চল—তিনি যেন ঠিক এই মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। স্বীয় বস্ত্রের মধ্যে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বের করে মুহূর্ত বিলম্ব না করে সেই ছুরিকা শোভা সিং-এর উদরে সরাসরি প্রবেশ করিয়ে দিলেন। নারীলোলুপ কামার্ত পাপিষ্ঠের মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আর কাল বিলম্ব না করে রাজকুমারী সেই ছুরিকা শোভা সিংহ-এর উদর থেকে বের করে নিয়ে নিজের বুকের মধ্যে বিদ্ধ করলেন। রক্ষীবৃন্দ জীবিত অবস্থায় সত্যবতীর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারলো না।

ঠিক এমনি ভাবেই আলাউদ্দিনের চিতোর জয়ের পর চিতোরের মহাশ্মশানের মধ্যস্থলে চিতোরেশ্বরী মন্দিরের সম্মুখে বারো হাজার রাজপুত সুন্দরী জহরব্রত পালন করে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। এমনি আর এক জহরব্রতের কাহিনী শাহাজাদা জাহানারার আত্মজীবনীতে স্বর্ণাকারে লিখিত আছে। সে কাহিনী—মোগলবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে জয়মল ও পুত্তার আত্মদানের কাহিনী—সে কাহিনী রাজপুত রমণীদের ইজ্জতরক্ষার জন্য অগ্নিকাণ্ডে আত্মাহুতির মর্মন্তুদ বিবরণ।

'চারণের মুখে আজও শুনতে পাই—
সেই মরণের বাণী—সেই জীবনের কাহিনী—
সবাই মরে—সবাই বেঁচে থাকে।'

(মাখনলাল চৌধুরীর অনুবাদ)

বর্ধমান রাজপ্রাসাদে সতীত্ব রক্ষার জন্য আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা বর্ধমানের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রইলো—লিখিত রইলো সেই মরণের বাণী—সেই জীবনের কাহিনী—

সবাই মরে—সবাই বেঁচে থাকে।

শোভা সিংহের মৃত্যুর পর রহিম খানের ভ্রাতা হিম্মৎ খান শোভা সিংহের স্থলাভিষিক্ত হন। হিম্মৎহীন হিম্মৎখান ছিলেন একেবারে অকর্মণ্য, বিলাসী ও

ইন্দ্রিয়পরায়ণ। বিদ্রোহী সৈন্যদল অচিরেই তাঁকে গদিচ্যুত করে রহিম খানকে আহ্বান করে। রহিম খান দেখলেন বাংলা সুবেদারী দূর অস্ত—কাজেই বিদ্রোহীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বর্ধমানে এলেন ও রহিম শাহ্ উপাধি ধারণ করে বর্ধমানের তখ্‌তে বসলেন। এরপর রহিম শাহ বিজয় অভিযানে বের হন। প্রথমেই তিনি নদীয়া হয়ে মুকসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু এখানকার জায়গীরদার নামাৎ খান বাধা দান করলে রহিম শাহ্ তাঁকে হত্যা করে কাশিমবাজারের দিকে অগ্রসর হন। কাশিমবাজারের রেশম কুঠি আক্রমণ করলে কুঠিয়াল রহিমকে বিরাট অঙ্কের মুক্তিপণ দিয়ে তাঁর হাত থেকে রেহাই পান। পরে রহিম ভ্রাতা হিম্মৎকে কাশিমবাজারের দায়িত্বে রেখে আরও অগ্রসর হয়ে রাজমহল ও মালদহের কিছু অংশ অধিকার করেন। এই সব অঞ্চলে লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে রহিম প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন।

বাংলায় এই বিপর্যয়ের সংবাদে সম্রাট ঔরঙ্গজেব বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খানকে বরখাস্ত করেন ও শাহজাদা আজিম-উস-শান-কে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। ইতিমধ্যে ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খান সঙ্গে অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মুক্‌সুদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। পথে রাজমহল ও মালদহ পুনরুদ্ধার করে হিম্মৎ ও রহিম শাহসহ সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনীকে মুকসুদাবাদ ও বর্ধমান থেকে বিতাড়িত করেন। বিদ্রোহীরা চন্দ্রকোণার জঙ্গলে গা-ঢাকা দেয়। জবরদস্ত বর্ধমানে আস্তানা গাড়লেন। শাহ্‌জাদা তখন মুঙ্গেরে শিবির স্থাপন করে বিলাসে গা ঢেলে দিলেন। কারণ তখন বর্ষা শুরু হয়ে গেছে—নদীমাতৃক বর্ধমানে অভিযান চালানোয় নানা অসুবিধা।

নভেম্বরে বর্ষা শেষ হতেই আজিম-উস-শান বর্ধমানে এলেন। তিনি জবরদস্ত খানের সাফল্যে কিছুটা ঈর্ষান্বিত—কাজেই বর্ধমানে এসে জবরদস্ত খানকে বিশেষ আমল না দিয়ে নিজেই জমিদারী শাসন হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর প্রতি শাহজাদার এই রকম উদাসীনতা লক্ষ্য করে জবরদস্ত খান বিশেষ অপমানিত বোধ করলেন ও পদে ইস্তফা দিয়ে পিতা ইব্রাহিমের কাছে দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলেন। বর্ধমানে এসে আজিম এখানকার জলহাওয়ায় দিব্যি আরামে বিলাস ব্যসনে বছর খানেক কাটিয়ে দিলেন। শাহজাদার এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহীরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো। রহিম খান আবার স্বমূর্তি ধারণ করে হুগলী ও নদীয়ায় লুণ্ঠন চালিয়ে বর্ধমানে ফিরে এলেন। শাহজাদা রহিম খানকে ভর্ৎসনা করে পত্র পাঠান ও আত্মসমর্পণ করতে বলেন। রহিম এক কূট চাল চেলে শাহজাদার কাছে প্রস্তাব পাঠান—সন্ধিপত্র নিয়ে প্রতিনিধি তাঁর শিবিরে এলে তিনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর

করবেন। শাহজাদা রহিমের চাল বুঝতে না পেরে তার ফাঁদে পা দিলেন ও খাজা আবুল কাশেমকে সঙ্গে দিয়ে তাঁর প্রধান উজির খাজা আনোয়ারকে রহিমের সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরেব জন্য বহিমের শিবিরে প্রেরণ করলেন। খাজা সাহেব রহিমের শিবিরে পৌঁছালে রহিম তাঁর প্রতি কোন সৌজন্য প্রদর্শন না করে খাজা আনোযাবকে তাঁর শিবিরের ভিতর আহ্বান করলেন। উজির সাহেবের কাছে সমস্ত ব্যাপাবটা স্পষ্ট হযে গেল। তিনি আর কাল বিলম্ব না করে দুর্গের দিকে রওনা হলেন। রহিম খানও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ করলেন। আনোয়ার সাহেব তাঁর মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে রহিমের মোকাবিলা করতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না—খাজা আনোয়ার রহিমের হাতে নিহত হলেন (১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট)।

এরপর শাহজাদা জ্বলে উঠলেন ও রহিমকে উচিত শিক্ষা দেবাব জন্য সসৈন্যে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। দামোদর পাড়ে মূলকাটিতে মতান্তরে চন্দ্রকোণায় এই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ চলাকালীন হামিদ খান কুরেশী নামক শাহজাদার এক আরব অনুচরের অতর্কিত আক্রমণে রহিম নিহত হন। নেতৃত্ববিহীন রহিমের বিদ্রোহী সৈন্যদল বিভ্রান্ত হয়ে কতক দেশে ফিবে গেল, আর কতক মোগল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে শাহজাদা আজিম-উস-শানের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করলো।

যুদ্ধ জয়ের পর শাহজাদা বর্ধমানে ফিরে বহ্রাম সক্কার সমাধির পাশে নতজানু হয়ে তাঁর দোয়া প্রার্থনা করলেন। রহিম খানের মৃত্যুতে নিশ্চিন্ত হয়ে শাহজাদা আরও দু বছর বর্ধমানে থেকে যান। বর্ধমানে থাকাকালীন শাহজাদা দেখলেন দীর্ঘ দিন বিদ্রোহীদের অত্যাচারে রাজস্ব কিছুই আদায় হয় নাই। রাজকোষও শূন্য—কৃষ্ণরামের মৃত্যুর পর কোষাগারে যা ছিল শোভা সিংহ গয়রহা সমস্তই (প্রায় ৩৯ লক্ষ টাকা) লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছেন। রিয়াজের বিবরণ থেকে জানা যায় আজিম-উস-শান-এর পর বর্ধমানে বছর দুই থাকার সিদ্ধান্ত নেন। উদ্দেশ্য ছিল শোভা সিংহ গয়রহা বিদ্রোহীদের আক্রমণের পর বর্ধমানে যে প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যে চরম বিপর্যয় ঘটেছে তার সুবন্দোবস্ত করা এবং বর্ধমান শহরে রাস্তাঘাট ও কিছু কিছু প্রাসাদ নির্মাণ করে বর্ধমান শহরের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা। বর্ধমানের বিখ্যাত জুম্মা মসজিদ আজও আজিম-উস-শানের স্মৃতি বহন করছে। অজিম-উস-শানের বর্ধমানে আসার অনেক আগে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বর্ধমানে মুসলমান সাধুসন্তদের আগমন ঘটতে থাকে। বহরাম সক্কা ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে

এসেছিলেন। আজিম-উস-শানের সময় সুফি-সন্তদের অনেক আস্তানা বর্ধমানে ছিল। সুফি-সন্তদের প্রতি আজিমের যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তিও ছিল। তাঁর সময়ের বিখ্যাত সুফী বায়াজিদ-এর আস্তানায় একদিন শাহজাদা তাঁর দুই পুত্র করিমুদ্দিন ও ফারুকশিয়ারকে আস্তানায় নিয়ে গিয়ে পুত্রদের প্রতি বায়াজিদ-সুফীর আশীর্বাদ কামনা করেন। জ্যেষ্ঠ করিমুদ্দিন ছিলেন রাজকীয় মর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ ও উদ্ধত প্রকৃতির আর কনিষ্ঠ ফারুকশিয়ার ছিলেন সাধুসন্তদের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও বিনয়ী। কনিষ্ঠই বায়াজিদের আশীর্বাদ লাভ করেন ও ভবিষ্যতে কনিষ্ঠ হলেও ঘটনা বিপর্যয়ে ফারুকশিয়ারই দিল্লীর সিংহাসনে বসেন (১৭১৩–১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ)। সম্রাট হওয়ার পর ফারুক বায়াজিদের আর্শীবাদ স্মরণ করে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বর্তমান—কালনা রোডের ধারে বর্ধমান স্টেশনের কালনা গেটের কাছে 'বন মসজিদ' নির্মাণ করে দেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আজিম-উস্-শান যখন বর্ধমানে অবস্থান করছিলেন তখন ইংরেজ বণিকরা কলকাতা সুতানুটি গোবিন্দপুরের জমিদারীর স্বত্ব ক্রয় করেন।

কৃষ্ণরামের কৃতিত্ব : বর্ধমানের জমিদার বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণরাম রায়—যদিও তিনি মোগল বাদশাহের ফরমান বলে চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত তবু প্রকৃত অর্থে জনগণের কাছে তিনিই ছিলেন রাজা। মোগল বাদশাহের ফরমান বলে তিনি সরকার সরিফাবাদ পরগনার বর্ধমান হাবিলি গয়রহা মহাল, সরকার সেলিমাবাদ, কিসমত হাবিলি, সেন-পাহাড়ি পরগনা, গোপভূম সরকার ও চন্দ্রকোণা পরগনাসহ ৫০টি পরগনার জমিদারী ও চৌধুরী খেতাব লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ভুরশুট, মনোহরসাহী ও বলাগড়, নিজবালিয়া পরগনা দখল করে নিজ জমিদারী ভুক্ত করেন। এই ভাবে কৃষ্ণরামের জমিদারী এক বিশাল রাজত্বের আকার ধারণ করে। তিনি এক বিশাল সম্পদের অধিকারী হন।

কৃষ্ণরামের বদান্যতা ও দেবদ্বিজে ভক্তি তাঁর চরিত্রকে পুণ্যশ্লোক নলরাজার মহত্বে উন্নীত করেছিল—

খেত্রী বংশেতে জন্ম নাম কৃষ্ণরাম।
প্রভাতে উঠিয়া মুখে স্বরে যার নাম॥
কৃষ্ণরামের নামে তাপ বিমোচনে।
চিরকাল রাজুতি করেন বর্ধমানে॥

(যাদুনাথের ধর্মপুরাণ)

কৃষ্ণরাম হাওড়া জেলার রসপুর আক্রমণ করে কবি রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্রের বাড়ীর মন্দির থেকে রাধাকান্ত বিগ্রহ জোর করে কেড়ে নিয়ে এসে

বর্ধমানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে কবিচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র মুকুন্দ রায় সেই বিগ্রহ কৃষ্ণরামের কাছে প্রার্থনা করতে এলে, কৃষ্ণরাম তাঁকে নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ দেন এবং মূর্তি কেড়ে আনার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মুকুন্দপ্রসাদকে দেবসেবা চালাবার জন্য ৮৫ বিঘা নিষ্কর জমি দেবোত্তর দান করেন। ১০৯১ বঙ্গাব্দের ১১ই বৈশাখ তারিখের (১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) ঐ দানপত্রের সনদ সম্পাদিত হয়—সনদের প্রতিলিপি নিম্নরূপ :—

শ্রীশ্রী হরি

(স্বাক্ষর) মহারাজা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম রায়।

ইয়াদকীর্দ্দ শ্রীজগন্নাথ রায় সদুদার চরিতেষু পত্রমিদং সন ১০৯১ এক হাজার একানই সালাব্দে লিখনং কার্য্যাঞ্চ আগে তোমারদিগের ইষ্টদেবতা শ্রী শ্রী (রাধাকান্ত বিগ্রহ) ছিলেন তাহা আমি শেবা করিতে লইলাম তুমি পুনরায় ৵প্রকাশ করিয়া সেবা করহ সেবার কারণ মৌজে রষপুর ওগয়রহ মামুলে পরগণে বালিডাঙ্গা মৌজে মজকুর হায়তে খারিজ্জমা বঞ্জর জমী ৮৫ বিঘা দেবোত্তর করিয়া দিলাম গ্রাম ২ জায়ামাফিক চিহ্নিত কবিয়া জোত আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদীক্রমে শ্রীশ্রী ৵সেবাকরহ রাজ পরমাইষ ও শীক পরমাইষ ও রাজস্ব সহিত দায় নাস্তা এবং রষপুর গ্রামে তোমাদিগকে খানাবাটী আছে যুদামত জার জে ভোগ আছে, সেই মাফিক এখন আমল করিয়া ভোগ করহ নস্তবদীয়ত না হবেক সভে আপন ভোগ প্রমাণ আমল করহ এতদর্থে পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি ১১ বৈশাখ।

জায় রষপুর	২০
হাবধাড়া	১০
তালসহর	১০
দুর্ব্বাচট	৩২
কলিকাতা	১০
কুমারিয়া	৩
	৮৫

এছাড়া কবিচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দপ্রসাদ রায় পৃথক ভাবে কৃষ্ণরাম রায়ের কাছ থেকে ১৪১ বিঘা ভূমিদান লাভ করেন। সনদ সম্পাদনের তারিখ ১১০০ সাল (১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দ এই সনদের অন্যতম শর্ত—'এ জমী তোমাকেই দিলাম ভাই ভায়াদ জ্ঞাতি গোত্র কাহার সহিত এলাকা নাই।' (কবিচন্দ্রের শিবায়ন কাব্যে ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণরামের জমিদারী শাসনকালে বর্ধমানে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়—তখন প্রজাদের ক্লেশ নিবারণের জন্য ৩০ একর জমির ওপর কৃষ্ণসায়র নামক বিরাট পুষ্করিণী খনন করান। বর্তমানে যেমন খরার সময় সরকার থেকে "Food for work" প্রকল্প চালু করা হয় তেমনি কৃষ্ণরাম এই হ্রদাকৃতি বিরাট পুষ্করিণী খননের জন্য ঝুড়ি পিছু ১ কড়ি মজুরীদানের ব্যবস্থা করে প্রজা-সাধারণের ক্লেশ দূর করতে প্রয়াসী হন—প্রজাবৎসল কৃষ্ণরামের এই বিরাট কীর্তি তাঁর বদান্যতা ও প্রজাহিতৈষণার স্মৃতি বহন করছে। এই পুষ্করিণীর তীরে খুব সম্ভবত তিনি রাজ-প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর পুত্র জগৎরাম এই পুষ্করিণীতে স্নানের সময় গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। কাঞ্চননগর বা বারদুয়ারীতে তাঁর বাসস্থান ছিল বলে যাঁরা দাবী করেন জগৎরামের এই পুষ্করিণী স্নান করার ঘটনায়, তাঁদের যুক্তি নস্যাৎ হয়ে যায়। কাঞ্চননগর থেকে মাইল দুই দূরে কৃষ্ণসায়রে স্নান করতে আসা অবাস্তব বলেই আমার ধারণা। বিদ্রোহীদের হাতে কৃষ্ণরামের অকাল মৃত্যুতে বর্ধমানের বুকে সূচিত হলো বর্তমান কলকাতা মহানগরীর জন্মলগ্ন। হায় কৃষ্ণরাম! তুমি যদি বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অকালে প্রাণ বিসর্জন না দিতে, তাহলে শাহজাদার বর্ধমানে অবস্থানও হয়ত ঘটতো না আর বড়িশার জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের কাছ থেকে মাত্র ১৩০০ টাকার বিনিময়ে ডিহি কলকাতা গোবিন্দপুর ও সুতানুটি এই তিন গ্রাম ক্রয়ে সুবাদারের সম্মতি ও স্বাক্ষর আদায় করা সম্ভব হতো না—অবশ্য সুবাদারের পাওনা হয়েছিল ১৬০০০ টাকা। এর ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী ২০০ বছর ইংরেজ শাসনের সূচনা। মোগল শাসকের অর্থগৃধ্নুতা ও অদূরদর্শিতার ফলে বাংলায় যে ইংরেজ শাসনের সূচনা হল—তা ঠেকানো হয়তো যেত না কিন্তু আরও কিছুকাল পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব হত। এই দিক দিয়ে কৃষ্ণরামের শাসনকাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জগৎরাম রায় (১৬৯৯–১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ) : কৃষ্ণরাম রায়ের মৃত্যুর তিন বৎসর পর মোগল সুবাদার কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরামকে ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতার জমিদারীতে অধিষ্ঠিত করেন। জগৎরাম বিদ্রোহী রহিম খানের বিরুদ্ধে মোগল-বাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ আজিম-উস-শানের সুপারিশক্রমে বাদশাহ্ গাজী আলমগীরের ফরমান বলে হিজরী ১১১১ সালে (১৬৯৯ অব্দে) চৌধুরী খেতাব ও চম্পানগরী, জাহানাবাদ ও পাণ্ডুয়াসহ ৪৫টি পরগনার রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেন।

জগৎরাম মাত্র ৪ বৎসর জমিদারী শাসন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ব্রজকিশোরীর গর্ভে দুই পুত্র কীতিচাঁদ ও মিত্রসেন জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা

১১০৮ সালের ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে (১৭০২ মার্চ) তাঁর পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণসায়র পুষ্করিণীতে স্নান করার সময় জনৈক গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে জগৎরাম নিহত হন। এই হত্যার সঠিক কারণ জানার মত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অনুমান হয় রহিম খান মূলকাটির যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হওয়ার পর, তার কিছু সৈন্য মোগল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়, তাদের মধ্যে রহিম খানের একান্ত অনুগত কিংবা শোভা সিংহের বা হিম্মৎ খানের নিয়োজিত কোন গুপ্তঘাতক শোভা সিংহ ও রহিম খানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এই জঘন্য হত্যা করে থাকবে।

জগৎরামের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ব্রজকিশোরী দীর্ঘ দিন বেঁচে ছিলেন। তাঁর পোষকতায় অম্বিকাকালনার প্রাণবল্লভ ঘোষ 'জাহ্নবীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

অনেকের ধাবণা রসপুরের জমিদার কবি রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র মুকুন্দপ্রসাদ রায়কে এককভাবে ১৪১ বিঘা জমির জন্য বর্ধমানের চৌধুরীদের পক্ষ থেকে যে দানপত্র সম্পাদিত হয় সেটি স্বাক্ষর করেছিলেন জগৎরাম কিন্তু ডঃ আবদুস সামাদ তাঁর "বর্ধমান রাজবংশাশ্রিত বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে দানপত্রটিতে কৃষ্ণরাম রায়ের স্বাক্ষরের বদলে 'সাহী নাগরি' লিখিত আছে কিন্তু দানপত্র সম্পাদন করেছিলেন কৃষ্ণরামই কারণ দানপত্র সম্পাদিত হয়েছিল ১১০০ বঙ্গাব্দের ১১ই আষাঢ় (১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)। কৃষ্ণরাম তখন জীবিত। কৃষ্ণরামের মৃত্যু হয় ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। কাজেই দানপত্র সম্পাদনকারী কৃষ্ণরামই; জগৎরাম নন।

কীর্তিচাঁদ রায় (১৭০২–৪০ খ্রীষ্টাব্দ) : জগৎরামের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কীর্তিচাঁদ রায় পৈতৃক জমিদারীর তখ্‌তে বসেন। জগৎরামের মৃত্যুর সময় কীর্তিচাঁদ তিন বৎসরের শিশু। স্বাভাবিক ভাবে মাতা ব্রজকিশোরী তাঁর অভিভাবিকা হিসাবে জমিদারী পরিচালনা করেন। কৃষ্ণরাম ও তৎপুত্র জগৎরামের সনদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোন সনদেই কাউকে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে স্থায়ীভাবে জমিদারীর রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হয় নাই। প্রত্যেককেই পৃথক পৃথক ভাবে বাদশাহী ফরমান লাভ করতে হয়। কাজেই কীর্তিচাঁদের জন্য সুবাদারের মাধ্যমে বাদশাহ ও ঔরঙ্গজেবের কাছে সনদের জন্য আবেদন করতে হয়। সেই অনুসারে কীর্তিচাঁদকে প্রথমে অস্থায়ীভাবে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার সিক্কাটাকার নজরানার বিনিময়ে ৪৯টি মহলের রাজস্ব আদায়ের অধিকার ও চৌধুরী খেতাব প্রদত্ত হয়; পরে সুবাদার আজিম-উস-শানের সুপারিশ ক্রমে

বাদশাহ আলমগীর হিজরী ১১১৫ সনের ২০শে সওয়াল (১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দ) ফরমান জারী করে পাকাপাকিভাবে ৪৯ পরগনার রাজস্ব আদায়ের অধিকার ও 'চৌধুরী' খেতাব প্রদান করেন। সনদের বয়ান কৃষ্ণরামকে প্রদত্ত ফরমানের মত প্রায় একই রূপ—আবুল জাফর মহাম্মদ মহীউদ্দিন আলমগীর বাদশাহ গাজী অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য ফরমান প্রচারিত হইল যে...

২০ সওয়াল সন ৪৮ জুলুস।

কীর্তিচাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিত্রসেনের জন্য রাজকোষ থেকে একটা মাসিক ভাতা বরাদ্দ হয়।

সরকারীভাবে চৌধুরী পদে অধিষ্ঠিত হবার পর কীর্তিচাঁদ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজ ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করতে থাকেন ও তাঁর পিতামহ কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী হত্যাকারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তাঁদের হত্যা করে বা যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁদের জমিদারী নিজের জমিদারীভুক্ত করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ আলমগীরের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে দীর্ণ। মোগল শাসনে দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটতে থাকে। ঔরঙ্গজেবপুত্র মোয়াজ্জেম প্রথম শাহ আলম নাম নিয়ে মোগল সিংহাসনে বসেন। শাহ আলমের মৃত্যুর পর জাহান্দর শাহ (১৭১২–১৩ খ্রীষ্টাব্দ) পরে ফারুকশিয়ার (১৭১৩–১৯) সম্রাট হন। বাংলায় আজিম-উস-শানের পর মীরজুমলা মোগল সম্রাটের অধীনে বাংলার সুবেদারী পদে অধিষ্ঠিত হন। মোগল সাম্রাজ্যের এই টলটলায়মান অবস্থায় ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খান বাংলার নবাব নিযুক্ত হয়ে প্রায় স্বাধীন ভাবেই নবাবী পরিচালনা করতে লাগলেন। এখন থেকে বাংলার নবাবী বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে স্বাধীন নবাবীর পত্তন হয়। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি দেওয়ান হয়ে এসেই রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য জমিদারীর পুনর্বন্টন করলেন। অকর্মণ্য জমিদারের সংখ্যাই সর্বাধিক ছিল, এরা ঠিকমত রাজস্ব জমা দিত না। মুসলমান জমিদারগণ তো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অর্থ আত্মসাৎ করতেন। মুর্শিদকুলি খান এইসব জমিদারের জমিদারী অধিগ্রহণ করে তাদের জায়গায় নতুন নতুন হিন্দু ইজারাদার নিযুক্ত করলেন। এই সমস্ত ইজারাদারদের মধ্যে পুথিয়ার জমিদার, নাটোরের জমিদার, দিঘাপতিয়া রাজ, ময়মনসিংহের রাজার নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বীরভূমের আশাদুল্লা খান ও বর্ধমানের কীর্তিচাঁদ পূর্ববৎ রয়ে গেলেন। মুর্শিদকুলির পূর্ব থেকে অর্থাৎ মোটামুটি ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ওলন্দাজ কোম্পানী চুঁচড়ায় ঘাঁটি গেড়ে পাটনা ও কাশিমবাজারে Factory গড়ে তোলে এবং বাণিজ্য চালাতে থাকে। ১৭০০–

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চন্দননগরে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মন্দা চলছিল—ডুপ্লের আমলে অবস্থার উন্নতি ঘটে। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ করে এবং বেহালা-বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের কাছ থেকে কলকাতা গোবিন্দপুর ও সুতানুটি গ্রাম ক্রয় করে ডিহি কোলকাতায় জাঁকিয়ে বসে। বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বর্ধমানের ইতিহাস বিচার করতে হবে।

ঠিক এই সময় চিতুয়াবরোদার রাজা শোভা সিংহের ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ ও চন্দ্রকোণার রাজা, মুর্শিদকুলি খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে কীর্তিচাঁদ প্রবল বিক্রমে এদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং ঘাটালে এদের মুখোমুখি হয়ে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করেন। ফলে কীর্তিচাঁদ মুর্শিদকুলি খানের বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন হন এবং মুর্শিদকুলি খানের সাহায্যে কীর্তিচাঁদ তাঁর পিতামহ কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হন।

প্রথমে তিনি তারকেশ্বর শিবতীর্থের সন্নিকটস্থ বালঘড় পরগনা দখল করার জন্য তারকেশ্বর মন্দিরের মোহান্তদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। এই যুদ্ধে মোহান্ত বলভদ্র গিরির সেনাপতি ছিলেন হীরা সিং ও ঋষিনাথ গিরি এবং কীর্তিচাঁদের সেনাপতি ছিলেন কিশোরচাঁদ ও জাহীর সিং; দীর্ঘদিন যুদ্ধের পর কীর্তিচাঁদ ভুরশুট পরগনা অধিকার করেন। এর ফলে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে চরম ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়। ভারতচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস ছিল আধুনিক হাওড়া জিলার ভুরশুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে। ইঁহাদের উপাধি ছিল মুখোপাধ্যায়, জমিদার বংশ। কবি ঈশ্বরগুপ্ত রচিত রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ একবার কীতিচাঁদ-জননী ব্রজকিশোরীর প্রতি চরম কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। ভারতচন্দ্রের জীবনীতে অবশ্য গুপ্তকবি একটু ভুল করেছেন তিনি কীর্তিচাঁদ-জননী ব্রজকিশোরীকে বিষ্ণুকুমারী বলে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য জগৎরামের যখন মৃত্যু হয় তখন কীর্তিচাঁদ তিন বৎসরের শিশু; মাতা ব্রজকিশোরীই তাঁর অভিভাবিকা হিসেবে জমিদারী পরিচালনা করছিলেন। নরেন্দ্রনারায়ণের অপমানে ব্রজকিশোরী চরম অপমানিতা ও প্রচণ্ড ক্রুদ্ধা হন। দেওয়ান রাজবল্লভের পরামর্শে এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আলমচাঁদ ও ক্ষেমচাঁদ নামক দুজন সেনাপতির নেতৃত্বে সৈন্য পাঠিয়ে ভুরশুট পরগনা আক্রমণ করেন এবং পেঁড়ো ও গড়ভবানীপুর অধিকার করেন। নরেন্দ্রনারায়ণের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাঁকে সর্বস্বান্ত করেন (১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ)। এর ফলে নরেন্দ্রনারায়ণ সপুত্র গ্রাম ত্যাগ করেন। ভারতচন্দ্র তখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় লাভ করেন ও তাঁর

আশ্রয়ে থেকে থেকে 'রসমঞ্জরী' নামে একটি অনুবাদ কাব্য রচনা করেন—এই কাব্যে ব্রজসুন্দরী কর্তৃক তাঁর পিতার সর্বস্বান্ত হওয়ার উল্লেখ আছে—

রাজবল্লভের কার্য্য কীর্তিচন্দ্র নিল রাজ্য
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া ॥

পরে অবশ্য পেঁড়োর পুরনারীদের আকুল আবেদনে ব্রজসুন্দরী কিছুটা নরম হন ও দেবসেবার জন্য সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি ফিরিয়ে দেন। নরেন্দ্রনারায়ণও পরে অনুতপ্ত হয়ে ব্রজসুন্দরীর কাছে আবেদন করলে ব্রজসুন্দরীর অধিকৃত নরেন্দ্রনারায়ণের জমিদারীর কিছু অংশ ইজারা দান করেন। কিন্তু নরেন্দ্রনারায়ণ এক সময় এই ইজারালব্ধ জমিদারীর রাজস্ব বর্ধমান রাজকোষে জমা দিতে না পারায় কীর্তিচাঁদ ইজারাটি খাস করে নেন। তখন অগ্রজদের অনুরোধে ভারতচন্দ্র ইজারা উদ্ধারের জন্য বর্ধমানে এসে রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েন ও কারারুদ্ধ হন। তবে এমনও হতে পারে রাজস্বের কিস্তিখেলাপের জন্য ভারতচন্দ্র কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। কারণ তৎকালীন আইন অনুযায়ী কিস্তিখেলাপের শাস্তি ছিল কারাবরণ, 'বৈকুণ্ঠ দর্শন' প্রভৃতি। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও এর উল্লেখ আছে—

প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইল বন্দি
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।

জনশ্রুতি—এই সমস্ত কারণে ভারতচন্দ্র বর্ধমান রাজপরিবারের উপর আক্রোশবশত বর্ধমান রাজবংশের কেলেঙ্কারী সম্বলিত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। এ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছিলেন—

"বর্ধমানের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দর কলঙ্কের যোগাযোগ কুটিল ভারতচন্দ্রের কল্পনা-প্রসূত। ভারতচন্দ্র 'মুখোপাধ্যায়' ছিলেন....মুখুজ্যেরা রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বড়ই কুটিল। কথাই আছে—'মুখুটি কুটিল বড় বন্দ্যঘটী সাদা'—এ কবিতা আর অধিক উদ্ধৃত করিব না। ভারত জাতিতে মুখুজ্যে, তাহাতে বর্ধমানরাজ তাহার পিতাকে সর্বস্বান্ত করেন ও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। সুতরাং তাহার রাগ বাড়িয়া যায়। তাই বিদ্যাসুন্দরের কেলেঙ্কারী বর্ধমানরাজের ঘাড়ে চাপাইয়া অনেকটা প্রতিশোধ লয়েন।" (কবি কৃষ্ণরাম, প্রবন্ধ)। ডঃ সুকুমার সেন বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীকে কাল্পনিক রূপক কাহিনী বলে মন্তব্য করেছেন।

সীমান্তবর্তীরাজ হিসেবে বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের জমিদারদের প্রভাব অত্যন্ত বেড়ে যায়। "The end of the Seventeenth century had left the Birbhum and Bishnupur Rajas at the summit of their fortune.

Their territories lay beyond the direct control of the central power and as frontier chiefs treated them as allies than as subject." (Bardhaman Gazetteers—1994)

ইতিমধ্যে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যু হয় ও তাঁর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলার নবাব হন। তাঁব আমলে কীর্তিচাঁদের প্রভাব আরও বেড়ে যায়। তিনি সুজাউদ্দিনের শাসনের প্রথম ভাগে ধেঞা পরগনার জমিদাবীর সনদ লাভ করেন। এর পর বিষ্ণুপুর অভিযান করার উদ্যোগ নেন। প্রথমেই পিতামহ-হন্তা শোভা সিংহের ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহকে স্বহস্তে হত্যা করেন। তারপর বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ করে এর অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করেন। এই রাজ্যে ফতেপুরমহল দীর্ঘদিন তাঁর অধিকারে ছিল। সীমান্তবর্তী জমিদারী হিসেবে বিষ্ণুপুর রাজার মহল অধিকার এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তিনি বিষ্ণুপুর জয় করে ফিরে এসে মহাসমারোহে বিজয়োৎসব পালন করেন ও কাঞ্চননগরের সীমান্তে বারোদুয়ারী নামে খ্যাত বিরাট তোরণ নির্মাণ করান। অনেকের মতে বর্ধমান রাজ পরিবারের পূর্ব আবাসস্থল কাঞ্চননগরের বারদুয়ারী ছিল বারোটি তোরণের সমষ্টি। কিন্তু আমি রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে জেনেছি বারদুয়ারী একটি তোরণ বাহিরদুয়ারী বা বারদুয়ারী—শহরের বাইরে তোরণ বলে নাম হয় বারদুয়ারী। দেশবিভাগের পর অনেক উদ্বাস্তু পরিবার এই অঞ্চলে এসে ঘরবাড়ী নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করছেন। গৃহ নির্মাণকালে ভিত্তি খননের সময় অন্য কোন তোরণের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। শিশিরকুমার সেন মহাশয়ও তাঁর 'বর্ধমান রাজপরিবার' পুস্তকে এই একটি তোরণের কথাই উল্লেখ করেছেন। এখনও এই একটি তোরণই বর্ধমান স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে কীর্তিচাঁদের বিষ্ণুপুর জয়ের সাক্ষ্যরূপে দণ্ডায়মান। বিষ্ণুপুরের পর কীর্তিচাঁদ একে একে বরোদা (ঘাটাল) ও চিতুয়া, মনোহরশাহী পরগনা ও মুর্শিদাবাদের ফতেসিং (কান্দি অঞ্চল) তাঁর জমিদারীভুক্ত করেন। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহের ফরমান বলে চন্দ্রকোণা জমিদারীর রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেন। বাদশাহ মহম্মদ শাহের মোহরাঙ্কিত 'সনদ' এর বাংলা অনুবাদ প্রদত্ত হল—

সাহেব কোরান দ্বিতীয়গাজী বাদশাহ আবুল ফতা
সমীরদ্দীন মহম্মদ
পিতা মহঃ বাদশাহ জাহানশাহা বাহাদুর
পিতা শাহ আলম বাদশাহ (ঔরঙ্গজেব)

পিতা জাহাঙ্গীর বাদশাহ
পিতা আকবর বাদশাহ
পিতা হুমায়ুন বাদশাহ
পিতা বাবরশাহ
পিতা সেখ উমর শাহা
পিতা সুলতান সাহিয়াদ সাহা
পিতা সুলতান মীরণ শাহা
পিতা সাহেব কোরান আমীর তৈমুরলঙ্গ

সন ১৭ জুলুষ, ১৫ রমজান তারিখের সত্মন্মল্ক্ সৌজাউদ্দৌলা সোজাউদ্দীন্ মহাম্মদ খাঁ বাহাদুর অসদ্জঙ্গের মোহর যুক্ত পত্রে প্রকাশ পাইল যে চাকলা বর্ধমান ওগায়রাহার জমিদার মৃত কিষেণরাম, সরকার নজরানা স্বরূপ এক লক্ষ তঙ্কা প্রদান করতঃ স্বনামে জমিদারীপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে তদীয় পুত্র জগৎরামও পিতার ন্যায় নজরানা প্রদান করতঃ জমিদারী প্রাপ্ত হয়। তৎপরে পরগনে চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ এবং বরদা ও চেতুয়ার জমিদার শোভা সিংহ সরকারের বিপক্ষাচরণ করতঃ রাজস্ব না দিয়া চাকলে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও-গায়রাহা অধিকার করিয়া মৃত কিষেনরামের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন ও অন্যূন পঞ্চবিংশতি জন পরিবারবর্গসহ তাহাকে হত্যা করে ও পরে উক্ত দুরাচারগণও হত হয়। কিয়ৎ দিবস পরে কীর্তিচাঁদ বাদশাহী সেনার সহায়তায় শোভা সিংহের হেমু নামক দুরাচার ভ্রাতার বিরুদ্ধে গমন করিলে দুরাত্মা অরণ্য মধ্যে পলায়ন করে। কীর্তিচাঁদের ঈদৃশ কার্য তৎপরতা ও আনুগত্য দৃষ্টে উক্ত জমিদারী সমূহ তাহাকেই প্রদান করায় প্রতি বৎসর বিনাপত্যে সরকার রাজস্ব প্রদান করিতেছে। এক্ষণে বাদশাহের আশ্রিতের নিকট হইতে নজরানা স্বরূপ ২৫০০০ তঙ্কা দুই বৎসরের মধ্যে গ্রহণ পূর্বক পরগণে চন্দ্রকোণা ও গায়রাহার ফরমান প্রদানে আজ্ঞা হইল।

উমদাতলমুলুক—বকশীউল মুলুক, সনসানদ্দৌলা—আমীর-ই মনসুর-জঙ্গ বাহাদুর অনুরোধ অনুসারে আদ্যন্ত বিজয়সম্বলিত এই শুভক্ষণে মহামান্য পরম বিশ্বাসপদ ফরমানে প্রচার হইল যে, দুরাচার শোভা ও হিম্মৎ সিংহ এবং চন্দ্রকোণার রাজা রঘুনাথ সিংহের মৃত্যু হওয়ায় পরগণে ফতেপুর ওগয়রাহার জমিদারী কৃষ্ণরাম পৌত্র জগৎরামের পুত্র কীর্তিচাঁদকে প্রদান করিলাম। ...১৫ রমজান ১৭ জুলুস। [ভগ্ন দেউলের ইতিবৃত্ত—কানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী (১ম)]।

অন্য ফরমান থেকে এই ফরমানটির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এতে যেমন মহম্মদ শাহের বংশতালিকা পাওয়া যায়, তেমনি কৃষ্ণরাম থেকে কীতিচাঁদ পর্যন্ত যুদ্ধজয়ের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকাও পাওয়া যায়। এরপর ধেঞা পরগনাও তাঁর অধিকারে আসে। ফলে কীর্তিচাঁদের জমিদারী এক বিশাল আকার ধারণ করে। তাঁর জমিদারীর আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ৫০০০ বর্গ মাইল। এর জন্য মোগল দরবারে তাঁর দেয় রাজস্ব ছিল ৪,৪১,১৬১ আকবরী টাকা (২০,৪৭,৫০৬ টাকা)।

কীর্তিচাঁদের জমিদারী শাসনের শেষ দিকে মানিক্যচন্দ্র বা মানিকচাঁদ নামে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি দেওয়ান নিযুক্ত হন। এই মানিকচাঁদ সম্পর্কে বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার তাঁর 'চিত্রচম্পূ' কাব্যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এঁর বাড়ী ছিল গুপ্তিপাড়ায়। মনে হয় ইনি কিংবা এঁর পূর্বপুরুষ পাঞ্জাব থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। বাণেশ্বর লিখেছেন মাণিক্যচন্দ্র অসাধারণ বীরযোদ্ধা, নীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিত, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, গদ্য-পদ্য রচনার রসজ্ঞ সমালোচক ও বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক। বর্ধমানের জমিদারী তাঁর নখদর্পণে এবং তাঁর সুদৃষ্টি পড়লে যে কোন লোকের ভাগ্য ফিরে যায়।

(Citracampu—Editor : Ram Charan Chakravery)

এই মানিকচাঁদ কীর্তিচাঁদ-পুত্র—চিত্রসেনের অধীনে দেওয়ান ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি আলিবর্দীর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। যখন সিরাজউদ্দৌল্লা কলকাতা অভিযান করে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করেন তিনি মানিকচাঁদকে এখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কীর্তিচাঁদের জমিদারী দখল ও বিশাল জমিদারীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে মানিকচাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। কীর্তিচাঁদের সময় থেকে বর্ধমানে পাঞ্জাবী-ক্ষেত্রী পরিবারের বসতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। কীর্তিচাঁদের স্ত্রী রাজরাজেশ্বরীর পিতা বুলচাঁদ ট্যান্ডন ও পিতামহ পীতাম্বর ট্যাণ্ডনও তাঁর সময়ে বর্ধমানে আসেন ও বসবাস করেন।

সুদীর্ঘ ৩৮ বৎসর কীর্তিচাঁদ প্রবল প্রতাপের সঙ্গে জমিদারী পরিচালনা ক'রে বৃদ্ধ বয়সে ১১৪৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান মাতা ব্রজকিশোরী, স্ত্রী রাজরাজেশ্বরী, পুত্র চিত্রসেন ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিত্রসেনের পুত্র ত্রিলোকচাঁদকে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র চিত্রসেন পিতার জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। একটি লোকগাথা থেকে জানা যায়—কীর্তিচাঁদ কাঞ্চননগর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মাতা ব্রজকিশোরীর স্মৃতিরক্ষার্থে রানীসায়রের পুষ্করিণী খনন করান (১৭৩৩ শকাব্দ)। বর্ধমানেশ্বরী দেবী সর্বমঙ্গলার নবরত্ন মন্দির তাঁর সময়েই নির্মিত হয় বলেই

অনেকের ধারণা— এ বিষয়ে রাঢ়ের লৌকিক দেবদেবী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা কবা যাবে। বৈকুণ্ঠপুরে গোপেশ্বর শিবমন্দির তাঁর সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্বেই বলা হয়েছে। বিষ্ণুপুর অধিকার করার পর এই বিরাট জয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে কাঞ্চননগরের উপকণ্ঠে কীর্তিচাঁদ বারদুয়ারী তোরণ নির্মাণ করান—সেটি সমকালীন স্থাপত্যের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কীর্তিচাঁদ কালনায় ভাণ্ডারহাটির জগন্নাথ বা লুটের জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করান। কীর্তিচাঁদের মাতা ব্রজকিশোরী কালনায় বারদুয়ারী ঘাট ও কালনায় পঁচিশ রত্নবিশিষ্ট লালজির মন্দির নির্মাণ করান। কীর্তিচাঁদ মাতার অনুরোধে ১৬৬১ শকাব্দে (১৭৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দ) এই মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। এই মন্দিরের অপূর্ব স্থাপত্য শৈলী ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য বাংলার মন্দির স্থাপত্যের এক অনুপম নিদর্শন। এই মন্দিরে ব্রজেশ্বরীদেবী লালজি নামে এক কৃষ্ণমূর্তি ও পাশে রাধা বিগ্রহ (রাধাকৃষ্ণ যুগায়) প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরলিপিতে উল্লেখ আছে—

যৎপুত্রাঃ পৃথিবী তলে সুবিদিতাঃ যৎকীর্ত্তিচন্দ্র কৃতী
সা শ্রীরাজকুমারিকার ব্রজকিশোরী কৃষ্ণভক্তায়র্থিনী।

ক্ষীরগ্রামের বিখ্যাত যোগাদ্যা মন্দির কীতিচাঁদের কীর্তি। (শকাব্দ ১৬৬১) ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে শাক্তপীঠ ক্ষীরগ্রাম তাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রাচীন মন্দিরের চত্বরে ত্রিরথাকৃতি গর্ভগৃহসহ গম্বুজাকৃতি মন্দির, অর্ধমণ্ডপ, নাট-মন্দির, পাকশালা কীর্তিচাঁদের কীর্তি। কাঞ্চননগরের পত্তন করে তিনি এখানে কুটির শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তাঁর সাহিত্যরাগ ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধমঙ্গলকাব্যের খ্যাতিমান কবি ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে কীর্তিচাঁদ অমর হয়ে আছেন। ১৬৩৩ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়া তিথি শুক্রবারে এই কাব্য সমাপ্ত হয়—

জগত রায় পুণ্যবন্ত পুণ্যের প্রভায়—
মহারাজ চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্র রায়।
আশীর্বাদ করি তায় বসিয়া বিরামে।
কইয়ড় পরগনা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে।

কীর্তিচাঁদ বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননকে বিস্তর নিষ্কর জমি ও ত্রিবেণীতে একটি পুষ্করিণী দান করেন। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার একটি শ্লোকে কীর্তিচাঁদের স্তুতিগান করেছেন—

তৎ কীর্তিচন্দ্র-মুদিতং গগণে নিশাম্য
রোহিন্যাপি স্বপতি সংশয়জাত শঙ্কা

অঘৈরা-শ্রীরামপুর নিবাসী কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কীর্তিচাঁদের গুণগান করেছেন—

মহারাজ চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্র কৃতকীর্তি
ইন্দ্রের সমান বর্ধমানে।
নিবাস তাঁহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাষে
ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চনে।

হান্টার সাহেবও কীর্তিচাঁদের দুঃসাহসিক অভিযান ও অসীম শৌর্য্যের (a man of great valour) প্রশংসা করেছেন—Kirti Chandra was a man of bold and adventurous spirit.

কীর্তিচাঁদ-জননী ব্রজকিশোরী দেবীর নির্দেশে অম্বিকা নিবাসী প্রাণবল্লভ ঘোষ গঙ্গা নিবন্ধ 'জাহ্নবীমঙ্গল' কাব্যরচনা করেন। প্রাণবল্লভ ছিলেন রাজপরিবারের আশ্রিত। কাব্যটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত। কাব্যটিতে প্রাণবল্লভ তাঁর পোষ্টার পৃষ্টপোষকতার উল্লেখ করে কীর্তিচাঁদ ও ব্রজকিশোরীর গুণগান করেছেন :-

যথায় ভূপতি বাবু রায়ের সন্ততি।
কীর্তিচন্দ্র মহারাজ জগতে খেয়াতি ॥
যাঁহার জননী যতি কৃষ্ণপরায়ণী।
বহু রাজ্য সুশাসিত কৈল ঠাকুরাণী।

পরিশেষে অজ্ঞাতনামা কবির লোকগাথায় রাজা কীর্তিচাঁদের কীর্তি ও মৃত্যু-ঘটনার উল্লেখ করে কীর্তিচাঁদের যে স্তুতি করেছেন তার উল্লেখ করে কীর্তিচাঁদ প্রসঙ্গ শেষ করি :-

রাজা রাজবলহো।
যাগেশ্বর দিয়ে দীঘি নাম রহিল ॥
বনকেটে বসালেন রাজা কাঞ্চন নগর।
হেদে যে ধার্মিক রাজা দয়ার সাগর।
বর্ধমানে বাড়ী তোমার, মহারাজ দীর্ঘনগরে হাট।
সাধ করে বাঁধালেন রাজা মা গঙ্গার ঘাট ॥
... ...
ধর্মশীল রাজা পাপে না দেন মন।
কত শত করান রাজা ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
আজানবাহু ছিল তোমার, জানে জগততেে।
অর্জুন রাজার সমান তুমি ছিলে ক্ষমতাতে।

জমিদারেরা ছিল দেশে, বড়ই অত্যাচারী,
তোমার নামে কাঁপ্‌ত তারা সদাই থরহরি ॥
... ...
ক্ষেত্রিকুলে জনম তোমার, তরবালের ধ্বনি।
চন্দ্রকোনা জয় করিতে, সাজিলেন আপনি।
... ...
আষাঢ়েতে রথযাত্রা-অঘ্রাণ মাসে রাস।
হাঁড়া-হাঁড়া ঘৃত জ্বলে, জ্বলে চন্দন কাট।
দাঁইহাটে থাকিল রাজার সাহান বাঁধা ঘাট ॥
পাক কান্দে পাকুরি কান্দে, কান্দে রাজতোতা
মা জননী এসে বলে বাছা গেলি কোথা ॥
শহরের লোক কান্দে সব করে হায় হায়।
হেঁট মুণ্ড করে কান্দে হরেকৃষ্ণ রায় ॥
... ...

মাইকেলকে অনুসরণ করে বলতে ইচ্ছে করে—

পুণ্যশ্লোক কীর্তিচন্দ্র নলের সমান।
হে রাজন্! অধীশদলে তুমি পুণ্যবান।

চিত্রসেন রায় (১৭৪০–৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) : কীর্তিচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র চিত্রসেন রায় উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার তখ্‌তে বসেন। তখন দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন প্রথম শাহ্ আলমের পৌত্র ও জাহানশাহের পুত্র রোশন্ আখতার যিনি মহম্মদশাহ নাম নিয়ে ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। আর বাংলায় আলিবর্দী খান মহাবৎজঙ্গ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দেব ১০ই এপ্রিল বাংলার অপদার্থ নবাব সরফরাজ খানকে গিরিয়ার অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করে বাংলার নবাবী দখল করেন—আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে “It is a clear illustration of the grossly vitiated atmosphere of the age and of the effects of treachery ungratefulness and ambition”. বাংলার রাজনৈতিক আকাশে যুগের এই বিশ্বাসঘাতকতা, অতকৃজ্ঞতার ও বিষপূরিত পরিবেশে চিত্রসেন রায় বর্ধমানের জমিদারী পদে অভিষিক্ত হন। ঐ বৎসরই তিনি দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহের ফরমান বলে রাজা উপাধিসহ কীর্তিচাঁদের সমস্ত মহলের জমিদারী প্রাপ্ত হন। বাদশাহী ফরমানের বঙ্গানুবাদ—

মোহর

'বাদশাহ গাজী আবুল ফতা নাসীরুদ্দিন মহম্মদ।'

ওমদতন মোলক বখসীয়ান মোমালোক আমীরল ওমরা সমশামদ্দৌল্লা খান দৌরান বাহাদুর মনসুর জঙ্গের প্রার্থনানুসারে, অনুগ্রহ ও কৃপা পূর্বক এই শুভ সময়ে মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ ফরমান প্রচার হইল যে, বঙ্গদেশে সুবার অধিকারস্থ চাকলা বর্ধমান ওগয়রহার জমিদার কীর্তিচাঁদ পবলোক গমন করায় তদীয় পুত্র চিত্রসেনের নিকট হইতে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা নজরানা গ্রহণ করতঃ রাজাধিরাজ উপাধিসহ উক্ত জমিদারী প্রদত্ত হইল। তাঁহার কর্তব্য যে ঈদৃশ অনুগ্রহের জন্য চিরবাধিত থাকিয়া স্বীকৃত নজরানার টাকা সরকারি ধনাগারে প্রদান করেন। সরকারি মালগুজারি বাদে নানকর ও রসুম স্বয়ং গ্রহণ করেন। সতত বাদশাহের অনুগত ও হিতাভিলাসী হইযা, প্রজাবৃদ্ধি ও দস্যুদিগের দমনার্থে যত্নবান হয়েন। উক্ত পরগনার মধ্যে কোন দূরবৃত্ত কর্তৃক দৌরাত্ম না হয়। প্রজাগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করতঃ যাহাতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয় তৎপক্ষে যত্নবান হয়েন। সরকারি খালেসা মহলের তহশীলও জায়গীরদারগণেব নিকট হইতে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সরকারি গোমস্তাগণকে সাহায্য করেন। সুবায় ও তাঁহার নায়েবদিগের অনুগত থাকিয়া, উল্লিখিত আদেশ সকল প্রতিপালন করিলে স্বীয় ধন ও মানের মঙ্গল জ্ঞান করিবেন। ২০ রমজান ২১ জুলুস (ইং ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ) (রাজবংশানুচরিত)।

এছাড়া নবাব আলিবর্দীর ফরমান বলে আরসা পরগনার জমিদারীও লাভ করেন।

চিত্রসেনকে প্রদত্ত ফরমানের বৈশিষ্ট্য হল এই ফরমান অনুসারে তিনি কীর্তিচাঁদের অধিকারভুক্ত সমগ্র জমিদারী তো পেলেনই উপরি পাওনা হল 'রাজা' উপাধি—কীর্তিচাঁদ যদিও প্রজাবর্গের কাছে রাজা বলেই পরিচিত ছিলেন কিন্তু সরকারী ভাবে 'রাজা' বলে স্বীকৃতি পান নাই। সরকারীভাবে চিত্রসেন ক্ষেত্রীবংশে প্রথম 'রাজা'—তাছাড়া তিনি তাঁর জমিদারীতে 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' করার শাসনাধিকার লাভ করেন।

চিত্রসেন পিতার জীবিতকালেই পিতার জমিদারীর কাজ পরিচালনা করতেন এবং বাহুবলে গোপভূম পরগনা জয় করে এখানে সেনপাহাড়ি দুর্গ নির্মাণ করেন। সম্রাট মহম্মদ শাহ গাজীর মোহরাঙ্কিত ও নবাব সরফরাজ খাঁর স্বাক্ষরিত হিজরী ১১৪৫ অব্দের ১লা সওয়াল ১৩ জুলুষের (১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ) ফরমানে সেলিমাবাদের মান্দারণ পরগনার জমিদারী পান। এর পূর্বে পিতার জীবিত কালেই ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে সেলিমাবাদের ইন্দ্রায়ণ পরগনার রাজস্ব আদায়ের

অধিকার লাভ করেছিলেন এবং জমিদারীর জন্য চিত্রসেনকে নবাবের কোষাগারে ২২,৭০,৪৭২ রাজস্ব নিয়মিত জমা দিতে হত। এর মধ্যে জায়গীর তরফির বাবদ ছিল ১৯১৬৬ টাকা। তাঁর জমিদারী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার কাজে তাঁর পিতার আমলের দেওয়ান মানিক্যচাঁদ বা মানিকচাঁদ বিশেষ সাহায্য করতেন। বীরভূম, বিষ্ণুপর ও পঞ্চকোট-এর জমিদারদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি রাজগড়ে দুর্গ নির্মাণ করান। চিত্রসেনের আমলে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ধমানের ব্যাপক অঞ্চলে বর্গী-হাঙ্গামা ও দামোদর থেকে ভাগীরথীর মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলে বর্গীদের জাতিধর্মনির্বিশেষে নারী পুরুষ শিশুর উপর নৃশংস বর্গী হাঙ্গামা : অত্যাচার ও লুণ্ঠন। এই বর্গী হাঙ্গামার বিশদ বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এই বর্গী হাঙ্গামাকে প্রতিরোধ করার জন্য তিনি বর্ধমান থেকে মাইল পাঁচেক উত্তরে তালিতে মাটির গড় নির্মাণ করান, সিউড়ি রোডের ধাবে বর্তমানে তালিত স্টেশনের কাছে এর ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দীর বর্গী হাঙ্গামা নবাবীর সময়ে মারাঠা নায়ক ভাস্কররামের অধীনে ২০ হাজার মারাঠা অশ্বারোহী বর্গী-সৈন্য বর্ধমান আক্রমণ করে। নবাব আলিবর্দী কৃষ্ণসায়রের তীরে শিবির স্থাপন করে এই বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ চেষ্টা চালান। অবশেষে কোন রকমে তিনি এখান থেকে মারাঠা সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে মুর্শিদাবাদ-এ পলায়ন করেন। হাঙ্গামা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে চিত্রসেন সপরিবারে ভাগীরথীর পূর্বতীরে ধাত্রীগ্রামের অনতিদূরে মূলাজোড়ের কাছে কাউগাছিতে পলায়ন করেন। চিত্রসেনের সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের 'চিত্রচম্পূ' খণ্ডকাব্যে বর্গীদের নৃশংস অত্যাচারের বিশদ বিবরণ আছে। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বাণেশ্বরের এই বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খুব সম্ভবত চিত্রসেন যখন কাউগাছিতে সপরিবারে আত্মরক্ষার জন্য বাস করছিলেন সেই সময়ে গুপ্তিপাড়ার (গুপ্তপল্লী) প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত, শাস্ত্রবেত্তা ও কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে চিত্রসেনের পরিচয় হয় আর পরিচয় করিয়ে দেন চিত্রসেনের দেওয়ান মানিকচাঁদ। কারণ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও মানিকচাঁদ উভয়েরই গুপ্তিপাড়ায় বাড়ী ছিল। বাণেশ্বরকে পরে চিত্রসেন নিজের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন—অবশ্য তার আগেই বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও কবিখ্যাতি বহুব্যাপ্ত। রাস পূর্ণিমার দিন চিত্রসেন পরলোকগমন করেন। চিত্রসেন ছিলেন নিঃসন্তান—মৃত্যুকালে তিনি ছঙ্গ-কুমারী ও ইন্দ্রকুমারী নাম্নী দুই স্ত্রী রেখে যান। তিনি তাঁর খুল্লতাত মিত্রসেনের পুত্র ত্রিলোকচাঁদ রায়কে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

চিত্রসেন মাত্র চার বছর জমিদারী পবিচালনা করার সুযোগ পান। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে বর্ধমানের ব্যাপক অঞ্চলে বর্গী হাঙ্গামার ফলে তিনি জমিদারী সুষ্টুভাবে পরিচালনার পূর্ণ সুযোগ পান নাই। তাছাড়া তাঁর দেওয়ান অসাধারণ বীর, নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মানিকচাঁদ বর্গী হাঙ্গামা থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে আলিবর্দীর আশ্রয়ে চলে যান ও নবাবের সেনাপতিপদে নিযুক্ত হন মানিকচাঁদের চলে যাওয়াটা চিত্রসেনেব কাছে এক বিরাট ক্ষতির সামিল।

পিতার ন্যায় তাঁব জমিদারীও একটি রাজ্যের আকার নিয়েছিল। বর্ধমানকে বর্গীহাঙ্গামা ও প্রতিবেশী জমিদারদের আক্রমণ থেকে বক্ষা করার জন্য চিত্রসেন পাহাড়ী রাজগড় ও তালিতে দুর্গনির্মাণ করেছিলেন। বর্গীহাঙ্গামার ব্যাপকতা এত বিশাল ছিল যে তাঁব পক্ষে এমনকি নবাবের পক্ষেও তাঁদের অত্যাচার-লুণ্ঠন থেকে বর্ধমানকে রক্ষা করা সম্পূর্ণ সম্ভব হয় নাই কিন্তু প্রজাব কল্যাণেব জন্য তাঁদের রক্ষা করার জন্য তাঁর আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টাব কোন ত্রুটি ছিল না। চিত্রসেন সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। চিত্রসেনের সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তাঁর পোষকতায় ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 'চিত্রচম্পূ' নামে সংস্কৃত খণ্ডকাব্য রচনা করেন। চিত্রচম্পূর 'চিত্র'—এই চিত্রসেন। কাব্যটি চিত্রসেনের চবিতকাব্য।

কাব্যের সূচনায় রাজসভাপণ্ডিত বাণেশ্বর তাঁর পোষ্টা চিত্রসেনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। চিত্রসেনকে তিনি আদর্শ নরপতি রূপে চিত্রিত করেছেন। কাব্যটিতে চিত্রসেনের শয্যাত্যাগ থেকে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত যে দিনলিপি দিয়েছেন তার থেকে মানুষ হিসেবে চিত্রসেনের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'চিত্রসেন শয্যাত্যাগ করেন অতি প্রত্যুষে। তারপর পবিত্র সলিলে স্নান করে তিনি আহ্নিকাদি সারেন। এরপর শুচিশুদ্ধ দেহমনে শুভ্র মন্দিরে প্রবেশ করে কুলদেবতাকে নানা উপচার পত্রপুষ্পাদিসহ পূজা নিবেদন করেন ও স্তোত্র পাঠ করেন। মন্দির থেকে ফিরে আসেন রাজপ্রাসাদে, যেখানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ বেদ-মন্ত্রসহ অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে যাগযজ্ঞে নিয়োজিত। সেখানে দেবাদিদেবকে পূজা নিবেদন করে রাজাবাহাদুর গুরুদেবের চরণস্পর্শ করেন। এরপর গঙ্গা নামক প্রিয় গাভীকে ফলমূল খাওয়ান। শেষে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে নিজে পারিষদবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা করেন। রাত্রি দশটায় রাজসভা ভঙ্গ হয়। তারপর একজন সেবকসহ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করেন।'

এমন কি বর্গীহাঙ্গামার সময় যখন তিনি কাউগাছিতে অবস্থান করছিলেন তখনও তাঁর দেবসেবা, দরিদ্রভোজন, পণ্ডিতবর্গ ও রাজসভাসদগণের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত ছিল।

সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বর্ণিত রাজা চিত্রসেনের এই দৈনন্দিন কার্যাবলীর বিবরণের আংশিক যদি সত্য হয়, তাহলেও চিত্রসেনকে 'গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক', সত্ত্বগুণসম্পন্ন দরিদ্রবান্ধব, দেবভক্ত এক আদর্শ রাজা বলে চিহ্নিত করতে পারি।

'চিত্রচম্পূ' কাব্যে বাণেশ্বর বর্ধমানে বর্গী অত্যাচারের যে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন আচার্য যদুনাথ সরকার তাকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলে তাঁর History of Bengal II-এ এই বিবরণের আংশিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয় কাব্যটিকে Historical and Quasi Geographical Kavya বলে বর্ণনা করেছেন।

চিত্রসেনের পৃষ্ঠপোষকতায় বাণেশ্বর 'চন্দ্রাভিষেক' ও 'জগন্নাথমঙ্গল' নামে দুটি নাটকও রচনা করেছিলেন।

চিত্রসেন শিল্প-স্থাপত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কালনার বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বরী দেবীর জোড়া বাংলার অনুরূপ মন্দির নির্মাণ করান। মন্দিরের শিলালিপিতে আছে—

শুভমস্তু শকাব্দ ১৬৬১/২/২৬/৬
শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী দেবী
মহারাজা চিত্রসেন রায়সা
মিস্ত্রি শ্রীরামচন্দ্র :

কাঞ্চননগরে অনুরূপ একটি জোড়াবাংলা মন্দির জীর্ণ অবস্থায় আছে। বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—'আকারে গড়নে এর পোড়া মাটির কারুকার্য দেখে মনে হয় একই সময়ে হয়ত একই মিস্ত্রীর হাতে তৈরি। তাই যদি হয় তা হলে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয় না যে রাজা চিত্রসেনের নির্দেশে কাঞ্চননগরের এই দেবীমন্দিরও নির্মিত হয়েছিল। আমার মনে হয় এই মন্দিরেই হয়ত বর্ধমানেশ্বরী সর্বমঙ্গলা প্রথমে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। চিত্রসেন মহিষী ছত্রকুমারী অম্বিকায় জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চিত্রসেন ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাসপূর্ণিমার পূর্বদিন পরলোকগমন করেন। তার পূর্বেই (১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ) নবাব আলিবর্দীর জঘন্য চক্রান্তে মানকরের শিবিরে মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁর কুড়ি জন মারাঠা সৈন্য নৃশংস ভাবে নিহত হন। এরপর প্রায় পনের মাস বাংলায় তথা বর্ধমানে কিছুটা নিরুপদ্রব শান্তি বিরাজ করেছিল—কিন্তু সে ছিল শ্মশানের শান্তি। বর্গী আক্রমণে

জেলার গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত, মানুষ ও পশুর খাদ্যবস্তু লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ, আউসগ্রাম, মঙ্গলকোট, ভাতার, বর্ধমান থানার বিরাট অঞ্চলে সড়কের পার্শ্ববর্তী গ্রাম প্রায় জনশূন্য, সম্পদশালী দেশত্যাগী—বর্ধমানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিধ্বস্ত। এই বিধ্বস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেও চিত্রসেন যথাসাধ্য প্রজাদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এর কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হওয়ায় বর্ধমানের বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক কাঠামোকে আর পুনর্গঠিত করার সময় পান নাই। এই অবস্থায় তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী তাঁর জমিদারীর তখ্‌তে বসেন।

ত্রিলোকচাঁদ রায় (১৭৪৪–৭০ খ্রীষ্টাব্দে, উচ্চারণভেদে ত্রিলোকচন্দ > তিলোকচাঁদ) : ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসন্তান চিত্রসেনের মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী পিতৃব্য পুত্র ত্রিলোকচাঁদ বর্ধমানের রাজতক্তে আসীন হলেন। বয়স তখন তাঁর মাত্র ১১ বৎসর। জন্ম তাঁর ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর। দিল্লীর সম্রাট তখনও মহম্মদ শাহ্‌। কিন্তু বাংলার অবস্থা তখন শোচনীয়; বর্গী হাঙ্গামায় জেলার অনেক অংশই বিপর্যস্ত, গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য, প্রায় শ্মশানে পরিণত। বাংলার নবাবের রাজকোষ শূন্যপ্রায়—জমিদারদের কাছেও রাজস্ব বৃদ্ধির চাপ আসতে থাকে। বর্ধমানের রাজকোষও শূন্যপ্রায়; বর্গী হাঙ্গামায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। তাছাড়া মারাঠা আক্রমণের আশঙ্কা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। যে কোন সময় প্রবলতর শক্তি নিয়ে মারাঠা আক্রমণের আশঙ্কা রয়েই গেছে। মানকর শিবিরে মারাঠা পণ্ডিত ভাস্কররাম ও মারাঠা সেনাপতিদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে তারা বদ্ধপরিকর। অপরদিকে ইংরেজ শক্তির অভ্যুত্থান ও কলকাতায় তাদের শক্তিবৃদ্ধি বাংলার রাজনৈতিক আকাশকে দুর্যোগপূর্ণ করে তুলেছে। এই রকম নানা উপদ্রবে বাংলার জমিদার তথা প্রজাপুঞ্জ ব্যতিব্যস্ত, বিপর্যস্ত।

এই অবস্থায় মারাঠারা আবার ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিহার ও বাংলা আক্রমণ করে। বাংলার নবাব আলিবর্দী এই আশঙ্কাই করছিলেন; মারাঠা সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়ে রঘুজী ভোঁসলে ও মীরহাবিব কাটোয়া পর্যন্ত এসে পরস্পর সম্মুখীন হন। যুদ্ধে রঘুজী পরাজিত হন ও নাগপুরে পলায়ন করেন। কিন্তু মীরহাবিব কিছু মারাঠা সৈন্য নিয়ে কাটোয়ায় রয়ে যান। এই মীরহাবিব দেওয়ান মুর্শিদকুলি কর্তৃক জাহাঙ্গীর নগরের নায়েব-নাজিম সুজাউদ্দিনের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান-এর ডেপুটি (নায়েব) নিযুক্ত হয়েছিলেন। শাসন পরিচালনায় মীরহাবিবের দক্ষতা ছিল। তাঁর দক্ষ শাসন পরিচালনায় ঢাকার উন্নতিও হয়। কিন্তু তিনি

ডেপুটি পদে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল বাংলার নবাবী। তাই প্রথম বর্গী হাঙ্গামার সময় তিনি আলিবর্দীর বিরুদ্ধে মারাঠাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলার মসনদ দখল কবতে উদ্যোগী হন। তাই রঘুজী ভোঁসলে নাগপুরে চলে যাওয়ার পবও মীরহাবিব কিছু মারাঠা সৈন্য নিয়ে থেকে গেলেন। কাজেই ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে আলিবর্দী মীরহাবিবের বিরুদ্ধে অভিযান করেন ও তাঁকে পরাজিত করেন। মীরহাবিব বর্ধমান ত্যাগ করে মেদিনীপুরের দিকে পলায়ন করেন। ডিসেম্বরে আলিবর্দীর সেনাপতি মীরজাফর আলিবর্দীর নির্দেশে মেদিনীপুর শহরের নিকট মীরহাবিবের সেনাপতি সৈয়দ নূরকে আক্রমণ করেন ও যুদ্ধে নূর পরাজিত হয়ে উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করেন।

ইতিমধ্যে মীরজাফর খবর পেলেন যে রঘুজী ভোঁসলের পুত্র জানোজী বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। মীরহাবিব বর্ধমানে এসে জানোজীর সঙ্গে মিলিত হলেন। মীরজাফরও এই সুযোগে মীরহাবিবের মত বাংলার নবাব হবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। জানোজী ভোঁসলের আক্রমণে তিনি আর কাল বিলম্ব না করে রাজমহলের দিকে অগ্রসর হলেন ও রাজমহলের ফৌজদারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আলীবর্দীকে হত্যা করে বাংলার মসনদ দখল করার ষড়যন্ত্র করেন। আলীবর্দী এই সংবাদ পেয়েই দুজনকেই পদচ্যুত করেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর চারদিকে ষড়যন্ত্র। এই অবস্থায় মারাঠাদের আক্রমণ থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। তখন তিনি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বছরে ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দেবাব অপমানজনক শর্তে মারাঠীদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষব করেন। জেলার এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ত্রিলোকচাঁদ মোগল বাদশার কাছ থেকে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ফরমান বলে চিত্রসেনের জমিদারীর উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করলেও শান্তিতে জমিদারী চালাতে পারেন নাই। জমিদারী পাবার পর থেকে আমৃত্যু তাঁকে কঠোর সংগ্রাম করে জমিদারী চালাতে হয়। ইংরেজ কোম্পানীও সুযোগ বুঝে তাঁকে পুনঃপুনঃ নিগৃহীত করতে ছাড়ে নাই। প্রজাদের কাছ থেকেও যথাসময়ে খাজনা না পেয়ে তাঁকে চরম অর্থসঙ্কটে পড়তে হয়।

এ হেন পরিস্থিতিতে ত্রিলোকচাঁদ অত্যন্ত সাহস ও কৃতিত্বের সঙ্গে সমস্ত সংকটের মোকাবিলা করে নানা পুণ্যকর্ম করে জেলা তথা বাংলাদেশে অতুল কীর্তি স্থাপন করেছিলেন।

হিজরী ১১৬৭ (১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে) দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের ফরমান বলে রাজা উপাধি পান। পর বৎসরই 'রাজা বাহাদুর' ও চার হাজার অশ্বারোহী ও দু হাজার পদাতিক রাখার অনুমতি লাভ করেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পরবর্তী

মোগল সম্রাট আহম্মদ শাহ্ (১৭৪৮–৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) এর ফরমান বলে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ব্যবহারের অনুমতি লাভ করেন। এছাড়া সাহামত খাঁ নওয়াজেস খাঁ বাহাদুরের কাছ থেকে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং বাদশার উজিরের কাছ থেকে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পরপর ফরমান ও পরওয়ানা লাভ করেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশা আজিজউদ্দিন (দ্বিতীয় আলমগীর)-এর আজ্ঞানুসারে বাঙ্গলা সুবার খেদা থেকে মহারাজাধিরাজ ত্রিলোকচাঁদকে একটি হাতী পাঠাবার পরোয়ানা দেওয়া হয়। এর ফলে মোগল দরবার ও বাংলার নবাবী দরবারে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি দারুণ বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু এই সময় ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর সংঘাত বাধে। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজের রামরঞ্জন কবিরাজ নামে এক পদস্থ কর্মচারী উড্ নামক এক ইংরেজের কাছ থেকে ৬৩৫৭ টাকা কর্জ করেছিলেন—কিন্তু সময় মত সে ঋণ শোধ করতে না পারায় উড্ কলকাতার মেয়র কোর্টে টাকা অনাদায়ের মামলা করেন। মেয়র কোর্টের পরওয়ানা বলে ত্রিলোকচাঁদের কলকাতার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই কাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য ত্রিলোকচাঁদ কোম্পানীর ক্ষীরপাই ফ্যাক্টরী ও জেলার কোম্পানীর বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করে দেন।

এর বিরুদ্ধে কোম্পানী নবাবের কাছে কুঠি চালু করার জন্য ও মহারাজের জমিদারীর মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের সুবিধে নেবার জন্য আবেদন করলে আলিবর্দী একটি পরওয়ানা পাঠিয়ে মহারাজকে কোম্পানীর সমস্ত কুঠি ছেড়ে দিতে বলেন। মহারাজ নবাবের পরওয়ানার মর্যাদা দিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কুঠি ছেড়ে দেন। কিন্তু কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হতে থাকে। এসময়ের বাংলার রাজনৈতিক চিত্রটা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

এই সময়ে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দীর মৃত্যু হয় ও বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা সঙ্কট দেখা দেয়। যার ফলে আলিবর্দীর মৃত্যুর ১০ বৎসরের মধ্যে ইংরেজ কোম্পানী পূর্বভারতে এক ক্ষমতাশালী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আলিবর্দীর পুত্রসন্তান ছিল না—তিন কন্যা; তিন কন্যাই বিধবা। জ্যেষ্ঠা ঢাকার নবাবের বিধবা পত্নী ঘসেটি বেগম, তাঁর একটি পালিত পুত্রও ছিল; মধ্যমা কন্যার পুত্র পূর্ণিয়ার সওকতজঙ্গ, মুর্শিদাবাদের কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌল্লা। আলিবর্দী তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর আদরের দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লাকে তাঁর নবাবীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ফলে আলিবর্দীর মৃত্যুর পরই নবাবীর দাবী নিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের

সূত্রপাত। জ্যেষ্ঠা কন্যা হিসাবে ঘসেটি আশা করেছিলেন তাঁর নাবালক পালিত পুত্রই নবাবীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী, এদিকে পূর্ণিয়ার সওকতজঙ্গ আশা করেছিলেন মধ্যমার গর্ভজাত সাবালক পুত্র হিসেবে তিনিই নবাবীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কাজেই আলিবর্দী সিরাজকে নবাব মনোনীত করলে মৌচাকে ঢিল পড়ে। এই ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সিরাজ ঘসেটিকে কারারুদ্ধ করেন ও ঢাকায় তাঁর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করান। আলিবর্দীর জীবিতকালে সিরাজ ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভকে দরবারে ডেকে পাঠিয়ে তহবিল তছরূপের দায়ে তাঁর মাতামহের সম্মুখে যারপরনাই অপদস্থ করেন, এমনি কি তরবারি নিষ্কোষিত করে হত্যা করতেও যান। আলিবর্দীর হস্তক্ষেপে সেদিন তিনি প্রাণে বেঁচে যান। কাজেই আলিবর্দীর মৃত্যুর পর ঘসেটি, সওকত ও রাজবল্লভ এক জোট হয়ে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সিরাজ যখন ঢাকায় নবাবের কোষাগার লুণ্ঠন করার আদেশ দেন তখন রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণরাম কিছু ধনরত্ন নিয়ে কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানীর কাছে আশ্রয় নেন। সিরাজ কোম্পানীর কাছে কৃষ্ণরামকে তাঁর হাতে সমর্পণ করতে আদেশ দিলে কোম্পানী সে পরওয়ানা অগ্রাহ্য করে। তাছাড়া সিরাজের আদেশ অমান্য করে কোম্পানী কলকাতায় পরিখা খনন, দুর্গ নির্মাণ, অস্ত্র সংগ্রহ করতে থাকে। তখন সিরাজ বিরাট বাহিনী নিয়ে কলকাতা আক্রমণ করেন। ইংরাজেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ফলতায় আশ্রয় নেয়। সিরাজ সেনাপতি মানিকচাঁদকে কিল্লাদার নিযুক্ত করে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। H.E.A Cotton এর Calcutta old and new পুস্তক থেকে জানা যায় যে বর্তমানে যেখানে G.P.O. রয়েছে সেখানেই আগেকার Fort William দুর্গ ছিল। এই পোষ্ট অফিসের নীচে অষ্টাদশ শতকের একটা সুড়ঙ্গপথ ও সিঁড়ি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে (Statesman 24.8.1998)। এই সুড়ঙ্গপথ গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল। William Hedges যিনি ১৬৮২ থেকে ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় কোম্পানীর কার্যাবলী পরিচালনা করতেন, তিনিই সম্ভবত নবাবের দ্বারা আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্য কোম্পানীর সৈন্য ও কর্মচারীদের এই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে পালাবার পরিকল্পনা করে এই সুড়ঙ্গপথের পরিকল্পনা করেন। আমার ধারণা সিরাজ তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে কলকাতা আক্রমণ করলে ইংরেজরা এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে পালিয়ে ফলতায় আশ্রয় নেয়।

সিরাজের কলকাতা দখলের দুঃসংবাদ পেয়ে কোম্পানীর তরফ থেকে ক্লাইভকে তড়িঘড়ি দাক্ষিণাত্য থেকে কলকাতায় পাঠান হয়। কলকাতা আক্রমণ শুরু হয়। ইংরেজ নাবিক স্ট্রাহন সম্পূর্ণ মত্ত অবস্থায় একাই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ

আক্রমণ করেন। এ্যাডমিরাল ওয়াটসন কলকাতায় ঢুকে পড়ে ফোর্ট উইলিয়ামের সামনে উপস্থিত হন। ক্লাইভ মাত্র ৭১১ জন পদাতিক ও ১০০ গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে মারাঠা খাল থেকে আমিরচাঁদ বাগানে নবাবের শিবির ও চিত্পুরে নবাবের প্রায় ১ লক্ষ সৈন্যবাহিনীর ওপর ভোরবেলায় অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে নবাব বাহিনীকে ছত্রিচ্ছন্ন করে দেন। নবাব পালিয়ে বাঁচেন ও পরে অপমানজনক শর্তে কোম্পানীর সঙ্গে আলিনগরের সন্ধি করতে বাধ্য হন। এরপর ক্লাইভের নেতৃত্বে মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ ও ঘসেটি বেগম সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরজাফরকে নবাব করার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই ষড়যন্ত্রের জাল বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ষড়যন্ত্রের শর্ত অনুসারে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধের একটা প্রহসন করার জন্য ক্লাইভ আয়ারকুটকে পাঠিয়ে কাটোয়া দখল করেন—নিজে এখানকার শাঁকাই দুর্গের ষড়যন্ত্রের খলনায়ক মীরজাফরের কিল্লাদারের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করে বিনা বাধায় কিল্লা দখল করেন। এরপর আয়ারকুট ও ক্লাইভের যৌথ বাহিনী পলাশীর দিকে অগ্রসর হন। ক্লাইভ বর্ধমান রাজ ত্রিলোকচাঁদের কাছে ১০০০ সৈন্য চেয়ে পাঠান। ত্রিলোকচাঁদ এই আবেদনে সাড়া দেন নাই। পলাশীর যুদ্ধের প্রহসনে সিরাজ পরাজিত ও পরে নিহত হন। মীরজাফর বাংলার নবাবীপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু কোষাগার শূন্য। কাজেই ষড়যন্ত্রের শর্ত মত মীরজাফর পলাশীর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কোম্পানীকে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল চাকলা বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব মর্টগেজ স্বরূপ দেন। প্রথম দিকে কোম্পানী হঠাৎ বর্ধমান রাজের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে চায় নাই। তাই বর্ধমান চাকলার রাজস্ব মুর্শিদাবাদের রায়বায়ান মারফৎ আদায়ের ব্যবস্থা মেনে নেয়। কিন্তু এই সুসম্পর্ক বেশী দিন টেকে নাই।

মীরজাফর কোম্পানীর দাবীমত কোম্পানীকে বাৎসরিক ২২৭ লক্ষ টাকা দেবার অঙ্গীকার করলেও এই টাকা দেবার মত অর্থ তাঁর কোষাগারে ছিল না। ফলে চুক্তি ভঙ্গের দায়ে ও ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। অবশ্য এর আগে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ও মীরকাশিমের মধ্যে এক গোপন চুক্তি হয়। মীরকাশিম সমস্ত টাকা শোধ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই গোপন চুক্তিমত মীরকাশিমকে নবাব করা হয়। কিন্তু মীরকাশিম ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া—তিনি “English Nawab” হতে চান নাই। প্রথমেই তিনি কোম্পানীর ঋণমুক্ত হবার জন্য ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায় করার সনদ দান করেন। পরে মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করার পরিকল্পনা করেন।

এদিকে বর্ধমানে মহারাধিরাজ ত্রিলোকচাঁদেরও কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ততব হতে থাকে। কোম্পানীর বর্ধমান বিভাগের সেকালের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ওয়াটস্ সাহেব ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে হলওয়েলকে যে রিপোর্ট পাঠান তার থেকে কোম্পানী ও মহারাজের এই তিক্ত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই রিপোর্টের সারমর্ম নিম্নরূপ :

> মহারাজের সৈন্য আমাদের ইজারদারদের অবরুদ্ধ করেছে—আমাদের কাছারী লুঠ করেছে। কিন্তু এতেও তত ভীত নই। কিন্তু আমাদেব প্রাপ্য টাকা আদায়ের ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করায় আমরা বিব্রত।
>
> আমাদের গোকুল জমাদারকে পালকি থেকে নামিয়ে ফাটকে দেবাব ভয় দেখিয়েছে। তাদের শুকলাল জমাদার আমাদের একজন সিপাহীকে বধ করায় আমি একজন সুবেদারের অধীনে ৩০ জন সিপাই পাঠিয়ে তাঁকে ধরে আনার জন্য পাঠিয়েছিলাম। তারা ৭০০/৮০০ লোক নিয়ে আমাদের সিপাইকে আক্রমণ করে। এই সংবাদ পেয়ে আমি তাদেরকে মহারাজের কাছারীতে আশ্রয় নিতে বলে লেফ্‌টেন্যান্ট ব্রাউনকে দুশো সিপাই দিয়ে তাদের আক্রমণ করতে আদেশ দিই। এই যুদ্ধে আমাদের ৫০ জন সিপাই ও সার্জেন্ট নিহত হয়েছে এবং মিঃ ব্রাউন ও কিছু সিপাই আহত হয়েছে। পরে সিপাই-এর কাছে শুনলুম যুদ্ধক্ষেত্রে ৫ হাজার সৈন্য উপস্থিত হয়েছিল। এখন আর কোন গোলমাল নাই।

ত্রিলোকচাঁদের এই বিরোধিতার বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে কোম্পানী মীরকাশিমের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগ পেয়ে মীরকাশিম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বর্ধমান পরগনার রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়ে এক পরওয়ানা জারি করেন ও পরওয়ানার প্রতিলিপি কোম্পানীকে পাঠান—পরোয়ানার প্রতিলিপি নিম্নরূপ ছিল :

(নবাব নাসের-উল-মোলক ইনতাজউদ্দৌল্লা নসরৎ জঙ্গ মীরমহাম্মদ কাসিম খাঁ বাহাদুর)

মোহরাঙ্কিত : "বর্ধমান পরগনার কানুন-গো তালুকদার রাইয়ত ও গ্রামস্থ মণ্ডলগণ অবগত হইবে। সুবা বাঙ্গালার অধীন মহারাজাধিরাজ তিলোকচন্দের অধিকারস্থ জমিদারীর দুষ্ট লোকেরা প্রজাগণের উপর অযথা অত্যাচার ও লুণ্ঠনাদি

করায় উক্ত পরগনা ইংরাজ কোম্পানীকে প্রদত্ত হইল। উহার উপস্বত্ত্বের কিয়দংশ হইতে ইংরাজ কোম্পানীর খরচ নির্বাহ ও রাজ্যরক্ষার্থ পাঁচশত ইংরাজ অশ্বারোহী, দু-সহস্র ইংরাজ পদাতিক ও আট সহস্র সিপাহী সৈন্য নিযুক্ত করিয়া তাহাদের মাসিক বেতন প্রদত্ত হইল। ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারীকে যথাসময়ে খাজনা ও তাহাদের আবশ্যকীয় সমুদায় কার্যের সহায়তা করিবে। ইংরাজ কোম্পানীও জমিদার ও প্রজাদিগের পূর্বাপর সমুদয়স্বত্ব বজায় রাখিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করতঃ উপরোক্ত খরচ নির্বাহ করিবেন। অর্থাৎ সৈন্যদের মাসিক বেতন প্রদান করতঃ রাজ্যের সুব্যবস্থা করিবেন।

১১৭৬ সাল ১লা কার্তিক ইংরাজী ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ ১৬ই নভেম্বর।"

এই পরওয়ানার প্রতিলিপিসহ কোম্পানী মহারাজকে পরগনার রাজস্ব পাঠাবার জন্য লেখেন। সে পত্রের উত্তরে মহারাজ লেখেন—

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর মহারাজ কোম্পানীকে নিম্নমত উত্তর দেন · "মহামান্য বঙ্গেশ্বরের নিকট হইতে আপনি যে পরওয়ানা পাইয়া সম্মানিত হইয়াছেন তাহা অবগত হইয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বর্ধমানের শোচনীয় অবস্থার বিষয় আপনি সম্যকরূপে অবগত নহেন। বাদশাহী সৈন্যগণ কর্তৃক এই প্রদেশ যেরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছে তাহা রায়রায়াঁ স্বয়ং দেখিয়া আমাকে অনেক পরিমাণে খাজনা মাফ করিয়া রাজ্যের উৎপন্নের কাগজ ও জনৈক মোহরারকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। আপনি মুরাদবাগে অবস্থান করিবার কালে আমার উকিল দুর্জয় রায়ের দ্বারা রাজ্যের উৎপন্নের দুখানি কাগজ প্রস্তুত করাইয়া আপনার নিকট পাঠাইয়া ছিলাম। রায়রায়াঁ যে কাগজ লইয়া গিয়াছেন তাহাও ফেরৎ পাঠাইতে লিখিলাম। তাহা ফেরৎ আসিলে একজন বিশ্বাসী মুৎসুদ্দী মারফৎ আপনার নিকট পাঠাইব। তাহা দেখিয়া যেরূপ বন্দোবস্ত করিবেন সেইরূপ হইবে। গত কার্তিক মাস পর্যন্ত যে খাজনা আদায় হইয়াছে তাহা রায়রায়াঁ লইয়া গিয়াছেন। তৎসমুদায়ও মূল কাগজের হিসাবে উদ্ধৃত করা হইবে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ ২২শে নভেম্বর।"

এরপর মহারাজ ত্রিলোকচাঁদ রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের কাগজ প্রস্তুত করাইয়া তাঁর প্রধান উকিল রাজচন্দ্র রায়ের মারফৎ কোম্পানীর গভর্ণর ভ্যানসিটার্ট-এর নিকট পাঠান। এর উত্তরে দেনার টাকা ১১৬৭ সালের পৌষ মাস থেকে কিস্তি বন্দী করা হয়। রাজচন্দ্র এই টাকা ৪টি কিস্তিতে চৈত্র মাসের মধ্যে পরিশোধ করার অঙ্গীকার করেন।

এই বৎসর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী মহারাজ ত্রিলোকচাঁদ, তাঁর দেওয়ান ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের জন্য যে-সমস্ত উপহার পাঠান তার থেকে বোঝা যায় যে মহারাজা ও কোম্পানীর মধ্যে সম্পর্ক ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খুব খারাপ পর্যায়ে পৌঁছায় নাই। উপহারগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :

	উপহার দ্রব্য	*মূল্য*
মহারাজ স্বয়ং	হস্তী ১টি	২০০০ টাকা
	পরিচ্ছদ ১ সুট	৬০০ টাকা
	হীরার শিরপেচ ১টি	৪০০ টাকা
		মোট - ৩০০০ টাকা
দেওয়ান অমরচাঁদ :	ঘোড়া ১টি	৫০০ টাকা
	তরবারি ১খানি	৫০ টাকা
	পরিচ্ছদ ১ সুট	৫০০ টাকা
	শিরপেচ ২টি	৩০০ টাকা
		মোট - ১৩৫০ টাকা
রামদেব নাগ :	পরিচ্ছদ ১ সুট	২২৫ টাকা
	ঘোড়া ১টি	৫০০ টাকা
		মোট - ৭২৫ টাকা
গোকুল মজুমদার :	পরিচ্ছদ ১ সুট	২২৫ টাকা
	ঘোড়া ১টি	৫০০ টাকা
		মোট - ৭২৫ টাকা
রাজচন্দ্র রায় উকীল :	পরিচ্ছদ ১ সুট	২২৫ টাকা
	ঘোড়া ১টি	৫০০ টাকা
		মোট - ৭২৫ টাকা
রাজেন্দ্র রায় :	পরিচ্ছদ ১ সুট	২২৫ টাকা
ধনঞ্জয় রায় উকীল :	পরিচ্ছদ ১ সুট	১৭৫ টাকা
	৬ জন উকীলকে শাল ৬ খানা	৬০০ টাকা

এছাড়া দিল্লীর বাদশাহের ফরমান মত কোম্পানীর কর্মাধ্যক্ষ হেনরী রিসবেড ত্রিলোকচাঁদকে একটি হাতী ও চার পারচা খেলাতসহ একখানি পরওয়ানা পাঠান।

এরপর থেকে কোম্পানী ও মহারাজার সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ততর হতে থাকে। আর এর পশ্চাতে নবাব মীরকাশিমের বিশেষ ভূমিকা ছিল। মীরকাশিম এ-সময়ে

মহারাজ ত্রিলোকচাঁদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য সুলতানী বেগ নামে এক গুপ্তচর নিযুক্ত করেন।

এসময় আবার মারাঠা ও তেলেঙ্গানা সৈন্যদল শিউভাটের নেতৃত্বে মেদিনীপুর, বর্ধমান চাকলার দক্ষিণ অঞ্চল, মানকব, চিতুয়া ভুরশুট, বালিগড়ী, চৌমহা ও জাহানাবাদ পরগনায় প্রায় তিনমাসকাল (১৭৬০ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত) লুঠতরাজ ও সন্ত্রাস চালায় এবং এখান থেকে প্রায় ২/৩ লক্ষ টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়। এই মারাঠা হাঙ্গামা এবং কোম্পানী ও নবাবের অসহযোগিতার ফলে বর্ধমান জমিদারীব রাজস্ব আদায় খুবই শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছায়। বেশীর ভাগ রাজস্বই অনাদায়ী থাকে। ফলে কোম্পানীকে দেয় রাজস্ব বকেয়া পড়ে যায়।

মহারাজ তখন কোম্পানীর গভর্ণরকে রাজস্ব বাকী পড়ার কারণ দেখিয়ে পত্র লেখেন। এমতাবস্থায় মহাবাজা বুঝতে পাবেন কোম্পানীর সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য ও আসন্ন। তখন তিনি তাঁর সৈন্যবিভাগে ১৫ হাজার লোক নিযুক্ত করেন। ১৭৬০ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায—"বর্ধমানের মহারাজ তাঁহার সৈন্যদলে পনের হাজার লাঠিযাল, পাইক ও ডাকাইত নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।"

মীরকাশিমও তাঁর গুপ্তচর মারফৎ এই সংবাদ সংগ্রহ কবে কোম্পানীকে জানিয়ে লেখেন—"বর্ধমানের রাজা যুদ্ধের জন্য ১০/১৫ হাজার সৈন্য নিযুক্ত করিয়া বীরভূমের রাজার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। আমি এই সংবাদ অবগত হইয়াই ২/৩ হাজার অশ্বারোহী ও ৫ হাজার পদাতিক পাঠাইয়া বীরভূমের রাজাকে দমন করিয়াছি। পূর্বেই চেতুয়া, বরোদা ও চন্দ্রকোণার রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের যে সকল রাজ্য বর্ধমানের রাজা অধিকার করিয়াছেন তৎসমুদায় পুনরুদ্ধার করিয়া পূর্ব জমিদারগণের উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিয়াছি। বর্ধমানের রাজাকে দমন করাই আমার অভিপ্রায়। বীরভূম হইতে যাইবার সময় অবশ্যই যেন মেজর হোয়াইট বর্ধমান আক্রমণ করেন।"

নবাবের অনুগত মহারাজের বিরুদ্ধে কোম্পানীর পক্ষে "স্বাধীনচেতা" মীরকাশিমের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করা মীরকাশিমের আচরণকে রহস্যাবৃত করে তোলে। মনে হয় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে কলকাতায় কোম্পানীর গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট-এর সঙ্গে মীরকাশিমের যে গোপনচুক্তি হয়েছিল মীরকাশিম তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার নবাবীর লোভে কোম্পানীকে নানা ভাবে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। পরে অবশ্য কোম্পানীর কর্মচারীদের বিনাশুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসা কোন মতে বন্ধ করতে না পারায় কোম্পানীর সঙ্গে নবাবের সম্পর্কে যে

ফাটল ধরে তারই পরিণতি বক্সার যুদ্ধ, বাংলায় নবাবীর পতন ও ইংরাজ আধিপত্যের সূচনা।

যাই হোক, বোর্ড মীরকাশিমের পত্রে বর্ধমানের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়ে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর ক্যাপ্টেন হোয়াইটকে আদেশ দেন—মিঃ সমবকে বোর্ড থেকে বর্ধমানের মহারাজার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি আপনাকে যেরূপ বলিবেন আপনি সসৈন্যে তাহাই করিবেন। আপনি মিঃ নচার্সের জন্য হুগলীতে অপেক্ষা করিবেন। যদি রাজা বশ্যতা স্বীকার না করেন তাহা হইলে আপনারা উভয়েই অম্বিকা হইয়া বর্ধমানে যাইবেন। আর যদি রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন তাহা হইলে বোটগুলিকে হুগলী অথবা অম্বিকা হইতে ফেরৎ পাঠাইয়া বরাবর মেদিনীপুরে যাইবেন। আমার বোধহয় মহারাজা বশ্যতা স্বীকার করিবেন।

বোর্ডের আদেশ পেয়ে ক্যাপ্টেন হোয়াইট মহারাজার নীলগড় নামক দুর্গ অবরোধ করেন এবং দুর্গের কামান ও স্থানীয় দেবালয়ের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করেন ও কিল্লাদার হীরা সিংকে বন্দী করেন। মহারাজ এ সংবাদে বিচলিত হয়ে বোর্ডকে লেখেন—

"বর্গীরা আমার দেশ লুণ্ঠন করিয়াছে এবং আমি সেনপাহাড়িতে আসিবার পরই মেজর হোয়াইট আসিয়া সহসা আমার নীলগড় দুর্গ আক্রমণ করিয়া আমার কামানগুলি ও দেবালয়ের দ্রব্যাদি অধিকার করিয়াছেন। কেল্লাদারকে বন্দী করিয়া দুর্গমধ্যে স্বীয় প্রহরায় রাখিয়াছেন। সহসা এইরূপ আক্রমণ করিবার কারণ জানিতে না পারায় আমি অতিশয় দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে এবং আমিও আপনার চিরঅনুগত ও আশ্রিত। কিন্তু কি কারণে মেজর সাহেব যে সহসা আমার ও এদেশের অনিষ্টকর কার্য করিলেন তাহা বলিতে পারি না।"

মহারাজার এরূপ বিস্মিত ও দুঃখিত হবার কারণ মহারাজ বিবিধ প্রকারে বর্গীদের দ্বারা উৎপীড়িত হলেও কোম্পানীর রাজস্ব এর আগে কোনও বাকী ফেলেন নাই। "কিন্তু বর্গীরা বারবার তাঁর জমিদারীতে অত্যাচার চালানোতে এবং প্রজাদের সর্বস্ব লুঠ ও ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়ায় তারা গৃহছাড়া; বর্গীদের পুনরায় আক্রমণের ভয়ে কেউ বাড়ী ফিরতে পারছে না। মহারাজ প্রজাদের স্ব-স্ব গৃহে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু বর্গীদের পুনরায় আক্রমণের আশঙ্কা করায় স্বীকৃত হচ্ছে না। সে কারণ হঠাৎ রাজস্বের কিছু কিস্তি বাকি পড়েছে।" একথা জানিয়ে মহারাজ পুনরায় পত্র দেন।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান ও বাঁকাখালের কাছে সঙ্গতগোলার মধ্যস্থিত নদীতীরে ক্যাপ্টেন হোয়াইট ও মহারাজার সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর হোয়াইট ঐ যুদ্ধ সম্বন্ধে Select Committee-র প্রেসিডেন্টের কাছে যে রিপোর্ট পাঠান তার মর্ম এরূপ : হোয়াইট মহারাজার কাছে পত্র লিখে তাঁকে কোম্পানীর বিলের উপর দশ হাজার টাকা দিতে বলেন এবং মহারাজার সৈন্যবাহিনীর, প্রজাদের ও দেশের হিতের জন্য রাজধানীর কোনরূপ ক্ষতি না করে রাজধানীর ভিতর দিয়ে সঙ্গতগোলায় নদী পার হয়ে চলে যাবার প্রতিশ্রুতি দিতে বলেন। মহারাজ ১০ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হলেও হোয়াইটকে তাঁর দলবল নিয়ে কাটোয়া দিয়ে ফিরে যেতে বলেন ও আরও জানিয়ে দেন যে কাটোয়া দিয়ে ফিরে না গেলে হোয়াইটকে এক কড়িও দেওয়া হবে না।

এরপর মহারাজার দুই সেনাপতি মিছরী খাঁ ও দুন্দর সিং-এর নেতৃত্বে মহারাজার ১০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী হোয়াইটের পথরোধ করে। এমনকি মেজর ইয়র্কের সঙ্গে হোয়াইটকে মিলিত হতে দেন না। ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধে হোয়াইটের দাবীমত রাজার পাঁচ শত লোক হতাহত হয় ও রাজার দশটি কামান অধিকৃত হয়। কোম্পানীর দুইজন ইউরোপীয় ও ৯ জন সিপাই আহত হয়। মহারাজা যুদ্ধে পরাজিত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোম্পানী মহারাজার সঙ্গে বিরোধ জিইয়ে রাখতে চান না। তিনি মহারাজকে লেখেন যে, সেনাপতিদের দোষেই এই অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। মহারাজার কোন দোষ নাই। মহারাজার সঙ্গে কোম্পানীর সদ্ভাব যথারীতি বজায় থাকবে। "The English however perhaps wisely chose to look upon the Raja as still their friend and continued him in the Zamindari on terms much below the revenue due to want of money and other reasons (History of the Freedom Movement in India, Vol. I, P-59) মনে হয় দেওয়ানি লাভ না করা পর্যন্ত নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোম্পানী খুব বেশী সুনিশ্চিত হতে পারে নাই, তাই ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে শত্রুতা না বাড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

ত্রিলোকচাঁদ কিন্তু টাকা দিতে পারলেন না। কোম্পানী তখন রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে বর্ধমানের জন্য রেসিডেন্ট-এর পদ সৃষ্টি করলেন। জনস্টন তখন প্রথম রেসিডেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে বর্ধমানে এলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে যখন কোম্পানীর অধিকারে বর্ধমান আসে তখন রাজস্ব ছিল ৩১,৭৫,৩৯২ সিক্কা টাকা, তিন বছরের মধ্যে বেড়ে তা দাঁড়ায় ৪১,৭২,০০০ সিক্কা টাকা। জনস্টন এলেন বটে কিন্তু তিনিও খাজনা আদায় করতে ব্যর্থ হন।

তখন জমিদারীর কিছু অংশ নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা করেন। ফলে বর্ধমান ও হুগলী জেলায় বেশ কয়েকজন নতুন জমিদারের সৃষ্টি হয়।

জনস্টনের পর মিঃ হে এবং মিঃ বোল্টস্ বর্ধমানের রেসিডেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে আসেন, কিন্তু খাজনা আদায় বাড়ে না। জমিদারীর অংশবিশেষ নীলামে বিক্রি হতে থাকে এবং সুপারিনটেনডেন্টরাও নানারকম দুর্নীতিতে জড়ান। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও বর্গীর হাঙ্গামায় বর্ধমানের রাজকোষ শূন্যপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। W.W. Hunterএর Annals of Rural Bengalএ এই সময়ের দুর্ভিক্ষপীড়িত বর্ধমানের নির্মম ও করুণচিত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। মহারাজা কোম্পানীকে জেলার এই করুণ চিত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন, এ অবস্থায় রাজস্ব ঠিকমত দেওয়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় কোম্পানীর বোঝা উচিত ছিল যে প্রজারা জমিদারের চিরন্তন ধন, সন্তানতুল্য, সুখে দুঃখে মহারাজাই তাঁদের একমাত্র আশ্রয়। তিনি যখন সেরকম পরিস্থিতিতে রাজস্ব ঠিকমত আদায় করতে পারছেন না তখন জনস্টন, হে বা বোস্টন কারও পক্ষে তা সম্ভব নয়। বাস্তব পরিস্থিতি বিচার না করেই তাঁরা রেসিডেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট পাঠিয়ে অবস্থাকে জটিল করে তুললেন মাত্র।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বার গভর্ণর হয়ে আসেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব নাজিমউদ্দৌল্যাকে বছরে ৩৫ লক্ষ টাকা ভাতা দেওয়ার পরিবর্তে কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে, ফলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় কোম্পানীর শাসনাধিকার আইনী স্বীকৃতি লাভ করে। এর পর থেকেই মহারাজার সঙ্গে কোম্পানীর সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি হয়। মহারাজা ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি পান। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের আর এক ফরমান বলে 'মহারাজাধিরাজ' ও 'ফিদবিখাস' উপাধিসহ ৫০০০ পদাতিক ও ৩০০০ অশ্বারোহী ও সৈন্যবাহিনীতে সামরিক বাদ্য বাজাইবার অনুমতি লাভ করেন। কোম্পানীর সেকালের কর্মকর্তা মিঃ হেনরী সাহেবের নির্দেশমত সরকার থেকে মহারাজ ৩৫,৮২৬ টাকা বার্ষিক তঙ্কা বাবদ পেতে থাকেন। ত্রিলোকচাঁদ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীকে ৭৫টি পরাগনার জন্য ৪৩ লক্ষ টাকার উপর রাজস্ব দিতেন। এছাড়া হাওল, জিয়োদা, চরতি, ইজারা ইত্যাদি বাবদ বছরে ছয় লক্ষাধিক টাকা অতিরিক্ত দিতে হতো; অনাদায়ী পতিত জমির জন্য দিতে হতো কিঞ্চিদধিক ৫০ হাজার টাকা। মহারাজ তাঁর উকিল গৌরীচরণ মল্লিক মারফৎ রাজস্ব জমা দিতেন ও কোম্পানীর কাছ থেকে দাখিলা পেতেন। মোহরটির সম্পূর্ণ

পাঠ এইরকম—শাহ্ আলম্ বাদশাহগাজী ফিদবী ওমদতল্ মোমালেক একতে খারাল মোল্ক কমরদ্দৌল্লা ভারলেষ্ট সেপাহ্দার জঙ্গ বাহাদুর। মোহরাঙ্কিত।

সেকালে যথাসময়ে রাজস্ব পরিশোধ করতে না পারলে নবাব, জমিদার বা রাজাদিগকে কারারুদ্ধ করে সেই টাকা আদায় করতেন। মহারাজ ত্রিলোকচাঁদেরও একবার এরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। রাজ পরিবারের পূর্বতন দেওয়ান মানিকচাঁদের মধ্যস্থতায় তিনি সেবার মুক্তি পান। সে এক মজার কাহিনী—

ত্রিলোকচাঁদ আবদ্ধ হয়ে নবাব দরবারে নীত হয়েছেন। সেখানে বর্ধমান রাজ এস্টেটের পূর্বতন দেওয়ান মানিকচাঁদ উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহারাজকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করেন। নবাব মানিকচাঁদের এই ধৃষ্টতায় রুষ্ট হয়ে তাঁর কাছ থেকে কৈফিয়ৎ দাবী করেন। মানিকচাঁদ উত্তর দেন তিনি মহারাজকে দেখে ওঠেননি; মহারাজের নিমক তাঁকে উঠিয়েছে। যাই হোক, মহারাজ মানিকচাঁদের এই উপকার ভোলেন নাই। তিনি রাজ্যে ফিরে এসেই দেওয়ান মানিকচাঁদের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

মহারাজার ছিল দুই স্ত্রী—জ্যেষ্ঠা মহারাণী রূপকুমারী ও কনিষ্ঠা বিষণকুমারী। রূপকুমারী ছিলেন কাশীজোড়ার রাজা নরনারায়ণের কন্যা। এঁর পূর্বপুরুষ গঙ্গানারায়ণ রায় সরহিন্দ থেকে জগন্নাথ দর্শনে এসে দিল্লীশ্বরের আদেশে কাশীজোড়ায় জমিদারী পেয়ে সেখানেই বাস করেন। কনিষ্ঠা মহিষী মহারাণী বিষণকুমারী সেরগড় পরগনার অন্তর্গত উখরানিবাসী বক্তার সিং হণ্ডের ভগিনী ও মেহেরচাঁদ হণ্ডের কন্যা। মেহেরচাঁদ লাহোরের মচ্ছিহাটা মহল্লা থেকে এসে উখরায় বসতি করেন। রূপকুমারীর কোন সন্তানাদি ছিল না। বিষণকুমারীর গর্ভে এক পুত্র মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর এবং দুই কন্যা তোতাকুমারী ও চিত্রকুমারী জন্মগ্রহণ করেন। লাহোরনিবাসী আনন্দচাঁদ শেঠের সঙ্গে তোতাকুমারীর ও দয়াচাঁদ শেঠের সঙ্গে চিত্রকুমারীর বিবাহ হয়।

মহারাজাধিরাজ স্বল্পাহারী ছিলেন। যেদিন তিনি একছটাক চালের ভাত ও একটি ছোট মাছ খেতেন সেদিন তাঁর মায়ের আনন্দের সীমা থাকতো না। জলযোগের সময় একজোড়া মণ্ডার এক পাটি খেলে তাঁর মা অন্তঃপুরে নহবৎ বাজাবার আদেশ দিতেন। (বর্ধমান রাজকাহিনী—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল)

ত্রিলোকচাঁদের রাজত্বকালে বর্ধমান অঞ্চলে দুবার দুর্ভিক্ষ হয়—একবার ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ও দ্বিতীয়বার তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের সময় খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত মহার্ঘ হয়ে উঠেছিল—প্রজাগণকে অশেষ দুর্গতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল। প্রাক্ দুর্ভিক্ষ বৎসর (১৭৫১) ও দুর্ভিক্ষের

বৎসরের খাদ্যদ্রব্যের মূল্য তালিকার তুলনামূলক বিচার করলেই বুঝতে পারা যায় একবছরে দ্রব্যমূল্য কতগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

১৭৫১ সালের অক্টোবর মাসের শস্যাদির মূল্য :

শস্য	প্রতি টাকায়	ওজন মন ও সের-এ	বর্তমানের কিলো-গ্রামের পরিমাণ
সর্বোৎকৃষ্ট চাউল	,,	\,৫	৩২.৮ কেজি
গম	,,	১\৭	৫৩.৫ কেজি
বুট (ছোলা)	,,	১/	৩৭.৫ কেজি
আটা	,,	//৪	২২.৫ কেজি
তৈল	,,	/৮	৭.৫ কেজি

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর (দুর্ভিক্ষের বৎসর) মূল্য তালিকা :

সর্বোৎকৃষ্ট চাউল	,,	/২	১১.২৫ কেজি
গম	১ টাকা	১৯ সের ১১ ছটাক	১৭.৫ কেজি
সাধারণের ব্যবহারোপযোগী চাউল	১ টাকা	//২	২০.৬ কেজি
বুট	১ টাকা	১৫ সের ২ ছটাক	১৪.২ কেজি
ময়দা	১ টাকা	/৫	৪.৬ কেজি
তৈল	১ টাকা	৩ সের ১০ ছটাক	৩.৮৫ কেজি

এই সময় শ্রমিকের মজুরী ছিল দৈনিক দুপণ পনের গণ্ডাকড়ি—অর্থাৎ দুই আনা আড়াই পয়সা বা বর্তমানের ১৬ পয়সা। এর মধ্যে সর্দারের দস্তুরি ৪ গণ্ডা। পরপর দু-বছরের মূল্য তালিকা বিচার করলে দেখা যায় এক বৎসরেই দুর্ভিক্ষের জন্য জিনিসপত্রের দাম তিনগুণের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল।

দ্বিতীয়বার দুর্ভিক্ষ হয় ত্রিলোকের রাজত্বের শেষ দিকে—১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, বাংলা ১১৭৬ সালে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে শুধু বর্ধমান নয় সারা বাংলা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়ে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে এই মন্বন্তরের মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাই।

"লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে কে ভিক্ষা দেয়? উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল, গোরু বেচিল, লাঙ্গল-জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল। ঘরবাড়ী বেচিল,

জোতজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কেনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইঁদুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল।"

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, কোম্পানী ও নবাবের দায়িত্বহীন শাসন ও শাসনহীন দায়িত্বের রাজনীতি দেশকে শ্মশানে পরিণত করিল। বর্ধমান তো বাংলার বাইরে নয়—কাজেই এখানেও একই চিত্র। ত্রিলোকচাঁদের রাজ্যে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় নেই। একের পর এক রেসিডেন্ট, সুপারিনটেনডেন্ট এসেও অবস্থার কোন সুরাহা করতে পারে নাই। ত্রিলোকচাঁদ বর্গীর আক্রমণ ও মন্বন্তরের বিবরণ দিয়ে কোম্পানীকে জানাল যে, এ-অবস্থায় রাজস্ব আদায় দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু রেসিডেন্ট ত্রিলোক সম্বন্ধে অনেক ভুল ও বিকৃত তথ্য বোর্ডের কাছে তুলে ধরেন।

কিন্তু বর্ধমান গেজেটিয়ার ১৯১০-এ Peterson তৎকালীন মহারাজার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য তুলে ধরেছেন। The Maharaja of Burdwan whose province had been the first to cry out and the last to which plenty returned, died miserably towards the end of famine, leaving a treasury so empty that the heir had to melt down the family plate and when this was exhausted, to beg a loan from the government in order to perform his father's obsequies.

মহারাজ ত্রিলোকচাঁদ ২৬ বৎসর বর্ধমান-এর জমিদারী শাসন করেন। এই ছাব্বিশ বৎসর মোটেই নিরুপদ্রবে কাটে নাই। কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত থেকে তিক্ততর হতে থাকে। মীরকাশিম নবাব হয়ে রহস্যজনক কারণে তাঁর সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেন। শিউভাটের নেতৃত্বে মারাঠা ও তেলেঙ্গানা বাহিনী পরগনার অধিকাংশ অংশে অত্যাচার ও লুঠতরাজ চালিয়ে গোটা অঞ্চলকে শ্মশানে পরিণত করে, বর্গীর অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানী তার আগ্রাসী থাবা পরগনার মধ্যে বিস্তার করতে থাকে—রাজধানী, মহবৎগড়, অম্বিকা, সেনপাহাড়ি, লালগড়, চন্দ্রকোণা, বিল্লরগড়, আরোয়াগড়, রঞ্জিগড়, শেরগড়, জাম গাঁ ও ওবৎগড়ে দুর্গ নির্মাণ বা দুর্গসংস্কার করতে থাকে। এর জন্য মহারাজকে তাদের অধিকৃত দুর্গ থেকে সৈন্য পদচ্যুত করতে হয়। একবার ঠিক সময়ে রাজস্ব দিতে না পারায় মহারাজকে নবাবের কারারুদ্ধও হতে হয়েছিল।

অবশেষে সারাজীবন সংঘর্ষ ও সংঘাতের মধ্যে জমিদারী পরিচালনা করে কোম্পানীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তাঁর পৈতৃক ও অধিকৃত জমিদারীকে

সম্পূর্ণ রক্ষা করে ১১৭৭ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) সাবিত্রী চতুর্দশী তিথিতে মহারাজাধিরাজ ত্রিলোকচাঁদের ঘটনাবহুল ও কর্মময় জীবনের অবসান হয়। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান দুই মহিষী, একমাত্র পুত্র নাবালক তেজচন্দ্র এবং দুই কন্যা চিত্রকুমারী ও তোতাকুমারী। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মহারাণী বিষণকুমারীর উপর নাবালক পুত্র তেজচন্দ্র ও জমিদারীর দায়িত্ব অর্পণ করে যান। রাজ এস্টে পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরী।

ত্রিলোকচাঁদের দেবদ্বিজে ছিল প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা, অনেক কবি ও সাহিত্যিক তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। শিল্প বিশেষ করে মন্দির-শিল্পে তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকলের ছিল গভীর-অনুরাগ।

ত্রিলোকচাঁদ ও তাঁর পূর্বপুরুষগণ ক্রমান্বয়ে ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর দান ক'রেছিলেন। মীরকাশিম ভ্যান্সিটার্ট-এর সঙ্গে নবাবী লাভের জন্য গোপন চুক্তিমত নবাবীপদ লাভ করেই মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম পরগনার সঙ্গে বর্ধমান পরগনার রাজস্ব আদায়ের সনদ কোম্পানীকে দান করার পরই কোম্পানী ঐ সমস্ত ব্রহ্মোত্তর জমির সেলামী বাবদ আড়াই লক্ষ টাকা আদায় করার আদেশ দেন। তখন ব্রাহ্মণগণ এই আদেশের বিরুদ্ধে বোর্ডে আবেদন করেন। বোর্ড সমস্ত কাগজপত্র দেখে আদেশ দেয় যে, যে সমস্ত জমি ১১৪৮ সালের আগে ব্রহ্মোত্তর দেওয়া হয়েছে ও ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের মধ্যে ত্রিলোকচাঁদ যে সমস্ত জমি ব্রহ্মোত্তর দান করেছেন ও যার জন্য নবাবের মাল গুজারি থেকে রাজস্ব মকুব করা হয়েছে সেই সমস্ত ব্রহ্মোত্তর জমির জন্য কোন সেলামি নেওয়া হবে না। ব্রাহ্মণদের দাবীর সমর্থনে ত্রিলোকচাঁদ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। একমাত্র তাঁর চেষ্টাতেই ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মোত্তর জমি রক্ষা পায় ও ব্রহ্মোত্তর জমি চিরস্থায়ী নিষ্কর হয়। ত্রিবেণীর বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে ত্রিলোকচাঁদ অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন ও তাঁকে অনেক জমি দান করেছিলেন। ত্রিলোকচাঁদ ও তাঁর পরিবারবর্গের স্থাপত্য বিশেষ করে মন্দির-স্থাপত্যের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন বর্ধমান, কালনা এমন কি ব্রজধাম পর্যন্ত বিস্তৃত।

ব্রজধামের কাম্যবনে গোপীনাথের মন্দির কীর্তিচন্দ শুরু করেছিলেন; ত্রিলোকচাঁদ সেটি সম্পন্ন করেন। ভরতপুরাধিকারী জোর করে মন্দির অধিকার করলেও মন্দিরগাত্র থেকে শিলালিপি অপসারিত করা যায় নাই। শিলালিপিতে ত্রিলোকচাঁদের নাম লিখিত আছে—

শকাব্দ ১৬৬৯

শ্রীমত্যা রাণী রাজেশ্বরীজী শ্রীরাজা ত্রিলোকচন্দজী বর্ধমানকে গোমস্তা অভিরাম বসু তথা রামেশ্বর শর্ম্মা।

১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিচাঁদের জননী ব্রজকিশোরী ব্রজধামের নন্দীগ্রামে পবন সরোবরের ঘাট নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন—তার শিলালিপিতেও ত্রিলোকচাঁদের উল্লেখ আছে। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পবন সরোবরের তীরে ব্রজকিশোরী পবনবিহারী-বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন—সে মন্দিরের শিলালিপিতেও ত্রিলোকচাঁদ-এর উল্লেখ পরোক্ষভাবে এই মন্দির নির্মাণে ত্রিলোকচাঁদ-এর পোষকতা প্রমাণ করে।

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিলোকচাঁদের মাতা লক্ষ্মীকুমারী অম্বিকায় লালজী মন্দিরের নিকটে পঁচিশ রত্নের টেরাকোটা অলঙ্করণ সমন্বিত শ্রীশ্রী কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির নির্মাণ করান—এর শিলালিপিতে ত্রিলোকচাঁদের উল্লেখ আছে—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজী
শ্রীহরিচরণ সরোজে গুণমণি ষোড়শে—
সংখ্যক শকাব্দে।
মন্দিরমর্পিতমেতন্দ্রাজে শ্রীতিলোকচন্দ্র মাত্রা ॥
শকাব্দা ১৬৭৩ । সাল ১১৫১

১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চিত্রসেন-মহিষী রাণী ছঙ্গকুমারী অম্বিকার জগন্নাথ মন্দিরে রামেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের শিলালিপিই তার প্রমাণ—

বাণাদ্রিমাতৃকামানে
শাকে প্রসাদমৈষ্টকম্।
চিত্রসেনস্য মহিষী—
মহেশায় ন্যবেদয়ৎ ॥
শকাব্দ ১৬৭৫।

চিত্রসেনের কনিষ্ঠা মহিষীও রামেশ্বর শিবমন্দিরের পাশে ভুবনেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিচাঁদ জননী ব্রজকিশোরী অম্বিকায় অতি রমণীয় কারুকার্যমণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের শিলালিপিতে দেখা যায়—

রসাব্ধিরসচন্দ্রাঙ্কগণিতে অব্দে শকাবধি।
চক্রে বৈকুণ্ঠ নাথস্য মন্দিরং সুমনোহরম্ ॥
জগদ্রায়স্য মহিষী কীর্তিচন্দ্র নৃপপ্রসুঃ।
শ্রীশ্রীত্রিলোকচন্দ্রস্য নৃপতের্যা পিতামহী ॥ শকাব্দা ১৬৭৬।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিলোকচাঁদের মাতা লক্ষ্মীকুমারী অম্বিকায় বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বরীবাটীতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন—শকাব্দ ১৬৮৫। এছাড়া

ত্রিলোকচাঁদের জ্যেষ্ঠা মহিষী অম্বিকায় রূপেশ্বর শিবমন্দির ও ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী বিষণকুমারী এর পূর্বদিকে আর এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সকল দেবালয়ে কিশোর-কিশোরী দেবদেবী, বর্ধমানেশ্বর, রাজরাজেশ্বর, কর্পূরেশ্বর শিব ও খাস হাবেলীতে ত্রিলোকেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছে। বিষণকুমারী দাঁইহাটে বারদ্বারী নামক ঘাট ও চাঁদনী নির্মাণ করিয়ে দেন। মহারাজ এই গ্রামে এক বিরাট পুষ্করিণীও খনন করান। বর্ধমান থেকে ৪ কিমি দূরে সিউড়ি রোডের ধারে নবাবহাটে ত্রিলোকচাঁদের মহিষী ও তেজচন্দ্র-জননী বিষণকুমারী ১০৯টি শিবক্ষেত্র নির্মাণ করান। এখানে কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নাই তবে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত List of Ancient Monuments of Bengal (P.W.D. Govt. of Bengal) গ্রন্থে এখানকার শিলালিপির একটা অনুলিপি আছে—

শাকে শূন্য শশাঙ্ক শৈল কুথিতে নির্ম্মায় রাধাহরি
প্রীত্যে পুণ্যবতী নবাধিকশতং শ্রী মন্দিরাণি স্বয়ম্।
ধীর শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র ধরণী ধৌরেয় চুড়ামনে—
মাতা তৎসবিধে বিধায় সুসরস্তীরে সমস্থাপয়তু।

অঙ্কস্য বামাগতি ধরলে মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৭১০ শকাব্দ বা ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। প্রতিটি মন্দিরের আয়তন ১০′ x ১০′ উচ্চতা ১৫ ফুট। কোন টেরাকোটা অলঙ্করণ নাই। একটি মন্দিরেব আয়তন কিছুটা বড়। শোনা যায় মহারাণী বিষণকুমারী নাবালক পুত্র তেজচন্দ্রের অভিভাবিকা হিসাবে রাজ্য পরিচালনায় নানা বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হন এবং তাঁহার যুবক পুত্রকে বিদেশী ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। এই ঘটনাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও অশেষ করুণা মনে করে তিনি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কালনায় ১০৮টি শিবমন্দির ও ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান নবাবহাটে ১০৮ ও পূর্ব দিকে একটা ছোট মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে লক্ষ ব্রাহ্মণের সমাগম হয়েছিল ও তাঁদের পদধুলি সযত্নে রাজবাড়ীতে রক্ষিত হয়েছিল। মন্দিরে শিবলিঙ্গের নীচে অনেক স্বর্ণ মুদ্রা আছে এই মনে করে পরে কিছু শিবলিঙ্গ স্থানচ্যুত করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন অযত্নের অভাবে মন্দিরগুলির ভগ্নদশা ঘটে। পরে ১৯৬৪-৬৫ সালে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী শঙ্করদাস ব্যানার্জীকে সভাপতি ও জেলাশাসক শ্রীমেননকে কার্যকরী সভাপতি করে ও বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে একটি মন্দির সংস্কার কমিটি গঠিত হয়; তাঁদের চেষ্টায় বিড়লা ট্রাস্ট এক লক্ষ দশ হাজার টাকা ব্যয়ে মন্দিরটি সম্পূর্ণ সংস্কার করেন। রাজমহিষীদের দ্বারা এই মন্দির প্রতিষ্ঠার বিবরণ পর্যালোচনা

করলে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায় যে রাজমহিষীদের অধিকাংশই দীর্ঘজীবী ছিলেন ও এদের অধিকাংশই পুণ্যবর্তী ধর্মশীলা মহিয়সী মহিলা ছিলেন।

এছাড়া ত্রিলোকচাঁদের অনেক অনুগত কর্মচারী মহিষীদের অনুচর, অনুচরীও অনেক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিলোকচাঁদের মন্ত্রী রামদেব নাগ সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীতে শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। এই রামদেব নাগ মূলাজোড় পত্তনী নিয়ে কবি ভারতচন্দ্রের উপর সবিশেষ উৎপীড়ন করেন। তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রায়গুণাকর দ্ব্যর্থক নাগাষ্টক স্তোত্র রচনা করেন। এই স্তোত্রে মহারাজ কৃষ্ণরামকে শ্রীকৃষ্ণ ও রামদেবকে কালীয় নাগরূপে চিত্রিত করা হয়েছে—সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ দুই-ই শিখরিণী ছন্দে রচিত।

অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিংকালিয়হ্রদং
পুরা নাগগ্রস্তং নিহতমপি সমস্তং জনপদম্।
যদি দানাং তৎ ত্বৎ নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং
সমস্তং মে নাগো গ্রাসতি সবিরাগো হরি হরি।

শেষ দুই ছত্রের বাংলায় রূপান্তরে মহারাজের কাছে আবেদন স্পষ্ট-

কবে রাজন্ চেষ্টা করিবে তুমি হে নাগ দমনে
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি ॥

ত্রিলোকচাঁদ সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানা বেঙ্গকালি গ্রামের কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী তাঁর পোষকতা লাভ করেছিলেন বলেই মনে হয়।

ভূপতি তিলক চন্দ্র বর্ধমানে যেন ইন্দ্র
তেজচন্দ্র তাঁহার নন্দন।
নিবাস তাঁহার দেশে চণ্ডিকা মঙ্গল ভাষে
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ অকিঞ্চন। (চণ্ডীমঙ্গল)

কবীন্দ্রের কাব্যের রচনাকাল জানা যায় না। তবে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে কবীন্দ্র ত্রিলোকচাঁদের রাজত্বের শেষ ভাগে ও তেজচন্দ্রের রাজত্বের প্রথম ভাগে কাব্যরচনা করেন। তবে কবির শীতলামঙ্গল কাব্য ত্রিলোকচাঁদের আমলেই রচিত। কারণ এটি ছিল তাঁর প্রথম কাব্য।

শ্রীযুত ক্ষত্রিয় জাতে বর্ধমানে অধিপতি
শ্রীযুত তিলকচন্দ্র রায়
তদাশ্রয়ে করি বাস শীতলার ইতিহাস
চক্রবর্তী অকিঞ্চনে গায়।

মহারাজাধিরাজ ত্রিলোকচাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেন কাষ্ঠশালীর দেওয়ান পরিবারের ব্রজকিশোর রায়। বর্ধমান জেলার কাষ্ঠশালী গ্রামে এঁদের পৈতৃক বাসভূমি। ব্রজকিশোরের পদাবলীর প্রায় সমস্ত পদই লুপ্ত—একটি মাত্র পাওয়া গেছে।

অভয়ে ব্রহ্মময়ী ভবদে ভবানী।
ভীত ভয় নাশিনী ॥
... ...
দ্বিজ ব্রজ কিশোর বলে,
ভবার্ণব জলে
তারিতে তারিণী চরণ তরণী ॥

এই ত্রিলোকচাঁদ আজীবন কোম্পানীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে ডিসেম্বর বাঁকার কাছে দামোদরের সঙ্গতগোলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনচেতা ত্রিলোকচাঁদের সশস্ত্র সংগ্রাম এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁর মত যদি বাংলার সমস্ত জমিদার কোম্পানীর আগ্রাসন ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতেন, যদি মীরকাশিম ভ্যান্সিটার্ট্-এর সঙ্গে গোপন চুক্তির মর্যাদা দিতে গিয়ে ইংরেজ কোম্পানীকে সন্তুষ্ট করার জন্য ত্রিলোকচাঁদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা না করে সমস্ত জমিদারকে কোম্পানীর বিরুদ্ধে সুসংগঠিত করে কোম্পানীর বিরুদ্ধে লড়তেন তাহলে হয়ত বক্সার যুদ্ধ ও পলাশীর যুদ্ধের প্রহসনের সমুচিত জবাব দিতে পারত, তাহলে হয়ত বাংলার ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। হায় ত্রিলোকচাঁদ! যিনি ৭৫ পরগনার অধীশ্বর হয়ে নবাবের কোষাগারে বিয়াল্লিশ লক্ষাধিক টাকা রাজস্ব দিয়ে গেছেন—যাঁর জমিদারী একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের রূপ ধারণ করেছিল, যাঁর পুণ্যকার্য বর্ধমান, কালনা এমন কি সুদূর ব্রজধাম পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র ও মহারাণীদের এস্টেটের ব্যয় নির্বাহের জন্য পারিবারিক সম্পদ স্বর্ণালঙ্কার ও তৈজসপত্রাদি গালাতে হয়েছিল। তাঁর নাবালক পুত্রকে পিতার শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে উপস্থিত হতে হয়েছিল! অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র রায় (১৭৭০–১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ) : ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ ত্রিলোকচাঁদ তাঁর একমাত্র নাবালক পুত্র তেজচন্দ্রকে জমিদারীর উত্তরাধিকারী রেখে পরলোকগমন করেন। তখন রাজকোষের অবস্থা ভয়াবহ,

শূন্যপ্রায়। মাতা মহারানী বিষণকুমারী নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা নিযুক্ত হন। রাজকোষের তখন এমন অবস্থা যে মহারাজ তেজচন্দ্রকে পিতৃশ্রাদ্ধের খরচ নির্বাহের জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে কোম্পানীর দ্বারস্থ হতে হয়। লালা উমিচাঁদ তখন রাজ এস্টেটের দেওয়ান। এই অবসরে বাংলার রাজনৈতিক চিত্রটা একবার দেখে নেওয়া যাক। দিল্লীর মসনদে তখন সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ) এঁর পর সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় আকবর শাহ্ (১৮০৬-১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)। বাংলার নবাব ছিলেন মোবারকউদ্দৌল্যা। কোম্পানীর পক্ষে বাংলার গভর্ণর পদে আসীন ওয়ারেন হেস্টিংস যিনি ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং এ্যাক্টের ধারা অনুসারে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলার গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। এই গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্য বারওয়েল, ক্লেভারিং ও মনসন। এই কাউন্সিলরদের মধ্যে সার জন ক্লেভারিং ছিলেন—an honest straight forward man of passionate disposition and mediocre abilities, —Manson a proud, rash and self willed man, though easily misled and very greedy for patronage and power. Fancis—capable not only of the faults of undying malignity, ferocious cruelty but also of falsehood, treachery and calumny." Richard Barwel—a man of many merits made a great fortune in India and Sir Stephen says this fact of itself raises a presumption against his official purity. তাঁর নিজের পত্র থেকে জানা যায়—এক ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি ইংলণ্ডে $ 40,000 পাঠিয়ে ছিলেন। এই চারজন কাউন্সিলের মধ্যে একমাত্র Barwell বড়লাট Hastings-এর অন্ধ সমর্থক ছিলেন।

আর Hastingsতো ছিলেন সমস্ত blood shed, rapine, villany extortion এর নাটের গুরু যার জন্য বার্ক-এর অভিযোগক্রমে হেস্টিংসকে পার্লামেন্টে Impeachment-এর সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অবশ্য শাস্তি কিছুই হয় নাই। Burke এর কথায় How many of the criminals have been summoned before you? How has their conduct been enquired into? If these evils really existed it could only be concluded that ministers sanctified the blood shed, the raptine, the villany, this extortion for the valuable consideration of 40,000 Pounds. The sinners arranged his white robed innocence, their misdeeds were more than atoned for, by an expiatory sacrifice of 40,000 Pounds.

বাংলার রাজপুরুষদের চরিত্র এই। কাজেই এদের লোভাতুর দৃষ্টি যে বর্ধমান রাজ এস্টেটে পড়বে তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। এই বার বর্ধমান

রাজ এস্টেটের চিত্রটা তুলে ধরা যাক। ত্রিলোকচাঁদের তিরোধানের পর তেজচন্দ্রের অভিভাবিকা মা নাবালক পুত্রের অছি রূপে ১৭৭৬ থেকে ১৭৭৯ পর্যন্ত জমিদারীর কার্য পরিচালনা করেন ও ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জমিদারী তেজচন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করেন।

কিন্তু ত্রিলোকচাঁদ মারা যান ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে, তাহলে ১৭৭০ থেকে—১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ছয়/সাত বছর জমিদারীর হাল ধরেছিল কে? ত্রিলোকচাঁদের মৃত্যুর পর মহারাণী বিষণকুমারী তেজচন্দ্রের জন্য 'মহারাজা' পদ নবীকরণের জন্য দশ হাজার টাকা নজরানা দিয়ে মোগল সম্রাটের নিকট আবেদন করেন। এলাহবাদের বাদশাহী দরবার থেকে তেজচন্দ্রকে মহারাজাধিরাজ ও ফিদবিখাস উপাধিসহ ৫০০০ পদাতিক সৈন্য, ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, কামান, বন্দুক, সামরিক বাদ্য, ঝালেদার—পালকি ও নিজ পতাকা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়—ফরমানের তারিখ ১২ সওয়াল ও ১২ জুলুস। এই ফরমান সম্রাট দরবারের সেনাপতি আরফৎ-উদ্-দৌল্লার মাধ্যমে মহারাজার কাছে প্রেরণ করা হয়।

বর্ধমানের রেসিডেন্ট তখন গ্রাহাম সাহেব। মহারানীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশমত পূর্ব দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরীকে সরিয়ে চুপীর দেওয়ান পরিবারের শঠ ও দুর্বৃত্ত ব্রজকিশোর রায়কে দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। এই পদ লাভের জন্য ব্রজকিশোরকে রেসিডেন্ট ও পরবর্তী রেসিডেন্ট চার্লস স্টুয়ার্টের প্রত্যেককে দুই লক্ষ টাকা করে উৎকোচ দিতে হয়েছিল। মহারানীর 'সিল' জোর করে কেড়ে নেওয়া হয় এবং তেজচন্দ্রকে প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রাহাম ও ব্রজকিশোরের অধীনে বন্দী হয়ে থাকতে হয়। ব্রজকিশোর মহারানীর কাছ থেকে রাজসিল কেড়ে নিয়ে যথেচ্ছভাবে তার ব্যবহার করতে থাকেন। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে প্রজাপীড়ন ও অত্যাচার বাড়তেই থাকে। মহারানী বিষণকুমারীকে (উচ্চারণ ভেদে বিষ্ণুকুমারী) অপদস্থ করার জন্য হেস্টিংস-এর বন্ধু বারওয়েল মহারানীর নামে নানা কুৎসা রটাতে থাকেন। গ্রাহামের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে তিনি রাজকোষ থেকে ১১ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা নন্দকুমারের পরামর্শে মহারাণী বিষণকুমারী কাউন্সিলের কাছে গ্রাহাম ও ব্রজকিশোরের বিরুদ্ধে ১১ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ দায়ের করেন। গ্রাহামদের আত্মসাৎ-এর ১১ লক্ষ টাকার একটা বড় অংশ হেস্টিংস পেয়েছিলেন। কাজেই তিনি কাউন্সিলের সভায়—গ্রাহাম-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। এমন কি কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য যখন ব্রজকিশোরকে সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে বাধ্য করেন, তাতেও হেস্টিংস প্রবল

আপত্তি তোলেন। অবশেষে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দেব ১৫ই জানুয়ারী কাউন্সিলের আদেশে ব্রজকিশোরকে বরখাস্ত করা হয় এবং মহারানীর হস্তে সমস্ত এস্টেটের দায়দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

বিষণকুমারীর পরিচালনাকালে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান কৃষ্ণরাম মিশ্র সরকারে দেয় রাজস্ব উসুল দিতে না পারায় শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব জামিনদার হন। কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হয় না। মহারাজ তেজচন্দ্র তাঁর মা বিষণকুমারীর অনুকূলে সমগ্র জমিদারীর বিক্রয় কোবালা সম্পাদন করে দেন। বিষণকুমারী আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে হয়ত অবস্থার সামাল দিতে পারতেন। কারণ Peterson এর মতে "She was a woman of considerable business capacity and she might ultimately have succeeded in saving the whole estate if her life had been prolonged." (Burdwan Gazeetteer 1910).

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের Collectorate Records থেকে জানা যায় রাজপরিবার ক্রমশ দেনায় ডুবতে বসেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জুলাই হেস্টিংসের পরামর্শে শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবকে 'ক্রোকি সাজোয়াল' নিযুক্ত করে বর্ধমানে পাঠানো হয়। নবকৃষ্ণ শতকরা ১২ টাকা সুদে ৯ লক্ষ টাকা কর্জ দেন। কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হয় না। শেষে বর্ধমানের কালেক্টরের প্রস্তাব মত সমস্ত জমিদারীকে ভিন্ন ভিন্ন লাটে ভাগ করে লাট বিক্রয় করা ছাড়া রাজস্ব পরিশোধ করার অন্য পন্থা দেখা গেল না। রাজস্ব বোর্ডও এই প্রস্তাব অনুমোদন করে। জমিদারী বিক্রয় আরম্ভ হল—ক্রেতাদের মধ্যে ছিলেন সিঙ্গুরের দ্বারিকানাথ সিংহ, ভাসতারার ছকুসিং, জনাই-এর মুখুজ্যে পরিবার ও তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। এই ভাবে হুগলী জেলায় কয়েকটি অভিজাত পরিবারের সৃষ্টি হয়।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিসের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়। এই প্রথার ১নং রেগুলেশনের শর্ত অনুসারে মহারাজ তেজচন্দ্র সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। এই চুক্তি অনুযায়ী বর্ধমান জমিদারীর রাজস্ব ধার্য হয় ৪০,১৫,১০৯ সিক্কা টাকা; এছাড়াও সেতু ও বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুলবন্দি বাবদ মহারাজার দেয় ধার্য হয় ১,৯৩, ৭৫১ সিক্কা। রাজস্ব জমা দিতে হত ৩ মাস অন্তর ৪টি কিস্তিতে; কিস্তি খেলাপ রুখতে জমিদারী বিক্রয় ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। জমিদারী বিক্রয়ের বহর দেখে মহারাজা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। মহল খণ্ড খণ্ড

করে বিলি করার ফলে অনেক ইজারাদার খাজনা বন্ধ করে দেয়, রাজস্ব সরকারী কোষাগারে ঠিক মত জমা পড়ে না। তা সত্ত্বেও সরকার থেকে মহারাজকে জোর করে প্রজাদের ওপর কর্তব্য সম্পাদন করতে ও নিজ ব্যয়ে বাঁধ নির্মাণ, পথঘাট মেরামতের জন্য চাপ দেওয়া হয়। এছাড়া মহারাজার সৈন্যবাহিনীর জন্য বৎসরে চার লক্ষাধিক টাকা ব্যয় বরাদ্দ করতে হত। রাজস্ব ঠিকমতো উসুল দিতে না পারলে মহারাজের ওপর নানাবিধ অত্যাচার চালানো হত। তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা, জমিদারীর কিছু অংশ জোর করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা, ব্যক্তিগত পাওনাদারকে দিয়ে তাগাদা দেওয়ান—সরকার থেকে এই রকম পন্থা অবলম্বন করে মহারাজার জীবনকে জর্জরিত করে দেওয়া হত। এত করেও কালেক্টর এক পয়সাও উসুল করতে পারে না। বকেয়ার ওপর বকেয়া জমতে থাকে। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কালেক্টরের রেকর্ড থেকে জানা যায় যে কালেক্টরের দায়িত্বে সুবাদার, জমাদার, হাবিলদার, মেজর, ৮ জন হাবিলদার, ৭ জন নায়েক, ৭৭ জন সিপাহির সৈন্যদের ৫টি ব্যান্ড নিয়ে ছোটখাটো বাহিনী ন্যস্ত ছিল; এদের জন্যে মাসিক ব্যয় হত ৬১৯ টাকা। এই সৈন্যবাহিনী রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কালেক্টর বোর্ডকে লেখেন—I had occasion to send out force to arrest a notorious dakait named Jeebua, who has assembled under him upward of 400 men armed and with whose assistance he committed the most notorious depredations in the pargana of Shergarh and St. pahary, laying waste with five whole villages leading to contributions and plundering the inhabitants একটা সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় তখন জেলায় ২০০০ ডাকাত ছিল।

এই সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য ঠিকমত রাজস্ব জমা দেওয়ার জন্য মহারাজের উপর চাপ বাড়তেই থাকে। এমনকি মহারাজার সম্পত্তি ক্রোক করা হবে বলে মহারাজকে শাসানো হয়। মহারাজ বোর্ডকে জানান—Besides the peons which you have placed over me, for the balance of Magh Kist, you are now increasing my distress and disgrace by proceeding to attach my house and property. এই সময় ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এক বিধ্বংসী বন্যায় বর্ধমানের অধিকাংশ বাড়ী ভেঙে পড়ে, নিকটবর্তী গ্রাম বিধ্বস্ত হয় জলাশয়ের পাড় ও নদীর বাঁধই জনগণের সাময়িক আস্তানায় পরিণত হয়। এর ফলে প্রজাদের কাছ থেকে ঠিকমত খাজনা আদায় সম্ভব হয় না। কিন্তু মহারাজার এই প্রতিবেদনকে সরকার বাজে অজুহাত বলে উড়িয়ে দেন। তবে বোর্ড মহারাজার ওপর রাজস্ব উসুলের জন্য যত চাপ দিতে থাকল মহারাজও তত

কোম্পানীর বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করতে থাকেন। Hunter এর statistical Account of Burdwan-এর বিবরণে দেখা যায়, কোম্পানীর লবণের ব্যবসা মার খাচ্ছে, ওদের একচেটিয়া লবণের ব্যবসায়ে ক্রমাগত বাধার সৃষ্টি হতে থাকে।

'ক্রোকি সাজোয়াল' মহারাজা নবকৃষ্ণও রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কোন উন্নতি ঘটাতে পারলেন না। ফলে ১১৮৮ সালে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। অবশ্য নবকৃষ্ণের পদচ্যুতির ব্যাপারে মহারানী বিষণকুমারী ও দেওয়ান রামকান্তের বিশেষ হাত ছিল—এঁদের ক্রমাগত অসহযোগিতাই মহারাজ নবকৃষ্ণের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। নবকৃষ্ণের পদচ্যুতির পর ২০ বৎসর বয়স্ক মহারাজ তেজচন্দ্র জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নবকৃষ্ণও ছাড়বার পাত্র নয়। এই সময়ে মহারাজা নবকৃষ্ণ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মনোনীত কয়েকজন অসৎ ও উচ্ছৃঙ্খল স্তাবক তেজচন্দ্রকে বিপথে চালিত করতে থাকে। স্তাবকদের পাল্লায় পড়ে মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র দিন দিন বিলাসব্যসনে মগ্ন হয়ে উৎসন্নে যেতে থাকেন,' জমিদারীর কাজে একেবারে অমনোযোগী হয়ে পড়েন। Early collectorate Records-এ এর উল্লেখ আছে এই সময় জেলার কালেক্টর কিনলোচ এক পত্রে তেজচন্দ্রের এই অধঃপতনের বিষয় গভর্নর জেনারেলকে অবহিত করেন। dangerous and intriguing persons have gained the young Raja's confidence and are leading have astray." রাজস্ব আদায় ঠিকমত হয় না, রাজকোষ শূন্যপ্রায়; এদিকে মহারাজার বিলাসব্যসন চরিতার্থের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করতে হচ্ছে। কোম্পানীর ঘরে রাজস্ব বাকী ১,৭৬,৪৬২ টাকা। কোম্পানী বারবার তাগিদ দিয়ে বকেয়া উসুল করতে না পেরে মহারাজকে গৃহবন্দী করে রাখে, মহারাজার ৭টি হাতি, ১২টি ঘোড়া, ১টি উট, ১টি রূপার হাওদা, ১টি সোনার থালা ও বহু মূল্যবান আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করে।

তখন বোর্ডের নির্দেশমত মহারাজ তেজচন্দ্র ও মহারানী বিষণকুমারী পৃথক পৃথকভাবে জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব পান। মহারানীর অংশের দেয় রাজস্ব ছিল ১৯,৯৯,৫৮৩ টাকা ১৩ আনা ১১ পাই ২ কড়ি। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে বিষণকুমারীর মৃত্যু হয়।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র জমিদারী বাঁচাতে কোম্পানীর নিষেধ সত্ত্বেও পত্তনীপ্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি দেখলেন রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি যেমন ইংরেজ সরকারের কাছে চুক্তিতে আবদ্ধ, তেমনি তিনিও যদি জমিদারীকে বিভিন্ন লাটে ভাগ করে এক একটি লাট একটা নির্দিষ্ট রাজস্ব-বৎসরের বিভিন্ন সময়ে তিন মাস অন্তর ৪টি কিস্তিতে আদায় দেওয়ার চুক্তিতে বিভিন্ন ছোট ছোট

জমিদারকে ইজারা দেন, তাহলে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে, তখন কোম্পানীকে চুক্তিবদ্ধ রাজস্ব নির্দিষ্ট দিনে জমা দিতে কোন অসুবিধা হবে না। উপরন্তু পত্তনিদারদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব-এর পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। যে সমস্ত জমিদার এই রকম চুক্তিতে মহারাজার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন, তাঁরা জমিদারীকে কয়েকটি লাটে ভাগ করে দরপত্তনিদারদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন। এই ভাবে দরাদর পত্তনি, সেপত্তনি প্রভৃতি ছোট ছোট এস্টেট সৃষ্টি হবে। এই প্রথাই পত্তনি প্রথা। তবে একটি অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কলকাতার রাজস্ব বোর্ড কখনও এইরূপ চুক্তি স্বীকার করতেন, কখনও বা আইনের নজির দেখিয়ে স্বীকার করতেন না। ফলে defaulter পত্তনিদারদের কাছ থেকে অনেক সময় রাজস্ব উসুল করা বা তাদের জমিদারী নিলামে চড়ানোর বিষয়ে আইনী জটিলতার সৃষ্টি হয়। অবশেষে মহারাজ ও তাঁর দেওয়ান মানগোবিন্দ মুন্সীর চেষ্টায় ১৮১৯ সালের ৮ম আইন হস্তান্তরযোগ্য বলে স্বীকৃতি লাভ করে এবং পত্তনিদারগণ কিস্তি খেলাপ করলে জেলা কালেক্টরের আদালতে পত্তনি নিলাম করিয়ে বকেয়া খাজনা আদায়ের অধিকার আইনী স্বীকৃতি লাভ করে। এই পত্তনিপ্রথা সৃষ্টির ফলে মহারাজার রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দিন দিন বাড়তে থাকে এবং অচিরেই বর্ধমানের মহারাজা বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীরূপে পরিগণিত হন।

After the death of his mother Raja Tejchand invented a device to save the Zamindari from further ruination. The Zamindari was divided into a number of lots called Patni and the rent of these lots wère farmed out to the Patnidars. He also prevailed upon the Government to enact Patni Taluk Sales Act whereby the patnis were liable to be put to auction sales in default of payment of rents by the patnidars (Burdhaman Gazetteer 1994)

মহারাজ তেজচন্দ্রের আটটি বিবাহ—পত্নীদের নাম (১) জয়কুমারী (২) প্রেমকুমারী (২) সেতারকুমারী (৩) তেজকুমারী (৫) কমলকুমারী (৬) নানকীকুমারী (৭) উজ্জ্বলকুমারী ও (৮) বসন্তকুমারী। এদের মধ্যে উজ্জ্বলকুমারী ও বসন্তকুমারীকে মহারাজা জীবনের প্রায় অন্তিমকালে বিবাহ করেন। যখন এদের বিবাহ করেন তখন শেষোক্ত দুইজন প্রায় নাবালিকা ছিলেন। এছাড়া মহারাজার একজন বিদেশিনী রক্ষিতাও ছিল। অবশ্য এরকম ইন্দ্রিয়ের অত্যাচারের মাশুল মহারাজকে শেষ জীবনে দিতে হয়েছিল। এই সমস্ত মহিষীদের মধ্যে উজ্জ্বলকুমারী ছিলেন মৃতবৎসা—৩টি পুত্র শিশু-অবস্থায় মারা যায় আর

চতুর্থটির বেলায় উজ্জ্বলকুমারী ও সদ্যোজাত শিশু উভয়েই মারা যান। একমাত্র নানকীকুমারীর গর্ভে এক পুত্র জন্মায়—প্রতাপচাঁদ এবং তিনিই মহারাজের একমাত্র উত্তরাধিকারী। কমলকুমারীর এক ভাই ছিলেন পরাণচাঁদ (পরাণচন্দ্র) কাপুর—অতিশয় চতুর ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বর্ধমান রাজবংশের 'শকুনি'। পরাণচাঁদের পিতা কাশীনাথ কাপুর লাহোর-এর কোটলি মহল্লা থেকে জগন্নাথ দর্শনে বের হয়ে বর্ধমানে বসতি করেন। সে সময় তার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। পরাণবাবুর মা লোকের বাড়ীতে সূতা বেচতেন। পরাণবাবুও ছোটবেলায় সূতা ও কাপড় বেচতেন। কারও কারও মতে পরাণবাবু কালনায় নীলকুঠিতে চাকরী করতেন। পরাণচাঁদের দুই স্ত্রী, চার পুত্র ও চার কন্যা। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম চুনীলাল। কাশীনাথ এক কন্যা কমলকুমারীকে নিয়ে জগন্নাথ দর্শনে যাবার সময় মহারাজ তেজচন্দ্র তাঁকে দেখে তাঁর রূপে মুগ্ধ হন ও তাঁকে বিবাহ করেন। এখন থেকে পরাণচাঁদ রাজার শ্যালক—এইখান থেকেই পরানচাঁদের ভাগ্যের চাকা ঘোরে। কমলকুমারীর বিবাহের পরই পরাণচাঁদ রাজ এস্টেটে এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন ও শেষে দেওয়ান এবং রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। কুমার বাহাদুরের মা তাঁর শিশু বয়সেই মারা যান, তাই প্রতাপ তাঁর পিতামহীর কাছে প্রতিপালিত হন। ছোটবেলায় তিনি অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুরন্তপনা আরও বেড়ে যায়। তাঁর সাহস ও শক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি কুস্তি লড়তেন, মল্লবিদ্যা, অশ্বচালনাতেও পারদর্শী হন। যদিও বেশীদূর লেখাপড়া শেখেন নাই কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার জন্য পিতার জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব পান। এই বিষয়ে পরাণচাঁদ প্রতিবাদী হওয়ায় প্রতাপচাঁদ কৌশল করে তেজচন্দ্রের কাছ থেকে সব বিষয় লিখিয়ে নেন। এটাই কাল হল। পরাণচাঁদ ও কমলকুমারী দুই ভাইবোন মিলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কমলকুমারী প্রতাপকে দুবার বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। প্রতাপের বিচক্ষণতা ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্য তিনি প্রাণে বেঁচে যান। শেষে ভাইবোনে প্রতাপের মনে এক 'মহাপাপে'র পাপবোধ জাগিয়ে তোলেন যার পরিণতি হয় প্রতাপের এক 'নাম-না-জানা অসুখ' ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রতাপের গঙ্গাযাত্রা। সে এক দীর্ঘকাহিনী, সে কাহিনী পরে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপের 'গঙ্গাযাত্রা' আর সেই বছরেই তেজচন্দ্র তাঁর ৭নং রাণী উজ্জ্বলকুমারীকে বিবাহ করেন।

প্রতাপচন্দ্রের গঙ্গাযাত্রার পরই ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান পরাণচাঁদের ছোট ছেলে চুনীলালকে মহারাজ তেজচন্দ্র দত্তক গ্রহণ করেন। দত্তক নেবার সাত দিনের মাথাতেই পরাণচাঁদের ১১ বছরের মেয়ে বসন্তকুমারীকে তেজচন্দ্র বিবাহ

করেন—এটি তাঁর অষ্টম ও শেষ বিবাহ। এই বিবাহের পাঁচ বছর পরেই দুরারোগ্য যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তেজচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৬ই আগস্ট ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে। পরাণচাঁদ ও কমলকুমারী নাবালক চুনীলালের অভিভাবক হন। মৃত্যুর পূর্বে তেজচন্দ্র কমলকুমারীকে তাঁর উইলের অছি নিযুক্ত করেন। দত্তক পুত্রের নাম হয় মহাতাবচাঁদ।

বহু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েও মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্রের জীবন সুখের হয় নাই। প্রথম জীবনে কোম্পানীর সঙ্গে সংঘাতে তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এমন কি তাঁকে গৃহবন্দীও হতে হয়েছিল। হেষ্টিংস-এর চক্রান্তে তাঁর জমিদারীর এক-একটা অংশ বিক্রি হতে থাকে। শেষে কোম্পানীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও পত্তনি প্রথা প্রবর্তন করে তিনি জমিদারীকে বাঁচান, নিজে বাঁচেন। মহারাজ তেজচন্দ্র ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, প্রজারঞ্জক ও শিক্ষানুরাগী। ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। আনুমানিক ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তেজচন্দ্র তাঁর বাড়ীর 'হাতায়' বর্ধমান রাজ স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সেই স্কুলই আনুষ্ঠানিকভাবে গথিক কাঠামোয় নির্মিত বিরাট বাড়ীতে উঠে আসে। তখন নাম ছিল Anglo-vernacular School; নাম শুনে মনে হতে পারে, এখানে ইংরাজী ও বাংলা দুই-ই পড়ানো হত—কিন্তু আসলে এটি ছিল ইংরাজী মাধ্যম স্কুল—বাংলা যা পড়ানো হত তা নামকো ওয়াস্তে। সে যুগে এ ধরনের স্কুল জেলার কোথাও ছিল না—এমন কি রাজধানীতেও কম ছিল। অবশ্য ইংরাজী স্কুলে আবার অনেক বাধাও ছিল—যোগ্য শিক্ষক ছিল না—ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে—ইংরেজশিক্ষক নিয়োগ করতে হত; তারপর ছিল সংস্কারের বাধা—ইংরেজি শিখলে হিন্দুত্ব লোপ পাবে, ছাত্ররা সব খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। এত বাধা সত্ত্বেও মহারাজা যে সে যুগে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন সেটা তাঁর দূরদর্শিতা ও শিক্ষাবিস্তারের প্রতি আন্তরিক অনুরাগের পরিচায়ক। Anglo-vernacular স্কুলের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন Charles-Du-Bordicux। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরে বর্ধমান রাজ কলেজের উদ্বোধনী বক্তৃতায় কলেজের অধ্যক্ষ W. Billings তাঁর প্রতিবেদনে বলেন—The Burdwan Maharaja's School was established in 1817 by the then Maharaja Tej chand Bahadur as a free School which still continues to be Previous to that time, there was no English School in the district.

হিন্দু কলেজেও তিনি এককালীন বহু অর্থ দান করেছিলেন। মিশনারীরাও শিক্ষা বিস্তারে তাঁর সাহায্য পান। এছাড়াও মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে জেলায় অনেক পাঠশালা ও সংস্কৃত টোল গড়ে উঠেছিল। ১৮৩৭

খ্রীষ্টাব্দে এ্যাডাম সাহেব তাঁর রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন There were 93 Persian and Arabic Schools of which two were supported by the Maharaja of Burdwan (Peterson). জেলার জনহিতকর কাজেও তেজচন্দ্রের অবদান কম নয়। কমলসায়র তাঁর আমলেই কাটানো হয়। বর্ধমানে আলমগঞ্জে বাঁকার সেতু তিনিই নির্মাণ করান। বর্ধমান ছাড়া হুগলী জেলাতেও তেজচন্দ্র অনেক জনহিতকর কার্য করেছেন। চুঁচুড়ায় ইংরেজী বিদ্যালয় তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুন্তীনালার উপর সেতু তিনিই নির্মাণ করান। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর যে রাজ্যসীমানা নির্ধারিত হয়, তাতে দেখা যায় তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল পূর্বে গঙ্গার পশ্চিম সীমানা, দক্ষিণে কংসাবতী ঘাট, উত্তরে মুর্শিদাবাদের দক্ষিণপ্রান্ত এবং পশ্চিমে পূর্ব পঞ্চকোট। শেষজীবনে তেজচন্দ্র শাক্ত ধর্মের প্রতি আসক্ত হন। তিনিই সাধক কমলাকান্তকে চান্নার বিশালাক্ষী মন্দিরের সাধনপীঠ থেকে এনে কোটালহাটে বসতি করান। গৌতম ভদ্র তাঁর জাল রাজার গল্প প্রবন্ধে সঞ্জীবচন্দ্রের উদ্ধৃতি দিয়ে তেজচন্দ্রের দৈনন্দিন জীবনের কিছু কৌতূহলোদ্দীপক খুঁটিনাটি দিয়েছেন। "তেজচন্দ্র পাখি পুষতেন, তাদের খেলা দেখতে দেখতে তিনি ভোরে অন্দরমহল থেকে বার হতেন। দেওয়ান ও রাজকর্মচারীরা রাজদর্শন পেয়ে ধন্য হত। সেই সময় একজন কর্মচারী খাজনার জন্য পাঠানো লক্ষ টাকা চুরির খবর দিলে তিনি খাস হিন্দুস্তানীতে ধমক দিলেন—"চুপ, হামরা লাল ঘাবরাওয়েগা"। এই ঘটনা বিবৃত করে সঞ্জীবচন্দ্র মন্তব্য করেছেন "এক লক্ষ টাকা গেল শুনিয়া তাহার কষ্ট হইল না; কিন্তু কথার শব্দে লালপক্ষী ভয় পাইবে, এই জন্য তাহার কষ্ট হইল।"

গল্পের এই খানেই শেষ নয়, "চোর মোক্তারটি অবশেষে ধরা পড়ল। রাজা তেজচন্দ্রকে সে জবাবদিহিও করে। অবশ্য টাকাটা সে-ই নিয়েছে, কিন্তু সবটাই শিবমন্দির, অতিথিশালা ও পুকুরকাটায় ব্যয় হয়েছে। জমিদারের মেজাজ অমনি শরিফ হয়ে গেল। আর্জি মাফিক তিনি আরও দুহাজার টাকা মঞ্জুর করলেন কারণ তা হলে পুকুরটি প্রতিষ্ঠার খরচও কুলিয়ে যাবে। মোক্তারটি বেকসুর খালাস পেল। "কারণ মোক্তার যাহা করিয়াছে তাহাতে আমার টাকাটি সার্থক হইয়াছে।" (সঞ্জীব রচনাবলী), হয়তো এটি গল্প, হয়তো কিছুটা সত্য কিন্তু এই ঘটনা থেকে তেজচন্দ্রের জনহিতকর কার্যের প্রতি অনুরাগ প্রতিফলিত হয়। ঠিক এই রকম দিলখোশ মেজাজে সালকিয়ার বাবু রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তেজচন্দ্র প্রমুখ চল্লিশ তাসের জুয়াখেলায় মেতে উঠতেন। দেড় লক্ষ টাকা দানে হারা বা জেতা তাঁর কাছে কিছু নয়। পরাণচাঁদের হরিহরমঙ্গল কাব্যে পক্ষীপ্রেমিক

তেজচন্দ্রের দেশবিদেশ থেকে অজস্র পক্ষী আনার কথা আছে। বর্ধমানের রাজবাড়ী ছিল মোগলাই জমিদার। মেদেরা মদে মত্ত থাকা বা বিদেশিনী রক্ষিতাকে নিয়ে স্ফুর্তি করা এই দিলখোশ মেজাজের পরিচয়। সেকালে রাজা-রাজড়াদের এই রকম একটু আধটু দোষ থাকতো—না থাকাটাই দোষের হত। চাঁদেরও কলঙ্ক থাকে।

এর পাশে বিচার করতে হবে তাঁর শিল্পানুরাগ—তাঁর সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা।

কালনা ও নবাব হাটের ১০৯ শিবমন্দিরের শিবক্ষেত্র তাঁরই আমলে মাতা বিষণকুমারী নির্মাণ করান। স্থাপত্যেশিল্পে বিশেষ করে মন্দিরস্থাপত্যে তেজচন্দ্রের অবদান উল্লেখযোগ্য। কালনাব এক বিশালচত্বরের মধ্যে মহারাজা ও কর্মচারীদের আবাসস্থল ও বহুমন্দির সমন্বিত বিশাল রাজবাড়ী—১৭৩১ শকাব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র নির্মাণ করান।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কম নয়। তাঁর দেওয়ান নন্দকুমার রায় শাক্তগীতি রচয়িতা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর পদ অবশ্য বেশী পাওয়া যায় না—কিন্তু যা পাওয়া গেছে তাতেই তাঁর কাব্যপ্রতিভাব পরিচয় মেলে।

"কালীপদ সরোজরাজে সহজে ভৃঙ্গ হও না মন।
পদে মত্ত হও মকরন্দে, মজে সদানন্দ রওনা মন।
মধুর ধারা বহিছে তাঁর চরণে স্মরণ লওনারে মন।।

সাধক কমলাকান্তের সমসাময়িক অধ্যাত্মসঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে তেজচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনাথ রাও-এর নামও উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানের চুপী গ্রামে তাঁর জন্ম। ব্রজকিশোর রায়ের দ্বিতীয় পক্ষের তিনি হলেন মধ্যম পুত্র। নন্দকিশোরের অকাল মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যকে তিনি রাজসভাপণ্ডিত পদে বরণ করেছিলেন। এর মূলেও রঘুনাথের অবদান ছিল। তেজচন্দ্র ধর্মনিষ্ঠ শক্তিসাধক, সাত্ত্বিক এই মানুষটিকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। রঘুনাথও অধ্যাত্ম সাধনায় উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন। তাঁর ৩০ বৎসর বয়স্ক পুত্রের মৃত্যুতেও তিনি ছিলেন নির্বিকার।

উপযুক্ত পুত্রনাশে নাহি শোকলেশ;
অর্থত্যাগে তাহার মহিমা গায় দেশ।।

সংসারের নাগপাশে আবদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য রঘুনাথ মাতৃপদে আকুতি নিবেদন করেছেন—

মা কত কর বিড়ম্বনা,
অজ্ঞানানন্দে রাখি আর দিও না যন্ত্রনা।
অনিত্য সুখে ভুলায়ে, দুঃখার্ণবে ডুবায়ে,
মা হয়ে সন্তানে কত কর বিড়ম্বনা।

(বাঙালীর গান)

মহারাজ তেজচন্দ্র তাঁব সভাপণ্ডিত কমলাকান্তের জন্য বর্ধমান কোটালহাটে গৃহনির্মাণ করে দেন ও তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উপযুক্ত বৃত্তিব ব্যবস্থা করেন। এছাড়া কোটালহাটে কমলাকান্ত প্রতিষ্ঠিত শ্যামামায়ের প্রতিবৎসর মহাসমারোহে পূজার বন্দোবস্ত করে দেন। মহারাজের সময়ে তাঁর শ্যালক-শ্বশুর ও দেওয়ান পরাণচাঁদ কাপুর হরিহরমঙ্গল কাব্যরচনা করেন। কাব্যটিতে তেজচন্দ্রের প্রশস্তি আছে—তাছাড়া আছে বর্ধমান শহরের নামকরণের ব্যাখ্যা—

রাজধানী বর্ধমান যেইহেতু মান্যমান
শুন তার প্রধান কথন।
শ্রীল তেজচন্দ্র রাজ্ঞ যাহে মহামানি বিজ্ঞ
যথা বদ্ধ হৈল মান্যগণ॥
তেঁই নাম বর্ধমান শুনপুন হেতু আন
মানিগণে মানদ রাজন্।
অন্য অন্য দেশী যারা বর্ধমানে আসি তারা
রাজমান পাল্যে মান্য হন॥
সংসারের মানিগণ প্রণিপাত অনুক্ষণ
মহামানি ভূপতির স্থানে।
এতগুণে গুণবান অতএব বর্ধমান
এই অর্থ বুঝ সর্বজনে॥

তেজচন্দ্রের আশ্রিত মায়া দাশের ছদ্মনামে জনৈক কবি, “শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিলাস” দ্ব্যর্থকবোধক কাব্যরচনা করেন। তেজচন্দ্র ও কমলকুমারীর মাহাত্ম্যকথা বর্ণনা করা হয়েছে গ্রন্থটিতে।

তেজচন্দ্রের রাজত্বের প্রথম দিকে—চণ্ডীমঙ্গলের কবি কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে যেভাবে মহারাজ তেজচন্দ্রের প্রশংসা করেছেন তা থেকে অনেকেই মনে করেন কবীন্দ্র মহারাজের পোষকতা পেয়েছিলেন।

মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বর্ধমানে যেন ইন্দ্র
পৃথিবী পালনে যুধিষ্ঠির।
প্রতাপে প্রচণ্ড রবি সভাতে পণ্ডিত কবি
ক্ষেত্রিয় নন্দন রণধীর ॥

মহারাজ তেজচন্দ্রের পোষকতায় বর্ধমান জেলার দেবগ্রামবাসী দ্বিজ কৃপারাম সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেছিলেন।

পীরের মঙ্গলকথা হৈল সমাধান।
নৃপতি তেজচন্দ্রের বাড়ুক কল্যাণ।

কলকাতার সিমুলিয়া নিবাসী কবিওয়ালা হরু ঠাকুরের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তেজচন্দ্র।

মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তকপুত্র মহতাবচাঁদ তাঁর এস্টেটের স্থলাভিষিক্ত হন। এই সঙ্গেই সঙ্গমরায়ের বংশের পরিসমাপ্তি ও বর্ধমান রাজবংশে দত্তক প্রথার সূচনা। ১৪ বছর পর সন্ন্যাসী অলোকশা-এর বেশে প্রতাপচাঁদের পুনরাবির্ভাব ঘটে। কিন্তু পরাণচাঁদের কারসাজিতে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন ও বিচারের শিকার হয়ে তিনি জাল প্রতাপচাঁদ বলে পরিগণিত হন—কিন্তু সে কাহিনী পরে। শকুনি মামার চক্রান্তে কুরুবংশ ধ্বংস হয় আর পরাণমামার ষড়যন্ত্রে সঙ্গমরায়ের বংশ নির্বংশ হলো।

রাজবংশের দত্তক প্রথা সম্পর্কে একটা কাহিনী আছে। কাহিনীটি আমি আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রয়াত তুলসী বোস মহাশয়ের কাছে শুনেছি। কাহিনীটি অলৌকিক ও রহস্যময়; সত্যমিথ্যা বিচারের ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু কাহিনীটির যেভাবে পরিসমাপ্তি ঘটেছিল তার ফল কিন্তু রাজবংশের ইতিহাসে সত্য হয়ে আছে।

সাধক কমলাকান্ত ছিলেন মহারাজা তেজচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ও প্রতাপচাঁদের গুরু। সেই সুবাদে সাধকপ্রবরের নিয়মিত রাজবাড়ীতে আগমন ঘটত। তাঁর সঙ্গে থাকতো কালীসাধনার উপকরণ কারণবারি। এই নিয়ে মহারাজের শ্যালক-শ্বশুর পরাণচাঁদ মহারাজের কাছে অভিযোগ করেন। তেজচন্দ্রের কাছে এমনও অভিযোগ যায় যে গুরুদেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শিষ্য প্রতাপচাঁদ পানাসক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রতাপের পানাসক্তি ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্য মহারাজ তাঁর একমাত্র পুত্রকে একেবারে দেখতে পারতেন না, এমনকি বাক্যালাপও বন্ধ হয়েছিল—অবশ্য এর মূলে ছিল পরাণচাঁদ-কমলকুমারীর চক্রান্ত। তবু মহারাজ পরাণচাঁদের অভিযোগ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অভিযোগ উঠতে থাকায় মহারাজ

স্বয়ং এবিষয়ে পরীক্ষা করতে চাইলেন। সাধক কমলাকান্ত রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতেই মহারাজ তাঁর পাত্রে কি আছে জানতে চাইলে সাধকপ্রবর উত্তর দিলেন 'গব্যদুগ্ধ'। মহারাজ কমলাকান্তের কথায় বিশ্বাস না করে প্রমাণ চাইলেন। সাধকও তৈরী, তিনি মহারাজকে যজ্ঞের আয়োজন করতে বললেন। এই যজ্ঞে তিনি তাঁর 'গব্যদুগ্ধ' থেকে মাখন ও ঘৃত তৈরী করে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে প্রস্তুত হলেন। তিনি মহারাজকে জিগ্যেস করলেন—মহারাজ আমার এই পূর্ণাহুতি বৃথা যাবে না—এর কোপ হয় আপনার বংশের ওপর পড়বে যার ফলে আপনি নির্বংশ হবেন অথবা আপনার সম্পদের ওপর পড়বে—আপনি হবেন নির্ধন। কোনটা চান বলুন? মহারাজ তাঁর পায়ে লুটিয়ে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু কমলাকান্ত অনড়। মহারাজ বললেন—গুরুদেব আমি রাজা, রাজ্যহীন হয়ে বাঁচতে চাই না। আপনি আমাকে নির্বংশই করুন। সাধক পূর্ণাহুতি দিলেন। সেই থেকে সঙ্গমরায়ের বংশ লোপ পেল। আর যেদিন দত্তক মহারাজের বংশ রক্ষা পেল সেদিন মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদের সময় জমিদারী লোপ হলো। মহারাজ তেজচন্দ্রের পর রাজবংশের ইতিহাসই এই কাহিনীর সত্যতার মানদণ্ড।

জাল প্রতাপচাঁদের কাহিনী

[উচ্চরণভেদে প্রতাপচন্দ্র বা প্রতাপচন্দ]

(১৭৯১-১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ)

মহারাজ তেজচন্দ্রের ষষ্ঠ মহিষী নানকীকুমারীর গর্ভে প্রতাপচাঁদের জন্ম ১১৯৮ বঙ্গাব্দের ১০ই কার্তিক (২৪শে অক্টোবর ১৭৯১)। এছাড়া সপ্তম মহিষী উজ্জ্বলকুমারীর গর্ভে চারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে কিন্তু সবকটিই শৈশবাবস্থায় মারা যায়। আর কোন মহিষীর কোন সন্তান হয় নাই। প্রতাপচাঁদ মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্রের একমাত্র উত্তরাধিকারী কিন্তু ভাগ্যদোষে তিনি দীর্ঘ ৬৪ বৎসর জীবিত থাকলেও মহারাজার সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেন নাই—মহারাজের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন মহারাজের দত্তক পুত্র মহতাবচাঁদ। প্রতাপচাঁদের ভাগ্যবিড়ম্বনার কাহিনী আজও রহস্যাবৃত। প্রতাপচাঁদ সঙ্গমরায়ের বংশের শেষ সন্তান কিন্তু রাজপদের শেষ উত্তরাধিকারী নয়।

ভাওয়ালের মেজরাজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণের মত কিংবা মারাঠা সেনাপতি রঘুনাথ রাও-এর মত 'মহাপাপগ্রস্ত' প্রায়শ্চিত্তকামী মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রতাপচাঁদের 'গঙ্গাযাত্রা' এক কুহেলিকাময় রহস্যে ঢাকা।

প্রতাপচাঁদের জন্মের কয়েক বৎসর পরেই তাঁর মা নানকীকুমারী মারা যান। প্রতাপচাঁদ পিতামহী বিষণকুমারী ওরফে বিষণকুমারীর স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হন। পিতামহীর আদরে প্রতাপচাঁদের লেখাপড়া বিশেষ হয় নাই। শৈশবে তাঁর শিক্ষক ছিলেন গোলকচন্দ্র দাস, তাঁর ইংরেজী বিদ্যের দৌড় 'থামস্ ডিস্' পর্যন্ত। তবে ভবিষ্যতে প্রতাপ অবশ্য অনেক সাহেব-সুবোদের সঙ্গে মিশে ইংরেজীটা ভালই রপ্ত করেছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির, যৌবনে তাঁর দুরন্তপনা আরও বেড়ে যায়—রাশটানা দুষ্কর হয়ে পড়তো। প্রতাপচাঁদ কুস্তি করতেন—চেহারাও বেশ শক্তপোক্ত। প্রতাপের বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর পিতামহী বিষণকুমারী মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে বিষণকুমারীর পরিচালিত সম্পত্তি তিনি প্রতাপের নামে হস্তান্তরিত করেন। ১৮১৩ সালে মহারাজ তেজচন্দ্র যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন তখন তাঁর পক্ষে সুষ্ঠুভাবে জমিদারী পরিচালনা সম্ভব হয় না। অবশ্য তাঁর শ্যালক ও পরে শ্বশুর পরাণচাঁদ কাপুর দেওয়ান ছিলেন; অতি সুচতুর ও ধুরন্ধর ব্যক্তি। এই পরাণচাঁদই যত নষ্টের গোড়া—প্রতাপচন্দ্রের অকালমৃত্যু (?) ও জাল প্রতাপচাঁদের কাহিনীর মূলে প্রতাপের এই পরাণমামা—'পরাণমামার দাড়ি পাকানোর' ফলেই সন্ন্যাসী প্রতাপচাঁদের স্বত্বস্বামিত্বের মামলায় 'প্রতাপের পরাজয়, বাঙালীর বিপর্যয়।'

কাজেই এই 'পরাণমামা' কে? কোথা থেকে তাঁর আবির্ভাব—তাঁর উত্থানের ইতিহাস প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

পরাণচাঁদবাবুর পিতা কাশীনাথ কাপুর লাহোরের কোটলিমহল্ল্যা থেকে জগন্নাথ দর্শনে বের হয়ে বর্ধমানে এসে বসতি করেন, তাঁদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। পরাণচাঁদের মা লোকের বাড়ীতে সূতা বেচতেন। লোকে বলে ছোটবেলায় পরাণবাবু লোকের বাড়ী বাড়ী কাপড়ের সূতা বেচে বেড়াতেন। পরে কিছুকাল কালনায় নীলকুঠিতেও কাজ করেছিলেন। পরাণবাবুর এক ভগ্নী ছিলেন নাম কমলকুমারী—বেশ রূপসী। কাশীনাথ যখন একদিন কমলকুমারীকে নিয়ে জগন্নাথ দর্শনে যাচ্ছিলেন তখন মহারাজ তেজচন্দ্র কমলকুমারীকে রাস্তায় দেখে তার বাবাকে ডেকে পাঠান। এরপরই কমলকুমারীর সঙ্গে তেজচন্দ্রের বিবাহ। পরাণবাবু হলেন মহারাজার শ্যালক। তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরলো। পরাণবাবু নীলকুঠির চাকরী ছেড়ে মহারাজের এস্টেটের তদারকি করতে লাগলেন—ধাপে ধাপে ম্যানেজার ও দেওয়ান। পরাণবাবুর দুই স্ত্রী মায়াকুমারী ও প্রেমকুমারী, আর ৮টি সন্তান—চার পুত্র, চার কন্যা। আর দুই ভগ্নী এর মধ্যে

কমলকুমারী ছিলেন তেজচন্দ্রের পঞ্চম রাণী আর দ্বিতীয়া ভগ্নী অম্বিকার বিবাহ হয় গোপালচাঁদ মেহেরার সঙ্গে। আর অম্বিকার কন্যা আনন্দকুমারীর সঙ্গে প্রতাপচাঁদের বিবাহ হয়। পরাণচাঁদ হলেন প্রতাপের মামাশ্বশুর।

প্রতাপ কিন্তু পরাণচাঁদকে একেবারেই দেখতে পারতেন না। ছোটবেলায় নাকি একবার পরাণচাঁদের পাছায় কলকের ছেঁকা দিয়েছিলেন। প্রতাপচাঁদ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর অকর্মণ্য পিতাকে তাঁর অনুকূলে রাজ্য ছাড়তে বলায় তেজচন্দ্র তাঁকে রাজ্য ছেড়ে দেন। প্রতাপ তাঁর দেওয়ান মানগোবিন্দ মুন্সীর সাহায্যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন। এর আগে তেজচন্দ্র রাজস্ব মেটাবার জন্য দেনায় জর্জরিত হয়েছিলেন। তারপর পত্তনি প্রথা চালু করে ও প্রতাপের পরিচালনায় রাজকোষে অর্থ জমতে থাকে। রাজবাড়ীর ঘাটতি বাজেট উদ্বৃত্ত বাজেটে উন্নীত হয়। আট হাজার গ্রামের রাজস্ব বিলি বন্দোবস্তের সর্বোচ্চ দায়িত্বে ছিলেন—মহারাজ প্রতাপচাঁদ। দক্ষতার জন্য প্রতাপ সাহেব-সুবোদেরও তারিফ পেতে থাকেন। ফলে বিমাতা কমলকুমারী ও মাতুল পরাণচাঁদের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র সুরু হয়। ষড়যন্ত্র এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে কমলকুমারী দুবার প্রতাপচাঁদের খাদ্যের মধ্যে বিষ দিয়ে তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা প্রতাপ আগে থেকেই টের পেয়েছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কোর্টে যখন জমিদারীর স্বত্ব নিয়ে 'জাল প্রতাপে'র বিরুদ্ধে মামলা ওঠে তখন 'জাল প্রতাপে'র জবানবন্দীতে সেকথা প্রকাশ পায়। "বিমাতা মহারানী কমলকুমারী আমার পরম শত্রু ছিলেন। আমার বয়স যখন ষোল কি সতের, তখন তিনি দুইবার আহারের সঙ্গে আমায় বিষ দেন। একবার আমি তাহা ফেলিয়া দিই আর একবার তাহা আমি একটা ইঁদুরকে খাইতে দিই। ইঁদুর তাহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মরে। সেই অবধি আমি স্বতন্ত্র পাক করিতাম। পরাণ ও বসন্তলালবাবু আমার সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত সহস্র ফাঁদ পাতিতেন। আমি তাহা হইতে কৌশলে উদ্ধার হইতাম। কিন্তু শেষে তাঁহারা আমার পিতার মন এমন ভার করিয়া দিলেন যে আমি তাহার আর কোন উপায় করিতে পারিলাম না—সেই অবধি আমি অধঃপাতে গেলাম। ক্রমে অধিক মদ ধরিলাম।" মেদেরা মদে সর্বদাই বুঁদ হয়ে থাকতেন। প্রমারা চল্লিশ তাসের জুয়া খেলা সুরু করলেন। তেলেনিপাড়ায় রামধনবাবুর ভদ্রেশ্বরের বৈঠকখানায় মজলিস জমাতেন। দোলের দিন সিঙ্গুরের শ্রীনাথবাবুর সঙ্গে পনের দিন ধরে আবির নিয়ে মাতামাতি করতেন। আবার মেজাজ খারাপ হলে, নেশার মাত্রা একটু বেশী হলে সাহেব ঠেঙ্গাতেও পিছপা হতেন না।

একজন সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে নাকি গাড়ী থেকে নামিয়ে বেধড়ক প্রহার করেছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছেন—"তাঁহার (প্রতাপের) ধারণা ছিল—ধোপা নাপিতের ছেলেরা সিভিল সার্ভেন্ট (Civil Servant) হইয়া এদেশে আসে। সেইজন্য তাহাদের দাম্ভিকতা তাঁহার সহ্য হইত না। একবার তাঁহার সহিত পথে একজন ম্যাজিস্ট্রেট (Magistrate)-এর দেখা হইয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁহার বগী একপাশে লইয়া যায় নাই এবং সেইজন্য তাঁহার দাম্ভিকতা সহ্য হইল না—কি এইরূপ একটা ত্রুটি করিয়াছিলেন। প্রতাপচাঁদের নিকট ইহা বেয়াদবি বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ম্যাজিস্ট্রেটকে নামাইয়া আগাগোড়া বিতাইয়া দিলেন।" তবে প্রতাপের যত রাগ ছিল সিভিল সার্ভেন্টদের ওপর। অন্য সাহেবদের সঙ্গে তাঁর বেশ হৃদ্যতা ছিল। আগেই বলা হয়েছে প্রতাপের লেখাপড়া বেশী দূর গড়ায় নাই। তাঁর শিক্ষক গোলক দাসের ইংরেজী বিদ্যে ছিল থামস ডিস্ পর্যন্ত। কিন্তু সাহেবদের সঙ্গে অধিক মেলামেশার ফলে প্রতাপ অনর্গল ইংরেজী বলতে পারতেন।

প্রতাপচাঁদের দুই স্ত্রী প্যারীকুমারী ও পরাণচাঁদের ভাগ্নী আনন্দকুমারী। অনুপচন্দ্র দত্ত বিরচিত "প্রতাপচন্দ লীলারস প্রসঙ্গ"তে আছে—অজ্ঞাতবাসের সময় তিনি পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং-এর দেওয়ান সুদয়াল সিংহের কন্যা রজনকুমারীকে বিবাহ করেন ও রজনকুমারীর গর্ভে মুলুকচন্দ্র নামে এক পুত্র জন্মে।

দৈব খেলা অনুপম সুদয়াল সিংহ নাম
জনকাংশে ক্ষত্রি কুলোদ্ভব।
রঞ্জিতের প্রিয়পাত্র শ্রীরূপের নেত্রে নেত্র
হেরি মাত্র কি নেত্র উৎসব॥

*** *** *** *** ***

তনয়া রজনকুমারী রামে সমর্পণ করি
জনগণে জানাই ভজন
কুমারীরে করে ধরি রামে সমর্পণ করি
দেওয়ানের প্রেয়সী চতুরা—
বলে লক্ষ্মী সঁপিলাম মনঃ প্রাণ সাধিলাম
ধনুর্ভঙ্গ মিথিলার ধারা॥

রণজিতের রাজদরবারে সুদয়াল সিংহ দূর্বাদলশ্যামরূপ প্রতাপচাঁদের রূপে মুগ্ধ হন ও তনয়া রজনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। অবশ্য প্রতাপচাঁদের এই

তৃতীয় বিবাহ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। জালরাজা যখন শেষ জীবনে মামলায় পরাজিত হওয়ার পর সন্ন্যাসগ্রহণ করে 'সত্যনাথ' নাম নিয়ে শ্রীরামপুরে অবস্থান করছিলেন তখন অনুপচন্দ্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও গুরুর মুখ থেকে তাঁর পূর্ব জীবনের কাহিনী শুনে কাব্য লিখেছিলেন। কাজেই জাল প্রতাপচাঁদের আসল নকল মীমাংসা না হওয়ায় সত্যনাথ-বেশী প্রতাপের বক্তব্য সঠিক বলে মেনে নেবার অসুবিধা আছে।

যাই হোক, প্রতাপচাঁদ তাঁর ২৮ বৎসর পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতেন। তারপর হঠাৎ তাঁর মানসিক বিপর্যয় ঘটে। তাঁর মুখে হাসি চলে গেল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ হয়ে গেল। একমাত্র পারিষদ শ্যামচাঁদের সঙ্গেই যা দু-একটা কথা বলতেন। এই সময়ে চিনারী নামে এক সাহেব চিত্রকর তাঁর প্রমাণ সাইজের তৈলচিত্র আঁকছিলেন। এই সময়ের তাঁর জীবনের কথা হুগলী কোর্টে প্রতাপের (জাল?) জবানবন্দী থেকেই শোনা যাক "ক্রমে অধিক মদ খাইতে আরম্ভ করিলাম। শেষে অদৃষ্ট দোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্যের নিকট স্বীকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব্যবস্থা দিলেন—'এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল—তাহা অশক্তে চতুর্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস। এই সঙ্গে বলিয়াছিলেন এমনভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে যেন সকলেই জানে তুমি মরিয়াছ।' (সঞ্জীব রচনাবলী)। হুগলী কোর্টে জাল মামলায় মির্জা হাদির সাক্ষ্য (January 4, 1839 Cal Monthly Journal Vol. 4 Aug-Sept 1839) থেকে আরও জানা যায় যে প্রতাপের দুই স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও প্রতাপচাঁদের বারদোষ ছিল, সেটাও বংশানুক্রমিক। হুগলী কোর্টে দায়রা মামলার সময় প্রতাপের রক্ষিতা বিলাতি খানুমের কথা ওঠে। বর্ধমানের জজ হেইস সাহেবের কাছে কাশ্মীরী মহিলাটি থাকতেন। পরে তিনি প্রতাপচাঁদের কাছে চলে যান। তাঁকে ভাল করে ফারসী শেখাবার জন্য আট আনা দিন খোরাকিতে প্রতাপচাঁদ মুনশি-ও রেখেছিলেন। অপর সাক্ষী গোপীনাথ দত্তকে দিয়ে বলানোর চেষ্টা হয়েছিল যে সে প্রতাপের আমলা নয় কুট্টন (Pimp), রাজার জন্য মেয়ে যোগাড় করতো। গোপীনাথ অবশ্য এই নির্জলা মিথ্যাটা বলতে অস্বীকার করে। তবে প্রতাপের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যে প্রতাপের এরকম বারদোষের কথা জানা যায় না। কাজেই পরাণচাঁদের চক্রান্তে প্রতাপের চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা হতে পারে। এ সম্বন্ধে গৌতম ভদ্র তাঁর 'জাল রাজার গল্পে' মন্তব্য করেছেন—'সেকালে বড়লোকদের এরকম দোষ না থাকলে মানমর্যাদা থাকতো না—প্রতাপের ইয়ার

দ্বারকানাথ ঠাকুর এ বিষয়ে অনেককে টেক্কা দিয়েছিলেন। উনিশ শতকের বড়লোকের কাছে এটা তো চাঁদের কলঙ্ক।" (পাক্ষিক দেশ ৪.৯.৯৯)

কিন্তু মহাপাপটি কি? যার জন্যে চৌদ্দ বছর অজ্ঞাতবাসের পণ্ডিতি বিধান? এ বিষয়ে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর জাল প্রতাপ গ্রন্থে কুৎসিত ধরণের incestuous ও পাপিষ্ঠার কৌশল বলে প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। Incestuous অর্থে নিকট সম্পর্কিত নারীসঙ্গমজনিত অপরাধ। তাহলে নিকট সম্পর্কিত নারীটি কে? সঞ্জীবচন্দ্র রাজবাড়ীর কর্মচারী জগবন্ধুর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু ক্লু বার করার চেষ্টা করেছেন। প্রতাপচাঁদ একদিন তাঁর বিমাতার ঘরে প্রবেশ করেন। এখন প্রশ্ন এই বিমাতাটি কে? তেজচন্দ্রের তখন ছয় মহিষী—উজ্জ্বলকুমারীর সঙ্গে তখনও মহারাজের বিবাহ হয় নাই, বসন্তকুমারীর তখন পাঁচ বছর বয়স। জয়কুমারী ও প্রেমকুমারী বয়স্কা। সেতাবকুমারী ও তেজকুমারীর কথা বিশেষ জানা যায় না। কমলকুমারীই তখন সর্বেসর্বা—পরাণচাঁদের সঙ্গে ভাইবোন মিলে প্রতাপচাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলেছেন। পরাণচাঁদ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন কাজ তা সে যতই জঘন্য হোক করতে পিছপা নন। তাই মনে হয় পরাণচাঁদের চক্রান্তে প্রতাপচাঁদ এক রাত্রে মত্ত অবস্থায় বিমাতা কমলকুমারীর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। মনুসংহিতার পঞ্চম খণ্ডে চোদ্দবছর অজ্ঞাতবাসের বিধান দেওয়া আছে গুরুপত্নীগামী বা বিমাতৃগামীর ক্ষেত্রে। কাজেই বিমাতৃগামিতার পাপবোধ প্রতাপচাঁদের বিবেককে অনবরত দংশন করছিল। তাই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের উপায় ভাবতে ভাবতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন ও সর্বদাই অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকতেন। পরিশেষে একদিন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান থেকে নিরুদ্দেশ হন। প্রথমে কলকাতার রামরতন মল্লিকেব বাড়ী যান। সেদিন সে বাড়ীতে পুত্রের বিবাহোৎসব ছিল। সেখানে সকলে প্রতাপকে চিনতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপ বরকে একটি হীরের আংটি দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বৃদ্ধ মহারাজ প্রতাপচাঁদ নিরুদ্দেশ হওয়ায় দিকে দিকে লোক পাঠিযে তাঁর একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারীর খোঁজ করতে পাঠান। অবশেষে রাজমহলে প্রতাপের দেখা পেয়ে তাকে ধরে আনে।

যে প্রতাপচাঁদ একদিন বারদ্বারীর ছাদে উঠে নীলপুরের দিকে দূরবীন কসতেন, দেখতেন কখন সেখানকার কুঠীর গেট থেকে একখানা বগী ছুটে বের হয়, আজ তার ছাদ গেল, দূরবীন গেল, জমিদারী গেল, পত্তনি গেল, আত্মীয়-স্বজন গেল, দেশী-বিদেশী বন্ধু গেল, মেদেরা মদ খেল, প্রমারার জুয়া গেল, এখন শুধু একটাই চিন্তা, একটাই মন্ত্র—মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত। নিরুদ্দেশ যাত্রা নিষ্ফল হওয়ায় এই চিন্তা আরও বেড়ে গেল।

"ষড়যন্ত্রের শিকার হলে কিভাবে এক সাহসী, অমায়িক, শিক্ষানুরাগী, দানশীল ও দক্ষ প্রশাসক, তরতাজা যুবক বিপথে চালিত হয়ে জড় পদার্থে পরিণত হতে পারে প্রতাপচাঁদ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রতাপচাঁদ ছিলেন দাতা। পূর্বে রাজবাড়ীতে মুঠি দেবার ব্যবস্থা ছিল, প্রতাপচাঁদই তার পরিবর্তন করে চাল, ডাল, লবণ, তেল প্রভৃতি যে পরিমাণ দ্রব্যে একজন ভিক্ষুকের পূর্ণমাত্রায় দৈনন্দিন আহার সম্পন্ন হতে পারে, তাই দিয়ে সদাব্রতের ব্যবস্থা করেন। প্রতাপ ছিলেন বিদ্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী। বাংলা সাহিত্যের পোষকতায় এবং সংস্কৃত ও ফারসী সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ চর্চায় তাঁর অবদান উপেক্ষণীয় নয়। রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার প্রমুখ অনেকেই তাঁর ঘনিষ্ট ও অনুরাগী। তিনি ছিলেন ধার্মিক ও শক্তির উপাসক, সাধক কমলাকান্ত ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। কমলকান্ত-শিষ্য প্রতাপচাঁদের ভক্তিগীতি রচনায় দক্ষতা ছিল। মনে হয় তাঁর বিরুদ্ধে রাজবাড়ীতে যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হয়েছিল; তার ফলে তাঁর অনেক ভক্তিগীতির অবলুপ্তি ঘটেছে। মাত্র দুটি পদ পাওয়া গেছে—একটি শ্যামাসঙ্গীত, অপরটি হরিবিষয়ক।

শ্যামা সঙ্গীত— আর কারে ডাকবো মাগো ছাওয়াল কেবল
মাকে ডাকে।
আমি এ্যামন ছেলে নই মা তোমার
ডাকবো মাগো যাকে তাকে।

....

হরি বিষয়ক— তোমা বিনে কিবা সুখ আছে মনে এ জগতে
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি মাত্র আরাধিত॥

ইত্যাদি

এহেন প্রতাপচাঁদ পারিবারিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মানসিক ভাবসাম্য হারিয়ে সব সময় এক পাপবোধে বিবেকের দংশন ভোগ করতে লাগলেন। সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছেন, একদিন প্রতাপ শয্যা হইতে উঠিয়া খানসামাকে বলিলেন—'আজ নূতন মহলে স্নান করিব।' খানসামা পয়ঃপ্রণালীতে জল পুরিয়া ফোয়ারা খুলিয়াছিল। বাটীর বাহির হইতে জলের গর্জন শুনা যাইতে লাগিল। প্রতাপচাঁদ তথায় প্রবেশ করিলেন। প্রায় প্রহরেক পরে বহির্গত হইলেন। চক্ষু তখন আরক্ত হইয়াছে। সর্বশরীর কাঁপিতেছে।

অপরাহ্নে রাষ্ট্র হইল প্রতাপের গুরুতর পীড়া হয়েছে। চিকিৎসকরা আসতে লাগল। প্রথমে প্রতাপের প্রিয় চিকিৎসক আসগর আলি; তারপর সিভিল সার্জেন

কুলটার সাহেব এলেন। কিন্তু রোগ নির্ণয় হল না। ডাক্তাররা কোন ব্যবস্থাই করলেন না। প্রতাপ গঙ্গা যাত্রার ব্যবস্থা করতে বললেন। চিকিৎসকরা বললেন—রোগ তো তেমন মারাত্মক নয়, তবে শুধু শুধু গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা কেন? প্রতাপ জিদ্ ধরলেন। তখন কবিরাজ প্রতাপের গঙ্গাযাত্রার আদেশ দিলেন।

গঙ্গাযাত্রার উদ্দেশ্যে বাবো দুয়ারীর গেট থেকে হাতীর হাওদায় চড়িয়ে প্রতাপকে কালনায় নিয়ে যাওয়া হল। গঙ্গাযাত্রার মাধ্যমে প্রতাপের 'মহাপাপে'র প্রায়শ্চিত্ত হবে—হবে আত্মশুদ্ধি। পণ্ডিতি বিধান প্রায়শ্চিত্তের বিধান তুষানল—অশক্তে চতুর্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস কিন্তু এমন ভাবে করতে হবে যেন সকলেই জানে প্রতাপের এক নাম-না-জানা রোগে মৃত্যু হয়েছে। কাজেই ছলনার আশ্রয় নিতেই হয়। কালনার ঘাট থেকে প্রতাপের অন্তর্ধান—শবাধার দাহ—সবটাই ছক-মাফিক। মহারাজ তেজচন্দ্র তখন কালনায় কিন্তু ছেলের গঙ্গাযাত্রায় তিনিও সেখানে নাই। কারণ ছেলের মতিগতি দেখে তিনিও তিতিবিরক্ত। এমন কি প্রতাপের দুই স্ত্রী—প্যারীকুমারী ও আনন্দকুমারীও সেখানে নাই। বঙ্গাব্দ ১২২৭, ২১শে পৌষ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী রাত্রি দেড় প্রহর, পালকী করে প্রতাপচাঁদকে কালনাগঞ্জের টাবি ঘাটে আনা হলো। কানাত দিয়ে ঘাট ঘিরে প্রতাপকে অন্তর্জলি করা হল—কিন্তু অজ্ঞাতবাসে যাবেন, কেউ জানবে না; সবাই জানবে প্রতাপের মৃত্যু হয়েছে, তাকে কালনার ঘাটে দাহ করা হয়েছে। কাজেই সঙ্গের লোকজনদের প্রচুর অর্থ দিলেন, তারা সেই অর্থ ভাগাভাগিতে ব্যস্ত; প্রতাপ কাঠের বাক্স থেকে বের হয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন, সাঁতার দিয়ে ওপারে উঠলেন। সঙ্গের লোকেরা টাকা সামলে চারিদিক খোঁজাখুঁজি করল—গঙ্গায় সাঁতার দিয়ে দেখলো ছোট বাহাদুর কোথাও নাই। শেষে কাঠের বাক্স দাহ করে ফিরে গেল। প্রতাপের "মৃত্যু" হল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় মহারাজ তেজচন্দ্র বর্ধমানের দিকে রওনা হলেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর হুগলীর জজকোর্টে জাল প্রতাপচাঁদের মামলায় সাক্ষীদের জবানবন্দীর পর জজ সাহেবের কাছে প্রতাপ যে স্বীকারোক্তি দেন তার শেষাংশে প্রতাপের অন্তর্ধানের পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "বাড়ী হইতে পলায়ন করার পর রাজমহল হইতে পিতার লোক দ্বারা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে, পিতা মহাশয় পরাণের অত্যাচার ও পীড়নের কথা জানিতে পারিলেন। সেই অবধি তিনি পরাণের ওপর হাড়ে হাড়ে চটিলেন। প্রায়শ্চিত্ত হইল না দেখিয়া পীড়ার ভান করিয়া কালনা গেলাম। কালীপ্রসাদকে বলা ছিল সে ভাউলিয়া লইয়া ঘাটে থাকিবে এবং সংকেতসূচক শাঁখ বাজাইবে। শঙ্খধ্বনি শুনিয়া বিকার রোগীর

ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলাম। এর পর অন্তর্জলি যাত্রার ব্যবস্থা হইলে গঙ্গার পাড়ে আনীত হইলাম। শীতকালের রাত্রে রাজবাড়ী-র লোকেরা তাঁবুতেই ছিল, সে অবসরেই নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া ভাউলিয়ায় উঠি এবং রাত্রিশেষে সেটি মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।"

দ্বিজ কার্তিকচন্দ্র রচিত একটি গাথায় প্রতাপের অন্তর্ধান সম্বন্ধে কিছু বিবরণ আছে। কবির বর্ণনায় কিছু নতুন তথ্যের উল্লেখ আছে।—

শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণায়—

রাজা আজ্ঞা পেয়্যা তখন জত কর্মীগণ।
গঙ্গাজল...করিলা শ্রীজন ॥
শ্রীজন করিযা তখন রাজাকে কহিল।
হাত করি জোড় রাজা গঙ্গ তিরে চল ॥
রাজা বলে জাইব আমি শুনহ বচন।
সিনধুক তৈয়ার করি আনহ এখন।
রাজ আজ্ঞা পেয়্যা তবে সিনধুক গড়িল।
সিন্দুক আনিয়া নৃপতির পাশে দিল।
তাহা দেখি মহারাজ হইল সানন্দ।
বসন্ত বাবু সহিত চলিল ব্রহ্মানন্দ।
গঙ্গাতিরে উপনিত হইল রাজন।
জোড় হাথে প্রণমিল দেবির চরণ ॥
পালাবার পথ নাই রাজা দেখে মনে।
ব্রহ্মানন্দ বসন্তবাবুকে বলি হে কথনে ॥
শুন দুইজন তোমরা আমার বচন।
লক্ষ তঙ্ক ল এ কর দান বিতরণ ॥
দুই জনায় টাকা লয় রাজার সম্মুখে।
কথো বিতরণ করি নিজে কথো রাখে।

এর পরে মহারাজার অন্তর্ধান ও বাক্স পোড়ানর কথা আছে।

অনুপচন্দ্র দত্ত বিরচিত "প্রতাপলীলারস" প্রসঙ্গেও অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায়।

কাষ্ঠের সিন্দুক এক ত্বরা করি আনিলেক
আর এক বাজনিয়া শঙ্খ।
সে শঙ্খ সিন্দুকে রাখি সিন্দুক কম্বলে ঢাকি
লেপন করিল তায় পঙ্ক ॥

অগ্নি দিয়া জ্বালাইল মৃতদাহ গন্ধ হইল।
পরাণের পরাণ হইল স্থির।
প্রবঞ্চক শবদাহ না জানিল অন্যকেহ
প্রাতঃকালে উদয় মিহির ॥

শুদ্ধি ক্রিয়ার মাধ্যমে অসংযমী মদ্যপ প্রতাপচাঁদের সব কলঙ্ক সব 'মহাপাপ' গঙ্গার জলে ধুয়ে গেল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার রাজ এস্টেটের নিয়ম-মাফিক প্রতাপের 'মৃত্যু'র পর তাঁর চিতাভস্ম কালনার সমাজ বাড়ীতে সমাধিস্থ করা হল না—প্রতাপ মৃত্যুর আগে তাঁর দুই স্ত্রীর নামে উইল করেও গেলেন না। প্রতাপের 'মৃত্যু'র পর আনুষ্ঠানিক ভাবে যে কোন আদ্যশ্রাদ্ধ হয়েছিল সে তথ্যও পাওয়া যায় না। প্রতাপের 'মহাপাপ', নাম-না-জানা অসুখ, গঙ্গাযাত্রা, নিরুদ্দেশ, সমাধি, শ্রাদ্ধ সবটাই গভীর রহস্যে ঢাকা।

প্রতাপচাঁদ দানসূত্রে বিষণকুমারী ও পিতার সমস্ত সম্পত্তি পেয়েছিলেন। প্রতাপের 'মৃত্যু'র পর তাঁর দুই স্ত্রী আইনত তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। মহারাজ তেজচন্দ্র প্রতাপের 'অন্তর্জলি'র পর সেই রাত্রে বর্ধমানে ফেরেন ও এসেই দুই স্ত্রীর সমস্ত অলঙ্কারাদি জোর করে তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেন এবং স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি থেকে তাঁদের হটিয়ে দেন।

তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট Hutchinson-এর কাছে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রতাপের দুইরাণী আনন্দকুমারী ও প্যারীকুমারী শ্বশুর কর্তৃক নির্যাতিত হওয়ার অভিযোগ করেন। (J. R. Hutchinson—Judicial—civil No I; 9th March 1821) সেই আবেদনে সংক্ষেপে তাঁদের বক্তব্য ছিল—কমলকুমারীর পক্ষে কোন খারিজনামা স্ব-ইচ্ছায় তাঁরা দেন নাই। রাজবাড়ীর জেনানা মহলে তাঁরা বন্দী। কোম্পানীর কাগজ মোহর সব কিছুই তাঁদের শ্বশুর তেজচন্দ্র কেড়ে নিয়েছেন। স্ট্যাম্পপেপার কেনার তাঁদের সঙ্গতি নাই—তাই সাদা কাগজে আবেদন জানাচ্ছেন। উকিল মোক্তার দেবার প্রশ্নই নাই। সে কারণে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে তাঁরা আবেদন জানাচ্ছেন। ম্যাজিস্ট্রেট হাচিনসনের কাছে তাঁদের প্রার্থনা—(১) বন্দীদশা থেকে মুক্তিদান (২) চিকের আড়াল থেকে হুজুরের নিকট তাঁদের অবস্থা সরাসরি নিবেদন করার সুযোগ (৩) সরকারী হেপাজতে পৃথক বসতবাটীতে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা ও (৪) প্রতাপচাঁদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের দাবী আদালতে তুলতে সাহায্য করা। হ্যাচিনসন অবশ্য

মহারানীদের অনুকূলে রায় দেবার জন্য তাঁদের আবেদন অনুমোদন করে হুগলীর জজের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পরাণচাঁদের কারসাজি আর তেজচন্দ্রের অর্থকৌলীন্যের জোরে ম্যাজিস্ট্রেট হাচিনসনের চেষ্টা সত্ত্বেও জজ ওকলির রায় তেজচন্দ্রের অনুকূলেই গেল। টাকায় কিনা হয়? আদালতের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে তেজচন্দ্রের গোপন আদান-প্রদানের অভিযোগ স্পষ্ট। রানীরা আবার নতুন ভাবে আবেদন পাঠালেন। তাঁদের আবেদনপত্রটি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপচাঁদের মামলা রুজু হবার ঠিক আগে বাংলা কাগজে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হল। অবশ্য প্রতাপচাঁদের সমর্থকদের এতে হাত ছিল—উদ্দেশ্য পরাণচাঁদের মুখোশ খুলে দেওয়া। (Holt Mackenzie -এর কাছে ১৮২৪ এর ২১ জুনের এই আবেদন Judicial criminal J.C তে ১৮২৪ এর ৮ই জুলাই প্রকাশিত হয়)। আবেদনের বক্তব্য এইরূপ—আমাদের সঙ্গে জঘন্য ও নিষ্ঠুর আচরণ করার জন্য তিনি (তেজচন্দ্র) তাঁর অনুচরদের উৎসাহ দিয়েছেন। অপমান করার জন্য সমগ্র জেলা জুড়ে আমাদের নামে অশ্লীল গান গাওয়া হয়েছে।... উচ্চ বংশের যে সব ভারতীয় মহিলারা (SIC) স্বামীর মৃত্যুর পরেও জীবনধারণের বিড়ম্বনার ভাগ্য ভোগ করেন, তাদেরই যদি এইরকম দুরবস্থা হয়, তাহলে না জানি দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা কী শঙ্কার সঙ্গে সেই দিনগুলির কথা ভাবে, যখন স্বামীর মৃত্যু পর বিধবা-দশায় তাদের অশেষ যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করতে হবে? কাদের কাছেই বা তারা প্রতিকারের জন্য যাবে, যখন তাদের চেয়ে উচ্চবর্ণের লোকেরাই কোন ভরসা খুঁজে পায় না? আমরা শুনি যে ইউরোপিয়ানরা মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীদের চিতায় সহমরণকে নিন্দা করেন। সত্যিই এতে খুব আশ্চর্য হওয়ার কি আছে যে মানুষের লোভ ও নিষ্ঠুরতায় নিষ্পেষিত দুঃখময় ভয়াবহ জীবনের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিধবারা মৃত্যুকে একমাত্র উপায় বলে মেনে নিতে বাধ্য হবে।"

রানীদের এই দুটি আবেদন থেকে দুটি জিনিষ স্পষ্ট—শ্যালক-শ্বশুরের হাতের পুতুল মহারাজার চরিত্রের আর এক অন্ধকার দিকের পরিচয় পাওয়া যায় আর তৎকালীন সমাজে নারী জাতির কি অবস্থা ছিল তার সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

যাই হোক, তাঁরা ন্যায়পরায়ণ ও মানবিক এক সরকারের কাছে খাইখরচা চান। বর্ধমান রাজবাড়ি তাঁদের এই শেষ প্রার্থনা শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়।

প্রতাপের বিধবাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায়; মনে হয় আবেদনের মুসাবিদা তাঁরই। কারণ সহমরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের তিনিই পথিকৃৎ, তিনিই উদ্যোক্তা; বর্ধমানের রাজবাড়ী-র সঙ্গে রাজা রামমোহন

রায়ের সম্পর্ক অনেক দিনের। রামমোহনের বাবা রাধাকান্ত রায় মহারানী বিষণকুমারীর খাস দেওয়ান ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রামমোহনের ভাগ্নে প্রতাপচাঁদের দেওয়ান ছিলেন আর ইনিই বউরানীদের হয়ে আদালতে তদ্বির তদারক করেছিলেন। রায় পরিবারের পোষ্টা ডিগবী বর্ধমানের কালেক্টর আর রামমোহনের ছেলে রাধাপ্রসাদ নায়েব সেরেস্তাদার। তিনি বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন যাতে অন্তত গঙ্গামনোহরপুর তালুক বউরানীদের দখলে থাকে। সফল তিনি হন নাই পরন্তু তেজচন্দ্র এর জন্যে তাঁকে অনেক হেনস্তা করেন। এমন কি তাঁর নামে তহবিল তছরূপের মামলা আনেন। রাধাপ্রসাদকে এই মামলা থেকে উদ্ধাব করতে রামমোহনকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

এদিকে প্রতাপের 'অন্তর্জলি'র ২/১ দিন পরেই চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে প্রতাপের মৃত্যু হয নাই—তিনি ছল করে পালিয়েছেন। মহারাজ সবই শুনলেন, কিন্তু কিছু মন্তব্য করলেন না। তাঁর আশা হয়ত প্রতাপ ফিরে আসবে। কিন্তু ঐ বৎসরই বংশরক্ষার দোহাই দিয়ে উজ্জ্বলকুমারীকে বিয়ে করলেন; এটি তাঁর সপ্তম বিবাহ। এদিকে পরাণচাঁদ একের পর এক মতলব ভাঁজছিলেন কি করে মহারাজকে হাতের মুঠোয় আনা যায়, কি করে মহারাজের এস্টেট হাতিয়ে নেওয়া যায়। যখন দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পরও প্রতাপ ফিরে এল না তখন পরাণচাঁদ তাঁর স্ত্রীর অষ্টম গর্ভের সন্তান চুনীলালকে মহারাজের পোষ্যপুত্র করার মতলব আঁটলেন। প্রথমে তেজচন্দ্র মত দিলেন না কিন্তু পরাণ ছাড়বার পাত্র নয়। তিনি তখন স্তাবকতার দ্বারা মহারাজের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বর্ধমান রাজসভার "অন্নদামঙ্গল" ও "হরিহরমঙ্গল" কাব্য রচনা করে মহারাজকে শোনাতে লাগলেন। কাব্যটি শুরু হয় ১২৩২ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ (১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ) ব্রহ্ম বাহুগুণ পাখা কর অবলম্ব, এই সনে প্রথম বৈশাখে গীতারম্ভ ।।

অর্থাৎ কাব্য যখন আরম্ভ হয় তখন মহারাজা দত্তক গ্রহণ করেন নাই বা বসন্তকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহও হয় নাই।

কাব্যটিতে বর্ধমান শহরের নামকরণ প্রসঙ্গে পরাণচাঁদ মহারাজকে একেবারে আকাশে তুলে দিয়েছেন।

রাজধানী বৰ্দ্ধমান যেই হেতু মান্যমান
শুন তার প্রধান কথন।
শ্রীল তেজচন্দ্র রাজ্ঞ যাহে মহামানী বিজ্ঞ
যথা বদ্ধ হইল মান্যগণ ।।

তেঁই নাম বর্দ্ধমান শুন পুন হেতু আন
মানিগণে মানদ রাজন।
অন্য অন্য দেশী যারা বর্দ্ধমানে আসি তারা
রাজমান পাল্যে মান্য হন।
সংসারে মানিগণ প্রণিপাত অনুক্ষণ
মহামানি ভূপতির স্থানে।
এত গুণে গুণবান অতএব বর্ধমান
এই অর্থ বুঝ সর্বজনে ॥

প্রতাপের অন্তর্ধানের সাত বছর পরেও যখন প্রতাপ ফিরলেন না তখন মহারাজ পরাণচাঁদের প্রস্তাব মত আনুষ্ঠানিকভাবে শ্যালক-শ্বশুর পরাণবাবুর অষ্টম পুত্র চুনীলালকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন। দত্তক নেওয়ার সাত দিন পরেই মহারাজ পরাণচাঁদের ১১ বছরের কন্যা বসন্তকুমারীকে বিবাহ করলেন। তেষট্টি বছর বয়স্ক মহারাজের এগার বৎসরের বসন্তকুমারী মহারাজের অষ্টম মহিষী। পোষ্যগ্রহণের পর পরাণচাঁদ ও কমলকুমারী চুনীলালের অভিভাবক নিযুক্ত হলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক কমলকুমারীর অভিভাবকত্বে চুনীলাল ওরফে মহতাবচাঁদকে জমিদার রূপে স্বীকৃতি দিয়ে জেলাশাসককে পত্র দিলেন।

পোষ্যগ্রহণ ও অষ্টম বিবাহের সাড়ে পাঁচ বছরের মধ্যে মহারাজ দুরারোগ্য যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে মহারাজ তাঁর উইলে মহারাণী কমলকুমারীকে অছি করে যান।

মহারাজের মৃত্যুর তিন বৎসর পর ও প্রতাপের অন্তর্ধানের ১৪ বছর পর বর্ধমান গোলাপবাগে আলোক শা নামে এক সুদর্শন সুপুরুষ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে। এস্টেটের পুরাতন কর্মচারীদের মধ্যে কুঞ্জবিহারী ঘোষ (ডঃ মৃগাঙ্ক ঘোষের পিতা), তারাচাঁদ ঘোষ, গোপীনাথ ময়রা ও আরও কয়েকজন সন্ন্যাসীকে নিরুদ্দিষ্ট প্রতাপচাঁদ বলে সনাক্ত করে। ১৪ বছর 'মহাপাপে'র প্রায়শ্চিত্ত করে তিনি এসেছেন বর্ধমান রাজ এস্টেট এবং গদির স্বত্ব দাবী করতে। স্বত্ব অর্থাৎ নিরূপকতা সম্বন্ধেন স্বামিত্বম্—ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকার বিচারে যে কোন ব্যক্তির নিরূপণতাই সম্পত্তিতে তার স্বামিত্বের বা মালিকানার জন্ম দেয়। কাজেই বর্ধমানে হুলুস্থূল পড়ে গেল। পরাণচাঁদের পক্ষে কিছু লোক সন্ন্যাসীকে আমলই দিল না—গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল বলে উড়িয়ে দিল।

পরাণচাঁদ ভাবলেন পাকা ঘুঁটি বোধ হয় ভেস্তে যায়। "পরাণ হয়ে কাবু হাবুডুবু খেতেছে।" কিন্তু প্রশ্ন প্রতাপচাঁদই যদি হবে তবে এত দিন ছিল কোথায়? হুগলী কোর্টে জাল প্রতাপচাঁদ মামলা চলাকালীন এক কাজীর প্রশ্নের উত্তরে প্রতাপচাঁদ ১৪ বছর অজ্ঞাতবাসের সময় কোথায় কোথায় ছিলেন তার একটা ফিরিস্তি দিয়েছেন। গঙ্গাযাত্রার সময় প্রতাপচাঁদ তাঁর নিজের পরিকল্পনামত কাশীনাথের নৌকা যোগে মুর্শিদাবাদে যান, সেখান থেকে ঢাকা হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে চন্দ্রকোটির আদিনাথে একবছর কাটান, তার পর সেখান থেকে বিত্তেশ্বর, ত্রিপুরেশ্বরী ও বানেশনাথ পরিদর্শন করে উত্তর ভারতে কাশী, প্রয়াগ, চিত্রকূট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, প্রভাস, বদরীনাথ, হরিদ্বার, হিন্দুল, জ্বালামুখী, লাহোর, অমৃতসর পর্যটন করে কাশ্মীরে যান ও সেখানে ছ' বছর কাটান। কাশ্মীর থেকে দিল্লী ও সেখান থেকে কলকাতা এবং শেষে বর্ধমান-গোলাপবাগ।

এখানে উল্লেখযোগ্য প্রতাপচাঁদের দৈনন্দিন ডায়েরী রাখার অভ্যাস ছিল। অনেকের মতে তাঁর এই ডায়েরীটি বাঁকুড়ার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করেন তখনই তিনি সেটি কেড়ে নেন, এ ডায়েরী প্রতাপ আর ফেরৎ পান নাই। আবার অনেকের মতে গোয়াড়ি কৃষ্ণলাল নামক এক ব্যক্তির চেহারার সঙ্গে প্রতাপের চেহারার অনেকটা মিল ছিল; তিনি নাকি প্রতাপের নিরুদ্দেশের সময়ে তাঁর ডায়েরীটি হাতিয়ে নেন ও সেই ডায়েরীতে লিখিত বিবরণ থেকে প্রতাপচাঁদের জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে তিনিই জাল প্রতাপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অবশ্য কৃষ্ণলাল সম্পর্কিত তথ্য প্রমাণিত হয় নাই। প্রতাপের ষড়যন্ত্রকারী পরাণচাঁদ—কমলকুমারী গয়রহার চক্রান্তে, উকিলবাবুদের চাপান উতোরে, দুনীর্তিগ্রস্ত আমলা ও বিচারালয়ের কর্মীদের কারসাজিতে, "মামলায় আদালতের নিরপেক্ষতা ও ঐতিহাসিক সাপেক্ষকতার টানাপোড়েনে অনেক পুরানো কাহিনী ভেঙে চুরে নতুন এক বাঁক নেয়।" সেই ভগ্নস্তূপে আসল প্রতাপ চাপা পড়ে—আর জাল প্রতাপ বেরিয়ে আসে।

অনুপচন্দ্র দত্ত বিরচিত 'প্রতাপচন্দ্রলীলা প্রসঙ্গ' কাব্যেও অন্তর্ধানকালে প্রতাপচাঁদের ভারতের এমন কি মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়াতে পর্যটনের বিবরণ আছে আর সেই বিবরণের সঙ্গে প্রতাপের জবানবন্দীর বিবরণের সম্পূর্ণ না হলেও কিছু কিছু মিল আছে।

প্রথমে আসাম রাজ্য ব্রহ্মার মুলুক।
প্রতাপচন্দ্র পরিচয় জানান চুম্বক।

তথা হইতে চলিলেন কামরূপ কামাক্ষ্যা।
যোগযাগে তন্ত্রমন্ত্র আদি করি শিক্ষা।
তদন্তরে দেব রাজা নেপাল ভূপাল।
হেরিয়া নাথ বদরিনাথ সহিত হেমতাল ॥
চন্দ্রশেখর চিত্রকূট হরিদ্বার।
কাশী কাঞ্চি প্রয়াগ অযোধ্যা সরযূ পার ॥
ব্রজধাম বৃন্দাবন গোকুল মথুরা।
মিথিলা জনকপুর দ্বারকা শিঙ্গারা ॥
গোকরণ নাথ জ্বালামুখী বৈদ্যনাথ।
নানাতীর্থ নানাদেশ ভ্রমিয়া পশ্চাৎ ॥
বন উপবন আর পর্বত পাহাড়।
নানা বেশে পরবাসে করিয়া বিহার।
লাহোর গঞ্জার সে মুলুক পেশোয়ার।
সিংহকুল রণজিৎ নাম তার অধিকার।
কাশ্মীর কাবুল চীন কনুজ কান্দাহার।
গৌতগঞ্জ কুটী আন্তমিও (?) শহর।

... ...

মুলতান দিল্লী লক্ষ্মৌ বোম্বাই ইরান।
তুর্কিস্তান মক্কা মদিনা মাধাই ॥

গ্রন্থটির সমাপ্তিকাল ১৩ই অগ্রহায়ণ ১২৪০ (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)। আর জাল প্রতাপচাঁদের মামলা চলে ১৮৩৫–৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। আর জাল (?) প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হয়—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। কাজেই অনুপচন্দ্রের কাব্য প্রতাপের (জাল?) জীবিতকালেই রচিত হয়েছিল। সেকারণে এর খানিকটা বিশ্বাসযোগ্যতা থাকাই সম্ভব।

যাই হোক, আলোক শা নামধারী সন্ন্যাসীবেশী প্রতাপচাঁদ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গোলাপবাগে এসে উপস্থিত হন। তাঁর উপস্থিতির কথা জানতে পেরেই পরাণচাঁদ তাঁকে তাড়াবার জন্য লাঠিয়াল পাঠান ও তাদের নির্দেশ দেন সন্ন্যাসীকে দামোদর পার করে দিয়ে আসতে। প্রতাপচাঁদ বর্ধমানে থাকা নিরাপদ নয় ভেবেই দামোদর পার হয়ে সোজা বিষ্ণুপুর চলে যান ও বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহনের বাড়ীতে ওঠেন। ক্ষেত্রমোহন তাঁকে আগে থাকতেই চিনতেন। তিনি খুবই আদর যত্ন করে

বাড়ীতে আশ্রয় দেন। বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব সরকারের কাছে যে রিপোর্ট দেন সেটি পর্যালোচনা করে জানতে পারা যায় যে তাঁর অজ্ঞাতবাসের সময় প্রতাপ বিষ্ণুপুরের তখনকার জমিদার গোপাল সিংহের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন আর সেই সময়েই ইলিয়ট সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ইলিয়ট সাহেব প্রতাপচাঁদের বক্তব্য শুনে তাঁকে কলকাতায় গিয়ে সেখানকার সব রইস ব্যক্তিদের ধরে তাঁর দাবী আদায়ের চেষ্টা করতে পরামর্শ দেন। এছাড়া মানভূমের লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যানিংটন ও দুঁদে পলিটিক্যাল এজেন্ট উইল-কিনসনের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে ঐ বৎসরের মাঝামাঝি প্রতাপ ওরফে 'আলোক শা' মানভূমের পাচেতের জমিদার বাড়ীতে থাকতেন। সেখানকার রানী সন্ন্যাসীর খুব ভক্ত হয়ে পড়েন ও তাঁর দৈনিক সেবার বরাদ্দ করেন ২৫ টাকা, কিন্তু সন্ন্যাসী আলোক শা দশটাকাতেই খুশী। হ্যানিংটনের রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায় যে পাচেতে থাকার সময় গুজব ওঠে যে সন্ন্যাসী নাকি পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিত কেশরীর জামাই—যে কোন সময় তাঁর দাবীর সমর্থনে সন্ন্যাসীর শ্বশুরবাড়ী থেকে চল্লিশ হাজার লোক এনে সন্ন্যাসীকে বর্ধমানের গদিতে বসিয়ে দিয়ে যাবে। নেপালের রাজার সঙ্গেও নাকি দূত বিনিময় চলছে। মানভূমে আদিবাসী আন্দোলনে মদত দেবার জন্য পাচেতের জমিদারের দুর্নাম তো আছেই তার ওপর সন্ন্যাসীর আগমনে সে আন্দোলন আরও জোরদার হতে পারে। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও পশ্চিমা গিরিপুরী দলের হাঙ্গামার স্মৃতি হয়তো হ্যানিংটন সাহেবকে সন্ন্যাসী আলোক শা-এর উপস্থিতিতে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল। কাজেই হ্যানিংটন সাহেব সরকারের কাছে সন্ন্যাসী সম্পর্কে সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করে সরকারের কাছে সন্ন্যাসীর রিপোর্ট পাঠান। কাজেই সন্ন্যাসী আলোক শাকে মানভূম ত্যাগ করতে হয়। এরপর তাঁর কলকাতা হয়ে বর্ধমান ও বর্ধমান থেকে বিষ্ণুপুরে আগমন।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারী প্রতাপচাঁদ ওরফে আলোক শা বাঁকুড়া শহরে মিছিল করেন—মিছিলে কাড়া নাকড়া নিয়ে আদিবাসীরা তরবারি নিয়ে যোগ দেয়। বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। মানভূমের আদিবাসী হাঙ্গামার মত এখানেও আদিবাসীদের হাঙ্গামার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সন্ন্যাসীকে মিছিল করতে নিষেধ করেন। সন্ন্যাসী তখন বাঁকুড়া থেকে ছয় ক্রোশ দূরে বলগড়া গ্রামে আস্তানা গাড়েন। ১৪ই জানুয়ারী মিলিটারী ফৌজ নিয়ে ইলিয়ট সাহেব সন্ন্যাসীকে এ্যারেষ্ট করেন ও তাঁকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর অপরাধটা কি সেটা তাঁকে

জানান হল না। পরে চুঁচুড়ার কমিশনার তাঁকে জানান সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে charge হবে of Political character অর্থাৎ seditions পর্যায়ের, সাধারণ ফৌজদারী-দেওয়ানী আইনের আওতার বাইরে।

এদিকে লাঠিয়াল দিয়ে 'আলোক শা'কে দামোদর পার করিয়ে দিয়েও পরাণবাবু কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। চর দিয়ে জাল রাজার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখেন—কারণ জালরাজা তাঁর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। জালরাজাকে আদিবাসী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে জেল হাজতে পাঠানোর ব্যাপারে পরাণবাবুর চক্রান্ত কাজ করেছিল। বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট দেখলেন বাঁকুড়া বা বর্ধমানে জালরাজার স্বপক্ষে অনেক সাক্ষী মিলবে। তাই পরাণবাবু বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়ট ও বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট-জেমস ওগিলবিকে হাত করে বন্দী প্রতাপের বিচারের জন্য হুগলী কোর্টে পাঠিয়ে দিলেন। টাকায় কি না হয়?

প্রতাপের তরফ থেকে বড়লাট অকল্যান্ডের কাছে আবেদন করা হয়। আবেদনের মর্ম হচ্ছে—প্রতাপচাঁদ বর্ধমানের রাজা—ইনি কখনও ইংরাজ বিরোধী হতে পারেন না। রাজা যখন-তখন সন্ন্যাসীর বেশে থাকলেও রাজা—কাজেই অস্ত্রশস্ত্র থাকতেই পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে হুগলী কোর্টে প্রতাপকে কৌঁসুলি নিযুক্ত করার ও সাক্ষীব জবানবন্দী নেবার সুযোগ না দিয়েই বিচার হয়ে গেল—ছয় মাস জেল ও মুক্তির পর ফের জামিন চল্লিশ হাজার টাকা, অনাদায়ে আরও দণ্ডভোগ। কলকাতা নিজামত আদালতে আপীল করেও জজের রায়ই বহাল রইল। প্রতাপের অপরাধ কিন্তু প্রতাপ মিছিল করে বিষ্ণুপুর থেকে কুচকাওয়াজ করে আসছিলেন—এর ফলে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা। এই অপরাধের শাস্তি। রাজা মাথা পেতে নিলেন। কিন্তু মুক্তির পর ৪০০০০ টাকার জামিন চাই? সে টাকা কি ভাবে যোগাড় হবে?

রাজকৃষ্ণ ও গোপীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ২৪ পরগনার বর্ধিষ্ণু তালুক গৌরীপুর বাঁধা দিয়ে জামিনের টাকা তুললেন। ১৮৩৭ সালটাই প্রতাপচাঁদের বাঁকুড়া ও হুগলী জেলেই কাটে। ১৮৩৯ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তাঁর জেল থেকে মুক্তি পাবার দিন—সেদিন অর্ধোদয় যোগ; হাজার হাজার লোক পুণ্যার্জনে গঙ্গাস্নানে এসেছেন। বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটের রাজাও গঙ্গাস্নানে এসেছিলেন, কাজেই তাঁরাও জেল গেটে হাজির। সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণনায়—"যখন জেলখানা হইতে জাল রাজা বহির্গত হইলেন, অমনি হাতীর ওপর নহবৎ বাজিয়া উঠিল, দূরে কাড়ানাকড়া বাজিতে লাগিল; চারিদিকে হরিবোল পড়িয়া গেল, তিন চারি দল ইংরাজী বাদ্য বাজাইতে লাগিল। সকলে জাল রাজাকে মহাসম্ভ্রমে সুখাসনে বসাইলেন, বাহকেরা

সুখাসন স্কন্ধে তুলিল, চারজন বালক চামর ব্যজন করিতে লাগিল, শত শত পতাকা দুলিতে দুলিতে আগে চলিতে লাগিল।”

বাহকের কাঁধে চড়ে জাল রাজা গোটা নগর পরিক্রমণ করলেন। তারপর স্টীমারে জালরাজা কলকাতায় এলেন। মুক্তির শর্ত হিসেবে এক বছর এখানেই থাকতে হবে। এইখানে মামলার প্রথম রাউণ্ড শেষ। পরাণচাঁদবাবু এবার দ্বিতীয় রাউণ্ডের জন্য তৈরী। রাজামশাইও সাক্ষী-সাবুদ যোগাড় করতে লাগলেন—কারণ প্রতিপক্ষ শক্ত, তার ওপর প্রতিপক্ষের আছে টাকার জোর। প্রতাপচাঁদ এখন কলকাতায় রাধাকৃষ্ণ বসাকের বাড়ীতে অধিষ্ঠান করছেন। রাজা সাহেবকে দেখবার জন্য বসাক মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতিদিনই মেলা বসছে। রাধাকৃষ্ণ বসাক ছিলেন সরকারী তোষাখানার দেওয়ান—কলকাতার একজন নামী সমাজপতি। জালরাজার দ্বিতীয় রাউণ্ডের মামলা রুজু করতে টাকা দরকার—রাধাকৃষ্ণ তিন বছরের মেয়াদে ১৬ হাজার টাকার হুণ্ডি কাটলো। প্রতাপ জিতলেই সুদে আসলে উসুল তো হবেই—অন্যান্য উপরি পাওনাও ঘটবে। কৌঁসুলি হিসেবে দ্বারকানাথ ঠাকুর তো প্রতাপচাঁদের প্রাণের দোস্ত। কৌঁসুলি টার্টনের মাধ্যমে দ্বারকানাথের শরণাপন্ন হন। কিন্তু পরাণবাবু আগে থাকতেই তাঁকে হাত করেছিলেন। কাজেই দ্বারকানাথ এবার বেসুরো গাইলেন। জগতে সবাই টাকার গোলাম—বন্ধুত্বটা কিছুই নয়। দ্বারকানাথ রাধাকৃষ্ণকে বেগ দিয়ে বলেন—‘আলোক শা ডাঁহা জালিয়াত, তাকে সাহায্য করা বাতুলতা।’ ইতিমধ্যে জাল রাজার পোষ্টা রাধাকৃষ্ণ বসাক ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। রাধাকৃষ্ণ বসাকের বাড়ীতে অবস্থান করার কয়েক মাস পরে প্রতাপের হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর কলকাতার সম্পত্তির স্বত্ব দাবী করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করলেন। সন্ন্যাসীর পক্ষের উকিলদের পরামর্শে তিনি যে প্রতাপচাঁদ সেটা প্রমাণ করবার জন্য নৌকাযোগে বর্ধমানের পথে রওনা হলেন। আসার পথে যেখানেই তিনি নৌকা থেকে নামেন সেখানেই হাজার হাজার লোক সমবেত হয়ে তাঁর দর্শনার্থী হন। বর্ধমান পর্যন্ত তাঁকে যেতে হল না, যাত্রাপথেই বে-আইনীভাবে লোক জমায়েত করার অভিযোগে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে হুগলী হাজতে চালান করা হয়। তাঁর সঙ্গে আরও ২৯৪৩ জনকেও গ্রেপ্তার করে বর্ধমান হাজতে পাঠানো হল।

যথা সময়ে হুগলী কোর্টে বিচার আরম্ভ হল। বে-আইনী ভাবে লোক জমায়েত করে শান্তিভঙ্গের অভিযোগের সঙ্গে সরকারের তরফ থেকে আরও অভিযোগ আনা হল। সন্ন্যাসী তাঁর আসল নাম গোপন করে অসৎ অভিপ্রায়ে প্রতারণার উদ্দেশ্যে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করেছেন।

সাক্ষীদের জবানবন্দী আরম্ভ হবার আগেই প্রতাপচাঁদ exhibit হিসেবে আদালতে পেশ করার জন্য ইউরোপিয়ান চিত্রকর চিনারী সাহেবকে দিয়ে আঁকানো তাঁর দৈর্ঘ্যের প্রমাণ মাপের অয়েল পেন্টিংখানি আনালেন।

সরকারের পক্ষে সাক্ষী দিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, সরকারের সেক্রেটারী এইচ. টি. প্রিন্সেপ, বোর্ডের মেম্বর জেমস প্যাটেল, তাছাড়া বর্ধমান রাজবাড়ীর আরও ১৫ জন কর্মচারী। কলকাতার সাক্ষীদের বক্তব্য সন্ন্যাসী প্রতাপচাঁদ নন—এটা সকলে ভালভাবেই জানেন। আর রাজবাড়ীর সাক্ষীদের বক্তব্য আসল প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হয়েছে—তাঁরা তাঁর দাহকার্যের সময় শ্মশানে ছিলেন।

আসামী সন্ন্যাসীর পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন অনেক ইংরেজ সাহেব, মেম, চন্দননগর ও ফরাসডাঙ্গার কয়েকজন ফরাসী। তাঁদের বক্তব্য তাঁরা সকলেই প্রতাপকে চেনেন—এই সন্ন্যাসী যে আসল প্রতাপচাঁদ তাঁরা হলপ্ করে বলছেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে আরও অনেক সাক্ষীকে সমন করা হয়েছিল। কিন্তু তারা অনেকেই হাজির হন নাই। খুব সম্ভবত তাঁদের হাজির হতে দেওয়া হয় নাই। এমন কি প্রতাপের দুই স্ত্রীকেও ২ বার সমন করা সত্ত্বেও তাঁরাও হাজির হন নাই। তাঁদেরকে চিকের আড়াল থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তাতেও তাঁরা হাজির হন নাই। তাঁদের বোঝানো হয়েছিল যে তাঁরা যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে লোকে তাঁদের নামে কলঙ্ক রটাবে যে তাঁরা বৈধব্য ঘোচাবার জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়ে সন্ন্যাসীর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

উভয়পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী হবার পর, প্রতাপ নিজে জজের নিকট জবানবন্দী দেন। তাতে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে পরানচাঁদবাবু ও বিমাতা কমলকুমারীর ষড়যন্ত্র থেকে আরম্ভ করে গঙ্গাযাত্রা পর্যন্ত আনুপূর্বিক ঘটনা বলে যান। শেষে তিনি বলেন তাঁর যদি মৃত্যুই হবে তাহলে তিনি কি তাঁর স্ত্রীদের জন্য সম্পত্তির উইল করে যেতেন না? তাছাড়া চিনারী সাহেবের অঙ্কিত তৈলচিত্রটি দেখিয়ে বলেন তিনি মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আগে থেকে নিরুদ্দেশ যাত্রার পরিকল্পনা করেছিলেন তাই নিজের দৈর্ঘ্যের একেবারে সমান মাপের এই তৈলচিত্র অঙ্কন করান। কারণ তিনি জানতেন তাঁর চোদ্দ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর এই রকম মামলা মোকদ্দমা হতে পারে। দীর্ঘ চোদ্দ বছরে তাঁর বয়সের যে কোন লোক মোটা বা রোগা হতে পারে কিন্তু দৈর্ঘ্যে এক চুলও ইতরবিশেষ হয় না। তার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি তৈলচিত্র প্রদর্শন করান। কিন্তু তৎকালীন দুর্নীতিগ্রস্ত বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রকৃত তথ্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয়। দুর্জনের ছলনার অভাব হয় না। তাহলে আর মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হত না।

বিচার শেষ হল, বে-আইনীভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার অপরাধে সন্ন্যাসীর এক হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাস কারাদণ্ড।

আদালতের বিচার শেষ—আদালতের বিচারে প্রতাপ দোষী, কালনার লোক-জমায়েত করার লোক প্রতাপকে কড়কে দেবার জন্য এক হাজার টাকা জরিমানাই যথেষ্ট। কিন্তু তার সঙ্গে আর একটা 'পুনশ্চ' যুক্ত হল—ভবিষ্যতে প্রতাপের নামে কোন আর্জি গ্রহণ করা হবে না। এই নাম কারও পক্ষে গ্রহণ করাটাই আইনত দণ্ডনীয়। (নিজামত আদালতের প্রেসিডেন্সি কোর্টের ১৮৩৯ সালের ১৩ই জুনের রায়ের অংশ CMJ)

প্রতাপের বিরুদ্ধে দুটো মামলা—ফৌজদারী ও দেওয়ানী। লোকজমায়েত করা ফৌজদারী অপরাধ আর নাম জাল করে সম্পত্তির স্বত্ব দাবী দেওয়ানি মোকদ্দমার আওতায়। প্রতাপ ফৌজদারীতে রেহাই পেলেন কিন্তু দেওয়ানীর রায় মোক্ষম, একেবারে বজ্রশেল—দেওয়ানিতে মামলা রুজু করার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল। দায়রা বিচারে জনাকয়েক সাক্ষী হাজির করেই তাদের জবানবন্দী নিয়েই মামলার ফয়সালা হয়ে গেল। ভাগ্যের ফেরে সরকারী প্রভাবে পরাণচাঁদের টাকার খেলায়, আমলাদের কারচুপিতে ফৌজদারী মামলায় দেওয়ানী দাবির নিষ্পত্তি হয়ে গেল। ইংরেজ সরকারের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে এ এক বিরল নজির হয়ে রইল। (CMJ Aug 1839)।

আদালতের বিচার টাকার জোরে ওলটপালট করা যায়। আমলাদের প্রভাবে হেরফের হতেই পারে; মহারাজ নন্দকুমারেরও হয়েছিল। তাকেও দলিল জাল করার মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়েছিল। প্রতাপকে জাল রাজাসাজার মিথ্যা অপরাধে জমিদারীর স্বত্ব থেকে চিরতরে বঞ্চিত করা হল। কিন্তু লোকের বিচার? তার মুখ বন্ধ করবে কে? টাকার জোরে ২/১ জনের মুখ বন্ধ করা যায় কিন্তু হাজার হাজার আমজনতার মুখ বন্ধ করা টাকা দিয়ে সম্ভব নয়। জনগণের রায়ে মহারাজা নন্দকুমার শহীদ, জনগণের রায়ে মহারাজ প্রতাপচাঁদ মহারাজ তো বটেই তিনি দেবতা। গৌতম ভদ্রের ভাষায় আদালত আঙিনার বাইরে প্রতাপচাঁদের দাবি ও আদালতের রায় নিয়ে বাদানুবাদ চলছিল, তৈরী হচ্ছিল দেশজ লোকমতের ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে যুক্তি কাজ করে, বিচার বিতর্ক চলে, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার জায়গাও থাকে। ...সঞ্জীবের বক্তব্যে আদালতে ব্যাভিচারের অনুমাপক এই লোকমত, যার সামাজিক ফলও উপেক্ষণীয় নয়। এই লোকধারণা বাঙালীর নিজস্ব মতামত। কারও মতে প্রতাপচাঁদের সঙ্গে রণজিৎ

সিং-এর ষড়যন্ত্র আছে, তাই কোম্পানী ভীত, যেনতেনপ্রকারে তাই প্রতাপকে হারাতেই হবে। অদৃষ্টবাদী হিন্দুরা প্রতাপচাঁদের অদৃষ্টকে দোষারোপ করেছে। আবার কারও কারও মতে পরাণবাবুর কেনা সাহেবদের কারসাজিতে প্রতাপের পরাজয়। আর সকলেই "কোম্পানীর বিচারের ওপর শ্রদ্ধা হারাল। লোকের হৃদয়ে তিনি রাজাধিরাজ। লোকে যারে বড় বলে বড় সে হয়।"

"হেরো রাজা কিন্তু এক ক্ষেত্রে বাজী জিতেছেন, ভিন্ন সামাজিক সত্তায় তিনি ভাস্বর। তিনি ধর্মপ্রণেতা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শালগ্রাম শিলার ন্যায় সর্বদা ঝারায় বসিয়া থাকিতেন, লোকের সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি লইতেন, পূজা গ্রহণ করিতেন, বৈকালি খাইতেন।"

সন্ন্যাসী গুরুদেব প্রতাপচাঁদের শিষ্য অনুপচন্দ্র তাঁর গুরুদেবের লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রতাপচাঁদকে ভগবানের অবতাররূপে বর্ণনা করেছেন। ভক্তদের আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে কলির ম্লেচ্ছ অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ধমানপুরীতে প্রতাপচন্দ্র রূপে আবির্ভূত হবেন।

ব্রহ্মাদিদেবগণ যে মায়ায় মুগ্ধমন
সে করণ কে বুঝিতে পারে?
সত্ত্বগুন দূরে গেল রজতম উপজিল
বলে ভাল সামান্য আকারে
পুরী বর্দ্ধমানধাম প্রতাপচন্দ্র যার নাম
সেই বুঝি হবে কহ সত্য।

শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসবাণী তাঁর ভক্তগণকে—

কলির কল্পের ভোগ অল্পদিন আর
ইতিমধ্যে হইব আমি পুনঃ অবতার ॥

প্রতাপ কলির অবতার। তিনি গৌররূপে বাংলার ম্লেচ্ছ নিধনে অবতীর্ণ হবেন। নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হবেন মুর্শিদাবাদের নবাব। "ভাগীরথী কুলে মিলন দুইজনে।" ম্লেচ্ছ আদালতের বিচারে প্রতাপ পরাজিত, কিন্তু লোক আদালতে প্রতাপ মহারাজাধিরাজ। ভক্তের কাছে ভগবানের অবতার।

অথ মহারাণী বসন্তকুমারী কথা :

জাল প্রতাপচাঁদের মামলা চলাকালীন মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্রের রাজপরিবারের আর এক পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিয়ে লোকমুখে এমন কি

কাগজেপত্রেও হইচই শুরু হয়। এই হইচই এর কেন্দ্র মহারাণী বসন্তকুমারী। বসন্তকুমারী ছিলেন "বৃদ্ধস্য বালিকা ভার্য্যা"। বসন্তকুমারী মহারাজ তেজচন্দ্রের অষ্টমা মহিষী। মহারাজা তাঁর ৬৩ বৎসর বয়সে পরাণচাঁদ কাপুরের ১১ বছরের কনিষ্ঠা কন্যা বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেন। এর ৭ দিন আগেই তিনি পরাণচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র বসন্তকুমারীর ভাই চুনীলালকে দত্তক গ্রহণ করেন। মহারাজের দত্তক পুত্রের নাম হয় মহতাবচাঁদ বাহাদুর—বর্ধমান রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী—'শাহাজাদা'। মহারাজ তেজচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট। ষোড়শী বসন্তকুমারী তখন পূর্ণ যৌবনা—অপরূপা সুন্দরী। মহারাজা তেজচন্দ্র যখন চুনীলালকে দত্তক নেন, "তখন এরূপ সঙ্কল্প ছিল যে বসন্তকুমারীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে ইনি কতক মুদ্রা ও জমিদারীর মধ্যে একটা লাট প্রাপ্ত হইবেন, নচেৎ ইহারই (দত্তকপুত্র) সব হইবে।" কিন্তু যৌন রোগগ্রস্ত তেজচন্দ্রের ঔরসে ও নাবালিকা বসন্তকুমারীর গর্ভে কোন সন্তান জন্মে নাই—হওয়ার আশাও ছিল না। বসন্তকুমারীর ভাগ্যে রাজমাতা হবার দুর্লভ সম্মান ছিল না। তবে মহারাজা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বসন্তকুমারীর ভরণ-পোষণের জন্য তাঁর নামে কলকাতার বাড়ী, চীনাবাজার-এর সম্পত্তিসহ বর্ধমানের কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জীবনস্বত্ব হিসাবে দান করে গিয়েছিলেন। কিন্তু একটা প্রবাদ আছে—দাতায় দিলেও বিধাতা বাদ সাধেন। বসন্তকুমারীর বিধাতা স্বয়ং তাঁর পিতা পরাণচাঁদ কাপুর ও পিসীমা তথা সপত্নী কমলকুমারী। বসন্তকুমারীর দানপত্র সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে অধিকার অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়াল পরাণচাঁদ ও কমলকুমারী; তাঁদের অজুহাত বসন্তকুমারীর এখনও একুশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই—আইনত তিনি নাবালিকা অতএব সম্পত্তিতে তাঁর কোন অধিকার জন্মে নাই।

বসন্তকুমারী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও সাহসী। কাজেই পরাণচাঁদের ভয় হল যদি তাঁর মেয়ে কোন আইনী ব্যবস্থা নেয়! তাই তাঁকে আপাতত রাজবাড়ীর জেনানা মহলে গৃহবন্দী করে রেখে দেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তকুমারীর ২১ বৎসর পূর্ণ হয়। তখন তিনি তাঁর কলিকাতাস্থ বাড়ী, চিনাবাজারের সম্পত্তি ও দানপত্র মূলে প্রাপ্ত বর্ধমানের অন্যান্য সম্পত্তির অধিকার অর্জনের জন্য বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ সাহেবের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু তখনকার আমলারা সব পরাণচাঁদের হাতের মুঠোয়। বসন্তকুমারীর উকিল ছিলেন W. N. Hazar সাহেব। তিনি বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য বর্ধমানে এলে তাঁকে বসন্তকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় নাই। এই নিয়ে চারিদিকে হইচই শুরু হল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ সমাচার দর্পণে সংবাদ প্রকাশিত

হলো—"বোধ হইতেছে—এই ক্ষণে শ্রীযুক্ত পরাণচাঁদবাবু ও শ্রীমতী বড়রানী কমলকুমারীর উদ্যোগে শ্রীমতী রানী বসন্তকুমারী নজরবন্দী আছেন। অতএব শ্রীযুক্ত হেজর সাহেব বর্ধমানে গমন করিলেও ঐ রানীর সহিত কোনরূপ কথোপকথন হইতে পারিল না।" বসন্তকুমারী হাল ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি জজের কাছে আবেদন করে মোক্তারদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি আদায় করেন। তাছাড়া রাজবাড়ী ছেড়ে পৃথক বাসায় গোলাবাড়ীতে থাকার বন্দোবস্ত করেন। পরাণচাঁদ সেখানেও পাহারা বসান। বসন্তকুমারী শাঁসাল রানী—বর্ধমানের জমিদারীর আয় আছে, কলকাতার সম্পত্তি আছে। তার ওপব বসন্তকুমারী যুবতী, অপরূপা সুন্দরী, বিধবা। কাজেই কলকাতার কিছু রইস ব্যক্তি ও আইনজীবী এ সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেক আইনজীবী বসন্তকুমারীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ডিরোজিও-শিষ্য ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের অন্যতম উৎসাহী সদস্য বিপত্নীক দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই সুযোগে বসন্তকুমারীর সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সাহায্যে বসন্তকুমারী গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে কলকাতায় পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পথে তিনি ধরা পড়েন ও আবার গৃহবন্দী হন। দক্ষিণারঞ্জন কলকাতার একজন রইস ব্যক্তিত্ব। তাঁর চেষ্টায় বসন্তকুমারীর বন্দী-দশা সম্বন্ধে ও তাঁকে তাঁর ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কাগজে লেখালেখি শুরু হয়। শেষে বসন্তকুমারী গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পান ও কলকাতায় চলে যান।

বসন্তকুমারীর কলকাতার সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন মদনমোহন কাপুর। বসন্তকুমারী ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই এক নোটিশ জারী করে উইলিয়াম প্রিন্সেপ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর উকিল হেজর সাহেবকে চিনা বাজারের প্রজাদের কাছ থেকে ভাড়া আদায়ের অধিকার দান করেন। এরপর ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বসন্তকুমারীর উকিল ডব্লিউ. এন. হেজর সদর দেওয়ানী কোর্টের জজ সি. টুকারের আদালতে তাঁর স্বেচ্ছামত গমনাগমন ও তাঁকে দানপত্রে প্রদত্ত সমস্ত সম্পত্তির পরিচালনার অধিকার দাবী করে মামলা রুজু করেন। তাঁর এটর্নি দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও উকিল হেজর সাহেব এই মামলা পরিচালনা করেন। কলকাতায় থাকা ফলে বসন্তকুমারীর পক্ষে ধুরন্ধর পরাণচাঁদের বিরুদ্ধে কলকাতায় মামলা করা সম্ভব হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আজীবন মাসে ৫০০ টাকা করে বৃত্তির বিনিময়ে বসন্তকুমারী বর্ধমান রাজবাড়ীর সঙ্গে মামলা রফা করে নেন।

মামলা চলাকালীন দক্ষিণারঞ্জনবাবুর সঙ্গে বসন্তকুমারীর প্রায়ই সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা এবং মেলামেশা হয়। দক্ষিণারঞ্জন সুপুরুষ ও বিপত্নীক আর

বসন্তকুমারী পরমাসুন্দরী যুবতী বিধবা। কাজেই মেলামেশার পরিণতি হয় প্রেম ও বিবাহ। প্রথমে হিন্দুমতেই বিবাহ হয় কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুমতে সিদ্ধ বিবেচিত হয় না। কাজেই পুলিশ কমিশনার বার্চ সাহেবের কাছে রেজেস্ট্রী দ্বারা সিভিল ম্যারেজ আইনত সিদ্ধ করা হয়। পুনর্বিবাহের ফলে দক্ষিণারঞ্জন ও বসন্তকুমারীর জীবন আবার নতুন করে শুরু হয়। সেযুগে বিধবা-বিবাহ তাও আবার অসবর্ণ বিবাহ। কাজেই দক্ষিণারঞ্জন ও বসন্তকুমারীর বিবাহ তৎকালীন সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

বিবাহের কিছুদিন পর দক্ষিণারঞ্জন কলকাতা ছেড়ে সস্ত্রীক লক্ষ্ণৌ যান ও সেখানেই বসতি করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সেখানকার এক বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় দক্ষিণারঞ্জন ইংরেজ সরকারকে যথাসম্ভব সাহায্য করেছিলেন। ইংরেজের পক্ষে থাকার পুরস্কারস্বরূপ সরকারের কাছ থেকে বেরিলির একটি তালুক উপহার পান। তাছাড়া ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সরকার থেকে "রাজা" খেতাবও লাভ করেন। তাঁদের এক পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বসন্তকুমারী আবার রাজরানী ও রাজমাতা হলেন। এখানে তো পরাণচাঁদের মত 'কংস' পিতা ছিল না। তাই বসন্তকুমারীর জীবনের অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বহু ষড়যন্ত্রের নায়িকা কমলকুমারীর মৃত্যু হয় আর বাংলা ১২৫১ সালের ২২শে অঘ্রান (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক পরাণচাঁদের মৃত্যু হয়।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন ও ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তকুমারী ইহলোক ত্যাগ করেন। মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্রের ইতিবৃত্ত এতদিনে পূর্ণতা লাভ করে।

মহতাবচাঁদ (১৮৩২—১৮৭৯) (উচ্চারণ-ভেদে মহতাপচাঁদ) :

মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র রায়ের ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট প্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর একমাত্র বংশধর ও উত্তরাধিকারী নিরুদ্দিষ্ট প্রতাপচাঁদের প্রত্যাবর্তনের আশায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন। প্রতাপের অন্তর্ধানের ছয় বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করে যখন তাঁর প্রত্যাবর্তনের কোন আশাই দেখলেন না তখন শ্যালক-শ্বশুর পরাণচাঁদের কুপরামর্শে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সাত বৎসর বয়স্ক চুনীলালকে (জন্ম ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর) আনুষ্ঠানিকভাবে দত্তক গ্রহণ করেন। চুনীলালের নাম হয় মহতাবচাঁদ বাহাদুর। মহারাজ তেজচন্দ্রের শেষ ইচ্ছানুসারে মহাতাবচাঁদ তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। তেজচন্দ্রের মৃত্যুর সময় মহতাবের বয়স বড়জোর ১২; কাজেই

পরাণচাঁদ ও কমলকুমারী তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ১৪ বৎসর পর প্রতাপচাঁদ ফিরলে তাঁকে জাল প্রমাণ করার জন্য পরাণচাঁদ-কমলকুমারী উঠে পড়ে লাগেন। এ নিয়ে হুগলী কোর্টে ও কলকাতায় সদর নিজামত আদালতে দীর্ঘদিন মামলা চলে; নিজের অনুকূলে মামলার রায় পাবার জন্য পরাণচাঁদ মামলা চালাতে বৈধ-অবৈধ নানাভাবে জলের মত টাকা ব্যয় করেন। রাজকোষ শূন্যপ্রায়। ডামাডোলের জন্য রাজস্ব আদায়ও ঠিকমত হয় নাই। ফলে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব উশুল দেবার জন্য জমিদারীর কিছু অংশ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সুরাহা হয় না; শেষে সমগ্র জমিদারী ও সম্পত্তি একজন কমিশনারের অধীনে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে যায়।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মহতাবচাঁদ সাবালকত্ব লাভ করার পর ২৪ বৎসর বয়সে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের কাছ থেকে বর্ধমান রাজ এস্টেটের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে খিলাত দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কমলকুমারীর অভিভাবকত্বে মহতাবচাঁদকে বর্ধমানের জমিদার রূপে স্বীকৃতি দান করেন। এতদিন জমিদারীর স্বীকৃতি লাভের জন্য ফরমান জারির প্রার্থনা করে মোগল দরবারে আবেদন করতে হত। এখন থেকে ব্রিটিশ সরকারের জমিদারীর সনদ দেওয়ার প্রথার প্রচলন হল। আর সেই সঙ্গে বর্ধমান রাজের আনুগত্যের গতিও ব্রিটিশমুখী হল। মহতাবচাঁদের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবের কোটলী মহল্যার সঙ্গমরায়ের বংশও নির্বংশ হলো আর চালু হলো মহতাব উপাধিসহ দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকার। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের জন কোম্পানীর যন্ত্রবিদ হিসাবে মিঃ জোনস্ কলকাতায় এসেছিলেন, এদেশে কয়লা উত্তোলনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই জোনস্‌কে রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেন। জোনস্ বর্ধমানের মহারানীর কাছ থেকে ৯৯ বিঘা জমি লিজ নিয়ে কয়লা অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেন। কোলিয়ারী লিজ দেওয়ার এই সূচনা। এরপর মহতাবচাঁদ পত্তনীতালুক ও কোলিয়ারী ইজারা দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। মহতাবচাঁদের সময়ে বর্ধমানরাজের অধীনস্থ পত্তনিদার ছিল ২৪৪৬ জন, দরপত্তনিদার ৮১৭ জন, সে-পত্তনিদার ৪৪ ও চৌপত্তনিদার ৫ জন। প্রশাসনিক দক্ষতার দ্বারা ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি গভীর আনুগত্যের ফলে মহতাবচাঁদ, "after wards, became one of the most enlightened representatives of the landed aristocracy of the province." তবে পত্তনিপ্রথা প্রবর্তনের ফলে জমিদারদের সঙ্গে প্রজাদের এর পূর্বে একটা যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল; সেটা

নষ্ট হয়ে যায়। পত্তনিদারগণ জমিদারদের পাওনা মিটিয়ে দেবার পর প্রজাদের কাছ থেকে নানা রকম অতিরিক্ত আবওয়াব আদায় করে প্রজাদের চরম দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দেয়। খাজনা সময়ে না দিতে পারলে তাদের জমি থেকে উৎখাত করে ভূমিহীন কৃষকদের দরিদ্র দিনমজুরে পরিণত করে। জমিদার বা সরকার কেউই পত্তনিদার বা দরপত্তনিদারদের অত্যাচার থেকে দরিদ্র প্রজাদের রক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেন নাই। জমিদারগণ প্রচুর অর্থ উপার্জন করে পুকুর প্রতিষ্ঠা, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, বা কিছু কিছু সম্পত্তি দেবোত্তর করে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করতেন। মহারাজা ত্রিলোকচাঁদ বীরভূমের জমিদারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে—নবাব ও কোম্পানীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু মহাতাপের সময় থেকে সেই ধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হল। এখন থেকে জমিদারশ্রেণী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যখনই যে আন্দোলন হয়েছে তখনই এই landed aristocracy আন্দোলনকারীদের বিন্দুমাত্র সহায়তা না করে ব্রিটিশ সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ও ব্রিটিশ সরকারকে নানা ভাবে সাহায্য করে এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য মদত জুগিয়েছে। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মহারাজ তেজচন্দ্রের পত্তনি-প্রথা প্রবর্তনের কুফল এই ভাবেই ফলে। আর ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শনের বিনিময়ে মহারাজ ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নানা খেতাব পেয়েছেন, নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন—আর্থিক দিক থেকেই নানা সুযোগ সুবিধা লাভ করেছেন। আর তার ফলে এই সমস্ত রাজা-মহারাজগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সামিল হয়ে গেছেন।

পনেট নামক জনৈক ইংরেজ কর্মচারী ও ইজারাদার এবং স্থানীয় মহাজনদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে, যখন ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বীরসিং মাঝি, গোকো, ও ভাগনা ডিহির সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সাঁওতালি 'হূল' (বিদ্রোহ) শুরু হয়; বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান জেলায় বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং ৩০শে জুন ভাগনা গ্রামের জমায়েত থেকে ৩০ হাজার সশস্ত্র সাঁওতালদের কলকাতা অভিযান শুরু হয়, তখন মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ ও আরও কিছু জমিদার এদের গতিবিধি সম্পর্কে সরকারের নিকট গোপন সংবাদ সরবরাহ ক'রে ও বিদ্রোহ দমনে নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন। তারপর আসে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতের প্রথম ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন—সিপাহীদের বিদ্রোহে গোটা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে, তখনও মহতাবচাঁদ ব্রিটিশ সরকারের পাশে এসে দাঁড়ান ও বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকারকে গোরুর গাড়ী, হাতী দিয়ে সাহায্য করেন। তাছাড়া বর্ধমান-বীরভূম ও বর্ধমান-কাটোয়া সড়ক উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করেন

যাতে বহরমপুর ক্যান্টনমেন্ট ও ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে গোপন সংবাদ আদানপ্রদানে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি না হয়। এর পুরস্কারস্বরূপ মহতাবচাঁদ ভাইসরয়ের লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের অতিরিক্ত সদস্য মনোনীত হন। বাংলাদেশে একমাত্র মহতাবচাঁদ প্রথম এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ উত্তরাধিকার সূত্রে অস্ত্র রাখার অনুমতি পান। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী ঘোষণার অনুষ্ঠানে মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় মহারাজকে ১৩টি কামান রাখার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাঁর নামের পূর্বে His Highness উপাধি ব্যবহারের অনুমতি প্রদত্ত হয়। এই সমস্ত রাজসম্মান ব্রিটিশ আনুগত্যের পুরস্কার।

অবশ্য ব্রিটিশ আনুগত্যের আড়ালে আর এক মহতাবচাঁদের গণতান্ত্রিক আদর্শর প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় লুকিয়ে আছে। মহারাজ মহতাবচাঁদের আমলেই ১৮৬৪ সালের ৩ সং বি. সি. এ্যাক্ট-এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমান পৌর প্রতিষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় ১৮৬৫ সালে ১লা এপ্রিল। ১৮৭৩ সালের ঘটনা। তখন পৌরপতি মিঃ ই. এইচ. হুইনফিল্ড ও উপ-পৌরপতি মিঃ ই. এইচ্. রাডক। তাঁদের কাছে বর্ধমানের ১০৪৫ জন নাগরিক একটি স্মারকলিপিতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২নং ধারাকে বর্ধমান পৌরশাসন ব্যবস্থায় চালু করার আবেদন করেন। সহস্রাধিক নাগরিকের মধ্যে ৬৪৭ জন করদাতার স্বাক্ষর ছিল—যাদের মধ্যে প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন বর্ধমান মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ বাহাদুর। তাতে উপ-পৌরপতি মিঃ রাডক মন্তব্য করেন—"It is barely a tenth of the rate payers ...The name of Burdwan Maharaja had given weight to it." মহারাজাধিরাজের স্বাক্ষরের সম্মান রক্ষার্থে পৌর কর্তৃপক্ষ—অনিচ্ছাকৃত-ভাবে নাগরিকদের অধিকারের দাবী স্বীকার করে নেন। ১৮৭৫-৭৬ সালে বর্ধমান পৌর প্রতিষ্ঠানে আংশিক নির্বাচন চালু হল। মহতাবচাঁদের সময়েই ব্রিটিশ স্থাপত্যের অনুকরণে মহতাব মঞ্জিল প্রাসাদ গড়ে ওঠে। আগে যেখানে দরবার বসতো—আজ সেখানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যালয়। এই প্রাসাদের বর্তমানের স্পোর্টস অফিসের প্রবেশদ্বারের মাথায় শ্বেতপাথরের এখনও এর স্মৃতি জাজ্বল্যমান।

"Mahatab Manjil" C 1849—F 1851

This building was commenced in 1849 and was finished, occupied and named by in 1851.

Sd. Mahatab chand

মহতাব উড়িষ্যার কুজঙ্গ ও মেদিনীপুরের সুজসুখা জমিদারী ক্রয় করেন। এর ফলে বর্ধমান জমিদারীর সীমানা মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার অংশবিশেষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মহতাবচাঁদের পূর্ব থেকেই বর্ধমানে বসবাস করতেন নন্দে পরিবার। পাঞ্জাবের কেদারনাথ নন্দে, তাঁর পুত্র বংশগোপাল নন্দে ও কন্যা নারায়ণীকে নিয়ে প্রাসাদের অনতিদূরে বাস করতেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কেদারনাথের কন্যা নারায়ণকুমারীর সঙ্গে মহতাপচাঁদের বিবাহ হয়। নারায়ণকুমারীর বয়স তখন মাত্র ১১ বৎসর। বর্ধমান রাজপরিবারের ওপর ছিল সাধক কমলাকান্তের অভিশাপ। কাজেই মহতাবচাঁদও নিঃসন্তান ছিলেন। মহতাবচাঁদ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ বংশগোপালনন্দের পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দেকে দত্তক গ্রহণ করেন—নাম হয় আফতাব্চাঁদ মহতাব্। মহতাবচাঁদের পর থেকেই সঙ্গমরায়ের রায় উপাধির পরিবর্তে মহতাব উপাধির প্রচলন হয়। পরাণচাঁদ কাপুরের অপর এক পুত্র রাসবিহারী সোয়াই নিবাসী গোপাললাল শেঠের কনিষ্ঠ পুত্র জহুরিলালকে দত্তক রূপে গ্রহণ করেন—নাম হয় বনবিহারী কাপুর। ইনি নিজের কর্মনিষ্ঠার গুণে মহারাজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন ও বর্ধমান রাজ এস্টেটের দেওয়ান-ই-রাজ্ নিযুক্ত হন। মহতাবচাঁদের রাজত্বকালে বর্ধমান রাজ এস্টেটের উন্নতিতে বনবিহারীর যথেষ্ট অবদান ছিল। পরবর্তী কালে তাঁর সততা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন ওঠে—সে আলোচনা পরে। ১৮৭৯ সালে পূজার সময় মহতাবচাঁদ ভাগলপুরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য যান, ও সেখানেই ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর ৫৯ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। বর্ধমান রাজবাড়ীর প্রথা অনুসারে মৃত্যুর পর তাঁর অস্থি কালনার সমাজবাড়ীতে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দত্তকপুত্র আফতাবচাঁদ মহতাব ১৯ বছর বয়সে মহতাবচাঁদের রাজগদিতে অধিষ্ঠিত হন।

মহতাবচাঁদ বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ তেজচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত Anglo vernacular school-কে মহতাব উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মহতাবের আগ্রহে বর্ধমানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ধমানের বালিকা বিদ্যালয়টি এখন মহারানী অধিরানী বালিকা বিদ্যালয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে মহতাবচাঁদের যথেষ্ট অবদান ছিল। কালনার তারানাথ তর্কবাচস্পতির উদ্যোগে ও বর্ধমান কাছারীর মনোনীত মীমাংসক ক্ষেত্রনাথ দাসের অর্থানুকূল্যে কালনায় হিন্দু স্কুল স্থাপিত হয়। পরে মহারাজ মহতাবচাঁদ এই বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণে প্রচুর অর্থদান করেন ও

বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন, বিদ্যালয়ের নাম হয় Culna Maharaja's H. E. School। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অগ্রহায়ণ (১৭৭৭ শকাব্দ) মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদের অতিথিরূপে ব্রাহ্ম আন্দোলনের পুরোধা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব বর্ধমানে আসেন। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরের সন্নিকটে উইল বাড়ীর অতিথিশালায় রাজকীয় সম্মানে তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা হয়। মহতাবের সঙ্গে মহর্ষির অন্তরঙ্গতা ঘনিষ্ঠ হয়। ঐ বৎসর বর্ধমানে ব্রাহ্মমন্দির ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ও বর্তমান ষাঁড়খানা গলিতে ব্রাহ্ম বালক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়টিই বর্তমান 'বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের' অঙ্কুর। আচার্য জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র সেই সময় বর্ধমান কালেক্টরেটে সরকারী উচ্চপদে আসীন ছিলেন। পুত্র জগদীশ নাকি এই বিদ্যালয়েই তাঁর পাঠ শুরু করেন। মহতাবচাঁদের পরলোক গমনের পর ব্রাহ্মধর্মের প্রতি রাজপরিবারের অনুরাগ কমে যায়।

সাধক ও পণ্ডিতের প্রতি মহতাবচাঁদ অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় নরেন্দ্রনাথ বসুর "মহাত্মা রামকৃষ্ণ" শীর্ষক প্রবন্ধে এর উল্লেখ পাই। "দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির ভবতারিণী মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে যৌবন বয়সে রামকৃষ্ণ স্বেচ্ছাক্রমে বর্ধমান রাজবাড়ীতে আসিতেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় তানসেন কলাবৎ না হইলেও বর্ধমানে রাজপুরবাসীগণ তাঁহাকে একজন ভক্ত গায়ক বলিয়া জানিত। পণ্ডিতদিগকে মহারাজা সৎকার করিতেন বলিয়া দূরদূরান্তব দেশ হইতে রাজবাড়ীতে পণ্ডিতের সমাগম হইত। ঘটনাক্রমে একজন পশ্চিমোত্তর দেশবাসী বহুশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত তথায় আসিয়াছিলেন। তিনি লোকের মুখেই রামকৃষ্ণের বিবরণ বিদিত ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত ভক্তিরসের প্রায় ধার ধারেন না। .....পণ্ডিতজী একদিন বাসায় নিদ্রিত আছেন রামকৃষ্ণ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া আপনার ভাবে, আপনার তালে করতালি দিয়া আনন্দময়ীর গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। করতালির পট্ পট্ শব্দে পণ্ডিতের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বিরক্ত হইয়া রামকৃষ্ণকে তিরস্কারপূর্বক বলিলেন—"তুম্ ক্যা পট্ পট্ আওয়াজ করতে হো? য়হ কা ভক্তিকা লক্ষণ হ্যা? রহ রোটী বানানেকী খেল হ্যায়!" রামকৃষ্ণ কিছুই না বলিয়া হাসিতে হাসিতে আপনার আনন্দে তথা হইয়া চলিয়া গেলেন। শুষ্ক তার্কিক পণ্ডিতের রামকৃষ্ণের ভক্তিরসের মাহাত্ম্য বুঝিবার ক্ষমতা কোথায়?

রামকৃষ্ণের জন্ম ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় আসেন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। মহতাবচাঁদের রাজত্বকাল ১৮৩২ থেকে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। কাজেই রামকৃষ্ণদেব

মহাতাবের সময়েই রাজবাড়ীতে আসতেন একথা সঠিকভাবে বলা যায়। তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে বর্ধমানে এসে শ্যামসায়রের পাড়ে রাজঅতিথিশালায় অধিষ্ঠান করতেন ও ঈশানেশ্বর শিবমন্দিরে শিবের প্রিয় কণ্টনবন দেখে পুলকিত হতেন শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতেও তার উল্লেখ আছে।

এছাড়া বহু পণ্ডিত, মৌলভি ও শিক্ষককে মহতাবচাঁদ নিয়মিতভাবে অর্থ সাহায্য করতেন। মহাতাবের বিদ্যোৎসাহিতার জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর J. P. Grant-কে লিখিতপত্রে মহতাবচাঁদকে First Man of Bengal বলে সম্মান জানিয়েছিলেন। আবার F. B. Bradley Birt তাঁর Twelve men of Bengal গ্রন্থে মহতাবচাঁদকে one of the great men of the 19th century আখ্যা দিয়েছিলেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মহতাবচাঁদের অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি তাঁর উদ্যোগে বর্ধমান রাজসভা থেকে বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের আখ্যাপত্রে এর উল্লেখ আছে—

রামায়ণ
মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত
আদিকান্ড
শ্রীমান শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহামহীশ্বর মহারাজাধিরাজ
মহতাব্‌চন্দ-বাহাদুর
কর্তৃক
শ্রীআশুতোষ শিরোরত্ন-দ্বারা অনুবাদিত ও
পরিশোধিত হইয়া
বর্ধমান
সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।
শকাব্দ ১৭৮৮

এই অনুবাদ করেছিলেন মহারাজার দুই সভাপণ্ডিত বিপ্রদাস তর্কবাগিশ ও উমাকান্ত ভট্টাচার্য। কবি ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় সংবাদ প্রভাকরে বইটির সুদীর্ঘ রিভিউ করেন ও অনুবাদটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদ ভাস্করেও এই পুস্তকের রিভিউ প্রকাশিত হয়। মহতাবচাঁদের আগ্রহে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান রাজসভা থেকে সাধক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের ২৬৯ খানি গানের এক সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের দায়িত্বে ছিলেন বিপ্রদাস

তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয়। মহতাব নিজেও শাক্তপদ রচনা করেছিলেন—তাঁর পদে মহতাবচাঁদের ভক্তি-প্রাণতার ওপর চিন্তার নিদর্শন মেলে—অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হয়েও রাজ্য-ভারাক্রান্ত মহারাজার মুক্তি পাবার আকুল প্রার্থনা তাঁর পদে পরিস্ফুট।

দিয়েছ রাজ্য বিস্তার, সময়ে মহা দুস্তার।
কেমনে পথ নিস্তার, তুমি বই নাহি আশ॥
কিংবা
দিয়াছ মা রাজ্যভার ধন জন পরিবার
এ সবে কিসে নিস্তার গৃহী অসাধ্যসাধন
....

মহতাবচাঁদের সময়ে পদ্য-রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডও প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। বাল্মীকি রামায়ণের সম্পূর্ণ সপ্তকাণ্ড সংস্কৃত টেকস্‌ট ও গদ্য-বামায়ণের আদিকাণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৯৭ শকাব্দে (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে)। মহতাবচাঁদের আমলে রাজসভায় মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ হয় ১২৬৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে।

তারকনাথ তত্ত্বরত্ন, অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি, ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন, পদ্মলোচন বিদ্যারত্ন প্রমুখ পণ্ডিত মহতাবচাঁদের পোষকতা লাভ করেন। 'পতিব্রতোপদেশ' পুস্তকের রচয়িতা পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য মহতাবচাঁদের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

অধ্যাত্মসঙ্গীত ও প্রণয়সঙ্গীত রচনাতে মহতাবচাঁদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তাঁর সঙ্গীতের সংখ্যা ১৭৪৩।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ আন্দোলনের বিরোধিতা করে পদ্মলোচন ন্যায়রত্নকে দিয়ে তিনি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া অত্যন্ত অনুচিত এতদ্বিষয়ক প্রমাণসমূহ নামে একটি পুস্তিকা রচনা করিয়েছিলেন—কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি বিধবাবিবাহের বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন—J. P. Grant-কে লিখিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রে এ তথ্য জানা যায়। মহারাজ মহতাবচাঁদের জনহিতকর কাজের মধ্যে শ্যামসায়রের তীরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য; এখানে রোনল্ডসে মেডিক্যাল কলেজ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহতাবের নানারকম অদ্ভুত শখ ছিল। পালকপিতা তেজচন্দ্রের মত তাঁরও নানারকমের পায়রাপ্রীতি ছিল—রাজবাড়ীর দক্ষিণে পায়রাখানা লেন তাঁর শখের স্মৃতি বহন করছে।

আর একবার তাঁর খেয়াল হয় প্রাচীন ভারতীয় ক্ষত্রিয় রাজা জনক বিশ্বামিত্রের মত তিনিও ধর্ম উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করবেন। এবিষয়ে তিনি তাঁর সভাপণ্ডিত ও অন্যান্য পণ্ডিতদের আহ্বান করে তাঁদের মত চান। তাঁদের প্রায় সকলেই মহারাজের এই বাসনা শাস্ত্রানুমোদিত বলে মত প্রকাশ করেন। অনেক পণ্ডিত মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে শুরু করেন। কেবল রমাপতি পণ্ডিত এর বিরোধিতা করেন, ফলে তাঁকে বিশেষ অর্থকষ্টে পড়তে হয়।

মহতাবচাঁদের আর এক খেয়াল তিনি ক্ষেত্রীদের ঐতিহ্যমণ্ডিত পাগড়ির বদলে মহ্তাব-টুপির প্রচলন করেন। তাঁর পরিকল্পনামত পুরাতন চকের কারিগররা এই জাতীয় টুপি তৈরী করে।

তাঁর অন্যতম তুঘলকী খেয়াল হচ্ছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহতাবী লিপির প্রচলন। সুলভ সমাচারে ১২৮১ সালের ২৩শে অঘ্রাণ এই সংবাদ পরিবেশিত হয়।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চের সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর লণ্ডনের চিঠিতে একটি প্রতিবেদনে এই লিপির প্রতিলিপি সহ বিস্তৃত আলোচনা করে সুধী সমাজের এই লিপির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ড. মুখোপাধ্যায়ের মতে লিপিগুলির আকার জ্যামিতিক diagram-এর মত। অনেক অক্ষর কলম না তুলে লেখা প্রায় অসম্ভব। তাঁর মতে এ লিপি আঁকবার, লেখবার নয়। যাই হোক বাংলা অক্ষরমালায় এই তুঘলকী অক্ষরমালার কোন প্রভাব পড়ে নাই; বা এ লিপি চালুও হয় নাই। একমাত্র ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সরকারের সহযোগিতা করার মত কিছু দোষ ও কিছু অদ্ভুত খেয়াল সত্ত্বেও সমাজ-শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গৌরবময় ভূমিকার জন্য মহতাবচাঁদের রাজত্বকাল বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

আফতাবচাঁদ মহতাব (১৮৭৯–৮৫ খ্রীঃ) : মহতাবচাঁদ অপুত্রক অবস্থায় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর শ্যালক লালা বংশগোপাল নন্দের পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দেকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ দত্তক গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মপ্রসাদের জন্ম ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে; দত্তক নেবার পর তাঁর নাম হয় আফতাবচাঁদ মহতাব্। পালকপিতা মহতাবচাঁদের ইচ্ছানুসারে আফতাবচাঁদ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজগদিতে বসেন। সে সময় রাজ এস্টেটের রাজস্ব ছিল ৪০ লক্ষ টাকা। তিনি যখন রাজগদিতে বসেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৯

বৎসর। কাজেই রাজ্য পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে এস্টেট পরিচালনা করতেন তাঁর পালকপিতার আমলের দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কাপুর। আফতাব যখন সিংহাসনে বসেন, তখন বড়লাট ছিলেন লর্ড লিটন পরে বড়লাট হন লর্ড রিপণ (১৮৮০–৮৪ খ্রীঃ) আর বাংলার গভর্নর ছিলেন স্যার অ্যাসলি ইডেন (১৮৭৭–৮২ খ্রীঃ) ও স্যার আগস্টাস বিভার্স টম্পসন্ (১৮৮২–৮৭)। আফতাবচাঁদ ছিলেন দুর্বলচিত্তের মানুষ—দৃঢ়হস্তে কোন সমস্যার মোকাবিলা করা তাঁর ক্ষমতায় ছিল না। যা কিছু করতেন ম্যানেজার বনবিহারী কাপুর। আফতাবচাঁদও তাঁর পালকপিতার মত ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য বজায় রেখে চলেছিলেন। তিনি মাত্র ছয় বৎসর রাজতক্তে আসীন ছিলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেও শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত ও সংস্কৃতির জগতে তিনি এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

আফতাবচাঁদ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আশি হাজার টাকা ব্যয়ে এফ.এ. কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়ে এই কলেজে ছাত্রদের কাছ থেকে কোন বেতন নেওয়া হত না। এছাড়া বর্ধমানে রাজ পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। লাইব্রেরীটি ছিল জি. টি. রোডের ধারে রূপমহল সিনেমার পশ্চিমে এখন যেখানে বর্ধমান সিনেমা হল রয়েছে সেখানে। জমিদারী উচ্ছেদের পর রাজ পাবলিক লাইব্রেরী বর্ধমান জেলা লাইব্রেরীকে দান করা হয়। বর্ধমানবাসীর জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি লাকুর্ডিতে জলকল নির্মাণের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করেন।

সাহিত্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও কম নয়। মহতাবচাঁদের জীবদ্দশায় বাংলায় গদ্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড পর্যন্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আফতাবচাঁদ ১৮৭৯–১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঐ রামায়ণের সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ডের অনুবাদ সম্পন্ন করিয়ে প্রকাশ করেন। অনুবাদ করেছিলেন তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন। বাল্মীকি রামায়ণের কাণ্ডগুলি তৎসম শব্দ-বহুল নির্ভুল ওজস্বিনী গদ্যরীতিতে অনুবাদিত। উর্দু সাহিত্যের অনুবাদেও তাঁর অবদান ছিল। তাঁর আমলেই বর্ধমান রাজসভা থেকে উর্দু সাহিত্য চাহারদরবেশ বা চারদরবেশের কাহিনীর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)। অনুবাদ করেছিলেন রাজসভার পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন। এই অনুবাদের আখ্যাপত্রে তাঁর নাম উল্লিখিত আছে।

চাহার দরবেশ

মীর অম্মন কৃত

বর্ধমান দি পঞ্চদশ মহীমহেন্দ্র হিজ হাইনেস

মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত আফচাঁদ চন্দ
বাহাদুর
কর্তৃক
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার বিদ্যারত্ন তথা
শ্রীযুক্ত মুন্সী মহম্মদী দ্বারা
বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত।

মহতাবচাঁদের ভক্তিগানামৃত-এর মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন আফতাবচাঁদই। তাঁর আমলে বর্ধমান রাজসভা থেকে আমানতকৃত ফার্সী অক্ষরে মুদ্রিত 'ইন্দর সভা' নামক সঙ্গীতগ্রন্থটি রাজসভাপণ্ডিত ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন ও মৌলভি-মুন্সী মহম্মদীর সম্পাদনায় বাংলা হরফে লিপ্যন্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

আফতাবচাঁদ মাত্র ছয় বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন অপুত্রক, মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী বিনোদেয়ী দেবীকে রেখে যান ও তাঁকে তাঁর মৃত্যুর পরে দত্তকপুত্র নেওয়ার অনুমতি দিয়ে যান। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই দত্তক নেওয়া সম্ভব হয় নাই। মনে হয় তাঁর শাশুড়ী মাতার সঙ্গে পারিবারিক গোলযোগের ফলেই দত্তক গ্রহণ পিছাইয়া দিতে হয়। অবশেষে আফতাবের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই বিনোদেয়ীদেবী রাজ এস্টেটের ম্যানেজার বনবিহারী কাপুরের কনিষ্ঠপুত্র বিজনবিহারী কাপুরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দত্তক গ্রহণ করেন—তাঁর নাম হয় বিজয়চাঁদ মহতাব। আফতাবের মৃত্যুর পর দু-বৎসর কোন উত্তরাধিকারী মনোনীত না হওয়ায় বর্ধমান রাজ এস্টেট একজন কমিশনারের তত্ত্বাবধানে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীনে ন্যস্ত হয়। বনবিহারী কাপুর ও টি. ডি. বর্গমিলার জয়েন্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হন।

ছয় বৎসরের শাসনকালে আফতাবচাঁদ তাঁর অল্প বয়স ও দুর্বল চিত্ততার জন্য দক্ষ প্রশাসক হিসাবে হয়ত সাফল্যলাভ করতে পারেন নাই; কিন্তু শিক্ষা-সাহিত্য-এর পৃষ্ঠপোষক, সঙ্গীতরসিক ও প্রজারঞ্জক রাজা হিসাবে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিজয়চাঁদ মহতাব (১৮৮৭—১৯৪১ খ্রীঃ) : আফতাবচাঁদের মৃত্যুর পূর্বে মহারানী বিনোদেয়ীদেবীর দত্তক নেবার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক ঝামেলার ফলে আনুষ্ঠানিক ভাবে দত্তক নিতে দু'বছর বিলম্ব হয়ে যায়। কিন্তু রাজবংশের ঐতিহ্য অনুযায়ী মহারাজার জ্যেষ্ঠপুত্র বা মনোনীত দত্তকপুত্র

রাজসিংহাসনে বসার অধিকারী। সেকারণে আফতাবের মৃত্যুর পর রাজমাতা নারায়ণীদেবী বা মহারানী বিনোদেয়ী দেবী কেউই রাজতক্তে বসতে পারেন নাই। সেকারণে সরকার থেকে রাজ্য পরিচালনার জন্য রাজ এস্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এর তত্ত্বাবধানে অর্পিত হয়। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এর পক্ষে দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কাপুর ও সরকারের পক্ষে টি. ডি. বর্গমিলার জয়েন্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই বিজনবিহারীকে বিনোদেয়ী দেবী অনুষ্ঠানিকভাবে দত্তক গ্রহণ করেন। নাম হয় বিজয়চাঁদ মহতাব্। বিজয়চাঁদের বয়স তখন মাত্র ছয় বৎসর। বিজনবিহারীর জন্ম ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর, কাজেই তাঁর সাবালকত্ব লাভ করতে আরও ১৪/১৫ বছর বাকি; তাঁর সাবালকত্ব লাভ না করা পর্যন্ত রাজ এস্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস-এর তত্ত্বাবধানেই থাকে। এই কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস-এর তত্ত্বাবধানে থাকার শেষ ছয় বৎসরে জমিদারীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। রাজ্য পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য বা Government Securities-এ বিনিয়োগ করার অজুহাতে জয়েন্ট ম্যানেজার রাজ এস্টেটের তহবিল থেকে বহু টাকা তছরুপ করেন। এই তছরুপের মধ্যে ছিল Mr. Miller-এর ব্যক্তিগতভাবে রাজকোষ থেকে লণ্ডনে প্রেরিত অর্থ, বনবিহারী কর্তৃক তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের উপহার দেবার নামে প্রচুর অর্থ এবং রাজ এস্টেটের ক্যাশিয়ার-এর মাধ্যমে ৮ লক্ষাধিক মুদ্রা রাজকোষ হতে বিক্রয় করে নানা মিথ্যা Invoice দাখিল করে আত্মসাৎ করা অর্থ।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়চাঁদ সাবালক হয়ে রাজ এস্টেটের দায়িত্ব ভার বুঝে নেন। বনবিহারী কাপুর এস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হন এবং উভয়ের দক্ষ পরিচালনায় এস্টেটের আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে, রাজ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। দক্ষ পরিচালনার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বনবিহারী কাপুর-কে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী বিজয়চাঁদ মহতাব্ রাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড মিন্টোর এক সনন্দ বলে বিজয়চাঁদকে প্রদত্ত মহারাজাধিরাজ উপাধি বংশানুক্রমিক হয়।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাবের বর্ধমান রাজপ্রাসাদে সাড়ম্বরে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই অভিষেক অনুষ্ঠানে লেফটেন্যান্ট গভর্নর বোর্ডিলিয়ন স্বয়ং বর্ধমানে উপস্থিত হয়ে মহারাজকে আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজপদে অভিষিক্ত করেন।

এসময়ে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটা একবার দেখে নেওয়া যাক। ভারতের বড়লাট তখন লর্ড কার্জন। আর বিজয়চাঁদের ৫৪ বছরের শাসনকালে

বাংলার প্রশাসনিক শীর্ষে ছিলেন একাধিক গভর্ণর। বিজয়চাঁদ-এর সিংহাসনারোহণের পূর্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়, যদিও তার ঢেউ বর্ধমানে বিশেষ অনুভূত হয় নাই, তবুও পত্তনিপ্রথার প্রবর্তনের ফলে জেলার কৃষকদের ওপর যে করভার চাপানো হয়েছিল বা যেভাবে তারা জমিদার ও তাঁর নিযুক্ত-দূতদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে জেলার নানা স্থানে কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য কিছু কিছু বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান সঞ্জীবনীসভা পত্তনিদারদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে জমিদার ও সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতসভার তিনটি শাখা বর্ধমান জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়—(১) বর্ধমান ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন, (২) কালনা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন ও (৩) পূর্বস্থলী হিতকরী সভা। চান্নার যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), এর সঙ্গে গোয়ালিয়রে গিয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিখে এসে কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। খণ্ডঘোষের রাসবিহারী বসুও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ও দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। দেশের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে বিজয়চাঁদ মহতাব ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড কার্জনকে বর্ধমানে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করে আনেন ও তাঁর সম্মানার্থে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ও বিজয়চাঁদ রোডের সংযোগস্থলে Star of India-এর অনুকরণে কার্জন গেট নির্মাণ করেন। গেটটি বিজয়চাঁদের সময়ের গথিক স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। সেই বৎসরেই (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ) সুরেন্দ্রনাথের ভারতসভার অধিবেশন বর্ধমান শহরেই অনুষ্ঠিত হয়। এর পর বৎসরই লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। কালনার মহিষমর্দিনীতলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এক বিশাল জনসমাবেশ ঘটে। এই সমাবেশের উদ্যোক্তাদের দ্বারা বাঘনাপাড়ায় বিদেশী বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যের দোকান লুঠ হয়। কালনার শক্তিসমিতি নামে এক ব্যায়াম সমিতি ও রানীগঞ্জের জয়দেব-সেবক সম্প্রদায় বিদেশী দ্রব্য বর্জনের শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ও সুসংগঠিত হয়ে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অনুশীলন সমিতি থেকে অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর ওপর। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অত্যাচারী লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার এন্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। একমাত্র মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদের চেষ্টায় ফ্রেজার আততায়ীর হাত থেকে উদ্ধার পান।

এর পুরস্কারস্বরূপ বিজয়চাঁদকে K.C.I.E ও Indian order of Merit (class III) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। স্বাভাবিকভাবে বিজয়চাঁদের এই ব্রিটিশপ্রীতি জেলাবাসী খুব ভাল চোখে দেখে নাই। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়চাঁদ ইউরোপ ভ্রমণে যান ও ফিরে এসে ইংরাজিতে একটি পুস্তক রচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রাজপরিবারের মধ্যে বিজয়চাঁদই প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

মহতাব্ বংশের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে বিজয়চাঁদ ইংরেজ সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও একথা সত্য যে, বিজয়চাঁদ বিপ্লবীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং গোপনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনি বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন। একথা আমি প্রয়াত বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী ফকিরচন্দ্র রায় ও বলাই দেবশর্ম্মার নিকট শুনেছি। ১৯৩৬ সালের ৪ঠা জুনের জেটল্যাণ্ডকে লেখা মেমোরামডামে জানা যায় বিজয়চাঁদ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার ব্যাপারে উদারপন্থী মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীজী বর্ধমানে আসেন। তখন বিজয়চাঁদ শ্যামসায়রের পাড়ে চাঁদনীচকে তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন ও যাতে তাঁর কোন অসুবিধা না হয় তার তদারকি করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু যখন বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে বক্তৃতা দিতে আসেন তখন মহারাজ বাহাদুর তাঁর সাদর অভ্যর্থনা করেছিলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি Bengal Legislative Council-এর সদস্য ছিলেন। ১৯০৯ থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত Imperial Legislative Council-এর ও ১৯১৮ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিরাজস্ব ও সংস্কার সম্পর্কে তদন্ত ও সুপারিশ করার জন্য স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড-এর নেতৃত্বে ফ্লাউড কমিশন গঠিত হয়। ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন বিজয়চাঁদ। তাঁর রাজত্বকালেই দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

কংগ্রেস নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন, চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাব বর্ধমান জেলায় খুব বেশী না পড়লেও জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিজয়চাঁদ দূরদর্শী ছিলেন তাই তিনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন ব্রিটিশ শাসনের দিন শেষ হয়ে আসছে। তাছাড়া ফ্লাউড কমিশনের সদস্য হিসেবে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে

তাঁর জমিদারীও আর বেশী দিন নাই। তাই কংগ্রেস আন্দোলনকে পরোক্ষভাবে সাহায্য দিয়েছিলেন। বিজয়চাঁদ বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত তিনটি ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। মহারাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। বর্ধমান শহরে ১৩২১ সালের চৈত্র মাসে যে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয়, তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ। সভার শেষে সভাপতির ভাষণে তিনি সেই সম্মেলনে যে ভাষণ দেন, সেটি ছিল আন্তরিকতায় পূর্ণ, তা সেই সারস্বত সম্মেলনে সুধীজনের প্রতি তাঁর সহৃদয়তা ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পরিচয় প্রদান করে। তিনি নিজেও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর রচিত ২০টি গ্রন্থের মধ্যে Impression, the Indian Horizon, Meditation, Studies, বিজয়গীতিকা, ত্রয়োদশী (কাব্য), রণজিৎ (নাটক), মানসলীলা (বিজ্ঞান নাট্য) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্ধমান রাজ কলেজটিকে ডিগ্রি কলেজে উন্নীত করেন। এই কলেজটি প্রথমে ছিল অবৈতনিক কিন্তু ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বর্ধমান পরিদর্শনে এসে মন্তব্য করেছিলেন Higher education is not for the poor. তারপর থেকে কলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেবার প্রথা চালু হয়। তবে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য রাজকোষ থেকে অর্থ সাহায্য বা মহারাজের তরফ থেকে ঢালাও Free studentship মঞ্জুর করা হত। তাঁর সময়েই শ্যামসায়রের পাড়ে রাজকলেজের নতুন ভবন Herbert House, হিন্দু ও মুসলিম হোস্টেল নির্মিত হয়। দুঃখের বিষয়, এই নতুন ভবন উদ্বোধনের ঠিক পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী রাধারানীদেবী, দুইপুত্র উদয়চাঁদ ও অভয়চাঁদ এবং দুই কন্যা সুধারানী ও ললিতারানীকে রেখে যান। প্রতাপচাঁদের পরই উদয়চাঁদ মহতাব বংশের প্রথম বংশধর। উদয়চাঁদের সময়েই বর্ধমান রাজবংশের দত্তক প্রথার এক দিকে যেমন পরিসমাপ্তি ঘটে আর অন্যদিকে তেমনি বর্ধমান বংশেরও আয়ু শেষ হয়। সাধক কমলাকান্তের অভিশাপের ফল অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়।

উদয়চাঁদ মহতাব (১৯৪১–১৯৫৫ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৯৮৪ খ্রীঃ) : ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট পিতার মৃত্যু হ'লে উদয়চাঁদ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে রাজসিংহাসনে বসেন। ভারতের বড়লাট তখন লর্ড লিন্‌লিথগো আর বাংলার গভর্নর হারবার্ট সাহেব। দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের করাল ছায়া। বর্ধমানের সন্তান রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেছেন। সুভাষচন্দ্র জার্মান হয়ে জাপানে পৌঁছালে জাপান ব্রিটিশ-বিরোধী যুদ্ধে তাঁকে সবরকম সাহায্যের

আশ্বাস দেন। তিনি সিঙ্গাপুরে থেকে রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে আজাদ হিন্দ সরকারের দায়িত্ব নেন। জাপানী আক্রমণের আতঙ্ক বর্ধমানেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীপস্ দৌত্যের পর সারাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীবিরোধী মনোভাব প্রায় বিস্ফোরণের পর্যায়ে আসে। গান্ধীজীর ভাবত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক তার একটা নিষ্কাষণের পথ করে দেয়। সারা দেশেব সঙ্গে বর্ধমানও উত্তাল হয়ে ওঠে। বেশ মনে পড়ে প্রতিদিনই কলেজ যাই আর প্রতিদিনই নেতাদের আহ্বানে সব ছেলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে মিছিলের সামিল হন। অনেক ছাত্রনেতাসহ জেলার নেতা কারারুদ্ধ হন। পরে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দমননীতি, মুসলিম ও কমিউনিস্ট স্বাতন্ত্র্য—নানা কারণে ১৯৪২-এর মাঝামাঝি এই ৪২-এর আন্দোলনে ভাটা পড়ে। তারপর আসে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ—মুসলিম লীগের চাঁই এম. এম. ইসপাহানি এণ্ড কোম্পানিকে সরকার সব চাল কেনবার একচেটিয়া অধিকার দান করে দেশে মন্বন্তরের সৃষ্টি করে। শ্যামাপ্রসাদ বিধানসভায় এ তথ্য ফাঁস করে দেন। বর্ধমানে রাস্তায় কাতারে কাতারে ভিখারীদের ভিড়। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া; দাম দিলেও জিনিস মেলে না। মৈঁ ভুখা হুঁ, জবানবন্দী, নবান্ন নাটকের বাস্তব ও মর্মস্পর্শী বিববণ শতাব্দীর ট্র্যাজেডিকে জনগণের সামনে তুলে ধরে। কংগ্রেসী চিন্তায় সরকার ও জমিদারবিরোধী মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে মহারাজার রাজ্যাভিষেক যে জাঁকজমক করে হতে পারে না বা রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে ছোটলাট বা বড়লাট কারও উপস্থিতি কাম্য নয় এটা বুঝেই এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই উদয়চাঁদের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উদয়চাঁদই রাজবংশের প্রথম গ্রাজুয়েট। তাঁর সময়েই রাজকলেজ Herbert House-এর নতুন বিল্ডিং-এ উঠে আসে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি যুবরাজ তখনই যে Legislative Council-এর নির্বাচন হয়, তাতে কংগ্রেসের বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি জয়লাভ করেন। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট-এ জমিদারী উচ্ছেদের জন্য সুপারিশ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন, মন্বন্তর ও মহামারীর জন্য সে সুপারিশ কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নাজিমউদ্দিন যখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তখন আবার জমিদার-বিরোধী সাম্প্রদায়িক জিগির ওঠে। ১৯৪৩–১৯৪৬ সালের মধ্যে কৃষক সমিতির স্থানীয় নেতারা লীগের সঙ্গে একজোট হয়ে জমিদার-বিরোধী আন্দোলন আরও জোরদার করে তুলল। মহারাজা বুঝলেন একদিকে যেমন ইংরেজ সরকারের দিন শেষ হয়ে এসেছে, অন্য দিকে তাঁরও জমিদারী আর বেশী দিন নাই—জমিদারী উচ্ছেদ হচ্ছেই—কেবল সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু একটা

জিনিস লক্ষ্য করার মত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে যখন বর্ধমানে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় তখন মহারাজ কৃষ্ণরাম রায় দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাগণের ক্লেশ নিবারণার্থ এক ঝুড়ি মাটির জন্য ১ কড়ি মজুরিতে বহু শ্রমিক নিয়োগ করে বিশাল "কৃষ্ণসায়র" পুষ্করিণী খনন করান। কিন্তু ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, যখন ভয়াবহ মন্বন্তরে গোটা জেলায় হাহাকার ওঠে, বর্ধমান শহরের রাস্তায় রাস্তায় লোকে কাতারে কাতারে এক বাটি ফ্যানের জন্য হাহাকার করতে থাকে, তখন কি সরকার, কি মহারাজা কেউ সদাব্রত খুলে বা লঙ্গরখানা খুলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন নাই। তবে বিনয় চৌধুরী মশাই তাঁর দলবল নিয়ে মন্বন্তরের রিলিফ ও মজুতদারির বিরুদ্ধে ঝাঁপিতে পড়েছিলেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে সারাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন। বড়লাট ওয়াভেলের সিমলা চুক্তি, ওয়াভেল প্ল্যান ব্যর্থ। তিতিবিরক্ত জিন্নাসাহেব পাকিস্তানের জিগির তুলে ১৯৪৬-এর ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক দিলেন। বাংলায় ১৯৪৬ এর নির্বাচন অন্তে সুরাবর্দী সঙ্কটে পড়ে কংগ্রেসের দিকে হাত বাড়াল—হাইকম্যান্ড বাদ সাধল। সুরাবর্দী উগ্র সাম্প্রদায়িক শিবিরে যোগ দিল। তিনি নবলব্ধ পৃষ্ঠপোষক জিন্নার ডাকে সাড়া দিয়ে ১৬ই আগস্ট কলকাতার বুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফ্রাঙ্কেসটাইন-এর দৈত্য ছেড়ে দিলেন। রাস্তায় রাস্তায় মুসলিম মিছিল; মুখে তাদের আওয়াজ—লেকর রহেঙ্গে পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। শুরু হল The great Calcutta killing, এক কলকাতাতেই ৫০০০ লোক নিহত, ১৫০০০ আহত ও লক্ষাধিক মানুষ গৃহহারা হয়। কিন্তু বর্ধমানে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য থাকলেও এখানে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে নাই। এর কৃতিত্ব মহারাজা ও এক উগ্র সাম্প্রদায়িক বিশিষ্ট নাগরিক রাজকৃষ্ণ দত্ত এবং বিশেষ করে জেলার নাগরিক সম্প্রদায়ের। জেলার যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে তো তাঁরা ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতো। সাম্প্রদায়িক বিভীষিকার অন্তে ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট দেশে স্বাধীনতা সূর্যের উদয় হল। বর্ধমানও এই উৎসবের সামিল হয়। এই প্রসঙ্গে কিছুটা ব্যক্তিগত হলেও একটা ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমি তখন বনপাশ শিক্ষানিকেতনের প্রধান শিক্ষক। স্কুলে ছেলেদের নিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের জন্য উদয়চাঁদ মহতাবের কাছে কিছু সাহায্য চেয়ে পত্র দিই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একশত টাকার চেক ও শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়ে দেন।

দেশ স্বাধীন হল। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সঙ্গে খণ্ডিত পশ্চিমবাংলারও বিধানসভার নির্বাচন। উদয়চাঁদ সদস্যপদের জন্য কংগ্রেসের তরফে প্রার্থী হন। তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির শ্রীযুক্ত বিনয় চৌধুরী। বিনয় চৌধুরী

ছিলেন প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী আর উদয়চাঁদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ প্রতিভূ। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৩৭-এর জমানায় যবনিকাপাত ঘটেছে। কাজেই ১৯৫২ সালের নির্বাচনে উদয়চাঁদ পরাজিত হন। নির্বাচনের ঠিক আগে মহারাজ ও জেলা কংগ্রেসের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও উদয়চাঁদের পক্ষে প্রচারে এসেছিলেন। টাউন স্কুলের হলঘরের ছাদে বিশেষ ভাবে নির্মিত মঞ্চ থেকে স্কুল প্রাঙ্গণের দশ একর জায়গা জুড়ে সমবেত বিশাল জনতার কাছে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেবার আবেদন জানিয়েছিলেন। তাতেও শেষরক্ষা হয় নাই। স্বাধীন দেশের সেই সাধারণ নির্বাচনে বর্ধমানের মানুষ নতুন দিনের নতুন রাজনীতিকে বরণ করে নিল।

ধীরে ধীরে উদয়চাঁদ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হল। উদয়চাঁদ এর জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে পরাজিত হয়ে তিনি বর্ধমানের মানুষের কৃতঘ্নতায় এমনিতেই ক্ষুব্ধ ও অভিমানাহত ছিলেন। জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হবার পর উদয়চাঁদ বর্ধমানকেই ত্যাগ করে আলিপুরের বিজয় মঞ্জিলে চলে গেলেন। যাবার আগে একটা বড় কাজ করে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবমত তিনি তাঁর মহতাব্ মঞ্জিল, গোলাপবাগ সমস্তই বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গেলেন। আর তাঁর শত শত কর্মচারীদের প্রত্যেককে বাবুর বাগ, ভাতছালা, সাধনপুর, কাঞ্চননগর অঞ্চলে বাস করার জন্য এক প্লট করে জমি দিয়ে গেলেন। মহতাব মঞ্জিল এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর কার্যালয়, এর পূর্ব অংশে উইমেন্স কলেজ আর পূর্ব প্রান্তে ভূমি সংস্কার ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! যে প্রাসাদে লক্ষ লক্ষ প্রজাদের জমিজমার হিসাব-নিকাশ হত, আজ সেই প্রাসাদেই মহারাজার উদ্বৃত্ত জমির হিসাব-নিকাশের ফয়সালা হচ্ছে। আর প্রাক্তন মহারাজা আলিপুরের বিজয় মঞ্জিলে বাস করে সেখানে থেকে ডানলপ, মেটালবক্স, ব্রুকমন্ড-এর বোর্ড অব্ ডিরেকটারদের মিটিং করে, একাডেমি অব্ ফাইন আর্টসের প্রদর্শনী দেখে, দার্জিলিং-এর মহতাব মঞ্জিল থেকে হিমালয়ের দৃশ্য দেখে দিন কাটাচ্ছেন। জীবনের শেষের দিকে জীবনটা নানা অশান্তি, মামলা-মোকদ্দমায় কাটে। শেষকালে স্ত্রী বিয়োগ হয়। অবশেষে ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর বর্ধমান রাজবংশের শেষ রাজা ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বৎসর। রেখে গেলেন তিন পুত্র—সদয়চাঁদ, মলয়চাঁদ আর প্রণয়চাঁদ এবং তিন কন্যা—বরুণাদেবী, জ্যোৎস্নাদেবী ও করুণাদেবী। তাঁর সহোদর অভয়চাঁদের

বনবাসে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে Student Health Home. মহারাজ উদয়-চাঁদের উইল অনুসারে কনিষ্ঠ পুত্র ড. প্রণয়চাঁদ মহতাব তাঁর দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। উদয়চাঁদের সঙ্গেই আবুরায় প্রতিষ্ঠিত তিনশ বছরের একচ্ছত্র জমিদারীর অবলুপ্তি ঘটল। স্মৃতিভারে পড়ে রইল রাজ এস্টেটের আদর্শের প্রতীক চিত্র—শীর্ষদেশে আবক্ষখণ্ডিত অশ্বমুণ্ড, দুই পার্শ্বে—উল্লম্ফনরত দুই বলশালী অশ্ব—মধ্যে অর্ধচন্দ্র সমন্বিত ঢাল ও তার পাশে দুই উন্মুক্ত তরবারি। আর তারই নীচে জমিদারী শাসনতন্ত্রের মন্ত্র—Descredito Justician colito—"সুপ্রশংসিত, সুবিবেচক, সুপ্রজাপালক" আর প্রাসাদের পশ্চিম প্রান্তের শীর্ষদেশে প্রস্তর-নির্মিত উড্ডীয়মান সুবিশাল ঈগলপাখী।

সেই আবুরায় থেকে কৃষ্ণরাম, কীর্তিচাঁদ—তেজচন্দ্র রায়—এর রায়বংশের মূল স্রোতধারার সঙ্গে মহতাবচাঁদ, আফতাব চাঁদ, বিজয়চাঁদ ও উদয়চাঁদ-এর মহাতাব বংশের স্রোতধারা মিলিত হয়ে বর্ধমান জেলার ইতিহাসকে সঞ্জীবিত করেছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, জন কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় বর্ধমান রাজবংশের অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্ধমান রাজ স্কুল, রাজ কলেজ, টেকনিক্যাল স্কুল, দামোদর বাঁধ, সাহিত্য পরিষদ, বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা মহাবিদ্যালয় ও সর্বোপরি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বর্ধমান জেলার প্রগতিতে এক অনিস্মরণীয় অবদান। বুঝতে অসুবিধা হয় না, বর্ধমান রাজবংশ তাঁদের প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে উৎকীর্ণ Descredito Justician Colito—এই বিশেষণ ত্রয়ের যোগ্য হতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছিলেন কি? কালই তার বিচার করবে।

ছাব্বিশ অধ্যায়



আধুনিক যুগে জেলার শাসনব্যবস্থা

মোগল আমলে বাংলা সুবা ছিল ১৯টি সরকারে বিভক্ত। বর্ধমান জেলা ছিল সরিফাবাদ, সুলেমাবাদ, সাতগাঁ ও মান্দারণ পবগনা নিয়ে গঠিত। ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। এবপর মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ-এর ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলার দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দেখলেন সরকার ভূমিরাজস্ব কার্যক্ষেত্রে কোন আযই পাচ্ছে না; সমস্ত জমি জায়গীরদারদের হাতে ন্যস্ত—সরকারের প্রত্যক্ষ আয়ের উৎস একমাত্র শুল্ক। তিনি রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলা সুবাকে ১৩টি চাকলায় ভাগ করেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বজায় ছিল। বর্ধমান চাকলা ছিল বৃহত্তম, আয়তন ছিল ৫১৮৪ বর্গমাইল। সমগ্র সরিফাবাদ, সুলেমাবাদের কিছু অংশ, সাতগাঁও-এর কয়েকটি পরগনা ও মান্দারণের অর্ধেক নিয়ে গঠিত ছিল চাকলা বর্ধমান। W.B. Dist Records, Burdwan এ দেখা যায় বর্ধমান চাকলা ৬৪টি পরগনায় বিভক্ত ছিল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের ফলে বাংলায় নবাবী শাসন কার্যত শেষ হয় ও কোম্পানীর শাসন শুরু হয়। অর্থাৎ de jure শাসনকর্তা নবাব আর কোম্পানী হয় de facto শাসনকর্তা। কর্ণওয়ালিসের পূর্ব পর্যন্ত চাকলায় ফৌজদার কোতোয়াল ও চৌধুরী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন আর পরগনায় সামন্তরাজা ও জমিদারের শাসন কর্তৃত্বে ছিল। কর্ণওয়ালিসের সময় দেশকে ৩৫টি জেলায় বিভক্ত করে, জেলাকে দেশের শাসনকার্যের কেন্দ্ররূপে গঠন করা হল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জেলার সংখ্যা কমিয়ে ২৩ করা হয়। শাহজাহানের সময় থেকে বর্ধমানের রাজস্ব আদায়ে চৌধুরী পদ লাভ করেন পাঞ্জাবের ক্ষেত্রীবংশের সঙ্গমরায়ের পৌত্র আবুরায়, চৌধুরী পদ লাভের সঙ্গে সঙ্গে কোতোয়ালী পদও লাভ করেন। কাজেই আবুরায় রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষারও দায়িত্ব লাভ করেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করেন তখন বর্ধমানের জমিদার ছিলেন আবুরায়েরই বংশধর ত্রিলোকচাঁদ রায় (১৭৪৪–১৭৭০)। ত্রিলোকচাঁদের ছিল ৭৫টি পরগনা।

সেকালে সমগ্র পরগনার শান্তিরক্ষার দায়িত্ব মহারাজের ওপরই ন্যস্ত ছিল। শান্তিরক্ষার জন্য পরগনাকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। থানাজাত আর গ্রাম-সরঞ্জামী। থানাজাত ছিল তিন ভাগে বিভক্ত—থানাদারী, কোতোয়ালী আর ফাঁড়িদারী। থানাদারের কাজ ছিল দেশের চুরিডাকাতি বন্ধ করা আর চুরিডাকাতি হলে থানাদারকেই সেই চোরডাকাত ধরে অপহৃত দ্রব্যের পুনরুদ্ধার করতে হত। শহর কোতোয়াল ছিল শহরের শান্তিরক্ষার দায়িত্বে। আর ফাঁড়িদার ছিল স্থলপথে শান্তিরক্ষার দায়িত্বে। এছাড়া ফাঁড়িদারকে দেখতে হত রাজপথে যেন জনসাধারণ নির্ভয়ে নিরুপদ্রবে যাতায়াত করতে পারে; চুরি, রাহাজানি যেন না হয়। রাহাজানি হলে দস্যুদের ধরে এনে ফাঁড়িদারকে রাজদ্বারে হাজির করতে হত। যদি থানাদার বা ফাঁড়িদার অপহৃত দ্রব্যের পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হতো, তাহলে থানাদার, ফাঁড়িদার ও শহর কোতোয়ালকে নিজ নিজ এলাকার চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মালিককে ক্ষতিপূরণ করতে হত। এদের নির্দিষ্ট কোন বেতন ছিল না। তবে রাজার কাছ থেকে চাকরাণ জমি পেতো আর খোরাকিবাবদ টাকা পেত।

গ্রাম-সরঞ্জামী ছিল গ্রামের চৌকিদার। এদের কাজ ছিল রাত্রে গ্রাম পাহারা দেওয়া। গ্রামের মাঠের শস্য কাটা হলে, যতক্ষণ না জমির মালিকের সঙ্গে শস্য ভাগ হয়, ততক্ষণ তার রক্ষণাবেক্ষণ করা। তাছাড়া গোমস্তার নির্দেশমত খাজনার তাগিদ দেওয়া, প্রজাকে গোমস্তার কাছে ডেকে আনা বা দরকার হলে ধরে নিয়ে আসা, থানা-কাছারীতে প্রহরীর কাজ করা ইত্যাদি। এরা এসব কাজের জন্য প্রত্যেকে সাড়ে আঠার বিঘা করে জমি চাকরাণ পেত কিন্তু খোরাকি পেত না। প্রতি গ্রামে গড়ে তিনজন করে গ্রাম-সরঞ্জামী বা চৌকিদার থাকতো।

ত্রিলোকচাঁদকে ৭৫টি পরগনার জন্য কোম্পানীকে রাজস্ব দিতে হত ৪৩ লক্ষাধিক টাকা। এছাড়া হাওল, জিয়াদা, চরতি, ও ইজারা বাবদ ছয় লক্ষ টাকা, অনাদায়ী পতিত জমির জন্য ৫৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত দিতে হত। রাজস্ব জমা দিলে কোম্পানীর কাছ থেকে দাখিলা পাওয়া যেত। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিলোকচাঁদ যে রাজস্ব জমা দেন তাতে গভর্ণর ভেরেলিষ্ট-এর মোহর দেখা যায়—দাখিলাটি এইরূপ—শাহ্ আলম বাদসাহ গাজী ফিদবী ওমদতল মোমালেক একতে থায়াল মোল্‌ক কমরদ্দৌলা ভারলেষ্ট সেপাহ্‌দার জঙ্গ বাহাদুর। মোহারাঙ্কিত।

রাজস্ব পরিশোধ করতে না পারলে জমিদারকে কারারুদ্ধ করে সেই টাকা আদায় করা হত। মহারাজা আবার প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা ছাড়া একাধিক

আবওয়াব আদায় করতেন; প্রজারাও খাজনা দিতে না পারলে তাদের কাছারী ঘরে আটক রাখা হত ও নানা রকম অত্যাচার করা হত।

সেকালে চাকলার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ভার মহারাজার হাতেই ছিল। অর্থ আত্মসাৎ করলে আসামীকে কারারুদ্ধ করে রাখা হত। এই বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে কাউন্সিলে আপীল করা চলতো। আপীলের শুনানী ও বিচারের দায়িত্ব স্থানীয় ইংরেজ-কর্মচারীর ওপর ছেড়ে দেওয়া হত।

বর্গীর অত্যাচার বা শত্রুর আক্রমণ থেকে চাকলাকে রক্ষার জন্য মহারাজার অধিকারে স্থানে স্থানে সেনানিবাস নির্মাণ করা হত। রাজবাটী, মহব্বৎগড়, অম্বিকা, তালিতগড়, সেনপাহাড়ী, লালখণ্ড, চন্দ্রকোণা, আরোরাগড়, সেরগড়, জামগাঁ ও ওরৎগড়ে এরকম মহারাজার দুর্গ ছিল। পরে বর্গীর অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমান চাকলার কয়েক জায়গায় কোম্পানীও সেনানিবাস স্থাপন করে। চিরস্থায়ী ব্যবস্থার আগে পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে চাকলার আয়তন কমিয়ে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য জেলার সৃষ্টি করা হয়।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বুদবুদ, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কাটোয়া, রানীগঞ্জ, জাহানাবাদ ও বর্ধমান সদর মহকুমা ও ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কালনা এই ছয়টি মহকুমা গঠিত হয়। পরগনাকে থানায় রূপান্তরিত করা হয়।

মহকুমাভিত্তিক থানার নাম :

সদর : বর্ধমান, খণ্ডঘোষ, ইন্ডাস, সেলিমাবাদ, গাঙ্গুরিয়া ও সাহেবগঞ্জ।

কাটোয়া : কাটোয়া, কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট।

কালনা : কালনা, ভাতুরিয়া ও মন্তেশ্বর।

জাহানাবাদ : জাহানাবাদ, কোতলপুর, গোঘাট ও রায়না।

বুদবুদ : বুদবুদ্, আউসগ্রাম ও সোনামুখী।

রানীগঞ্জ : রানীগঞ্জ, কাঁকসা ও নিয়ামতপুর। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রানীগঞ্জ মহকুমাকে আসানসোল মহকুমা করা হয়।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান ভেঙে বাঁকুড়া জেলা সৃষ্টি হয়। পরে জেহানাবাদ (পরবর্তীকালে নাম হয় আরামবাগ) ও বুদবুদ থেকে সোনামুখীকে কেটে নিয়ে বাঁকুড়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে Peterson-এর জেলা গেজিটিয়ারে নিম্নবর্ণিত মহকুমা ভিত্তিক থানার নাম পাচ্ছি :

বর্ধমান : বর্ধমান, মেমারি, জামালপুর, রায়না, খণ্ডঘোষ, গলসী, আউসগ্রাম, সাহেবগঞ্জ ও সাতগেছিয়া। (পরে সাহেবগঞ্জ থেকে থানা উঠে আসে ভাতার-এ)

আসানসোল : আসানসোল, রানীগঞ্জ, কাঁকসা, ফরিদপুর ও বরাকর।

কাটোয়া : কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট।

কালনা : কালনা, পূর্বস্থলী ও মন্তেশ্বর।

কোম্পানী যখন ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভ করে তখন বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও বীরভূমের ১/৩ অংশ নিয়ে—বর্ধমান জেলা গঠিত ছিল। পরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী বিচ্ছিন্ন হয়, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া ও বীরভূম বিচ্ছিন্ন হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাঝে মাঝে জেলার সীমানায় ছোটখাট পরিবর্তন ঘটানো হলেও, ১৮৮৫-এর পর জেলার সীমানায় বড় রকমের কোন রদবদল ঘটানো হয় নাই। সম্প্রতি কয়েক বৎসর আগে আসানসোলকে ভেঙে দুর্গাপুরকে পৃথক মহকুমা করা হয়।

কর্ণওয়ালিশ যখন প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বিভাগ ও জেলার সৃষ্টি করেন তখন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন কমিশনার; তাঁর কার্যালয় স্থাপিত হয় হুগলী জেলার চুঁচুড়ায়। জেলার প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। মাঝে মাঝে তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটও নিয়োগ করা হত। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে থাকতেন ৫ জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আসানসোল মহকুমার যখন সৃষ্টি হয় তখন তার গুরুত্ব বিবেচনা করে একজন convented civil servant পদাধিকারী অফিসার ও তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন ডেপুটি কালেক্টর ও একজন সাবডেপুটি কালেক্টর দেওয়া হত। কালনা ও কাটোয়ার দায়িত্বে থাকতেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—এক বা একাধিক সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের সাহায্য করতেন।

ডালহাউসীর সময় যখন Public Works Department-এর সৃষ্টি হয়, তখন তার দায়িত্ব দেওয়া হয় একজন Executive Engineer এর ওপর। কিন্তু জলসেচ ও বাঁধ দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন Executive Engineer, Northern Embankment and Drainage Division—তাঁর কার্যালয় ছিল কলকাতায়।

পরবর্তীকালে প্রশাসনিক কাজের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলা শাসকের অধীনে নানা বিভাগ খোলা হতে থাকে। পূর্বে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সদর কার্যালয়ের চারটি বিভাগ ছিল—(1) Judicial Munshikhana (2) Revenue Munshikhana (3) Treasury (4) General Department.

পরে বিচারবিভাগকে সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগ থেকে পৃথক করার ফলে ও স্বাধীনতার পর যখন জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হল তখন এই বিভাগগুলির কার্যকারিতাও চলে গেল। কেবল নামে এখনও এদের অস্তিত্ব আছে। এখন Judicial Munshikhana-এর অধীনে রয়েছে সাধারণ প্রশাসন, বন্দুকের

লাইসেন্স, মোটর ভেহিকেলস্-এর লাইসেন্স, যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমার প্রমোদকর, বিস্ফোরক পদার্থের লাইসেন্স, পেট্রোলিয়াম লাইসেন্স, চৌকিদারী বিষয়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি।

Revenue মুন্সীখানা দপ্তর ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি সংস্কার, ভূমি রাজস্ব দপ্তরে রূপান্তরিত, Treasury দপ্তরের কাজ এখন State Bank-এই হচ্ছে। Treasury-তে আগে যে ধনাগার ছিল সেটা এখন State Bank-এ মিশে গেছে, তবে হিসাবনিকাশ, খাজাঞ্চিখানা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে Treasury অফিসে হয়। সাধারণ প্রশাসন বিভাগ যেমন ছিল তেমনই আছে।

বর্তমানে সবকারের কাজের পরিধি অনেক বেড়ে গিয়েছে, কাজেই দফতরও অনেক খুলতে হয়েছে। Dist census Hand book Bardhaman-এ Administrative Development সম্বন্ধে মন্তব্য—In the district of Bardhaman, at present there are five subdivisions. The names of such subdivisions are Bardhaman (Sadar), Katwa, Durgapur and Asansol, Durgapur subdivision has been created in the last decade. There are 32 police stations and 33 community Development Blocks. In the district there are 2649 villages.* Two new police stations have been created in the last decade. The names of such police stations are Pandabeswar and Madhabdihi Pandabe-swar Police station is located in Durgapur sub-division and Madhabdihi police Station has been created in Burdwan Sadar sub-division.

There are 61 census towns. Among such towns 7 are statutory towns and the rest are non-statutory towns. In the last decade many new places, have been declared as census towns. According to 1991 census there are in the district 6050605 persons divided into 3927613 rural and 2122992 urban people.

১. জেলা সদর দপ্তর : এর প্রশাসনের শীর্ষে আছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর—তাঁর অধীনে রয়েছে তপসিলী জাতি ও উপজাতি বিভাগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, পরিকল্পনা, ট্রেজারী। তাঁর সহযোগী আছেন ছয় জন অতিরিক্ত জেলা-শাসক—এক এক জনের এক এক দপ্তর, যেমন—সাধারণ, ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন (Development), নেজারত, জেলাশাসকের সদর দপ্তরে আছেন একজন

* প্রকৃত প্রস্তাবে ব্লকের সংখ্যা ৩১ ও গ্রামের সংখ্যা ২৫৮৮-এর মধ্যে অনধ্যুষিত ১০৫

সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এছাড়া জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি এবং প্রচার দপ্তরও জেলা শাসকের দপ্তরের অধীন।

সদর দপ্তরে আরও W.B.C.S Cadre-এর ২০ জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বে, এদের একজন, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের সেটেলমেন্ট অফিসার একজন (এখন নাম হয়েছে Dist. Land Reforms Officer বা D.L.R.O), একজন পঞ্চায়েত অফিসার, একজন special Land Acquisition officer, একজন Regional Transport Officer (R.T.O) প্রভৃতি।

২. ভূমি-রাজস্ব বিভাগ :

একজন বাঁকুড়া-বর্ধমান সেটেলমেন্টের চার্জ অফিসার (বর্তমানে S.D.L.R.O) একজন দামোদর ক্যানেল সেচ বিভাগের রেভেনিউ অফিসার, একজন দামোদর উপত্যকার রেভেনিউ অফিসার আর একজন অতিরিক্ত ভূমিগ্রহণ আধিকারিক। এছাড়া প্রয়োজন পড়ার সঙ্গে দপ্তরও বাড়ছে আর আরও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হচ্ছেন।

৩. ক্ষতিপূরণ ও ভূমিসংস্কার বিভাগ : জেলা ক্ষতিপূরণ আধিকারিক (W.B.C.S. Officer)

৪. শিক্ষাদপ্তর : জেলা পরিদর্শক (মাধ্যমিক), জেলা পরিদর্শক (প্রাথমিক) জেলা শিক্ষাবোর্ড, জেলা সোসাল এডুকেশন অফিসার। প্রত্যেক বিভাগের শীর্ষে একজন করে W.B.E.S অফিসার আছেন।

৫. খাদ্য সরবরাহ : শীর্ষে আছেন ডিস্ট্রিক্ট কনট্রোলার (ডেপুটি বা সাবডেপুটি ক্যাডারের অফিসার)

৬. পুলিশ প্রশাসন—শীর্ষে আছেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব্ পুলিশ ও তাঁর সহযোগী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। এছাড়া তিনজন ডেপুটি পুলিশ সুপার—হেড কোয়ার্টাস, এনফোর্সমেন্ট ও ইনটেলিজেন্স বিভাগের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত।

৭. আবগারী বিভাগ (Excise) : একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব্ পুলিশ (একসাইজ) প্রশাসনের শীর্ষে আছেন।

৮. স্বাস্থ্য বিভাগ : ক. দায়িত্বে আছেন Chief Medical Officer, Bijoy Chand Medical College and Hospital, ও C.M.O.H (Reserve Store) ও এঁদের সহকারী ২ জন Deputy C.M.O.H

খ. Veterenary and Animal Husbandary বিভাগ : শীর্ষ দায়িত্বে আছেন একজন Superintendent—State Veterenary Service, Deputy Director, Animal Husbandry, Veterenary Surgeon.

৯. বিচার বিভাগ : জেলার বিচারবিভাগের শীর্ষে আছেন জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ, Chief Judicial Magistrate। [আইন আদালত সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

১০. সেচ বিভাগ : শীর্ষে আছেন Executive Engineer

১১. কর্মীনিয়োগ ও বিনিয়োগ দপ্তর : জেলার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসার, এছাড়া জেলা সদর দপ্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকগুলি দপ্তর আছে; যেমন—(১) আয়কর বিভাগে, Asstt. Commissioner, তাছাড়া আছে Deputy Central Intelligence Officer, Assitt Engineer, construction Subdivision, Project Evaluation Officer, Superintendent—Central Excise, Superintendent—Post Office, Burdwan-Divn., Divisional Engineer—Telecommunication, (বর্তমানে ভারতসঞ্চার নিগম) Assitt. Engineer Eastern Railways, Television centre প্রভৃতি।

জেলার পাঁচটি মহকুমার শাসনকার্য মহকুমা-অফিসারের দায়িত্বে পরিচালিত হয়।

বর্ধমান মহকুমার সদর দপ্তর জেলাশাসকের দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একজন সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এই প্রশাসনের শীর্ষে আছেন। নিজের দপ্তরের সব রকম কাজ ছাড়াও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও সময় সময় তাঁর দপ্তরের কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেন, তাঁকে সে দায়িত্বও পালন করতে হয়।

জেলার মহকুমাগুলির মধ্যে খনি ও শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা আসানসোলের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা বেশী। এখানকার প্রশাসনের শীর্ষে আছেন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক। তিনি জেলাশাসকের মত সমস্ত দপ্তরের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত।

পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষে আছেন একজন সুপারিনটেনডেন্ট অব্ পুলিশ-এর পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন পুলিশ সুপার ও তাঁর সহযোগী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। খনি ও শিল্প সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য এবং বিহার সীমান্তে অবস্থিত হওয়ার জন্য এখানকার অপরাধের সংখ্যা বেশী।

আসানসোলে অনেকগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস আছে। যেমন : (1) Assitt Central Intelligence Office, বার্ণপুরেও অনুরূপ আর একটি অফিস আছে, (2) Asstt Collector Central Excise (3) Asstt. Coal Superintendent, (4) Regional Commissioner, Coal mines Provident Fund, (5) Asstt Labour Commissioner (6) Asstt. National Savings Officer (7) Field Publicity officer, (9) Inspector,

Mines Labour Welfare (শ্রমকল্যাণ বিভাগ) (10) খনি নিরাপত্তা বিভাগ (11) শ্রমিকদের শিক্ষা কেন্দ্রের আঞ্চলিক ডাইরেক্টর-এর অফিস। (12) ডাক ও তার বিভাগ (13) বিভাগীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে (14) আয়কর বিভাগ ইত্যাদি।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর আগে আসানসোল মহকুমাকে ভেঙে দুর্গাপুরকে মহকুমার মর্যাদা দেওয়া হয়। এর অধীনে নিম্নলিখিত থানাগুলি আছে—ফরিদপুর, দুর্গাপুর, নিউ টাউনশিপ, কোকওভেন, কাঁকসা।

দুর্গাপুরের প্রশাসনিক শীর্ষে আছেন একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক ও একজন chief executive officer।

গোটা জেলাকে ৩১টি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্লকে প্রশাসনের শীর্ষে আছেন W.B. Civil Service-এর পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন Block Development Officer। অবশ্য Subordinate Agricultural Officer-এর পদমর্যাদাসম্পন্ন অফিসারও B.D.O হতে পারেন। B.D.O.-র সহকারী আছেন Agricultural Extension Officer, Panchayet Extension Officer, Veterenary Asstt. Surgeon, Fishery Extension Officer, Social Education Officer, ও একজন Sub. Asstt. Engineer. অর্থাৎ পল্লীর উন্নয়ন কার্যে বা পল্লীবাসীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কার্যে সহায়তা করার জন্য সর্বস্তরের অফিসারের সমন্বয় ঘটানো হয় সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে। এছাড়া একজন মহিলা Extension Officer, ২ জন গ্রামসেবিকা ব্লক অফিসে পল্লীর মহিলাদের সাহায্যার্থে নিযুক্ত আছেন। প্রতি গ্রামে একজন করে গ্রামসেবকও আছেন।

যতদিন যাচ্ছে ততই ব্লকের কাজের পরিধিও বাড়ছে; কাজেই এখন প্রতিটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে একজনের জায়গায় দুজন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার নিযুক্ত। প্রথম B.D.O. সমগ্র ব্লক এলাকায় সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বে থাকেন, তাছাড়া তিনি সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতিরও Executive Head ও পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত। তাঁকে সাহায্য করার জন্য সমমর্যাদাসম্পন্ন একজন সহযোগী (joint) বি.ডি.ও. নিযুক্ত হন। তিনিই সমস্ত টাকা তোলা বা টাকা বণ্টনের পূর্ণ দায়িত্বে থাকেন। এই দুজন B.D.O. ছাড়া পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার, সমবায় পরিদর্শক, ব্লক রিলিফ অফিসার আছেন। রিলিফ অফিসারের দায়িত্ব হচ্ছে দুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বা বন্যাক্লিষ্ট ব্যক্তিদের রিলিফ বণ্টন, তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে সাহায্য করা, বা শোকসন্তপ্ত পরিবারের মধ্যে অনুদান বণ্টন। এখন আবার O.B.C. Inspector নিযুক্ত

হয়েছেন। তাঁকে সমস্ত তপসিলী জাতি, উপজাতি, স্বীকৃত অনুন্নত জাতি (O.B.C)-দের সার্টিফিকেট দিতে হয়। অন্যান্য Extension Officer তো আছেনই।

পরিকল্পনা, কৃষি, রাস্তাঘাট ও গৃহনির্মাণ এবং সবরকম প্রযুক্তিগত কর্মের জন্য চার জন Sub. Asstt. Engineer নিযুক্ত হয়েছেন আর সবার কাজের অগ্রগতি ও মূল্যায়নের (Progress and Evaluation) জন্য একজন Inspector নিযুক্ত হয়েছেন। এই সমস্ত অফিসার Public Service Commission-এর মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের জন্য নিযুক্ত হলেও যখন Block-এ Posted হন তখন সম্পূর্ণরূপে B.D.O-র নির্দেশমত চলতে হয় ও তাঁদের দায়বদ্ধতাও B.D.O.-র নিকট। বর্তমানে গ্রামসেবক ও সেবিকার পদের অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে।

বর্ধমানে একজন Dist. Livestock Officer অধিষ্ঠিত আছেন। তাছাড়া Livestock Superintendent Western Range। গোবীজ সংগ্রহ ও কৃত্রিম প্রজননের দায়িত্বে আছেন আর একজন Livestock Superintendent। এর অধীনে বর্ধমান, সাতগেছিয়া, মেমারী, শক্তিগড় ও বনপাশ কামারপাড়ায় কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

বর্ধমান রেঞ্জের পশু চিকিৎসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর অফিস বর্ধমানে। দাতব্য পশু চিকিৎসালয়ে একজন Veterenary Surgeon, ২ জন ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসক ও একজন ভেটেরেনারী পরিদর্শক গ্রামেগঞ্জে পশুচিকিৎসা পরিষেবায় নিযুক্ত।

বর্ধমানে Dist. Industrial Officer-এর ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তর রয়েছে। দুর্গাপুরে আছে কাষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র, কাষ্ঠ ও লৌহশিল্প প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনকেন্দ্র। শক্তিগড় ও গুসকরায় এদের শাখা অফিস আছে। তাছাড়া বড়শূলে সূতা উৎপাদন ও বস্ত্রবয়ন কারখানা স্থাপিত হয়েছে। বর্ধমানের ডেয়ারী থেকে Processed Milk সরবরাহ হয়। বর্তমানে আউসগ্রামে Mother Dairy-র কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এখান থেকে গুসকরা, মানকর, গলসী ও বর্ধমানে মাদার ডেয়ারী থেকে টোনড্ মিল্ক, পনীর, ঘি, দই সরবরাহ করা হয়।

এছাড়াও বর্ধমান ও কাটোয়ায় সমবায় দপ্তর, আসানসোলে পরিকল্পনা সংগঠন, দুর্গাপুরে আছে পর্যটন দপ্তর।

বর্ধমানের বাবুরবাগে স্থাপিত হয়েছে মৎস্যদপ্তর, রমনাবাগানে বনদপ্তর, আসানসোল ও রানীগঞ্জে আছে খনিদপ্তর।

যতদিন যাচ্ছে তত কর্মবিভাজন হচ্ছে আর কর্মবিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরেরও সৃষ্টি হচ্ছে।

সাতাশ অধ্যায়



স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (শহরাঞ্চল)

ইংরেজ শাসনের সূচনায় কলকাতার বাইরে মফস্বল বা গ্রামবাংলার উন্নতি বিষয়ে সরকার বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই। ইংরেজ সরকার প্রথম দিকে রাজস্ব আদায় আর শান্তিরক্ষার দিকেই দৃষ্টি দিত। সাধারণ প্রশাসন আর শান্তিরক্ষা ছাড়াও জনগণের উন্নতির জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত পরিষেবাও যে দরকার, এটা বিবেচনা করার মত বিচক্ষণতা তাদের ছিল না। আর্থিক অভাবও এর জন্য কিছুটা দায়ী। অবশেষে স্থির হয় যে জনগণের কাছ থেকেই কর আদায় করে সেই টাকার সঙ্গে কিছুটা অনুদান বা ভর্তুকি দিয়ে মফস্বল শহর ও গ্রামের রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, শিক্ষার উন্নতির দায়িত্ব জনগণের হাতেই ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭১ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হয়। এতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে প্রতি জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট একটা করে জেলা-বোর্ড গঠন করবেন। এর সদস্যরা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত হবেন ও এর এক তৃতীয়াংশের বেশী সরকারী কর্মচারী হবেন না। এই বোর্ডই জনগণের কাছ থেকে রোড সেস বা পথ কর, শিক্ষাকর আদায় করে রাস্তাঘাট নির্মাণ করবেন বা প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে সচেষ্ট হবেন বলে ঠিক হয়।

মনে রাখা দরকার গ্রাম ও শহরগুলি এক একটি রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ। এখানে স্থানীয় জনগণের জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, যাতায়াতের ব্যবস্থা, জলসরবরাহ প্রভৃতি পরিষবা গ্রামের নির্বাচিত বা মনোনীত গ্রাম-বৃদ্ধদের দ্বারা পরিচালিত হতো। গ্রামীণ সভাসমিতি সেই বৈদিক যুগ থেকে গ্রাম পরিষেবা চালিয়ে আসছে। কেবল মোগল শাসনের শেষের দিকে—এই সমস্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের অবলুপ্তি ঘটে। ১৮৫০ সালের XXVI নং আইনের দ্বারা মফস্বল শহরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের ব্যবস্থা চালু হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের District Municipal Improvement Act (Act No. III) দ্বারা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে

বর্ধমান শহরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। বিভাগীয় কমিশনার বা তাঁর মনোনীত কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান ও তাঁর সঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, নাগরিকদেব মধ্য থেকে ১২ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে বর্ধমানে প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। প্রথম অধিবেশন বসে ১৮৬৫ সালের ১লা মে। নিম্নলিখিত সদস্য নিয়ে প্রথম মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠিত হয়।

১. মিঃ সি. এফ. মন্টেসর—(পৌরপিতা)
২. মিঃ এস. এস. হগ—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
৩. মিঃ এল. আর—এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
৪. মিঃ এইচ. এস. সাদ'র ল্যাণ্ড
৫. ডঃ এ. এ. মণ্টেল
৬. মিঃ পি. মোগার্থা
৭. বাবু পাঞ্জাবলাল বর্মণ
৮. মতিলাল চৌধুরী
৯. বনমালী মুখার্জী
১০. হরিনারায়ণ পুরোহিত
১১. মদনলাল বর্মণ
১২. মহানন্দ রায়
১৩. মদনলাল তেওয়ারী
১৪. ব্রজলাল তেওয়ারী
১৫. মুন্সী জোহাদ রহিম

দেখা যাচ্ছে সদস্যদের মধ্যে ৬ জন ইংরেজ আর ৯ জন ভারতীয়। সকলেই সরকার মনোনীত। ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন ভারতীয় পৌরপ্রধানের পদে মনোনীত হন নাই। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচন আইন পাশ হয়। এর দ্বারা নাগরিকগণ আংশিক ভোটাধিকার লাভ করেন। কিন্তু এই আংশিক ভোটাধিকার লাভ করতেও নাগরিকদের বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়। তখন পৌরপতি ই.এইচ. হুইন ফিল্ড আর উপপৌরপতি ই.এইচ. রাডক। এঁদের কাছে বর্ধমান শহরের ১০৪৫ জন নাগরিক একটি স্মারকলিপিতে বর্ধমান পৌর-প্রতিষ্ঠানে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২নং ধারা প্রয়োগ করে আংশিক নির্বাচন চালু করার আবেদন করেন। আবেদনকারীদের শীর্ষে ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচাঁদ ও ৬৪৭ জন করদাতা। এই আবেদনের ওপর Mr. Radok মন্তব্য করেন—It is barely a tenth of the rate payers. The name of Burdwan

Maharaja has given weight to it. মহারাজের সম্মানরক্ষার্থে রাডক নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও নাগরিকদেব দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন। Hunter তাঁর Statistical Account of Bengal Vol. (iv) টি গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—প্রথমে মিউনিসিপ্যাল শহরগুলি ছিল কতকগুলি গ্রামের সমষ্টিমাত্র। বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি বর্ধমান শহরের চারপাশের ৯৩টি ছোট ছোট গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ নং আইনের ২ ধারা মতে ১৮৫৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর এক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বর্ধমান শহর বলে ঘোষিত হয়। এদিলপুর, তেজগঞ্জ, ফকিরপুর, বালামহাট, দেওয়ানগঞ্জ, তরীব মহল্লা, আলিগঞ্জ, আলিমগঞ্জ, কাঠঘর মহল, বঙ্গপুর, ভাটশালা, গোলাহাট, খজানরবেড়, শাঁকুরিপুকুর, দামরাই, মাসারবেড়, জগৎবেড়, পারবীরহাট্টা, নীলপুর, ছোটনীলপুর, নিষকিনিবাজার, কানাইনাটশালা, বেনপাড়া, ইবলাবাজার, শিয়ালডাঙ্গা, কালীবাজার, হাফিজুললার বেড়, রসিকপুর, বাহির সর্বমঙ্গলা, বাবুরবাগ, কেশবগঞ্জ চটী, গদা, কাজিরহাট, কাবরা পাট্টা, পাহাড়পুর ও নাথদ্দী—এই সব গ্রাম বর্ধমান শহরের মধ্যে বলে ঘোষিত হয়। পরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইনের (Act III) ৩ ও ৪ নং ধারা মতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই বছরের ১লা মে থেকে পৌরসভা কাজ শুরু করে।

যাই হোক, রাডক ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের স্বায়ত্তশাসন আইনের ২নং ধারা মোতাবেক বর্ধমানবাসীর দাবীতে আংশিক নির্বাচন স্বীকার করে নিলে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচন হয় ও ২১ জন প্রার্থীর মধ্য থেকে ১২ জন নির্বাচিত হন। ১৮৭০–৭১ সালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির লোকসংখ্যা ছিল ৩২৩২১। মিউনিসিপ্যালিটির বার্ষিক আয় ছিল ৫৪৫০ স্টার্লিং ব্যয় ৫৪৫০ স্টার্লিং, মাথাপিছু ট্যাক্সের হার (এক টাকা ১০ আনা ১১ পাই)। জন্মলগ্নে পৌর-প্রতিষ্ঠানে পৌরসভা কালেক্টর অফিসের একাংশে অনুষ্ঠিত হত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মাসিক ২৫ টাকা ভাড়ায় old chapel (Roman church) এ স্থানান্তরিত হয়। তারপর পৌরভবন উঠে আসে পুরাতন পোষ্ট অফিসের একাংশে। পুরাতন পোষ্ট অফিস তখন ছিল বর্তমান পৌরভবনের এলাকার মধ্যে। শোনা যায় ১৮৮৫ সালের ১লা মে পৌরভবনে আগুন লাগে—পোষ্ট অফিসের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে বাদানুবাদের ফলেই এই আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে।

অবশেষে লালা নির্মলপ্রকাশ নন্দের অর্থানুকূল্যে বর্তমান পৌরভবনের কেন্দ্রীয় অংশ নির্মিত হয়। তখন পৌরসভা নিজস্ব ভবনে উঠে আসে। প্রথমে

পৌরসভার এলাকা ছিল ৮ বর্গ মাইল ও ৫টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। পরে বিভাগীয় কমিশনারের ১২৭১ নং আদেশবলে পৌর-এলাকা ২৫টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হয়। ক্রমে ক্রমে পৌরসভার কাজের পরিধি বাড়তে থাকে; রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, জল সরবরাহ, রাস্তায় বাতিদান, টীকাকরণ ছাড়াও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও চারটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পৌরসভার দ্বারা পরিচালিত হত। বর্তমানে ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারী ঘাটতি-ভিত্তিক অনুদানে চলে। তবে বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে পৌরসভার চেয়ারম্যান বা তাঁর মনোনীত কোন কমিশনার বিশেষ অধিকার বলে অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৭২–৭৩ সালে বর্ধমান পৌর-এলাকা ছিল ৮.৭৫ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ১,৪৯,২৮১, করদাতার সংখ্যা ২৪০০০। মাথাপিছু করের হার নয় টাকা। ঐ সময় মিউনিসিপ্যালিটির মোট আয় ৩৩,৬৩,৪৭৭ টাকা। এর মধ্যে সরকারী অনুদান ১২৪৭০৪৬ টাকা, নীট ব্যয় ছিল ৩১,৭৭,৫৯০ টাকা। এই খরচের মধ্যে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যয় ২০৬৫৮২৬ টাকা, জনশিক্ষা খাতে ব্যয় ২৭৮২.৩২ টাকা। বাকী বিদ্যুৎ-এর বিল, ময়লা নিষ্কাশন, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রভৃতি। আয়ের প্রধান প্রধান উৎস Holding-এর মূল্যায়নের ওপর একটা শতকরা হারে কর, জলকর, ময়লা নিষ্কাষণ সংক্রান্ত সংরক্ষণ (conservancy) ট্যাক্স, গাড়ীর লাইসেন্স ফি, বাজারের ট্যাক্স, শ্মশানের ট্যাক্স, বাড়ী ভাড়া ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আয়। বর্তমানে শহরের সর্বত্র পরিস্রুত জল সরবরাহের জন্য শহরের বিভিন্ন স্থানে গভীর নলকূপ থেকে জল উত্তোলন করে বিশেষভাবে নির্মিত জলাধারে পরিস্রুত করে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু সর্বপ্রথম শহরবাসীর জলকষ্ট নিবারণের জন্য ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ২,৩৫,৫০০ টাকা ব্যয়ে লাকুড্ডি-তে জল ট্যাঙ্ক নির্মাণ করে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। এই অর্থের মধ্যে বর্ধমানের মহারাজা আফতাবচাঁদ ৫০,০০০ টাকা দান করেন, সরকারী অনুদান আসে ৫০,০০০ টাকা ও পুরাতন স্লুইস গেটের মূল্যবাবদ ১১০০০ টাকা ও বাকি অর্থ বাজার থেকে ঋণ করে সংগৃহীত হয়। তবে পূর্বে এমন কি স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রধান প্রধান রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটি থেকে অপরিস্রুত জল দেওয়া হত। যেখানে ট্রাকবাহিত জলের ট্যাঙ্ক যেত না, সেখানে ভিস্তিওয়ালা চামড়ার ভিস্তি করে রাস্তায় জল সিঞ্চন করত। রাস্তায় রাস্তায় কেরোসিনের বাতি জ্বালানো হত। এখন রাস্তায় বিদ্যুতের আলো তবে বেশীর ভাগ রাস্তায় বালব নাই। আর রাস্তায় জল দেওয়া কবে উঠে গেছে তার ঠিক নেই। এখন আয়ও যেমন বেড়েছে ব্যয়ও তার চেয়ে

বেশী বেড়েছে। তবে ব্যয়ের সিংহভাগ যাচ্ছে কর্মচারী বেতন ও ভাতা দিতে, শহরের উন্নয়নের জন্য খুব কমই অবশিষ্ট থাকছে।

অবশ্য এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আশির দশক থেকে পৌরএলাকার পানীয় জল সরবরাহ ছাড়াও অনেক উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেশ কিছু আর্থিক অনুদান পৌর এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে। নগরায়ন-এর অর্থ শুধু রাস্তা, ড্রেন, ময়লা নিষ্কাশন, জল সরবরাহ-ই নয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, বিনোদন ও নগরায়নের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। এর জন্য প্রতিটি পৌরসভার অধীনে জেলা উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে—ইতিমধ্যেই অনেক sports complex নির্মিত হয়েছে, সংস্কৃতি মঞ্চ তৈরী হয়েছে, স্কুল গৃহ নির্মিত হচ্ছে এমন কি পৌরসভা সাক্ষরতা অভিযানেও অংশগ্রহণ করছে।

আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি : ১৮৫০ সালের ২৯শে অক্টোবর-এর বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কালনা, কাটোয়া, রানীগঞ্জ আসানসোলে ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়। এই ইউনিয়ন কমিটি আপাতত পৌরসভার কার্য পরিচালনা করতো। পরে ১৮৮৫ সালের ২৩শে এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ১লা জুলাই আসানসোল পৌরসভা মঞ্জুর হয়। কিন্তু কার্যকর হয় ১৮৯৬ সালে। রেলপাড়া, ইংরেজ এলাকা, বুধডাঙ্গা গ্রাম, বাস্টিন সাহেবের বাজার, পাকা বাজার, মুন্সী বাজার ও তালপুকুর চটি নিয়ে আসানসোল পৌরসভা গঠিত হয়। ১৯০৩–৪ সালে এই পৌরসভার আয় ছিল ২০,৩০০ টাকা, এর অর্ধেক Municipal tax থেকে আসতো। ব্যয় ছিল ২০,৪০০ টাকা। প্রথমে সাতজন সরকারী পদাধিকারী অফিসার (Ex-officio) সহ ১২ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। ১৯৭২-৭৩ সালে এর এরিয়া ছিল ১০.৪৪ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ১,৫৫,৯৬৮, করদাতা ছিল ১১৫০০; এসেসমেন্ট হয়েছিল মাথাপিছু গড়ে ২৩৫.১৫ হারে; পরে করদাতাদের পুনর্বিবেচনার আবেদন ক্রমে কমিয়ে মাথাপিছু গড়ে ১১৯.৬৫ টাকা করা হয়। ১৯৭২-৭৩ এর আয় ছিল ৩২৬৯২৮৫ টাকা, ব্যয় ৩৪৩১৬৬ টাকা

কালনা মিউনিসিপ্যালিটি : এই মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয় ১৮৬৯ সালের ১৩ই মার্চ-এর বিজ্ঞপ্তির দ্বারা। প্রথমে সদস্য ছিল ১৫ জন—যার মধ্যে ৫ জন মনোনীত। এলাকা ২ বর্গ মাইল, ১৮৭১ সালের লোকসংখ্যা ২৭৩৩৬ জন, এর মধ্যে ২২৪৬৩ জন হিন্দু, ৩৫৫৭ জন মুসলমান, ৩৮ জন খ্রীশ্চান ও অন্যান্য

১২৭৮ জন। মিউনিসিপ্যালিটির আয় ১১৮৫ ষ্টার্লিং, ব্যয় ৯৮০ ষ্টার্লিং, করের হার মাথাপিছু ১০.৩৭৫ পেন্স বা ছয় আনা এগার পাই।

১৯০৭–০৮ সালে করের হাব দাঁড়ায় মাথাপিছু ১টাকা ১৩ আনা ৭ পাই। এই সময় আয় ছিল ১৪০০০ টাকা, ব্যয় ১৩৯০০ টাকা। এই সময়ের শহরের উত্তরাঞ্চল ছিল জনবহুল ও এখানকার রাস্তাঘাট, নর্দমা সবই দক্ষিণ অঞ্চলের চেয়ে অনেক উন্নত। ১৯৭২-৭৩ সালে আয় ছিল ৬০৩১২২.৮২ টাকা ও ব্যয় ৪২২০৪২.৬৯ টাকা।

কাটোয়া : কাটোয়া মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল ইউনিয়ন কমিটি থেকে সংগঠিত হয়। প্রথমে ১২ জন কমিশনার ছিলেন এর মধ্যে ৮ জন নির্বাচিত ও ৪ জন মনোনীত। মনোনীতের মধ্যে একজন সবকারী পদাধিকাবী। মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা ছিল এক বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৭৯৬৩; এব মধ্যে হিন্দু ৬৮১৭, মুসলমান ১১৩১, ক্রীশ্চান ১৫ ও অন্যান্য ১২৭৮। করদাতার সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ, করের হার ১ শি ৩.৫ পেন্স অর্থাৎ দশ আনা চার পাই। ১৮৭৮ সালে আয় ছিল ৫১৩ ষ্টার্লিং, ব্যয় ৫১৩ পাউণ্ড ১৪ শি, মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনাধীনে ছিল একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। রাস্তাগুলি অধিকাংশই পাকা, তবে খুবই সরু। ১৯৭২-৭৩ সালে আয় ২৮৪০৪১৫ টাকা ও ব্যয় ১৪৬৫৩০২ টাকা।

দাঁইহাট : দাঁইহাট পৌরসভা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১২ জন কমিশনারকে নিয়ে গঠিত এই সভায় ৮ জন নির্বাচিত ও ৪ জন মনোনীত সদস্য ছিল। মনোনীত সদস্যদের মধ্যে একজন Ex-officio। প্রথমে এর এলাকা ছিল চার বর্গমাইল, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২ বর্গ মাইল পরিমিত গ্রাম এই মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে যুক্ত হয়। লোকসংখ্যা ৭৫৩২, এর মধ্যে হিন্দু ৭৩৮৯ মুসলমান ১৭৩। মোট জনসংখ্যার ২২.৬ শতাংশ ছিল করদাতা। ১৯০৭ সালের করদাতার সংখ্যা ছিল ১২৭০। প্রথমে আয় ছিল ৩৯৮ পা ৪ শিলিং, ব্যয় ৩৮৬ পা ৮ শি; ট্যাক্সের মাথাপিছু হার ১ শি .৩৭৫ পে অর্থাৎ (আট আনা ৫ পাই)। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অধিকাংশ রাস্তা ছিল কাঁচা, শহরে জল সরবরাহ হত ভাগীরথী থেকে, তবে গ্রীষ্মকালে নদীর জল কমে গেলে শহরে জল কষ্ট দেখা দিত। ১৯৭২–৭৩ সালের আয় ১৭৭৪৮৫ টাকা, ব্যয় ১৫১৪৪১ টাকা।

রানীগঞ্জ : ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাঁকুড়া জেলা গঠিত হয় তখন রানীগঞ্জ বাঁকুড়া জেলার মধ্যে ছিল। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রানীগঞ্জ, কাঁকসা ও নিয়ামতপুর

থানা নিয়ে বর্ধমান জেলার পৃথক রানীগঞ্জ মহকুমা গঠিত হয়। ১৮৫০ সালের ২৯শে অক্টোবরের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। ২রা নভেম্বর সরকারী গেজেটে প্রথম রানীগঞ্জ ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়। প্রথম প্রথম এই ইউনিয়ন কমিটিই পৌরসভার কাজ করতো। এর অনেক পরে ১৮৭১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে রানীগঞ্জ পৌরসভা গঠিত হল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এর জনসংখ্যা ছিল ১৯৫৭৮, এর মধ্যে হিন্দু ১৭৯২৭, মুসলমান ১৪৭৩, ক্রীশ্চান ১৭৩; প্রথমে আয় ছিল ৮৭১ পাউন্ড ১২ শিলিং, ব্যয় ৮৭১ পাউন্ড ১২ শিলিং। মাথাপিছু ট্যাক্স ১০.৬৩ পেন্স অর্থাৎ ৭ আনা ১ পাই। করদাতার সংখ্যা মোট জনসংখ্যার সাড়ে দশ শতাংশ। ১৯০৭—০৮ সালে আয় দাঁড়ায় ১৮৫২৮ টাকা, ব্যয় ২১২৪৯ টাকা। শহরের যে অংশে কয়লাখনি ও বার্ন কোম্পানীর কারখানা ও অফিস সেই অংশ ছিল জনাকীর্ণ। এর রাস্তাঘাট পাকা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো। শহরের বিভিন্ন অংশে কতকগুলি পুষ্করিণী ইজারা নিয়ে শহরে জল সরবরাহ করা হত। জল সরবরাহের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। ১৯৭২-৭৩ সালের আয় ছিল ৭৩০৮৯৮ টাকা ও ব্যয় ছিল ৭১২৯১৮ টাকা।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Encyclopadea Britanica 9th Edn. Vol 3 -তে দেখা যায় উপরিউক্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ছাড়া জেলার মধ্যে জাহানাবাদ, শ্যামবাজার ও বালিতে এ সময় মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। এই বিশ্বকোষে এই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির জনসংখ্যা, আয়, ব্যয় ও মাথাপিছু ট্যাক্সে'র হারও দেওয়া আছে—

মিউনিসিপ্যালিটি	জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	আয়	ব্যয়	করের হার
শ্যামবাজার	১৯৬৩৫	১৯৩৪১	২৯৪	২৭৬ পা	২২৪ পা	৩.৩৭৫ পে.
জেহানাবাদ	১৩৪০৯	১০২২২	৩১৮৭	২৩৮ পা ১৮ শি	২৫০ পা ১৪ শি	৪.২৫ পে.
বালি	৮৮১৯	৮১৫০	৬১৯	১৭৩ পা ৪ শি	২১৪ পা ৪ শি	৪.৭৫ পে.

১৯১০ সালের বা ১৯৯৪ সালের District Gazetteer-এ এই তিন মিউনিসিপ্যালিটির কোন উল্লেখ পাচ্ছি না। জেহানাবাদ অবশ্য পরে হুগলী জেলার ও আরও পরে বাঁকুড়ার অন্তর্ভুক্ত হয়, নাম হয় আরামবাগ। রেনেলের ম্যাপে চাতনা (ছাতনা?) এর দক্ষিণে বুলাহ (Bullah) নামে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানের

উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—বিষ্ণুপুর থানার বেলিয়া বলে একটি স্থান পাওয়া যাচ্ছে, এদের মধ্যে কোনটি যদি বালি হয়, তাহলে এটিও মনে হয় বাঁকুড়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। কাঁকসা থানার ৩৭ নং মৌজা শ্যামবাজারের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বকোষে শ্যামবাজারের ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের জনসংখ্যা দেওয়া আছে ১৯৬৩৫ কিন্তু ১৯৯১ সালের census Report কাঁকসার শ্যামবাজারকে বিশ্বকোষের বলে বিশ্বাস হয় না। তবে অবশ্য W.W. Hunter তাঁর Statistical Account of Bengal Vol IV.-এ মন্তব্য করেছেন যে প্রথমে মিউনিসিপ্যাল শহরগুলি কতকগুলি গ্রামের সমষ্টিমাত্র। এই মন্তব্য মেনে নিলে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না প্রথমে পার্শ্ববর্তী অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে শ্যামবাজার পৌরসভা গঠিত হয়েছিল ও তাদের জনসংখ্যার সমষ্টি অধিক হওয়াই সম্ভব। যাই হোক সমস্ত বিষয়টিই অনুমান নির্ভর। এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

এখন জেলার পৌর-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে। আসানসোল ও বর্ধমান করপোরেশনসহ কুলটি, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, গুসকরা, মেমারি, কালনা, কাটোয়া, দাঁইহাট ও দুর্গাপুর এই কয়টি পৌরসভা হয়েছে।

দুর্গাপুরের জন্য ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে মিউনিসিপ্যালিটি ঘোষিত হয়। প্রথম নির্বাচন হয় গত ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে, সদস্য সংখ্যা ৪৩, এর মধ্যে ১৬ জন মহিলা। তার আগে দুর্গাপুরে শিল্পনগরী গড়ে ওঠার পর ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাপুর নোটিফায়েড অথরিটি গঠিত হয়। এই নোটিফায়েড অর্থরিটিই মিউনিসিপ্যালিটির যাবতীয় কাজের দায়িত্বে ছিল। ১৯৭১ সালের এই শিল্পনগরীর লোকসংখ্যা ছিল ২৮২৫৯৩, এর মধ্যে করদাতার সংখ্যা ৮৫০০। নোটিফায়েড এরিয়ার অন্তর্গত ৩৫টি গ্রাম ও ৯টি শিল্পনগরীর জনগণের জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য পরিষেবা, ময়লা নিষ্কাষণ, রাস্তায় আলো দেওয়া, ২৭ কিমি পাকা ও ১৩ কিমি রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ, জঞ্জাল পরিষ্কার সমস্ত কিছু পৌর-কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব অথরিটির উপর ন্যস্ত। এছাড়া বেনাচিতিতে outdoor dispensary এবং দুর্গাপুর শিল্পনগরীর নিজস্ব দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনার দায়িত্ব অর্থরিটির উপর অর্পিত ছিল। তবে বর্তমানে দুর্গাপুরকে মিউনিসিপ্যালিটিরূপে ঘোষণা জারির ও মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের পর Notified Authority-এর কার্য মিউনিসিপ্যালিটির উপর ন্যস্ত হয়েছে।

আঠাশ অধ্যায়



গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন

(জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড)

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের Act Bengal III (Bengal Local Govt. Act) এর দ্বাবা গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা ঘোষিত হয়। এই ব্যবস্থার শীর্ষে আছে জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ড। জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের ওপর দায়িত্ব ছিল মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদে জেলার সর্বত্র রাস্তা, সেতু, খোঁয়াড়, গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা, জল সরবরাহ, গ্রামে গ্রামে টীকাকরণ, প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান কবা। প্রথম প্রথম জেলা বোর্ড জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সহ ১৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এই ১৮ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন মাত্র নির্বাচিত ও ১২ জন সরকার মনোনীত। ১২ জন মনোনীত সদস্যের মধ্যে ৪ জন সদস্য Ex-officio.

১৯০৭–০৮ খ্রীষ্টাব্দে জেলা বোর্ডের আয় ছিল ৩,৮০,০০০ টাকা, এর মধ্যে ১,৭০,০০০ টাকা পথকর থেকে আয়। ১,৫৯,০০০ টাকা রাজ্য সরকারী অনুদান, ১০০০ টাকা ফেরী থেকে আয় ও ১০,০০০ টাকা খোঁয়াড় থেকে আয়। ঐ সময় বোর্ডের বাৎসরিক ব্যয় ছিল ৩,২৮,০০০ টাকা। রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার খাতে ২,৩২,০০০ টাকা, শিক্ষাখাতে ৫৫,০৩৫ টাকা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ১২,৫৮৭ টাকা। স্বাধীনতার পর ১৯৫০–৫১ খ্রীষ্টাব্দে জেলা বোর্ডের আয় দাঁড়ায় ১৩,০৫,৮৪৯ টাকা এবং ব্যয় ১১,৯৪,৮৫৯ টাকা।

জেলা বোর্ডের অধীনে ৪টি লোকাল বোর্ড জেলা বোর্ড থেকে নির্দিষ্ট অনুদান পেত ও জেলা বোর্ডের পক্ষে গ্রামের রাস্তাঘাট, প্রাথমিক শিক্ষা, ফেরী ঘাট, খোঁয়াড়, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রভৃতি দেখাশোনা করতো। বর্ধমান লোকাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫ জন এবং আসানসোল, কালনা ও কাটোয়ার প্রত্যেকটির

সদস্য সংখ্যা ছিল ৯ জন করে। বর্ধমান লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন একজন বেসরকারী ব্যক্তি কিন্তু অন্য তিনটিতে মহকুমা শাসকই চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করতেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লোকাল বোর্ডের বিশেষ গুরুত্ব না থাকায় এর অবলুপ্তি ঘটে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের স্বায়ত্তশাসন আইন দ্বারা জেলায় মেমারী, মানকর, শ্রীখণ্ড, শ্রীবাটী, বৈদ্যপুর ও বাঘনাপাড়া প্রত্যেকটিতে একটি করে ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির ওপর গ্রামীণ স্থানীয় স্বাস্থ্যপরিষেবা, রাস্তাঘাট, প্রাথমিক স্কুল ও খোঁয়াড়ের দাযিত্ব অর্পিত হয়। এই কমিটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিল নয় সদস্যের একটি বোর্ড। এই কমিটির আয়ের উৎস ছিল গ্রামের জনগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ট্যাক্স, জেলাবোর্ডের অনুদান, খোঁয়াড় নিলাম থেকে আয়। এই আয় থেকে গ্রামের শাসনের ও গ্রামীণ পরিষেবার সব কিছু খরচ চালাতে হত। এই সমস্ত কমিটির কার্যপ্রণালী খতিয়ে দেখার জন্য ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে A. N. Moberly -এর নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়। ৮.৯.১৯১২ তারিখে কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে দেখা যায় যে কমিটিগুলির কার্যাবলী মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। এক এক কমিটির অধীনে বিশাল এলাকা ঠিক মত পরিচালনা করা মনে হয় সম্ভব হয় নাই। এছাড়া সদস্যদের অভিজ্ঞতাও বিশেষ ছিল না। মেমারী কমিটির অধীনে ছিল ২০টি গ্রাম, বাঘনাপাড়ার ১৭টি গ্রাম, বৈদ্যপুরের ১০টি; শ্রীখণ্ডের ১৯টি ও শ্রীবাটীর ১৭টি গ্রাম। মানকর কমিটির আয়তন এত বিশাল ছিল যে Moberly Report-এ এটিকে মিউনিসিপ্যালিটি করার সুপারিশ করা হয়।

Moberly Report পাওয়ার পর সরকার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে Bengal Village Self Govt. Act (Act III of 1919) পাশ করে সারা জেলায় ২০৯টি ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করে গ্রামীণ শাসনের দায়িত্ব বোর্ডের ওপরই ন্যস্ত করে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ২০৯টি বোর্ডের মধ্যে ৮৫টি বোর্ডে ইউনিয়ন বেঞ্চ গঠন করা হয়। ইউনিয়ন বেঞ্চের ওপর ইউনিয়নবাসীর ছোটখাট ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

সারণী-১

থানাভিত্তিক ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা :

মহকুমা সদর :

থানা	ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা
আউসগ্রাম—	১২
ভাতার—	১১
বর্ধমান—	১০
গলসী—	১৪
জামালপুর—	১০
খণ্ডঘোষ—	৯
মেমারি—	১৩
রায়না—	১৫
মোট—	৯৪

মহকুমা : আসানসোল

থানা	ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা
আসানসোল—	৫
বরাবনি—	৪
ফরিদপুর—	৮
জামুরিয়া—	৬
কাঁকসা—	৬
কুলটি—	৪
অণ্ডাল—	৫
রানীগঞ্জ—	৩
সালানপুর—	৩
মোট —	৪৪

মহকুমা : কালনা

থানা	ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা
কালনা—	১৪
মন্তেশ্বর—	৯
পূর্বস্থলী—	১২
মোট—	৩৫

মহকুমা : কাটোয়া

থানা	ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা
কাটোয়া—	১১
কেতুগ্রাম—	১৩
মঙ্গলকোট—	১২
মোট-	৩৬

ইউনিয়ন বোর্ডের আয়তন অনুযায়ী এর সদস্য সংখ্যা ৯ থেকে ১২ জন হতো। করদাতা ও শিক্ষিত (কম পক্ষে ম্যাট্রিকুলেট) ভোটার দ্বারা সদস্যরা নির্বাচিত হতেন। তখন গোপন ব্যালট প্রথা ছিল না। প্রিসাইডিং অফিসারের সামনে ভোটার হাজির হয়ে নিজের পছন্দমত প্রার্থীর নাম বলতো, ভোট হয়ে গেলে প্রিসাইডিং অফিসার ফল ঘোষণা করতেন ও নির্বাচিত সদস্যদের নাম ঘোষণা করতেন। নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন। গ্রামবাসীদের জমির আয়তন অনুপাতে ইউনিয়ন ট্যাক্স ধার্য হত। সর্বোচ্চ ট্যাক্স ছিল ৮০ টাকা। ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের উৎস ইউনিয়ন কমিটির অনুরূপ ছিল। সার্কেল অফিসার ও এস.ডি.ও-র অনুমোদন নিয়ে চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ

করা হত। চৌকিদারের বেতন ছিল মাসিক ৩ টাকা, দফাদারের ৪ টাকা। চৌকিদার, দফাদারকে প্রতিদিন প্রেসিডেন্টের বৈঠকখানায় হাজিরা দিতে হত ও তাঁর আদেশ মত করদাতাদের ডেকে আনা, ট্যাক্স আদায়কারীর সঙ্গে ঘরে ঘরে গিয়ে ট্যাক্স আদায়ের সাহায্য করা, কোর্টের বা বোর্ডের নোটিশ বিলি করা, প্রয়োজন হলে গ্রামে ঢেঁড়া দেওয়া, রাত্রে প্রতি পাড়ায় পাহারা দেওয়া, ইউনিয়নের মধ্যে চুরিডাকাতি, খুন বা দাঙ্গা বাধলে থানায় খবব দেওয়া, এই সব বোর্ডের কাজ ছাড়া প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত কাজ তো ছিলই। তাছাড়া গ্রামে কোন অফিসার এলে তাঁর সঙ্গে ঘোরা ও টাকা সংগ্রহের ব্যাপাবে অফিসারকে সাহায্য করা—এসব কাজও করতে হতো। এ সমস্ত কাজ ছাড়া—দফাদারকে প্রতি সপ্তাহে থানায় রিপোর্ট নিয়ে যেতে হতো। সরকার থেকে যখন যেমন আদেশ হতো—যেমন, গ্রামের ঢেঁকি গণনা করা, এমন কি বানব বা শকুনি গণনার কথাও শোনা যায়—এসব কাজও চৌকিদারকে করতে হতো। রাস্তায় কোন কুকুর, জানোয়ার পড়ে থাকলে তাও চৌকিদারকে ফেলতে হতো। বেশ মনে আছে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় রাস্তার পাশে মানুষ মরে পড়ে থাকলে তাও ফেলতে হয়েছে চৌকিদার ও দফাদারকে। গ্রামে উৎসব পূজাপার্বণ-এর সময় ঘরে ঘরে আমের শাখা দেওয়া—বারোয়ারী পুজোয় পূজা কমিটির নির্দেশ মত কাজ করা এসবও চৌকিদারের বেসরকারী দায়িত্ব ছিল। অবশ্য এর জন্য প্রতি-পূজা-পার্বণ উৎসবে প্রতিটি গৃহস্থবাড়ী থেকে মুড়ি, ভাত এসব বরাদ্দ থাকতো। এখন সব স্তরেই Work Culture নষ্ট হয়ে গেছে—কাজেই পাহারা দেওয়া, উৎসব-পার্বণে পল্লব দেওয়া এসব উঠে গেছে তবে পূজাপার্বণে মুড়ি-ভাত নেওয়ার রেওয়াজটা ঠিকই আছে। কোন কোন ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে দাতব্য চিকিৎসালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকতো। বোর্ডকে এগুলিও দেখাশোনা করতে হতো। তবে এরকম ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা খুবই কম ছিল।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রশাসন ও পরিকল্পনা রূপায়ণে গ্রামের জনগণকে সামিল করার জন্য ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আইন পাশ করে স্বায়ত্তশাসন বিভাগকে পুনর্গঠিত করে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডকে পুনর্গঠিত করে জেলাপরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইন অনুসারে প্রথম যে নির্বাচন হয় তার সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৯, এর মধ্যে ২ জন মহিলা। পরিষদের অধীনে ৬টি Standing Committee গঠন করা হয়। কমিটিগুলির মধ্যে দপ্তরও বন্টন করা হয় যেমন :

দপ্তর	সদস্য-সংখ্যা
১. অর্থ ও প্রশাসনিক দপ্তর :	১১
২. জনস্বাস্থ্য :	১৬
৩. পূর্ত বিভাগ ও জনস্বার্থ সম্পর্কিত কার্যাবলী :	১২
৪. কৃষি ও সেচ :	১২
৫. শিল্প ও সমবায় :	১২
৬. জনকল্যাণমূলক বিশেষ কার্যাবলী :	১২

বিভিন্ন Standing Committee-র মধ্যে সমন্বয় সাধন, জেলার প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে জেলা পরিষদের সমন্বয় সাধন এবং সুষ্ঠু প্রশাসনের সমন্বয়ের জন্য কমপক্ষে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন অফিসারকে Executive Officer নিয়োগ করা হয়। জেলা পরিষদের অধীনে এক একটি এলাকা নিয়ে ২৩টি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। ১৯৬৮—৬৯ সালে জেলা পরিষদের অধীনে নিম্নলিখিত আঞ্চলিক পরিষদগুলি গঠিত হয়েছিল :

সারণী-২

আঞ্চলিক পরিষদ	আয়তন (বর্গ মাইল)	লোকসংখ্যা	সদস্য-সংখ্যা
আউসগ্রাম-১	৯৪.০১	৬৬০৯৩	১৯
আউসগ্রাম-২	১৩৭.৫০	৬৫৪৯৩	২২
ভাতার ১	১৬৬.৮৮	১,২৪,২৪৯	৩০
বর্ধমান	১৫৭.১০	১,২০,২৮১	৩১
মেমারি-১	৮০.৪০	৯৬,৮০০	২৬
মেমারি-২	৮৭.৮২	৭৫,৮০৮	২৪
জামালপুর	১০১.৫২	১০৯৫৯৩	৩২
রায়না-১	১০২.৮৭	৮০.১৩১	২৫
রায়না-২	৮৮.০৩	৬৮.১২৩	২৩
খণ্ডঘোষ	১০০.৯৫	৭৯,৪৫৯	২৬
গলসী-১	৮৯.৫৩	৭৭,৭৩৫	২৬
গলসী-২	৮৪.০০	৭০,০৮১	২৮
পূর্বস্থলী-১	৬০.০০	৬৫,৬৭৫	২৩
পূর্বস্থলী-২	৭৪.০০	৭৭,৮১০	২৭

আঞ্চলিক পরিষদ	আয়তন (বর্গ মাইল)	লোকসংখ্যা	সদস্য-সংখ্যা
কালনা-১	৬৩.৮৯	৭৩.৯৮৮	২৭
কালনা-২	৬৭.৩৯	৬৯,২৮৫	২৪
মন্তেশ্বর	১১৭.০০	১,০৭,৪৫৫	৩২
মঙ্গলকোট	১৪১.২৬	১,২২,৪৩৮	৩৩
কেতুগ্রাম-১	৭৪.৮৪	৭৪,৮১০	১৫
কেতুগ্রাম-২	৬৬.৯৬	৩২,২০৯	২৪
কাটোয়া-১	৬৬.০০	৭৯,৫৭১	২৭
কাটোয়া-২	৬৪.৩৪	৫২,০৯৩	২৩
কাঁকসা	১০৮.০০	৬৩,২২৩	১৯

কেবলমাত্র আসানসোল মহকুমার ১০টি ব্লকের জন্য কোন আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয় নাই। এখানকার কলিয়ারী ও শিল্প-প্রশাসন, আঞ্চলিক পরিষদের মত এলাকার সমস্ত জনস্বার্থ পরিষেবার দায়িত্ব পালন করতো। আঞ্চলিক পরিষদও জেলা পরিষদের মত প্রায় একই রূপ Standing Committee-তে বিভক্ত ছিল, কেবল অতিরিক্ত ছিল প্রাথমিক শিক্ষাদপ্তর। সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের অনুদান, জেলা পরিষদের বরাদ্দ, পথকর, পুলবন্দী কর, অন্যান্য কর—এগুলি ছিল আঞ্চলিক পরিষদের আয়ের উৎস।

২৩টি আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে ২৯৩টি অঞ্চল পঞ্চায়েত ছিল।

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন (Act XLI of 1973) রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। এর ফলে জেলায় পঞ্চায়েতীরাজ দৃঢ়ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ ও পঞ্চায়েতের পরিবর্তে এখন থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে (সারণীতে)। এর সর্ব নিম্নস্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি ও কয়েকটি পঞ্চায়েত সমিতি নিয়ে জেলা পরিষদ পুনর্গঠিত হয়েছে। (১) গ্রামীণ কর্মসূচী রূপায়ণের সর্বাঙ্গীন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর। প্রাথমিক কার্যের মধ্যে রয়েছে (ক) জনস্বার্থ সংরক্ষণ (খ) মহামারী প্রতিরোধ (গ) পথঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ (ঘ) সাধারণের ব্যবহার্য পুষ্করিণী সংরক্ষণ (ঙ) পানীয় জল সরবরাহ (চ) পশুচারণভূমি, শ্মশানঘাট ও কবরখানা সংরক্ষণ (ছ) গ্রাম উন্নয়নের জন্য শ্রমদান সংগঠন (জ) পঞ্চায়েত তহবিল পরিচালনা (ঝ) কর সংগ্রহ (ঞ) ন্যায় পঞ্চায়েত তহবিল পরিচালনা (ট) কর-সংগ্রহ (ঠ) ন্যায়

পঞ্চায়েত গঠন ইত্যাদি। এছাড়া প্রাথমিক সামাজিক বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি দায়িত্বও পঞ্চায়েতের ওপর অর্পণ করা হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রসূতি ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ সার্থক করা, সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন, ভূমি সংস্কারের সহায়তা দান, চাষের প্রয়োজনীয় সার, যন্ত্রপাতি বন্টনে সহায়তা করা, কুটিরশিল্পের প্রসার ইত্যাদি দায়িত্বও পালন করতে হয় পঞ্চায়েতকে। পঞ্চায়েত সমিতির কাজ পরিচালনার জন্য কয়েকটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। যেমন—(১) অর্থ সংক্রান্ত কমিটি (২) শিক্ষা কমিটি (৩) জনস্বাস্থ্য কমিটি (৪) পূর্তকার্য কমিটি (৫) কৃষি, সেচ সমবায় কমিটি (৬) ক্ষুদ্র শিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ কমিটি। সমিতি এই সমস্ত কাজের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও অর্থ সাহায্য করতে পারে। বন্যা, খরা মোকাবিলা করাও সমিতির কাজ।

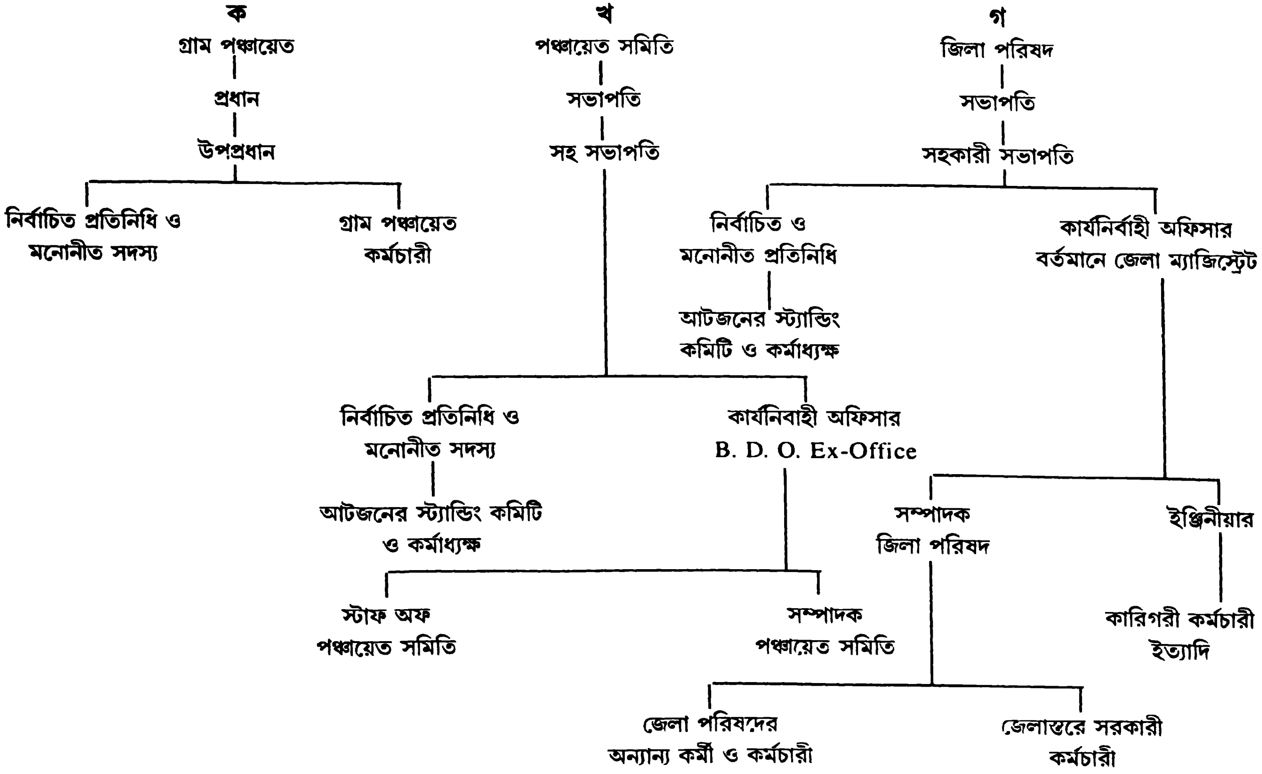
জেলা পরিষদেও পঞ্চায়েত সমিতির মত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। কার্যনির্বাহক হিসাবে জেলাশাসক ও রাজ্যসরকার নিয়োজিত কর্মসচিব পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিকল্পনা রূপায়ণ করে।

কেবলমাত্র আসানসোলের ১০টি ব্লকে কোলিয়ারী ও শিল্পপ্রধান এলাকায় পূর্বের ইউনিয়ন বোর্ডই বহাল আছে।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত প্রথার মাধ্যমে তৃণমূলস্তরে সমগ্র জেলার প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। কবির কথায় এখন—

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা, নই দাসের রাজার ত্রাসের রাজত্বে ॥

কিন্তু এই খানে একটা 'কিন্তু' or Proviso আছে—যেটির উল্লেখ করেছেন মানস বক্সী' মহাশয় The Statesman পত্রিকার ১৯৯৯ সালের ১৬/১৭ মে সংখ্যায়—It is also admitted that the role of Panchayets in recording the names of bargadars—a precondition for enabling them to get institutional credit and in recovery and distribution of vested land is credible, provided the charges of alleged partisan outlook is brushed aside. Promoting rural development work with popular initiative at the grass root level required mass involvement পরিশেষে Bakshi যে মন্তব্য করেছেন সেটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—Panchayet system needs a new dimension. It has to be more dynamic in its approach, performance and administrative network. Dependence on central grants will no longer do. It has to generate its own funds.


সারণী-৩ : ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও তাদের প্রশাসনিক কাঠামো
ক
গ্রাম পঞ্চায়েত
প্রধান
উপপ্রধান
নির্বাচিত প্রতিনিধি ও মনোনীত সদস্য
গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারী
খ
পঞ্চায়েত সমিতি
সভাপতি
সহ সভাপতি
নির্বাচিত প্রতিনিধি ও মনোনীত সদস্য
আটজনের স্ট্যান্ডিং কমিটি ও কর্মাধ্যক্ষ
কার্যনিবাহী অফিসার B. D. O. Ex-Office
স্টাফ অফ পঞ্চায়েত সমিতি
সম্পাদক পঞ্চায়েত সমিতি
গ
জিলা পরিষদ
সভাপতি
সহকারী সভাপতি
নির্বাচিত ও মনোনীত প্রতিনিধি
আটজনের স্ট্যান্ডিং কমিটি ও কর্মাধ্যক্ষ
কার্যনির্বাহী অফিসার বর্তমানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
সম্পাদক জিলা পরিষদ
ইঞ্জিনীয়ার
কারিগরী কর্মচারী ইত্যাদি
জেলা পরিষদের অন্যান্য কর্মী ও কর্মচারী
জেলাস্তরে সরকারী কর্মচারী

ঊনত্রিশ অধ্যায়



রাজস্ব ব্যবস্থা

সম্রাট আকবরের সময় থেকে বাংলা সুবায় মোগল কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত আইন-ই-আকবরীতে বর্ধমানকে মহাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মহাল ছিল সরিফাবাদ সরকারের একটি পরগনা, এর রাজস্ব ধার্য ছিল ৪৬৯০৩ ১/২ আকবর শাহী সিক্কাতঙ্কা। এই তঙ্কার মূল্যমান ছিল ১৭৫ রতি রুপোর মূল্যমানের সমান—সাবেকী ওজনের ১ ভরি বা ১১.৬৪ গ্রাম। বর্ধমান চাকলা সরিফাবাদ, সেলিমাবাদের কিছু অংশ, সাতগাঁ এর কয়েকটি পরগনা ও মান্দারণের অর্ধেক নিয়ে গঠিত ছিল। সরকাবগুলি ৬৪টি পরগনায় বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে জেলার সঙ্গে সেই সময় বর্তমান বাঁকুড়া জেলার সমগ্র অংশ পাঞ্চেৎ (মানভূম) এবং হুগলী ও বীরভূমের কিয়দংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আকবরের সময় টৌডরমল বর্ধমান পরগনার যে রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেন সে ব্যবস্থা সমগ্র পরগনায় প্রচলিত হয় নাই। মান্দারণ সরকারে (বর্তমান আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমা) স্থানীয় সামন্তরাজদের নিজস্ব রাজস্ব ব্যবস্থা চালু ছিল। আকবরের সময় থেকে মোগল সম্রাটকে আনুগত্য দেখাবার প্রতীক ছিল সম্রাটকে 'পেশ কাশ' প্রদান করা। জমিদার নিজস্ব কোষাগার থেকে এই 'পেশ কাশ' জমা দিতেন মনে করলে ভুল হবে। মোগল সম্রাটকে দেয় 'পেশ কাশে'র সমগ্র অর্থ জমিদার অধীনস্থ রায়তদের কাছ থেকে আদায় করে নিতেন।

এই জমিদার কারা?

মুঘল আমলের রাজস্ব সম্পর্কিত দলিলে জমিদার ও মালিক প্রায় সমার্থক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। জমিদার কথাটি ২ ভাবে ব্যবহৃত। প্রথমত, মিলকিয়াৎ অর্থাৎ মালিকের অধিকারের বিশেষ রূপ হচ্ছে জমিদারী। দ্বিতীয়ত, জমির ওপর সব রকম মিলকিয়াৎ-এর অধিকার জমিদার শব্দের মধ্যে ব্যক্ত। কেবল জমি

থাকলেই জমিদার হয় না। যদি বিভিন্ন লোকের দখলীকৃত জমির ওপর কারোর ব্যাপক অধিকার থাকে তবে সেই হচ্ছে জমিদার। জমিদারির সঙ্গে মালিকানা, সির, নানকর, যৌথ কতকগুলি বিশেষ দাবি সংশ্লিষ্ট। এদেশের জমিদারগণ প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত ও সরকারকে নির্দিষ্ট রাজস্ব জমা দিত। এই আদায়ীকৃত খাজনা ও দেয় রাজস্বের মধ্যে পার্থক্যটাই ছিল জমিদারের মুনাফা।

১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সুবাদার সুজার সময় ও ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে দুবার রাজস্বের সংস্কার সাধন করা হয়। মুর্শিদকুলি খাঁর সময় ৬৪টি পরগনা নিয়ে গঠিত বর্ধমান চাকলার রাজস্ব ছিল ২২৪৪৮১২ সিক্কা মুদ্রা। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিম যখন বাংলার নবাব সেসময় ৫১৭৪ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট বর্ধমান চাকলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার কোম্পানীকে প্রদত্ত হয়। তখন বর্ধমান চাকলার রাজস্ব ছিল ৩১৭৫৩৯১ সিক্কা টাকা। এই রাজস্ব আদায় করার জন্য কোম্পানী তিন জন সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করেন। এই তিন জন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন—Mr. Johnstone, Mr. Hay, Mr. Bolt. তাঁরা সেই সময় রাজস্ব আদায়ের হাল হকিকৎ দেখে ৩ বছরের জন্য জমিদারী ইজারা বিলি করেন। এর ফলে রাজস্ব ৩১৭৫৩৯১ তঙ্কা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮৩৪৪২৯ সিক্কা টাকা যদিও ১৭৬৫ দেওয়ানী লাভের সময় রাজস্বের পরিমাণ হিসেব হয়েছিল ৪৪৮৪০৪৯ সিক্কা। কিন্তু এই বৃদ্ধি নামকো ওয়াস্তে। ইজারা দেওয়ার ফলে আদায় উসুল ও আবওয়াব নিয়ে রাজস্বের পরিমাণ মাত্র ১৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। রাজস্ব ব্যবস্থার এই দুর্দশার জন্য সেরিস্তাদার Charles Grant-কে তদন্তের ভার দেওয়া হয়। Grant তদন্ত করে যে রিপোর্ট দেন তাতে বর্ধমান জমিদারী সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়—The most compact best cultivated and in proportion to its dimensions, by far the most productive annual rent to the proprietory share. তিনি এই প্রসঙ্গে বর্ধমান জমিদারকে দেশীয় রাজ্য ও বারাণসীর জমিদারীর সঙ্গে তুলনা করেন। অবশেষে গভর্ণর ভেরেলিষ্ট Hustabood পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বর্ধমান জমিদারীর জন্য সুপারভাইজার নিযুক্ত করেন ও চিরাচরিত প্রথায় রাজস্ব আদায়ের নির্দেশ দেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজা তখন মহারাজ তেজচন্দ্র। হেস্টিংস রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আমিনি কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন জমিদারদের—সব থোকা পরীক্ষা করে বর্ধমানরাজের রাজস্ব নির্ধারণ করেন ও দেখা যায় সেই নির্ধারিত রাজস্বের সঙ্গে ৯,১৯,৬৫৭ সিক্কা নানা আবওয়ার বা সেস আদায় হতো।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান পরগনার রাজস্ব আদায় হয় ৪৩,৫৮,০২৬ সিক্কা টাকা; এর মধ্যে নীট রাজস্ব ৪০,০০,০০০ টাকা ও বাকী আদায়ের খরচ। এই আদায়ী খরচের মধ্যে ছিল মহারাজের 'সালানা' মুশায়ারা বা Proprietory allowance ও ৫০,০০০ পুলবন্দী কর।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই পরিমাণ রাজস্বের ওপর নির্ভর করে মহারাজের সঙ্গে কোম্পানীর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে ৪০,১৫,১০৯ সিক্কা টাকা ও পুলবন্দী বাবদ ১,৯৩,৭২১ টাকা। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের বিশেষ উন্নতি হয় না। এর জন্যে অবশ্য ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অনেকখানি দায়ী। মহারাজ ত্রিলোকচাঁদ—এ বিষয়ে কোম্পানীকে অবহিত করেন।

Abstracts of the consultations of the Govt of Bengal of the 20th Nov 1769 থেকে জানা যায়—Representation of the Raja of Burdwan. Drought and dearness of grain. Crop parched, and cut up for fodder for the cattle. Tanks dry, water insufficient for the inhabitants. Rubbee harvest back ward, and without rain will be destroyed. Ryats deserting in large bodies.

Consultation of the 3rd April 1770—At the instance of Messers Russell, Floyer and Hare (3rd April 1770) fifty maunds of rice per day in addition to the merchants' assistance, have been ordered to be distributed in charity in calcutta and twenty to twenty-five maunds a day in Burdwan. (The Annals of Rural Bengal W.W Hunter page 289-91)

Hunter এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—Remissions of the land tax and advances to the husband, men although constantly urged by the local officials, received little practical effect. In a year when thirty five percent of the whole population and fifty percent of the cultivators perished not five per cent of the land tax was remitted and ten percent was added to it for the ensuing year (1770–71).

১৭৭০ সালের শেষের দিকে অবস্থার একটু উন্নতি হতেই চালের রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

এছাড়া Abstract of the consultations of the Govt of Bengal of 14th November 1770—The famine having now entirely ceased, and there being not only a great abundance, but also a prospect of a most plentiful harvest—

"Agreed—That embargo on rice be taken off, and that a publication be issued to that purpose."

এর ওপর গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংসের দপ্তর থেকে Court of Directors-এর কাছে বাংলার দুর্ভিক্ষের অবস্থা ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত যে পত্র লেখা হয় তাতে দেখা যায় দুর্ভিক্ষের জন্য বর্ধমান জমিদারীর রাজস্ব সে বছরের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা মকুব করা হলেও পরের বার ঐ মকুব করা অর্থাৎ উসুল দেবার শর্ত আরোপ করা হয় অর্থাৎ কিছুই মকুব করা হয় না।

১৭৭১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারীর চিঠির ৪৩ ও ৪৪ অনুচ্ছেদে এর উল্লেখ আছে।

12th February 1771—paras 43 and 44–45 "In our letter of the 25th January 1770, by the Grafton, we informed you that, on account of the famine which prevailed throughout the country, we had made a remission to the farmers in the Burdwan province of about 2½ or 3 lacks of rupees on condition that they should discharge it at certain periods, with the rents of the next year.

But the collector general has represented to us that the great increase of the famine since that period has been the cause of such a mortality and desertion amongst ryotts, as to deprive the farmers of possibility of receiving the rents that had been allowed to run in arrear, and that therefore if some reduction of the sum remitted was not made, many of the farmers would be ruined...

এই বৎসর ১৪ই মে মহারাজা তেজচন্দ্র বর্ধমানের কালেক্টরের কাছে মন্বন্তরজনিত খাজনা আদায়ের অসুবিধা ও কোম্পানীকে চুক্তিমত রাজস্ব জমা দেওয়ার অসুবিধার কথা জানান। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রজাদের কাছ থেকে কড়ায় গণ্ডায় খাজনা উসুল করা হয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ফলে যে শতকরা ৫০ ভাগ কৃষকের অধিকাংশ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে কিংবা গ্রাম ছেড়ে পালায় কাজেই তাদের খাজনা আর কার কাছ থেকে উসুল হবে? সুতরাং, রাজ এস্টেটের রাজস্ব কোম্পানীর ঘরে বাকী পড়তেই থাকে। এস্টেটের পরিচালনা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। মহারাজ তেজচন্দ্রের মা বিষণকুমারী তাঁর স্বপক্ষে পুত্র তেজচন্দ্রকে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় কোবালা করে দিতে বাধ্য করেন। তিনি আরও কিছু দিন বেঁচে থাকলে হয়ত জমিদারীর হাল ফেরাতে পারতেন কিন্তু ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বিষণকুমারীর মৃত্যুর ফলে এস্টেটের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। এর ফলে জমিদারীকে

খণ্ড খণ্ড করে বড় জোতদার বা ইজারাদারদিগকে ৫ থেকে ১০ বছরের জন্য মেয়াদী ইজারা দেওয়া হয় কিন্তু ইজারাদাররাও সময়মত রাজস্ব জমা দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে কোম্পানীর ঘরে রাজস্ব বকেয়া দিন দিন বাড়তে থাকে।

বিষণকুমারী বেঁচে থাকার সময়েই ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংসের পরামর্শে শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবকে 'ক্রোকি সাঁজোয়াল' নিযুক্ত করে বর্ধমানে পাঠানো হয়। নবকৃষ্ণ শতকরা ১২ টাকা হারে তেজচন্দ্রকে ৯ লক্ষ টাকা কর্জ দেন কিন্তু অবস্থার উন্নতি হয় না। শেষকালে বর্ধমান কালেক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত জমিদারীকে ভিন্ন ভিন্ন লটে ভাগ করে কিছু লট বিক্রয় করা ছাড়া বকেয়া রাজস্ব পরিশোধের কোন উপায় রইল না। collectorate-এর রেকর্ড থেকে জানা যায় যে রাজপরিবার ক্রমশ দেনার দায়ে ডুবতে বসেছিল। চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান-কালেক্টরেট মহারাজ তেজচন্দ্রের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে Board of Revenue কে লেখেন :

"The difficulty I found in realizing the instalment Kist of revenue for Agrahayan from the Maharaja induces me to listen to his earnest request of representing to you the hardship he sustains from one of his renters who destitute of good faith and availing himself of the delay that necessarily attends the institution of low process for the recovery of arrears of rent, is encouraged to withhold from him his just dues. The Maharaja begs leave to submit for your consideration, whether or not it can be possible for him to discharge his engagements to Government with punctuality which the Regulations require, unless he is armed with powers as prompt to enforce payment from his renters as Government has been pleased to authorise the use of in regard to its claim on him. He seems to think that it must have proceeded from oversight rather than from any just and avowed principle that there should be established two methods of judicial process under the same Government. The one summary and efficient for the satisfaction of its own claim, the other tardy and uncertain in regard to the satisfaction of classes due to his subjects,—more especially in a case like the present, where the ability to discharge the one demand necessarily depends on the other hand being previously realised." (letter from the collector of Burdwan 9th May 1794.)

Collector এর Board of Revenue-কে এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে XXXV নং আইন পাশ করে বকেয়া রাজস্ব উসুল করার আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল এক সভায় ঠিক করেন, যে সব জেলা নিয়ে বর্ধমান zilla গঠিত হয়েছে সেগুলি ২ ভাগ করে পৃথক পৃথক জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটসহ ২টি জেলা করা হবে। অতঃপর Board of Revenue এর সভায় বর্ধমান মহারাজকে ডেকে এনে তাঁর সমস্ত estate বাজেয়াপ্ত করার ভয় দেখানো হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অবস্থা যখন চরমে ওঠে তখন কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত জমিদারীর এক একটি লাট বিক্রয় শুরু হয়—প্রধান প্রধান ক্রেতা ছিলেন সিঙ্গুরের দ্বারকানাথ সিংহ, ভাণ্ডারার ছকু সিং, জনাই-এর মুখুজ্জ্যে পরিবার ও তেলিনীপাড়ার ব্যানার্জী পরিবার। এই ভাবে বর্ধমান ও হুগলী জেলায় ছোট ছোট অভিজাত জমিদার পরিবার (landed aristocracy) এর সৃষ্টি হয়। জমিদারীর এক একটা অংশ একে একে হাত ছাড়া হয়ে যেতে দেখে ভীত হয়ে মহারাজা স্বয়ং বেনামীতে কিছু কিছু লাট কিনতে আরম্ভ করেন। এই সময় মহারানী বিষণকুমারীর মৃত্যু হলে (১৭৯৮ খ্রীঃ) মহারাজা স্বয়ং জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন। এই বন্দোবস্তের ১নং রেগুলেশনের শর্ত অনুযায়ী মহারাজা সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। এই চুক্তি অনুযায়ী বর্ধমান জমিদারীর রাজস্ব ধার্য হয় ৪০,১৫,১০৯ টাকা। এছাড়া সেতু ও বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য—পুলবন্দি বাবদ মহারাজকে রাজস্ব দিতে হয় ১৯৩৭৫১ সিক্কা। রাজস্ব জমা দিতে হত তিনমাস অন্তর চারটি কিস্তিতে। কিস্তি খেলাপ রুখতে জমিদারীর অংশ বিক্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

এই সময় মহারাজা জমিদারীর হাল দেখে চিন্তা করেন তাঁর ওপর যেমন সরকারে রাজস্ব জমা দেবার নানারকম বাধ্যবাধকতা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, তিনিও যদি তাঁর সমগ্র জমিদারীকে কয়েকটি লাটে ভাগ করে এক একটি লাট স্থায়ী ভাবে ইজারা দেন ও ইজারাদারদের ওপর অনুরূপ শর্ত আরোপ করেন, তা হলে সময়মত রাজস্ব জমা দেওয়ার একটা সুরাহা হতে পারে ও কিস্তি খেলাপের ভয় থাকে না—জমিদারীও রক্ষা পায়। এই ভাবে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে 'পত্তনি' প্রথার সৃষ্টি করে পত্তনিতালুক বিভিন্ন পত্তনিদারকে 'স্থায়ী ভাবে ইজারা দেন। এই ব্যবস্থার ফলে তাঁর জমিদারী রক্ষা পায়, কোম্পানীর ঘরে রাজস্ব ঠিক মত জমা পড়ে। কিন্তু এতেও একটা সমস্যা দেখা দেয়—

কোম্পানীর রাজস্ব বোর্ড মহারাজার এই পত্তনি প্রথাকে সহজভাবে মেনে নেয় নাই—নানারকম আইনের অজুহাত দেখিয়ে অস্বীকার করতে থাকেন। ফলে পত্তনিদাররা মহারাজার কাছে defaulter হলে মহারাজা সেই সমস্ত পত্তনিদারদের বিরুদ্ধে কিস্তি খেলাপের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারতেন না। অবশেষে মহারাজা স্বয়ং ও তাঁর দেওয়ান মানগোবিন্দ মুন্সীর চেষ্টায় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইন অনুসারে পত্তনি চিরস্থায়ী ও হস্তান্তরযোগ্য বলে আইনী স্বীকৃতি লাভ করে। তাছাড়া এখন থেকে পত্তনিদাররা কিস্তি খেলাপ করলে জেলা কালেক্টরের আদালতে পত্তনি নিলাম করিয়ে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের আইনী ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। পত্তনিদাররা এই আইনের বলে নিজেদের পত্তনি বিভিন্ন লাটে ভাগ করে অনুরূপভাবে দরপত্তনি সৃষ্টি করতে পারতেন। দরপত্তনিদাররা সে-পত্তনি, সে-পত্তনিদাররা দরাদর-পত্তনি সৃষ্টি করে নিজেরা unearned income অর্জনের পথ করতে পারতেন। এইভাবে ৬৪ রকমের মধ্যস্বত্ব সৃষ্টির উল্লেখ পাওয়া যায়। জেলার ৮০ ভাগ অংশে এই রকম পত্তনিতালুক ব্যবস্থা চালু হয়। এই ব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তরে ছিল রায়ত। নিজে জমি চাষ করার জন্য জমিদারের কাছ থেকে কিছু সেলামী দিয়ে যারা জমিদার বা পত্তনিদারদের কাছ থেকে জমিবন্দোবস্ত নিত তারাই রায়ত। এই বন্দোবস্ত রেজেস্ট্রীকৃত লিজ মারফৎ এমন কি চেক মারফৎও হতে পারতো। উৎকৃষ্ট বা উর্বর জমির বন্দোবস্তে সেলামির ও খাজনার হার বেশী হতো আর বন কেটে বা ডাঙা ও অনুর্বর জমির বন্দোবস্তে সেলামি ও খাজনার হার খুবই কম হতো—এমন কি প্রথম ২/৩ বছর কোন খাজনা দিতে হত না—২/৩ বৎসর পর জমি চাষযোগ্য হলে খাজনা নির্ধারিত হত। তবে গোচরডাঙ্গা ছিল জমিদারের অধিকারভুক্ত কিন্তু গোচারণের অধিকার প্রত্যেক রায়তের স্বীকৃত হতো। তার জন্য জমিদারকে সামান্য খাজনা দিতে হতো। এগুলি মোগল আমলে সয়ের ও জিহাতের মধ্যে পরিগণিত হত। এই রায়তরা আবার তাদের পুকুর পাড়ে বা নিজস্ব ডাঙ্গা বা ভিটির মধ্যে কিছু প্রজা বসাতে পারতো। এদিকে বলা হতো কোর্ফা প্রজা। এদের কাছ থেকে সামান্য হারে খাজনা নেওয়া হতো কিংবা বিনা পারিশ্রমিকে কখনও সখনও শ্রমদান বা বেগার নেওয়া হতো। এছাড়া এই সমস্ত রায়ত নিজের জমি চাষ না করে সাঁজা বিলি ও মাহিন্দরী বিলি করতে পারতো। সাঁজাদারও এক শ্রেণীর বর্গাদার—তবে বর্গাদার যেমন স্থানীয় প্রথামত উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক দেয়, সাঁজাদারকে বিঘা প্রতি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ যেমন বিঘা প্রতি ৪ মন বা ৫ মন ধান জমির মালিককে দিতে হত—উৎপন্ন ফসলের বাকী অংশ সাঁজাদারের। তবে একটা অসুবিধাও ছিল, যেবার

ফসল ঠিকমত হত না, সে বছরও কিন্তু সাঁজাদারকে চুক্তিমত ধান পূরণ করে দিতে হত। আর মাহিন্দরী বিলি ছিল; যে সমস্ত শ্রমিক সারা বছরের জন্য জমির মালিকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মালিকের হালগরু নিয়ে মালিকের নিজেদের চাষে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো তাদের খোরাকিবাবদ এক বছরের চুক্তিতে ২/১ বিঘা জমি ও বেতন দিতে হতো। বছর বছর এই চুক্তির নবীকরণ হতো। কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং-এর প্রকাশিত 'বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন' পুস্তকে, রজতকান্ত রায় তাঁর নিবন্ধে বাংলার কৃষিক্ষেত্রে জোতদারদের প্রাধান্যের উত্থান-এর বিষয় আলোচনা করেছেন—তিনি চাষবাসে নিযুক্ত ব্যক্তিদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(১) কৃষক, যারা নিজেদের জমি চাষ করত, (২) জমিদার অথবা বড় চাষী ও ভাগচাষীদের মধ্যে সাময়িক চুক্তির ভিত্তিতে ভাগ চাষ, (৩) জোতদার কর্তৃক শ্রমিক (মাহিন্দার) নিয়োগ করে চাষ। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন রায়তি ভূস্বত্ব ভোগী কৃষকদের দখলিস্বত্বকে—অনুমোদন করে ও জমিদারের বিরুদ্ধে রায়তদের অবস্থানকে কিছুটা শক্তিশালী করে। এই সমস্ত সাঁজা বা মাহিন্দরী প্রথা রাঢ় অঞ্চলের রায়তি জমিচাষের একটি বৈশিষ্ট্য। মোগল আমলে এক প্রকার খাজনার ব্যবস্থা ছিল যার নাম ছিল মণ্ডলী প্রথা—এই প্রথার বিশেষত্ব ছিল, গ্রামের সমস্ত প্রজার খাজনা একত্রে গ্রাম-প্রধান মকদ্দমের মাধ্যমে জমিদারের কাছে পৌঁছে দিতে হতো। দরপত্তনি, সে-পত্তনি বা আর ভিন্ন রকমের যে সব পত্তনি ছিল, তারই একটা ক্ষুদ্রতম সংস্করণ।

প্রজাদের খাজনা আবার বিভিন্ন রকমের ছিল। সবচেয়ে ভাল জমা ছিল মোকররী জমা—এটি বংশানুক্রমিক চিরস্থায়ী জমা এবং এর খাজনাও চিরস্থায়ী ভাবে নির্দিষ্ট। জমিদার এই রকম জমা থেকে প্রজাকে সহজে উচ্ছেদ করতে পারতো না, আবার ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধিও করতে পারতো না।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে যে সমস্ত ১০০ বিঘার কমে লাখেরাজ জোত ছিল সেগুলিকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে XIX নং আইনবলে মোকররী জমায় রূপান্তরিত করা হয়। অবশ্য এই মোকররী বা দরমোকররী জমির জন্য বন্দোবস্ত গ্রহণকারীকে জমিদারের সেরেস্তায় একটা সেলামি দিতে হত। মোকররীদারগণ আবার দর-মোকররী জমা সৃষ্টি করতে পারতো।

ইজারা বন্দোবস্ত : ইজারা বন্দোবস্ত কিন্তু পত্তনি বন্দোবস্ত নয়। জমিদারগণ তাঁর জমিদারী বিভিন্ন লাটে ভাগ করে ইজারাদারদের মধ্যে এক বৎসর, তিন বৎসর বা ৫ বৎসরের জন্য মেয়াদী বন্দোবস্ত দিতে পারতেন। মেয়াদ অন্তে সেই লাট আবার জমিদারের দখলে চলে আসতো। অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৫০ সালের

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' প্রবন্ধে ইজারাদার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন :

"যদি তিনি আপন গ্রামের ইজারদার হয়েন তবে আর কাহারো নিস্তার থাকে না। তাহার অতি প্রভূত লোভরিপুর হুতাশন শিখা ভূস্বামির অপেক্ষা দীর্ঘ হওয়াই সম্ভাবিত। তিনি সে লোভাগ্নির উপভোগ আহরণার্থে ভূস্বামী সম্ভাবিত নানা প্রকার নিষ্পীড়ন প্রণালীর কোন ভাগই পরিত্যাগ করেন না, বরঞ্চ সর্বপ্রযত্নে তার বৃদ্ধিরই চেষ্টা পায়েন। বিশেষতঃ প্রজারা ভূস্বামীর চিরন্তন ধন; তাহারা এককালে উচ্ছিন্ন না যায় ও অধিকার পরিত্যাগ না করে তাঁহার এমত বাসনা অবশ্যই থাকিতে পারে। কিন্তু ইজারদের নিরূপিত সময় অতীত হইলেই ইজারদারের স্বত্ব লোপ হয় সুতরাং প্রজাদের প্রতি তাঁর স্নেহ সঞ্চারের সম্ভাবনা কি?" দোকান, কারখানা এসবের জন্য ৯৯ বছরে ইজারা দেবার প্রথা এখনও চালু আছে। তবে এসব ইজারার সেলামি বিক্রয়মূল্যের প্রায় সমতূল্য।

আর এক রকমের ইজারা ছিল তার নাম Zar-i-peshgi Ijara সাধারণত খাই খালাসী ইজারা নামে পরিচিত। কিছু থোক টাকা ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে অধমর্ণ উত্তমর্ণের কাছে এই শর্তে কিছু জমি বন্ধক রাখে যে উত্তমর্ণ নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য টাকার সুদ বাবদ জমির ফসল ভোগ করবে আবার আসল টাকা শোধ দিলেই জমি ঋণগ্রহীতায় কাছে প্রত্যর্পিত হবে—কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়াদ অন্তে সুদসহ আসল শোধ হয়েছে বলে গণ্য হবে ও জমি মূল মালিকের কাছে ফেরৎযোগ্য হবে।

জমিদারের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত নেবার বিভিন্ন শর্ত অনুসারে জমার বিভিন্ন শ্রেণী ছিল—যেমন জমা বা জোত, মেয়াদি জমা, মোকররী ও মৌরসী জমা, রায়ত দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট, রায়ত দখলীস্বত্বশূন্য। রায়ত আবার তার জমার কিছু অংশ কোর্ফা, কোর্ফাদার আবার দরকোর্ফা বিলি করতে পারে।

জোত বা জমা : কোন লিখিত চুক্তিপত্র ছাড়াই মৌখিক ভাবে বিলি করা যে জমি চাষী বংশানুক্রমে ভোগ করে তাকে জোত বা জমা বলে। চাষী আবার নিজেদের মধ্যে জোত ভাগ করে নিতে পারে। তবে খাজনা যার নামে জমিদারী সেরেস্তায় রেকর্ড আছে বা যার নামে প্রজা বলে রেকর্ড তাকেই খাজনা দিতে হবে। তবে কোন অংশীদার ইচ্ছা করলে গোমস্তার বা জমিদারের কাছে কিছু সেলামি দিয়ে জমা খারিজ অর্থাৎ নিজের নামে হারাহারি অংশে জমা পত্তন করাতে পারে। তখন মূল জমা থেকে খারিজ করা অংশ বাদ যাবে; অংশীর নামে সেরেস্তায় জমা পৃথক হবে।

মেয়াদী জমা : এই প্রকারের জমায় চাষী জমিদারের কাছ থেকে লিখিত চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য বন্দোবস্ত নেয়। মেয়াদ অন্তে মেয়াদকে নবীকরণ করা যায় অন্যথায় জমি আবার জমিদারের দখলে চলে যাবে।

মোকররী ও মৌরসী : সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমা—জমিদারের সঙ্গে লিখিত চুক্তিমত রায়ত এরূপ জমা নিতে পারতো—এই জমার বৈশিষ্ট্য হল এটি চিরস্থায়ী। অর্থাৎ উচ্ছেদযোগ্য নয় এবং এর খাজনাও বৃদ্ধি করা যাবে না। তবে এর জন্য জমিদারকে দেয় সেলামির হার কিছু বেশী।

দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট জমি : কোন জমার অন্তর্ভুক্ত জমি রায়ত যদি একাদিক্রমে ১২ বৎসর ভোগদখল করে তবে তাকে দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট জমা বলে। এই জমা থেকে চাষীকে সহজে উৎখাত করা যাবে না। এই জন্য জমিদার জমার মেয়াদ বার বৎসর পূর্ণ হবার আগেই প্রজাকে জমা থেকে উচ্ছেদ করে আবার বেশী খাজনায় জমি বন্দোবস্ত দিত। জমিদারের এই রকম দুরভিসন্ধি বন্ধ করার জন্য ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইন পাশ করে প্রজাদের স্বত্ত্ব রক্ষার ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে মেয়াদী, মোকররী, মৌরসী স্বত্ব নাই—সব জমিই রায়ত দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট।

ভাগ জোত : এই ব্যবস্থায় রায়ত যেখানে নিজে হালগরু রেখে চাষ করতে পারে না সেখানে সে চাষীকে জমি ভাগে বিলি করে। চাষী নিজের হালগরু দিয়ে কিংবা লাঙ্গল কিনে নিজের শ্রম দিয়ে ফসল ফলায় ও তার একটা অংশ সাধারণত অর্ধাংশ মালিককে দেয়। এ ক্ষেত্রে সার, ক্যানেলকর, খাজনা মালিককে দিতে হয়—বর্গাদার দেয় বীজ, লাঙ্গল, আর নিজের শ্রম। তবে বর্গাদারকে মালিকের ঘরে সব ফসল তুলে ঝাড়াই করে মালিককে ভাগ দিয়ে বা মালিকের কাছ থেকে চাষ করার জন্য ধান বাড়ি (ঋণ) নিলে মণে দশ সের 'বাড়ি' সহ ফসল শোধ করে নিজের অর্ধেক অংশের যা বাকী থাকে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি আসতে হয়।

কোর্ফা, দরকোর্ফাদের বিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

চাকরান : সে কালে রাজ্যের শান্তিরক্ষার ভার ছিল মহারাজার ওপর। এর দুটো ভাগ ছিল—থানা জাত ও গ্রাম সরঞ্জামী। থানা জাত আবার তিন ভাগে বিভক্ত—থানাকারী, শহর কোতোয়াল ও ফাঁড়ীদারী। থানাকারীর কাজ ছিল দেশে যাতে চুরি ডাকাতি না হয় দেখা আর চুরি ডাকাতি হলে চোর ডাকাতকে ধরে চুরি যাওয়া সমস্ত জিনিষ পুনরুদ্ধার করা।

শহর কোতোয়ালের কাজ ছিল রাজপথে লোক যাতে ফাঁসুড়েদের পাল্লায় না পড়ে—রাহাজানি না হয় তা দেখা, আর হলে দস্যুদের ধরে রাজদরবারে হাজির করা।

ফাঁড়িদার দেশের ছোট ছোট outpost-এ অধিষ্ঠিত থেকে দেশের প্রত্যন্ত অংশের শান্তিরক্ষা করত।

থানাদার, ফাঁড়িদার, শহর কোতোয়াল—এদের কেউ যদি চুরি ডাকাতির জিনিস পুনরুদ্ধার করতে না পারতো, তাহলে এ দিকে নিজ নিজ এলাকার চুরি যাওয়া জিনিসের ক্ষতিপূরণ করতে হত। একাজের জন্য এরা রাজার কাছ থেকে প্রচুর চাকরান জমি (Service tenure) পেত—নাম ছিল কোতোয়ালী চাকরান, থানাদারি চাকরান, ফাঁড়িদারি চাকরান। তাছাড়া খোরাকিবাবদ টাকাও পেত।

১৭৬০ সালে মীরকাশিম কোম্পানীকে বর্ধমান পরগনা থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার ছেড়ে দেওয়ার সময় পরগনায় চার ধরনের দেশরক্ষী ছিল—এরা ছিল নগদী, থানাদারী-পুলিশ, গ্রাম-সরঞ্জামী ও ঘাটোয়াল। কোম্পানীর অধিকারে জমিদারী যাওয়ায় তাদের কাজ চলে যায়; তখন মহারাজা তাদেরকে চাকরান জমি দিয়ে নিজের জমিদারীর মধ্যে শান্তিরক্ষার কাজে নিয়োগ করেন। অবশ্য এর জন্যে মহারাজা কোম্পানীর কাছ থেকে তাঁর দেয় রাজস্ব থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ছাড় পেতেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে থানাদারী পুলিশের সংখ্যা ছিল ৩০৭৯ জন। এদের জন্য ১৪৪৯১ একর জমি চাকরান দেওয়া ছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের XXII নং আইন মোতাবেক ৮০১ থানাদার, থানা পাইক ও পিওনের পদ খোয়া যায় ও ৪৬৫২ একর জমি বাজেয়াপ্ত হয়। বাকী ২২০০ চৌকিদার ফাঁড়িদার, পাইক ও পিওনের চাকরীকে আইনী স্বীকৃতি দেওয়া হয়, এদিকে প্রদত্ত ১০,০০০ একর জমি তারা চাকরান ভোগ করতে থাকে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এদের পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে এদিকে গ্রাম-সরঞ্জামী, পাইক পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয় ও এদিকে জমিদারী কাছারীরও শান্তিরক্ষার কাজে নিয়োগ করা হয়।

গ্রাম-সরঞ্জামী ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রামের চৌকিদার—চৌকি বা ফাঁড়ির দায়িত্বে রক্ষী। এদের কাজ ছিল রাত্রে গ্রাম-পাহারা দেওয়া। মাঠে শস্য কাটা হলে মালিকের সঙ্গে চাষীর ভাগ বাঁটোয়ারা না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি পাহারা দেওয়া, জমিদারের কাছারীতে গোমস্তার ফরমাইস খাটা ইত্যাদি। এই কাজের জন্য এরা প্রত্যেকে সাড়ে আট বিঘার মত জমি চাকরান পেত কিন্তু কোন খোরাকি পেত না। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এদের সংখ্যা ছিল ১৭২৪৮, আর এদের জন্য সাকুল্যে ৪৬২৩৬ একর জমি চাকরান দেওয়া ছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের কালেক্টরের

রিপোর্টে দেখা যায় এদের কতকগুলি শ্রেণী বিভাগ ছিল। চৌকিদারের সংখ্যা ছিল ৮৯৭৮, এদের মধ্যে ৬৬ জনকে নগদে বেতন দেওয়া হত, সীমানাদারের সংখ্যা ২১৩৮ জন, হলশনস্ (halshanas) বা আমিন এর সংখ্যা ৩৬, মীরদহস বা চেইনম্যান ছিল ২ জন, সর্দার ৫, নাগার্চি (ঢাক পিটানো ছিল কাজ) ৭, অষ্টপ্রহরী (মাঠ শস্য পাহারাদার) ছিল ২ জন।

আর ছিল ঘাটোয়াল—১৮৩৬-৪০ সালের চাকরান রেজিষ্টারে দেখা যায় সেই সময় ১৫টি থানায় ৭১ জন ঘাটোয়াল ছিল—এরা ছিল পাহাড়ী সর্দার—এরা ঘাট পাহারা দিত। এদের সংখ্যা ছিল ২৩৮, এদের জন্য বরাদ্দ ছিল ৭৯৮২ বিঘা ঘাটোয়ালি চাকরান। এরা সীমানা রক্ষাকারীর দায়িত্বে নিযুক্ত ছোটখাট সৈন্যবাহিনীর সর্দারী করার কাজে নিযুক্ত হত।

পরে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এদের পদও উঠিয়ে দেওয়া হয় আর চাকরানও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এই সমস্ত জমা ছাড়া দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, শিবোত্তর, পীরোত্তর, নজরৎ. চিরব্‌গণ প্রভৃতি নিষ্কর জমি দান (আয়েমা) হিসাবে দেওয়া হত। এদের পরিমাণ ছিল ৬৬০০ একর, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে দেখা যায় এরকম প্রায় ১৭০২৪০ ছোট ছোট নিষ্কর প্লট ছিল।

সাধাবণ প্রজা ও রায়তগণও নানারকম চাকরান জমা সম্পাদন করতেন। কুলদেবতা, শিব, নারায়ণ প্রভৃতি যে সমস্ত দেবতার নিত্য সেবা হয়—তাদের সেবাপূজার জন্য গ্রামের পুরোহিতকে চাকরান জমি দেওয়া হতো। পুরোহিত এই জমি বংশানুক্রমে ভোগ করতেন ও তার পরিবর্তে প্রতিদিন দুপুর সন্ধ্যায় বিগ্রহের পূজা করে দিয়ে যেতেন। বার মাস নাপিত গৃহস্থের সকলের কামানো, মেয়েদের সপ্তাহে সপ্তাহে আলতা সিঁদুর পরানো, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়নের কাজ করা প্রভৃতির জন্য নাপিতকেও চাকরান দেওয়া থাকতো। চাষীরা তাদের লাঙ্গল, ফাল, কাস্তে, কোদালে শান দেওয়ার জন্য কর্মকারকে জমি না দিয়ে লাঙ্গল পিছু এক মণ ধান দিত—এও এক ধরনের অলিখিত চাকরান। সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ীর দুর্গাপূজা কালীপূজা প্রভৃতি পূজায় ঢাক ঢোল বাজাবার জন্য ডোম বা মুচিদের চাকরান দেওয়া থাকতো। তবে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রথাও উঠে গেছে। তাছাড়া গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষার প্রসারও ঘটেছে—কেবলমাত্র ক্ষৌরকর্ম করলে আর নাপিতের সংসার চলে না, চাকরানের জমির ওপর নির্ভর করে পুরোহিতের সংসার চলে না, কাজেই এরা বর্তমানে চাকরান জমি সব বিক্রি করে দিয়ে নানা রুজি রোজগারের ধান্দা করেন।

জেলার উত্তরপূর্ব অংশে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার লাগোয়া অঞ্চলে কিছু কিছু রায়তি স্বত্ব ও পোয়ালি জমা আছে। উদ্‌বন্দী শর্তে জমির আয়তন ও খাজনা বছর বছর নির্ধারিত হয়। পোয়ালী জমার সংখ্যা ও আয়তন খুবই কম। এই জমার বৈশিষ্ট্য হল এর খাজনার কিছু অংশ অর্থে ও কিছু অংশ ফসলে দেওয়া হতো। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন-এর ১৮০ নং ও ১৮০ (এ) ধারা যুক্ত হওয়ায় এই সমস্ত জমিকে রায়তি দখলীস্বত্ব দেওয়ার বাধা অনেক দূর হয়েছে।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লাউড্ কমিশন জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ সাধনের সুপারিশ করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ; বিয়াল্লিশের আন্দোলন-এর পরিপ্রেক্ষিতে তখন এই সুপারিশ কার্যকর করা যায় নাই। স্বাধীনতার পর এই সুপারিশের সূত্র ধরেই ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে W.B. Estate Acquisition Act বা জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ। জমিদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার থেকে শুরু করে সব রকম মধ্যস্বত্বভোগী ও বড় বড় জোতদারদের কৃষিজমির ঊর্ধ্বসীমা রাখা হয় ২৫ একর ও অকৃষি জমির ঊর্ধ্বসীমা রাখা হয় ১৫ একর। এছাড়া ৬(৩) ধারা মতে প্রকৃত দেবোত্তর শহরের পাকা বাড়ি, বাগান, চা-বাগান, মৎস্যচাষের পুকুরের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেওয়া হয়। বাকী উদ্বৃত্ত জমি সরকারে বর্তাবে এই রকম শর্ত করা হয়। এই উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ ও ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণের জন্য ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে Revisional settlement আরম্ভ হয়। প্রতিটি জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী যাদেরই সরকার নির্ধারিত জমির ঊর্ধ্বসীমার ঊর্ধ্বে জমি থাকবে তাদের প্রত্যেককেই 'বি' ফরমে তাদের মনোমত জমি রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করে সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে জমা দিতে হয়েছে। যারা রিটার্ন দেবেন না তাদের জমি অফিসার ইচ্ছামত ২৫ একর কৃষিজমি ও ১৫ একর অকৃষি জমি রেখে বাকী সমস্ত জমি সরকারে vest করিয়ে দিতে পারবেন। এই সমস্ত ফরম পরীক্ষা করে রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে উদ্বৃত্ত জমি সরকারে vested বলে গণ্য করে মালিককে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা হয়। Settlement বিভাগ এই উদ্বৃত্ত জমির তালিকা প্রস্তুত করে ক্ষতিপূরণ আধিকারিকের নিকট তালিকা পাঠিয়ে দেন। ক্ষতিপূরণ আধিকারিক ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করেন। ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে তালিকা প্রস্তুত হয়েছে তাতে দেখা যায় জমিদার ও পত্তনিদারদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮২৫ জন ও মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা ২৮৯৯৩। এই সমস্ত মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বিলোপসাধন করা হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমিদার ও সরকারের সরাসরি অধীনে রয়েছে রায়ত। যে সমস্ত জমি নিষ্কর বা খাজনার যোগ্য ছিল সেই সমস্ত জমির

খাজনা ধার্য হয়েছে। তবে তিন একরের কম যাদের জমি তাদের খাজনা মকুব করা হয়েছে। তিন একরের ঊর্ধ্বে যাদের জমি তাদের খাজনার হার একরে নয় টাকা শতকে নয় পয়সা। এর ওপর সেস আছে।

এরপর ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ভূমি সংস্কার (সংশোধন) আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে ব্যক্তিগত মালিকানার ঊর্ধ্বসীমার বদলে পরিবার-ভিত্তিক ঊর্ধ্বসীমা স্থির হয়। একজন সদস্য বিশিষ্ট পরিবার সর্বোচ্চ ২.৫০ হেক্টর বা ৬ একর কৃষিজমি অথবা ৯ একর অন্য ধরনের জমি রাখতে পারবে আর সর্বোচ্চ সদস্যের পরিবার সর্বোচ্চ ৭ হেক্টর বা ১৭ একর কৃষি-জমি বা ২৪ একর অন্য ধরনের অন্য জমি নিজ দখলে রাখতে পারবেন। এর জন্য বড় বড় জমির মালিককে ৭(ক) ফরমে রিটার্ন দাখিল করতে হয়। কিন্তু বড় বড় রায়তদের দখলের জমি যা সরকারে ন্যস্ত হওয়ার কথা ছিল জোতদারদের কারসাজিতে তার মাত্র শতকরা ১০ ভাগ সরকারে ন্যস্ত হল। উদ্বৃত্ত ৯০ ভাগ জমিই জোতদারদের হাতেই রয়ে গেল। জেলা পরিকল্পনা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্লক প্রোফাইল' ১৯৯৫ পুস্তিকা থেকে দেখা যায় ১৯৯৫-এর মার্চ অবধি সরকারে ন্যস্ত খাস কৃষি জমির পরিমাণ ৩২৯৪৭ হেক্টর।

সংশোধিত ভূমিসংস্কার আইন অনুসারে উদ্বৃত্ত জমি নির্ণয় করার জন্য আশির দশকে সেটেলমেন্টের রেকর্ড সংশোধন শুরু হয়েছে। এই সংশোধন বিংশ শতাব্দীতে শেষ হয় নাই। এই সংশোধন মতে আবার রায়তদের কাছ থেকে ৭এ নং ফরমে (7A) রিটার্ন চাওয়া হয়েছে ও সেই রিটার্ন পরীক্ষা করে "one man one Khatian" নীতি অনুসারে প্রত্যেক রায়তের সমগ্র জেলার এমনকি অন্য জেলায় অবস্থিত সম্পত্তির হিসাব নিয়ে একটি মাত্র খতিয়ান করা হচ্ছে। তবে পদ্ধতিটি খুবই জটিল, কত দিনে যে এই সংশোধন সম্পূর্ণ হবে ও one man one khatian সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে, সেটার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা শক্ত।

সরকারে ন্যস্ত জমি কিভাবে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করা হবে তা ভূমিসংস্কার আইনের ৪৯ নং ধারা ও ২০ক বিধি মতে নির্ধারিত হয়েছে। এই বিধিমতে সম্ভাব্য উপকৃতদের তালিকা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি। এই তালিকা মহকুমা শাসকের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে। অনুমোদন পাওয়া গেলেই পাট্টা দিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা হয়। '৯৬ সাল পর্যন্ত জেলার এই ভাবে বিলিকরা চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৪৯৩৮৮.৪৮ একর এবং পাট্টা প্রাপকের সংখ্যা ১,৭৯,২৮১ জন; এদের মধ্যে তফসিলী জাতি ৭৫৪৩০ জন, উপজাতি ৩৭৯১৫ জন ও অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত

৬৫৯৩৬ জন। তাছাড়া ক্ষেতমজুর, কারিগর, মৎস্যজীবী, বর্গাদার, কুম্ভকার যাদের বাস্তু জমি নাই তাদের প্রত্যেককে ৪ কাঠা হিসেবে বাস্তুভিটা দেবার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচি অনুসারে জুন '৯৬ পর্যন্ত ৫৮২৮০ জনের মধ্যে ২০৪৫.১৭ একর বাস্তু জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে।

বর্গাদারী প্রথা : পশ্চিমবঙ্গ তথা বর্ধমান জেলায় বর্গাদারী প্রথায় জমিচাষ একটা দীর্ঘদিনের কালচার। সাধারণ ভদ্রলোক শ্রেণী বা চাকুরীজীবীরা তাঁদের জমি নিজেরা চাষ করেন না। তাঁরা বর্গাদারদের দিয়ে জমিচাষ করিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান। বর্গাদার নিজের হালগরু, বীজধান ও শ্রম দিয়ে মালিকের জমি চাষ করে ও উৎপন্ন ফসল মালিকের খামারে তুলে ঝাড়াই করে মালিকের অর্ধেক ভাগ ও মালিকের ঋণ সুদশুদ্ধ শোধ করে দিয়ে বাকী যা থাকে তাই নিয়ে বাড়ী আসে। আবার বোশেখ / জ্যৈষ্ঠ মাসে মালিকের কাছে বস্তা নিয়ে হাজির হয় ধান 'বাড়ি' বা ঋণ নেবার জন্য। এই ঋণ পৌষ মাসে মণ প্রতি দশ সের সুদসহ শোধ করতে হবে। মালিক জমিতে সার, খোল, ওষুধ দেন আর ক্যানেলকর ও জমির খাজনা বহন করেন। কিন্তু বর্গাদারদের কোন নিরাপত্তা ছিল না। মালিক যখন খুশি তাকে বর্গা থেকে উৎখাত করে নতুন বর্গাদার নিযুক্ত করতে পারতো। তারপর নিজের খামারে ধান তুলিয়ে নিজের ভাগ ছাড়া নানা অজুহাতে তাকে শোষণ করে যৎসামান্য যা বাকী থাকে তাই দিয়ে বিদেয় করতো। অত্যাচার যখন চরমে ওঠে তখন বামপন্থী রাজনৈতিক নেতারা বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য 'তেভাগা' আন্দোলন শুরু করে। তাঁদের নেতৃত্বে বর্গাদাররা দাবী তোলে 'লাঙ্গল যার জমি তার।' বর্গাদারদের প্রাপ্য অর্ধেক নয়; উৎপন্ন ফসলের ২/৩ অংশ। অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিতের মতে 'তেভাগা আন্দোলনে'র তাৎক্ষণিক ফল হচ্ছে ১৯৪৭ সালের Bengal Bargadars' Temporary Regulation Bill যার উদ্দেশ্য জোতদার কর্তৃক বর্গাদারদের বিনিয়োগের ভিত্তিতে ভাগের বিধান দেওয়া। এই বিলে জমির অবাঞ্ছিত ব্যবহারের কারণে উৎখাতের অধিকার জোতদারদের দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫০ সালে বর্গাদার আইনে একে বিধিবদ্ধ করা হয়। ভাগচাষীকে ক্রীতদাস করে রাখার জন্য এই উৎখাতের অধিকারই ছিল জোতদারদের প্রধান হাতিয়ার।' (বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন)। এদের স্বার্থে সত্তর দশকের গোড়া থেকে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশালবাড়ী আন্দোলন শুরু হয়। ব্যাপক হারে জোতদার 'খতম্' হতে থাকে। দাবানলের মত এই আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায়

এসে বর্গাদারদের নাম সেটেলমেন্ট রেকর্ডে নথিভুক্ত করানোর জন্য 'অপারেশন বর্গা' পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর আগেও অবশ্য ১৯৫৪ সালের রিভিশ্যন্যাল সেটেলমেন্টের সময় ১৯৫০ সালের বর্গাদার আইন অনুসারে সেটেলমন্ট রেকর্ডে বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করাবার জন্য সরকারী নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বেশীর ভাগ মালিক উচ্ছেদের ভয় দেখিয়ে বর্গাদারদের আমিন বা অফিসার কারোও কাছে ঘেঁষতেই দেয় নাই। কাজেই সরকারী নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সে সময় বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করানোর নির্দেশ বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই। অবশেষে 'অপারেশন বর্গা' পরিকল্পনা যথেষ্ট সাফল্যলাভ করে। এই পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত জেলার ১,১০,৭০৩.৫১ একর জমিতে ১,২৫,৯৫৮ জন বর্গাদার নথিভুক্ত হয়েছে। এই নথিভুক্ত হওয়ার ফলে জমিতে বর্গাদারদের বর্গা করার স্বত্ব পুরুষানুক্রমিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এছাড়া বর্গাদাররা উচ্ছেদ হওয়ার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে। তাছাড়া এই রেকর্ড দেখিয়ে বর্গাদারগণ ব্যাঙ্ক থেকে অল্পসুদে ঋণ পেতে পারে। বর্গাদারগণ এই নথিভুক্ত হওয়ার ফলে মালিকের খামারে ধান না তুলে নিজেদের খামারে ধান তুলতে পারবে ও ধান ঝাড়াই করে উৎপন্ন ফসলের ১/৪ অংশ মালিককে দিয়ে নিজেরা ৩/৪ অংশ ভাগ নেবার হকদার হয়েছে—তবে এই ৩/৪ অংশ পেতে হলে বর্গাদারকে চাষের সমস্ত খরচ বহন করতে হবে। এখন প্রশ্ন বর্গাদার তো নিজের খামারে ধান তুলবে কিন্তু কয়জন বর্গাদারের নিজস্ব খামার আছে? বা কয়জন বর্গাদারের চাষের সমস্ত খরচ বহন করার আর্থিক সঙ্গতি আছে? সে কারণে কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালিক চাষের সমস্ত খরচ বহন করে ফসলের অর্ধেক বা ১/৩ অংশ ভাগ পাচ্ছে আর বর্গাদার হালগরু ও শ্রম দিয়ে বাকী অর্ধেক পাচ্ছেন—কোন কোন ক্ষেত্রে ২/৩ অংশও অবশ্য পাচ্ছেন। আরও অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। বর্গাদার আইন পাশ হওয়ার পর থেকে মালিকরা সতর্ক হয়ে গেছে। ফলে অপারেশন বর্গা শুরু হওয়ার আগেই অনেক মালিক বর্গাদারকে উচ্ছেদ করে নিজেরা হালগরু কিনে নিজেরা চাষ শুরু করে দিয়েছে। এর ফলে বহু বর্গাদার বর্গাদারীর স্বত্ব হারিয়ে কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়েছে। অনেকে জমি বিক্রয় করে দেওয়ার ফলে বর্গাদারদের চাষের জমি কমে গিয়েছে তাদের পক্ষে হালগরু রেখে ৫/৭ বিঘা জমি চাষ করা লাভজনক হচ্ছে না। মালিকদের মধ্যে যাদের মোট জমি ৫/৬ বিঘা ও যারা এই সামান্য জমির ওপর নির্ভর করে কোন রকমে মাস ছয়ের খোরাক যোগাড় করতে পারতো, তারা ঠিক মত ধান বর্গাদারদের কাছ থেকে আদায় করতে পারছে না, ফলে তারাও দুর্দশা-

গ্রস্ত হয়েছে—বিশেষ প্রয়োজনে যেমন মেয়েদের বিবাহ, বা চিকিৎসার খরচ যোগাড় করার জন্য জমি বিক্রয়ের বিশেষ প্রয়োজন হলে তারা সহজে জমি বিক্রি করতে পারছে না। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনাথ বিধবারা, যারা স্বামীপরিত্যক্ত ৫/৭ বিঘা জমির ওপর নির্ভর করতো—তাদের ওপর বর্গাদারের অত্যাচার বেড়েছে। তারা পূর্বের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিচ্ছে।

তাছাড়া আর একটা কথা চিন্তা করা দরকার। ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্যন্ত জেলার চাষযোগ্য ৪৯৩৮৮.৪৮ একর অর্থাৎ ১৪৮১৬৫ বিঘা জমি ১৭৯২৮১ জন ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে মাথাপিছু .৮২ শতক অর্থাৎ ১৬ কাঠার মত ভাগে পড়ে। দেখা যাচ্ছে ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যার তুলনায় বিলির জমির পরিমাণ খুবই কম।

ত্রিশ অধ্যায়



আইন আদালত

মোগল যুগে কাজিই দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার বিচারের দায়িত্বে ছিলেন। বিচার হতো ইসলামিক বিধি মতে। আর যে সমস্ত বিষয় ধর্মীয় আইনের আওতার বাইরে, সেই সমস্ত বিষয়ের বিচার করতেন মীর-ই-আদল। জমিদারদের বিচারের কোন ক্ষমতা ছিল না। নবাবী আমলে নবাবই বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। তবে বর্তমানের civil code বা criminal code এর মত কোন লিখিত আইন ছিল না। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দ্বাদশ কানুন ও ঔরঙ্গজেবের ফতোয়া-ই-আলমগীরি এবং কোরানের অনুশাসন অনুসারেই বিচার হত। মুফ্‌তিগণ ইসলামীয় আইনের ব্যাখ্যা করতেন। গ্রামে কোন কাজির আদালত ছিল না। গ্রাম-প্রধানরাই পঞ্চায়েতে বসে বিচার করতেন। মোগল রাজত্বের শেষ দিকে যখন নবাবদের ক্ষমতা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন জমিদারগণই নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে বিচার ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। C.D. Field তাঁর "The Regulations of the Bengal code'-এর ভূমিকায় লিখেছেন—The Zamindars—assumed that power for which no provision was made by the law of the land, and they exercised it with a view not to justice but to their own interest. ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বর্ধমানে এক রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন; তাঁর দায়িত্ব মূলত রাজস্ব-সংক্রান্ত হলেও তিনি অন্যান্য বিচারও করতেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভেরেলিষ্ট বর্ধমানের সুপারভাইজার নিযুক্ত হন—তিনি সেকালে বর্ধমানে প্রচলিত কতকগুলি স্থানীয় আদালতের তালিকা দিয়েছেন—

(১) *সদর কাছারী :* এখানে সব রকম খাজনা, রাজস্ব জমা নেওয়া হত, জমিজমার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজের সম্পাদন হতো। জমিদার ও প্রজার মধ্যে খাজনা সম্পর্কিত কোন বিষয়ের বিবাদের মীমাংসা হতো।

(২) বক্সী দপ্তর : জেলার শান্তিরক্ষা, চুরি ডাকাতি, রাহাজানি বন্ধ করা, চুরি ডাকাতি হলে থানাদার ফৌজদার দিয়ে অপরাধীকে ধরে এনে বিচারের জন্য হাজির করা, অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধার করা—দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করা এবং শান্তিরক্ষার জন্য সব ফতোয়া জারি করা সমস্তই এই আদালত থেকে হত।

(৩) ফৌজদারী আদালত : দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চুরি, রাহাজানি, খুনখারাপি প্রভৃতি সব রকম ফৌজদারী অপরাধের বিচার এই আদালতেই নিষ্পত্তি হত।

(৪) বড় আদালত : পঞ্চাশ টাকার ঊর্ধ্বের সবরকম দাবীর নিষ্পত্তি করার দেওয়ানী আদালত ছিল এই বড় আদালত। ৫০ টাকা পর্যন্ত ছোটখাট দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য ছিল চুটা (ছোট, chootah) আদালত।

(৫) আমিনী দপ্তর : সদর কাছারীর অধীনস্থ রাজস্ব ও খাজনা সংক্রান্ত সব রকম মামলা এখানেই প্রথমে দাযের করা হত, পরে এখান থেকে সদর কাছারীতে পাঠানো হত।

(৬) বাজে জমা দপ্তর : সবরকম নারী ঘটিত ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা ও সাংসারিক বিবাদ-বিসংবাদ-সংক্রান্ত বিচারের আদালত। এছাড়া সরাইখানা, বিশ্রামাগার, পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি সব রকম জনকল্যাণমূলক জমির পাট্টা এখান থেকেই দেওয়া হত।

(৭) খারিজ দপ্তর : জমিদারীর হিসাবনিকাশের ফয়সালা হলে এ দপ্তরে পাঠানো হত—অর্থবিলির জন্য; তাছাড়া মহাজন ও ঘাতকের মধ্যে বিবাদের ফয়সালা এখান থেকেই হত।

(৮) বাজে জেমিন দপ্তর : জনকল্যাণমূলক ও লাখেরাজ জমাসংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি হত এই আদালতে।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ফৌজদারী বিচারের জন্য রেজা খাঁর পরিকল্পনা মত জেলার ফৌজদারী আদালত স্থাপন করা হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংস বিচার সংস্কারে ব্রতী হয়ে অন্যান্য জেলার সঙ্গে বর্ধমানেও একটি মফস্বল দেওয়ানী আদালত ও মফস্বল ফৌজদারী আদালত স্থাপন করেন। জমিদারী ও তালুকদারির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলা ছাড়াও যাবতীয় দেওয়ানী সংক্রান্ত মামলার বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হল সদর দেওয়ানি আদালতের ওপর। এই বিচারকার্যের সভাপতিত্ব করতেন জেলার কালেক্টর। মফস্বল ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করতেন ভারতীয় বিচারকগণ।

মফস্বল দেওয়ানি বিচারের বিরুদ্ধে আপীল এবং জমিদার ও তালুকদারির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলার বিচারের জন্য কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম নামে

একটি আদালত স্থাপিত হয়। গভর্নর ও দুই জন কাউন্সিলর-এর বিচারের দায়িত্বে ছিলেন। মফস্বল ফৌজদারী আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল ও যে সমস্ত আসামীর প্রাণদণ্ড দেওয়া হত তাদের বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন মুর্শিদাবাদে সদর নিজমত আদালত স্থাপিত হয়। নাজিম অর্থাৎ নবাব ছিলেন এর সভাপতি।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিলের রেগুলেশন অনুসারে বর্ধমান দেওয়ানি আদালতের এলাকা বর্ধমান চাকলা, সাত সৈকা জেলা ও কাটোয়া থানার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। এই সমস্ত বিচারালয়ের বিচারপতিকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করতে হত। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা থাকলেও এই সমস্ত বিচারপতির ফৌজদারী মামলার বিচারের ক্ষমতা ছিল না। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সমস্ত বিচারপতি তথা ম্যাজিস্ট্রেটকে ছোটখাট ফৌজদাবী বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থার আরও সংস্কার কবেন। সদর নিজামত আদালতকে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলরগণ এই আদালতে বিচার করতেন—কাজী ও মুফতি আইনেব ব্যাখ্যা করতেন। এই আদালতের অধীনে চারটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় স্থাপন করা হয়। দুজন ইংরাজ বিচারপতি ও তাঁদেরকে সাহায্য করার জন্য কাজী ও মুফতিকে নিয়ে এই আদালত প্রতি বৎসর জেলার বিভিন্ন অংশে ঘুরে ঘুরে ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি করতেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হলে দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন সাধন করতে হয়। জমির মালিকানা, ভূমি রাজস্ব, রায়তের খাজনা এই সমস্ত বিষয়ের বিচারের ভার পর্যায়ক্রমে কতকগুলি বিচারালয়ের উপর ন্যস্ত হল। সর্বনিম্ন আদালত হল সদর আমিন ও মুনসেফি আদালত, এর উপরে জেলা জজের বিচারালয়। জেলা বিচারালয়ে এক জন ইংরেজ বিচারপতি দেশীয় আইনজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে বিচার করতেন। দেশীয় আইনজ্ঞরা আইনের ব্যাখ্যা করে দিতেন। পূর্বের মত কালেক্টরগণ জেলা দেওয়ানি আদালতে বিচার করতেন, তাঁদের ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ক্ষমতা পূর্ববৎই থাকে। দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থার গঠন সম্পর্কে H. Cowell তাঁর History and constitution of courts and legislative Authorities in India-তে মন্তব্য করেছেন—"Below the city and Zillah courts were two classes of inferior judges. First in order were the Registrars of those courts who could dicide cases for amounts not exceeding Rs. 200, subject to revision by judges. The rest and lowest grade of judges were the

Native Commissioners, who under Regulation XI of 1793 could decide civil suits for sums of money or personal property of a value not exceeding 50 sicca rupees. Of these officers the head commissioners were called sudder Ameens and the rest were called Moonsiffs" ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে কালেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঐ বৎসরের VII নং রেগুলেশন মোতাবেক জেলাজজকেও সেসন জজেরও ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর ফলে বিভাগীয় কমিশনারের কাজের চাপ খানিকটা কমে যায়। এখন থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টার জেলা প্রশাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন, জেলা ও সেসন জজ জেলার বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাজী ও মুফ্‌তিপদের অবলুপ্তি ঘটানো হয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতি জেলায় একজন দেওয়ানি ও সেসন জজ এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর নিযুক্ত করা হয়। প্রথমে মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর ও বর্ধমানে পরীক্ষামূলকভাবে নিয়োগ করা হয়, পরে অবশ্য সব জেলাতেই এই ব্যবস্থা চালু হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধমানবাজ জাল প্রতাপচাঁদ সংক্রান্ত মামলার সময় বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জেমস বেলফোর ওগলবি; তিনি তিন লক্ষ টাকা উৎকোচ নিয়ে জাল প্রতাপচাঁদ সংক্রান্ত মামলা বর্ধমান কোর্টে বিচাব না করে হুগলী কোর্টে স্থানান্তরিত করেন। হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ই. এ. সামুয়েল। হুগলী কোর্টের জজ ছিলেন জেমস কার্টিস। তিনিই প্রতাপচাঁদের দায়রা বিচার করেন। বিচারককে সাহায্য করার জন্য একজন কাজী ছিলেন। এখানকার রায় প্রতাপচাঁদের বিপক্ষে যাওয়ায় কলকাতায় নিজামত আদালতে আপিল করা হয়। সেখানে বিচারপতি ছিলেন W. Brodin ও C. Tukar। প্রতাপচাঁদ এখানকার রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করার আবেদন করায় সে আবেদন নাকচ হয়। জাল প্রতাপচাঁদের মামলার বিবরণ থেকে সেকালের বিচার ব্যবস্থার একটা বাস্তবচিত্র পাওয়া যায়।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জেলায় কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে একজনকে নিয়োগ করা হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে Indian Penal Code ও Indian Criminal Procedure Code পাশ করে আইনী ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। জেলাজজ, একজন সাবজজ, একজন অতিরিক্ত সাবজজ ও চারজন মুনসেফকে নিয়ে জেলার দেওয়ানি আদালত গঠিত হয়। কালনা, কাটোয়া, আসানসোল ও দুর্গাপুরেও দেওয়ানি আদালতের দায়িত্ব দেওয়া হয় একজন মুনসেফের ওপর। আসানসোলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন-খারাপির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি

পাওয়ায় এখানে একজন অতিরিক্ত মুনসেফকে স্থায়ীভাবে বহাল করা হয়। জেলার ফৌজদারী বিচারের দায়িত্বে থাকেন জেলা ও সেসন জজ এবং মহকুমার ফৌজদারী বিচারের দায়িত্বে থাকেন একজন subdivisional Judicial Magistrate। এছাড়া বর্ধমান, রানীগঞ্জ, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় একজন করে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন।

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে W.B. Separation of Judicial and Executive functions Act পাশ হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৫০ নং আর্টিকেলের লিখিত নির্দেশমূলক নীতির নির্দেশ অনুসারে বিচার ও প্রশাসনকে সম্পূর্ণ পৃথক করা। এই অ্যাক্ট অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট পদকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়।

(১) **Judicial Magistrate :** মহামান্য উচ্চ আদালতের সঙ্গে পবামর্শ করে এই পদে কাউকে নিযুক্ত করা হয়। এর কাজ হচ্ছে কোন অপরাধকে বিচারযোগ্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া, সাক্ষ্যপ্রমাণসহ অপবাধেব অনুসন্ধান ও Indian Penal Code-এর সংশ্লিষ্ট ধাবা মতে বা স্থানীয় বা বিশেষ আইন বলে অপরাধীর বিচার করা।

(২) **Executive Magistrate :** এঁব নিয়োগের জন্য উচ্চ আদালতের অনুমোদন লাগে না। এঁদের দায়িত্ব হচ্ছে অপরাধ যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া; তাছাড়া জেলার সবরকম প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।

বর্তমানে জেলার বিচারের সর্বোচ্চ দায়িত্বে আছেন জেলা ও সেশন জজ, ৩ জন অতিরিক্ত জেলা ও সেসন জজ, তিন জন সাব-জজ ও ১২ জন মুনসেফ। বর্ধমানে আছেন জেলাজজ ছাড়া দু জন অতিরিক্ত সেসন জজ, ২ জন সাব-জজ ও ৪ জন মুনসেফ। আসানসোলে বিচারের দায়িত্বে আছেন একজন অতিরিক্ত জেলা ও সেসন জজ, ৬ জন সাব-জজ ও তিন জন মুনসেফ। কাটোয়া ও দুর্গাপুরে ২ জন করে মুন্‌সেফ আর কালনায় আছেন একজন মুনসেফ।

বর্ধমান জেলা জজ-এর অধীনে সমস্ত আদালতে বছরে কত মামলা দায়ের হয়, কতগুলির নিষ্পত্তি হয় ও কতগুলি বকেয়া থাকে তার ১৯৭০-৭২ সালের একটা হিসাব দেওয়া হল—এই হিসাব থেকে জেলার মামলার সংখ্যা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাবে।

বৎসর	রুজুকরা মামলা	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (বকেয়াসহ)	বকেয়া
১৯৭০	২৮২৫৯	১৬১১৯	২২৩৬৬
১৯৭১	১৪৯৭৫	১৬৭২৬	২০৯০২
১৯৭২	১৯৩৯০	১৭৪১৫	২২৭৯২

বছর বছর এরকম বকেয়া মামলা জমতে জমতে মামলার পাহাড় জমে গেছে। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মান্ধাতা আমলের Civil Procedure code, Criminal procedure code-এর, মনে হয় আমূল সংস্কার প্রয়োজন, তাছাড়া জজের সংখ্যা আরও বাড়ান দরকার।

একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন আগে দেওয়ানী মামলার পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে থাকতেন Govt Pleader ও ফৌজদারী মামলার জন্য সরকারের পক্ষে থাকতেন Public Prosecutor, বর্তমানে মামলার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারী উকিলের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে জুরি প্রথা চালু হয়। প্রমাণ অনুসারে বিচার্য খুন খারাপী বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ার্থ শিক্ষক, গ্রামের প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ৫/৬ জন জুরি নিযুক্ত হতেন। কোন দায়রায় সোপরদ্দ মামলার চূড়ান্ত শুনানির পর রায় দেবার পূর্বে সেসন জজ জুরিদের আহ্বান করে তাঁদের কাছে মামলার পূর্ণ বিবরণ ব্যাখ্যা করে আসামী দোষী কি নির্দোষ-এর সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জানতে চাইতেন। তাঁরা আইনের ধারা উপধারার বাইরে সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে ব্যক্তিগত মতামত জানাতেন। তাঁদের অধিকাংশের মত গ্রহণ করে সেই অনুসারে রায় দিতেন। তবে বিচারক তাঁদের সঙ্গে একমত নাও হতে না পারতেন; তাহলে মামলার সমস্ত নথি উচ্চ আদালতে পাঠাতেন প্রধান বিচারপতির মতের জন্য। সেই মতই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হত। স্বাধীনতার পরও অনেকদিন পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল—কিন্তু দেখা গেল এই সব জুরিকে আসামীর তরফ থেকে নানা ভাবে প্রভাবিত করা হচ্ছে—ফলে বিচারের চেয়ে অবিচারই বেশী হচ্ছে। সেইজন্য জুরিপ্রথা অপ্রয়োজনীয় বিধায় ষাটের দশকে উঠিয়ে দেওয়া হয়।

মামলা নানা ধরনের হয়। ফৌজদারী মামলা, দায়রা মামলা, ফৌজদারী আপিল, বিশেষ ফৌজদারী মামলা, দেওয়ানী স্বত্ব বিচারের মামলা, অর্থসংক্রান্ত Money suit, special court case, রাজস্ব বা খাজনা সংক্রান্ত মামলা। এছাড়া

আছে Execution case, misc case, নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল মামলা, হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের আপিল মামলা। দেওয়ানী মামলায় সম্পত্তির মূলের ওপর কোর্ট ফি লাগে। ফৌজদারী মামলায় কোর্ট ফি লাগে না। মামলা হয় S.D.J.M-এর কোর্টে। আসামীর পক্ষে সাধারণ ফৌজদারী মামলা পরিচালনা করেন court Inspector ও দায়রা মামলা হয় জজ আদালতে, পরিচালনা করেন Public Prosecutor। Civil procedure code-এর ৩৩/৩৪ ধারা মতে তপসিলী জাতি ও উপজাতিরা কোর্ট ফি দেবার দায় থেকে মুক্ত হয়েছে, তাছাড়া সরকারী উকিলের প্যানেল থেকে এদের পক্ষে সওয়াল করার জন্য সরকারী ব্যয়ে সরকারী উকিল দেবার ব্যবস্থা আছে।

Bar council : বর্ধমান আদালতের আইনজীবীদের দুটি সমিতি আছে। একটি ব্যারিষ্টার, এ্যাডভোকেট. উকিলদের Burdwan Bar Association আর একটি মোক্তাদের (এঁরাও বর্তমানে এ্যাডভোকেট বলে পরিচিত) Lawyers' Bar Association, আসানসোল, কালনা, কাটোয়া ও দুর্গাপুর আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটি করে উকিল মোক্তারদের সংস্থা (council) আছে। শাসনতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচার জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার ও মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য সমগ্র বিচার ব্যবস্থার দুটি প্রধান অংশ বিচারক ও আইনজীবীর মধ্যে সুসমন্বয় ও সহযোগিতা অপরিহার্য। এ সম্বন্ধে A. S. Anand মহাভারতের একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। দুর্যোধন যখন গন্ধর্বদের হাতে বন্দী হন ও তাঁদের রাজ্যে কারারুদ্ধ থাকেন তখন যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে উদ্ধার করে আনবার জন্য ভীম ও অর্জুনকে আদেশ দেন। কিন্তু বংশগত বিরোধের উল্লেখ করে যখন অর্জুন ও ভীম গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন, তখন যুধিষ্ঠির যুক্তি দিয়ে তাঁদের বলেন যখন কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমুপস্থিত তখন তাঁরা ১০০ বনাম ৫, কিন্তু যখন কোন বহিঃশত্রু কৌরব ও পাণ্ডবদের আক্রমণ করে তখন তাঁরা ১০০+৫। এই কাহিনীর উল্লেখ করে Anand মন্তব্য করেছেন—It is in this spirit that the Bench and the Bar have to protect the independence of the Judiciary' ...এ সম্পর্কে Jeremy Benthan-এর মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য—Law, said Jeremy Benthan, is not made by the judges alone but by the judge and company...lawyers are the most important share-holder of that company'. (Statesman 21.9.1999) এইখানেই Bar Association এর গুরুত্ব।

ইউনিয়ন বোর্ড : ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের Bengal village self Govt. Act অনুসারে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জেলায় ২০৯টি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। অবশ্য এর পূর্বেই ১৮৮৫ সালে Bengal Local Self Govt Act পাশ করে গ্রামীণ খোঁয়াড়, পাঠশালা ও রাস্তাঘাট দেখাশোনার জন্য মেমারি, মানকর, শ্রীখণ্ড, শ্রীবাটি, বৈদ্যপুর ও বাঘনাপাড়ায় ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল—প্রতি কমিটিতে ৯ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু এদের কাজকর্ম মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। এ বিষয়ে তদন্ত করে দেখার জন্য ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে A. N Moberly-এর নেতৃত্বে একটি কমিটির ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। মোবারলি ৮.৯.১৯১২ তারিখে সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করেন—এই রিপোর্টে বলা হয় একমাত্র বৈদ্যপুর কমিটি ছাড়া কোন ইউনিয়ন কমিটি জঙ্গল পরিষ্কার বা রাস্তাঘাট মেরামতির জন্য একটি পয়সাও খরচ করে নাই বা স্থানীয় ভাবে কোন ট্যাক্সও আদায় করে নাই। তাঁর সুপারিশ ক্রমেই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আইনে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। প্রথমে সমগ্র জেলায় ২০৯টি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। এর পর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ইউনিয়ন বোর্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৮৫টি ইউনিয়ন বেঞ্চ ও ৮৫টি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কোর্ট গঠন করা হয়।

ইউনিয়ন বেঞ্চ ও ইউনিয়ন কোর্টের মাধ্যমে সরকার গ্রামীণ বিরোধের মীমাংসা যাতে গ্রামেই হয় তার ব্যবস্থা করেন—কতকটা বর্তমানের লোক-আদালতের আদর্শে উকিলের সাহায্য ছাড়াই বিবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উভয়পক্ষকে ডেকে স্থানীয় সাক্ষ্য সাবুদ নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি হয়। তার জন্যই ইউনিয়ন বেঞ্চের পরিকল্পনা। কিন্তু বাস্তবে এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা সম্ভব হয় নাই। এর কারণ আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে যা বুঝেছি—গ্রামবাসীদের খানিকটা personal ego, তারা শহরে আসবে, সাক্ষীদের হোটেলে খাওয়াবে, লাল শালু ঘেরা হাকিমের এজলাসে দুপক্ষের উকিলের সওয়াল জবাব শুনবে, হেরে গিয়েও উকিলের আশ্বাসবাণী শুনবে—'বড় হাকিমের কাছে আপিল ঠুকে দেব'—এসবের অভিজ্ঞতা না হলে কি আর গ্রামবাসীদের বিচার হয়। গ্রামের 'মোদো'র বিচারের চেয়ে শহরের 'মধুসূদনের' বিচারই তাদের বেশী মনঃপূত। তবে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা খানিকটা পাল্টাতে শুরু করেছে।

মানবাধিকার কমিশন : ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর এক অর্ডিনান্স দ্বারা এই মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে। জাতীয় স্তরে সুপ্রিম কোর্টের এক অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও আটজন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত। প্রাদেশিক স্তরেও উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও মানবাধিকার

সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সদস্যদের নিয়ে প্রাদেশিক মানবাধিকার কমিশন গঠিত। পুলিশের হাতে, জেল হাজতে, নির্যাতিত কয়েদির মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদা সুরক্ষিত করার জন্য, বিনা বিচারে দীর্ঘ দিন আটক ব্যক্তির অযথা হয়রানির অভিযোগের ভিত্তিতে, মানবাধিকার কমিশন অভিযোগকারীর মানবাধিকার রক্ষার জন্য যথার্থ তদন্ত করে অভিযুক্তের শাস্তির বিধান দেন ও সেই শাস্তি আদালত মারফত কার্যকরী কবা হয। আলিপুরের ভবানীভবনে কমিশনের প্রধান কার্যালয় অধিষ্ঠিত।

লোক-আদালত : বর্তমানে মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশে জেলায় জেলায় লোক-আদালত গঠিত হয়েছে। বর্ধমানেও লোক-আদালতের অধিবেশন হয়ে গেছে ও কিছু কিছু মামলার তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি হয়েছে! কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ও আরও দু'জন বিচারক বা প্রখ্যাত সমাজসেবীদের নিয়ে এই লোক-আদালত গঠিত। বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে বা সাক্ষী সাবুদ নিয়ে বিচাবকগণ একটা অপোস মীমাংসা করে দেন। কোন উকিল মোক্তারের সাহায্য ছাড়াই বিচার হতে পারে—ইচ্ছা করলে বাদী-বিবাদী উকিল দিতেও পারে। উকিল দিলে মামলায় জটিলতা বাড়ে ও দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ, বধূর ওপর অত্যাচার, ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পত্তি বিভাগ সম্পর্কিত মোকদ্দমাই সাধারণত বিচারালয়ের বিষয়ভুক্ত। তবে যেখানে বিচারকদের রায় উভয়পক্ষকে সন্তুষ্ট করতে পারে না—সেখানে লোক-আদালতে কোন নিষ্পত্তি হয় না। লোক-আদালতে কোন শাস্তি দেবার বিধান নাই। তবে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

একত্রিশ অধ্যায়



মুক্তি সংগ্রামে বর্ধমান ও জেলা কংগ্রেসের ভূমিকা

১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরান্তরীর (তরাইনের) যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে আর্যাবর্তে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন। এর মাত্র কয়েক বৎসর পর গর্মসিরের অধিবাসী ভাগ্যান্বেষী ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজী লখনৌতি বা লক্ষণাবতী জয় করেন। বখতিয়ারের নবদ্বীপ বিজয়ে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। সেই ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে যেদিন বখতিয়ার মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন সেদিন থেকেই দেশ বিদেশী শাসনের অধীন হল। বর্ধমানও এর থেকে বাদ গেল না।

এরপর সুলতানী শাসনের পর এলো মোগল শাসন। কিন্তু এই দুই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে কোন স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে নাই। কারণ ইসলামিক শাসন ছিল তামস যুগ, শিক্ষ্যর আলোক তেমন ভাবে দেশবাসীর মধ্যে প্রবেশ করে নাই। ইউরোপে ধর্মযুদ্ধের পর যেভাবে গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ইউরোপে ছড়িয়ে প'ড়ে ইউরোপে নবজাগরণ এনেছিল, এখানকার প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি ও পরবর্তীকালে আরবী ফারসী শিক্ষার দ্বারা তার কোন সুযোগ ছিল না। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যাচার্য সুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—'মুসলমান শক্তির সঙ্গে ইংরেজ শক্তির একটা বড়ো তফাৎ ছিল। মুসলমানরা বিদেশ থেকে এলেও বিদেশী ছিল না, তারা দেশেই থেকে গিয়েছিল। ইংরেজরা তা করেনি। (ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন), এদেশে এসেছিল, এদেশ অধিকার করেছিল তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য, যেমনটি করেছিল মুসলমানেরা। তফাৎ ছিল এই যে মুসলমানেরা লুটেপুটে নিতেন, ইংরেজরা রেখে ঢেকে খেতেন। তাছাড়া একটা বড়ো কথা, আমরা এখানে ভুলে যাই। এদেশে আসার আগে এদেশের ঐশ্বর্য্যের কথাই মুসলমানেরা অবগত ছিল। ইংরেজরা ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান গরিমার খবরও রাখতো....এরাই হলেন নব্য বাঙালীর নবীন জ্ঞানাঞ্জন দাতা-গুরু' (দিনের পরে দিন যে গেল—২য় খণ্ড)।

একমাত্র চৈতন্যদেব ধর্মের ক্ষেত্রে এক নবজাগরণ এনে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের সমন্বয় সাধন করেছিলেন; যেমন মোগল শাসনের পর যখন মিশনারীদের খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে দেশকে ধর্মান্তরীকরণ থেকে রক্ষা করতে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে ধর্মান্তরীকরণ রোধ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর—কেবলমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রে নবজাগরণ আনেন নাই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে জাতীয়তাবাদের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে "The impetus to the changes (from Medieval to the Modern age) came from the liberal ideas of the west which stirred the people and roused them from slumber of ages. A critical out look of the past and new aspirations for the future marked the awakening." বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে ঠিক এই কথাই বলেছেন—'অষ্টাদশ ও বিংশ শতাব্দীতে এ ঐতিহাসিক শক্তির প্রেরণা এদেশে বিদেশী ইংরেজরা আমদানী করেছিলেন।'

বর্ধমানের সঙ্গেও রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এখানে বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্রের ও মিশনারীদের উদ্যোগে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে আসেন ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের সূচনা করেন ও ব্রাহ্ম বালক বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। মহারাজা তেজচন্দ্র আনুমানিক ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রাসাদের হাতায় Anglo-Vernacular School নামে এক ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে জেলাবাসীর মধ্যেও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটতে থাকে।

কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে কলকাতায় তথা সমগ্র বাংলায় ইংরেজদের ঘাঁটি গাড়বার ও আধিপত্য বিস্তারের সূচনা হয়েছিল এই বর্ধমানে। চিতুয়া বরোদার জমিদার শোভা সিংহ যখন কলকাতার উপকণ্ঠ পর্যন্ত অগ্রসর হন, তখন ইংরেজ বণিকরা আত্মরক্ষার তাগিদে ছুটে আসেন বর্ধমানে—সুবাদার ইব্রাহিমের কাছে। ইব্রাহিম খান তাদের বুঝিয়ে দিলেন তারা কেমন করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে—গড়ে উঠলো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সূচনার সাক্ষী হয়ে রইলো বর্ধমান। শুধু এটাই নয়—১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বর্ধমান শহরেই কলকাতার জন্মপত্রিকা রচিত হয়। সুবাদার আজিম-উস-শান তখন বর্ধমানে; ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আজিম-উস-শানকে ১৬,০০০ টাকা নজরানা দিয়ে তাঁর ফরমান

ও নিশান নিয়ে বড়িশা বেহালার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে মাত্র ১৩০০ টাকায় কলকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি—গ্রাম তিনটি ক্রয় করেন। বাংলার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এই ফরমান ও নিশানের ফল সুদূরপ্রসারী হয় আর এর সূতিকাগার এই বর্ধমান। বর্ধমানের রাজা তখন কৃষ্ণরাম রায়।

এর পরের ঘটনা দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। আলিবর্দীর পর সিরাজের সিংহাসন লাভ ও তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজদের চক্রান্ত। এই চক্রান্তের জাল বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যার পরিণতি পলাশীর যুদ্ধ। এই পলাশীর যুদ্ধের প্রথম মহড়া হয় কাটোয়ায়। ক্লাইভ পলাশীর ক্ষেত্রে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রহসন করার আগে সেনাপতি আয়ারকুটকে কাটোয়ায় পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি নিজে কাটোয়ায় এসে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের খলনায়ক মীরজাফরের অনুগ্রহপুষ্ট কাটোয়ার কাছে শাঁকাই দুর্গের কিল্লাদারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দুর্গটি বিনা বাধায় অধিকার করেন। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হবার আগে ক্লাইভ বর্ধমান রাজ ত্রিলোকচাঁদের কাছে এক হাজার সৈন্য চেয়ে পাঠান। ত্রিলোকচাঁদ অবশ্য এই আবেদনে সাড়া দেন নাই—বর্ধমান এক কলঙ্কের দায় থেকে মুক্তি পেল। পলাশীর যুদ্ধের প্রহসন হয়ে গেল—বাংলার নবাবীর অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ আধিপত্যের সূচনা হল—নামেমাত্র নবাব মীরজাফরও পদচ্যুত হন। নবাব হলেন তাঁর জামাতা মীরকাশিম। মীরকাশিম একজন English Nawab না হতে চেয়ে প্রকৃত নবাব হতে চেয়েছিলেন; আর এই নবাব হবার খেসারৎ স্বরূপ কোম্পানীকে বর্ধমানসহ তিনটি পরগনার রাজস্ব আদায়ের অধিকার দান করেন। বর্ধমান পরগনা চলে গেল ইংরেজদের কব্জায়। বর্ধমানরাজ ত্রিলোকচাঁদ কিন্তু কোম্পানীর এই অধিকার মেনে নিতে রাজী হলেন না। মীরকাশিম বর্ধমান পরগনার অধিকার ইংরেজ কোম্পানীকে ছেড়ে দেবার পর থেকেই কোম্পানীর সঙ্গে রাজার সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হতে থাকে। কোম্পানীর বর্ধমান বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ হগ ওয়াটস্ সাহেব ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে হলওয়েলকে যে রিপোর্ট পাঠান তার সারমর্ম থেকে এই তিক্ততার কথা স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

'আমাদের গোকুল জমাদারকে পালকি থেকে নামিয়ে ফাটকে দেবার ভয় দেখিয়েছে। তাদের শুকলাল জমাদার আমাদের একজন সিপাইকে বধ করায় আমি একজন সুবেদারকে ত্রিশ জন সিপাই-এর সঙ্গে দিয়ে তাকে ধরে আনার জন্য পাঠিয়েছিলাম। তারা সাতশো আটশো লোক বন্দুক নিয়ে আমাদের সিপাইদের আক্রমণ করে। আমি এই সংবাদ পেয়ে তাদেরকে মহারাজার কাছারীতে আশ্রয় নেবার জন্য বলে লেফ্‌টেন্যান্ট ব্রাউনকে দুশো সিপাই নিয়ে

তাদেরকে আক্রমণ করতে আদেশ দিলাম। এই যুদ্ধে আমাদের পঞ্চাশজন সিপাই ও সার্জেন্ট নিহত হয়েছেন এবং মিঃ ব্রাউন ও ক'জন সিপাই আহত হয়েছে। পরে আমাদের সৈন্যদের কাছে শুনলুম প্রায় ৫০০০ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিল। যাই হোক, এখন আর কোন গোলমাল নাই।'

H. C. Hill সম্পাদিত 'Old Fort William Records' Vol-I থেকে এর সমর্থন মেলে। 'The early days of British rule in Burdwan were trouble ones. The Burdwan Raja was against this transfer of Govt. and rallied against British authorities but Major White completely defeated him on 29th Dec. 1760.'

বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুরের জমিদারগণ বিদ্রোহ করতে পারেন—এই সংবাদ মীরকাশিম ইংরেজ কোম্পানীকে জানা'ন। ইংরেজও এই সংবাদ পেয়ে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। মীরকাশিম কোম্পানীর সাহায্যে মেদিনীপুরের জমিদারগণকে দমন করেন। বীরভূমের জমিদার আত্মসমর্পণ করেন। যে মীরকাশিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালায় যুদ্ধ করেন ও যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বক্সারের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন সেই মীরকাশিমের ইংরেজ কোম্পানীর সাহায্য নিয়ে মেদিনীপুরের জমিদারদের দমন করার বা বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বীরভূমের জমিদারদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার খবর গোপনে ইংরেজদের জানানোর কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। অথচ এই মীরকাশিম যদি প্রথম থেকে বর্ধমানরাজ ত্রিলোকচাঁদ, বীরভূমের জমিদার আসাদজামান ও বাংলার সমস্ত জমিদারদের সহযোগিতা চেয়ে তাদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করে ও মারাঠীদের সাহায্য নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তেন, তাহলে আমার মনে হয়, বাংলার তথা ভারতের ইতিহাস হতো অন্যরূপ। ত্রিলোকচাঁদ প্রথমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এই ঘটনার প্রায় একশো বছর পরে ব্যারাকপুরে ব্যারাকে মঙ্গল পাণ্ডে যে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন ও যে সিপাহী-বিদ্রোহ সমগ্র উত্তর ভারতে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল সেই বিদ্রোহকে James Outram—a war of Independence বা সুসংগঠিত জাতীয় আন্দোলন আখ্যা দিয়েছেন। বীর সাভারকর একে ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন বলেছেন। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে ১৭৬০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর দামোদর তীরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গতগোলার এই যুদ্ধকে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন আখ্যা দেওয়া সঙ্গত বলে মনে হয়। কিন্তু

নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে সত্যি কি তা বলা যায়? সিপাহী বিদ্রোহকে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন "It was in the main a military out-break, which was taken advantage of by certain discontented Princes and land-lords whose interest had been affected by the new political order. ...It was never all-Indian in character but was localised, restricted and poorly organised", তেমনি ত্রিলোকচাঁদের এই ইংরেজ-বিরোধী যুদ্ধ তাঁর নিজের স্বার্থেই, জমিদারী রক্ষার তাগিদেই বলে আমার ধারণা। এই যুদ্ধে জেলার স্বার্থ বা দেশপ্রেম কখনই ছিল না। তবু বলতে হবে সে যুগে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ত্রিলোকচাঁদের এই উত্থান তাঁর অসম সাহসিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ত্রিলোকচাঁদের পরে কিন্তু বর্ধমান রাজবংশের কোন রাজাই ইংরাজবিরোধী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন নাই। একমাত্র বিজয়চাঁদ ও উদয়চাঁদ পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার বীরযোদ্ধাদের কিছুটা সাহায্য করেছিলেন।

ইংরেজ শাসকরা ব্যক্তিগতভাবে দফায় দফায় বর্ধমান-রাজের কাছে টাকা আদায় করতে থাকে; বর্ধমান-রাজও নিজেদের স্বার্থে তা দিয়েও দেন। ১৭৬৭ থেকে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ শাসকরা বর্ধমান রাজার কাছে আদায় করেছেন মোট ১,৭২,০৪৬৩ টাকা এগার আনা নয় পাই। এর মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৫০০০, ভ্যান্সিটার্ট ৩৫০০০, কাশীপ্রসাদ বসু পেয়েছিলেন লক্ষাধিক টাকা। এই নির্মম শোষণের ফলে বর্ধমানের রাজকোষ শূন্যপ্রায় হয়ে পড়ে। রাজ-এস্টেট থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে দরিদ্র রায়তদের বিরুদ্ধে বাকী খাজনার দায়ে ত্রিশ হাজার দেওয়ানী মামলা করা হয়েছিল। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর রায়তদের অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। কুড়মুন পলাশীর রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র Bengal Peasant Life গ্রন্থে এর মর্মন্তুদ বিবরণ পাওয়া যায়।

এই ভাবে রায়তদের ওপর অত্যাচার, উৎপীড়ন, খাজনাবৃদ্ধি, মামলা, মোকদ্দমার দ্বারা অত্যাচার উৎপীড়নই ছিল বর্ধমানরাজের নীতি। কাজেই এঁদের কাছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভাবধারা আশাই করা যায় না। কিন্তু একটা আশ্চর্যের কথা—কৃষকদের ওপর এত অত্যাচার উৎপীড়ন সত্ত্বেও বর্ধমান জেলায় কোন কৃষক বিদ্রোহ হয় নাই। শহরের ছোট নীলপুর, বড় নীলপুর, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল প্রাঙ্গণে ও কালীবাজার এলাকাতে নীলচাষ হত। বরাবনী ও কালনায় নীলকরদের ফ্যাক্টরী ছিল। ১৮৫০ সালে ২৭শে সেপ্টেম্বর

সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে বীরভূমের কালেক্টরের রিপোর্টেও এই বিভাগে নীলচাষ সমর্থিত হয়। কাজেই নীলকরদের অত্যাচারও ছিল। কিন্তু বর্ধমানে নীল বিদ্রোহের প্রভাব পড়ে নাই। এর কারণ অক্ষয়কুমার দত্তের মতে—"যে অনাথ কৃষকেরা অহরহ, নিষ্পীড়িত, তর্জ্জিত, মানভ্রষ্ট ও শরীরে আহত হয়....তাহাদের কি কখনো বীর্য ও সাহসের সম্ভাবনা আছে?" রমাকান্ত চৌধুরী বলেছেন—এখানে ছিল একটি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, শান্তিময়, ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রামীণ সমাজ। এখানে কেউ কারও বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না। কেউ কিছু ভেঙে দিতে চায় না, কেউ কোন পরিবর্তন চায় না। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, আগুরি, কায়স্থ, সদ্‌গোপ প্রভৃতি জাতিভুক্ত নানা শ্রেণীর জমিদার—পাটনিদার, জোতদারদের ভূমির উপর যে নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং যে নিয়ন্ত্রণের উপরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল, রক্ষণশীলতাই ছিল তার প্রাণ বস্তু।" তাছাড়া নীলকর সাহেবরা দু'ধরনের নীলচাষ করতো—রায়তি চাষ ও এলাকা চাষ। বর্ধমানে নীলকররা নিজেরা জমি লিজ নিয়ে শ্রমিক দিয়ে নীলচাষ করতো। কাজেই চাষীদেব ওপর অত্যাচার হতো না। সেকারণে রায়তরা নীল বিদ্রোহের সামিল হয় নাই।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বীরসা মুন্ডা, সিধু-কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচাঁদ সাঁওতাল বিদ্রোহকে দমন করার জন্য সামরিক বাহিনীকে রসদ, যানবাহন দিয়ে সাহায্য করে ইংরাজ সরকারের প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। W. W. Hunter এর Annals of Rural Bengal থেকে জানা যায়, মুর্শিদাবাদের জমিদার, বীরভূমের জমিদার বিপ্রচরণ চক্রবর্তী ও বর্ধমান বিভাগের নীলকরগণ সৈন্য ও হস্তী দিয়ে সরকারকে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করতে সাহায্য করেছিলেন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়, যখন সমগ্র উত্তর ভারত সিপাহীদের আন্দোলনে উত্তাল, তখনও এই মহতাবচাঁদ সেই স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করার জন্য ইংরেজ সরকারকে হস্তী, যানবাহন দিয়ে এবং বর্ধমান থেকে বীরভূম এবং বর্ধমান থেকে কাটোয়ার পথ উন্মুক্ত রেখে সিপাহীদের আন্দোলন সম্পর্কে সরকারকে গোপন সংবাদ সরবরাহ করতে সাহায্য করেছিলেন। এইভাবে বর্ধমানরাজ দুটি স্বতঃস্ফূর্ত ইংরাজ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করতে সাহায্য করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে জেলায় মদত জুগিয়েছিলেন। এই সাহায্য এই আনুগত্যের আশাতেই কর্ণওয়ালিশ চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে তাদের সমর্থক বুর্জোয়া জমিদারদের সৃষ্টি করেন। এছাড়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনের Times পত্রিকায় একটি সংবাদে জানা যায় যে সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার জন্য

মহতাবচাঁদ ইংরেজ সরকারকে ৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থদান করেন। সরকার কঠোর দমন নীতি চালিয়ে সিপাহীদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে দমন করেন। ভারতীয়দের পরাজয়ের ও ইংরাজদের সাফল্যে বর্ধমানের মহারাজা ও বেশ কিছু সংখ্যক বুর্জোয়া ভদ্রলোক লর্ড ক্যানিংকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের ইংরাজ আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখান। এই সমস্ত বিভীষণদের সমর্থন পেয়েছিলেন বলেই এ জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন প্রথম থেকে তেমন দানা বাঁধতে পারে নাই।

কোম্পানীর শাসনব্যবস্থায় জেলাভিত্তিক প্রশাসন গড়ে ওঠায় জেলা শহরের সৃষ্টি হয়। ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভারের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা শহরে আমদানি হতে থাকে। গ্রাম্য সমাজের অবনতির পাশপাশি যন্ত্রযুগের গতিশীলতার স্পর্শে দেশে আধুনিক নগর-সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। নগর-সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার সংস্পর্শে এসে সমাজে একটা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ক্রমশ যুক্তিবাদী ও প্রগতিবাদী হয়ে ওঠে। ফলে ইংরেজ অফিসারদের এদেশের জনগণের উপর অত্যাচার, দেশীয় কর্মচারী ও ইংরেজগণের কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ, সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ, চাকুরীর ক্ষেত্রে বঞ্চনা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একটা তিক্ততা, হতাশা ও ইংরেজ সরকারের প্রতি বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে—যার থেকে জন্ম নেয় জাতীয়তাবাদ। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ এদেরই নেতৃত্ব দেন। কিন্তু বর্ধমান ছিল গ্রামভিত্তিক শহর—ফলে জেলার বহু অংশই ছিল অনুন্নত। নদনদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে বর্ধমান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে তার পূর্ব গৌরব হারায়। রানীগঞ্জে কয়লাখনি আবিষ্কৃত হলে ইংরেজ বণিক রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে ঢুকে পড়ে। কিন্তু যাদের এখানে কাজে লাগান হয়, তাদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাগ্‌দী, বাউড়ী, সাঁওতাল। এছাড়া কেবলমাত্র মিশনারী ও কিছু কিছু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছাড়া খুব বেশী ইংরেজ এখানে আসে নাই। তার ফলে কলকাতা যেভাবে দ্রুত শহর থেকে নগরে উন্নীত হচ্ছিল, বর্ধমানে তা হয় নাই। ফরাসী পর্যটক জ্যাকমো ১৮২৯ সাল নাগাদ এ জেলায় আসেন। তিনি বর্ধমান শহরে পর্যটন করে শহর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তাতেও বলা হয়েছিল— Burdwan Town was an assemblage of crowded shubarbs of wrethched huts with wall of mud and covered with thatch, having no temples of striking aspect and few handsome houses. (Encyclopadea Britanica 9th edn. 1890 Vol-3)

রমাকান্ত চক্রবর্তী মশাই তাঁর "বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন" প্রবন্ধে ভোলানাথ চন্দ-এর Travels of a Hindoo Vol 1 1866 থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন—'১৮৬০-এ মানকর ছিল গুরুত্বহীন, পানাগড় অনুন্নত, রানীগঞ্জে কয়লাখনি থাকলেও শিশু শহর আর বরাকর ছিল গ্রাম। বর্ধমান, কালনা, ও কাটোয়া এই তিনটি শহরের বাণিজ্য ছিল মধ্যকালীন।' যে আধুনিক নগরায়ণ ছিল ব্রিটিশ শাসন বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের, একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, তা বর্ধমান জেলায় ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। বর্ধমানের মহারাজ জাতীয়তা বিকাশে উৎসাহ দেখান নাই বরং নানা ভাবে ব্রিটিশ আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তাঁদের জমিদারী থেকে unearned income এর কিছু অংশ ব্যয় করে কিছু কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করে এখানকার সাধারণ মানুষের চিত্তজয় করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। আবু রায়ের পৌত্র ঘনশ্যাম রায় ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামসায়র খনন করান। ১৬৯১ সালে দুর্ভিক্ষের সময় কৃষ্ণরাম রায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাগণের ক্লেশ নিবারণের জন্য হ্রদতুল্য বিরাট দীঘি কৃষ্ণসায়র খনন করান। মহতাবচাঁদ শ্যামসায়রের পাড়ে একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। বন্যা থেকে রক্ষার জন্য দামোদরের বাঁধ নির্মাণ করান। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মন জয় করার জন্য জেলায় অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করান। এর ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় যে নবজাগরণের জোয়ার আসে, তার ঢেউ বর্ধমানকে বিশেষ ভাবে আঘাত করতে পারে নাই। এখানে যা কিছু রাজনীতি চর্চার বিকাশ ঘটেছিল তা সমৃদ্ধ পুঁজি ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে। প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন হয় ১৮৩৭ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে গঠিত Land Holders Association; এটি মূলত সমগ্র বাংলার জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার একটি সংস্থা—রায়ত বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। বর্ধমানরাজের জমিদারীর মধ্যে ২৫৯৯৩৭৩ একর জমি ৩১৭৭ জোতে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে ২৫১৯টি পত্তনি বিলি ছিল, ৯৫টি ছিল মেয়াদি বিলি। পত্তনিগুলি আবার নানা স্তরে ভাগ হয়ে দরপত্তনি, দরাদর পত্তনি, সে-পত্তনি, সে-দরাদর-পত্তনি বিলি হয়েছিল। এই সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগীগণ স্থানীয় লোকদের কাছে জমিদার বলেই পরিগণিত হত। যেমন কালনা সাতগেছিয়ার শীলরা, বাঘনাপাড়ার গোপাল মুখার্জীরা, নাদন ঘাটের সৈয়দরা, চকদীঘির সিংহরায়রা, সিমলনের সিংহরায় পরিবার, বৈদ্যপুরের নন্দীরা, উখরার হাণ্ডারা এবং গ্রামে-গঞ্জের ছোট ছোট চুনোপুঁটি, সে-পত্তনি বা সে-দরাদর পত্তনিদার সকলেই স্থানীয় লোকের কাছে জমিদার বলেই পরিচিত হত। এরা সকলেই আর্থসামাজিক কাঠামোর স্বার্থ বজায়

রাখার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার দিকেই বেশী নজর দিত। মনে হয় কর্ণওয়ালিস যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য এইসব জমিদারের আনুগত্যের কথাও মাথায় রেখেছিলেন। কর্ণওয়ালিশের দূরদৃষ্টিব প্রশংসা করতে হয়। আর কর্ণওয়ালিশ যার সূচনা করেন, মহারাজ তেজচন্দ্র ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জমিদারীর মধ্যে পত্তনিপ্রথা চালু করে সে বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন।

তাছাড়া মধ্যযুগীয় তামস যুগের আবরণ ভেদ করে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটাতে যে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকের প্রয়োজন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত সে আলোক এখানে পৌঁছায় নাই। তেজচন্দ্রের Anglo Vernacular School স্থাপন, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিদ্যাসাগর মশাই-এর বর্ধমানে অবস্থান এর পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এত বড় জেলায় মাত্র ২৭টি বিদ্যালয় ছিল ও বর্ধমান শহরে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক না পাওয়ায় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাচেতনা জাগ্রত হতে দেরী হয়েছিল।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম পৌরসভার ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জনই ছিলেন ইউরোপীয়ান। পৌরপতি ও উপপৌরপতির পদ ইউবোপীয়ানদের জন্যই ছিল সংরক্ষিত। ১৮৭৩ সালে নির্বাচন আইন পাশ হয়; এর দ্বারা নাগরিকগণ আংশিক ভোটাধিকার অর্জন করেন। এ সময় বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি ছিলেন ই. এইচ. হুইনফিল্ড আর উপপৌরপতি ই. এইচ. রাদক। বর্ধমানের ১০৪৫ জন নাগবিক নির্বাচনের অধিকার চেয়ে পৌরপতির নিকট আবেদন করেন। এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্বাক্ষরকারী ছিলেন বর্ধমানরাজ মহতাবচাঁদ। একমাত্র তাঁর স্বাক্ষর-এর গুরুত্ব দিয়েই নাগরিকদের নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। বর্ধমানে এই প্রথম জাতীয়তাবাদের আলো দেখা দিল।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী, ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন বা ভারতসভা প্রতিষ্ঠা করেন "With the conception of a united India, derived from the inspiration on Mazzine." এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয় সমগ্র দেশে শক্তিশালী জনমত গঠন করে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণকে একই রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত করা। এই ভারতসভার প্রভাবে বর্ধমানে উদারপন্থী রাজনীতির পক্ষে জনমত জাগ্রত হয়। বর্ধমান শহরে, কালনায় ও পূর্বস্থলীতে ভারতসভার আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ

রাজনীতির সূচনা করে। অন্ততপক্ষে জমিদার, জোতশ্রেণী ও সরকারী শাসকের মধ্যে একটা যোগসূত্র দ্বারা দাবী উত্থাপনের সোপান তৈরী হয়। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নলিনাক্ষ বসু, জগবন্ধু মিত্র, মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিন ও আবুল কাশেমের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বর্ধমানে এলে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। অবশ্য যখন তিনি আদর্শভ্রষ্ট হন তখন জেলাবাসী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য 'বর্ধমান সঞ্জীবনী' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ও পরবর্তীকালে সপ্তম আইন (Halftam Act) ও ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই-এর আইন পাশ হওয়ার ফলে জেলায় রায়তদের চরম দুর্দশা ও জমিদারী উৎপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়। এর প্রতিবাদে 'বর্ধমান সঞ্জীবনী' সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। এই রকম ভাবে ধীরে ধীরে জেলার জনগণের মধ্যে একটা সরকারবিরোধী মনোভাব জাগ্রত হতে থাকে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই-এ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই সময় বর্ধমানে কংগ্রেসের কোন শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে স্যার সৈয়দ আহম্মদের আলিগড় আন্দোলনের প্রভাব বর্ধমান জেলার মুসলমানদের উপর পড়ে নাই; বা ১৮৮৮ সালে সৈয়দ আহম্মদ যখন জাতীয় কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে মুসলমানদের জন্য United patriotic Association প্রতিষ্ঠা করেন তখনও তার দ্বারা এখানকার মুসলমান জনসাধারণ প্রভাবান্বিত হন নাই। ওয়াহাবী আন্দোলনের নায়ক মীর নাসির আলি বা দুধুমিঞার নেতৃত্বে ২৪ পরগনা যখন জমিদার ও মহাজন বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার উঠেছিল তার প্রভাব বা নবাব আমির আলির National Mahommedan Association জেলার উৎপীড়িত কৃষক সমাজকে জাগ্রত করে নাই।

১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে যে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয় তাতে Indian Assocn., British Indian Assocn. ও আমির আলির Central Mahommedan Assocn. মিলিত হয়ে National conference হয়, তাতে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব, কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব প্রমুখ বহু জমিদার ও অভিজাত সম্প্রদায় যোগ দেন কিন্তু বর্ধমানেব মহারাজার কোন উল্লেখ নাই। বর্ধমানে ১৮৯৯ ও ১৯০৪ সালে Indian National Conference এর সভা হয়। আমার মনে হয় বর্ধমানে যে Indian Association-এর শাখা অফিস ছিল

তাদেরই উদ্যোগে এই conference ডাকা হয়, তবে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবে এই সব conference বা বর্ধমান সঞ্জীবনীর প্রতিষ্ঠা থেকে একটা জিনিস বেশ বোঝা যাচ্ছে ধীরে ধীরে হলেও জেলাবাসীর মধ্যে একটা জাতীয় চেতনা জাগ্রত হচ্ছে ও সরকারের কার্যাবলীর ওপর একটা ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে—যার হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পরে।

১৯০৪ সালে বর্ধমান রাজার আমন্ত্রণে লর্ড কার্জন বর্ধমানে আসেন; তাঁর সম্মানে বর্ধমানে Star of India নামক সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হয় যা আজও কার্জন গেট নামে পরিচিত। আর তার ঠিক এক বছর পরেই কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশেব সঙ্গে বর্ধমানও প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে।

১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন ভারতবাসীকে মিথ্যাবাদী বলায় প্রখ্যাত আইনবিশারদ বর্ধমান জেলার তোড়কণার স্যার রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতার টাউন হলে বিলাতী মিথ্যাবাদিত্ব ও ভারতীয় মিথ্যাবাদিত্ব সম্বন্ধে এক ওজস্বিনী বক্তৃতা দেন। মহারাজ বিজয়চাঁদ কিন্তু বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেন—এটাই অবশ্য স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু জেলা এই ঘোষণার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে। গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। বর্ধমানে বহু স্থানে রাখীবন্ধন ও অরন্ধন পালিত হয়। মেমারীতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন আবুল কাশেম। কালনায় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে প্রতিবাদ সুতীব্র হয়ে ওঠে। ব্যবহারজীবী উপেন্দ্রনাথ হাজরা, দেবেন্দ্রনাথ নাগ, উপেন্দ্র সেন-এর উদ্যোগে কালনার মহিষমর্দিনী তলায় যে প্রতিবাদ সভা হয়, তাতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলার আবুল কাশেম এই ঘোষণাকে ধিক্কার জানিয়ে জোরালো বক্তৃতা করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, ললিতমোহন ঘোষাল, গীতপতি কাব্যতীর্থ, উপেন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ। আর সঙ্গে সঙ্গে বয়কট আন্দোলনও শুরু হয়ে যায়। কালনার ভিক্টোরিয়া টাউন হলে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। কালনা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা পল্লীবাসীতে লেখা হয় :

"বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইলে লোকে মর্মপীড়ায় অধীর হইয়া ওঠে। কালনার ছাত্ররা সে দিবস জামা-জুতা ত্যাগ করিয়া শোকচিহ্ন ধারণ করত সভাস্থলে উপস্থিত হইলে করুণ ভাব প্রকটিত হইয়াছিল। কালনার শ্রেষ্ঠ মোক্তার উপেন্দ্রনাথ হাজরাও নগ্নপদে অনাবৃত শরীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন... গত ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯০৬) শনিবার অপরাহ্নে কালনার

ভিক্টোরিয়া টাউন হলে ছাত্রদের যত্নে এক সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল। সভাপতিত্ব করেছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি হাইকোর্টের উকিল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।" বাঘনাপাড়ায় ১৯০৬ সালে বিলাতী কাপড় লুট করে আগুনে পোড়ান হয়। আগুন লাগায় চোদ্দ থেকে ষোল বছর বয়সী পাঁচজন ছাত্র। এদের নাম সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায় বলাইচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে বলাই দেবশর্মা) ও গৌরগোবিন্দ গোস্বামী। পুলিশ এই পাঁচজন ছেলেকে এ্যারেস্ট করে ধরে নিয়ে যায় ও বিচারে এদের শাস্তি হয়। সম্ভবত এঁরাই হন সারা জেলায় ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রথম রাজনৈতিক অপরাধী। মানকরের বাজারে কাপড় পোড়ায় রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত। সেও এ্যারেস্ট হয় ও শাস্তি পায়। এদের বিচারে সওয়াল করেন বর্ধমানের আইনজীবী নলিনাক্ষ বসু ও শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী জনসভা হয় কাটোয়া, সিঙ্গারকোন, বৈদ্যপুর, অকালপৌষ, ধাত্রীগ্রাম ও অনুখালে। কালনা শহরেও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। কালনার পাথুরিয়া মহলে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বদেশী ভাণ্ডার' খোলেন। দেশীকাপড় নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন শ্যামলাল গোস্বামী। উপেন্দ্রনাথ হাজরা চৌধুরী ও পূর্ণ দত্ত স্বদেশী কাপড় তৈরীর জন্য নিজ ব্যয়ে তাঁত বসান। এই ভাবে বয়কট আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবে স্বদেশী আন্দোলনও শুরু হয়ে যায়। এই স্বদেশী আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন কলকাতার ব্যবসায়ী অকাল-পৌষের নগেন্দ্র রক্ষিত, রমাপতি রায়। এদের উৎসাহ দেন জাতীয় কলেজের (বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক কালনার প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও অকালপৌষের অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ। এদের দেখাদেখি অনুখাল, ঢোলার হাট, রাইগ্রাম, কৈগ্রাম, অকালপৌষ, পাঁচরখি, বৈদ্যপুর, ধাত্রী-গ্রামেও স্বদেশী ভাণ্ডার খোলা হয়। কালনা, মন্তেশ্বর ও পূর্বস্থলীতে বান্ধব সমিতি, মহামায়া সমিতি নামে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে ব্যায়ামচর্চা ও বিপ্লবী কাজকর্ম চালান হয়। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর সমিতির শাখা অফিসও খোলা হয়। সাপ্তাহিক 'পল্লীবাসী'তে রিপোর্ট বের হয়—বিদ্রোহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর পুলিশ নাকি কালনার বান্ধব সমিতির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিল। গতবারে বিভাগীয় কমিশনার বহরমপুরের রিপোর্টে এই সমিতির নাম ছিল।

বয়কট আন্দোলনের কর্মসূচী অনুসারে অনেক ব্রাহ্মণ জমিদার বিলাতী কাপড় পোড়ান ও লিভারপুলের লবণ ফেলিয়া দিবার দায়ে অভিযুক্ত হন।

গোটা জেলায় বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। চারদিকে বিলাতী বর্জন কর্মসূচীতে বিলাতী কাপড় পোড়ানর হিড়িক পড়ে গেল। বিলাতী কাপড়ের ব্যবসা মার খেতে লাগল; খরিদ্দার আকর্ষণ করবার জন্য বিলাতী কাপড়ের দাম কমাতে হল।

স্বদেশী আন্দোলনের আর একটা দিক হল জাতীয় শিক্ষার প্রসার। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডন সোসাইটি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সুবোধ মল্লিক ও ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়ের অর্থদানে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে ওঠে। এই পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় নিয়ন্ত্রণে ও জাতীয় ভাবধারায় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রাসবিহারী ঘোষের নিকট জাতীয় শিক্ষা পরিষদে অর্থদানের জন্য উপস্থিত হলে রাসবিহারীবাবু একটা Blank cheque-এ সই করে দিয়ে বলেন—টাকার অঙ্কটা আপনারাই বসিয়ে নেবেন। বর্ধমান জেলাতে প্রমথ মুখোপাধ্যায়, অবিনাশ চক্রবর্তী, রাখালচন্দ্র দেব, বলাই দেবশর্মা, স্বামী কমলানন্দ, ডন সোসাইটি ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জেলায় জাতীয় শিক্ষাপ্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অকালপৌষের অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ এম.এ. পাশ করে সরকারের হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন—তিনি সরকারী স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়ে নামমাত্র বেতনে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এই অরবিন্দবাবু কুষ্ঠরোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে শেষ জীবনে নিজেই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। শেষ জীবনে চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও মানবসেবা ত্যাগ করেন নাই। দরিদ্র ব্যক্তিদের কন্যার বিবাহের জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে অর্থ সংগ্রহ করে দরিদ্র পিতামাতাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের এক উজ্জ্বল প্রতিভা অরবিন্দ ঘোষ। কালনা ও উপলতি গ্রামেও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কুটীর শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

জেলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। বর্ধমান জেলার মধ্যে কালনায় উগ্রজাতীয়তাবাদী আন্দোলন অনেক ব্যাপক হয়েছিল। জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনে কালনার ভূমিকা সবচেয়ে অগ্রগণ্য। এর কারণ মনে হয় প্রাচীনকাল থেকে ভাগীরথী দিয়ে জলপথের সুবিধা থাকার জন্য কালনায় ব্যবসা-বাণিজ্যের রমরমা চলেছিল। কালনার পাথুরিয়াঘাট, হাটখোলা ও পুরানো কালনা অঞ্চলে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠে। ফলে অনেক বিদেশীও এখানে বাণিজ্যের স্বার্থে আসতে থাকে। কিন্তু ধুস দত্তর আমলে বর্ধমানে যে

ব্যবসা-বাণিজ্যের রমরমা ছিল, আস্তে আস্তে নদী, খাল বুজে আসতে থাকায় নদীর নাব্যতা নষ্ট হয়; দামোদরে বর্ষাকালে প্রবল বন্যা দেখা দিলেও অন্য সময় স্টীমার বড় বড় পণ্যবাহী নৌকো চলাচলের যোগ্য ছিল না। কিন্তু কালনায় ভাগীরথীর দৌলতে সারাবছরই পণ্যবাহী নৌকা চলাচলের অসুবিধা হত না। Before her (Damodar) joining Hooghly near Kalna she was known to have had flowed almost a direct west to east course and discharged its water into the Hoogly at a point in the vicinity of Katwa. (P. K. Roy—Agricultural Economics of Bengal)

Rev. Long-এর বিবরণীতেও দেখা যায় The river (Damodar) formerly flowed behind Kalna, where old Kalna now is .....

কালে দামোদরের এই গতিপথের পরিবর্তন হয়ে পূর্ব-পশ্চিম গতিপথ মজে গেল। কাজেই বর্ধমানের ব্যবসা-বাণিজ্যেব রমরমা কমে গেল। কিন্তু ভাগীরথী দিয়ে কালনার কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত বইল। ১৮২৬ থেকে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা থেকে ষ্টীম ন্যাভনেশন কোম্পানী ও পরে হোর মিলার কোম্পানী কালনার মধ্য দিয়ে মাল পরিবহণ করতো। তাছাড়া মহকুমার বহু ব্যবসাদার কলকাতায় ব্যবসা করতে আরম্ভ করলেন—রমাপতি রায়, নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত ও বৈদ্যপুরের নন্দীদেরও কলকাতায় ব্যবসা ছিল। এছাড়া জাতীয় কলেজের অধ্যাপক প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, অকালপৌষ গ্রামের অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ, প্রমুখ উচ্চ শিক্ষিত মানুষ কলকাতায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও নবজাগরণেব যে জোয়ার এসেছিল তার বার্তা কালনায় নিয়ে এলেন ও এখানকার জনগণকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্দীপিত করলেন। বৈদ্যপুর, মীরহাট, হাসনহাটি, নপাড়া, ভুরকুণ্ডা, রামনগর, ধাত্রীগ্রাম, চকব্রাহ্মণগড়িয়া, অকালপৌষ অঞ্চলে একটা শক্তিশালী বিদ্বৎ-সমাজও গড়ে উঠেছিল। এখানকার পণ্ডিত-সমাজ সারা বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতেন। উডের ডেসপ্যাচের প্রভাবে বিদ্যোৎসাহী যুবকদের প্রচেষ্টা ও জমিদার মধুসূদন হালদারের বদান্যতায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কালনা উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কালনায় হিন্দু পরিবারের চারজন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। ফলে মিশনারীদের প্রতি হিন্দু জনগণের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। মিশনারী স্কুলের পাশাপাশি তারাকান্ত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে হিন্দু পরিচালিত ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ মহতাবচাঁদের দানে পুষ্ট ঐ বিদ্যালয়ের নাম হয় Culna Maharaja's H. E. School, ঐ বৎসরেই বিদ্যালয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। কালনার জাপতেও মিশনারী স্কুল

প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক, মিশনারীদের প্রতি বিদ্বেষ কালনার জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায়।

এর তুলনায় বর্ধমানে কলকাতার সঙ্গে সেরকম যোগাযোগ স্থাপিত হয় নাই—পাশ্চাত্য শিক্ষার পত্তন হয়তো হয়েছিল কিন্তু জনগণের মধ্যে সে রকম সাড়া জাগাতে পারে নাই। ব্যবসার দিক দিয়েও তেমন যোগাযোগ ছিল না—উগ্রজাতীয়তাবাদের অভাব ছিল। তাছাড়া মহারাজা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করায় সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনগণের মধ্যে তারও প্রভাব কিছুটা পড়েছিল। তাই আমার মনে হয় কালনায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যেরকম সাড়া জাগাতে পেরেছিল বর্ধমানে সেরকম সাড়া জাগাতে পারে নাই। আবার মুক্তি সংগ্রামের কথায় ফিরে আসি। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পর পর দু'বার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন প্রথিতযশা ব্যবহারজীবী খণ্ডঘোষ থানার তোড়কোণার স্যার রাসবিহারী ঘোষ। এছাড়া রায়না থানার সুবলদহের রাসবিহারী বসু চন্দননগরে অধ্যাপক চারু রায়ের প্রভাবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন ও মুরারীপুকুর বাগানে বারীন ঘোষের সংস্পর্শে এসে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। এরপর বাঙলায়, যুক্ত প্রদেশে ও পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তাঁর সঙ্গীরা সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর নাম প্রকাশ হওয়ায় তিনি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় পরিচয়ে পি. ঠাকুর ছদ্মনামে জাপানে পালিয়ে যান ও সেখান থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যান। কুলীনগ্রামের অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও বড় পলাসনের পঞ্চানন চৌধুরীও জেলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯১৫ সালে পঞ্চানন চৌধুরী রেগুলেশন আইনে গ্রেপ্তার হন। বোরহাটের অনুকূল চট্টোপাধ্যায় নদীয়া জেলায় সন্ত্রাসবাদ কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে এক মামলায় গ্রেপ্তার হন ও আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন—১২ বছর পর তিনি মুক্তি পান। ঋষি অধ্যাপক স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ, চান্নার যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্বামী নিরালম্ব), ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বটুকেশ্বর দত্ত, পুলিনবিহারী দাস, মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ভাবশিষ্য ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ সামরিক শিক্ষালাভের জন্য বরোদায় যান ও সেখানে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শে আসেন ও বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। পরে তিনি পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদী দল গদর পার্টিরও সংস্পর্শে আসেন। তিব্বতী বাবার কাছে সোহং মন্ত্রে দীক্ষিত হন। বাংলায় এসে তিনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পক্ষে প্রচার চালান। এই সময় অনুশীলন সমিতির

আদর্শে রানীগঞ্জে জয়দেব সেবক সম্প্রদায় নামে এক বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যে রেলওয়ে ধর্মঘট হয় তাতে জেলার রেলকর্মচারীগণ যোগদান করেন। চকদীঘির তরুণ বিপ্লবী বাসুদেব ভট্টাচার্য বয়কট আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। পরে তিনি ব্রহ্মব্রান্ধব উপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন ও সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত হন ও রাজদ্রোহের অপরাধে চার মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেল থেকে বেব হয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান ও সেখান থেকে শিকাগোয় গিয়ে সেখানে পড়াশোনা করেন। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন তিনি সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক লি. ওয়ার্নারকে মারধোর করার জন্য অভিযুক্ত হন। যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত বর্ধমানের সুরেশ মজুমদার ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯১৩ সালের দামোদরের বিধ্বংসী বন্যায় শহীদ যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায বন্যাত্রাণ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় বর্ধমান স্টেশনে অনুশীলন দলের নেতৃবৃন্দ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, মাখনলাল সেন, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে দলীয় নেতাদের একতাবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আসানসোলের বিপ্লবী নিবারণ ঘটক ও তাঁর মাসীমাতা দু-কড়ি-দেবী আসানসোলে বিপ্লব আন্দোলন সংগঠন করেন ও বহু নির্যাতন ভোগ করেন। নিবারণ ঘটক ছিলেন বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর অনুগামী। তিনি সিয়ারশোলে যুগান্তর দলের শাখা খুলেছিলেন। এই সময়ে বর্ধমানেও যুগান্তর দলের শাখা 'আত্মোন্নতি সমিতি' স্থাপিত হয়। শিয়ারশোলের রাজা সাহেব প্রমথনাথ মালিয়া ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র পশুপতি মালিয়া জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। পশুপতিবাবু ১৩৩৪ সালের বর্ধমানে দুর্ভিক্ষের সময় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় জেলার জাতীয়তাবাদী কর্মীবৃন্দ কেবলমাত্র বিপ্লব কার্যেই লিপ্ত ছিলেন না, মানবসেবাতেও আত্মনিয়োগ করে ছিলেন।

বারাণসীর বিপ্লবী নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বর্ধমানে এসে অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপন করেন। রাজ কলেজের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন ও মানকরের রাধাকান্ত দীক্ষিতও এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মুসলিম লীগ : ১৯০৬ সালে ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকার নবাব সলিমুল্ল্যার নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়। লীগের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থবক্ষা এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য জাগ্রত করা এবং সংযত ভাষায় সরকারের নিকট অভাব অভিযোগ পেশ করা। মুসলিম

লীগের শাখা ভারতের প্রধান প্রধান শহরে প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্ধমান জেলায় এর কোন তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়ে নাই। বর্ধমান জেলার অবিসংবাদিত নেতা আবুল কাশেম, মহম্মদ ইয়াসিন, মৌলভী আবুল হায়াত, সেখ রুস্তম্, গোলাম রহমান (কচি মিঞা), সৈয়দ রাহাত আলি, মঙ্গলকোটের নবাব আবদুল জব্বার খান, মৌলভী আবদুর রহমান, জনাব জাহেদ আলি, আবদুল কাদের ও পরবর্তীকালে আবদুস সত্তার সকলেই জাতীয়তাবাদী নেতা—এরা সাম্প্রদায়িকতা এড়িয়ে চলতেন।

পরে অবশ্য মৌলভী আবুল হাসেম জেলার মুসলিম লীগ গঠন করেন ও তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। তবে জেলায় মুসলিম লীগ-এর কার্যকলাপ খুব ব্যাপক হয় নাই—যা কিছু হয়েছে গোপনে গ্রামে গ্রামে নেতৃস্থানীয় কিছু লোক পাঠিয়ে মসজিদে মসজিদে মিটিং করে এবং সেটাও হয়েছিল ১৯৪২ সালের পর থেকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন ভারতীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারে নাই। মহাত্মা গান্ধী ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে মুসলিম জগতের ধর্মগুরু খলিফাকে গদিচ্যুত করলে ও তুরস্ককে বিভাজন করলে খিলাফতী আন্দোলন শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধী খিলাফতের সমর্থনে মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইনের, সরকারের দমন নীতির হাতিযার রাওলাট আইন-এর প্রতিবাদে ও দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবীতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ১৯২০ সালের কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় বর্ধমান কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও ব্যবহারজীবী অমরনাথ দত্ত। মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে একটা জোয়ার আসে ও স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। খিলাফতী আন্দোলনের ঢেউ বর্ধমানেও পৌঁছায়। এখানকার কংগ্রেস নেতা মহম্মদ ইয়াসিন এখানকার খিলাফতী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। খিলাফত আন্দোলন বর্ধমান জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। খিলাফতের সমর্থনে জেলায় একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। আসানসোল খিলাফৎ কমিটি ২৬৭০ টাকা চাঁদা তুলে কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির নিকট প্রেরণ করে; এছাড়া ২০০ টাকা আলিগড় জাতীয় মুসলিম ইউনিভারসিটিতে প্রেরণ করে। খিলাফতী মুসলিমদের মনোভাব তখনকার একটা নিষিদ্ধ কবিতায় ফুটে উঠেছিল—

ইসলাম আজ কুকবকে
নখে মেঁ আলয়া
বাদল সিয়া রংকা
কাবা পে ছা গয়া।

অর্থাৎ ইসলামকে আচ্ছন্ন করেছে বিধর্ম, কাবা ঢেকেছে অন্ধকাব।

মহাত্মা গান্ধী খিলাফতী আন্দোলন সমর্থন করে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়কে সামিল করেন। পাঁজামশাই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ভোট দেন। কলকাতা অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় ও এই আন্দোলন পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব মহাত্মা গান্ধীকে দেওয়া হয়। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর দুটি দিক ছিল—একটি বর্জনমূলক ও অন্যটি এর পরিপূরক গঠনমূলক। বর্জনমূলক কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সরকাবী উপাধি পদ বর্জন; সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারী অফিস বর্জন ও বিদেশী পণ্য বর্জন অর্থাৎ সরকারের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা। গঠনমূলক কর্মসূচীর মধ্যে ছিল স্বদেশীকে জর্নাপ্রয় করা, চরকা ও তাঁতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যস্থাপন, মাদকদ্রব্য বর্জন, লোকমান্য তিলকের স্মৃতিতে স্বরাজ্য তহবিল গঠন। অন্য কর্মসূচীর মধ্যে এক বৎসরের স্বরাজ ও খিলাফতীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এ জেলায় অসহযোগ কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব পড়ে যাদবেন্দ্র পাঁজার উপর—তিনি চিরকালের জন্য ওকালতি ত্যাগ করেন। ব্যবহারজীবী মহঃ ইয়াসিন, মৌঃ আবুল হায়াত, শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় আদালত বর্জন করেন। পাঁজা-মশাই-এর সঙ্গে নেতৃত্ব দেন প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দীক্ষিত, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, সেখ রুস্তম, কচি মিঞা। ডাঃ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় কাটোয়ার ডাঃ গুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (গুনীবাবু), নাদনঘাটের হরিহর সেন, সাতগেছিয়ার সুহৃৎ মল্লিক, সমুদ্রগড়ের লালমোহন পালিত, কাটোয়ার গুণেন্দ্র সিংহ, মণ্ডলগ্রামের মোক্তার জগবন্ধু হাজরা, কমলকৃষ্ণ বসু, বনওয়ারীলাল পাঁজা, মণীন্দ্র চৌধুরী, জিতেন্দ্রনাথ পাঁজা। কাটোয়ার অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ডাঃ গুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মণ্ডল, ক্ষুদিরাম মোদক। কাটোয়ার মহিলা সংগঠন পরিচালনা করেন গুণীবাবুর স্ত্রী সুরমা দেবী ও তাঁর পুত্রবধূ। কালনায় নেতৃত্বে থাকেন অন্নদা মণ্ডল, জিতেন্দ্র মিত্র ও গোপেন কুণ্ডু। আসানসোলে অসহযোগ পরিচালনা করেন সরস্বতী কর্মমন্দিরের সদস্যবৃন্দ— অমূল্য ঘোষ, ভীমবাবু প্রমুখ। বর্ধমানের জেলা কমিটির তখন সভাপতি মহম্মদ ইয়াসিন ও

সম্পাদক ছিলেন যাদবেন্দ্র পাঁজা। এই সময় কাটোয়া, কালনা ও আসানসোলেও জেলা কমিটির শাখা খোলা হয়। আন্দোলন চলে সম্পূর্ণ অহিংস পদ্ধতিতে।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন উত্তর প্রদেশে চৌরিচৌরায় এক উত্তেজিত জনতা থানা আক্রমণ করে ২২ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারে। অহিংস আন্দোলন হঠাৎ সহিংস হয়ে ওঠায় ক্ষুব্ধ হয়ে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন ও সকল কর্মীকে চরকা কাটার পরামর্শ দেন। এই সিদ্ধান্তে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

এইখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্ধমানের মহারাজা ও জমিদারশ্রেণী তাঁদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতাহীন বঙ্গীয় বিধান পরিষদে এই বুর্জোয়াশ্রেণী প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তাছাড়া উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সম্পন্ন কৃষক পরিবার, অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রলোক এই আন্দোলন থেকে পারতপক্ষে দূরে থেকেছেন। কাজেই গান্ধীজীর এই আন্দোলন দেশের অন্যান্য স্থানে যেমন ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল এ জেলায় তেমন সাড়া জাগাতে পারে নাই। এর কারণ নেতারা জেলার গ্রামে-গঞ্জে ঠিকমত জনসংযোগ করতে পারেন নাই বা যেমন প্রচার চালান উচিত ছিল তাও করেন নাই। তবে কালনা ও কাটোয়া অঞ্চলে এই আন্দোলন অনেকটা সাফল্যলাভ করেছিল।

গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ প্রত্যাহার করায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনেকের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়। এঁদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য, জয়াকার প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তিনি যখন জেলে সেই সময় হতেই ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ও আইনসভায় নির্বাচিত হয়ে ভিতর থেকে সরকারের বিরোধিতা করে সরকারের কাজকর্ম বন্ধ করে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী এই পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, সত্যমূর্তী, বিঠলভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিকল্প কর্মসূচীর কথা চিন্তা করেন। তাঁরা স্থির করেন আইনসভাকে সম্পূর্ণ বর্জন না করে আইনসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত এবং নির্বাচিত হবার পর ভিতর থেকে সুসংবদ্ধ, নিয়মিত ও নিরন্তর বাধা (uniform, constant and continuous obstruction) সৃষ্টি

করে সরকারকে অচল করে দিতে হবে। কিন্তু গান্ধীজীর অন্ধ ভক্ত অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা এই মত সমর্থন করেন না। ফলে মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্বরাজ্য পার্টি নামে কংগ্রেসের মধ্যেই একটি পৃথকদল গঠন করেন। যাঁরা অসহযোগনীতি পরিবর্তনের পক্ষে তাঁরা হলেন prochanger দল আর যাঁরা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাঁরা হলেন No changer দল। বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের পক্ষে যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা No changer-এর পক্ষে যোগ দেন। জেলার অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা যেমন কাটোয়ার গুণীবাবু, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আবুল কাশেম প্রমুখ অহিংসবাদী দল No changer দলে থাকেন। আর চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দেন গুইর গ্রামের অনিলবরণ রায়, বর্ধমানের মহম্মদ ইয়াসিন, বনওয়ারীলাল পাঁজা, রামদয়াল দে, রাজকৃষ্ণ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়, ভামিনী সেন প্রমুখ। বর্ধমান জেলা থেকে আইনসভার নির্বাচনে স্বরাজ্য দল সাধারণ আসনে দু'জন প্রার্থী দেন ও পরাজিত হন, তবে মুসলিম আসনে মহম্মদ ইয়াসিন জয়ী হন। অনিলবরণ বাঁকুড়া থেকে স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও জয়ী হন।

১৯২৩ সালের ১৮ই মার্চ মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার ও কারাবরণ পালন উপলক্ষে সারা জেলায় হরতাল পালিত হয়। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। জনগণ ঐ দিন জাতীয় পতাকা হাতে দলে দলে শ্লোগান দিতে দিতে বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই মে মহাত্মা গান্ধী বর্ধমানে আসেন। ভামিনীরঞ্জন সেন ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে গান্ধীজীকে বিপুল অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে সিয়ারশোল রাজস্কুলের শিক্ষক নিবারণ ঘটকের অনুরোধে বিপ্লবী কবি নজরুল ইসলাম 'ছাত্রদলের গান' লেখেন।

এই প্রসঙ্গে বর্ধমানে ছাত্র আন্দোলন ও যুব সংগঠন আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে। বর্ধমানে যুব সংগঠনের সূত্রপাত করেন কচিবাবু নামে পরিচিত দুর্লভকিশোর মিত্র। দুর্লভকিশোর মিত্রের উদ্যোগে ও অর্থ ব্যয়ে ১৩৩২ সালে (১৯২৫) জন্মাষ্টমীর দিন 'শক্তি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সমস্ত বাংলাদেশে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রসারে 'শক্তি'-র ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার বহু দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে 'শক্তি'-তে প্রকাশিত সংবাদের উদ্ধৃতি প্রকাশিত হত। পরে 'শক্তি'র সম্পাদনাব দায়িত্ব নেন বলাই দেবশর্মা। মুদ্রণ ও প্রকাশনার দায়িত্বে থাকেন কচিবাবু। এই 'শক্তি' ছাড়াও ভোলানাথ ভঞ্জ সম্পাদিত 'বর্ধমান'

(১৯২১), বংশগোপাল চৌধুরী সম্পাদিত 'দেশপ্রিয়', ভূজঙ্গভূষণ সম্পাদিত 'শান্তিজল' ও পরবর্তীকালে ফকিরচন্দ্র রায় ও সুবিমান ঘোষের পৃষ্ঠপোষকতায় 'সংবাদ' নামক সাপ্তাহিক, অজিতকুমার রায়ের সম্পাদনায় 'ছাত্র' ও দাশরথি তা সম্পাদিত পাক্ষিক 'দামোদর' ছাত্র ও যুব আন্দোলনের প্রেরণা যুগিয়েছিল।

১৯২৫ সালে কলকাতায় নিখিলবঙ্গ ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বর্ধমানের ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেন ফকিরচন্দ্র রায় ও সুধীন্দ্রনাথ সরকার। বর্ধমানে ছাত্র-যুব সংগঠন শক্তিশালী হয়ে ওঠে বিপ্লবী ফকিরচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে। যুব-সংগঠনে দেবকী বসু (পরবর্তীকালে ছায়াছবির নির্দেশক), প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোলাম রহমান ওরফে কচি মিঞা, খাদি কর্মী মন্মথ সেন, বিনয় বসু, অন্নদা চক্রবর্তী, অম্বিকা নাগ প্রমুখের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যুব সংগঠন পরে দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। মন্মথ সেনের সংগঠন ছিল গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলনের সমর্থক আর কচিবাবুর সংগঠন ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক। ১৯২৫ সালে ডিসেম্বর মাসে বিপ্লবী রাজেন্দ্র লাহিড়ী শহীদ হলে, তাঁর স্মরণে বর্ধমান যুব-সংগঠন মহম্মদ ইয়াসিনকে সভাপতি করে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান করে। এরপর ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের উভয় সংগঠন মিলিত হয়ে বর্ধমানে অনুশীলন সমিতি বা শ্রীসঙ্ঘের মত ১৯২৮ সালে বর্ধমানে এক গুপ্তসমিতি স্থাপন করে। এর সদস্য ছিলেন ফকির রায়, বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, মন্মথ সেন, প্রমথ বসু, দুকড়িবালা দেবী, সরোজ মুখোপাধ্যায়, হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, দাশরথি তা, আসানসোলের নিবারণ ঘটক প্রমুখ। এই গুপ্তসমিতির সঙ্গে 'যুগান্তর' দলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। গুপ্তসমিতির মধ্যে বিপ্লবের জোয়ার আনেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা), বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। এঁদের পরামর্শে গুপ্তসমিতি রাইফেল সংগ্রহ, অর্থ লুণ্ঠন (স্বদেশী ডাকাতি)। ডিনামাইট দিয়ে রেললাইন উড়িয়ে দেওয়া এইসব পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই সমস্ত পরিকল্পনা হয়ত সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নাই। কিন্তু এর ফলে জেলায় ধীরে ধীরে যুবকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রসার লাভ করে। বীরভূম ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। হরেকৃষ্ণ কোঙার স্বদেশী ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। বর্ধমান জেলার তরুণদের গুপ্তসমিতি কেবলমাত্র রাইফেল সংগ্রহ, অর্থ লুণ্ঠন প্রভৃতি কাজেই লিপ্ত ছিল না, এই সমিতি নানা গঠনমূলক কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিল। এদের নেতৃত্বে গ্রামে গ্রামে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা, গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করে পল্লীবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি কাজেও তরুণরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে।

এছাড়া এর সদস্যগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরে দুর্গতদের সেবা করেছে, বন্যাক্লিষ্ট ও দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেছে। তাঁরা যেমন গান্ধীবাদ ও জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তেমনি বিপ্লববাদ ও সাম্যবাদের মন্ত্রেও দীক্ষিত হয়ে সাম্যবাদ প্রচার করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ছিলেন বিপ্লববাদ ও সাম্যবাদের পথিকৃৎ। তিনি আমেরিকায় অধ্যয়নকালে কালিফোর্নিয়ায় গদরপার্টি ও সোশ্যালিষ্ট ক্লাবের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আহ্বানে বীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এর সঙ্গে তিনি মস্কো যান ও সেখানে বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য), বীরেন্দ্র দাশগুপ্তের সংস্পর্শে আসেন ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি একাধিক বার বর্ধমানে এসে এখানকার গুপ্ত-সমিতির পাশে দাঁড়িয়েছেন ও সদস্যদের সাম্যবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি বর্ধমান টাউন হলে এক মহতী জনসভায় বিশ্বের যুব আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সমবেত জনগণকে অবহিত করেন। ১৯২৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কলকাতায় সমাজবাদী যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়। ভূপেন্দ্রনাথ তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। জহরলাল নেহরু এই সম্মেলনে ভাষণ দেন। বর্ধমানে যুব-সম্মেলনের সূচনা করেন মহবাজ কুমার উদয়চাঁদ মহতাব। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। সম্মেলনে যোগ দেন প্রণবেশ্বর সরকার (টোগো), আমোদবিহারী বসু, দাশরথি তা, বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, সরোজ মুখোপাধ্যায়, ফকির রায়, আবদুস সাত্তার।

এই সময় মুসলমানদের মধ্যে সুস্থ চিন্তা বজায় রাখা, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রতিরোধ করার জন্য জেলার কয়েকজন মুসলমান তরুণ এগিয়ে আসেন। এদের চেষ্টায় বর্ধমানে গড়ে ওঠে মুসলমানদের যুব প্রতিষ্ঠান। ইয়ং মেনস্ক ক্রীশ্চান এসোসিয়েশনের মত জাতিধর্ম নির্বিশেষে সেবামূলক কাজ করার উদ্দেশ্যে এই মুসলমান তরুণ দল ইয়ংমেন্স মুসলিম এ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। রাজনীতিবর্জিত খেলাধূলা, ব্যায়াম, পাঠাগার স্থাপন ও সমাজসেবার আদর্শ নিয়ে গঠিত হলো এই প্রতিষ্ঠান। এদের গঠনতন্ত্রে ধর্মমত নির্বিশেষে যে কেহ এই এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হতে পারতেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান শহরে এদের নিখিলবঙ্গ সম্মেলন হয়। আজীবন জাতীয়তাবাদী মৌলভী মুজিবর রহমান হলেন এর সভাপতি। প্রধান বক্তা ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ সাহেবও এদের কার্যে আকৃষ্ট হয়ে এই এ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে যুক্ত হন।

এবার কংগ্রেস আন্দোলনের মূল স্রোতে ফিরে আসি। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের দাবী ছিল ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের অনুকরণে স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু তরুণ নেতৃবর্গ জহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তোলেন। ১৯২৮ সালের কংগ্রেসের সম্মেলনে গান্ধীজীর অনুরোধে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩০ সালে ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পাঠ করা হয়। বর্ধমানেও যাদবেন্দ্র পাঁজার নেতৃত্বে ঐ দিন বর্ধমান টাউন হলে স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পাঠ করা হয়।

ইতিমধ্যে ১৯২৯ সালে ৮ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় সভাকক্ষে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের বোমা ফেলাকে কেন্দ্র করে সারা ভারত তোলপাড় হয়। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত উভয়েই ছিলেন হিন্দুস্তান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য। বটুকেশ্বর দত্তের (১৯০৮—৬৫) পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার ওয়াড়ি গ্রামে। পিতার নাম গোষ্ঠবিহারী; তিনি কানপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় দরজীর কাজ শেখেন। এর পর তিনি রাশিয়া-বিপ্লব ও ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং কলকাতা, বোম্বাই ও কানপুরে শ্রমিক ধর্মঘটের সংস্পর্শে আসেন। ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দুস্তান সোস্যায়ালিষ্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য হন। লাহোরে সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার সময় A. S. P Mr. Sanders লালা লাজপত রায়কে এমন ভাবে আহত করেন যে তাঁর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য ভগৎ সিং বোমা মেরে স্যান্ডার্সকে হত্যা করেন এবং এর পরেই কেন্দ্রীয় আইন সভাগৃহকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করা হয়। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর বিশেষভাবে তৈরী বোমা নিয়ে কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্বলী হাউসের দর্শকের গ্যালারীতে অপেক্ষা করতে থাকেন এবং যে মুহূর্তে বিতর্কিত Public Safety ও Trade Dispute Bill পাশ হওয়ার কথা প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন সেই মুহূর্তে প্রথমে ভগৎ সিং ও তার ঠিক ৫ সেকেণ্ড পরে বটুকেশ্বর দত্ত পর পর দু'টি বোমা নিক্ষেপ করেন ও গুলি ছুড়তে ছুড়তে ভারতে সর্বপ্রথম বিপ্লব মন্ত্র 'ইনকিলাব্ জিন্দাবাদ্' ধ্বনি দেন ও পরিষদ ভবনে লাল প্রচারপত্র ছড়িয়ে পুলিশের হাতে ধরা দেন। প্রচারপত্রে বোমা ফেলার উদ্দেশ্য লেখা ছিল—On behalf of the helpless Indian masses, we want to emphasise the lesson often repeated by history that it is easy to kill individuals

but you cannot kill ideas. Great empires crumbled while ideas survive. Bourbons and Czars fell while revolutionaries marched triumphantly ahead. (Martyrdom of Bhagat Sing by Ladli Mohan Roy Chowdhury—Amrita Bazar Patrika 15.8.1981) ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর পালাতে পারতেন কিন্তু কাপুরুষের মত না পালিয়ে শান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করেন। এরপর বিচারের একটা প্রহসন হয় এবং বিস্ফোরক আইন ভঙ্গ ও হত্যার চেষ্টার দায়ে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসী ও বটুকেশ্বরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ২৪শে মার্চ ১৯৩১ মঙ্গলবার Statesman-এ প্রথম পৃষ্ঠায় Lahore Terrorist hanged শিরোনামে সংবাদ বের হয় The executions which previously were fixed to take place this morning were carried out in strict secrecy and upto a late hour last night the carrying out of the death sentences was not known in Lahore."

এই প্রসঙ্গে লাডলিমোহন মিত্র লিখেছেন—The Gandhi Arwin pact was signed on March 5, 1931. The civil disobedience movement was called off. Salt to be manufactured free of duty, Political Prisoners were mostly released from the gaol and the nation was ready to participate in the Second Round Table Conference. For the time being, it seemed all quiet on the Indian Scene. এই প্রসঙ্গেরই এবার অবতারণা :

লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গৃহীত হবার পর গান্ধীজী তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড আরউইন-এর কাছে এগারো দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। কিন্তু সরকার দাবীর প্রতি কোন কর্ণপাত না করায় ১৯৩০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ গান্ধীজী তাঁর ৭৯ জন সত্যাগ্রহীকে নিয়ে ডাণ্ডি অভিযানের মাধ্যমে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করেন। বর্ধমানেও যুগান্তর দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, ফকির রায়, বিজয় ভট্টাচার্য, আমোদবিহারী বসু, মথুরানাথ ঘোষ, দুর্গাপুর ও আসানসোল থেকে অমূল্য ঘোষ, বনওয়ারীলাল ভালোটিয়া এই আইন অমান্য আন্দোলনের সামিল হন। পাঁজা-মশাই-এর নেতৃত্বে ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবী কালনা রোড ধরে ২৪ পরগনা জেলার মহিষবাথানে লবণ আইন ভঙ্গ করে লবণ তৈরীর জন্য যাত্রা করেন। যাত্রার আগে হুগলী থেকে বিজয় ভট্টাচার্যকে ডেকে এনে তাঁকে জেলা কংগ্রেসের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শিবশঙ্কর

চৌধুরীর নেতৃত্বে আর একটি দল বর্ধমান থেকে বের হয়ে মেদিনীপুরের পিছাবনীতে যান। উভয় দলই গ্রেপ্তার হন। বিচারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ও দমদম জেলে প্রেরিত হন। সেদিন জেলার এক হাজারের ওপর স্বেচ্ছাসেবীদের ওপর পুলিশ সুপার দোহার চরম নির্যাতন চালান। চৈতন্যপুরের মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, জিতেন্দ্র চৌধুরী ও জ্ঞান চৌধুরীর নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জিতেনবাবু আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। চৈতন্যপুর এলাকার দাশরথি চৌধুরী সক্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যপুর পরিবার সচকিত হয়ে ওঠেন। চৈতন্যপুরের রায়চৌধুরীরা ছিলেন জমিদার। স্থানীয় জমিদার জোতদারদের মধ্যে এই চৌধুরী পরিবারের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। এঁরা ছিলেন মহাজন ও শোষক। তা সত্ত্বেও প্রয়াত মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর সময় থেকেই এঁরা স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। জ্ঞান চৌধুরী ও জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। জ্ঞানবাবু শেষে পরিবার থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্ধমানে বোরহাটে বাস করতেন। পরে দাশরথি চৌধুরী বামপন্থী আন্দোলনের সামিল হন। বিনয় চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল কংগ্রেসকর্মী বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-কে চিঠি দিয়ে কার্জন গেটে প্রকাশ্যে বেআইনীভাবে লবণ বিক্রয় আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনের সামিল হন হরেকৃষ্ণ কোঙার, দাশরথি তা ও বহু স্বেচ্ছাসেবক। বেআইনীভাবে লবণ বিক্রয় করার অপরাধে বিনয় চৌধুরী ও হরেকৃষ্ণ কোঙার-সহ প্রায় ২০০ জন স্বেচ্ছাসেবী গ্রেপ্তার হন ও তাঁদেরকে বর্ধমান জেলে পাঠান হয়। আমোদবিহারী বসু ও শচীন্দ্রনাথ অধিকারী দুর্গাপুরে গ্রেপ্তার হন। দুর্গাপুরে এক সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুর্গাপুর থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। তিনি বর্ধমানে আত্মগোপন করে থাকেন। সরোজ মুখোপাধ্যায় আসানসোলে গ্রেপ্তার হন ও তাঁকে দমদম জেলে পাঠান হয়। ফকির রায়কে বাংলার কুখ্যাত ডিটেনশন আইনে বন্দী করে ৬ বছরের জন্য দেউলীতে রাখা হয়। এই আইন ছিল ব্রিটিশ সরকারের একটা যথেচ্ছাচার মূলক দমনমূলক আইন—এই আইনে যে কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে দীর্ঘকাল বন্দী করে রাখা যেত। ১৯৩০ সালে ১৮ই এপ্রিল সূর্য সেন (মাস্টার দা)-এর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম জাতীয় সরকার গঠিত ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয়। অগ্রদ্বীপের সুবোধ চৌধুরী তখন সেখানে মাতুলালয়ে থেকে পড়াশুনা করতেন। তিনি পড়াশুনা ছেড়ে মাষ্টারদার ডাকে বিপ্লবী আন্দোলনের সামিল হন ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে যোগ দেন। ফকির রায় ছাড়া কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরোজ মুখোপাধ্যায়কেও ডিটেনশন আইনে বন্দী করে বিভিন্ন জেলে ঘোরানো হয়।

আইন অমান্য করে মণ্ডলগ্রামের জগবন্ধু হাজরা চৌধুরী, এ্যাডভোকেট পঞ্চানন চৌধুরী বর্ধমানে অন্তরীন হন। মোক্তার ভবদীশ রায়ের জেল হয়। এছাড়া বর্ধমানে আইন অমান্যকারীদের মধ্যে ছিলেন উকিল হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নরেন্দ্র সামন্ত, মাধু সামন্ত (মুকুন্দমাধব সামন্ত), নিমাই সামন্ত, তারক সেনগুপ্ত, শান্তি সেনগুপ্ত, উকিল পূর্ণ চৌধুরী, ডাঃ বিষ্ণুপদ রায়, মথুরানাথ ঘোষ, নরেন্দ্র চৌধুরী, বিনয় মিত্র, শিক্ষক আশুতোষ চৌধুরী, গোবর্ধন সাধু, গোবর্ধন পাল, গীতগোবিন্দ বসু প্রমুখ।

দাশরথি তা-কে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। তিনি ধামাসকে কেন্দ্র করে হিজলনা, বড়োবলরাম, সাদিপুর, বেড়ুগ্রাম, বলরামপুর, জামালপুব, দেরীপুর, আনগুনো অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামবাসীকে আইন অমান্য করার জন্য সংঘবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর একটা গুণ ছিল—লোকের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশে, মধুর ব্যবহারে, হাস্যকৌতুকপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে লোককে সহজে আকর্ষণ করতে তাঁর জুড়ি ছিল না। মেমারীতে দারোগার বাসায় বোমা ছোঁড়া হয়।

কালনার কর্মীরা পথসভা কবেন ও মদের দোকানে নিয়মিত ভাবে পিকেটিং করতে থাকেন। কালনার উৎপল সাহার দোকানে মদ আমদানি বন্ধ করতেও কালনা স্টেশনে পিকেটিং শুরু হয়। ডাঃ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সন্তোষকুমার ঘোষ, অন্নদা মণ্ডল, নিত্যানন্দ অবধূত, অবনী ভট্টাচার্য, সুধীর দে প্রমুখ তরুণদের ওপর মদের দোকানে পিকেটিং-এর জন্য অমানুষিক অত্যাচার চালান হয়।

কাটোয়ায় আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ডাঃ গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (গুণীবাবু) ও বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে মহিলা সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন গুণীবাবুর স্ত্রী সুরমা মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ চৌধুরীর সহধর্মিনী, ও শচীন্দ্র অধিকারীর স্ত্রী রেণু দেবী এবং ময়মনসিংহের কমিউনিস্ট নেতা শ্রীমণি সিংহের ভগ্নী নির্মলা সান্যাল। এখানে গুণীবাবুর নেতৃত্বে যে আইন অমান্য আন্দোলন হয়, তাতে কাটোয়ার K. D. Institution-এর ছাত্ররাও সামিল হয়। (এই প্রসঙ্গে অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছুটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ছে যার জন্য আগে থেকে মার্জনা চেয়ে রাখছি।) এই স্কুলের সেকেন্ড ক্লাসের (বর্তমান নবম শ্রেণীর) ছাত্র ছিলেন আমার দাদা প্রয়াত শঙ্করচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনিও এই আন্দোলনের সামিল হন ও গ্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। দেশের বাড়ীতে (ভাতার থানার হরিবাটী গ্রাম) কান্নার রোল পড়ে যায়—মা তো আহার নিদ্রা

ত্যাগ করেন। সে সময় আইন অমান্য আন্দোলনকারীদের কাছে জেলখানা তীর্থস্থানে পরিণত হলেও পল্লীগ্রামের নিরক্ষর মহিলার কাছে জেলখানা মানেই ঘানি টানা; পাথর ভাঙা, হাতে পায়ে বেড়ী দিয়ে ফেলে রাখা, খুদঘাঁটা খাওয়া বোঝাত। শেষে বাবা গিয়ে মুচলেখা দিয়ে দাদাকে জেল থেকে খালাস করে নিয়ে এলেন। আর এই খানেই দাদার পড়াশোনাতেই ইতি পড়লো।

এই সময় মদের দোকানে পিকেটিং করার ফলে ১৯৩০ সালের জুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে আগের বছরের ঐ সময়ের তুলনায় সরকারের রাজস্ব খাতে ৪৩০০০ টাকা আয় কমে যায়।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ৭ জন ইউরোপিয়ান সদস্যের কমিশন ভারতে আসেন মন্টেগু চেমসফোর্ড আইনের কার্যকারিতা খতিয়ে দেখতে ও ভারতবাসীদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করতে। কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় ভারতবাসীরা সাইমন কমিশন বয়কট করেন। সাইমন কমিশন প্রবল প্রতিবাদের মধ্যে তদন্ত করে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ভারতবর্ষে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকার লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠক ডাকেন। কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগ দেয় নাই। শেষ পর্যন্ত লর্ড আরউইন ও গান্ধীজীর মধ্যে গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট ১৯৩১ সালের ৪ঠা মার্চ স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির দ্বারা কংগ্রেস আইন অমান্য প্রত্যাহার করে ও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হয়। সরকারও আইন অমান্যকারীদের ওপর দমনমূলক নীতি প্রত্যাহার করে ও বেশীর ভাগ বন্দীকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়। এরপর আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। এর ফলে অগ্রগামী কর্মীদের মধ্যে চাপা বিক্ষোভ দেখা দেয়। বর্ধমান জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদন নিয়ে আলোচনা হয়।

এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। জেলা কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা যেমন পাঁজা মশাই, বিজয় ভট্টাচার্য, গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদনের প্রস্তাব আনেন। অপর দিকে তরুণ নেতারা যেমন আমোদ বসু, বিনয় চৌধুরী, সরোজ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই চুক্তির বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সরোজবাবুর জ্বালাময়ী বক্তৃতা সম্মেলনের প্রতিনিধিদের বিপুল সমর্থন লাভ করে এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতি নিন্দাসূচক প্রস্তাব প্রতিনিধিদের সমর্থনে গৃহীত হয়ে যায়। এই সম্মেলনকে সার্থক করার জন্য বিজয় ভট্টাচার্য ও ভামিনী সেন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। যাই হোক গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুযায়ী

কংগ্রেস ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ঘোষণা করলে গান্ধীজী বৈঠক ত্যাগ করেন। এদিকে সরকারের দমননীতি আবার চালু হয়ে গেল। গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে বৈঠক চাইলেন কিন্তু তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হল। ফলে ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে আবার আইন অমান্য আন্দোলন ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের নীতি গৃহীত হয়। বর্ধমানেও দ্বিতীয়বার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে হরেকৃষ্ণ কোঙারের ৬ বছর সাজা হয় ও তাকে আন্দামানে পাঠানো হয়। বিনয় চৌধুরী, আমোদবিহারী বসু, মথুরানাথ ঘোষ, সরোজ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা আত্মগোপন করে দলের কাজ চালিয়ে যান। কিন্তু ১৯৩৩ সালের মে মাসের প্রথম দিকে বিনয়বাবু গ্রেপ্তার হন ও বেগুট কেসে বিচারের জন্য তাঁকে বর্ধমান জেলে নিয়ে আসা হয়। তাঁকে ডিটেনশন আইনে কয়েক মাস বর্ধমানে রেখে পরে বগুড়া জেলে ইনটার্ন করা হয়, পরে সেখান থেকে সিউড়ি জেলে আনা হয় ও বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করা হয়। এই মামলায় আসানসোলের হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর ভট্টাচার্যকেও জড়ানো হয়। বিচার চলে ৮ মাস ও বিচারে বিনয়বাবুর সাড়ে পাঁচ বছর ও হরিপদবাবুর ৬ বছর কারাদণ্ড হয়। অমর ভট্টাচার্যকে ডেটেনিউ করে আন্দামানে পাঠানো হয়। বেগুট কেসে বিনয়বাবু ও তাঁর ভাই ধর্মদাস চৌধুরীকে জড়ানো হলে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করানো যায় নাই। তাই তাঁদেরকে ডেটেনিউ করে বন্দী করা হয়। ১৯৩৩ সালে সশস্ত্র বিপ্লবীরা কালনা থানার নোয়াপাড়ায় স্বদেশী ডাকাতি করে ও গৃহকর্তার বন্দুক কেড়ে নিয়ে আসেন। এই সময় পুলিশ সাতগেছিয়ায় হানা দিয়ে একটা পোড়ো বাড়ী থেকে ব্যাগ ভর্তি বোমা ও হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মির সিল উদ্ধার করে। দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে রায়না থানার মেড়াল, মির্জাপুর, বোগরা প্রভৃতি অঞ্চলে দাশরথি তা তার দলবল নিয়ে স্বদেশী ডাকাতি করেছিলেন বলে আমার প্রতিবেশী মেড়ালের প্রয়াত সমরেন্দ্র দত্ত রায়ের কাছে শুনেছি।

১৯৩২ সালে বর্ধমানে কংগ্রেসের যে বর্ধমান সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনের পরই একই মঞ্চে যুব সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে বঙ্কিমবাবু এক অসাধারণ বক্তৃতা করেন। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বর্ধমান বিভাগীয় সমাজবাদী সম্মেলন। এই সম্মেলন হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। এই

সম্মেলনের সূচনা করেন মহারাজ কুমার উদয়চাঁদ মহতাব। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, আবদুস সাত্তার, দাশরথি তা এ সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। এতে রক্তপতাকা উত্তোলন করা হয়। এর পর থেকে বিনয়বাবু ও সরোজ মুখার্জি সাইক্লোস্টাইলে "সাম্য" নামে একখানি পত্রিকা বের করেন ও বেশ কয়েক মাস চালান। এর পর থেকে কংগ্রেসের মধ্যে তরুণ সম্প্রদায় বামপন্থী আন্দোলনের দিকে ঝোঁকেন। বিনয়বাবু, সরোজবাবু, আমোদ বসু প্রমুখ নেতা যুগান্তর দল থেকে বেরিয়ে এসে ইন্ডিয়ান সোসিয়োলিস্ট রেভেলিউশনারী পার্টি গঠন করেন। পরে এর নাম পরিবর্তন করে ইন্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান পার্টি রাখা হয়। কংগ্রেস ভেঙে এই সমস্ত নেতা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। এঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে ক্যানেল-কর আন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'ইডেন ক্যানেল' খনন করা হয়। তবে এই ক্যানেলের দ্বারা সেচসেবিত অঞ্চল খুব বেশী ছিল না। কর দেবার চুক্তিপত্রে সই করে জল নিতে হত। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি দামোদর ক্যানেল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯২৬ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত খাল খনন করা হয়। ১৯৩২ সাল থেকে কিছু এলাকায় জল দেওয়া শুরু হয়। এই খাল কাটার জন্য অনেক কৃষকের জমি নষ্ট হয়। তাছাড়া খাল কাটার জন্য অনেক কৃষকের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হয়। এই সময় অবিভক্ত বাংলার সেচমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন; তিনি বাংলার আইন সভায় Bengal Development Bill উপস্থাপিত করলেন। তাঁর প্রস্তাব মত ক্যানেলকর ধার্য হয় একরে পাঁচ টাকা আট আনা (৫.৫০ টাকা)। এর প্রতিবাদে বর্ধমানের বার এ্যাসোসিয়েশন সোচ্চার হয়। জেলা কংগ্রেসও এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন। জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক আবদুস সাত্তার বার এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রায়ত এ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। জেলা কংগ্রেস ক্যানেলকরের প্রতিবাদে জেলার নানা স্থানে নিয়মিত সভা করে কৃষকদের সংগঠিত করে। ১৯৩৩ সালে মে মাসে হাট গোবিন্দপুরে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বর্ধমান জেলা কৃষক-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত এই সভায় ভাষণ দেন। কংগ্রেসের মধ্যে এই সময় দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। উভয়পন্থীরা ক্যানেলকর প্রতিকার সমিতি গঠন করে। তবে দক্ষিণপন্থীরা খুবই জোরদার মারমুখী আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন অহিংস পদ্ধতিতে কতকটা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। আর বামপন্থীরা চাইলেন সংগ্রামী মারমুখী

আন্দোলন। অবশেষে জেলা কংগ্রেসের পাঁজামশাই একটা ইউনাইটেড ফ্রন্ট গড়ার প্রস্তাব দিলেন। সাত্তার সাহেবও এর সমর্থন করলেন। অবশেষে বামপন্থীদের নেতৃত্ব দিয়ে শাহেদুল্লাহ সাহেব একটা সমঝোতার সূত্র হিসেবে পাঁজামশাই-এর কাছে প্রস্তাব দেন, বামপন্থীদের ক্যানেলকর প্রতিকার সমিতিকে কংগ্রেসের সাব-কমিটির শাখারূপে মেনে নিতে হবে। যাই হোক, এই ভাবেই ক্যানেলকর প্রতিকার সমিতির আন্দোলন চলতে লাগলো। বর্ধমানে ২ বছরে ৩টি ক্যানেল কর বিরোধী সম্মেলন হয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ১৯৩৫-এর ২০ শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারী ১০ ও ১৯৩৭-এর ১লা মার্চ। তাছাড়া সেচসেবিত অঞ্চল ভাতার ও সড্যাতেও ক্যানেলকর প্রতিরোধ সম্মেলন হয়। কলকাতায় এলবার্ট হলেও প্রাদেশিক স্তরে সম্মেলন হয়। হাট গোবিন্দপুর, সড্যা, সিজেপাড়া, কুড়মুন, বন্ডুল ও ভাতারে ক্যানেলকর প্রতিকার সমিতির উদ্যোগে ক্যানেলকর বিরোধী সম্মেলন হয়। বামপন্থী হেলারাম চট্টোপাধ্যায় ও স্থানীয় কংগ্রেস নেতা মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৯৩৭ সালের ১লা মে বর্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলন হয়। সভাপতিত্ব করেন মুজফফর আহমেদ। ১৯৩৭-এর ১৩ জুন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার-এর সভাপতিত্বে বর্ধমানে কিষাণ সম্মেলন হয়। এতে অনেক জমিদার ও জোতদারও যোগ দেন। কেবল চকদীঘির জমিদার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় (এম.এল.এ.) এর বিপক্ষে ছিলেন। কংগ্রেস ১৯৩৭-এর ৩১শে জানুয়ারী বর্ধমানে ক্যানেলকর প্রতিকার সমিতি স্থাপন করে। গ্রামে গ্রামে প্রতিবাদ সভা হয়—এতে হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, আবদুল্লাহ রসুল সাহেব, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বামপন্থী নেতৃবর্গও যোগ দেন। কংগ্রেসের আবদুস সাত্তার এই আন্দোলনের পক্ষে থাকলেও অনেক কংগ্রেস নেতার মধ্যে ক্যানেলকর প্রতিরোধ আন্দোলনকে সংগ্রামী আন্দোলনে পরিণত করা নিয়ে দ্বিধাচারিতা ছিল। পাঁজামশাই তো ঢাকঢাক গুড়গুড় না রেখে প্রকাশ্যেই তাঁর সংগ্রামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি এটা বুঝতে চান নাই যে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে Elite Congress বা শিক্ষিত ভদ্রলোকের কংগ্রেস থাকলে চলবে না। একে হতে হবে জনগণের কংগ্রেস। তার জন্যে গ্রামের লোকজনদের অভাব অভিযোগ, তার প্রতিকার নিয়ে তাদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে জনগণের মধ্যে সরকারের সাম্রাজ্যবাদী রূপটা প্রকাশ করে দিতে হবে। গান্ধীজীও তো গ্রামের মানুষদের উন্নতির ওপরই জোর দিয়েছিলেন।

কিন্তু পাঁজামশাই-এর অনুগামী কিছু দক্ষিণপন্থী নেতা ক্যানেলকর প্রতিকার সমিতিকে কংগ্রেসের পাল্টা সংগঠন বলেই ধরে নিলেন ও সংগঠকদের বিরুদ্ধে

শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। কংগ্রেসের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ যেমন হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, মহানন্দ খান, শিবপ্রসাদ দত্ত (আলুবাবু), অশ্বিনী চৌধুরী, তারাপদ মোদক প্রমুখ নেতা বি. সি. রোডে কংগ্রেসের অফিসে (বর্তমানে যেখানে 'প্রয়োজনী' দোকান রয়েছে) গিয়ে পাঁজামশাইকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু পাঁজামশাই বললেন ক্যানেলকর নিয়ে আন্দোলন করলে কংগ্রেসের আভিজাত্য নষ্ট হয়ে যাবে, খাঁটি দুধের সঙ্গে জল মিশে যাবে। তাই তিনি উত্তেজিত হয়ে হেলারামবাবুদের বললেন "এসব Milk and water Policy চলবে না বাপু, হয় Milk না হয় water"। পাঁজামশাই সাধারণত ইংরেজী কথা ব্যবহার করতেন না কিন্তু উত্তেজনার বসে বাঙালীর ইংরেজী, হিন্দী কথার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।

১৯৩৭ সালে ফেব্রুয়ারীতেই সংবাদ পাওয়া যায়—সরকার ৫ টাকা আট আনা হারে কর আদায়ে বদ্ধ পরিকর; এমনকি ইতিমধ্যে চল্লিশ হাজারের বেশী সার্টিফিকেট তৈরী হয়ে যায়। দরকার হলে স্থাবর-অস্থাবর নিলাম করেও তারা কর আদায় করবেন। ৩রা মার্চ বর্ধমানে এর প্রতিবাদে এক বিরাট জনসভা হয়। নরমপন্থী আইনসভার সদস্য বর্ধমানের মহারাজও এই সভায় যোগ দেন। তিনি কর কমানোর সুপারিশ করার কথা বললেও বে-আইনী কিছু করা হবে না বলে মত প্রকাশ করেন। সভায় জনগণের রায় পুনর্ঘোষিত হল। যেহেতু জমির কোন উন্নয়ন হয় নাই অতএব Betterment levy হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে সাম্যবাদী রুশোর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—Law was a good thing for property owners and a very bad one for the propertyless. সেই সভায় তাই বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেছেন বে-আইনী কিছু করার ইচ্ছা জনগণের নেই। কিন্তু গভর্নমেন্টকেও আইনসম্মত ভাবেই চলতে হবে। সরকার যদি জেদ বজায় রাখার চেষ্টা করেন ও জনগণের ন্যায্য দাবী অস্বীকার করেন তাহলে জনগণকেও কড়া সংগ্রামের জন্য তৈরী হতে হবে।

যাই হোক, কৃষকসমিতি সেচসেবিত অঞ্চলে ক্যানেলকর প্রতিকার আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁদের যুক্তি সেচব্যবস্থা সরকারের দায়িত্ব, কাজেই চাষীদের কর দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে ক্যানেল রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক প্রশাসনিক খরচের জন্য কৃষকরা একর প্রতি দেড় টাকা ক-র দিতে প্রস্তুত। কংগ্রেস-এর দক্ষিণপন্থী কৃষক-সম্মেলন সংগ্রামী পথে না গিয়ে একটা সমঝোতার পক্ষে আন্দোলন চালাতে থাকে। ক্রমশ দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী কৃষক সমিতির মত-পার্থক্য তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। যেহেতু ক্যানেলকর প্রতিকারের সঙ্গে

জনস্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত তাই জনসমর্থন ক্রমশ বামপন্থীদের অনুকূলে যেতে থাকে। আন্দোলন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। অবশেষে সরকার আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তবে সরকার একেবারে কর কমায় না। প্রথমে সাড়ে পাঁচ টাকা থেকে চার টাকা দু আনা, দ্বিতীয় দফায় চার টাকা দু আনা থেকে তিন টাকা ও শেষে দু টাকা নয় আনায় রফা হয়। যদিও এটা কৃষক সমিতির একটা বড় জয়, তবুও ধানের দাম ক্রমশ নিম্নমুখী হতে থাকায় জমির খাজনা মিটিয়ে এই কর দেওযা কৃষকদের অসাধ্য হয়ে উঠলো। কৃষক সমিতি ক্যানেলকর বন্ধের ডাক দেয়। ১৯৩৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বর্ধমান আনন্দ প্রেস (সে সময় বর্তমানে উদয়চাঁদ গ্রন্থাগারের বিপরীত দিকে বি. সি. রোডের উপর এই প্রেস ছিল) থেকে মুদ্রিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর যে বাণী প্রকাশিত হয় তাতে তিনি সরকারকে ক্যানেল কন্‌ফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাব মত শর্তমূলক ভাবে একর প্রতি দেড় টাকা হারে কর নেবার আবেদন রাখেন ও এই দাবী না মানা হলে আবার সংগ্রাম চালান হবে বলে হুমকি দেন।

যেহেতু সতর্কবাণীটি সুভাষচন্দ্রের, সে কারণ তাঁর বাণীটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের বাণী :

বর্ধমান জেলার দামোদর ক্যানেল অঞ্চলের কৃষকগণ অতিরিক্ত ক্যানেল-করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। এই আন্দোলনেব সহিত আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। গত বৎসর আমি এই কর একর প্রতি দেড় টাকা ধার্য হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমি জানিয়া সুখী হইলাম যে সম্প্রতি এক ক্যানেল কনফারেন্সেও শর্তমূলকভাবে ক্যানেলকর একর প্রতি দেড় টাকা স্বীকার করিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং আরো স্থির হইয়াছে যে গভর্নমেন্ট দেড় টাকার অধিক ধার্য রাখিলে তাহার- বিরুদ্ধে আবার সংগ্রাম চালানো হইবে। আমি আশা করি গভর্নমেন্ট কৃষকদের দেড় টাকার দাবী মানিয়া লইতে বিলম্ব করিবেন না। আরো আশা করি গভর্নমেন্ট উহা মানিয়া না লইলে এবং আন্দোলনের প্রয়োজন হইলে সকলে উহাতে যোগদান করিবেন।

৫.২.৩৯ স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

আনন্দ প্রেস

(বর্ধমান রাজ কলেজের অধ্যাপক ভাস্কর দাশগুপ্তের সংগৃহীত ও সৈয়দ শাহেদুল্লাহ-এর 'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ' পুস্তকে প্রকাশিত উদ্ধৃতি থেকে সংকলিত।)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ২৮.৫.৩৮ তারিখে সুভাষচন্দ্র বসু বর্ধমানে আসেন এ বিষয়ে আলোচনার জন্য। তিনি উভয় পক্ষকে সমঝোতায় আনার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু সরকার ক্যানেলকর আদায়ের জন্য কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে। Govt of Bengal Home Politcal এর ১০/২/১৯৩৯ তারিখে 656 No. Notification-এ সরকারের পাঁচ টাকা আট আনা হিসাবে ক্যানেলকর আদায়ের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর ১৯৩৭ সালে নিযুক্ত কমিটির রিপোর্ট মোতাবেক ১৯৩৬-৩৭ ও ১৯৩৭-৩৮ আর্থিক বছরের জন্য একর প্রতি কর পাঁচ টাকা আট আনা থেকে দু টাকা নয় আনায় নামিয়ে আনতে সরকার রাজী হয়। কিন্তু এই নোটিফিকেশনে ঘোষণা করা হয় যে ১৯৩৮-৩৯ আর্থিক বছর থেকে যাঁরা সেচের জন্য ক্যানেলের জল নেবেন তাঁদেরকে তাঁদের ক্ষেত্রে একর প্রতি চার টাকা ও যাঁরা দীর্ঘ মেয়াদী লিজ নেবেন তাঁদের ক্ষেত্রে একর প্রতি ৩ টাকা ৮ আনা কর ধার্য করা হবে। সরকারের বক্তব্য বর্ধমান ও হুগলী থেকে প্রস্তাবিত সেচসেবিত ২ লক্ষ একর জমির মধ্যে ১,৩৫,০০০ একরে সেচের জন্য জল দেওয়া সম্ভব হয়েছে ও এর জন্যে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। প্রচলিত হারে ঐ কর আদায় করলে মোট ব্যয়ের তিন শতাংশও রাজস্ব উঠবে না। তা সত্ত্বেও সরকার একর প্রতি চার টাকা বা সাড়ে তিন টাকা দাবী মেনে নিয়েছেন, এর চেয়ে কমানো কখনো সম্ভব নয়। এতেও যদি কৃষকরা কর না দেন তা হলে আসানসোল ছাড়া জেলার অন্য সেচসেবিত অঞ্চলে সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৭ ধারা প্রয়োগ করে কর আদায় করা হবে।

এই আদেশ জারির পরে যখন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী নেতারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামবাসীকে কর না দেবার জন্য উপদেশ প্রচার করতে লাগলেন তখন সরকার সশস্ত্র পুলিশ এমনকি গোরা সৈন্য নামিয়ে গ্রামবাদীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়—যেমন মত্ত অবস্থায় ঘর ভাঙা, প্রহার, অকথ্যভাষায় গালিগালাজ করা ইত্যাদি। এখন কি বিনোদ দারোগা ঘরের মেয়েদের ডাকিয়ে আনিয়ে অকথ্য গালিগালাজ ও এমন কি রোদে দাঁড় করিয়েও রাখে। সাপ্তাহিক 'বর্ধমান বার্তা'র ১৯৩৯ সালের বিভিন্ন সংখ্যায় এই সব অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে 'বর্ধমান বার্তা' ১৩.৩.৩৯ তারিখে এক বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি ভাতার থানার বনপাশ কামারপাড়ার ঝাঁপপুকুর পাড়ে আমবাগানে তাঁবু ফেলে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী যাদের ক্যানেলকর বাকি ছিল তাদের ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়, এমনকি গৃহস্থকে রাঁধতে না দেবার জন্য উনানে পা ঢুকিয়ে বসে থাকে। গরু, বাছুর, ছাগল, বাসন-

কোসন যা পায় সমস্ত নিলামের জন্য ইউনিয়ন অফিসে নিয়ে যায় ও নীলামে বিক্রি করে বকেয়া উসুল করে। কৃষকসমিতি অনেক ক্ষেত্রে গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক পাঠিয়ে ক্রোক করা গরু, বাছুর, ছাগল বা অস্থাবর জিনিসপত্র গ্রামের বাইরে নিয়ে যেতে বাধা দেয়। তবে একথাও সত্য সমস্ত গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক পাঠানো সম্ভব হয় নাই। সড্যা, সিংহপাড়া, করন্দা, মহাচাঁদা, পারহাট, জিয়ারা সব গ্রামের অনেক সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হন। জেলের ভিতর পুলিশ এই সব সত্যাগ্রহীদের ওপর থার্ড ডিগ্রী প্রয়োগ করে। অবশেষে কংগ্রেস প্রতিনিধি, কৃষক সমিতির প্রতিনিধি, মুসলিম লীগের প্রতিনিধি সভাপতি আবুল হাসেমকে নিয়ে বোঝাপাড়া হয় ও ঠিক হয় যে সরকার দমননীতি ত্যাগ করবে। বন্দীদের মুক্তি দেবে আর কৃষকরা স্থায়ীভাবে দু টাকা নয় আনা হারে কর দেবে। এই প্রস্তাব আবুল হাসেমের মারফৎ সরকারে জমা দেওয়া হয় ও সরকার তা মেনে নেয়।

ক্যানেল আন্দোলনে বহু মানুষ গ্রেপ্তার হন। এদের মধ্যে ধনী ও জমিদাররা বন্ড দিয়ে ছাড়া পেয়ে আসেন। আর জেলে আটক বন্দীদের ওপর পুলিশ অকথ্য অত্যাচার চালায়। ডাণ্ডাবার, ষ্ট্যান্ডিং হ্যান্ডকাপ, পেনাল ডায়েট, তক্তা পিটুনি প্রভৃতি নানা ধরনের থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করে। এত অত্যাচারের পরেও পানীয় জল, আলো, ঘোরাফেরার অধিকার এসব থেকেও বন্দীদের বঞ্চিত রাখা হয়। তখন কিছু বন্দী জেলের মধ্যেই অনশন শুরু করে। অবশেষে ১২ দিন অনশনে যখন তাদের শারীরিক অবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে তখন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, নাজিমুদ্দিন সাহেব, মুজফ্ফর আহম্মদ বন্দীদের কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে অনশন ভঙ্গ করতে অনুরোধ করলে তাঁরা অনশন ভঙ্গ করেন। সাধারণ গ্রামবাসীর ওপরও পুলিশ জঘন্য অত্যাচার চালায়। বর্ধমান জেলায় ক্যানেলকর সংক্রান্ত আইন-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে অভিযুক্ত প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার বন্দীর ওপর সরকারী অত্যাচার বর্বরতার নীচতম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। স্ত্রীলোকের সম্ভ্রমহানি, জনতার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ, জেলখানার অভ্যন্তরে থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ—যত রকম বর্বরতা আছে উইলিংডন আমলের ব্রিটিশ সরকার তার কিছু বাকী রাখে নাই। সব কিছু মিলিয়ে ব্রিটিশ সরকারের মানবতাবোধ গান্ধীজীকে নিরাশ করে। সেনাপতির দায়িত্বই হল পরিস্থিতি বিবেচনায় পশ্চাদপসরণ করে নিজ বাহিনীকে রক্ষা করা। মনে হয় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দায়িত্ববোধই তাঁকে আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ করতে বাধ্য করেছিল। তাছাড়া ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে বিহারে প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হলে সকলের দৃষ্টি সে দিকে পড়ে আর আইন অমান্য আন্দোলন আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যায়।

বর্ধমানে কিন্তু ক্যানেলকর সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে আইন অমান্যের পরেও আইন অমান্য হয়েছিল। সেটা বাংলার লীগ মন্ত্রিসভার একটা সাম্প্রদায়িক আইন ও তার প্রয়োগের বিরুদ্ধে। ১৯৩৮ সালের ঘটনা—সে সময় ফজলুল হকের লীগ মন্ত্রীসভা আইন প্রণয়ন করে—কোন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করে ও বাদ্যভাণ্ড সহকারে প্রকাশ্যে নিরঞ্জন করতে দেওয়া হবে না। তখন প্রায় সকল প্রতিমাই কৃষ্ণসায়র, শ্যামসায়র ও রানীসায়র প্রভৃতি পুষ্করিণীতেই বিসর্জন দেওয়া হত। লীগ সরকারের তোঘলকী আইনের ফলে সে বছর বেশ কয়েকটা দুর্গাপ্রতিমা দীর্ঘদিন বিনা অর্চনায় রাজবাড়ীর পশ্চিমে বোরহাট যাবার পথের ধারে ভেরিখানা মসজিদের কাছে পড়ে থাকে। প'রে অবশ্য পুলিশের সতর্ক প্রহরায় প্রতিটি প্রতিমার নিরঞ্জন সম্পন্ন হয়। বর্ধমানের প্রায় প্রতিটি রাস্তার ধারে মসজিদ আছে। কাজেই কোন রাস্তা দিয়ে আর শোভাযাত্রা করে বাজনা বাজিয়ে নিরঞ্জন করা যায় না। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সত্ত্বায় আঘাত হানায় লীগ সরকারের এই অপচেষ্টাকে প্রতিরোধ করার জন্য হিন্দু মহাসভার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সরকারের কাছে অনেক আবেদন করেন। এমন কি কোন মসজিদ বা দরগার এক শত গজের মধ্যে বাজনা না বাজিয়ে নীরবে প্রতিমাসহ শোভাযাত্রা নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা ব্যর্থ হয়। ফলে বর্ধমান তথা সারা বাংলার হিন্দুসমাজ ক্ষোভে অপমানে ফেটে পড়েন।

ইতিমধ্যে বর্ধমানে খোসবাগানের রাজরাজেশ্বর শিবতলার কালীপূজা এসে পড়ে। কাজেই ঐ প্রতিমার নিরঞ্জনের কথা ও চিন্তা পূজার উদ্যোক্তাদের মাথায় আসে। তখন বর্ধমানের কয়েকজন প্রবীণ ব্যবহারজীবী এবং কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন—এঁদের মধ্যে ছিলেন গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বলাই মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার মিত্র (হিন্দুমহাসভার সভাপতি), রাজকৃষ্ণ দত্ত, প্রণবকুমার সরকার, তারাপদ পাল, প্রাণদা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বৈঠকে স্থির হয় এঁরা কোন একটি প্রতিমা নিয়ে আইন অমান্য করে নিরঞ্জন সমাপন করবেন। ফল যাহা হয় হবে। কোন বাটির পূজার প্রতিমা নিয়ে আইন অমান্য করলে গৃহস্বামীকে আইন অমান্যের দায়ে আসামী করা হবে। সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। আর তখন এখনকার মত সর্বজনীন পূজার রেওয়াজ ছিল না। তখন খোসবাগানের যতীন্দ্রনাথ বিষ্ণু (পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ দলিল লেখক) বাগ্‌দিপাড়ার রাজরাজেশ্বর শিবতলার কালী প্রতিমার কথা বলেন। কারণ এ পূজা কোন একক গৃহস্থেরও ছিল না আবার সর্বজনীনও নয়। ঐ স্থানটি তখন বাগ্‌দীপাড়া নামে খ্যাত। ঐ পাড়ারও স্থানীয়

কয়েকজন ব্যক্তি যেমন গৌরীঠাকুর, নরেনঠাকুর, অবিনাশ মাঝি, সনাতন মাঝি ও দুঃখীরাম পরামাণিক এঁরাই উদ্যোগী হয়ে স্থানীয় মানুষের কাছে দু আনা, চার আনা চাঁদা তুলে পূজা আনতেন।

১৩৪৫ সালে ৩০শে কার্তিক রাত্রি ৮ টার সময় উপরিউক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও যুবকগণ খোসবাগান পাড়ার কিশোর তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের মাথায় চাপিয়ে দেবীমূর্তিসহ শহর পরিক্রমায় বের হন। তখন ব্রিটিশ শাসনে লীগ মন্ত্রীসভার একদলীয় সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নেতৃবৃন্দের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সমগ্র হিন্দু সমাজের মনে আশা জাগায়। তখন বর্ধমান থানার অফিসার ছিলেন মহম্মদ বাবর আলি। তিনি সম্ভবত একটা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আশঙ্কায় কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে শোভাযাত্রা নিয়ে বিসর্জন সমাপন করতে দেন, কিন্তু বিসর্জনের পরই তিনি পূজার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে তিনকড়িকেও গ্রেপ্তার করে, এদের নামে ফৌজদারী মামলা রুজু করেন। বর্ধমান আদালতে আইন অমান্য ও অন্যান্য অপরাধে যুবকদের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে বর্ধমান বারের ব্যবহারজীবীমহল উচ্চ আদালতে আপীল করেন ও তৎকালীন ব্যারিষ্টারমহল বিনা পারিশ্রমিকে এদের সসম্মানে মুক্ত করেন ও তৎসঙ্গে শোভাযাত্রার আইনসঙ্গত অধিকারও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই কারণে খোসবাগানেব বাগ্‌দী পাড়ার (বর্তমানে অভিজাত ডাক্তারপাড়া) রাজরাজেশ্বর তলার কালীমা ফৌজদারী কালীরূপে সর্বজনবিদিতা। সেই তিনকড়ির মাথায় করে শোভাযাত্রার ট্যাডিশন আজও চলে আসছে। ফৌজদারী কালী মা আজ এক ইতিহাস। [এই তথ্যটি পাওয়া গেছে সমকালীন শারদীয়া শিউলি পত্রিকায় অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এর "শ্রীশ্রী ফৌজদারী কালীমাতা" প্রবন্ধ ও পূজার উদ্যোক্তাদের প্রকাশিত সুভ্যেনীর-এ প্রকাশিত শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য মহাশয় রচিত "শ্রীশ্রী ফৌজদারী কালীমাতা নামকরণ ও ইতিবৃত্ত" (স্মৃতিচারণা) প্রবন্ধ থেকে। প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার সহকর্মী ভ্রাতৃপ্রতিম সত্য ভট্টাচার্য]।

মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের ধারা ও ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের কেন্দ্রীয় আইনসভাভবনে ইন্‌কিলাব্ জিন্দাবাদ্ ধ্বনির Tradition আজও সমান ভাবে চলে আসছে। যে কোন বামপন্থী আন্দোলনের স্লোগানের মূলমন্ত্রই 'ইন্‌কিলাব্ জিন্দাবাদ্'। আর আইন অমান্য তো আজ জলভাত। যে কোন দাবী আদায়ের আন্দোলনে যে কোন দল আইন অমান্য করলেই হল—তবে তার ধার কমে গেছে। এখন আইন অমান্য মানে পথরোধ, রেলপথরোধ, প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের অফিসে ঢুকে ভাঙচুর ইত্যাদি।

এর পরবর্তী আন্দোলন ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন। ১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার ভারতের সহযোগিতা চায়। কংগ্রেস শর্ত হিসেবে যুদ্ধচলাকালীন একটি অস্থায়ী সরকার ও যুদ্ধ শেষে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে। ভারত সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় কংগ্রেসের মধ্যে এক সংকট দেখা দেয়। কিন্তু 'আগষ্ট প্রস্তাব' ঘোষণার দ্বারা সরকার জানায় যুদ্ধের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে শাসনতান্ত্রিক কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়, যুদ্ধ শেষে এক প্রতিনিধিসভার ওপর সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাপানের সাফল্য ও রেঙ্গুন পর্যন্ত অগ্রগতি ব্রিটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তোলে। ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকার স্যার স্ট্র্যাফোর্ড ক্রীপসকে দৌত্যে পাঠায়। ক্রীপস প্রস্তাবে ভারতকে Dominion Status দানেব প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া পূর্ণ স্বাধীনতা দানের বা পাকিস্তান সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না থাকায় কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। গান্ধীজী ক্রীপস প্রস্তাবকে A post dated cheque on a crushing Bank বলে প্রত্যাখ্যান করেন ও ইংরেজকে ভারত ছাড়ার পরামর্শ দেন। এরপর তিনি "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের ডাক দেন; ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাব সমর্থন করে। বিখ্যাত ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী, নেহরু ও অন্যান্য নেতারা গ্রেপ্তার হন। নেতৃত্ববিহীন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সারা ভারত উত্তাল হয়ে ওঠে।

বর্ধমানও এই উত্তাল আন্দোলনের সামিল হয়। ৯ই আগষ্ট গান্ধীজী আগষ্ট আন্দোলনের ডাক দেন আর ১৭ই আগষ্ট বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল কোর্ট প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। সর্বত্র পিকেটিং শুরু হয়ে যায়। পুলিশ প্রচণ্ডভাবে মিছিলের ওপর লাঠি চার্জ করে। সমস্ত নেতার মুক্তির দাবীতে ১৩ই সেপ্টেম্বর সারা জেলায় হরতাল পালিত হয়। নেতৃত্ববিহীন আন্দোলন আর অহিংস রইলো না। চারিদিকে ইলেকট্রিক ও টেলিফোনের তার কেটে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হয়। রেললাইন তুলে দেওয়া হয়, থানা, পোস্ট অফিস, রেল স্টেশন পোড়ানো শুরু হয়ে যায়। জামালপুর, খণ্ডঘোষ, সাদিপুর, বেড়ুগ্রামের পোস্ট অফিসে আগুন লাগানো হয়। খানা জংশন থেকে গলসী ও খানা জংশন থেকে ভেদিয়া পর্যন্ত রেললাইন তুলে দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ করা হয়। ছাত্রজীবন শেষ করে মণ্ডলগ্রামের তরুণ নেতা নারায়ণ চৌধুরী স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমি তখন রাজ কলেজের ছাত্র—প্রতিদিন কলেজে যাই আর ১০ টা না

বাজতে বাজতেই বিপ্লবী উকিল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় শ্যামসায়রের পাড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা আরম্ভ করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রনেতা সনৎ গাঙ্গুলী, বলাই রায়, প্রশান্ত গাঙ্গুলী কলেজ থেকে ছেলেদের একত্রিত করে (অন্যান্য স্কুল থেকেও ছেলে বার করে) বিরাট মিছিল নিয়ে নেতৃবর্গ শহর পরিক্রমা করে কোর্ট প্রাঙ্গণে হাজির হতো। সেখানে নেতারা আন্দোলনের স্বপক্ষে জোরালো বক্তৃতা দিতেন, তারপর আমরা যে যার বাড়ী ফিরে যেতাম। বিজয় ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রামে গ্রামে ঘুরে আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত জাগ্রত করেন। আন্দোলন যখন জোর কদমে চলছে তখন পুলিশ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ দাস হাজরা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ভরত গাঙ্গুলী, অসীম ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে। অনেকের মতে দাশরথি তা-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে মেদিনীপুরের মত জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। কিন্তু এর সমর্থনে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। দাশরথি স্মরণ-সংখ্যা ত্রৈমাসিক লোকভারতী পত্রিকার মাঘ-চৈত্র ১৩৫৭ সংখ্যায় দাশরথিবাবুর ভাই দুর্গেশ তা যে প্রতিবেদন লিখেছেন তাতেও এই জাতীয় সরকার-এর কোন উল্লেখ নাই। তবে দাশরথিবাবু যে অভিনব ভূমিকা নিয়ে আন্দোলনকে ঐ অঞ্চলে ব্যাপকতর করে তুলেছিলেন তার পরিচয় দুর্গেশ তা-র প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। "বিয়াল্লিশের বিপ্লবে দাদার ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেখানে রণকৌশল ছিল ভিন্ন। শক্তিগড় স্টেশনে বহু হিন্দুস্তানীর নামে বস্তা বস্তা পার্শেল আসত। সেগুলি জমা হত শশিভূষণ দাঁ (ওরফে বাদল দাঁ)-এর কাছে। তারপর বড়শুল ও শক্তিগড় মোড়ে আনগুনো গ্রামের গুরুপদ প্রামাণিকের মিষ্টান্নের দোকানে সেগুলি জমা হত। গভীর রাত্রে তিনকড়ি সর্দার (চৌকিদার) তার গাড়ীতে করে প্রসাদ সামন্ত, দুর্গা গুহ, দুর্গেশ তা মালগুলি নদী পার করে শিয়ালী গ্রামে সুরেনের বাড়ীতে রেখে আসত। পরে ঐ সব জিনিস দাদার (দাশরথিবাবু) নির্দেশে কর্মী সংগ্রহ করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিলি করা হতো। তাদের প্রত্যেকের ছদ্মনাম ও নম্বর দেওয়া থাকতো। অনুরূপ নম্বর দেখলেই জিনিসপত্রের ব্যবস্থা হত। তারপর চলত নির্দেশ অনুযায়ী অ্যাকশন। বলা বাহুল্য বস্তুগুলি ছিল বোমা ও অগ্নিসংযোগের মালপত্র। ডাকঘর, গাঁজা আফিমের এবং মদের দোকান ও বিলাতী কাপড় পোড়াবার নির্দেশ থাকত।" এই প্রতিবেদন থেকে দাশরথি তা-র বিপ্লবী কার্যের একটা আভাস পাওয়া যাবে। কালনায় ৪২-এর আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের কংগ্রেসকর্মী গুপ্ত বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে এক যোগে পোস্ট অফিস, স্টেশন, আদালত ভবন প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে আগুন লাগাতে শুরু

করে। পুলিশ ও সরকারী প্রশাসন নির্মমভাবে আন্দোলনকারীদের ওপর অত্যাচার চালাতে থাকে ও এইভাবে আন্দোলন দমন করে। সরকারী সম্পত্তি ক্ষতি করার অপরাধে গোপেন কুণ্ডু, অন্নদা মণ্ডল, শিবপ্রসাদ পাণ্ডে, বিশ্বনাথ সাহা, সিদ্ধেশ্বর দাস, কানাই দে প্রমুখ ১৪ জন যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে বর্ধমানে চালান দেয়। এর পরেও সরকারী সম্পত্তি ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সরকার শহরের বাসিন্দাদের ওপর ৩৫০০০ টাকা পিটুনিকর জরিমানা ধার্য করে ও নির্মমভাবে ঐ টাকা আদায় করে।

ইতিমধ্যে ১৯৩৮–৪০ খ্রীষ্টাব্দে কালনায় আবদুস সাত্তার, পূর্বস্থলীতে বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, মন্তেশ্বরে গোপেন কুণ্ডু, নারায়ণ চৌধুরী ও আবদুর রহমানের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সংগঠন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের মহিলা, কৃষক ও শ্রমিক শাখাগুলিও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলে। কালনার সুচরিতা পাল ও পূর্বস্থলীর রমাদেবীর নেতৃত্বে মহিলা সংগঠন শক্তিশালী হয়।

কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভোগ ছাড়াও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধিতা "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল। রমাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর "বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন" প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন "প্রধানত তাত্ত্বিক কারণে তাঁরা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নাই।"

বোম্বাইতে ১৯৪৩-এর ২৩শে মে সিপিআই-এর প্রথম কংগ্রেসে বোসের দল (সুভাষ বোস) ফরওয়ার্ড ব্লককে বিশ্বাসঘাতক বলে প্রস্তাব নেওয়া হয়। এদের পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রধানত পড়েছিল সুভাষ ও জয়প্রকাশ নারায়ণের ওপর। গান্ধীজীও বাদ যান নাই। ১৯৪২-এর আগেই তাঁকে "The leader of the bourgeoise" বলা হয়েছে, তাঁর non-cooperation নীতিকে দেউলিয়া ও non-violent suicide বলা হয়েছে। দ্য পিপলস ওয়ার পত্রিকার ১৯৪২-এর ১১ই অক্টোবরের সংখ্যায় বলা হয়—নাশক ও সত্যাগ্রহীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—দেউলিয়া নীতি।

আরেকটা আক্রমণ জি. অধিকারীর থিসিসে পাকিস্তান দাবীর সমর্থনে। পাকিস্তান দাবী সমর্থন করে কম্যুনিস্ট পার্টি সরকারের হাতই শক্ত করে। [ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস (১৯০৮–৪৭) অমলেশ ত্রিপাঠী।] রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—কম্যুনিস্টরা '৪২-এর আন্দোলনে যোগও দেয় নাই, মদতও দেয় নাই।

ডঃ ত্রিপাঠী আরও বলেছেন—পাকিস্তান ব্যাপারে অধিকারী থিসিস ভ্রান্ত ছিল। ই.এম.এস নাম্বুদ্রিপাদ তাঁর "রেমিনিসেন্স অব্ অ্যান ইন্ডিয়ান কম্যুনিস্ট"

পুস্তকে এই ভুল স্বীকার করেছেন—"The essence of mistake committed by the party was that, as opposed to this Marxist-Leninist stand that the question of nationalities should be dealt with not abstractly but as a part of the class political question (Indian's freedom struggle in this case) the CPI failed to take due account of the real class and national situation in the country. Equating the league demand for the division of India with the congress opposition to it, meant putting on par an avowedly pro-imperialist section of the bourgeoisie with its oppositional though compromising, rival in the same class...।"

কমরেড নাম্বুদ্রিপাদ-এর 'স্বাধীনতা ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি' পুস্তিকায় "কিছু ভুল ত্রুটি" অধ্যায়েও বলেছেন, "কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। আর আমাদের মনে হয়েছিল ব্রিটেনসহ ফ্যাসিবিরোধী বিশ্বশক্তি মানবসভ্যতার জঘন্যতম শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে। এই অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে বাধা দিলে আমাদের নিজেদেরই মারাত্মক ক্ষতি হবে। তবে এই সঠিক অবস্থান নিয়েও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে "ফ্যাসিবাদীদের সহচর" বলে চিহ্নিত করা আমাদের দিক থেকে গুরুতর ভুল হয়েছিল। ফলে সাময়িকভাবে আমরা ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম।" ('গণশক্তি', ২৩শে অক্টোবর ১৯৯৭)

কম্যুনিস্ট পার্টি ৪২-এর আন্দোলনে যোগ না দিয়ে ঠিক করেছিল, কি ভুল করেছিল এই সব তাত্ত্বিক প্রশ্নে না গিয়ে আমার সাধারণ বুদ্ধিতে বলে কম্যুনিস্ট, লীগ ও অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দল যদি যৌথভাবে মিলিত হয়ে গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দিত তাহলে আন্দোলন খুবই শক্তিশালী হতো ও সারা দেশ জুড়ে বিপ্লবের আগুন জ্বলতো। ফলে ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ হয়ত ত্বরান্বিত হতো। তার পর প্রতিটি পার্টি তাদের আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী ঘর গোছাতে পারতো। হিন্দু মহাসভা ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে Working Committee-তে মন্তব্য করেছেন—The Peril confronting India, demands the mobilisation of India's tremendious manpower...which can never be secured withount a National Govt." (Nalanda year book 1947-48 p. 242)

১৯৪০ সালে বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের নির্বাচন হয়। এই সময় কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠী ন্যাশান্যাল ফ্রন্ট গঠন করে। এই ফ্রন্ট বামপন্থীদের নিয়ে গঠিত হয়।

এরাই কংগ্রেসের ভিতর থেকে কম্যুনিস্ট আদর্শ গোপনে প্রচার করতে থাকে ও কংগ্রেস কমিটি দখল করার চেষ্টা করে। তারই ফলে জেলা কংগ্রেসের কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে বামপন্থীদের দখলে চলে যায়। এই নির্বাচনে ফকির রায় সভাপতি ও শিবশঙ্কর চৌধুরী সম্পাদক হন। কিছুদিনের ব্যবধানে আবার জেলা কংগ্রেসের ভার যাদব পাঁজা ও বিজয় ভট্টাচার্য এই দক্ষিণপন্থীদের হাতে ন্যস্ত হয়। এই সময় জেলা কংগ্রেস কমিটি নতুন করে গঠিত হলে কম্যুনিস্টরা কংগ্রেস ত্যাগ করে। এখানকার নির্বাচনে যাদব পাঁজা সভাপতি ও আবদুস সাত্তার সম্পাদক হন। বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সরোজ মুখোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর চৌধুরী প্রমুখ বামপন্থী নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

এই সময়ে ১৯৪৩ সালে জেলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখা দেয়। জেলায় ও মহকুমাগুলিতে দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার জন্য ফুড কমিটি গঠিত হয়। বর্ধমানে যে ফুড কমিটি গঠিত হয় তার সম্পাদক ছিলেন ভুজঙ্গ সেন। সদর মহকুমার ফুড্ কমিটির সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ। নাদনঘাটে কালনা মহকুমার খাদ্য সম্মেলন হয়। এর সংগঠক ছিলেন হরগোবিন্দ রেজ। কুসুমগ্রামের আবদুল হাসানাৎ, কাটোয়ায় করোজ গ্রামে মুশা মিঞার উদ্যোগে খাদ্য সম্মেলন হয়। কিন্তু খাদ্য সম্মেলন বা ফুড কমিটি করে যে সুরাহা হয়েছিল তা বলা যায় না। গ্রামে গ্রামে খাদ্যের জন্য হাহাকার। আগের বছর থেকে ভাল ফসল হয় নাই। ১৯৪৩ সালে যে ধান হয় সব পোকায় নষ্ট করে। যে সামান্য পাওয়া যায় তার স্বাদও তিক্ত। ১৯৪১ সালে বোশেখ মাসে ধান বিক্রয় হয়েছিল দু টাকা নয় আনায় দেড় মন। আষাঢ় মাস থেকে ধানের দর হু হু করে বাড়তে থাকে। কুড়ি টাকা বস্তা (দেড় মন) দাঁড়ায়। তাও যে ধান মজুত থাকে মিলিটারীর জন্য সরকার উচ্চ দর দিয়ে কিনে নেয়। আরও দর বাড়ার আশায় ব্যবসাদাররা মজুত করতে থাকে। কালো বাজারীর সৃষ্টি হয়। গ্রামে ওল কচু গাছ সব নির্মূল হয়ে যায়। এই খেয়েই লোকে কোন মতে বেঁচে থাকার প্রয়াস পায়। দলে দলে লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে এক মুঠো ভাতের আশায় ভিড় করতে থাকে; শেষে ভাত তো দূরের কথা, এক ভাঁড় ফেনের জন্য দরজায় দরজায় ধর্ণা দেয়। কোন উৎসবের বাড়ী থেকে ফেলে দেওয়ায় উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে লোকে পেট ভরাবার চেষ্টা করে। বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকে এর মর্মন্তুদ বর্ণনায় বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। আটা চিনি অমিল, দোকানে দোকানে গুড়ের চা, আটার বদলে বিড়ি কলাই ও ভুট্টার মিশ্রণ। অথচ যাদের পয়সা ছিল তাদের কোন অভাব ছিল না। চতুর্গুণ আটগুণ দাম দিলে চোরা বাজারে অঢেল মাল।

এর ওপর ১৯৪৩ সালের দামোদরের বিধ্বংসী বন্যায় শক্তিগড়ের কাছে রেললাইন ও জি. টি. রোড ভেঙে যায়। দামোদরের প্রবাহ বাঁকা ধরে দুই তীরের গ্রাম প্লাবিত করে। শক্তিগড়, বড়শুলের বিস্তীর্ণ এলাকা বানেব জলের বালিতে ভরে যায়, দীর্ঘদিন চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে থাকে। বন্যাত্রাণে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কংগ্রেস যৌথভাবে ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মন্বন্তরের রিলিফ, মজুতদারি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে এই যৌথ আন্দোলন জোরদার হয়। দুর্ভিক্ষে ও বন্যায় সাম্যবাদী কর্মীদের অক্লান্ত সেবাব্রত তাঁদের দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। তবে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ায় বর্ধমান জেলায় ৪২-এব আন্দোলন সুসংগঠিত ভাবে গড়ে ওঠে নাই। বন্যা ও মন্বন্তর এর ত্রাণকার্যের সেবাব্রতের ফলেও '৪২-এর আন্দোলনেও ভাটা পরে। বিচ্ছিন্নভাবে এখানে ওখানে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চলে। সারা ভারতেও নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ায় তাদের অনুপস্থিতিতে ও যোগ্য সংগঠনের অভাবে সবচেয়ে বড় কথা জাতীয় বিপ্লবের জন্য পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচীর অভাবে আগষ্ট আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয। তবে গণআন্দোলন ও সন্ত্রাসের ব্যাপকতা দেখে ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে ভারতে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। ভারতকে আর বেশী দিন পবাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা যাবে না। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। তবে বর্ধমান জেলায় যে গণচেতনা জাগ্রত হয তার ফলে ১৯৪৭ স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত জেলায় রাজনৈতিক আন্দোলন বিভিন্ন আকারেই চলতেই থাকে।

রমাকান্ত চৌধুরী বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন "বর্ধমান জেলায় কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে মত বিরোধ প্রবল হলেও, দক্ষিণপন্থা ও বামপন্থার বৈপরীত্য থাকলেও, সমস্ত ব্যাপক আন্দোলনেও একটি সময় পর্যন্ত বিভিন্ন নির্বাচনে তাঁরা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এক সঙ্গে লড়াই করেছেন। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এর জন্যই বর্ধমান জেলায় সাম্প্রদায়িকতা কখনই প্রবল হয়ে উঠতে পারে নাই।" সাপ্তাহিক "জনযুদ্ধ" পত্রিকার ১৯৪২-এর বিভিন্ন সংখ্যায় যে সমস্ত সংবাদ পরিবেশিত হয় তাতেও এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সুর ধ্বনিত হয়।

ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সম্মেলনে, বকেয়া ক্যানেলকর আদায়ের সার্টিফিকেট জারী যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখার দাবীতে, আপোষের পথে আমলাতান্ত্রিক বাধা দূর করার দাবীতে, বন্যাত্রাণে সাহায্যে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, বার এ্যাসোসিয়েশান সকলেই হাত মিলিয়েছেন।

তবে একথা ঠিক সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হয়ে না উঠলেও জেলার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। অবশ্য সমস্ত দলের যৌথ প্রচেষ্টায়, পুলিশী ও সরকারী হস্তক্ষেপে তা খুব ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করতে পারে নাই।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : "বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ" গ্রন্থে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ সাহেব বনপাশ স্টেশনের কাছে বেলগ্রামে (আউসগ্রাম থানা) স্থানীয় মসজিদের সামনের রাস্তা দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার উপক্রম হওয়ার কথার উল্লেখ করেছেন। পুলিশ ও শাহেদুল্লাহ সাহেবের হস্তক্ষেপে তার একটা সুষ্ঠু সমাধান হয়। ১৯৩৮ সালে সমকালীন লীগ মন্ত্রীসভার মসজিদ, দরগার পাশ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে দেবদেবীর মূর্তি শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করে একটা আইন জারি করলে বর্ধমান শহরে বোরহাটের রাস্তার ধারে ভেরীখানার পাশ দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা, কালীপ্রতিমা নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হয়েছিল। বার এসোসিয়েশন, সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন কয়েকজন নেতা ও পুলিশি প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ও মহামান্য উচ্চ আদালতের রায়ের ফলে দাঙ্গা ঘটতে পারে নাই। খোসবাগানের ফৌজদারী কালীর জলজ্যান্ত উদাহরণের ঘটনা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া আলমগঞ্জের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও নেতা রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের জায়গার ওপর রাস্তা দিয়ে মহরমের তাজিয়া নিয়ে যাওয়া যেভাবে বন্ধ করা হয়েছিল তাতে ইসলামধর্মে আঘাত দেওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল; কিন্তু তদানীন্তন জেলাশাসকের দ্রুত হস্তক্ষেপে তার একটা মীমাংসা হয়ে যায়। ১৯৪২ সালের মে মাসে জেলার পলাসন, গয়েশপুর, মণ্ডলগ্রাম অঞ্চলে মণ্ডলগ্রামের হাটতলার মেলায় একজন মুসলমান মিষ্টান্ন বিক্রেতার মিষ্টান্ন বিক্রিকে কেন্দ্র করে সমগ্র অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায় বেধে এসেছিল। একটা অগ্নিগর্ভ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। শাহেদুল্লাহ্ সাহেব, বিজয় ভট্টাচার্য, হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর চৌধুরী (কালো দা), রশিদ সাহেব, হিন্দু মহাসভার শ্রীকুমার মিত্র, মুসলিম লীগের সভাপতি আবুল হাসেম, প্রণবেশ্বর সরকার (টোগো সরকার), মোড়ল গাঁয়ের ময়না চৌধুরী, পুলিশ ইন্সপেক্টার অমরবাবু, ডিএসপি বঙ্কিমবাবু এঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় একটা ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে এ অঞ্চল রক্ষা পায়। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের পর ইতিহাসের গতি দ্রুত এগিয়ে চলে। ১৯৪৫-এর মার্চ মাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতের উপকণ্ঠে কোহিমাতে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন, কলকাতার

হাতিবাগানে জাপানী বোমা ফেলা—দলে দলে লোকের কলকাতা থেকে পলায়ন—লর্ড ওয়াভেলের সিমলা কনফারেন্স—ওয়াভেলের পরিকল্পনা ঘোষণা—১৯৪৬ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারী নৌবিদ্রোহ—এইসব ঘটনা দ্রুত এগিয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নৌবিদ্রোহে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মেড়ালের বাদল দত্ত। এই নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি কর্মচ্যুত হন। পরিস্থিতি যখনই খারাপের দিকে গেছে তখনই ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর সঙ্গে একটা মীমাংসার চেষ্টা করেছে। জাপানের আক্রমণে রেঙ্গুনের পতনের অব্যবহিত পরে যেমন ব্রিটিশ সরকার ভারতের নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর একটা মীমাংসায় আসার উদ্দেশ্যে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভাবতে পাঠিয়েছিলেন তেমনি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়াবি নৌ-বিদ্রোহ দেখা দিলে পরদিন অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লীমেন্ট এটলী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পন্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ক্যাবিনেট পর্যায়ের তিনজন মন্ত্রীকে প্রেরণ করেন। মহম্মদ আলি জিন্না ও মুসলিম লীগের বিরোধিতায় ক্যাবিনেট মিশনের কাছে কোন ঐক্যবদ্ধ দাবী উপস্থাপিত করা সম্ভব হল না। ক্যাবিনেট মিশন শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় একটা যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনামাফিক তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ক্যাবিনেট মিশনের ঘোষণায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের পরিকল্পনা কংগ্রেসনীতির বিরোধী হওয়ায় তাঁদেরও মনঃপূত হল না। কংগ্রেস সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে গঠিত গণপরিষদে যোগদানে সম্মতি জ্ঞাপন করে। তবে এ ঘোষণায় পাকিস্তান গঠনের সম্ভাবনায় লীগ উল্লসিত হয়। ওয়াভেলের সরকার গঠনের প্রস্তাবে কংগ্রেস যোগ না দেওয়ায় পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ফলে মুসলীম লীগ আশাহত হয়ে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক দেয়।

১৯৪৬ সালে বাংলার আইনসভার নির্বাচন হয়। বর্ধমান জেলার সাধারণ আসন ছিল চার। বর্ধমান সেন্ট্রাল দুই ও বর্ধমান উত্তর-পশ্চিম দুই; মুসলমান-১, জমিদার-১। বর্ধমান সেন্ট্রালে জিতলেন কংগ্রেসের কানাইলাল দাস ও যাদবেন্দ্র পাঁজা, উত্তর পশ্চিমে বঙ্কুবিহারী মণ্ডল ও আনন্দপ্রসাদ মণ্ডল; মুসলমান আসনে মুসলিম লীগের আবুল হাসেম ও জমিদার আসনে উদয়চাঁদ মহতাব্। আইন সভায় কোন দলই সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় নাই। আইনসভার মোট আসন ২৫০, এর মধ্যে মুসলিম লীগ ১১৩, ফজলুল হকের Bengal Nationalist Muslim Parliamentary Party ৭৮টি আসনে লড়ে পেল ৫টি, তার মধ্যে হক সাহেব স্বয়ং দুটিতে জেতেন, কংগ্রেস পেল ৮৬, সিপিআই ৩, হিন্দু মহাসভা ১, স্বতন্ত্র

মুসলমান ১, স্বতন্ত্র হিন্দু ১৩ ও বাকী অন্যান্য। সুরাবর্দী কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চাইলে, হাইকম্যান্ড আপত্তি জানান। ফলে সুরাবর্দী উগ্র সাম্প্রদায়িক শিবিরে যোগ দেন। তিনি নবলব্ধ পৃষ্ঠপোষক জিন্নার ডাকে সাড়া দিয়ে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করেছিলেন। ১৬ই আগষ্ট সুরাবর্দী যে দৈত্য কলকাতার বুকে ছেড়ে দিলেন জিন্না বা সুরাবর্দী কারও পক্ষে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হল না। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে শাহেদুল্লাহ্ সাহেব, কালোদা, বিনয় বসু ও কংগ্রেসের আবদুস সাত্তার, যাদব পাঁজা, বিজয় ভট্টাচার্য সকলে একযোগে বর্ধমান শহর ও জেলার অন্যান্য স্থানে ঘুরে পরিস্থিতি শান্ত রাখলেন। কিন্তু যে সব গ্রামে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে কিন্তু গোপনে মসজিদে, লীগের মাতব্বরদের নেতারা বাইরে থেকে এসে নানা ভাবে উত্তেজনা ছড়াবার চেষ্টা যে করেননি তা নয়। ভাতার থানার হরিবাটী, ঘোলদা, মোহনপুর, আউসগ্রাম থানার কয়রাপুর, ভোঁতা, সদর থানার সিমডাল, আলমপুর। এছাড়াও, এড়্যাচা, খারজুলি, খুর্তুবা, বড়দীঘি, ক্ষেতিয়া, কাশেমনগর, চক্ষনজাদী, শেখপুর, বিজুর, মঙ্গলকোট প্রভৃতি অনেক গ্রামের সংবাদ সংগ্রহ করে দেখেছিলাম লীগের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, কিছু সমাজবিরোধী লোক গ্রামের কিছু মাতব্বরদের নিয়ে গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করেছিল। ফলে গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা ছিল। আবার কোথাও কোথাও গুজবকে কেন্দ্র করেও দাঙ্গা বাধাবার উপক্রম হয়েছিল। ভাতার থানার হরিবাটী গ্রামে ঠিক এই রকম অবস্থা দাঁড়ায়। আমি তখন বনপাশ শিক্ষা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক। হঠাৎ এক রাত্রে চারদিক থেকে শাঁখ ঘন্টা বেজে উঠলো—বাইরে বের হয়ে খবর নিয়ে যা শুনলাম তাতে 'পিলে চমকানিয়া' অবস্থা। সোঁচালিদা, বিঘড়া, নারায়ণপুর থেকে হিন্দুর দল ঘোলদার মুসলমান পাড়া জ্বালিয়ে হরিবাটী-র দিকে আসছে—এর পর মোহনপুর ও কয়রাপুর আক্রমণ করবে। হরিবাটী গ্রামে তখন মাত্র ঘর চল্লিশেক মুসলমানের বাস। তারা সব ঘরবাড়ী ছেড়ে ধানক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছে। আমিও গ্রামের কয়েকজনকে নিয়ে কামার পাড়ার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ভবানী রায় ও কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে গ্রামের উত্তর সীমানায় উত্তর সায়র পুষ্করিণীর পাড়ে অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখি কোথাও কিছু নাই। সবটাই গুজব। গ্রামে ফিরে মুসলমান পাড়ায় গিয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করে ফিরিয়ে আনি। পরে মুসলমান পাড়ার নেতা ভুলন মুন্সী, আকবর ওস্তাদ, ভবানী রায়, আমি, সুধীর চক্রবর্তী, পশুপতি সেন সবে মিলে শান্তি কমিটি গঠন করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করি। ফলে আর কোন অঘটন ঘটে নাই।

আমার মনে হয় দাঙ্গার উস্কানি দেয় কিছু রাজনৈতিক নেতা, নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য, আর তাদের হাতিয়ার হয় কিছু সমাজবিরোধী, কিছু কিছু দরিদ্র যাদের হারাবার কিছু নেই আর কিছু নারীলোলুপ পশু—এরা কিছু লুটপাট করে, নারীহরণ করে নিজেদের আখের গোছাবার চেষ্টা করে। আর এই ফ্রাঙ্কেস্টাইন-এর দৈত্য ছেড়ে দিলে আর তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। হিংসা-প্রতিহিংসার আগুনে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কাজেই কলকাতাতে যেটা সম্ভব হয়েছিল বর্ধমান জেলার মফস্বল শহরে বা পল্লীগ্রামে সেটা সম্ভব হয় নাই। তাছাড়া পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা ছিল সংখ্যা লঘিষ্ঠ, তবে হিন্দুদের মধ্যে অনেকের জোত জমা বেশী ছিল। কাজেই সেখানকার মুসলমানদের যাদেব বেশীর ভাগই দরিদ্র ও হিন্দু জোতদারদের দ্বারা উৎপীড়িত তাদেরকে বোঝান হযেছিল হিন্দুদের তাড়াতে পারলে তাদের সম্পত্তি সবই তারা ভাগ করে নিতে পারবে। কিন্তু এখানে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী, তাদেরকে তাড়াবার কোন প্রশ্নই ছিল না। তাছাড়া দাঙ্গা বাধায় নেতারা; সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ এ সবের কোন ধাব ধারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
*** *** ***
রাজছত্র ভেঙ্গে পড়ে,
রণ ডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি
ওরা কাজ করে...

আর এ জেলার সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ সকলেই প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী শান্তিকামী। মুসলিম লীগের কিছু নেতা অবশ্য উগ্রপন্থী ছিলেন কিন্তু তাঁদের সংখ্যা জেলায় খুবই কম। প্রভাবও বিশেষ ছিল না। কাজেই এ জেলায় জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবসের ডাক বিশেষ কার্যকরী হয় নাই।

এর পরে বড়লাট ওয়াভেল কংগ্রেস ও কিছু সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন। নেহেরু হন কার্যত প্রধানমন্ত্রী।

দেশের এক সীমান্তে কলকাতা, নোয়াখালি ও অন্য সীমান্তে লাহোর, অমৃতসর এই দুই প্রান্তে জিন্নার ফ্র্যাঙ্কেস্টাইনরা যে কান্ড বাধিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ও অন্যান্য নেতাদের মনে এই ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করে যে দেশভাগই ভাল।

এখন প্রশ্ন দেশভাগ কি অনিবার্য ছিল? জি. অধিকারীর থিসিসে পাকিস্তান দাবীর সমর্থন ছিল। পরে অবশ্য বামপন্থীরা দেশভাগের বিরোধিতা করে। সি.পি.এম.-এর মতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙেঘর উদ্ভবের আগেই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সাভারকর তাঁর "হিন্দুত্ব" পুস্তকে হিন্দু মুসলমানকে দুটি পৃথক জাতি বলে দ্বিজাতিতত্ত্বের সূচনা করে। কিন্তু এ তথ্য ঠিক নয়। স্যার সৈয়দ আহম্মদ ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী থিওডোর বেকের সহযোগিতায় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজাতিতত্ত্ব ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ নীতির বীজ রোপণ করেন। ডঃ ত্রিপাঠীর মতে—শুধু বামপন্থীদের নয়, অনেকেরই ধারণা দেশভাগ রোধ করা যেত, যদি সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি সংহত করে কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু করতেন ১৯৪৬ সালে। ১৯২২ সালে বারদৌলি প্রস্তাবের পর রজনীপাম দত্ত কংগ্রেসকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়েছিলেন। আজ দেশভাগের চল্লিশ বছর পর অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী (এবং আরো অনেকে) ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তাকে প্রায় সেই আখ্যাই দিচ্ছেন। (হীরেন মুখার্জী—ওয়াজ ইন্ডিয়ান পার্টিশান আন-এ্যাভয়ডেবল?) তাঁদের মতে ১৯৪৫–৪৬ সালে দেশ এ ধরনের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অনুকূল ছিল। কিন্তু কৃষক-মজুর শ্রেণীর নানা ন্যায্য দাবী মেটাতে অসম্মত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় কালক্ষেপ করে ও শেষে তার চক্রান্তের শিকার হয়; দেশভাগের বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে। স্বাধীনতার পরেও বহু বৎসর বামপন্থীদের আওয়াজ শোনা যেত—"এ আজাদী ঝুটা হ্যায়।" [ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস (১৯০৮–১৯৪৭)]

১৯৪৫ সালের ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে উদারপন্থী ক্লিমেন্ট এটলী মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ভারতে বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তিনি এসে যে Plan Balkan দেন, তা নেহরু প্রত্যাখান করে। ঐ Plan গৃহীত হলে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যেত। কমিউনিস্ট পার্টিদের সামনে রাষ্ট্র হিসেবে ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রস্তাব রাখে কংগ্রেস-নেতা শরৎ বসু। যোগেশ গুপ্ত ও কিছু মুসলিম লীগ নেতাও দেশভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। হিন্দু মহাসভা প্রথমে বিরুদ্ধে থাকলেও শেষে দেশভাগের পক্ষেই মত দেয়। কংগ্রেসের বিধানচন্দ্র রায়, নলিনী সরকার,

কিরণশঙ্কর রায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও তাঁদের সহযোগীরা বাংলা ভাগ নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাঁরা সমস্ত অবিভক্ত বাংলার পৌরসভা ও বার এ্যাসোসিয়েশন থেকে—তাদের মতামত চাইলেন। বর্ধমান পৌরসভায় তখন কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৪৭-এর ১৮ই এপ্রিলের পৌরসভার অধিবেশনে সভার ১৬ জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার ১২ জন সদস্য বর্ধমান, রাজশাহী ও কলকাতাসহ প্রেসিডেন্সি বিভাগ নিয়ে পৃথক পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে ভোট দেয় আর কমিউনিস্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লকের ৪ জন সদস্য 'ইউনাইটেড বেঙ্গল'-এর পক্ষে ভোট দেয়। চেয়ারম্যান প্রণবেশ্বর সরকার ভোট দানে বিরত থাকেন। কাজেই সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে দেশবিভাগ-এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দেশবিভাগ ও স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে জহরলাল নেহরুর ওপর এডুইনা মাউন্টব্যাটেন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলে Janet Morgan তাঁর পুস্তক Edwina Mountbatten—A life of her own-এ উল্লেখ করেছেন। এই পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে পীযূষ গাঙ্গুলী Life line To Nehru প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—A lot of words have been skilled over the nature and depth of Edwina Mounbattern's relationship with Jawaharlal Nehru and its possible impact on the Indian Politics leading to independence. According to Richard Hong, anthor of Mountbattern : Hero of our Time, an affair developed between Edwina and Nehru, a relationship that had the most profound effect on the negotiations for the transfer of power. (The Statesman Miscellany, Feb 2, 1992) তাই কতকটা নেহরুর চাপে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীর বিরোধিতা সত্ত্বেও 'মন্দের ভাল' হিসেবে দেশবিভাগ মেনে নেয়। তাঁরা আশা করলেন জিন্না তাঁর স্বপ্নের পাকিস্তান পাবেন না—পাবেন Moth eaten Pakistan পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, তার ফলে ভারত যে কোন সময়ে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন করতে পারবে (১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নিয়ে যুদ্ধে তার কিছুটা সত্য প্রমাণিত হয়।)। নেহরুর ভ্রান্তনীতির ফলে পাঞ্জাবে Transfer of population নীতি গৃহীত হলেও বাংলার ক্ষেত্রে সে নীতি গৃহীত না হওয়ায় বাংলার সমস্যা চিরকালের জন্য জিয়ে রাখা হল। ফলে কাতারে কাতারে পূর্ব বাংলার হিন্দুরা নির্যাতিত হয়ে এ বাংলায় চলে আসে; এই প্রবাহ আজও স্তব্ধ হয় নাই। আর কোন দিন হবে বলেও মনে

হয় না। বর্ধমান জেলায় যত্র তত্র উদ্বাস্তুদের কলোনী গড়ে উঠলো—শহরে কাঞ্চননগর, লাকুরডি বালিডাঙ্গা, ইছলাবাদ, ভাতার থানায় সাহেবগঞ্জ, দাওরাডাঙ্গা, ওড়গ্রামের ডাঙ্গা, রাজবাঁধের কাছে শিবপুর, গোপালপুর, পানাগড় সর্বত্র উদ্বাস্তুদের ভীড়। প্রথম যাঁরা এসেছেন দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে তাঁরা আজ জেলারই হয়ে গেছেন। কিন্তু যারা এখনও আসছেন? ভারতের ভবিতব্যই ভারতকে খণ্ডিত করলো। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট সকলে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করলাম। স্বাধীনতার অনেকদিন পরেও বামপন্থীদের 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলা সত্ত্বেও স্বাধীন ভারত—স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ, স্বাধীন বর্ধমানই বাস্তব সত্য। আজ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে লর্ড কার্জনের মত প্রশাসনিক অসুবিধার ধুয়ো তুলে বর্ধমান জেলাকে দু-দুকরো করার কথা উঠেছে। ঈশ্বর সেই দুর্দিনের হাত থেকে জেলাবাসীকে রক্ষা করুন।

বত্রিশ অধ্যায়



জেলায় কৃষক সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়া ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব নিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও বৈপ্লবিক ধ্যানধাবণার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে সাম্যবাদ প্রচারে সচেষ্ট হন। সে সময় ইউরোপে অবস্থিত মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য), অবনী মুখার্জী, নলিনী গুপ্ত, মহেন্দ্রপ্রতাপ, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সোভিয়েত রাশিয়ার ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। ১৯২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মানবেন্দ্রনাথ রায় নলিনী গুপ্তকে কলকাতায় পাঠান, ফলে কোলকাতায় মুজফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বে একটি সাম্যবাদী কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন এস. এ. ডাঙ্গে।

বাংলায় ১৯২৫–২৬ সাল থেকেই এখানকার কিছু যুবসম্প্রদায় বামপন্থী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। মুজফ্ফর আহমেদ, কবি নজরুল ইসলাম, কুতুবদ্দিন আহমেদ আর হেমন্তকুমার সরকারের নেতৃত্বে Peasants And Workers Party গঠিত হয়। পূর্বতন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত গোপেন চক্রবর্তী ও ধরণী গোস্বামী এই সংগঠনে যোগ দেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হয়। বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলন, সমাজবাদী যুব সম্মেলন ও ছাত্র সম্মেলন। যুব সম্মেলনের সূচনা করেন বর্ধমানের মহারাজ কুমার উদয়চাঁদ মহতাব। বিনয় চৌধুরী, আবদুস সত্তার ও দাশরথি তা এই সম্মেলনে যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। সম্মেলনের সূচনায় রক্তপতাকা উত্তোলন করা হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তৃতায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের জন্য নতুন চিন্তাধারায় কমিউনিজমের আহ্বান জানিয়ে লক্ষ্য পথে

এগিয়ে যাবার জন্য আন্দোলনের ডাক দেন। এরপর জেলার কংগ্রেসের সংগঠনে বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বারবার বর্ধমান এসেছেন এবং সমাজবাদ ও প্রগতির বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জেলার অনেক তরুণ রাইফেল সংগ্রহ, বোমা মেরে রেললাইন উড়িয়ে দেওয়া, স্বদেশী ডাকাতি প্রভৃতি বিপ্লবাত্মক, সমাজবাদী ও জঙ্গী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীর বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হরেকৃষ্ণ কোঙারও স্বদেশী ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ সালে জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতি; সভাপতি হন হেলারাম চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী। ১৯৩৩ সালে মে মাসে হাটগোবিন্দপুরে বর্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলন হয়। সভাপতিত্ব করেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। এই সম্মেলনে বর্ধমান জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটও ভাষণ দেন। কৃষক সমিতির সদস্য সাম্যবাদী কর্মীরা কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজও করেছেন। এই সমস্ত সাম্যবাদী আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী কংগ্রেস-নেতা বিজয় ভট্টাচার্য। তিনি বস্তির শিশুদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাতে শিক্ষকতা করেন সাম্যবাদী কর্মী হেলারাম চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বর্ধমানে তখন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কোন চেষ্টা হয় নাই।

ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ জি. এম. অধিকারী ও পি. সি. যোশীর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি নতুন করে সংগঠিত হয় ও সারা ভারত কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ডঃ অধিকারী কমিউনিষ্ট পার্টির একটি তাত্ত্বিক নীতি প্রণয়ন করেন। এতে বলা হয় —Any person 18 years of age or more regardless of race, sex, colour, religion or rationality who habitually resides in India including Indian States and whose loyalty to the working class and patriotism are unquestioned are eligible for membership. According to the 1943 party constitution the party is based on the leadership of the proletariat and on the firm revolutionary alliance between the workers and the toiling peasantry and seeks to build the national united front of the entire freedom loving people of India for the defence of the country from the fascist aggression and for its liberation from imperialist enslavement, for complete national independence, for complete democracy. guaranteeing the right of self determination to nationalities to the

point of secession, land to peasants, and security of decent standard of living and civic liberties to every citizen. The party functions democratically. All its committees are elected. (Nalanda Year Book 1947-48, P. 223)

অর্থাৎ পার্টির মৌলিক নীতি হল—শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ ধর্মঘট গড়ে তুলতে হবে, সেনাবাহিনী ও পুলিশের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করতে হবে ও পূর্ণ স্বরাজের জন্য সারা ভারতে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

বর্ধমান জেলায় বিজয় মোদক, পাঁচু ভাদুড়ী, বিনয় চৌধুরী প্রমুখ ইন্ডিয়ান প্রলেতারিয়ান রেভেলিউশনারী পার্টি নামে একটা পার্টি গঠন করেন। এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে থেকে বামপন্থীগণ গোপনে নানা বিপ্লবাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩২ সালে বেগুট কেসে হরেকৃষ্ণ কোঙারের ৬ বছর জেল হয় ও তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়। ১৯৩৩ সালে মে মাসে বিনয় চৌধুরীকে ঐ একই কেসে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান জেলে পাঠানো হয় কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা যায় নাই; তবুও তাঁকে ডিটেনশন এ্যাক্টে বিনা বিচারে ডেটেনিউ করে রাখা হয় ও বগুড়া জেলে ইনটার্ন করে রাখা হয় এবং সেখান থেকে সিউড়িতে এনে সিউড়ি ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করা হয়। বিনয় চৌধুরী ছাড়াও বিপদতারণ রায়, ধর্মদাস চৌধুরী, আসানসোলের হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর ভট্টাচার্যকেও ঐ একই কেসে জড়িয়ে বিচার করা হয়। ১৮ মাস বিচার চলে। রায়ে বিনয় চৌধুরীর সাড়ে পাঁচ বছর ও হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ছয় বছর জেল হয়। হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আন্দামানে পাঠান হয়। আর ধর্মদাস চৌধুরী, অমর ভট্টাচার্য ও বিপদতারণ রায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে কেস দাঁড় করানো যায় নাই। কাজেই সরকার তাঁদের ডিটেনশন এ্যাক্টে ডেটেনিউ করে বিনা বিচারে আটক রাখেন। ফকির রায়কেও ডেটেনিউ করে ছয় বছর দেউলিতে রাখা হয়। সরোজ মুখোপাধ্যায় ও কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ডেটেনিউ করে আটক রাখা হয়। ১৯৩২ সালে বর্ধমান জেলা কংগ্রেসে বামপন্থীগণ গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরোধিতা করেন ও তাঁদের প্রস্তাবই সম্মেলনে পাশ হয়। এরপর বর্ধমানে যে যুব-সম্মেলন হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। এরপর বর্ধমান বিভাগীয় সমাজবাদী সম্মেলনে সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী অনেক সংগঠনই যোগদান করে। সাম্যবাদী পন্থীদের দ্বারা এই সময় "সাম্য" নামে একটি পত্রিকা সাইক্লোস্টাইল করে প্রকাশ করা হয়।

১৯৩৫ সালে ডিমিট্রভের থিসিস ভারতে এলে সিপিআই-এর পন্থা কিছুটা উন্মুক্ত হয়। ইন্ডিয়ান প্রলেতারিয়ান রেভেলিউশনারী পার্টির সদস্যরা কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইন্ডিয়ার সদস্য হন। হেলারামও সিপিআই-এর সদস্য হন। তিনি বর্ধমানে এসে এখানে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি গঠনে উদ্যোগ নেন।

বর্ধমান জেলার এক প্রান্তে রয়েছে কয়লা, বিদ্যুৎ, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং লোকোমোটিভ প্রভৃতি শিল্পসমৃদ্ধ আসানসোল-দুর্গাপুর মহকুমা আর অন্য প্রান্তে রয়েছে বর্ধমান-কালনা-কাটোয়ার কৃষি অঞ্চল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই জেলায় ধীরে ধীরে বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। কয়লার সহজলভ্যতা, সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগের সুবিধা, হাজারীবাগ-বিহার অঞ্চল থেকে সুলভ শ্রমিকের সহজলভ্যতা, আসানসোল দুর্গাপুর অঞ্চলে শিল্পাঞ্চলে গড়ে তোলার পরিবেশ তৈরী করে। কৃষিক্ষেত্রে জেলার পূর্বপ্রান্তে ভাগীরথী-দামোদর অজয় নদবিধৌত পাললিক ভূমি, সেচব্যবস্থার সুবিধার কারণে কৃষিজ শস্যের উৎপাদন এ জেলার অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে।

জেলার অর্থনীতির এই বৈশিষ্ট্য জেলায় কমিউনিষ্ট আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। জেলার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে শিল্পাঞ্চল ও কৃষি অঞ্চল এই দ্বৈত সত্তার ফলে একদিকে কৃষক আন্দোলন অন্যদিকে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে কমিউনিস্ট পার্টি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই কারণেই ১৯৩৫ সালের ৫ই অক্টোবর সি.পি.আই-এর প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক মণি চ্যাটার্জী বর্ধমানে আসেন ও মাত্র ৫ জনকে নিয়ে বর্ধমানে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি গঠন করেন। এই পাঁচ জন হলেন হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, অশ্বিনী মণ্ডল, ধীরেন চট্টোপাধ্যায় ও শিবপ্রসাদ মুখার্জী। সম্পাদক হলেন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্। পরে ধীরেনবাবু রাজনীতি ছেড়ে দেন এবং মহানন্দ খান ও শিবপ্রসাদ দত্ত কমিটিতে যোগ দেন।

১৯৩৪ সালে শিল্পে ধর্মঘট দেখা দেওয়ায় সরকার সারা ভারত কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় কর্মীদের খুব গোপনে কাজ করতে হয়। অনেক বামপন্থী কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকে গিয়ে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে বামপন্থী আদর্শ প্রচার করতে থাকেন।

বর্ধমানে জেলা কমিটি গঠিত হওয়ার পর প্রথম যে সভা হয় তাতে কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য, রীতিনীতি সম্পর্কে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পার্টির কার্যকলাপ ও তার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। এরপর যে প্রাদেশিক সম্মেলন হয় তাতে জেলা থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ ও

হেলারাম চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনের ব্যবস্থায় খুব গোপনে একটা খালি বাড়ীর দোতলায় ২৪ পরগনার ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি, হুগলী, বর্ধমান ও যশোহরের ২/৪ জন করে প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে বাক্‌বিতণ্ডাই বেশী হয়। কাজের কাজ বিশেষ কিছু হয় নাই। সদস্যদের অভিজ্ঞতার অভাব ও আগের কংগ্রেস পার্টির মধ্যে কাজ করে তার রেশ কাটাতে সময় লেগেছিল।

১৯৪০ সালে বর্ধমান জেলা কংগ্রেসে নির্বাচন হয়। এই সময় কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠী ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট গঠন করে। এই ফ্রন্টে বামপন্থীদেরই প্রাধান্য ছিল। এরাই কংগ্রেসের ভেতর থেকে কমিউনিস্ট আদর্শ গোপনে প্রচার করতে থাকে ও কংগ্রেস কমিটি দখল করার চেষ্টা করে। তারই ফলে ১৯৪০ সালের নির্বাচনে জেলা কংগ্রেসের কর্তৃত্ব যায় ফকির রায় ও শিবশঙ্কর চৌধুবীর হাতে। ফকির রায় হন সভাপতি ও শিবশঙ্কর চৌধুরী হন সম্পাদক। কিছু দিনের ব্যবধানে আবার জেলা কংগ্রেসের কর্তৃত্ব যাদব পাঁজা ও বিজয় ভট্টাচার্যের হাতে ন্যস্ত হয়। ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে বে-আইনী সভা করার জন্য ফকির রায় ও পাঁজা-মশাই গ্রেপ্তার হন। বামপন্থীগণ নীতিগত কারণে '৪২-এর আন্দোলনকে সমর্থন করে নাই। কাজেই বামপন্থী নেতৃবর্গ কংগ্রেস ত্যাগ করেন ও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

আসানসোল মহকুমা কংগ্রেসও বামপন্থীদের দখলে আসে। এখানে সম্পাদক হন নিত্যানন্দ চৌধুরী ও সহ-সম্পাদক হন সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বার্ণপুরের এক বামপন্থী কর্মী নিত্যানন্দ চৌধুরী সম্পাদকের নামে পার্টি অফিসের জন্য কিছু জমি ও একখানি ঘর লেখাপড়া করে দেন। আসানসোলে পার্টি অফিস প্রথমে ঝিকরিয়া মহল্লায় ও পরে বকশিম বাজারে স্থানান্তরিত হয়। কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোটে বামপন্থীদের কিছু শক্তিবৃদ্ধি হয়। তবে কালনায় বিশেষ সুবিধা হয় নাই। কালনায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা হয় পূর্ণ পালের উদ্যোগে ১৯৪৩-এর পরে। তার আগে অবশ্য বর্ধমানের প্রগতিশীল বামপন্থী নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে কৃষক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। সরকার বামপন্থী আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্য সন্ত্রাস চালায়। ফলে এখানকার বামপন্থী কর্মীগণ গা ঢাকা দেন ও আন্ডার গ্রাউণ্ড থেকে গোপনে জনগণের মধ্যে বামপন্থী মতবাদ প্রচার করতে থাকেন।

বর্ধমানে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হবার পর বর্ধমান পৌরসভা ও লোকাল বোর্ডের নির্বাচন এসে পড়ে। সে সময় অবশ্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার মত বা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত পার্টির সংগঠন শক্তিশালী হয় নাই।

কাজেই বামপন্থীগণ ঠিক করলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্ট হিসেবে কংগ্রেসকেই সামনে আনতে হবে।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে বর্ধমান জেলাতেও এই আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়ে। আইন অমান্য আন্দোলনে গোটা জেলা থেকে প্রায় ১১০০-এর মত ছেলে আইন অমান্য করে জেলে যান। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এই সমস্ত ছেলেরা কংগ্রেস অফিসে আসতো কিন্তু কংগ্রেস অফিসে কেউই এদের বিশেষ পাত্তা দিত না। বামপন্থীরা এই সুযোগে এদের দলে টানার জন্য যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে এদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামের মানুষের সঙ্গে এদের পরিচিত করে ও বামপন্থী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন এবং কৃষক সমিতির নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন প্রসারে এদের সাহায্য চান। এর ফলে এই সমস্ত যুবক ধীরে ধীরে কৃষক আন্দোলনের সামিল হন।

১৯৩৫–৩৬ সালে হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জেলার সেচসেবিত অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। হেলারামবাবু জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে মহাজনী শোষণ ও জমিদারী স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে গ্রামবাসীদের মধ্যে ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এর ফলে তাঁর নেতৃত্বে ক্যানেলকর-বিরোধী আন্দোলন গ্রামবাসীদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। ক্যানেলকর বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে এর আগের অধ্যায়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ক্যানেলকর-বিরোধী আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাবে। ১৮৮৫ সালে ইডেন ক্যানেল কাটা হয়েছিল। কিন্তু এর দ্বারা অতি সামান্য অঞ্চলেই এই ক্যানেল থেকে সেচের সুবিধা ছিল। এরপর ১৯২০ সালের দামোদর পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯২৬–২৭ সালে দামোদর ক্যানেল কাটা শুরু হয়। প্রথমে নিয়ম ছিল যে, যে সমস্ত চাষী জমিতে জল নেবে তাদের সরকার নির্ধারিত কর দেবার অঙ্গীকার করে চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। ১৯৩৫ সালে তৎকালীন সেচমন্ত্রী খাজা নিজামুদ্দিন সাহেব সমস্ত সেচসেবিত অঞ্চলে সরকার নির্ধারিত কর বাধ্যতামূলক করার উদ্দেশ্যে এ্যাসেমব্লীতে Bengal Development Bill পেশ করলেন। অমনি চারদিক থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি তখনও গঠিত হয় নাই। কাজেই কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে গলসী থেকে শুরু করে মেমারী, মন্তেশ্বর, আউসগ্রাম, ভাতার থানার সেচসেবিত অঞ্চলে ১৫টি ক্যানেলকর প্রতিকার সমিতি গঠিত হয়। Development Bill-এর প্রতিরোধে নামলেন বামপন্থী নেতৃবৃন্দসহ জেলা কংগ্রেস। কৃষক সমিতিও এই

আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে দুটি দলের সৃষ্টি হল। একটি গান্ধীবাদী দক্ষিণপন্থীদল আর একটি বামপন্থী তথা কমিউনিস্ট প্রভাবিত বামপন্থী দল। বামপন্থী কৃষক সমিতি গ্রামে গ্রামে ক্যানেলকর-বিরোধী প্রচার চালাতে লাগলেন আর এই সুযোগে সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সমিতির সদস্য সংখ্যাও বাড়াতে সচেষ্ট হলেন। এক বৎসরের মধ্যে জেলায় কৃষকসমিতির সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো কুড়ি হাজার।

১৯৩৭ সালে বংশগোপাল টাউন হলে ক্যানেলকর প্রতিকার সমিতির এক বিরাট সম্মেলন হয়। হাজার হাজার চাষী গ্রামগঞ্জ থেকে মিছিল করে এসে সভায় যোগ দেয়। সভায় নেতাদের বক্তব্য ছিল জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা সরকারের কর্তব্য। এর জন্য সরকার কোন কর দাবী করতে পারে না। বরং সারাদেশে খাল কেটে সমস্ত জমিতে যাতে সেচের জল সরবরাহ হয় সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তবে ক্যানেল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ও প্রশাসনিক কিছু ব্যয় নির্বাহের জন্য বড় জোর একর প্রতি দেড় টাকা সরকার দাবী করতে পারে—এর বেশী নয়। সরকার সেচসেবিত অঞ্চলে বাড়তি ফসলের দাম দাবী করছে তাও ভিত্তিহীন। জমি চাষের খরচ, জমিদারের প্রাপ্য খাজনা মিটিয়ে দেওয়ার পর চাষীদের ক্যানেলকর দেবার মত উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না। যেহেতু ক্যানেলের দ্বারা জমির কোন উন্নয়ন হয় নাই অতএব সেচসেবিত অঞ্চলে জমির ওপর কোন 'Betterment levy' হতে পারে না। সরকার কিন্তু একর প্রতি সাড়ে পাঁচ টাকা অর্থাৎ বিঘা প্রতি দু'টাকা ছয় আনা হারে কর আদায় করতে বদ্ধপরিকর। কাজেই প্রতিরোধ আন্দোলন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

১৯৩৭–৩৮ সালের জানুয়ারীতে কুড়মুনে কৃষক সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। সারা প্রদেশের কৃষক নেতারা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বঙ্কিম মুখার্জী ক্যানেলকরের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করবার জন্য সম্মেলনে জোরালো ভাষণ দেন। এরপর ক্যানেলকর প্রতিরোধ আন্দোলন গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন চলাকালে জাহেদ আলির সভাপতিত্বে কৃষক সমিতির এক সভা হয়। এই সভায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ যোগ দেন। তিনি একটা আপোস মীমাংসার সূত্র বের করেন। একর প্রতি এক মন ধান ও এক পণ খড়ের সমমূল্যের টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু কৃষক সমিতির অধিকাংশ সদস্য একর প্রতি দেড় টাকার দাবীতে অনড়। সরকার তাদের সেচসেবিত এলাকায় একর প্রতি সাড়ে পাঁচ টাকা হারে কর ধার্যের যুক্তিকে সমর্থন করার

জন্য সেচসেবিত এলাকা ও সেচবিহীন এলাকার কোন জমি থেকে ১১×৯ বর্গফুট জমিতে crop cutting করে ধান মেপে আনুপাতিক হারে উভয় এলাকায় আনুপাতিক ভাবে উৎপন্নের হার দেখান। কারণ সরকারের crop cutting-এর ফল অনুসারে সেচবিহীন এলাকার চেয়ে সেচসেবিত এলাকার উৎপাদন আনুপাতিক হারে বেশী।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারীতে সরকারী কমিটির মেম্বারগণ ও মন্ত্রী বিজয় সিংহ নাহার ও শ্রীশচন্দ্র নন্দী খানা জংশন ও কুড়মুন, বলগনা গ্রামে যান। চন্দ্রশেখর কোঙারের নেতৃত্বে প্রায় দুহাজার চাষীর স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপিতে নিবেদন করে যে crop cutting-এর এস্টিমেট ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে বাড়তি উৎপাদন দেখানো হয়েছে, কারণ জমির মালিক বা কোন চাষীকে না জানিয়ে statistical বিভাগের কর্মীরা crop cutting করেছে। ৯′×১১′ এর চেয়ে বেশী পরিমাণ জমিতে cutting করে বেশী দেখিয়েছে। তাছাড়া ফসল মাঠ থেকে খামারে তুলতে ঝরে পড়ে যায় বা নষ্ট হয়, সেটাও ধরা হয় নাই। প্রভিন্সিয়েল অটোনমি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব বিভাগ থেকে ক্যানেল খননের খরচ থেকে বাংলা সরকারকে রেহাই দেওয়া হয়। কংগ্রেসের তরফে যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা মশাইও অনুরূপ স্মারকলিপি দেন। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রী (বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী) ফজলুল হক ও মন্ত্রী পরিষদের কয়েকজন সদস্য নিয়ে মুসলিম লীগের সভাপতি আবুল কাশেমের আমন্ত্রণে কাশিয়াড়া আসেন ও সভা করেন। সেখানে স্থানীয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট -এর সহযোগিতায় হ্যান্ডবিল ছড়িয়ে বিরোধীপক্ষ তাদের বক্তব্য জানায়। ইতিমধ্যে সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে একর প্রতি ক্যানেলকর প্রথমে গড়ে পাঁচ টাকা থেকে চার টাকা দু'আনা, দ্বিতীয় দফায় আরো কমিয়ে সাড়ে তিন ও শেষে দু টাকা নয় আনাতে নামিয়ে আনতে বাধ্য হন। কিন্তু কৃষক সমিতি দেড় টাকার দাবীতে অনড় থাকে ও গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে চাষীদের সত্যাগ্রহ চলতেই থাকে। সরকারও দমন নীতি গ্রহণ করে বকেয়া করের জন্য ক্যানেলকর রেভেনিউ বিভাগ থেকে চাষীদের ওপর সার্টিফিকেট জারি করে চাষীদের ঘর থেকে গরু, বাছুর, ছাগল, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক্ করে নিলাম করা হয়। কৃষক সমিতিও ক্রোক করা সম্পত্তি গ্রামের বাইরে নিয়ে যেতে বাধা দেয়। তখন গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ এমন কি গোরা সৈন্য পাঠিয়ে গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে কর আদায় করতে থাকে। বহু চাষী গ্রেপ্তার হন ও জেলে তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালান হয়। অত্যাচারের নৃশংসতা ও ব্যাপকতা দেখে শেষে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও কৃষক সমিতি এক যোগে লীগ নেতা আবুল

হাসেমের মারফৎ কোনরূপ পূর্বশর্ত ও এগ্রিমেন্ট ছাড়াই স্থায়ী ভাবে একরে দুটাকা নয় আনা হারে কর জারি করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করে। এই দাবীই শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়। এই ভাবে কৃষক সমিতির সংগ্রামী আন্দোলনের ফলে কিছুদিনের জন্য ক্যানেলকরের একটা মীমাংসা হয়।

১৯৩৮ সালে বর্ধমান পৌরসভা নির্বাচনে বামপন্থীগণ বিরোধীশক্তির প্রসারে মনোযোগ দেন ও নিজেদের সংগঠন জোরদার না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসকে সমর্থন করে। ১৯৩৮ সালের ৯ই এপ্রিল বর্ধমান পৌরবোর্ড গঠিত হয়। ১৭ জন নির্বাচিত ও ৫ জন মনোনীত সদস্য, চেয়ারম্যান হন গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভাইস-চেয়ারম্যান মহম্মদ আজম। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত বামপন্থীরা পৌরসভায় নিজেদের প্রার্থী দিতে পারেন নাই। ১৯৫০ সালে সন্তোষ খান, শৈলেশ ব্যানার্জী, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বামপন্থী নেতা সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু বোর্ড কংগ্রেসের দখলেই থাকে। ১৯৫৫ সালের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির টিকিটে ২৫ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ডাঃ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, মথুরানাথ ঘোষ, অসীম ঘোষ, শৈলেশ ব্যানার্জী, দেবরঞ্জন সেন, কৃষ্ণচন্দ্র হালদার, অশ্বিনী হাজরা, সন্তোষ খান, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু প্রমুখ দশ জন সদস্য নির্বাচিত হন কিন্তু এবারেও গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি বোর্ড দখল করতে পারে নাই। ১৯৫৮ সালে পৌরসভা নির্বাচনে বোর্ডের ২৫ জন সদস্যের মধ্যে গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির ১৭ জন সদস্য নির্বাচিত হন ও বোর্ড দখল করে, চেয়ারম্যান হন শৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারম্যান হন ডঃ চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৮৫ সালের Bengal Local Self Govt. Act অনুসারে লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডও গঠিত হয়। ১৯৩৬ সালের Bengal Act XIV অনুসারে লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডের কার্যকাল ৫ বছর করা হয়। কিন্তু ১৯৫২ সালের পূর্বে বামপন্থীগণ লোকাল বোর্ড বা জেলা বোর্ডের নির্বাচনে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নাই। ১৯৫২ সালের জেলা বোর্ডের নির্বাচনে জেলা বোর্ড বামপন্থীদের দখলে যায়। চেয়ারম্যান হন সুবিমান ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান হন হেলারাম চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু মুখার্জী।

১৯৫৬ সালের শেষ ভাগে সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারিয়ে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের পদত্যাগ করতে হয়। চেয়ারম্যান হন পশুপতি মালিয়া এবং ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ বিজয় গড়াই ও নির্মলেন্দু চৌধুরী। জেলা বোর্ডের এই খানেই সমাপ্তি। এরপর নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় জেলা পরিষদ গঠিত হয় ১৯৬৪ সালে। প্রথম সভাধিপতি হন নারায়ণ চৌধুরী ও সহ-সভাধিপতি হন বামনদাস মুখার্জী।

১৯৪২ সালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে কংগ্রেস বোর্ড গঠন করে কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি মিউনিসিপ্যাল শ্রমিক ধাঙড়দের নিয়ে শ্রমিক সংগঠন তৈরী করে ও শাহেদুল্লাহ সাহেব, বিশ্বনাথ সেন, সন্তোষ খান, শিবশঙ্কর চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ফাগুয়া ও কৃষ্ণা ডোম এদের নিয়ে চেয়ারম্যান সন্তোষ বসুর কাছে ধাঙড়দের কিছু দাবী দাওয়া বিষয়ে ডেপুটেশন দেন। কিন্তু বোস সাহেব ডেপুটেশনিস্টদের মধ্যে ফাগুয়া ও কৃষ্ণাকে বাইরে যেতে বলেন; ফলে ডেপুটেশন ব্যর্থ হয় ও কৃষ্ণা ডোম সমবেত ধাঙড়দের দিয়ে 'কিরা' (শপথ) করায় ও ঘোষণা করে যে পরের দিন থেকে ধাঙড়দের স্ট্রাইক। স্ট্রাইক দিন তিনেক চলে, পরে সবার সঙ্গে কথা বলে বোস সাহেব মিটিয়ে নেন। এর পর থেকে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি বলতে সবাই বুঝতে পারলো শ্রমিক কৃষকদের পার্টি, যেহেতু গ্রামে-গঞ্জে এদের সংখ্যাই বেশী তাই গ্রামে কৃষকদের মধ্যে আর শহরে শ্রমিকদের মধ্যে নিজেদের সংগঠনকে ছড়িয়ে দিয়ে পার্টি ক্ষমতা দখলের দিকে এগোতে থাকে।

১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ বাধে। ১৯৪২ সালে আরম্ভ হয় বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলন। কিন্তু ১৯৪২ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধকে সমর্থন করে। যেহেতু হিটলার ও মুসোলিনি সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করেন তাই এই সোভিয়েত আক্রমণের পর হিটলার ও জাপানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আক্রমণকে কমিউনিস্টগণ সমর্থন করে এবং সে কারণে ব্রিটিশ-বিরোধী আগস্ট আন্দোলনকে সমর্থন করে নাই, শুধু তাই নয় নেতাজীকে 'কুইনস্‌লিং' পর্যন্ত আখ্যা দেন। পরে অবশ্য নাম্বুদ্রিবাদ ব্রিটিশ-বিরোধী বিয়াল্লিশ-এর আন্দোলনকে সমর্থন না করা বা নেতাজিকে দেশদ্রোহী বলা পার্টির পক্ষে মারাত্মক ভুল হয়েছিল বলে স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

১৯৪২ সালের ১৫ই আগস্ট বর্ধমান টাউন হলে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে এক ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সভা হয়। এ সভায় প্রায় ৫০০০ কৃষক-শ্রমিক যোগদান করে। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী সভায় ভাষণ দেন। সরকার এই সময় পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। ফলে বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, দাশরথি চৌধুরী, বিপদতারণ রায়, পাঁচু গুহ, কালীপদ মণ্ডল প্রকাশ্যে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। বর্ধমান শহরে হাতিপুকুর গলিতে জেলা কমিটির প্রকাশ্য দপ্তর শুরু হয়। ১৯৪২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর হাট-গোবিন্দপুরে পার্টির প্রকাশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কমিউনিস্ট নেতা প্রমথ

ঘোষ রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। পার্টির সম্পাদক বিনয় চৌধুরী রিপোর্ট পেশ করেন। কিছু মহিলা সমর্থক এই সম্মেলনে যোগ দেন।

এরপর গ্রামে গ্রামে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার আয়োজন শুরু হয়। বর্ধমানে তখন কৃষক সভার সভাপতি দাশরথি চৌধুরী। শাহেদুল্লাহ্ ও পাঁচু গুহ দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে রায়না থানার ১৫টি ও খণ্ডঘোষ থানার হিজলনা, শালগাছা, বনতির, দক্ষিণ একলখি, উচালন, ছোট বৈনান, কামারহাটি, গোতান, ধামাস, মেড়াল, সাঁকটে, বোড়ো, বোঁয়াই, তোড়কোনা ও রায়নার কাছাকাছি সেহারাবাজার, রামবাটি, শ্যামসুন্দরপুর, সহজপুর, পিপলে, বোসরা প্রভৃতি গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ ও শ্রমিক মজদুরদের সংগঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যান। কামারহাটিতে তেঁতুলে বাগ্‌দিদের নিয়ে কৃষক সমিতি গঠন করা হয়। পিপলের বিনয় ডাক্তার, বোগরার ধনেশ্বর সামন্ত, সহজপুরের ডাঃ গঙ্গা হালদার, নিমাই দাঁ, রামবাটির বিমান মণ্ডল, রায়নার কালিপদ মণ্ডল, একলখির সৌরীন ডাক্তার, কামারহাটির নকুল বাগ্‌দি এঁরা সকলে কৃষক সমিতির সংগঠনের ব্যাপারে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন।

তালিতে ধর্মদাস মিশ্র পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তিনি পার্টির আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করতে প্রায়ই আমাদের গ্রাম বনপাশ কামারপাড়ার সন্নিহিত পল্লী হরিবাটীতে যেতেন। সেখানে আমাদের বাড়ীর পাশেই ভোলানাথ পরামাণিকের বাড়ীতে মাঝে মাঝে থাকতেন। পার্টি যখন বে-আইনী হয় তখন প্রায় কিছুদিন ভোলাদার বাড়ীতে থেকে গ্রামের বাগ্‌দীপাড়া, বাউড়ী পাড়া ও সন্নিহিত গ্রাম বিঘড়া, খুরুল, পিলখুড়ি, ধান্দলসার সাঁওতাল ডাঙ্গা, চান্দাই এই সব অঞ্চলে পার্টির সংগঠনের জন্য রাত্রে রাত্রে গ্রামের পাঁচজনকে নিয়ে মিটিং করতেন। এর পর ভোলানাথ একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে গেল। পার্টি করার জন্য ভোলাদা ওর বাবা ও জমিদারশ্রেণীর লোকের দারোয়ানদের হাতেও মার খেয়েছে কিন্তু পার্টির মতাদর্শ ছাড়ে নাই। তবে কোনদিন পার্টির নেতৃত্ব চায় নাই, পায়ও নাই। তার পার্টির প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতিও পেয়েছিল বলে মনে হয় না। তার কাছে চুলদাড়ি কামাতে লোকে ভয় পেত। তখনই ভোলা তার পার্টির 'সারমন' ছাড়বে। কথায় আছে সাপের ওঝা সাপের হাতেই মরে। ভোলাদারও শেষ জীবনে তাই হয়েছিল। বর্গাদাররা তাকে প্রায় সর্বস্বান্ত করে দিয়েছিল। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ভোলাদা মারা যায়—**unwept, unhonoured, unsung.**

আর দেখেছি পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী তকিপুরের ডাঃ গোবর্ধন গোস্বামী। বনপাশ স্টেশন বাজারে একটা চালা ঘরে তাঁর ডিসপেনসারী ছিল। সে অবশ্য

১৯৫০—৫১ সালের কথা। সেখানে প্রায়ই কমরেড অশ্বিনী রায় যেতেন, ঘোলদা, বেলাড়ি, ব্রজপুর থেকেও সব পার্টির কর্মীরা আসতো। পার্টির কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হত। আমি তখন সরকারী কাজে ওখানেই পোস্টেড ছিলাম। তাদের আলোচনাতে মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করতাম। এখনও গোবর্ধনবাবু পার্টি করেন তবে CPI না CPI (M) ঠিক বলতে পারবো না। গোবর্ধনবাবুর দলের বেলাড়ি, ব্রজপুর, ভাদা, আশিন্দে, জয়কৃষ্ণপুর প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক ছেলে পরবর্তীকালে নক্‌শাল হয়ে গিয়েছিল বলে শুনেছিলাম।

১৯৪২ সালের মন্বন্তরের মোকাবিলায় জিলাতে ও মহকুমায় খাদ্য কমিটি গঠন করা হয়। কাটোয়া মহকুমার 'খাদ্য সম্মেলন' হয় করোজ গ্রামে মুশা মিঞার উদ্যোগে। কালনা মহকুমার 'খাদ্য সম্মেলন' সংগঠনে প্রথমে বেশ অসুবিধা হয়। পরে হরগোবিন্দ রেজ, লোহার গ্রামের তালুকদার শেখ, কালনার অবোধ বিহারী পান্ডে, কুসুমগ্রামের আবদুল হাসনাৎ প্রমুখ ব্যক্তিদের উদ্যোগে নাদনঘাটে 'খাদ্য সম্মেলন' হয়।

১৯৪৩ সালে কালনা অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে বন্যাত্রাণ কমিটি গঠিত হয়। নাদনঘাট, পূর্বস্থলী এলাকার বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য পার্টির পরিচালনায় বিজয় চট্টোপাধ্যায়, শরদীশ রায় প্রমুখের নেতৃত্বে ও তারাপদ পালের তত্ত্বাবধানে নাদনঘাট ডাকবাংলোয় একটা 'রিলিফ কেন্দ্র' পরিচালিত হয়। শীতের সময় ময়নামপুরের আইমাদার সেখ সাহেবের মারফতে পূর্বস্থলী মন্তেশ্বর এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে বন্যা বিপন্নদের কাপড় ও কম্বল বিলি করা হয়। ১৯৪৯ সালে ১লা আগষ্ট 'ক্ষেতমজুর দিবস'ও পালন করা হয়।

১৩৪২ সালের বন্যায় দামোদরের এক বিরাট ভাঙনের ফলে 'নাকড়া' হানার সৃষ্টি হয়। এই হানা দিয়ে প্রতি বৎসর দামোদরের বন্যার জল ঢোকায় জামালপুর, রায়না থানার বিরাট অঞ্চল প্লাবিত হত, গোটা মাঠ জলে জলময় হত। বছর বছর বিরাট এলাকার শস্যহানি হত। এই হানা বাঁধবার জন্য দাশরথি তা "নাকড়া হানা বাঁধ আন্দোলন' গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার নামই ছিল 'দামোদর', সম্পাদকীয় কলমের শীর্ষে ক্যাপশন থাকতো "ওরে নদ দামোদর, তোরে নিয়ে আতান্তর।' ধামাশের রাজবল্লভ তা-র পিতা ললিতমোহন তা-র আশ্রয়ে থেকে সরোজ মুখোপাধ্যায়, বিনয় চৌধুরী, সৈয়দ হবিবুল্লাহ্, দাশরথি চৌধুরী, বারিদবরণ রায়, হেলোরাম চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ মণ্ডল, পুতুণ্ডার শিবু, ধামাশের কার্তিক সামন্ত, গঙ্গা হাজরা, শচীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধিকা যশ, সাতকড়ি দত্ত প্রমুখ যুবকদের নিয়ে দাশরথি তা-এর নেতৃত্বে

দামোদর প্রতিকার আন্দোলন গড়ে ওঠে। ধামাশ গ্রামের প্রয়াত অমূল্য দত্তের ঠাকুর দালানের পাশে গোয়াল ঘরের চালার নীচে সাময়িক অফিস ঘরে সাইক্লোস্টাইলে বুলেটিন ছাপা হত; সেই বুলেটিন রাতারাতি পৌঁছে যেত রায়না, জামালপুর থানার বন্যাপ্লাবিত গ্রামে গ্রামে।

বর্ধমান থেকে প্রকাশিত হত 'সংবাদ' নামে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকাও বর্ধমান থেকে নিয়ে গিয়ে গ্রামে গ্রামে বিলি করা হত।

১৯৪৩ সালের ৭/৮ ই ফেব্রুয়ারী আহারবেলমা ইউনিয়নের আলালপুর গ্রামে অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কৃষক সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধের বাজারে প্রচণ্ড খরার জন্য জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বাড়তে থাকে, তার ওপর মিলিটারীর জন্য সরকার চড়া দাম দিয়ে ধান চাল গম কিনতে থাকে; ফলে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। এ সময় কিছু কালোবাজারী চড়া দাম দিয়ে চাল গম কিনে মজুদ করে রেখে চতুর্গুণ দামে বিক্রয় করতে থাকে। বর্ধমানেও বাজেপ্রতাপপুর, বোরহাট, আলমগঞ্জ অঞ্চলে জনতা সমবেত হয়ে খাদ্যের দাবীতে স্লোগান দিতে থাকে। শহরে ভুখা মিছিল বের হয়। পার্টি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সস্তায় খাদ্যের ও কালো বাজারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের দাবীতে জেলা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। ১৯৪৩ সালে যখন শক্তিগড়ের উত্তরে দামোদরের বাঁধ ভাঙে, তখন শক্তিগড়ের কাছে রেললাইন ও জি. টি. রোড ভেঙে যায়, গোটা শক্তিগড় এলাকা জলমগ্ন হয়, জমিতে ২/৩ ফুট বালি জমে— সমস্ত জমি চাষের অযোগ্য হয়ে যায়। বাঁধ ভাঙা জলের প্রবাহ বাঁকা নদী ধরে প্রবাহিত হতে থাকে। ফলে সদর, মেমারি, মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী ও কালনা থানার বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত হয়। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত কর্মী বন্যাত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর ফলে এই সমস্ত গ্রামাঞ্চলে পার্টির গণভিত্তি তৈরী হয়।

১৯৪৩ সালে (১৩৫০ সাল) মন্বন্তরের সময় পার্টি স্থানে স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লঙ্গরখানা খুলে ছেলেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে। মেয়েরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন। বন্যাক্লিষ্ট ও দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে ত্রাণ পরিচালনার ফলে গ্রামের লোকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় ও সেই সব অঞ্চলে পার্টির সংগঠনও গড়ে ওঠে। চারিদিকে খাদ্যাভাব, চারিদিকে হাহাকার, রাস্তায় রাস্তায় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানুষের কাতর প্রার্থনা 'দুটি ভাত দাও', 'একটু ফ্যান দাও'। যেটুকু খাদ্য আছে তার সুষ্ঠু বন্টন দরকার; প্রয়োজন Rationalised System of Food Rationing। এরই প্রয়োজনে বর্ধমান

শহরেও ফুড কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক হন ভুজঙ্গ সেন; পাড়ায় পাড়ায় ফুড কমিটির শাখা অফিসও খোলা হয়। ফুড্ ডিলারদের ওপর কড়া নজর রাখা হয়। সদর মহকুমা ফুড কমিটির সম্পাদক হন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ। ফুড কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মণ্ডল প্রমুখ উকিলগণ যথেষ্ট সহযোগিতা করেন।

শহরে শিবশঙ্কর চৌধুরী, অশ্বিনী মণ্ডল, শিবপ্রসাদ দত্ত, সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (নাড়ু) প্রমুখ গণ্যমান্য মানুষ মিলে শহরের দরদী মানুষের কাছ থেকে চাল, ডাল, সংগ্রহ করে লঙ্গরখানা খুলে ভুখা মিছিলের লোকজনদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। অমিয়প্রকাশ নন্দে (ঝাঁপুবাবু) রেশন কার্ডের যে তালিকা তৈরী করেন তাতে দেখা যায় আয়করদাতা ও ধনী ব্যক্তিদের নামই বেশী; তখন পার্টি থেকে দাবী ওঠে সাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে তালিকা প্রস্তুত করাতে হবে। সরকার সে দাবী মেনে নেয়। দলমত নির্বিশেষে সকল দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা ফুড কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হন বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাব। মুসলিম লীগের আবুল হাসেম হন সম্পাদক। প্রত্যেক পার্টি থেকে একজন করে প্রতিনিধি, জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধি, জেলা থেকে নির্বাচিত এম.এল.সি., এম.এল.এ. ও বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি নিয়ে বর্ধমান জেলা ফুড কমিটি গঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি থাকেন বিনয় চৌধুরী আর কর্মী হিসেবে থাকেন শাহেদুল্লাহ্ সাহেব। শহর ফুড কমিটির সভাপতি হলেন সুপ্রসিদ্ধ এ্যাডভোকেট জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

ফুড কমিটি গঠনের ফলে বর্ধমানের অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আসে, এখানে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি রিলিফ কিচেন পরিচালনায় খুবই সাহায্য করেছিল।

এরপর আর এক উৎপাত দেখা দিল। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তিরা অনশন, অর্ধ অনশন, অখাদ্য কুখাদ্যজনিত রোগের শিকার হতে লাগল। বর্ধমান ফ্রেজার (পরে বিজয়চাঁদ) হাসপাতালের সিভিল সার্জেন শরদীশ রায় ও হাসপাতালের অনেক কর্মী, স্থানীয় রেডক্রশ এই সমস্ত ভুখাক্লিষ্ট রোগীদের চিকিৎসা ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। পার্টির তরফ থেকে চাঁদা তুলে ওষুধপত্র, ভুখা পেটের উপযোগী তরল খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৩৩ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের চাপে দেশে কাঁচামাল ও কৃষিজাত পণ্যের মূল্য খুবই কমে যায়। শিল্পজাত পণ্যের মূল্যও অনেক কমে। এর কোপ কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যেও পড়ে। চারিদিকে কলকারখানা বন্ধ, মজুর ছাঁটাই, বেকারী। এছাড়া মজুরির হারও কমে যায়। সবচেয়ে সঙ্কটে পড়ল ঋণগ্রস্ত

খাতকরা। যখন ধানের দর ছিল সাড়ে তিন টাকা মণ তখন এক শত মণ ধানের দাম ধরে ৩৫০ টাকা ধার নেয়। শোধ দেবার জন্য ধানের দর দাঁড়ালো আড়াই টাকা মণ তখন ধানের দর হিসেবে তাকে ১৪০ মণ ধান দিতে হল এর ওপর আবার চড়া হারে সুদ। ঋণের দায়ে চাষীরা জমি বিক্রি করতে লাগল কিংবা খাজনা দিতে না পারায় জমি খাস হয়ে পড়ে থাকছিল। কারণ নতুন করে বন্দোবস্ত নেবার কেউ নাই। সবাই বেচতে চায়। এর বিরুদ্ধে পার্টির তরফ থেকে খাজনা মকুব বা আদায় স্থগিত রাখার ও সুদের হার কমানোর, এবং দেনা উসুলের মামলা স্থগিত রাখার আবেদন জানান হয়।

পার্টির প্রচারের ফলে মহাজন বুঝতে পারে, খাতক জমি বিক্রী করে দিলে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবে। জমিদাব দেখলেন চাষী জমি ছেড়ে দিলে জমি অনাবাদী পড়ে থাকবে। ফলে পার্টির আন্দোলনের দ্বারা মহাজন ও জমিদারের শোষণ কিছুটা কমানো গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলনের ফলে Agricultural Debtors' Act পাশ হয়। এর ফলে মহাজনরা খাতকদের সঙ্গে একটা মাঝামাঝি রফায় এসে মিট্‌মাট করতে বাধ্য হয়। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে পার্টি আসানসোলে পার্টি সংগঠনের দিকে নজর দেয়। এই কাজে কলকাতা ও ২৪ পরগনা থেকে অনেক কর্মী এসে সংগঠনের কাজে লেগে যায়। শ্রমিক কেন্দ্রগুলিকে কাজে লাগিয়ে পার্টির প্রার্থী বঙ্কিম মুখার্জীকে জয়ী করান হয়। এর পর পার্টি এই শিল্পাঞ্চল এলাকায় শ্রমিক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা আসানসোলে কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলেন।

১৯৪৩ সালে বর্ধমান থেকে হায়দ্রাবাদের অধিবাসী মাহিন্দ্রকে আসানসোল অঞ্চলে খাদ্য আন্দোলন ও তার সঙ্গে বার্ণপুরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পাঠানো হয়। এই মাহিন্দ্র শান্তিনিকেতনে ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন ও বিতাড়িত হয়ে বর্ধমানে পার্টি অফিসে এসে কিছু দিন এখানকার ছাত্র আন্দোলনে কাটাবার পর পার্টির কর্মী হয়ে যান। আসানসোল আন্দোলনের সঙ্গে বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীও বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। বিনয়বাবু মাহিন্দ্রকে আসানসোল ও বার্ণপুরের শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব দিয়ে বার্ণপুরে বসিয়ে দিলেন। সে সময় শিবপ্রসাদ দত্ত কোলিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে কাজ করছিলেন; তিনি মাহিন্দ্রকে একজন একনিষ্ঠ দোসব পেয়ে যান।

কাটোয়ায় দাশরথি চৌধুরী ও অশ্বিনী মণ্ডলের প্রচেষ্টায় প্রথমে মাধবীতলায় ও পরে খেড়ো পাড়ায় পার্টি অফিস গড়ে ওঠে। এখান থেকে দাশরথি চৌধুরীর

চেষ্টায় বর্ধমান-কাটোয়া ও আহম্মদপুর-কাটোয়া রেলওয়ে ওয়ার্কার্সদের নিয়ে A. K. B.K. Railway men's union গঠিত হয় ও রেজেষ্ট্রি করান হয়। রেল কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন ভাঙার জন্য নেতা বৃদ্ধ খাঁকে হাত করবার জন্য তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকে। শেষে বৃদ্ধ খাঁ-র স্ত্রীর চেষ্টায় শ্রমিকদের কাছে মাপ চেয়ে নিয়ে তবে বৃদ্ধ পরিত্রাণ পায়।

এরপর পার্টি মঙ্গলকোট ও আউসগ্রামে অজয় নদীর বাঁধ ভাঙা প্রতিরোধ আন্দোলনে নামে। ১৯৪৩ সালে বন্যায় আউসগ্রাম থানার রামনগর, বেরেণ্ডা, উক্তা, পিচকুরি, ভেদিয়া, গুসকরা ও মঙ্গলকোট থানার গতিষ্ঠা, লাকুরডি, পালিগ্রাম, এবং চানক-অজয়ের বাঁধ ভাঙায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ভেদিয়ার কাছে বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় ও তা না সারানোয় প্রায় প্রতি বছরই পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি বন্যার শিকার হয়। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা বাঁধ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সরকারের কাছে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে বাঁধ এলাকা জমিদারের স্বত্বাধীন; কাজেই বাঁধ মেরামতের ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জমিদারের; সরকারের কোন দায়িত্বই নেই। ১৯৪৪ সালে বাঁধ কমিটির উদ্যোগে গুসকরায় এক বিরাট জনসমাবেশ করা হয়। সভাপতিত্ব করেন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাব। সেখান থেকে প্রস্তাব নিয়ে সরকারের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু তাতেও কোন কাজ না হওয়ায়, ৯টি ইউনিয়নের সদস্যগণ একযোগে পদত্যাগ করে সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে একেবারে অচল করে দেন। ক্রমশ আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। তখন সরকার বাঁধ মেরামত করতে রাজী হন। সে সময় Superintending Engineer ছিলেন জি. মণ্ডল। তিনি জুন মাস পড়ে যাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে বাঁধ মেরামতির কাজ ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করলেন। তখন পার্টির তরফ থেকে যত প্রয়োজন তত লেবার সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিলে ইঞ্জিনিয়ার বাঁধ নির্মাণ করতে বাধ্য হন। পার্টি থেকে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ/ছয় হাজার লেবার যোগাড় করে দেওয়া হয়। ফলে বাঁধ বর্ষার আগেই শেষ হয়ে যায়। এই বাঁধ ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অক্ষত ছিল। এই বাঁধ-আন্দোলনে লোক সরবরাহ করে সফল করার ফলে এই এলাকায় পার্টির জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেড়ে যায়।

১৯৪৬ সালে সরকার থেকে ক্যানেলকর বৃদ্ধির নোটিশ জারি হলো। কৃষক সমিতি এই করবৃদ্ধি রোখবার জন্য বদ্ধপরিকর হল। এই ভাবে দ্বিতীয় ক্যানেলকর-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। পার্টি ইতিমধ্যে জেলার বিভিন্ন গ্রামে

বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পার্টি থেকে জনগণের মধ্যে ক্যানেলকর বন্ধ করার ডাক দেওয়া হয়। সরকারও পূর্বের পদ্ধতি অনুসরণ করে সার্টিফিকেট জারি করে গরু বাছুর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করতে আরম্ভ করল। গরু ক্রোক করে সেই গ্রামের খোঁয়াড়ে না রেখে অন্য গ্রামের খোঁয়াড়ে চালান দিতে লাগল। গরু-নিলাম বন্ধ করবার জন্য সমিতি স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশনের সহায়তা নিয়ে খোঁয়াড়ের সামনে সত্যাগ্রহ শুরু করল। মণ্ডলগ্রামের কাছে ষাঁড়গাছি গ্রামে শাহেদুল্লাহ ও বিনয় চৌধুরী সত্যাগ্রহ ক্যাম্প গড়ে তোলেন। এরপর শাহেদুল্লাহ সাহেবকে ক্যাম্পের দায়িত্বে রেখে বিনয়বাবু চারপাশের গ্রামে প্রচারে বেরিয়ে যান। তখন পুলিশ বিনয়বাবু, শাহেদুল্লাহ্ ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ এনে গ্রেপ্তার করে। পরে অবশ্য এঁরা জামিনে মুক্তি পান। ইতিমধ্যে দ্রুত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হচ্ছে। লীগের ঘোষণামত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করে জেলার চারদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মহড়া চলছে। বেলাড়ি, মণ্ডল-গ্রাম, বর্ধমান, হরিবাটীতেও ব্যাপক দাঙ্গার সূচনা হয়; কিছু ক্ষেত্রে পার্টির চেষ্টায়, কিছু ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপে, অপর কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের চেষ্টায় দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে নাই। এর বিশদ বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এর পর কেন্দ্রে জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭ সালে যে মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়, তাতে বর্ধমান থেকে যাদবেন্দ্র পাঁজা অন্তর্ভুক্ত হন। পাঁজামশাই মন্ত্রী হয়েই বিনয়বাবুদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা তুলে নেন। ক্যানেলকর কিছুটা কমান হয়। এবারের ক্যানেলকর আন্দোলন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই।

১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পরই আসে দেশবিভাজনের প্রশ্ন। বর্ধমানের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ United Bengal Movement-এর পক্ষে ছিলেন যদিও ডঃ জি. অধিকারীর থিসিসে পাকিস্তান দাবী ও দেশবিভাগকে মেনে নেওয়া হয়েছিল। যাই হোক—বাংলা, বিহার, পাঞ্জাবসহ সমগ্র উত্তর ভারতে ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দেশবিভাগ মেনে নেয় ও ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হল। এর পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করল 'এ আজাদী ঝুটা' নয়, এ আজাদী লক্ষ লক্ষ বীর শহীদের রক্তে রঞ্জিত আজাদী। এ আজাদী রূঢ় বাস্তব সত্য। জেলা জুড়ে সাড়ম্বরে স্বাধীনতা উৎসব পালিত হল। অবশ্য দেশের বিরাট অংশে ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এবং পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলা থেকে কাতারে কাতারে শরণার্থী আসার পরিপ্রেক্ষিতে উৎসবের জৌলুস অনেকটাই ম্লান হয়ে গেল।

১৯৪৭ সালে কলকাতায় পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। সে সময় দেশ ভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী বনগাঁ, বেনাপোল, ২৪ পরগনা, শিয়ালদহ, হাওড়া, কলকাতা ও এমন কি মফস্বল শহরে ভিড় করেছে। সরকার থেকে তাদের জন্য রিলিফ ক্যাম্পে রেখে 'ডোল' দেওয়ার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিয়ালদহ, বনগাঁ, ২৪ পরগনা থেকে উদ্বৃত্ত উদ্বাস্তুদের মফস্বলে যেমন বর্ধমান, পানাগড়, দেবপুরের কাছে দাওরার ডাঙ্গা, ওড়গ্রামের ডাঙ্গা, রাজবাঁধ-এর কাছে শিবপুর, গোপালপুর বিশেষ করে যেখানে যেখানে মিলিটারী ক্যাম্প হয়েছিল সেই সব জায়গায়, কাঞ্চননগর, ইছলাবাদ, লাকুর্ডি চারদিকে এদের পাঠিয়ে দিয়ে সাপ্তাহিক ডোল, বাড়ী তৈরীর জন্য অনুদান, জায়গা, নামমাত্র সুদে বাড়ী তৈরীর জন্য ঋণ, সরকারী-বেসরকারী সবরকম চাকুরীতে শরণার্থীদের অগ্রাধিকার দিয়ে সাহায্য করা হয়। কিন্তু এত শরণার্থী আসতে থাকে যে ব্রিটিশের ছেড়ে যাওয়া শূন্যপ্রায় অর্থ ভাণ্ডার নিয়ে এত শরণার্থীকে সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। একটা সর্বস্বান্ত ছিন্নমূল পরিবারকে যতটা সাহায্য দেওয়া উচিত তা দেওয়া সম্ভব হয় নাই একথাও সত্য। কেন্দ্রে ও পশ্চিমবঙ্গে পৃথক ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরও খোলা হয়। কিন্তু সাহায্য বা খয়রাতির সিংহভাগ দালালদের ও সরকারী অফিসারদের পকেটে যায়। শরণার্থীদের মধ্যেও কিছু কিছু অসৎ প্রবৃত্তির লোকও ছিল। তারা একবার বাড়ীর সরঞ্জাম পেয়ে সেগুলি বিক্রি করে নাম ভাঁড়িয়ে অন্যত্র শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। কিছুদিন Relief and Rehabilitation Department-এ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থেকে এ সম্বন্ধে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। তবে অপ্রতুল সাহায্য ও শরণার্থীদের পুনর্বাসনে অব্যবস্থা প্রভৃতির কারণে শরণার্থীদের মধ্যে যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ জমে উঠেছিল, কমিউনিস্ট পার্টি তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে শরণার্থীদের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে তৎপর হয়; এর ফলে ভবিষ্যতে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের অধিকাংশই পার্টির সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এই হিসেবে দেশবিভাগ পার্টির কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। শরণার্থীদের সমর্থন পার্টির পক্ষে এক বিরাট লাভ।

কলকাতায় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান সদস্য রাধারমণ মিত্রের উপস্থিতি সম্মেলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়। কাজেই পার্টির নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যান। নেতৃবৃন্দ গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামীণ মানুষের কাছে পার্টির আদর্শ প্রচার করেন ও সংগঠনকে দৃঢ়

করতে প্রয়াস পান। ইতিমধ্যে প্রভাত কুণ্ডু ও হরেকৃষ্ণ কোঙার জেল থেকে মুক্তি পান। প্রভাতবাবু বর্ধমানেই থেকে যান আর হরেকৃষ্ণবাবু আন্ডার গ্রাউন্ডে গিয়ে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বেতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, বর্ধমান থেকে প্রতিনিধি হিসেবে যান সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, বিনয় চৌধুরী, আসানসোলের নিরঞ্জন ডিহিদার ও বার্ণপুরের প্যাটেল। সি.আই.ডি., আই.বি.-এর দৃষ্টি এড়িয়ে নেতারা বোম্বে থেকে বর্ধমান ফিরলেন। এরপর কাশিয়াড়ায় কৃষক সম্মেলন হল। সম্মেলন বেশ সাফল্যের সঙ্গেই উদ্‌যাপিত হল।

এরপর বিনয়বাবু, বিপদতারণ রায়, রায়নাতে গিয়ে তেভাগা আন্দোলন শুরু করে দেন। অগ্রদ্বীপে সুবোধ চৌধুরী, শান্তিব্রত (রবি রায়ের ছদ্মনাম) ও সুনীল রায়-এর নেতৃত্বে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গোয়ালা চাষীদের সংঘবদ্ধ করে সভা করেন। পুলিশের নজর পড়ে। বক্তৃতা দেবার সময় পুলিশ বাধা দিতে গেলে চাষীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে ও পুলিশের রাইফেল ছিনতাই হয়। ফলে চাষীদের ওপর পুলিশের অত্যাচার চরমে ওঠে। চারদিকে ধরপাকড় চলে। অগ্রদ্বীপের সম্মেলনকে বানচাল করার জন্য পুলিশ জমিদারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। আন্দোলনও চরম আকার ধারণ করে। তখন সরকার বন্দুকধারী রিজার্ভ ফোর্স নামাতে বাধ্য হয়। পুলিশের গুলি চলে। গুলি চালানোর সময় পুলিশের বেয়নেটের আঘাতে সুনীল পাল নিহত হন। ব্যাপক গ্রেপ্তার আরম্ভ হয়। জেলার অন্যত্র নেতাদের গ্রেপ্তার করা হতে থাকে। বর্ধমান জেলে অগ্রদ্বীপের চার চাষী, আসানসোলের কোলিয়ারী শ্রমিক, বর্ধমান শহরের ছাত্র ফেডারেশনের নেতা, রিক্‌শা ইউনিয়নের নেতা মিলে পার্টির অনেকেই তখন বন্দী। ৮/১০ মাস বন্দীদের হাজতবাস করতে হয়। তারপর হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের ফলে কেস শুরু হয় ও সাক্ষ্য প্রমাণাভাবে প্রায় সকলেই মুক্তি পান।

১৯৫১ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় জমিতে উৎপাদনের হার কমেছে পাম্পের মাধ্যমে জলসেচের দিকে সরকারের বিশেষ নজর ছিল না। অথচ আমার ধারণা চাষীকে যদি অল্প সুদে ঋণ দিয়ে রাসায়নিক সার কিনতে সাহায্য করা হয় ও ক্যানেল থেকে কিংবা গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে পাম্পের মাধ্যমে জমিতে একাধিকবার জলসেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তা হলে চাষীরা জমিতে সোনা ফলাতে পারে। ১৯৫১ সাল থেকেই পার্টি ভুখা মিছিল বের করে খাদ্য আন্দোলন তীব্রতর করে তোলে। ১৯৫২ সালেও একই দিনে ভুখা মিছিলের

ব্যবস্থা করা হয়। র‍্যালির দিন ভোরবেলায় বিনয় চৌধুরী মশাই গ্রেপ্তার হন। পুলিশের প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে বিনয় কোঙার র‍্যালিকে সার্থক করে তোলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল গ্রামের কৃষকদের মধ্যে ও শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে। কিন্তু সমাজের বঞ্চিত শিক্ষক, রাজকর্মচারী, চালকল কর্মচারী, সরকারী কর্মচারী সকলের মধ্যেই পার্টি-সংগঠন গড়ে তোলার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক সর্বস্তরের শিক্ষকদের বেতন পঞ্চাশের দশকেও ছিল খুবই কম। মুদালিয়ার কমিশন শিক্ষকদের বেতন কাঠামো সংশোধন করার সুপারিশ করলেও কাজের কাজ কিছু হয় নাই। পার্টির উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এ.বি.টি.এ.), মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন, রিক্সাচালক ইউনিয়ন, বাসকর্মচারী ইউনিয়ন, চালকল শ্রমিক ইউনিয়ন, মিউনিসিপ্যালিটি শ্রমিক ইউনিয়ন, সরকারী কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রভৃতি অসংখ্য ইউনিয়ন গঠন করে পার্টির কর্মক্ষেত্র সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ও পার্টি প্রত্যেক সংগঠনের দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ধর্মঘট, ভুখা মিছিল প্রভৃতি পরিচালনা করে।

স্বাধীনতার পর বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জেলার আন্দোলন জঙ্গী হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের দুটি প্রধান শাখা কৃষকদের নিয়ে ভূমি সংস্কার আন্দোলন আর শ্রমিকদের নিয়ে শিল্পাঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। ষাটের দশকের গোড়া পর্যন্ত ছিল এক পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইন্ডিয়া। ১৯৬৪ সালে পার্টির মধ্যে নীতি, পথ, মত, আদর্শ ও কর্মপন্থা নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয় তাতে বর্ধমান জেলার বেশীর ভাগ নেতা-শ্রেণী সমঝোতা নীতির বিরোধিতা ও বিপ্লবী মতাদর্শ প্রচারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিছু নেতা অবশ্য সমঝোতার নীতি আঁকড়ে থাকেন। ফলে সারা ভারতের সঙ্গে বর্ধমানেও পার্টি দু-ভাগ হয়ে যায়। জেলার অধিকাংশ সদস্য ছিলেন বিপ্লবী ও জঙ্গী মতাদর্শে বিশ্বাসী, তাঁরা নতুন কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) দলভুক্ত হলেন। আর যাঁরা শ্রেণী সমঝোতার নীতিতে অনড় রইলেন, তাঁরা মূল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতেই রয়ে গেলেন। তবে এঁদের সংখ্যা খুবই কম। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হল সর্বভারতীয় পার্টি আর মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি আঞ্চলিক দলে পরিণত হল। এদের প্রধান কর্মক্ষেত্র পশ্চিমবাংলা ও কেরালায় সীমাবদ্ধ রইল। ১৯৬৪ সালে বর্ধমানে যে পার্টির প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়, তাতেই সি.পি.আই (এম) পার্টির মতাদর্শ ও পথের নির্দেশিকা রচিত হয়। জেলার জনগণের মধ্যেও সি.পি.আই. (এম)-এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

শ্রমিক সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন :

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন হয় বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে। আর এই দশকের গোড়ার দিকে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে। দুর্গাপুরসহ আসানসোল, রানীগঞ্জ, অন্ডাল, বার্ণপুর, কুলটির শিল্পাঞ্চল ও কয়লাখনি অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) শ্রমিক সংগঠনের ওপর জোর দেয়।

ভারতের ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ক্রমে ক্রমে পাটকল, কাপড়ের কল, কাগজের কল, লৌহ-ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেছে অন্ডাল রানীগঞ্জে ও দেশের অন্যত্র। সীতারামপুর অঞ্চলে একের পর এক কয়লাখনি আবিষ্কৃত হতে থাকে। এইসব শিল্পে বহু শ্রমিক নিয়োগ কবা হয়। কিন্তু শ্রমিকদের কোন সংগঠন না থাকায় শিল্পপতি ও খনি মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করে এবং অন্যান্য নানাভাবে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে থাকে। ১৯১৮ সালের আগে পর্যন্ত কোন সংগঠিত শ্রমিক সংস্থা গড়ে ওঠে নাই। ১৯১৮ সাল থেকে বিভিন্ন কলকারখানায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিটি কলকারখানা বা পাটকলে, কাপড়ের কলে পৃথক পৃথক শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয় ও ২/১ ক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্মঘটও হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এরকম বহু শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে। অবশেষে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (All India Trade Union Congress—A.I.T.U.C) স্থাপিত হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে AITUC এর দশম অধিবেশনে কমিউনিস্ট পার্টি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দখল করে। ১৯৩১ সালে কলকাতায় AITUC-এর একাদশ অধিবেশনে কংগ্রেসের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ AITUC থেকে বেরিয়ে আসেন ও All India Red Trade Union Congress গঠন করেন। এখন Trade Union Congress-এর তিন শাখা দাঁড়ায়। কংগ্রেস পরিচালিত AITUC কংগ্রেস বামপন্থীদের AIRTUC এবং কমিউনিস্ট পরিচালিত AITUC। তিনটি সংগঠন থাকায় শ্রমিক স্বার্থ ঠিক মত গুরুত্ব পায় না। ১৯৩১ সালে বোম্বে কনফারেন্সে একবার তিনটি সংগঠনকে এক করার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়। শেষে যখন দেখা গেল কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পরিচালিত সংগঠনের মতপার্থক্য দূর হবার নয় তখন ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে প্রতিনিধি সম্মেলন গঠিত হয়েছিল সেই প্রতিনিধি সম্মেলন (Representive Conference) অন্য সমস্ত সংগঠনের জন্য একটি পৃথক কংগ্রেস গঠনের সিদ্ধান্ত নেন এবং এর ফলে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে National Trade Union Congress গঠিত হল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে AITUC-এর দুটি শাখা (কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট) নিজেদের মতপার্থক্য

খানিকটা মিটিয়ে নেয় এবং মূল সংস্থাকে কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসেবে মেনে নিতে রাজী হয়। দুটি সংস্থা AITUC ও NTUC শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে সমঝোতা নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। বিশিষ্ট সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা B.T. Ranadive এর মতে "The AITUC which over long years had grown as the rallying centre for all militant trade unions in the country for carrying forward the united struggle of the working class had ceased to be so due to the class collaborationist policies of the Dangeites and is serving as an instrument in their hands for splitting the trade unions and disrupting the united struggle of the workers."

তাছাড়া ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সমস্ত শ্রেণীসংগ্রাম, ধর্মঘট শিল্পাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে এগুলির কোনটিই AITUC বা NTUC দ্বারা পরিচালিত ছিল না। এই সমস্ত ধর্মঘটের ফলে ৪০ শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে AITUC-এর অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠন দ্বারা ধর্মঘটের শতকরা ৪৭ ভাগ AITUNC-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। বেশীর ভাগই হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা ছিল না। সেকারণ ১৯৭০ সালের এপ্রিলে AITUC এর General Council ও State Committee-এর উদ্যোগে যে পার্টি কংগ্রেস হয় তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতায় ২০—৩০ মে ১৯৭০ অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে জঙ্গী সংগঠন Centre of Indian Trade Unions—CITU) প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট পরিচালিত CITU-এর নেতৃত্বে এরপর থেকে জেলার অধিকাংশ ধর্মঘট ও শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। এরপর ১৯৭৮ সালে হাওড়ার সালকিয়ার পার্টির দ্বিতীয় প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয় ও সেই প্লেনামে পার্টির সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তারপর দীর্ঘদিন পার্টির কোন প্লেনাম হয় নাই। ২০০০ সালে সেপ্টেম্বরে ৩য় Plenum হবার কথা ছিল। অথচ আগামী একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উনবিংশ শতাব্দীর দলীয় নীতি ও আদর্শ কতটা উপযোগী হবে কিংবা পার্টির বিপ্লবাত্মক কৃষক-শ্রমিক-আন্দোলনের পাশাপাশি কেন্দ্রের বুর্জোয়া সরকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কেন্দ্রে ক্ষমতায় যাওয়া কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সেটা নির্ধারণের জন্য পার্টির প্লেনাম খুবই জরুরী। অবশেষে ২০শে অক্টোবর থেকে ২৩শে অক্টোবর কেরালার রাজধানী থিরুভানমপুরমে পার্টির বিশেষ অধিবেশন (special conference) অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী ই.কে.নায়ানার। এই প্লেনামে ৩৯৩

জন প্রতিনিধি যোগ দেন। প্লেনামের সূচনায় নায়ানার এই বিশেষ অধিবেশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন—Amendments to the party Programme will be without any deviation from the principles of Marxism-Leninism and participation in the central government foreign investments, issues of Languages will be some of main issues for the consideration of the Plenum. এই প্লেনামেই আনুষ্ঠানিকভাবে অকংগ্রেসী-অবিজেপি দল নিয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার সূচনা হয় ও এই তৃতীয় ফ্রন্ট নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলে কেন্দ্রে সরকার গঠনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (Source People's : Democracy 22/10/2000 & 12/11/2000)। এবার শ্রমিক সংগঠনে ফিরে আসি।

১৯৩৭ সালে আইনসভার নির্বাচনে আসানসোল-রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্কিম মুখার্জী জয়ী হন। এরপর খনি অঞ্চলে কাজ করার জন্য নিত্যানন্দ চৌধুরীকে এই অঞ্চলে পাঠানো হয়। এখানকার শ্রমিক সংগঠনের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন টাটার শ্রমিক নেতা মানেক হোমী। মানেকের কর্মক্ষেত্র ছিল ধানবাদ আসানসোল ও রানীগঞ্জ অঞ্চলে। বিহারে এ্যাসেম্‌ব্লি নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হয়, কাজেই ওখানকার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কংগ্রেসের কব্জায় চলে গেল।

তখন আসানসোল, রানীগঞ্জ, কুলটি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব পড়ে অমূল্য ঘোষ ও নিত্যানন্দ চৌধুরীর উপর। রানীগঞ্জ কাগজকল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হন বঙ্কিম মুখার্জী, সহসভাপতি আবদুল মোমিন সাহেব ও সম্পাদক হন নিত্যানন্দ চৌধুরী এবং সহ-সম্পাদক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর থেকে কাগজ কলে ধর্মঘট শুরু হয়। ১৫ই নভেম্বর যখন কলের শ্রমিকদের শিফট পরিবর্তন হচ্ছে, তখন কাগজকলের ম্যানেজার লো সাহেব ও ইঞ্জিনিয়ার ব্রাউন সাহেব একটা ট্রাকে করে বাইরে থেকে লোক এনে কাগজকলে ধর্মঘট ভাঙতে মিলের দিকে যাচ্ছিলেন। ট্রাক যখন ইউনিয়ন অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইউনিয়ন অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ট্রাক আটক করেন। ম্যানেজার ব্রাউন সাহেবের হুকুমে ট্রাকের ড্রাইভার সুকুমার বাবুর বুকের ওপর দিয়ে লরি চালিয়ে দেয়। সুকুমার শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কাগজকলের অফিস-কর্মচারী ও কিছু উচ্চপদস্থ অফিসারও শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেন। ধর্মঘট চলে পাঁচ মাস। বিনয় চৌধুরী,

নিত্যানন্দ চৌধুরী, বলদেও, যশবন্তিয়া, দাসী বাউড়ীসহ চারজন মহিলা শ্রমিক গ্রেপ্তার হন। বিচারে এদের ৬ মাস জেল হয় এবং আসানসোল জেলে বন্দী করে রাখা হয়। কিছুদিন পর বিনয়বাবু ও নিত্যানন্দ চৌধুরীকে আলিপুর জেলে পাঠান হয়। ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ডিসেম্বরে বিনয়বাবুসহ সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৩৮ সালে বিনয়বাবু কুমারডুবি অঞ্চলে আত্মগোপন করেন ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের সঙ্গে বরাকর অঞ্চলে ভিক্টোরিযা কোলিযাবী, রামনগর কোলিয়ারী এবং জামুরিয়া অঞ্চলে বাঁকাসিমুলিয়া কোলিয়ারী, দিশেরগড় কোলিয়ারী, শ্রীপুর, দিঘা, চিনাকুড়, প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলেন।

১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। তখন বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, নিত্যানন্দ চৌধুরী, বঙ্কিম মুখার্জী সকলে বাইরে এসে কোলিয়ারী অঞ্চলে কাজ শুরু করেন ও Bengal Coal Workers' Union গঠন করেন। এর সভাপতি হন বঙ্কিম মুখার্জী আর সম্পাদক হন বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী। এসময় কয়লাখনি-শিল্পে শ্রমিকদেব অবস্থা একবার পর্যালোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

কয়লাখনি অঞ্চলে শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেবার জন্য ভারত সরকার থেকে ১৯৪৫ সালে Cost of Living Indian Scheme, Govt of India-এর Director এস. আর দেশপাণ্ডেকে নিয়োগ করা হয়। দেশপাণ্ডে বিভিন্ন কয়লা খনিতে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, মজুরি, কাজের ধারা, আবাসন, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক তদন্ত করে ১৯৪৬ সালে এক বিস্তৃত রিপোর্ট দাখিল করেন।

দেশপাণ্ডে রানীগঞ্জ এলাকার ৩৯টি খনি অঞ্চলের ৬৩টি পরিবারের আয়-ব্যয় সমীক্ষা করে যে রিপোর্ট দেন তার থেকে জানা যায় প্রতি শ্রমিক পরিবারের গড় আয়তন ৩.৬২ জন। সাপ্তাহিক মজুরি ১২/৬ (বার টাকা এক আনা ছয় পাই) বর্তমানের মুদ্রায় ১২.১০ টাকা) সাপ্তাহিক ব্যয় দশ টাকা দশ আনা দু পাই (বর্তমান মুদ্রায় ১০.৬৩ টাকা) এই খরচের মধ্যে মাথাপিছু দৈনিক নয় ছটাক চালের খরচ ধরে চালের বাবদ প্রতি শ্রমিকের সপ্তাহে গড় খরচ দাঁড়ায় তিন টাকা পাঁচ আনা দশ পাই (বর্তমান মুদ্রায় ৩.৩৭ টাকা)। খাদ্য খুবই নিম্নমানের। সঞ্চয় হওয়ার কথা (এক টাকা নয় আনা চার পাই অর্থাৎ ১.৪৭); কিন্তু রোগ ভোগ, বিবাহ বা পারিবারিক অনুষ্ঠানের জন্য, তাছাড়া মদ্যপান বা অন্যান্য নেশার খরচ যোগাতে বেশীর ভাগ শ্রমিকের সঞ্চয় তো হতই না উপরন্তু দেনা

হত। হিসাবে দেখা গেছে শ্রমিকদের ২২.৬ শতাংশ প্রতি মাসেই ঋণগ্রস্ত হত। ঋণ করতে হত শতকরা ১৫ থেকে ৬০০ টাকা সুদে।

কয়লাখনি সাধারণত গ্রাম থেকে দূরে শহরাঞ্চলে অবস্থিত, তাই খনির মালিকদের শ্রমিকদের জন্য আবাসন (স্থানীয় নাম ধাওড়া) তৈরী করে দিতে হত। ধাওড়ায় এক এক শ্রমিক পরিবারের জন্য একটি কামরা ও সংশ্লিষ্ট বারান্দা, ছোট টালির ছাদ। এক একটি ঘরে থাকতে হয় চার থেকে দশজনকে। মেঝে কাঁচা, জলের জন্য পাতকুয়ো বা পুকুরই ভরসা, স্যানিটারির নামগন্ধ নাই; চিকিৎসার সুবিধা নামকোওয়াস্তে। ফলে বেশীর ভাগ শ্রমিক বা তার পরিবারের লোক নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, থাইসিস, ডাইরিয়া, চোখের রোগ, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি রোগের শিকার হয়। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

প্রথম দিকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন খুবই দুর্বল ছিল। রানীগঞ্জে কোন শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয় নাই। ১৯৩৮-এর পূর্বে কোন ধর্মঘট হয় নাই।

১৯৪৩ সালে Bengal Coal Workers' Union গঠিত হয়। বিনয় চৌধুরী, বঙ্কিম মুখার্জী, কে. এল. মহেন্দ্র, রঞ্জিৎ গুহ এদের চেষ্টায় ১৯৪৩ সালে বার্ণপুর ইস্কোতে ইউনিয়ন গঠন করা হয়। কে. এল. মহেন্দ্র হন সম্পাদক। কিন্তু ১৯৪৫ সালে টাটা ইউনিয়নের নেতা আবদুল বারি ইউনিয়ন দখল করে, তবে কিছুদিনের মধ্যেই বারিকে হটিয়ে তাহের হোসেনের চেষ্টায় ইস্কো কমিউনিস্ট পার্টির দখলে আসে। পানাগড় অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীর শ্রমিক ইউনিয়ন প্রথমে কংগ্রেসের দখলে ছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে কাশীনাথ হাজরা চৌধুরী, সুনীল বসু রায়, অনিল রায়-এর উদ্যোগে এই পানাগড় ইউনিয়ন কমিউনিস্টদের কব্জায় আসে। এই ভাবে স্বাধীনতার আগে আসানসোল-রানীগঞ্জ-বার্ণপুর-পানাগড় শিল্পাঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কিছুটা অগ্রগতি হয়।

স্বাধীনতার পর দামোদর নদীর পাশে বরাকর, কুলটি, অন্ডাল, দুর্গাপুর নিয়ে নতুন দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে। বরাকর কুলটি নিয়ে গড়ে উঠেছে দুই শত বছরের পুরানো কয়লাখনি অঞ্চল। রানীগঞ্জ-দুর্গাপুরে বার্ণস রিফ্রাক্টরিজের দুটি ইউনিট, সাইকেল করপোরেশন, বেঙ্গল পেপার মিল, হিন্দুস্তান পিলকিনটন গ্লাস ওয়ার্কস, বেঙ্গল রিফ্রাক্টরিজ, ইস্কো, বার্ণপুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এইসব শিল্প গড়ে ওঠেছে।

দুর্গাপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স-এর মধ্যে ১৯৭০–৭১ সেশনের হিসাবে দেখা যায় ২০টি বড় ও মাঝারি শিল্প এবং ৪০টি ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে। এই সব শিল্পে ৬০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছিল আর ৬০,০০০ কর্মীর কর্মসংস্থান

হয়। প্রধান প্রধান শিল্প হল Durgapur Steel Plant, Durgapur Projects Ltd., Acc Vickeys Babeock—(AVB) সিমেন্ট উৎপাদন ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের সংস্থা, Boilers, Pressure Vessels, Alloy Steel Plant (unit of SAIL)—নানা রকমের Alloy Steel উৎপাদন সংস্থা, Durgapur Chemicals Ltd (D.C.L)—এটি একটি স্টেট গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং ও মৌলিক অরগানিক ও ইনঅরগানিক কেমিক্যালস্ তৈরী করে—Durgapur Thermal Power Station (unit of D.V.C), Mining and Allied Machinery Corporation (M.A.M.C) এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা, Coal mining, Bulk Handling Equipments and other heavy machinery, Durgapur Coal mining Machinery plant, Heavy Engineering Corporation. HEC ও MAMC রাঁচী থেকে ১৯৫৭ সালের মে মাসে স্থানান্তরিত হয়ে দুর্গাপুরে আসে। এছাড়া আছে Durgapur Fertilizer Projects—পশ্চিমবাংলার প্রথম সার উৎপাদন প্রকল্প। Durgapur Projects Ltd-এর মধ্যে আছে Coke oven Plant, Thermal Power Station, Gas grid. আর A New Industrial Site Offering Industrial Sites of Modern Facilities.

১৯১২ সালে আসানসোল মাইনস্ বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৪২-৪৩ সালে বোর্ডের আয়তন ছিল ৪১৩ বর্গ মাইল, ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ৫,১২,৬১৬, এর মধ্যে আসানসোল পুরসভা এলাকার জনসংখ্যা ৫৫,৭৯৭, রানীগঞ্জ এলাকার ২২৮৩৯ এবং গ্রামাঞ্চলের কয়লাখনি ও কারখানাসহ জনসংখ্যা ৪,৩৩,৯৮০। বোর্ডের এলাকাধীন গ্রামের সংখ্যা ৪৯০, চালু কোলিয়ারী ১৩০। এছাড়া আছে বার্ণপুর এবং কুলটিতে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, আর রানীগঞ্জে কাগজকল ও সেরামিক কারখানা।

বাজার এলাকা যেমন নিয়ামতপুর, দোমহানী, জামুরিয়া, বল্লভপুর, অন্ডাল, বরাকর, বেগুনিয়া, কেন্দুয়া, সীতারামপুর, কালিপাহাড়ীসহ বার্ণপুর ও কুলটি অঞ্চলে ১৯৬৫ সালে চালু কোলিয়ারীর সংখ্যা ছিল ২০০। ১৯৬৩, ৬৪, ৬৫ সালে বিভিন্ন কোলিয়ারীতে পুরুষ ও মহিলা কর্মীর সংখ্যা ছিল :–

	১৯৬৩	১৯৬৪	১৯৬৫
(ক) স্থায়ী (settled)	৮৬,৮৪৪	৮০,৩৩১	৯৫,৮২৯
(খ) অস্থায়ী (Floating)	২৬,৪৮৩	২২,০৪৮	৩৪,২৩২
(গ) স্থানীয় অন্যান্য	৩০,৯০১	৩২,৩১৬	৩০,৬৩৩
মোট	১৪৪২২৮	১৩৪৬৯৫	১৬০৬৯৪

এই কর্মীর মধ্যে বিভিন্ন বৎসরে আন্ডার গ্রাউন্ড ও সার্কেলে কর্মরত পুরুষ ও মহিলার পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নরূপ—

বৎসর		আন্ডারগ্রাউণ্ড	সার্কেল	মোট
১৯৬৩	পুরুষ	৫৭,৪৯৪	৩৬,২৭২	৯৩,৭৬৬
	মহিলা	—	৫,৩৫০	৫,৩৫০
১৯৬৪	পুরুষ	৪৬,৩৮৩	২২,৩৩৭	৬৮,৭২০
	মহিলা	—	৪৯৬১	৪৯৬১
১৯৬৫	পুরুষ	৫৯,১৫৯	২৪,৬১৭	৮৩,৭৭৬
	মহিলা	—	৪,৫০৩	৪,৫০৩

তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা ধারাবাহিক ভাবে কমেছে। ১৯৪৯ সালে মহিলার সংখ্যা ছিল ১০৮৫৮। এই সংখ্যা কমতে কমতে ১৯৬৫-তে দাঁড়ায় ৪৫০৩-এ। ১৯৪৬ সালে ইন্ডিয়ান কোল ফিল্ডস্ কমিটি (Indian Coal Field Committee) গঠিত হয়। দেশপাণ্ডে রিপোর্টে শ্রমিকদের মজুরী, সুখসুবিধা আরও ভাল করার জন্য সুপারিশ করা হয়। National Commission of Labour-এর সুপারিশক্রমে Board of Conciliation গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১২ই মে কনসিলিয়েশন বোর্ডের রায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই রায় শ্রমিকদের বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে পারে নাই। কনসিলিয়েশন বোর্ডের রায়কে সংশোধন করে এক সর্বাঙ্গীন নতুন মজুরী, কাজের সময় ইত্যাদি বিষয়ে একটি নতুন রায়ের দাবীতে সব ট্রেড ইউনিয়নই ধর্মঘটের নোটিশ দেয়। AITUC-ও এই ধর্মঘটে যোগদান করে। ধর্মঘটী ইউনিয়নগুলির মধ্যে দেবেন

সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত কোলিয়ারী মজদুর কংগ্রেস ছিল অন্যতম। ভারত সরকারের হস্তক্ষেপে শ্রমমন্ত্রক দাবিগুলি বিবেচনা ও মীমাংসার জন্য দাশগুপ্ত অ্যাপেলেট ট্রাইবুন্যাল গঠন করে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এর রায় বের হয়। দাশগুপ্ত ট্রাইবুন্যাল-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল Daily rated শ্রমিকদের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির স্কেল ও কয়েকটি Monthly rated শ্রমিকদের জন্য টাইম-স্কেল প্রবর্তনের সুপারিশ।

১৯৫২ সালের ফেব্রুযারী মাসের ৬ই থেকে এপ্রিল মাসের ২৩ পর্যন্ত মুসলিয়া কোলিযারীতে, ১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত ইকড়ানডি কোলিয়ারিতে, ও ২৫শে আগস্ট থেকে ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত কে. সি. পাল চৌধুরী কোলিযারিতে ধর্মঘট চলে। অক্টোবর মাসে কাজোরা ও ওয়েষ্ট কাজোরা কোলিয়ারী, শিবপুর পলিযাটি ওয়ার্কশপে ও রিযাল কাজোরা কোলিয়ারীতে আর নভেম্বরে পাট মোহনায় শ্রমিক ধর্মঘট হয়।

ধর্মঘটের পাশাপাশি বিভিন্ন কোলিয়ারীতে লক আউটও ঘোষিত হয়, যেমন সেন্ট্রাল সামনা কোলিয়ারীতে ১।৩।৫২ থেকে ২৪।৩।৫২ পর্যন্ত, দেশেরমোহন কোলিয়ারীতে ১৫।৫।৫২ থেকে ২৩।৬।৫২ পর্যন্ত, সেন্ট্রাল জামুরিয়া কোলিয়ারীতে ২৯।৫।৫২ থেকে ২৫।১০।৫২ পর্যন্ত ও মণ্ডলপুর কোলিয়াবীতে, ১০।৬।৫২ থেকে ১৫।১২।৫২ আবার ২০।১২।৫২ থেকে ২৪।৩।৫৩ পর্যন্ত লক-আউট ঘোষিত হয়।

১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ প্রত্যেক বছরেই কোন না কোন খনিতে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের আহ্বানে বিভিন্ন দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য ধর্মঘট পালিত হয়।

এর ফলে শ্রমিকদের মজুরী কাঠোমো নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় ও কয়লাখনি শ্রমিকদের জন্য বেতন বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে Wage Board-এর রায় বের হয়।

ইতিমধ্যে কয়লাশিল্পে মেশিনকরণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই সব আমদানী করা যন্ত্রপাতির মধ্যে বেশীর ভাগই কাজে লাগে নাই। অকেজো হয়ে পড়ে থাকে ও কোটি কোটি টাকা নষ্ট হতে থাকে। ফলে মালিকপক্ষ থেকে লোকসান-এর অজুহাত দেখিয়ে কয়লাখনি বন্ধ করার হুমকি দেওয়া হয়। ফলে উদ্বৃত্ত শ্রমিক ছাঁটাই-এর সমস্যাও প্রকট হয়ে ওঠে। এর ওপর আছে খনি এলাকায় মাফিয়াচক্র। প্রতিদিন ট্রাক ট্রাক মাল পাচার হয়ে যাচ্ছে। আর লোকসানের বহরও বাড়ছে। খনি এলাকায় দুর্ঘটনাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। সব

মিলিয়ে শিল্পাঞ্চলে এক ভয়াবহ অবস্থা। ১৯৮৩ সালে কয়লা খনিতে দুর্ঘটনায় ১৭৯ জন শ্রমিক মারা যায়। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে পরিবেশ দূষণের সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলতে থাকে। দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে বাতাসে Toxic Element-এর ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়েছে, এর মধ্যে আছে Chloronium, Nickel, Manganese, Aluminium, Silicon, Chloride, Carbon ইত্যাদি। এই দূষণ কেবলমাত্র বায়ুদূষণে সীমাবদ্ধ নয়, শব্দ, বায়ু, জল, স্থল, ধূলি সর্বত্র দূষণ। এর ফলে শ্রমিকদের অধিকাংশ ফুসফুসের রোগের শিকার হচ্ছে; পানীয় জল, আবাসন উভয় ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বাস্তবচিত্র অতীব শোচনীয়। ধাওড়াগুলি সব শুধু (নিম্নমানের) substandard-ই নয়, non-standard; নারীশ্রমিকরা প্রায় অপসারিত। এর প্রতিকারের দাবীতে কোলিয়ারীতে প্রায়ই ধর্মঘট লেগেই আছে। ১৯৫৩ সালে Bengal Coal Group-এর চারটি কোলিয়ারীতে ১১ দিন লাগাতার ধর্মঘট চলে। ১৯৫৬ সালে Bengal Coal Equitable Coal Company-তে লাগাতার ২৭ দিন ধর্মঘট চলেছিল।

১৯৬০-৭৭ পর্যন্ত সংকট ও সন্ত্রাসের যুগ—জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ি, ভারত-চীন সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে যুদ্ধ বাধে, জরুরী অবস্থার সময় শ্রমিকদের ওপর দমননীতি ও সন্ত্রাস চরমে ওঠে। তাদের সমস্ত রকম আন্দোলন জোর করে দমন করা হয়। এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে ১৯৭০-৭২ সালে বিভিন্ন দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে অনেকগুলি ধর্মঘট হয় ও ঐ সময়ের মধ্যে এইসব ধর্মঘট, লক আউট জনিত কর্মবিরতির সমস্যার সমাধান কল্পে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তার ফলে ৪৮টি বন্ধের সমাধান হয়। নীচের ১ নং সারণীতে ১৯৭০-৭২ সালের মধ্যে বন্ধের সংখ্যা ও এই বন্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীসংখ্যা এবং ২নং সারণীতে কলকারখানার ধর্মঘট মেটাবার বিভিন্ন পদ্ধতি ও ফলে উপকৃত কর্মীর সংখ্যার তালিকা দেওয়া হল। এই প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের শেষে ১৯৭০-৭৩ সালে জেলার মোট ট্রেড ইউনিয়নের তালিকাও সংযোজিত হল।

সারণী ১

১৯৭০—৭২ সালে স্ট্রাইক ও লক-আউটের খতিয়ান
(শ্রম দপ্তরের তথ্যের ভিত্তিতে)

	১৯৭০		১৯৭১		১৯৭২	
কারণ	বন্ধের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট কর্মীসংখ্যা	বন্ধের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট কর্মীসংখ্যা	বন্ধের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট কর্মীসংখ্যা
বেতন ও ভাতা	২০	১২৫৩৭	১১	৩৫৮৭	৯	২৩২১
বোনাস	১	৬০	৩	৪৫৮৯	২	৩৮৮০
রোয়েদাদ কার্যকর না করা	৬	৫৯২৫	-	-	১	৯০
পার্সোনেল	৬	৫২৬	৩	১১১৪	৯	৫৬১৬
শ্রমকল্যাণ	১	৩০	১	১৪২	-	-
নিয়োগ প্রমোশন আপগ্রেডিং	৫	৮৪৬	৬	১৩১৬৭	৬	৩৭৫৫
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি	১	৪৭	১	৩৭৫	৩	৪৯৩
ধীরে চলার নীতি (Go-slow)	২	৯৯০	৫	৩২৫০	১	৩০০০
ছাঁটাই	১	৫৮	-	-	২	৫৩
লে-অফ	১	১২	-	-	১	৪৩
অন্যান্য	৪	৫৩৫	৮	৬৭০১	৬	৩৯৮৯
মোট	৪৮	২১৫৬৬	৩৮	৩২৯২৫	৪০	২৩২৪০

সারণী ২

স্ট্রাইক, লক-আউটজনিত বন্ধের অবসান ঘটানোর পদ্ধতি ১৯৭০–৭২

সমাধানের পদ্ধতি	১৯৭০		১৯৭১		১৯৭২	
	ঘটনার সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট কর্মীসংখ্যা	ঘটনার সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	ঘটনার সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা
আপোস-মীমাংসা (Conciliation)	১৯	৪৫৯৯	১৭	৬৬৭৩	২০	১২৮৬৮
দ্বিপাক্ষিক চুক্তি	৮	৬৩১	৮	১০৪৪২	৯	৬৬৭
বিনাশর্তে যোগদান Undonditional resumption	১৩	১৪৮৩১	৭	৮২৯৪	৪	৩৭৮৬
পরিচালন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একক ভাবে	১	৪৭	১	৮২১	–	–
অন্যান্য (Otherwise)	৭	১৪৫৮	৫	৬৬৯৫	৭	৫৯১৯
সর্ব মোট	৪৮	২১৫৬৬	৩৮	৩২৯২৫	৪০	২৩২৪০

১৯৭৮ সালে লোকসভা, বিধানসভা, পৌরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপন্থীরা বিপুলভাবে জয়ী হন। ফলে শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক সংগঠন All India Coal Workers' Federation, CITU-এর কব্জায় আসে।

১৯৯৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কয়লাখনি ও ওয়াশারিগুলিকে বিরাষ্ট্রীকরণের সিদ্ধান্ত নেয় ও ওয়াশারিগুলিকে দেশী ও বিদেশী মালিকানার হাতে অর্পণ করতে যায়। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কয়লার আমদানি শুল্ক যথেষ্ট হ্রাস করা হয়। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি আশঙ্কা করে এই বিরাষ্ট্রীকরণ ও আমদানি বেকারত্ব বাড়াবে, দেশের কয়লার বিক্রয়যোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, জাতীয়করণের পূর্বের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন খনিতে যেমন শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ, জীবনমানের অবনতিসহ চরম দুর্গতি ঘটেছিল তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

ওয়েজ বোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কয়লাখনি শিল্পে পাঁচটি ন্যাশন্যাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্ট হয়, এদের মধ্যে প্রথম ও পঞ্চমটি শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ছিল,

তাই AICWF ও CITU এতে স্বাক্ষর দেয় নাই। অন্য সমস্ত দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলির সম্মতিতে এদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও এগুলিকে চালু রাখা হয়।

কয়লাখনি-শিল্পে শ্রমিকদের জীবনের ঝুঁকি বেশী, কয়লাখনিতে দুর্ঘটনার খতিয়ানই এই তথ্য সমর্থন করে। অথচ কয়লাশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিকদের তুলনায় প্রায় ৫০ টাকা কম অন্তর্বর্তী ভাতা পায়। তাছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে যেখানে শ্রমিকরা অন্তর্বর্তী ভাতার সব টাকা এককালীন পেয়ে যায়, কয়লা শ্রমিকরা পায় সারা বছর ধরে দফায় দফায়। কোল ইন্ডিয়া বা কয়লাশিল্পের অন্যান্য কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বাসস্থান, চিকিৎসা, পানীয় জল, সন্তান-সন্ততির শিক্ষা সম্পর্কিত চুক্তি কার্যকর করে নাই; ফলে শ্রমিকদের জীবনমানে ঘটে অবনতি, ঘটে স্বাস্থ্যহানি। এ কারণে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন বিভিন্ন দাবীতে ১৯৯৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর শিল্প ধর্মঘটের ডাক দেয়, এদের নানা দাবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়লাখনি ও ওয়াশারি বিরাষ্ট্রীকরণ রদ, কয়লার আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার, কয়লাশিল্পে চুরি, দুর্নীতি ও মাফিয়াচক্র বন্ধ করা ও নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ ও ঠিকাদারী প্রথার বিলোপ ইত্যাদি।

১৯৯০-৯১ সালে কোন সাধারণ ধর্মঘট হয় নাই। ১৯৯০ সালে অফিসারগণ ১১ ও ১২ই অক্টোবর ২ দিন ধর্মঘট করেন, যার ফলে ৩২৭৩২ শ্রম-দিবস নষ্ট হয়, মজুরি নষ্ট হয় ৬৫,৪৬,৪০০ টাকা। ১৯৯২-৯৩ এর মধ্যে বাংলা বন্ধ ও ভারত বন্ধের ফলে মোট ৪,৮৫,৩২৯ শ্রমদিবস নষ্ট হয়।

১৯৮৪ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট ও লক-আউটের পরিসংখ্যান থেকে এখানে ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টের গতি-প্রকৃতির একটা সাম্প্রতিক চিত্র পাওয়া যাবে :

	১৯৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০
ধর্মঘট	৪৯	৩৯	২৯	৩৯	৩৪	১৬	১৫
লক-আউট	১৩৫	১৬৫	১৭৮	১৯৭	২১২	২১১	১৭৪

এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৯৯টি বড় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ধর্মঘট ও লক-আউট হয়েছে। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত ধর্মঘটের জন্য শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে যথাক্রমে ২২২৫০, ১০৫৬৫০০, ১৫১৮৪১০ টি। লক-আউটের ফলে ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে যথাক্রমে ১২,৬৬,৬২৭; ১৯,৫৮,৯৫৬; ৫০,৮৩,১০৯; ৪১০, ৫৩০ ও ২৭,১২,৪৩০ টি।

ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে একই সময়ে শ্রমদিবস নষ্টের হিসাব— ১৯৮৬—৩৩২৩৬৩; ১৯৮৭—৫২২৮০৫; ১৯৮৮—৮২২২৪৯; ১৯৮৯—৬,৮১,০০৩; ১৯৯০—৬,৭২,২৫২টি। শ্যামল সান্যাল মহাশয় ২১।১২।৯১ তারিখে পাক্ষিক দেশ পত্রিকায় "পশ্চিমবঙ্গে শিল্প" প্রবন্ধে এক ট্রেড ইউনিয়ন নেতার উক্তির যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার থেকে এ রাজ্যে শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হবে। "ট্রেড ইউনিয়ন করি আমরা। শ্রমিকদের জন্য চিৎকার করি। বেশি বোনাস, মাইনে আদায় করতে যাই। কিন্তু মনে মনে জানি আমাদের দাবি মেটাতে কারখানা বন্ধ হবে। নয়ত গুজরাট, হরিয়ানা চলে যাবে। আমরা স্বীকার করতে ভয় পাই এ সব কথা। কিন্তু ঘটনাটা তাই।" হিসাব দিয়ে তিনি জানিয়েছেন ১৯৭৭ সাল থেকে এ রাজ্যে ৬৬২টি বড় বড় শিল্পে ক্লোজার হয়েছে। এর ভেতর ২৯৭টির দরজা খুলবে না। এই সব কলকারখানার প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক পথে বসেছেন।

বর্ধমান জেলায় শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে অনেক কোলিয়ারী কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। New India Tames চামড়ার রঙ তৈরীর কারখানা চিরতরে বন্ধ, দামোদর পারে সূর্যনগরে ঢাকেশ্বরী কটন মিলে লাগাতার শ্রমিক ধর্মঘট ও ক্লোজারের ফলে মিলটি একেবারে বন্ধ হয়। রানীগঞ্জে গির্জাপাড়া লেনে গ্লাস ফ্যাক্টরী বন্ধ, বেঙ্গল পেপার মিল বন্ধ হবার মুখে, দুর্গাপুর শিল্পনগরীতে Pibco কোম্পানী বন্ধ, Bharat Opthalmic Factory বন্ধ, MAMC প্রায় বন্ধ, ওখানকার Hostel-কে এখন বিয়ে বাড়ির জন্যে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। ISCO, DPL-এ দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান হচ্ছে। যা অবস্থা চলছে, মনে হয় এগুলিও যে কোন দিন বন্ধ হয়ে যাবে, ভর্তুকির কোরামিন দিয়ে আর কতদিন টিকিয়ে রাখা যাবে। বর্ধমান শহরে রায়-কো বিস্কুট কোম্পানী বন্ধ, আলমগঞ্জের গ্লাস ফ্যাক্টরী বন্ধ, একটা নতুন সূতাকল হয়েছিল শ্রমিক ধর্মঘটে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। দুর্গাপুরে শতাধিক ক্ষুদ্রশিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। এ জেলাতেই আরও কত শিল্প ও খনিতে যে শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে ক্লোজার হয়েছে বা চিরতরে বন্ধ তার সঠিক তথ্য জানা নাই। ১৯৯০ সালেই এ রাজ্যে বিভিন্ন কলকারখানায় ধর্মঘটের ফলে ৩,১৪,৩৯৪টি শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে; ঐ বছরেই ১৭৪টি সংস্থায় লক-আউট ঘোষণা করায় ১,৪৯,৩৬২ কর্মী বিপদে পড়েছিল, এর জন্যে ২,৭৮,৪৮,৭২৮টি শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে; ক্লোজারও ঘোষিত হয় ১৭টি ক্ষেত্রে। জ্যোতিবাবু রাজ্যের শিল্পের পরিবেশটা জানেন বলেই ১৯৯১—৯২ সালে বিধানসভায় শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের বাজেট পেশ করতে গিয়ে বলেছেন—"We have miles to go on the road of Industrial regeneration and to extricate ourselves

from the negative features of the Past"। কিন্তু সিপিআই (এম)-এর লালদুর্গ এই বর্ধমান জেলার শিল্প এলাকা কি কোন দিন এই negative features of the past থেকে extricate হতে পারবে? এখানকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি থেকে কিন্তু কোন আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। এর ওপর আছে বিদ্যুৎ-বিভ্রাট যেটা শিল্পের ক্ষেত্রে অপরিহার্য—এ রাজ্যে তথা এ জেলাতেই অমাবস্যার অন্ধকার, খারাপ রাস্তাঘাট ও শিল্পের অগ্রগতির বড় বাধা। ক্রমাগত শ্রমিক অসন্তোষ, বেহাল রাস্তাঘাট, বিপর্যস্ত বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য বাইরের কোন শিল্প এ রাজ্যে আসতেই চাইছে না উপরন্তু যারা আছে তারাও পালাচ্ছে বা ধুঁকছে।

এই ভাবে শিল্পের ক্ষেত্রে দিনের পর দিন শ্রমিক অসন্তোষ ঘটিয়ে, লক্ষ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট করে, উৎপাদনকে ব্যাহত করে, হাজার হাজার শ্রমিককে বেকার করে ও তাদের সপরিবারে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে কার কি লাভ হচ্ছে—তা আমার ধারণায় নাই। শ্রমিক নেতাদের হয়তো নেতৃত্ব বজায় থাকে, রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছুটা আখের গোছান হয়, কিন্তু দেশের উৎপাদন তথা অর্থনীতির ওপর পড়ে চরম আঘাত। ক্রমবর্ধমান বেকারের ভারে জেলা এমনিতেই ধুঁকছে, তার ওপর ক্লোজার, লক আউট, ধর্মঘট, বন্ধ কলকারখানার দরুণ ক্রমবর্ধমান শ্রমিক বেকারের (আগে শ্রমিক পরে বেকার অর্থে) সংখ্যা বেকারত্বের মূল স্রোতকে দিন দিন স্ফীত থেকে স্ফীততর করছে। দীর্ঘদিন এ রাজ্যে চলেছে পুঁজিবাদের নিন্দা আর স্তালিনবাদের স্তুতিগান। সেই ঐতিহাসিক ভুল-কে শোধরাবার জন্যে মুখে বেসরকারি ও বিদেশী বিনিয়োগের কথা বললেও বর্তমান জমানায় তা কতটা কার্যকর করা সম্ভব হবে ভবিষ্যৎই তা প্রমাণ করবে। অন্ধ্রপ্রদেশের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ইতিমধ্যেই তাঁর রাজ্যে উন্নয়নে দৃষ্টান্তস্বরূপ নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমাদের পশ্চিবঙ্গেও কি অন্ধ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শিল্পে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, বাজার অর্থনীতি ও প্রতিযোগিতামূলক শিল্পব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় না? যদি যায় তবেই দেশের মঙ্গল, আমাদের জেলার মঙ্গল।

কৃষির ক্ষেত্রেও ষাটের দশক থেকেই খাদ্য আন্দোলন, জমিদখলের লড়াই-এর ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামে গ্রামে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯৫৪ সালে জমিদারী উচ্ছেদ আইন অনুসারে জমিদার ও বড় বড় রায়তদের বিভিন্ন ধরনের জমির-মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। এই সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত জমি সরকার অধিগ্রহণ করে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করার কথা আইনে বলা হল।

দ্বিতীয় ব্যবস্থায় ভাগচাষীর সংজ্ঞা দিয়ে বর্গার হার স্থির করা হল ও বর্গা উচ্ছেদের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করা হল। মালিক চাষের খরচ দিলে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাবেন আর বর্গাদার পাবে অর্ধেক। আর মালিক কোন খরচ না দিলে বর্গায় চাষ করা জমির উৎপন্ন ফসলের মালিক বর্গাদারের পাওনার অনুপাত হবে ৪০ : ৬০, মোটামুটি ছয় আনা : দশ আনা। উচ্ছেদের শর্ত হল মালিক যদি নিজে চাষ করে বা বর্গাদার যদি চাষে অবহেলা করে বা মাঠহারী ফসল ফলাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে মালিক বর্গাদারকে উচ্ছেদ করতে পারবেন। কিন্তু আইন করা এক আর তাকে কার্যকর করা অন্য। জমিদারী অধিগ্রহণ আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উকিলের পরামর্শ নিয়ে বড় বড় রায়ত ও জমিদাররা আইন কার্যকরী হবার পূর্বের তারিখ দিয়ে আনরেজেষ্ট্রী আমলনামা এমন কি চেকেও আত্মীয়স্বজন, বাগাল, মুনিষ-এর নামে জমি হস্তান্তর করতে লাগলেন। কারণ বিনা রেজেষ্ট্রীকৃত আমলনামা ও চেকে বন্দোবস্ত আইনত গ্রাহ্য হত। বড় বড় রায়ত আনরেজেষ্ট্রী বন্টননামা কাগজ তৈরী করে জমি ভাগ করে নিতে লাগল। কোন কোন পরিবার উকিলের পরামর্শমত Deed of family settlement নামক রেজেষ্ট্রী দলিল করে উদ্বৃত্ত জমি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বন্টন দেখিয়ে আইনকে ফাঁকি দিল। কারণ জমিদারী উচ্ছেদ আইনে Deed of family settlement-এর কোন উল্লেখ নাই। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে এটি একটি বন্টননামা দলিল কিন্তু আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য উকিলের কারসাজিতে এটি একটি হস্তান্তর দলিলের নতুন Terminology. এরপর যা উদ্বৃত্ত জমি রইল তার কিছু দেবোত্তর, পীরোত্তর দেখানো হল। কিংবা জমিতে রাতারাতি পুকুর, বাগান তৈরী করে আইনকে ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা হল। এরপর যা রইলো তার মধ্যে গোচর, গোভাগাড়, শ্মশান, জলা, ডাঙা এই সমস্ত অচাষযোগ্য জমি সরকারে Vest করানো হল। বেআইনী হস্তান্তর সন্দেহে ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তর থেকে ৫(ক) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়, সেখানেও টাকার জোরে অনেক বড় রায়ত পার পেয়ে যায় কিংবা সরকারের অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে বড় বড় জোতদার হাইকোর্টে মামলা করে ইনজাংশন জারী করে অধিগ্রহণ রদ করে দেন।

বর্গাদারকে ফাঁকি দেবার জন্য অধিকাংশ সম্পন্ন পরিবার রাতারাতি লাঙ্গল গরু কিনে নিজে চাষ করার অজুহাতে বর্গা উচ্ছেদ করতে লাগলো—যাদের সে সঙ্গতি নাই তারা চাষে অবহেলার অজুহাত দেখিয়ে বর্গা উচ্ছেদ করতে লাগলো। এই ভাবে আইনকে ফাঁকির বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই।

যুক্তফ্রন্ট ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে বর্গাদার ও ভূমিহীনদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই সমস্ত বে-আইনীভাবে দখলে রাখা জমি উদ্ধারের জন্য এক জঙ্গী পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সরকারে ন্যস্ত জমি জোতদাররা বে-আইনীভাবে চাষ করে থাকলে কমিউনিস্ট পার্টি বা কৃষক সমিতির নেতৃত্বে পাঁচ / সাতশত ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তীরধনুক, বল্লম, বর্শায় সজ্জিত হয়ে জমির ওপর চড়াও হয়ে সেই সমস্ত বে-আইনভাবে দখলীকৃত জমিতে লাল পতাকা পুঁতে দখল করতে লাগলো। এমন কি জোতদার যদি হাইকোর্ট থেকে স্বপক্ষে রায় বের করে আনেন তা সত্ত্বেও সেই রায়কে আমল না দিয়ে জোর করে লাল পতাকা গেড়ে জমি দখল চলতে লাগলো। এই ব্যবস্থা সংক্রামক রোগের মত গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো। পুলিশ প্রশাসনও পার্টির পক্ষে—মালিকপক্ষ তাদের কোন সাহায্যও পেল না। এমন কি থানার অফিসার মালিকের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। এক কথায় জঙ্গলের রাজত্ব শুরু হয়ে গেল। জোর যার মুলুক তার—এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হল। গ্রামে গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। কোন কোন ক্ষেত্রে মালিক বন্দুক বার করলো। কিছু ক্ষেতমজুর মরতে লাগলো। আবাব মিছিলের তীর, বর্শা, বল্লমে মালিক পক্ষও রেহাই পেল না। ক্ষেত্রবিশেষে মালিকের ঘরবাড়ী, খামারবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হল। পুলিশ নীরব দর্শক। তার চোখের সামনেই এই সব ঘটতে লাগলো। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, সরকার বা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কখনও জমি দখলের জন্য এত দূর চরম পন্থা নেবার নির্দেশ দেন নাই। পার্টি থেকেও এরকম জঙ্গী ফতোয়া জারি হয়েছিল কিনা তাও আমার জানা নাই। কিন্তু গ্রামে গ্রামে যারা ভোল পাল্টিয়ে রাতারাতি সিপিএম-এর নেতা বনে গেল, যে সমস্ত ক্ষেতমজুর, বর্গাদার ভূমিহীন দীর্ঘকাল জমিদার, জোতদারদের অত্যাচার সহ্য করে এসেছে; অবিচার, শোষণের শিকার হয়েছে, তাদের গোলামী করেছে, বেগার খেটেছে, হঠাৎ তারা ক্ষমতার আস্বাদ পেয়ে মরিয়া হয়ে উঠলো। এদের সঙ্গে ভিড়ে গেল কিছু সমাজবিরোধী চোর-ডাকাতের দল। আর ফ্রাঙ্কেস্টাইন-দৈত্য ছেড়ে দেওয়া সোজা কিন্তু তাকে আর বোতলে ঢোকানো যত বড়ই নেতাই হোক তার সাধ্য নাই। এর ফলে শান্তির নীড় গ্রামগুলি জতুগৃহে পরিণত হতে দেরী হল না। আর পুলিশের একটা বড় অংশই তো চিরকাল শাসকশ্রেণীর গোলামী করে এসেছে। ব্রিটিশের রাজত্বে ব্রিটিশের গোলামী করেছে, কংগ্রেসের শাসনের সময়ে কংগ্রেসের গোলামী করেছে, আবার যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসায় তাদের যে গোলামী করবে তাতে আর বৈচিত্র্য কি? তাদের গোলামীর এই Tradition চলেছে, চলবে।

এরপর সরকার থেকে ভূমিসংস্কার আইনকে সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইনে মালিকের পরিবারভিত্তিক জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারিত হল। এই সংশোধিত আইনের দ্বারা ১৯৬৯-এর ৭ই আগষ্টের পর এই আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য বন্টননামা, দানপত্র, খোসকোবালা প্রভৃতি যে কোন প্রকার হস্তান্তরকে Invalid বলে গণ্য করার ব্যবস্থা হলো। জমির ঊর্ধ্বসীমা হিসাবে এক সদস্যের পরিবারের জন্য সেচসেবিত অঞ্চলে ২·৫০ হেক্টর বা মোটামুটি ৬ একর (এক হেক্টর ২·৪৭৫ একর)। আর অসেচসেবিত অঞ্চলে ৯ একর। ৫ জন পর্যন্ত পরিবারের জন্য সেচসেবিত অঞ্চলে ৫ হেক্টর বা ১২·৫০ একর, অসেচসেবিত অঞ্চলে ১৮ একর, এরপর সদস্য প্রতি ·৫০ হেক্টর করে সর্বোচ্চ ৭ হেক্টর বা ১৭ একর ও অসেচসেবিত অঞ্চলে সর্বোচ্চ ২৪ একর নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। ভাগচাষীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা হল। সেটেলমেন্ট রেকর্ডের ২৩নং কলমে বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করার জন্য "অপারেশন বর্গা" আন্দোলন শুরু হল। তবে আগেকার বর্গা আইনের পরেই বড় বড় জোতদার বেশীর ভাগ বর্গাদারকে উচ্ছেদ করে দিলেন। ফলে ভাগচাষীর গড়পরতা সংখ্যা ৫০ থেকে কমে ১৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। পরিবারভিত্তিক জমির ঊর্ধ্বসীমা ও উদ্বৃত্ত জমি নির্ধারণের ১৯৭০-এর 'অপারেশন বর্গা' আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আবার নতুন করে সেটেলমেন্ট রেকর্ড সংশোধন শুরু হল। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এক ব্যক্তির যত জমি আছে তার হিসাবসহ রিটার্ন নিয়ে One man one Khatian নীতি অনুসারে একই খতিয়ানভুক্ত করার ব্যবস্থা হল। অবশ্য কৃষিজমির জন্য একটি ও অকৃষিজমির জন্য আর একটি খতিয়ানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেটেলমেন্ট বিভাগের মাঠেতে খানাপুরী বুঝারতের সময়ই কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উদ্যোগী হয়ে জোর করে বর্গাদারের নাম রেকর্ড করাতে লাগলেন। ফলে এলোপাথাড়ি বর্গা উচ্ছেদ বন্ধ হল। ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষীরা সঙ্কটে পড়লো। তারা বর্গাদারকে তার প্রাপ্য সিকি অংশ ছেড়ে দিয়ে বাকী জমি অন্য চাষীকে বিক্রি করতে লাগলো। অপারেশন বর্গার ফলে আশির দশকে নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ৩০,০০০ থেকে বেড়ে ১,১১,০০০ হল। উদ্বৃত্ত জমি যা সরকারে ন্যস্ত হল তা ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা হল। এই বন্টনের ব্যাপারেও পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যে জমি সরকারে ন্যস্ত হল তার একটা বিরাট অংশ ২৫ হাজার একরের মত আদালতের স্থগিতাদেশে আটক পড়ে আছে। ৫০ হাজার একর ১,৫০,০০০ ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা সম্ভব হয়েছে। ভূমিহীনরা কি পেল? মাথাপিছু ⅓ একর বা এক বিঘার মত। রেকর্ড

করা বর্গাদারের অনেকে তাদের অধীনে বর্গাজমির সিকি বা ১/৩ অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট রইল। এখন এই এক বিঘা জমি নিয়ে লাঙ্গল গরু রেখে জমি চাষ করা কি সম্ভব? কাজেই অনেক বর্গাদারকেও জমি বর্গায় চাষ করাতে হচ্ছে কিংবা বিক্রি করতে হচ্ছে। এ জমিও মালিক স্বনামে বেনামে কিনতে আরম্ভ করেছে। কাজেই ভূমিহীনরা ভূমিহীনই রয়ে যাচ্ছে। সংশোধিত ভূমি সংস্কার আইন-এর উদ্দেশ্য একেবারে না হোক অনেকটাই ব্যর্থ হল। তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় অপারেশন বর্গা ও ভূমি সংস্কারের দ্বারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগণের ও ভূমিহীনদের অবস্থার যেটুকু উন্নতি হয়েছে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কমিউনিস্ট পার্টির ও কৃষক সমিতির। তবে বাড়াবাড়ি যে হয় নাই তা নয়। কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনের ফলে এবং সিটু প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের 'ঘেরাও'-এর রাজনীতি আমদানী হওয়ায় কৃষিশ্রমিক ও শিল্প শ্রমিক, সরকারী কর্মচারীদের মজুরী ও মাইনে অনেক বেড়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু work culture একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আগে কৃষি-মজুররা অল্প মজুরীতে যত পরিমাণ কাজ করত, আজকে তার দশ গুণ মাইনে ও ৭ ঘন্টা কাজ বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও ৪/৫ ঘন্টার বেশী কাজ কেউ করছে না। সরকারী অফিসের যে হাল তাতে মুখ্যমন্ত্রীকেও বলতে হয় "কাজ করতে বলবো কাকে? চেয়ারকে?" কাজেই মনে হয় মূল্যসূচী অনুযায়ী মজুরী নির্ধারিত হোক কিন্তু সেটা শ্রমের উৎপাদনশীলতার আনুপাতিক হোক। বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে বা শিল্পক্ষেত্রের যা অবস্থা, প্রশাসনের হাল কঠোর হস্তে না ধরলে, ভোটবাক্সের দিকে না তাকিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে নাইডু-প্ল্যান না গ্রহণ করলে এ রাজ্য তথা এ জেলাকে বাঁচানো যাবে না।

সারণী-৩

LIST OF TRADE UNIONS IN THE DISTRICT OF BARDHAMAN

1970–73*

Sl. No.	Name of the Union	Address	Date of Registration	Membership	Affiliation
1.	Asansol Sub-divisional Stone Quarry Worker' Union	Chattapathar, G.T Road (East)	2.1.70	100	Independent
2.	Asansol Subdivisional Light Engineering Workers' Union	Thana Road, Asansol	8.1.70	35	AITUC
3.	Carew Employee's Association, Asansol	Gopalpur, Asansol	17.1.70	50	AITUC
4.	Burdwan B.C Hospital Special Ayas Union	B.C. Road, Bardhaman	19.1.70	100	Independent
5.	Kastha Silpi Sangha, Bardhaman	B.C. Road. Bardhaman	19.1.70	41	Independent
6.	Burdwan Co-operative Societies' Employees' Union	Bardhaman	20.1.70	204	Independent
7.	Burdwan Bidi Mazdoor Union	B.C.Road, Bardhaman	22.1.70	210	AITUC
8.	Glass Worker' Union, Raniganj	Raniganj	6.2.70	54	AITUC
9.	Burdwan District Kathgola & Carpentray Works Sramik Union	Kalitala, Bardhaman	12.2.70	150	Independent
10.	Nursing Home Employee's Union Asansol	Thana Road, Asansol	19.2.70	30	AITUC
11.	Sarkari Gudam Thikadar Mazdur Sabha, Barddhaman	Thana Road, Asansol	19.2.70	50	AITUC
12.	J. K. Ropeways (Coal Board) Employees' Union, Lachipur	Madanpur, Bardhaman	20.2.70	138	Independent

* Source : Registrator or Trade Unions, West Bengal.

Sl. No.	Name of the Union	Address	Date of Registration	Membership	Affiliation
13.	United Contractors' Workers' Union (Durgapur Sub-division)	Benachiti, Durgapur-4	20.2.70	375	Independent
14.	Burdwan Zilla Telkal Sramik Union	Kalitala, Bardhaman	25.2.70	83	Independent
15.	Rajbandh Special Casting Employees' Union	Benachiti, Durgapur-4	25.2.70	52	Independent
16.	Chitra Cinema Hall Workers' Union	Radhanagar Road, Bardhaman	27.2.70	18	UTUC
17.	Burdwan District Dokan Karmachari Samity	Kalitala, Bardhaman	2.3.70	200	Independent
18.	Eastern Railway, Catering Workers' Union	Kalitala, Bardhaman	2.3.70	120	Independent
19.	Burdwan Seeban Silpee Samity	Kalitala Bardhaman	5.3.70	99	Independent
20.	Durgapur Subdivision Automobiles (Garage & Allied) Employees' Union	Benachiti, Durgapur-4	5.370	76	AITUC
21.	Burdwan District Rajmistri and Grihanirman Sramik Union	Memari	10.3.70	113	Independent
22.	Memari Thana Bidi Mazdoor Union	Bamunpara Mor, Memari	10.3.70	400	Independent
23.	Durgapur Subdivisional Press Employees' Union	Benachiti, Durgapur-4	18.3.70	55	Independent
24.	Sykho Glass (Pvt. Ltd.) Sramik Union	Kalitala, Barddhaman	24.3.70	100	AITUC
25.	Hindustan Cables Majdur Union (H.C.M.U.)	H.C.L Township, Hindustan Cables	24.3.70	25	UTUC
26.	Burdwan Zilla Rice Mill Mazdur Union	B. C. Road, Barddhaman	26.3.70	307	UTUC
27.	Memari Thana Dokan Karmachari Samity	Rasulpur	28.3.70	94	AITUC

Sl. No.	Name of the Union	Address	Date of Registra- tion	Member- ship	Affiliation
28.	Memari Thana Chirakal Sramik Union	Memari	6.4.70	27	AITUC
29.	Associated Timber Industries Sramik Union	Rupnarayan- pur	16.4.70	35	Independent
30.	Bardhaman Town Rajmistri, Griha-O-Pathanirman Sramik Union	Kalitala, Bardhaman	27.4.70	82	BPTUC
31.	Central Coal Mines Rescue Stations Staff Association	Sitarampur	27.4.70	74	AITUC
32.	Galsi Dokan Sangstha Karmachari Samity	Galsi	4.5.70	79	WBSEF
33.	Rice Mill Workers' Union, Kalna	Dangapara, Kalna	4 5 70	50	AITUC
34.	Thikadar Mazdoor Union, Burnpur-Kulti	Kulti	12 5.70	300	HMS
35.	Durgapur Chemicals Ltd. Canteen Employees' Union	Benachiti, Durgapur-4	25.5.70	32	AITUC
36.	Fertilizer Corpn. India Ltd., Security Staff Assn., Durgapur	Sagar Bhanga Colony, Durgapur-1	13.6.70	82	AITUC
37.	Asansol Silicate Factories Employees Union	Asansol	17.6.70	60	CITU
38.	Asansol Sub-divisional Kathgola Mazdoor Union	Girjapara, Raniganj	18.6.70	30	BPTIC
39.	Maning & Allied Michinery Corpn. Security Employees' Assn., Durgapur	Viswakarma- nagar, Durgapur-10	19.6.70	118	INTUC
40.	Durgapur Foundry & Engineering Works Mazdoor Union	Hattola Road, Durgapur-1	3.7.70	76	AITUC
41.	Ausgram Block-2 Co-operative Agri- cultural & Marketing Society Employees' Union	Abhirampur, Ausgram	17.7.70	47	CITU

Sl No.	Name of the Union	Address	Registration	Date of Membership	Affiliation
42.	Khan Mazdoor Sangh, Bardhaman Division	Safiquenagar, Ukhra	8.8.70	397	Independent
43.	Ajoy Valley Colliery Mazdoor Union	Moira Colliery, Ukhra	14.8.70	7,053	Independent
44	Mining & Allied Machinery Corpn. Sramik Union	Viswakarma-nagar, Durgapur-4	9.9.70	2,150	AITUC
45.	Sen-Raleigh (Asansol Works) Employees' Association	Provat Hotel, G.T. Road, Asansol	17.9.70	250	AITUC
46.	Eastern Railway Traction Distribution Workers' Assn.	Asansol	29.9.70	600	Independent
47.	Jessop & Co. Ltd. Workers' Assn., Durgapur	V. K. Nagar, Durgapur-10	5.10.70	94	INTUC
48.	Durgaput Steel Sramik Union	Benachiti, Durgapur-13	6.11.70	2,406	AITUC
49.	Ophthalmic Glass Plant Mazdoor Union	Durgapur-10	12.11.70	200	Independent
50.	Raniganj Flour Mills Mazdoor Union	Girjapara, Raniganj	17.11.70	51	CITU
51.	Hind Refractories Sramik Union, Durgapur	Sagarbhanga, Durgapur-11	18.1170	95	AITUC
52.	Hindusthan Pilkington Glass Works Employeess' Association, Asansol	Chatapathar, Asansol	24.11.70	182	CITU
53.	Asansol Taxi Drivers' & Cleaners' Union	A. Garden Road, Asan.	24.11.70	60	CITU
54.	Consumers' Co-operative Society Employees' Union, Asansol	A. Garden Road, Asan.	24.11.70	63	CITU
55.	Rickshaw Mazdoor Union, Asansol	Dhadka Road, Asansol	24.11.70	296	CITU
56.	Asansol Hawkers' Union	A. Garden Road, Asan.	24.11.70	56	CITU

Sl. No.	Name of the Union	Address	Registration	Date of Membership	Affiliation
57	West Bengal-Apex Co-operative Agriculture & Marketing Society Workers' Union	Memari	7.1.71	75	CITU
58.	ACC-Vickers Babcock Sramik Union	Ghosh Market, Durgapur.	18.1.71	403	AITUC
59.	Colliery Mazdoor Sabha of India	Sishubagan, Raniganj	20.1.71	10120	CITU
60.	Asansol Bakery Workers' Union	A. Garden Rd., Asansol	3 371	60	CITU
61.	Dishergarh and Associated Power Company's Employees' Union	Jhalbagan, Dishergarh	27.3.71	108	INTUC
62.	Durgapur Projects Employees' Multi-Purpose Co-operative Society Employees' Union	Durgapur-2	6 4 71	34	CITU
63.	I. I. & Co. Ration Distributors Employees' Union, Burnpur-Kulti	Puranhat, Burnpur	10.4.71	80	CITU
64.	The West Bengal Co-operative Land Mortgage Banks Employees' Association	Bardhaman	10.4.71	132	Independent
65.	Rickshaw Mazdoor Union, Raniganj	Raniganj	20.4.71	52	CITU
66.	Asansol Subdivisional Bidi Mazdoor Union	Asansol	17.5.71	100	CITU
67.	Asansol Subdivisional Retail Fruit Sellers' Union	Thana Road, Asansol	27.5.71	50	AITUC
68.	Eastern Rly. Sanitary Workmen's Assn.	Thana Road, Asansol	27.5.71	180	AITUC
69.	Bihar Potteries Refractory & Ceramic Works Sramik Union	Rupnarayanpur, P.O.-Hindustan Cables	11.6.71	52	CITU
70.	Mining and Allied Machinery Corpn. Workers' Union	V. K. Nagar, Durgapur-10	17.6.71	250	Independent

Sl. No.	Name of the Union	Address	Registration	Date of Membership	Affiliation
71.	Graphite India Workmen's Union	Sagarbhanga Housing Colony, Durgapur	18.6.71	40	Independent
72.	Indo American Electricals Sramik Union	Sagarbhanga, Durgapur-11	9.7.71	60	AITUC
73.	Lorry Transport Mazdoor Sabha, Bardhaman	Provat Hotel, G. T. Road, Asansol	27.7.71	80	AITUC
74.	Durgapur Subdivisional Bakery Sramik Union	Kapoor Market, Durgapur-13	14.8.71	80	AITUC
75.	Burdwan Cycle-Rickshaw Sramik Union	Barabazar, Bardhaman	18.8.71	251	Independent
76.	I I S Co. (Kulti Works Mozdoor Union)	Kendua, Kulti	24.8.71	462	Independent
77.	Samla Collieries Workers' Union	Pandaveswar	1.9.71	421	Independent
78.	Burdwan Rickshaw Mazdoor Union	86, B. C. Rd., Bardhaman	6.9.71	300	Independent
79.	Thie Chief Mining Adviser's Office (Rly. Board) Staff Association	136, K. S. Rd., Railpar, Asan.	7.9.71	55	Independent
80.	Burdwan District Food Corpon. of India Godown Workmen' Union	Upper Chelia-danga, Asansol	22.9.71	75	UTUC
81.	Vehicle Depot Mazdoor Union Panagar	Bud Bud, Bardhaman	23.9.71	306	Independent
82.	Durgapur Projects Sramik Union	EN-8, Coke Oven Colony, Durgapur-2	23.9.71	714	AITUC
83.	Gala Mazdoor Panchayat, West Bengal	2, Md. Hussain Street, Asansol	6.10.71	1,279	HMS
84.	Durgapur Dairy Workers' Association	Sagarbhanga Colony, Durgapur-11	8.10.71	25	AITUC

Sl. No.	Name of the Union	Address	Registration	Date of Membership	Affiliation
85.	India Refractories Mazdoor Union	Kulti	22.10.71	265	Independent
86.	Sodepur Central Works & Stores Employees' Union	Dishergarh	27.10.71	76	Independent
87.	A. V B. Workmen's Union, Durgapur	LR-160, A.V.B. Coly. Durgapur-6	10 11 71	109	INTUC
88.	Heckett Engineering Co. (India Branch) Employees' Union	Puranhar, Burnpur	10 12.71	128	CITU
89.	Durgapur Small-Scale Industries Mazdoor Sang	Viswakarma-nagar, Durgapur-10	30.12 71	41	BMS
90.	Coal Mines Workers' Union, Bardhaman	Madhaiganj Road, Ukhra	3 1.72	915	Independent
91.	Gushkara Rice and Oil Mills Workers' Congress	Gushkara	7.1.72	102	Independent
92.	Philips Carbon Black Workmen's Union	E/31, Sagar-bhanga, Durgapur	17.1.72	14	INTUC
93.	Durgapur Mahakuma Dokan Karmachari Sangh	Viswakarma-nagar, Durgapur-10	17.1.72	91	BMS
94.	Budwan Zilla Bus Paribahan Karmachari Sangstha	86, B.C. Rd., Bardhaman	25.1.72	137	INTUC
95.	Durgapur Fertilizer Corporation of India Workers' Union	111-164, F.C.I. Township, Durgapur-1	31.1.72	51	INTUC
96.	Saktigarh Textile & Industries Mazdoor Congress	B.C. Rd., Kalitala, Bardhaman	4.2.72	34	INTUC
97.	Kumar Engineering & Spun Pipe Works Workers' Union	P.O. & Vill-Baidyapur	4.2.72	29	INTUC
98.	Colliery Sramik Congress, Asansol	Ushagram (E), Asansol	4.2.72	158	INTUC
99.	Apeejay Structural Workers' Union	Amlazora, P.O. Rajbandh	4.2.72	22	INTUC

Sl. No.	Name of the Union	Address	Registration	Date of Membership	Affiliation
100.	J. K. Nagar, Aluminium Workers' Union	Ushagram, Asansol	8.2.72	198	INTUC
101.	Burdwan Cycle Rickshaw Owners' Assn.	Barabazar, Bardhaman	11.2.72	31	INTUC
102.	Hein Lehmann (I) Ltd. Mazdoor Sangh	Sagarbhanga Housing Colony, Durgapur-11	12.2.72	30	BMS
103.	Durgapur Projects Ltd., Mazdoor Sangh	V.K. Nagar, Durgapur-10	21.2.72	104	BMS
104.	Dry Cleaning & Laundry Workers' Union, Raniganj	Girjapara, Raniganj	3.3.72	19	CITU
105.	A.V.B. Employees' Co-operative Society Employees' Union	LR-233, A.V.M Colony, Durgapur-6	3.3.72	16	CITU
106.	Bardhaman Chirakal Karmachari Samity	B.C. Rd., Bardhaman	4.3.72	85	INTUC
107.	M. H. S. Shany Workmen's Union	Sagarchanga Colony, Durgapur-11	7.3.72	46	INTUC
108.	Graphite India Ltd. Mazdoor Sangh	V.K. Nagar, Durgapur-10	20.3.72	33	BMS
109.	Kalna Mahakuma Darjee Union	Lalbagan, Kalna	20.3.72	148	UTUC
110.	Hindusthan Steel & Metal Co. Mazdoor Sangh	Sagarbhanga Housing Coly., Durgapur-11	24.3.72	25	BMS
111.	Hindusthan Refractories and Ceramics Workers' Union	Sagarbhanga Colony, Durgapur-11	30.3.72	51	INTUC
112.	Durgapur Thikadar Mazdoor Sangh	Viswakarma-nagar, Durgapur-10	15.4.72	33	BMS
113.	Durgapur Contractor Workers' Union	Benachiti, Durgapur-13	25.4.72	60	INTUC
114.	Hein Lehmann Workmen's Union	Sagarbhanga Housing Coly, Durgapur-111	25.4.72	74	INTUC
115.	Alloy Steet Worker's Union	6/9, Guru Nanak Rd., Durgapur-5	12.5.72	498	INTUC

Sl. No.	Name of the Union	Address	Registra-tion	Date of Member-ship	Affiliation
116.	Rajbhandh Special Costing Industries (Pvt.) Ltd., Workers' Union	V.K. Nagar, Durgapur-10	12.5.72	68	INTUC
117.	Damodar Iron & Steel Works (P) Ltd. Workmen's Union	P.O. & Vill. Baktar Nagar	12.572	101	INTUC
118.	Katoya Subdivisional Bus Workers' Union	P.O. Katoya Bus Stand, Barddhaman	18.5.72	70	Independent
119.	Dawns Co. (Pvt.) Ltd., Workers's Union	V. K. Nagar, Durgapur-10	26.5.72	20	INTUC
120.	Pib Co. Ltd. Workers' Union, Durgapur	V. K. Nagar, Durgapur-10	26.5.72	63	INTUC
121.	Durgapur Mill-men's Union	Raghunathpur Ambagan, Amrai	26.5.72	98	INTUC
122.	Power Tools & Appliance Co. Workmen's Union	Sagarbhaga Colony, Durgapur-11	26.5 72	31	INTUC
123.	Indo-American Electricals Workmen's Union	Sagarbhanga Housing Coly, Durgapur-11	26.5.72	56	INTUC
124.	Durgapur Dev. Authority Workers' Union	12/9 Einestin Avenue B-Zone, Durgapur-5	26.5.72	115	INTUC
125.	Durgapur Dairy Workmen's Union	Sagarbhanga Housing Coly, Durgapur-11	31.5.72	24	INTUC
126.	Durgapur Taxi Workers' Union	Benachiti, Durgapur-13	31.5.72	112	INTUC
127.	Bardhaman Poura Mazdoor Karmachari Sangathan	G.T. Road, Barddhaman	8.6.72	46	INTUC
128.	Barakar Electric Supply Workers' Union	Kulti	19.6.72	25	INTUC
129.	Bengal Paper Mill Mazdoor Congress	Raghunathchak, Ballavpur	20.6.72	160	INTUC
130.	Hindusthan Steel Workmen's Union Durgapur-4	15/5, Viveka-nanda Road,	20.6.72	500	Independent

Sl. No.	Name of the Union	Address	Registration	Date of Membership	Affiliation
131.	DSP Employees' Cooperative Society Ltd. Workers' Union	Ghosh Market, Durgapur-13	20.6.72	58	Independent
132.	Shankey Wheels Workmen's Union, Durgapur	Durgapur Projects B-Zone Colony, Durgapur-2	27.6.72	182	Independent
133.	Poura Sramik Karmachari Samity, Asansol	16, Raha Lane, Asansol	27.6.72	107	INTUC
134.	Bihar Potteries Workers' Union	H. C. Colony, Hindusthan Cables-P.O.	30.6.72	161	INTUC
135.	Bihar Potteries & Refractory Ceramic Works Labour Union	Rupnarayanpur, Hindusthan Cables-P.O.	5.7.72	115	AITUC
136.	Hindusthan Steel & Metal Workmen's Union	Sagarbhanga Colony, Durgapur-11	18.7.72	84	INTUC
137.	Gushkara Bus Workers' Congress	P.O. & Vill. Gushkara	18.7.72	68	INTUC
138.	Panagar Engineering Works Workers' Union	P.O.-Panagar Bazar	20.7.72	52	INTUC
139.	B. P. Mill Contractors' Mazdoor Congress	Ballavpur, Bardhaman	20.7.72	171	INTUC
140.	Western Kajora Colliery Workers' Union	V. K. Nagar, Durgapur-10	22.7.72	102	INTUC
141.	Raniganj Oil Mills Sramik Congress	M.G. Road, Raniganj	22.7.72	45	INTUC
142.	J.K. Ropeways Coal Board Workers' Union	V. K. Nagar, Durgapur-10	25.7.72	216	INTUC
143.	Durgapur Rickshaw Pullers' Association	Maya Bazar, Durgapur-7	25.7.72	100	INTUC
144.	Hawkers' Union Barddhaman	86, B.C. Road, Bardhaman	4.8.72	103	INTUC
145.	National Refractories Workers' Union	Salanpur	4.8.72	102	Independent
146.	Durgapur Chemicals Sramik Union	Coke Oven Colony, Durgapur-2	11.8.72	176	AITUC

Sl. No.	Name of the Union	Address	Registration	Date of Membership	Affiliation
147.	Food Corporation Workers' Union, (Durgapur)	F.C.I. Township, Durgapur-12	14.8.72	30	INTUC
148.	D.V.C. Diploma Engineers Association	3rd Unit Colony, DTPS, Durgapur-2	5.9.72	61	Independent
149.	Wood Industries Centre Workmen's Union, Durgapur	Wood Industries Colony Durgapur-2	9.9.72	82	INTUC
150.	Phillips Carbon Black Co-operative Society Workmen's Union	Sagarbhanga Housing Colo. Durgapur-11	16.9.72	27	INTUC
151.	Bengal Refractories Staff & Workers' Union	Sitarampur, Barddhaman	28 9.72	21	INTUC
152.	Kusumgram Bazar Dokan Karmachari Samity	Kalitala Bazar, P.O.-Kusumgram	9.10.72	94	Independent
153.	Bengal Refractories Labour Union	G.T. Road, Asansol	10.10.72	77	AITUC
154.	Durgapur Bus Worksmen's Association	Sagarbhanga Colony, Durgapur-11	28.11.72	61	INTUC
155.	J.K. Nagar Aluminium Sramik Union	G.T. Road, Asansol	30.11.72	516	AITUC
156.	Burdwan District Chirakal Mazdoor Congress	133, G.T. Rd., Mehedi Bagan, Bardhaman	7.12.72	71	Independent
157.	Hein Lehmann Labour Union	Sagarbhanga Colony, Durgapur-11	21.12.72	60	NLCC
158.	Burdwan Cycle Rickshaw Sramik Congress	Powerhouse Para, P.O. & Dist-Bardhaman	19.1.73	311	Independent
159.	Durgapur State Dairy Workers' Union	Viswakarmanagar, Durgapur-10	29.1.73	35	INTUC
160.	Durgapur Projects Workmen's Union	Coke Oven Colony, Durgapur-2	31.1.73	397	WBPC

Sl. No.	Name of the Union	Address	Registra- tion	Date of Member- ship	Affiliation
161.	Bharat Opthalmic Glass Workers' Union	V.K. Nagar, Durgapur-10	31.1.73	134	INTUC
162.	Durgapur Notified Area Authority Workmen's Union	Sagarbhanga Colony, Durgapur-10	29.1.73	95	WBPC
164.	Burdwan District Taxi Workers' Union	Sagarbhanga Colony, Durgapur-11	16.2.73	21	INTUC
165.	India Refractories Workmen's Union	Kendua Bazar, Kulti	22.2.73	54	INTUC
166.	Burdwan Zilla Tell Kal Karmachari Sangstha	Bijoy Toran Bus Stand, Bardhaman	22.2.73	46	INTUC
167.	Life Insurance Corporation Workers' Union Asansol Division	G.T. Road., West Asansol	24.2.73	238	A.I.L.I.C Employees' Federation
168.	Durgapur Motor Vehicles (Lorry) Workers' Union	6/2, Guru Nanak Avenue, Durgapur-5	26.2.73	60	INTUC
169.	Colliery Mazdoor Sangh, West Bengal	26, S.B. Balia Lane, Asansol	26.2.73	300	INTUC
170.	CEDB-Staff Association, Durgapur	Durgapur-3	26.2.73	86	Independent
171.	Eastern Railway Vendors' and Bearers' Union	. 26, S.B. Raha Lane, Asansol	1.3.73	45	INTUC
172.	Durgapur Projects Mazdoor Union	Benachiti, Durgapur-3	2.3.73	650	UTUC Lenin Sarani
173.	Burdwan Tula Sramik Union	Bejoy Toran Bus Stand, Bardhaman	9.4.73	39	INTUC
175.	Koyala Mazdoor Congress	G.T. Rd., Asansol	17.4.73	500	HMP
176.	Durgapur Small-Scale Industries Workers' Union	Sagarbhanga Housing Colony, Durga.11	28.4.73	94	INTUC
177.	Indian National Coal Mines Engineering Workers' Association (INMEWA) West Bengal	Ningah Colliery, P.O-Ningah, via-Kalipahari, Bardhaman	25.5.73	2.011	Independent

Sl. No.	Name of the Union	Address	Registration	Date of Membership	Affiliation
178.	Coal Mines Staff Association	27, G.T. Rd., Asansol	9.673	1.076	INTUC
179.	Burdwan Zilla Rice Mill Sramik-O-Karmachari Congress	G.T. Rd., Bardhaman	11.6.73	234	Independent
180.	Durgapur Engineering Co. Workers' Union	Panagarh Bazar, P.O-Panagarh Bazar	16.6.73	18	INTUC
181.	Coal Mines Officers' Association of India	P.O.-Ukhra	25.6.73	506	Independent
182.	Lachipur Colliery Workers' Union	Viswakarmanagar, Durgapur-10	18.7.73	192	INTUC
183.	Kapur Mining Equipment Mazdoor Congress	'A' Block, Kanyapur, P.O-Kanyapur	18.7.73	32	INTUC
184.	Raniganj Electric Supply Employees' Union	Raja P.N. Nalia Road, Raniganj	18.7.73	53	INTUC
185.	Durgapur Cement Works Workers' Union	6/2, Guru Nanak Avenue, Durgapur-5	6.8.73	30	INTUC
186.	Kalna Mahakuma Powerloom Employees' Union	Talbona, P.O.-Nebhuji Bazar	22.8.73	200	Not Known
187.	Jamuria Electric Supply Worker's Union	Jamuriahar Cinema Morh	11.9.73	11	INTUC
188.	Asansol Market Shop Owners' Association	Asansol M. Bazar Asansol	12.9.73	195	INTUC
189.	Durgapur Thana Dokan Karmachari Parishad	Benachiti, Durgapur-13	6.12.73	120	INTUC
190.	Hindusthan Pilkington Glass Works (H.P.G.W) Supervisory Staff Welfare Association	K.S. Road, Railpar, P.O.-Asansol	13.12.73	64	Independent
191.	Ajoy Industries Workers' Union	P.O.-Kulti	24.12.73	N.A.	N.A.
192.	Eastern Railway Traffic Staff Association	Loco Tank Colony, P.O. Bardhaman	27.12.73	282	Independent

ABBREVIATIONS

HMS	:	Hind Mazdoor Sabha
HMP	:	Hind Mazdoor Panchayat
BMS	:	Bharatiya Mazdoor Sangha
WBSEF	:	West Bengal Shop Employees' Federation
NLCC	:	National Labour Co-ordination Council
CITU	:	Centre of Indian Trade Unions
WBPC	:	West Bengal Pradesh Congress
AITUC	:	All India Trade Union Congress
UTUC	:	United Trade Union Congress
BPTUC	:	Bengal Provincial Trade Union Congress
INTUC	:	Indian National Trade Union Congress
N.A.	:	Not Available

ট্রেড ইউনিয়নের এই ১৯২টি ইউনিয়নের তালিকা ১৯৭০–'৭১ সালের। আজ ৩০ বৎসরের মধ্যে আরও বহু ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত হয়েছে ও হচ্ছে। এক একটি ইউনিয়ন ভেঙে আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত একাধিক ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। সবে মিলে বর্তমানে ইউনিয়নের তালিকা ৩০০ ছাড়িয়ে যাওয়াই সম্ভব। যত দিন যাচ্ছে নেতৃত্ব লাভের জন্য এক এক রাজনৈতিক দল ভেঙে যেমন একাধিক দল গড়ে উঠছে—ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যাও তত বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই সঠিক তালিকা প্রকাশ প্রায় অসম্ভব।

তেত্রিশ অধ্যায়



আধুনিক যুগের সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি

সমাজ হল সমাজবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের চিন্তা থেকে প্রতিফলিত একটি প্রত্যয় (Collective representation)। নৃতাত্ত্বিক Radcliffe Brown-এর মতে সমাজের বিভিন্ন কাজকর্ম (Functions) কোন সামাজিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রক (determitant) ও প্রতিফলক (Reflector). এই সব সম্পর্ককে পরিচালনা করছে সামাজিক অবয়ব বা কাঠামো (Structure), Adams Richard ও Levy Strous-এর কাছে ধর্ম কেবল সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখার একটি জোরালো অস্ত্র নয় বরং মানুষের ও সমাজের জাগতিক বিষয়গুলিকে একটি প্রতীকী চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে নিজেকে একটি নীতি-নির্ধারক বা Moral order হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উপাদান। Levy যে সামাজিক কাঠামোর কথা চিন্তা করেছেন তার প্রতিফলন ঘটেছে মানুষের সামাজিক সম্পর্কে। মানুষ তার অভ্যস্ত আচার-বিচার-ধর্মবিশ্বাস, মানুষের মধ্যে পারস্পরিককে কোন ক্ষেত্রেই আমূল তো দূরের কথা, সামান্যও পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু গোটা দুনিয়া প্রতিনিয়তই বদলাচ্ছে, মানুষও বদলাচ্ছে, মানুষের বাস্তব জগতেও যেমন, ভাবজগতেও এই পরিবর্তন অপরিহার্য। কাজেই সমাজও বদলাতে বাধ্য। মানুষ চায় আর না-ই চায়, যুগের সঙ্গে চলতে গেলে পরিবর্তন না এসে পারে না।

কাজেই জেলায় যে সমাজচিত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগে ছিল, ইতিহাসের যুগে তার পরিবর্তনের সূচনা হয়। ইতিহাসেরও যেমন প্রাচীন যুগ থেকে মধ্য যুগে আবার মধ্য যুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ঘটেছে, সমাজেও তেমনি গোষ্ঠীতন্ত্র থেকে পরিবারতন্ত্রে আবার পরিবারতন্ত্র থেকে ধর্ম ও বর্ণভিত্তিক সমাজতন্ত্রে ঘটেছে উত্তরণ। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও অগ্রগতি হয়ে চলেছে। এ চলার বিরাম নেই, এ চলার শেষ নাই। চরৈবেতি, চরৈবেতি। পরিবর্তনহীন সমাজ অসভ্য, সভ্যতার আঙ্গিনায় তার প্রবেশ নিষেধ। যুগে যুগে যেমন

পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন হবে, অভাব-অভিযোগের আকার বদলাবে, সমাজশরীরের ভিত্তি বদলাবে, সমাজেরও হবে তেমনি পরিবর্তন।

বিগত ২৫০ বছরের মধ্যে বাংলার তথা এ জেলার যে পরিবর্তন হয়েছে তা যদি আমাদের পূর্বপুরুষরা কেউ মর্তে আসতেন তো সম্যক বুঝতে পারতেন, বোঝাতে পারতেন। সমাজ গঠনের পরিবর্তন-বিবর্তন যখন উন্নতি পথগামী তখনই সমাজে প্রগতি আসে। আর বিপরীত পথগামী হলেই আসে অধোগতি। জন্ম নেয় অপসংস্কৃতি। জেলার আধুনিক সমাজ গঠনে এই যুক্তি অপরিহার্য।

জেলায় যে আগে অনার্য আদিম জাতির বাস ছিল সে কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পান্ডুরাজার ঢিবির আদিম অধিবাসী জেলার সীমান্ত অঞ্চলে বিলুপ্তপ্রায় শরাক জাতি, মহাবীর বর্ধমানের পিছনে বাগ্‌দী-ডোমেদের কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার ঘটনা এই আদিম সমাজের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। ১০০ বছর আগেও বর্ধমানের বর্তমান অভিজাতপল্লী খোসবাগান অঞ্চলে বাগ্‌দীদের বাস ছিল। অধুনালুপ্ত 'শিউলি' পত্রিকার এক শারদ সংকলনের "ফৌজদারী কালীর উৎস" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। তাছাড়া শিয়ালডাঙ্গা নাম থেকেও বর্ধমানে ব্যাধপল্লীর অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে।

তারপর আর্যজাতির আগমন। মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড়, অনার্য, আর্যজাতির পরস্পরের মিলনে উদ্ভব বাঙালী জাতির। গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি বিভাগ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয়, গোপ, সদ্‌গোপ, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, হাড়ি, মুচি কত জাতি উত্তম-মধ্যম-অধম বর্ণসংকরের পরিণতি। আদিশূর মতান্তরে বল্লালসেনের আমলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের মধ্যে কৌলীন্যের উদ্ভব।

তারপর হল মুসলমানদের আগমন। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির ঘটলো সমন্বয়, কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় ঘটলেও একে অপরের সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে পারে নাই। প্রত্যেকটিই তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে।

১৭৫৭ সালের পর পাশ্চাত্যভাব, পাশ্চাত্য ধর্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ঘটে অনুপ্রবেশ। আবার সংঘাত এবার হিন্দু, মুসলমান ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘাত। ফলে গড়ে উঠলো এক আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি। বর্ধমানেও এই তিনের সমন্বয় ঘটেছে, তার ওপর এসেছে পাঞ্জাবী, বিহারী, রাজস্থানী। এদের সঙ্গেও বাঙালীর সংস্কৃতির ঘটেছে সমন্বয়। ২৫০ বছর ধরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেও কেউ কাউকে গ্রাস করতে পারে নাই। প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। এমন কি যারা খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করেছে

তারাও কিন্তু সাহেব বনে যায় নাই। আচারে-ব্যবহারে আহারে-বিহারে বাঙালী বা আদিবাসীই থেকে গিয়েছে। পারিবারিক সংঘাতে যেটুকু সমন্বয় ঘটেছে তা শহরেই ঘটেছে। ঘটেছে বর্ধমান, আসানসোল, রানীগঞ্জের শিল্পাঞ্চলে; গ্রামে-গঞ্জে এমনকি কালনা কাটোয়ার মত কৃষিভিত্তিক শহরেও পাশ্চাত্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব তেমন অনুভূত হয় নাই।

তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আধুনিকতার ছাপকে সম্পূর্ণরূপে ঠেকানো যায় নাই। গ্রামীণ সমাজে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে ঠিকই কিন্তু তার মৌলিক কাঠামোটা এখনও বজায় আছে। কতদিন বজায় থাকবে সেটা ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

নাগরিক সমাজ :

বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, আসানসোল, রানীগঞ্জ, বার্নপুর অঞ্চলেও ইংরেজ রাজত্বের সূচনাকালে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, গোপ, সদগোপ, উগ্রক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, বাউড়ি, মেথর, মুসলমান, খ্রীষ্টান নানা জাতির বিভিন্নতার ওপর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে এসে শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে একটা নতুন আদর্শ ও নতুন রীতি গড়ে ওঠে। ফলে জাতি, শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য অনেক শিথিল হয়ে যায় ও একটা নতুন সামাজিক স্তর গড়ে ওঠে। এছাড়া জন্মের হার বৃদ্ধির ফলে জাতি যেমন প্রসার লাভ করেছে তেমনি 'জাত-বেজাতে'র বেড়া ভেঙে গিয়েছে। এক জাতের মধ্যে অন্য জাত মিশে যাওয়ার উদাহরণেরও কমতি নাই। খনি আবিষ্কৃত হয়েছে, শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠেছে, যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটেছে, এক শহরের সঙ্গে আর এক শহরের এমন কি বিভিন্ন শহরের সঙ্গে কলকাতার নদীপথে, রেলপথে ব্যবসাবাণিজ্য বেড়েছে, কলকাতার কালচারের সঙ্গে মফস্বল-শহরের কালচারের সংঘাত ঘটেছে, খনি আবিষ্কৃত হওয়ায়, শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠায় বাংলার বাইরে থেকে জাত-বেজাতের লোক আমদানি হয়েছে, ফলে এই সব শহরে এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বিমলচন্দ্র সিংহ তাঁর "প্রগতির স্বরূপ ও বাঙালী সমাজ" প্রবন্ধে লিখেছেন—"পাশ্চাত্য সভ্যতা ও যন্ত্রনিষ্ঠার ফলে যেমনি আমাদের জাত-বেজাতের গন্ডী ভেঙে আসছে এবং আন্তর্জাতিক ও আন্তর্গণিক বিবাহ যেমন আর স্বর্গোদ্যানের নিষিদ্ধ ফল নয়, তেমনি আমরা বেশী পরিমাণে জাতভক্ত হয়ে উঠেছি, কারণ আজকাল ব্রাহ্মণ-সভা, কায়স্থ-সভা, বৈদ্য-সম্মেলন, সভাসুন্দর-সমিতি, সবিতৃব্রাহ্মণ সম্প্রদায় যেরকম "নিখিলবঙ্গ", "অখিলবঙ্গ" ভাবে শুরু হয়েছে তাতে দুই হিন্দুসভার মিলনও ছিল ছোট ব্যাপার।"

১৮৫৯ সনের জুন মাসে গোপ ও মোদকের ধর্মঘট, ধোপার ধর্মঘট, পাল্কী-বাহক, নৌকার মাঝি প্রভৃতির ধর্মঘটের বিবরণ পাওয়া যায় (বিনয় ঘোষ—সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র)। সুবর্ণবণিক জাতির কথা আগেও উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু ইংরেজ আমলে এরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যায়। ফলে লাখপতি, ক্রোড়পতি এক অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। জমিদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগীরাও অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হন। এদের অধীনস্থ কর্মচারীগণ ও জোতদারগণ অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত না হলেও বেশ একটা স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে উচ্চ মধ্যবিত্ত বলে পরিগণিত হন।

এদের নীচে ছিল শিক্ষিত আমলা, ছোটখাট ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, শিক্ষক, লেখক, এঁরা মধ্যবিত্ত বলে গণ্য হল। জমিদারের পাটোয়ারী, গোমস্তাদের বেতন মাসিক তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকা। কিন্তু নানা রকম আবওয়াব হিসাবানা, পার্বণী, তহুরী এসব মিলিয়ে মোটামুটি আয় ভালই হত। আমার মাতামহ মঙ্গলকোটের জমিদার সচ্চিদানন্দ রাজের গোমস্তা ছিলেন। বেতন ছিল মাসিক তিন টাকা। কিন্তু এই মাইনেতেই স্ত্রী পুত্র ও দুই বিধবা কন্যাদের নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার চালিয়েও শতাধিক বিঘা জমি কিনেছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল অন্যান্য আবওয়াবের আয়ের দ্বারা। অভিজাত পরিবার ও ইংরেজ পরিবারে "সরকার" নামে এক শ্রেণীর কর্মী ছিল; এঁরা দেশী ধনী ও বিদেশী পরিবারের যাবতীয় কেনাকাটার কাজ করতেন। তাঁদের বেতন সাধারণ কেরানীর সমান হলেও এঁরা 'ন্যায্য দস্তুরী' ও 'অন্যায্য অনেক উপায়ে' বহু অর্থ উপার্জন করে মধ্যবিত্ত পর্যায়ে উন্নীত হন। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, ইংরেজ শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করাব ফলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার সৃষ্টি হওয়ায় উচ্চ-বিত্ত ও মধ্যবিত্তের সম্প্রসারণ ঘটলো। এদের নীচে সৃষ্টি হল নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়; খুচরা ব্যবসায়ী যেমন মুদিখানা বা বেনেতি মসলার ব্যবসায়ী, কাটা কাপড়ের কারবারী, ছোটখাট শিল্পের দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী, যেমন স্বর্ণশিল্পী, সোনারূপার কারিগর, তাঁতি, মুদ্রাযন্ত্রের চালক ও মালিক, আড়ৎদার। এদের ছেলেরা শহরের আর পাঁচটা পরিবারের অনুকরণে লেখাপড়া শিখে নিজদিগকে মধ্যবিত্ত স্তরে উন্নীত করে।

এদের নীচে ছিল ধোপা, নাপিত, ভৃত্য, কুলি, মজুর, ক্ষেতমজুর, আর্দালি, পিওন, দফতরী ইত্যাদি। গ্রামে এদের রুজি রোজগারের সুবিধা দিন দিন সঙ্কুচিত হতে থাকায় এরাও শহরে এসে ভিড় করতে লাগলো।

শহরে দীর্ঘদিন বাস করতে করতে এই সমস্ত জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী,

ব্যবসায়ী, শিল্পী, প্রফেসর, শিক্ষক, ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ইঞ্জিনিয়ার, দোকানদার, ধোপা, নাপিত, মজুর, ভৃত্য, দপ্তরী এদের বর্ণভিত্তিক পরিচয়, জাতিভিত্তিক সমাজ ভেঙে পড়ে ও এরা অভিজাত, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দিনমজুর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তা সত্ত্বেও পারিবারিক ক্ষেত্রে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, পূজা, পার্বণ, উৎসব প্রভৃতি ক্ষেত্রে পৈতৃক জাতিসত্তা বজায় রেখে চলতেন। বিবাহের ক্ষেত্রে তো জাতবিচারের যথেষ্ট কড়াকড়ি ছিল। কিন্তু পল্লীগ্রামের মত কোন বর্ণভিত্তিক পাড়া গড়ে ওঠে নাই ও জাতবিচারের কঠোরতাও ছিল না।

পল্লীগ্রামের যে দীর্ঘদিন একান্নবর্তী পরিবার প্রথা ছিল, একাধিক পুত্র-পৌত্রদের সম্পত্তি বিভাজন হতে হতে এমন পর্যায়ে এসে গেল যে গ্রামে থেকে সংসার চালানো দুষ্কর হয়ে পড়লো ও রুজি-রোজগারের জন্য এরা সব শহরে এসে ভিড় করতে লাগলো। গ্রামের একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা আস্তে আস্তে ভেঙে পড়লো। আবার এমন পরিবার দেখা গেল যাদের পুরুষরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শহরে চাকুরী যোগাড় করে নিয়ে শহরে মেস হোটেলে থেকে চাকরী করতো, সপ্তাহান্তে গ্রামের বাড়ীতে যেত, কিন্তু এই সমস্ত পুরুষ শহরে থাকতে থাকতে অভিজাত বা এখানকার বাসিন্দা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের দেখাদেখি নিজেদের ছেলেমেয়েকে শহরে এনে শিক্ষা দেবার দিকে ঝুঁকে পড়লো। ফলে সমস্ত পরিবারকে শহরে আনতে হয়; প্রথমে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে থাকতে শহরেই জায়গা কিনে বাড়ীঘর করে শহরেরই বাসিন্দা হয়ে যায়। গ্রামগুলো এমনি ভাবেই পরিত্যক্ত হতে থাকে। কিন্তু শহরে ব্রাহ্মণরা আর ব্রাহ্মণ-পাড়া, কায়স্থরা কায়স্থপাড়া, আগুরিরা আগুরিপাড়া গড়ে তুলতে পারে না। ফলে এক composite পাড়ার সৃষ্টি হয় যেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য এমন কি মুসলমানেরাও একত্রে মিশে যান, এমন কি বাড়ীর পাশাপাশি বাগ্‌দী, মুচি মেথরের বসতিও এড়ানো যায় না। গড়ে ওঠে এক হরিহরছত্রের মেলা। একটা উপকার হয়, শহরে পল্লীগ্রামের সঙ্কীর্ণতা, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতার ধীরে ধীরে ঘটে অবলুপ্তি।

সমাজের উন্নতিতে এই মধ্যবিত্ত সমাজের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ নবজাগরণের উন্মেষে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই মধ্যবিত্ত সমাজই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৮৯৬ সনে "অমৃতবাজার" পত্রিকায় যে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয় তার উল্লেখ থেকেই এ বক্তব্যের সমর্থন মিলবে।

"মধ্যবিত্ত থেকে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত তাহাতে ইহাদের ধনাঢ্যগণের অবস্থার দোষের ভাগ থাকে না, অথচ গুণটি থাকে। ইঁহারা দরিদ্রগণের ন্যায় অন্নচিন্তায় দিবারাত্র জর্জরিত হন না, অথচ কর্মঠ হন, সুতরাং ইঁহারা যেরূপ আত্মোৎকার্যের সুবিধার দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, স্বীয় উন্নতি প্রবৃত্তিও যে প্রয়োজন, ইহারা সেইরূপ প্রবলভাবে অনুভব করেন। সুতরাং, মধ্যবিত্ত লোক সকল সময়েই সমাজে উপকারীরূপে পরিগণিত হন। এদেশের সৌভাগ্য অনেক অংশে এই শ্রেণীর লোকের ওপর নির্ভর করে। যদি কোন কালে এদেশে কোনরূপ সমাজিক কি অন্য কোন বিপ্লব হয়, ইহাদের দ্বারাই তাহা সম্পাদিত হইবে। এখন দেশেতে যতরূপ শুভসূচক কার্যের উদ্যোগ হইতেছে তাহা ইহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে রক্ষা ও পোষণ করা দেশহিতৈষী রাজার অতি কর্তব্য।" (সাময়িক পত্রে সমাজচিত্র)

এ মন্তব্য যে কতদূর সত্য উনিশ শতকের শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সংস্কারের বিবরণ ও বিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস পড়লেই তা বোধগম্য হবে। কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নয়, রুজি-রোজগারের আশায় গ্রামেব ধোপা, নাপিত, ক্ষেতমজুর, নিম্নশ্রেণীর জাতিও শহরে এসে ভীড় করতে লাগল। শহরে গড়ে উঠলো বস্তিজীবন। এদের মধ্যে ২/১ জন লেখাপড়া শিখে সামাজিক মর্যাদা লাভে তৎপর হয়ে উঠলো। এ সম্বন্ধে সংবাদ ভাস্করের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"পূর্বে যে সকল নীচ লোকেরা এদেশে রাজমজুরী করিত, এইখানে তাহারা কর্ণিকাদি পরিত্যাগ করিয়া কাগজকলম ধরিয়া বসিয়াছে। ধোপা, নাপিত, ছুতার, মেথরাদিও কেরাণী, বিল সরকার, মেট, দালালাদির কর্মে গিয়াছে। নীচ কর্মের লোকের অত্যন্ত অপ্রতুল হইয়াছে। সভ্য রাজ্যে ইতর লোকেরাও লেখাপড়া করিয়া থাকে। কিন্তু তাছাড়া জাতীয় নীচ-কর্মে লজ্জা জ্ঞান করে না। ...কিন্তু এদেশে ইতর জাতিরা লেখাপড়া শিক্ষা না করিয়া যদি ইংরেজী ভাষায় কয়েকটা কথাও কহিতে পারে... প্রাণ গেলেও আর স্বজাতীয় কর্মে হাত দিবে না।"

"ইহার ফলে সমাজে জাতিভেদের কঠোরতা ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিল। উচ্চ-নীচ জাতির বর্ণগত বৃত্তির অনুসরণ যেমন হ্রাস পাইল জন্মগত জাতির মর্যাদাও তেমনি হ্রাস পাইল।"

(তদেব)

শহরে এসে ব্রাহ্মণ আর জন্মগত অধিকারে সমাজের ওপর লাঠি ঘোরাতে পারে না। কাজেই ধীরে ধীরে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকারের মর্যাদা ত্যাগ করল।

কায়স্থ, বৈদ্য, উগ্রক্ষত্রিয়, গোপ, সদ্‌গোপ, কর্মকার, সূত্রধর, তন্তুবায় প্রভৃতি জাতির মধ্যে স্তরভেদ ঘুচে গেল। শহরে আসার পর এই সমস্ত জাতির মধ্যে শিক্ষা, অর্থ ও উপজীবিকাই সমাজে বেশী মর্যাদার অধিকারী হলেন। একজন তন্তুবায় কি সূত্রধরও যদি লেখাপড়া শিখে ডেপুটি কি সাবডেপুটি হতে পারে তো ব্রাহ্মণের চেয়ে তারই মর্যাদা বেশী হবে। সাধারণ লোকে ব্রাহ্মণের পায়ে দণ্ডবৎ হওয়ার পরিবর্তে সেই সাবডেপুটিকে দশ বার সেলাম জানাবে। অর্থ কৌলীন্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলো। এমন কি সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান—যেমন বিবাহ, আদ্যশ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন এই সব উপলক্ষে একত্রে এক পঙক্তিতে ভোজন নাগরিক সমাজে দ্রুত বেগে প্রচলিত হলো।

পূজাদি বিভিন্ন ধর্মেকর্মে ব্রতী ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের মধ্যে যে সাত্ত্বিকতা নিষ্ঠা ছিল এখন সেই সব ব্রাহ্মণের শহরে এসে কিরূপ অবনতি হয়েছে সে বিষয়ে ১৮৪৬ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সুন্দর মন্তব্য করা হয়েছে।

"সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেও যে কোন ব্রাহ্মণ বিবিধ ধর্মচিহ্ন ধারণ করিয়া আপনাকে ধার্মিকরূপে প্রকাশ করে, অথবা তাহারদিগের যাত্রা মহোৎসবাদি ক্রিয়া সম্পাদনের প্রয়োজনীয় মন্ত্রসকল কেবল উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই যথেষ্ট সমাদর পূর্বক ধন প্রদান করিয়া থাকেন, সে ব্রাহ্মণ জ্ঞানাপন্ন কিনা ইহা ভ্রান্তিতেও বিবেচনা করেন না। এই প্রকার উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ দশকর্ম উপযোগী কতকগুলি মন্ত্র অভ্যাস করিয়াই আপনারদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন—কঠোর জ্ঞানাভ্যাসে আর কেন পরিশ্রম করিবেন?"

পূর্বে প্রথম প্রথম বৃত্তিভিত্তিক জাতির পরিচয় পাওয়া যেত। বৃত্তিভিত্তিক বসতি বিন্যাসে—যেমন ইছলাবাদের জেলেপাড়া, বড় বেনেপাড়া, অফিসার্স কলোনী, ভাতছালার পিওনপাড়া, নীলপুরের মুচিপাড়া, কুমোরপাড়া, তেঁতুলতলার ময়রাপট্টি, পাকমারা লেন, মহাজনটুলি, জহুরীপট্টি, চাউলপট্টি, ভিখিরিবাগান, বাবুরবাগ, তেলমারুই, ভাতশালা ইত্যাদি। বর্তমানে বড় বেনে বা ছোট বেনেপাড়ায় ২/১ ঘর বেনে হয়তো আছে, বাকী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মজুর, গোপ, শুঁড়ি, নমঃশূদ্রের হরিহরছত্রের মেলা। তেলমারুই-এ তেলকল এককালে ছিল। বর্তমানে তেল মারার ঘানি ও কলু আছে কিনা সন্দেহ। ভাতশালায় আর ভাতের হোটেল নাই। অফিসার্স কলোনীতে এখন কেরাণী, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, পিওনের ভীড়। পিওনপাড়া আভিজাত্যের গর্ব করতে পারে। মহাজনটুলির মহাজনরা উধাও। মহাজনটুলি এখন বেশ্যাপল্লী, তাও বোধ হয় বেশী দিন থাকবে না। জহুরীপট্টি এখন Nursing House, এককথায়

বর্তমান কালে বৃত্তিভিত্তিক পল্লীনামের আর সার্থকতা নাই। পাকমারা গলি এখন ডাক্তারদের অভিজাত পল্লী, পিলখানা লেনে হাতির চিহ্ন নাই। রেকাবী বাজারে এখন আর ঘোড়ার রসদের চিহ্ন নাই, এখন নতুন সাজে নতুনগঞ্জ নাম। আদরের 'খোকা' নাম বুড়ো হলেও ঘুচবে না। নতুনগঞ্জও কোন দিন পুরাতন গঞ্জ হবে না। ভিখিরিবাগানে ভিখিরিরা উধাও। "বর্ধমানেশ্বর মহাদেব" স্বমহিমায় বিরাজমান। প্রায় সমস্ত শহর ও গ্রামে এই একই চিত্র।

Census Hand Book Part XIIA -তে Social Development প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করা হয়েছে তার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে।

In the district of Bardhaman there has been a change for the social behaviour of the people. The restrictions regarding castes have been abolished and all types of people now can participate in a Social function. In the village organisations the people of all castes can also take part. The leadership pattern in the society has also been changed. The person who is both literate and knowledgeable now can take the leadership in the sosiety.

নারী জাতির অবস্থা :

উনবিংশ শতাব্দীতে কি শহর কি গ্রাম সর্বত্রই নারীদের অবস্থা ছিল একই রূপ। রাজা রামমোহন রায় তাঁর "সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ", প্রবন্ধে তৎকালীন হিন্দুনারীর যে জীবনচর্চার বিবরণ দিয়েছেন তার থেকে এ জেলায় সে যুগে এঁদের অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

"দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্ম ভয়ে সহ্য করে। অনেক কুলীন কন্যারই বিবাহের পর যাবজ্জীবনের মধ্যে দু চারিবার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, ভ্রাতৃ গৃহে নানা দুঃখ সহ্যপূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্বাহ করেন।...আর সাধারণ গৃহস্থের বাটিতে স্ত্রীলোক কি দুঃখ না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তাহাদের সহিত পশুর অধম ব্যবহার করেন। স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং বৃহৎ পরিবারের সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে।... ঐ রন্ধনে পরিবেশনে যদি কোন অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী, শ্বাশুড়ি, দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন। এ সকলই স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম ভয়ে সহ্য করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট

থাকে তাহা সন্তোষপূর্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। আর দরিদ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা গো-সেবাদি কর্ম্ম করে, পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেয়, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জল আনয়ন করে, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম তাহাও করে। মধ্যে মধ্যে কিছু ত্রুটি হইলে তিরস্কার পায়। যদি দৈবাৎ ঐ স্বামী ধনী হয় তবে ঐ স্ত্রীব সর্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায়ই ব্যাভিচার দোষে মগ্ন হয় এবং মাসমধ্যে এক দিবসও স্বামী-স্ত্রীর আলাপ হয় না।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামমোহন রায়)

বর্ধমান জেলার চুপী গ্রামের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২—১৯২১) 'সহমরণ' কবিতায় তৎকালীন সমাজের বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ আছে।

জন্ম আমার হিঁদুর ঘরে,
বাপের ঘরে খুব আদরে,
ছিলাম বছর দশ,
কুলীন পিতা, কুলের গোলে,
ফেলে দিলেন বুড়ার গলে,
হলাম পরের বশ।
আচারে তার আসত হাসি
বলব কি আর পরকাশি,
মিটল সকল সাধ,
হিঁদুর মেয়ে অনেক করে
শ্রদ্ধা রাখে স্বামীর পরে,
তাতেও বিধির বাদ।

দিন কাটে তো কাটে না রাত,
মাসেক পরে গেল হঠাৎ—
নিবল জীবন-বাতি।
... ...
চলল নিয়ে শবের সাথে,
যেথায় শ্মশানঘাট।
গুঁড়িয়ে শাঁখা, সবাই মিলে
চিতায় মোরে বসিয়ে দিলে,
বাজল শতেক শাঁখ।

সহমরণ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে তো ছিলই। ব্রাহ্মণেতর অভিজাত পরিবারেও ছিল। বর্ধমানের মহারাজ কৃষ্ণরামের ছয় স্ত্রী ছাড়া একজন বিদেশিনী রক্ষিতা ছিল, চিত্রসেনের দুই স্ত্রী, ত্রিলোকচাঁদের দুই স্ত্রী, তেজচন্দ্রের আট পত্নী—এর মধ্যে জীবনের অন্তিমকালে বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেন। বিবাহের সময় বসন্তকুমারীর বয়স ছিল এগার বৎসর। প্রতাপচাঁদের দুই পত্নী। কাজেই সমাজে অভিজাত পরিবারেও বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। তেজচন্দ্রের বিধবা-পত্নী বসন্তকুমারীর কলিকাতার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অসবর্ণ বিবাহ হয়। এই বিবাহ শাস্ত্রীয় মতে ও রেজেষ্ট্রী করে দুই ভাবেই সম্পন্ন হয়। বালিকাদের ব্রতের মন্ত্রেও বধূদের সপত্নীর উল্লেখও এই বহু বিবাহকে সমর্থন করে :

হাতা হাতা হাতা
খা সতীনের মাথা।
বেড়ী বেড়ী বেড়ী
সতীন বেটি চেড়ি ॥

ঊনবিংশ শতকে যে সমুদায় সমাজসংস্কার গুরুত্ব পেয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল স্ত্রীশিক্ষা, নারী জাতির সাধারণ জীবনযাত্রা ও সামাজিক পদমর্যাদার উন্নতিসাধন। এর থেকেই বোঝা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নারী জাতির অবস্থা কিরূপ ছিল।

১৮৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাডাম সাহেবের রিপোর্টের তথ্য থেকে জানা যায় সে সময় মেয়েদের শিক্ষার কোন পাঠশালা ছিল না। দু-চারটি বাড়ীতে মেয়েদের সামান্য কিছু শিক্ষা দেওয়া হত।

দু-চারটি জমিদার পরিবার বা বৈষ্ণবের আখড়ার বাইরে কোনমতে লিখতে পড়তে পারে এমন একটি স্ত্রীলোকও ছিল না। এর প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ, অবরোধ প্রথা ও তৎকালে প্রচলিত একটা বদ্ধমূল সংস্কার ছিল স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে। Peterson তাঁর ১৯১০-এর বর্ধমান গেজেটে তৎকালে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লিখেছেন : "The first school for girls was started by the European ladies at Burdwan in connecion with the Ladies' Society at Calcutta sometime before 1834, and by 1837 there were altogether four girls' schools in the district. ...The number of girls taught in these schools was 175 and the

instruction was largely religious." এখানে উল্লেখযোগ্য সে সময় জেলার পুরুষের সংখ্যা ১৫,৩২,৪৭৫ এবং নারীর সংখ্যা ৮ লক্ষের ওপর।

১৯০৮-০৯ সালে সমগ্র জেলায় ৭৬টি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে; এ সমস্ত বিদ্যালয়ে ১৯৯৮ জন বালিকা পড়তো অর্থাৎ গড়ে প্রতি বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ২৬.২৮। এই ১৯৯৮ জনের মধ্যে ৭ জন ছিল মধ্য ইংরাজীর ছাত্রী (Class VI) অর্থাৎ মাইনর ক্লাস; ৭১ জন মধ্য বাংলা (Middle Vernacular), ১৭৫ জন উচ্চ প্রাথমিক ও ১৭৫৪ জন নিম্ন প্রাথমিক (দ্বিতীয় শ্রেণী)। মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ছিল আসানসোলে। আসানসোল মিশন বালিকা বিদ্যালয় এটিও প্রথমে Middle English (Class VI) ছিল, পরে এর অধঃপতন ঘটে—মধ্য বাংলা বা Middle Vernacular হয়। এই যেখানে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা সেখানে নারী-প্রগতি আশা করাই বাতুলতা।

জেলায় সহমরণও প্রচলিত ছিল। বর্ধমানের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সহমরণ' কবিতাই এর প্রমাণ। তাছাড়া বর্ধমানে আলমগঞ্জে, ২নং ইছলাবাজারে সতীর মাঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাতার থানা বনপাশ মৌজার মণ্ডলপাড়ায় ও মাঁইডাল শ্মশানের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও মোহনপুরের উত্তর মাঠে সতীর মন্দির এখনও এ অঞ্চলে সহমরণের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বর্ধমানের মহারাজা কৃষ্ণরামের পত্নীগণ চিতুয়া-বরোদার জমিদার শোভা সিংহের কামনালোলুপের আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য জহরব্রত পালন করে মৃত্যুবরণ করেন। বর্ধমান জেলার প্রথম ও শেষ জহরব্রতের অনুষ্ঠান বর্ধমানের বুকেই হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হলেও সমাজে এ বিবাহ বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। রাজপরিবারের তেজচন্দ্রের বিধবা মহিষী বসন্তকুমারীর অসবর্ণ বিধবা-বিবাহ এক বিরল দৃষ্টান্ত। এরপরে ২/৪ ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান হলেও বর্ধমানের সমাজ এ-বিবাহকে বিশেষ আমল দেয় নাই। একবিংশ শতাব্দী এসেও কিন্তু বিধবাবিবাহ সমাজের স্বীকৃতি আদায় করতে পারল না। বাল্যবিবাহের প্রচলন খুবই ব্যাপক ছিল। রাজপরিবারেও ছিল আর ব্রাহ্মণ বিশেষ করে কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের তো ছিলই।

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী
নববর্ষা তু রোহিণী
দশ বর্ষা ভবেৎ কন্যা
তদূর্ধ্বং রজঃস্বলা।

আট বছরে গৌরীদান একি কম পুণ্যের কথা? সারদা আইন পাশ করেও এ বিবাহ আটকানো যায় নাই। বর্তমানে অবশ্য শিক্ষাপ্রসারের ফলে মেয়েরা উচ্চ

শিক্ষা লাভ করছে। কাজেই ২৩/২৪ বছরের আগে বিয়ে হচ্ছে না। কৌলীন্য প্রথাও ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। তবে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ও গোপদের মধ্যে এখনও বাল্যবিবাহ চলছে। মেয়েরা এখন উচ্চশিক্ষা লাভ করছে। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারও হচ্ছে—সরকারী অফিসে, ব্যাঙ্কে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে, স্কুলে, কলেজে চাকরী করছেন। কাজেই মেয়েদের মধ্যে এখন অধিক বয়সে বিবাহ, দু একটি সন্তান, অসবর্ণ বিবাহ, রেজিস্ট্রি বিবাহ বেশ চালু হয়ে গেছে।

পল্লীগ্রামের একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরেছে, বিয়ে হওয়ার পরেই অনেক মেয়ে স্বামীকে নিয়ে বাসা বাড়ীতে থাকতে চায়, শহরে atomic family-এর প্রবণতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। 'Live together'-এর কথাও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। তবে মুসলমান সমাজে ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। মুসলমান সমাজে পরিবার নিয়ন্ত্রণ প্রথা শাস্ত্র অনুসারে নিষিদ্ধ। কাজেই এদের সন্তান সংখ্যাও বেশী। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিবাহ বহুল প্রচলিত। এরা একে 'সাঙ্গা' বলে (মনে হয় সঙ্গী থেকে সাঙ্গা এসেছে। তা যদি হয় তাহলে এদের মধ্যে Live together চালু হতে দেরী নাই)। শিক্ষার প্রসার যেখানে কম, রক্ষণশীলতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ-এর প্রচলন তাদের মধ্যেই বেশী। কলকারখানা যেখানে বেশী বা খনি অঞ্চলে মজুরদের জন্য অনেক বস্তি এলাকা গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে শিশুশ্রমিকের হারও বেশী। তাই শিক্ষার হারও কম। প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার প্রবর্তন হলেও এরা এই সমস্ত শিক্ষাকালকে সময়ের অপচয় বলেই মনে করে। এদের মধ্যে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত। এদের পরিবারের স্ত্রী পুরুষ শিশু সবাই অল্প-বিস্তর উপায় করে কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ পরিবারে স্ত্রীপুরুষের মদ খাওয়া বা অন্য ভাবে নেশাগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতাটা বেশী। এর ফলে সামগ্রিক ভাবে এরা যথেষ্ট উপায় করলেও অভাব এদের ঘোচে না। মদই এদেরকে খায়।

গ্রামীণ সমাজ :

জেলার গ্রামীণ সমাজের কাঠামো (Structure) মূলত কৃষিভিত্তিক। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে কয়লাখনি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জেলার সামাজিক কাঠামোও দ্বিধা-বিভক্ত হয়। পূর্বাঞ্চল হয় কৃষিভিত্তিক আর পশ্চিমাঞ্চল হয়ে দাঁড়ায় শিল্পভিত্তিক। কৃষিভিত্তিক সমাজ মূলত গ্রাম বা পল্লীজীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গ্রামীণ সমাজে জাতিগত পার্থক্য, বর্তমানে অনেক শিথিল হলেও একেবারে ভেঙে পড়ে নাই। জাতিগত বৈচিত্র্য হিন্দুসমাজেই বেশী আর এদের সংখ্যাও বেশী। এদের পরেই আছে মুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য

নেই। তবে সূক্ষ্ম একটা সাম্প্রদায়িক বিভেদ আছে, সেটা সিয়া আর সুন্নী সম্প্রদায় নামে। তবে সে পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে একমাত্র মহরম পর্ব ছাড়া সে পার্থক্য চোখে পড়ে না। জেলার প্রায় সর্বত্র মুসলমান অল্পবিস্তর থাকলেও বর্ধমান, কাটোয়া, কালনা, কেতুগ্রাম, কাঁকসা ও মঙ্গলকোট এলাকাতেই এদের সংখ্যাটা বেশী। হিন্দুদের মধ্যে বেশী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, তিলি, গোয়ালা—এদের সংখ্যাই বেশী। এদের সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

আর আছে নিম্নশ্রেণীর মানুষ ও আদিবাসী সম্প্রদায়। Peterson ১৯১০ সালে বর্ধমান গেজেটে এদের সম্বন্ধে যে তথ্য দিয়েছেন তার থেকে গত শতকে এ জেলায় এদের একটা চিত্র পাওয়া যায়।

In Asansol the lowest stratum of population to be found are the Bauris but even with the last century this tract was an unpeopled wilderness, the haunt of thieves and banditte, and it is only since the discoveries of coal that it has become settled country. The deltaic portion of the district was perhaps seat of oldest civilisation in Bengal; the aboriginal element here is represented by the Bagdis who, according to Mr. Oldham are descended from the Malli and were once the ruling race. The Brahman of Burdwan, however and the Sadgop and Aguri castes, which are peculiar to the district, deserve further mention while the Bagdis and Bauris as representing the aboriginal element in the population are also interesting.

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় জেলার বাগ্‌দী ও বাউড়ীদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯৭০০০ জন ও ১১৩০০০ জন।

যতদিন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয় নাই, শিক্ষার তেমন প্রসার ঘটে নাই, ততদিন গ্রামগুলি ছিল প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ। গ্রামের মধ্যে বৃত্তিভিত্তিক বিভিন্ন জাতি গ্রামের এক এক অংশে বাস করতো; গড়ে উঠেছিল এক একটি পাড়া—ব্রাহ্মণপাড়া, আগুরিপাড়া, কায়স্থপাড়া, সদগোপপাড়া, গোয়ালাপাড়া, বাউড়িপাড়া, বাগ্‌দীপাড়া, সাঁওতালপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি। ব্রাহ্মণ পূজা অর্চনা করতেন কিংবা পাঠশালায় পণ্ডিতি করতেন। কায়স্থগণ জমিদারী সেরেস্তায় গোমস্তাগিরি কিংবা শিক্ষকতা করতেন। উগ্রক্ষত্রিয় সদ্‌গোপ এঁরা চাষবাস নিয়েই থাকতেন। কৈবর্তদের বৃত্তি ছিল মাছ ধরা ও মাছের ব্যবসা, কুম্ভকার হাঁড়িকলসী তৈরী করতেন, কর্মকার ধাতুশিল্পে নিযুক্ত থাকতেন। মুসলমানগণও চাষবাস করতেন। আর বাউড়ী বাগ্‌দী হাড়ি এরা ক্ষেতমজুর বা মজুরের কাজ করতো। এই ভাবে

প্রতিটি জাতি পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতো; এই রকম ভাবেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, আগুরি, সদ্গোপ, বাগ্দি, বাউড়ি, মুসলমানদের নিয়ে একটা compact গ্রামীণ সমাজ গড়ে উঠেছিল। গ্রামে যা উৎপন্ন হত তাতেই মোটামুটি সংসার চলে যেত। অভাব নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু অভাববোধটা ছিল না। মামলা-মোকদ্দমা, কিংবা চাকরী বা ব্যবসার জন্যে কিছু লোক শহরে আসতেন। গ্রামীণ পরিবার ছিল একান্নবর্তী।

তারপর স্বাধীনতা এলো। শিক্ষার প্রসার ঘটলো, রাস্তাঘাটের উন্নতি হল। বাস-ট্রাকের মাধ্যমে শহরের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ হতে লাগলো। একশো বছর আগেও যৌথ পরিবারের আর এক নাম ছিল একান্নবর্তী পরিবার। রোজগার খরচ সবই পাইকারী ভাবে হত। একটাই হেঁসেলে দুরকম রান্না হত, আঁশ আর নিরামিষ। এই পরিবারে দু-একটা বেয়াড়া ছেলে কিছু ঝামেলা পাকাতে চাইলে, জবরদস্ত বড় কর্তা তাকে পোষ মানিয়ে বশে রাখতেন। ক্রমে যৌথ পরিবারে ফাটল ধরলো। যৌথ পরিবারে বড় বড় অংশীদারের মধ্যে একটা করে অদৃশ্য দেওয়াল উঠে যে একতা যৌথ পরিবারের প্রধান শক্তি ছিল, তাকে নষ্ট করে দিল। হয়তো দুই বউ-এর ঝগড়া দিয়ে শুরু হয়ে যৌথ পরিবারের একেকটা ভগ্নাংশ অন্যত্র বসতি করলো, আবার কেউ সঙ্গতির অভাবে পুরানো পৈতৃক বাড়ীরই দুখানি ঘরে পৃথগন্ন হয়ে বাস করতে লাগল। উপজাতিদের বাদ দিলে সাহেব মেম কেউ আর যৌথ পরিবার সমর্থন করে না। আমরাও স্বাধীন হয়ে ওদের ভক্ত হয়ে পড়েছি। "ইংরেজ ভারত ছাড়" বলে ওদের তাড়িয়েছি কিন্তু আচারে-ব্যবহারে পোশাকে-আশাকে কথায়-বার্তায় চালচলনে ওরা যা করতো তাই করছি। বারবার বলছি ছেলেপিলে নিয়ে ওরা কেমন স্বামী-স্ত্রী সুখে আছে; শ্বশুর-শাশুড়ি দিদিমা-ঠাকুরমার বালাই নাই। ওদের পুষতে হচ্ছে না। আর তাঁরা অবস্থা বুঝে সময় থাকতে বৃদ্ধ বয়সের বীমা, থাকার জন্য বৃদ্ধাবাস মায় মরবার পর শ্মশান-খরচের ব্যবস্থা পর্যন্ত ঠিক করে রাখছেন। আমরাও এ-বিষয়ে ঢলে পড়েছি; ভুলে যাই যৌথ পরিবারের সুবিধা। এখানে নিষ্কর্মা পঙ্গু, তাদেরও একটা স্থান ছিল। ছেলেপিলে হলে তাকে মানুষ করার জন্য আয়া রাখতে হত না। দিদিমা-ঠাকুরমার আদরে অনায়াসেই মানুষ হয়ে যেত। সবার জন্যে না হলেও একটা করে বিছানা, সবার জন্যে দু বেলা সব্যঞ্জন ভাত বা রুটি, দুবেলা মোটামুটি জলখাবার অন্ততপক্ষে গুড় মুড়ি বিনি পয়সায় জুটে যেত; তবে শৌখিন কিছু কিনতে হলে নিজের পয়সায় কিনতে হতো। পুজোয় মাথাগুণে অবিকল এক রকম পাড়ের শাড়ী, ধুতি বা এক দামের ইজের শার্ট ফ্রক পেত সবাই।

যৌথ পরিবারে আর কিছু না থাক নিরাপত্তা ছিল—বর্তমানে যেটার একান্ত অভাব। দিনেদুপুরে ফাঁকা ঘরে একা মেয়েমানুষ পেয়ে চোরে ঘর ফাঁক করে দিয়ে যাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী টাকা রোজগারের ধান্দায় দুজনায় দুদিকে বেরিয়ে পড়লেন বিকেলে এসে দেখলেন ঘর ফাঁকা—যা কিছু সঞ্চয় ছিল সব শেষ।

পরিবার ভাগ হতে হতে জমিও ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান যুগে গ্রামে ৪/৫ বিঘে জমি নিয়ে চাষীর আর চলে না। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের গ্রামের ২/৫ ঘরে শাঁখ ফুঁকে দিন গুজরান হয় না, তাঁতির ২/৪ খানা কাপড় বুনে সংসার চলে না। কাজেই চাকরী বা ব্যবসার ধান্দায় শহরে যেতেই হবে। কাজেই যৌথ পরিবার ভাঙছে। আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতা, যৌথ পরিবারে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অভাব, শাশুড়ীর গঞ্জনা, বউদের স্বামী-স্ত্রী মিলে স্বাধীনভাবে বাসা বাড়ীতে থাকবার জিদ যৌথ পরিবারকে ভেঙে দিচ্ছে। কোথাও কোথাও হয়ত দু/একটি পরিবারে যৌথ পরিবার টিকে আছে। তাও আর বেশীদিন থাকবে বলে মনে হয় না।

একান্নবর্তী পরিবারের অংশীদারের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমি-জায়গাও খণ্ডিত হতে লাগলো; গ্রামে থেকে আর চলে না। গ্রামের লোক শহরমুখী হল। শহুরে কালচারের গ্রামীণ কালচারের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটলো। গ্রামের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় শহরের বিলাসিতা, স্টাইল, ঢুকে পড়লো। লোকের অভাববোধ বাড়তে লাগলো। শহুরে কালচারকে নকল করতে গিয়ে গ্রামে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়লো। লেখাপড়া শিখে ছেলেরা আর গ্রামে থাকতে চাইল না, চাকুরী যোগাড় করে নিয়ে কিংবা শহরে একটা ছোটখাট ব্যবসাপত্র ফেঁদে ছেলেরা গ্রাম ছড়ালো। শহরে কি ভিন প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়লো। যত দিন প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের সামঞ্জস্য ছিল তত দিন কোন সমস্যা দেখা দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"আমাদের মধ্যে বিলাসিতা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে ইহা আমাদের ধনবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু একথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে পূর্বে যে অর্থ সাধারণের কার্যে ব্যয়িত হইত, এখন তাহা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত হইতেছে। ইহাতে ফল হইতেছে দেশের ভোগবিলাসের স্থলগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে, শহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে। কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাংলাদেশে দেবমন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নান-পানের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং যে দেশ বারো মাসে তেরো পার্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত সে দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।"

অবশ্য বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে গ্রামের মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতা অনেকটা দূর হয়েছে। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, অস্পৃশ্যতা এ সমস্ত আস্তে আস্তে মানুষের মন থেকে ক্রমশ কমে আসছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার বর্ণভিত্তিক পাড়ার কৌলীন্য অন্তর্হিত হচ্ছে; নিম্নবর্ণের জাতির এমন কি মুসলমানদেরও ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের পাড়ার মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর কারণও আছে—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের ছেলেরা শহরে উচ্চশিক্ষা লাভ করে শহরে এমন কি জেলা বা রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে, সেখানেই বাসা বাঁধছে, গ্রামের বাস তুলে দিচ্ছে আর তার ফলে উচ্চবর্ণের পাড়ায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা ঢুকে পড়ছে কারণ অপেক্ষাকৃত ভাবে এই সমস্ত বাউড়ী, বাগ্‌দী, কোটাল, মুসলমানদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার প্রভাব বিশেষ পড়ে নাই। এদের মধ্যে জন্মহারটাও বেশী।

গ্রামের যে সমস্ত মানুষ শহরে বাসা বাঁধছে তাদের ছেলেমেয়েরা শহুরে জীবনযাত্রার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে, তারা আর গ্রামে যেতেই চাইছে না। গ্রামে তাদের যে জমি-জায়গা ছিল, সেগুলি গ্রামের যে সমস্ত উগ্রক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, গোয়ালা, মুসলমান নিজেরা পরিশ্রম করে নিজেদের জমিতে ২/৩ বার ফসল ফলিয়ে "সান্ন" হয়ে উঠছে তারা কিনে নিচ্ছে। এর আর একটা কারণ আছে; জমিদারী উচ্ছেদ আইন ও সংশোধিত ভূমিসংস্কার আইন কার্যকর হওয়ার পর গ্রামের বড় বড় জোতদাররা গ্রামের মোহ ত্যাগ করে শহরে চলে আসছে। সরকার তাদের উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ করার পর যেটুকু জমি থাকছে, সেগুলি প্রথম প্রথম বর্গাভাগে দিয়ে আসছিল। আবার 'অপারেশন বর্গা' শুরু হওয়ায় বেশীর ভাগ মালিক বর্গাদারের অংশ মিটিয়ে দিয়ে বাকী জমি বিক্রি করে দিয়ে শহরে ব্যবসায় সেই টাকা খাটাচ্ছে বা ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতে জমা রাখছে। আর গ্রামে যারা থাকছে তারা কোন রাজনৈতিক দলে 'নাড়া' বেঁধে পার্টির মদতে সৎ-অসৎ নানা উপায়ে দু'পয়সা উপায় করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। জমির পূর্বতন মালিকেরা বে-আইনী ভাবে তাদের যে সমস্ত উদ্বৃত্ত জমি ভোগ করছিল সেইসব সিলিং বহির্ভূত জমিতে লাল ঝান্ডা গেড়ে দখল করে নিচ্ছে। তবে বেশীর ভাগ লোক যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছে। গ্রামের সমাজ মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে—জমির মালিক আর ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, মজুর প্রভৃতি। মালিক শ্রেণীর মধ্যে আছে ব্রাহ্মণ আগুরি, সদগোপ, গোপ, মুসলমান প্রভৃতি। আর এক শ্রেণীর স্বল্প জমির মালিকানা নিয়ে কিছু লোক আছেন যাদের জমির উৎপাদন থেকে সারা বছরের 'ভাতের' যোগাড়ও হয় না, তাই তারা

গ্রামের মধ্যে মুদিখানা, মণিহারী, কাঁচা সব্জী, মিষ্টির দোকান এই সবের ছোটখাট ব্যবসা খুলে দিনগত পাপক্ষয় করছে। কেউ কেউ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে পোল্ট্রি ফার্ম, গোটারি এ সমস্ত করে দু পয়সা উপায় করছে। আবার কিছু সংখ্যক লোক গ্রামের প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, টিউশনি করেও ভালই উপার্জন করছেন। গ্রামের বর্ণভিত্তিক সমাজ যদিও এখন একেবারে ভেঙে পড়ে নাই, তবে ফাটল ধরেছে। আগেকার বন্ধন আর নাই। আগে গ্রামের মানুষের মধ্যে যে সহযোগিতা ছিল, যে সহমর্মিতা ছিল, আজ তা নষ্ট হতে বসেছে। আগে গ্রামের কারও বাড়ীতে কোন উৎসব পূজা-পার্বণ হলে, গ্রামের লোক ঝাঁপিয়ে পড়তো, সবাই মিলে কাজকর্ম উদ্ধার করে দিত। বাইরে থেকে রান্নার ঠাকুর, এমনকি পরিবেশনকারী এনে কাজ উদ্ধার করতে হত না। সকলেই যেন আত্মীয় পরিজনের মধ্যে, যেন একটা বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা উৎসবের ঘরে, দাওয়ায়, উঠোনে বসে পাত পেড়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন সমাধা করত, উৎসবকে মধুরতর করে তুলতো। অনাহূত রবাহূত কেউ যেন অভুক্ত ফিরে না যায় সেদিকে গৃহকর্তার সতর্ক দৃষ্টি থাকতো।

আর আজ? বড় বড় বিবাহ, উপনয়ন, আদ্যশ্রাদ্ধ উৎসবে নিমন্ত্রণের মাধ্যম দাঁড়িয়েছে ছাপানো পত্র। বাইরের ঠাকুরের রান্না ও বাইরের লোক দিয়েই পরিবেশন—প্যাণ্ডেল খাটিয়ে চেয়ার-টেবিলে ইতর-ভদ্র সকলের একত্রে ভোজন, একেবারে শহুরে কায়দা। তবে কায়দাই আছে, উৎসবের জৌলুস আছে, উৎসবের সে প্রাণ, সে আন্তরিকতা আর নাই। নিমন্ত্রিতরা গৃহকর্তার টিকিও বোধ হয় দেখতে পান না।

গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বেড়েছে। মেয়েরাও বাসে নিত্যযাত্রী হয়ে শহরে স্কুল-কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। "প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজন"-এর বিরাট অসঙ্গতি হওয়ায় বেকারত্ব বেড়ে গেছে। অসন্তোষ বেড়েছে। কাজেই কোন কোন রাজনৈতিক দলে ভিড় পড়ছে। যে সমস্ত মেয়ে শিক্ষিত হয়ে চাকরীর সুযোগ পাচ্ছে তারা সরকারী হোক বেসরকারী হোক, স্কুল হোক পাঠশালা কোথাও চাকরী করতে যেতে পিছপা হচ্ছে না।

"স্ত্রীলোককে সাধ্বী রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়াছে। তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোন জবাবদিহি নাই"। যুগের আধুনিকতা কবিগুরুর উল্লিখিত এই সামাজিক শক্তিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, সহমরণ এসব সেকেলে প্রথা আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান করে নিয়েছে। সবর্ণ, অসবর্ণ, এমন কি হিন্দু-মুসলমানের

মধ্যে বিবাহ শহরে তো বটেই গ্রামেও চলে যাচ্ছে। পূর্বে এরকম এমন কি কুলীন অকুলীনের বিবাহে যেখানে সমাজচ্যুতি বা একঘরে করার ব্যবস্থা ছিল আজ সে সব গবেষকের গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এসব উচ্চবর্ণের ও উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরা শহর থেকে আধুনিকতার স্টাইল গ্রামে আমদানি করে আমাদের বাড়ীর পাশে থেকে ছেলেদের ভাল ভাল পোশাক পরিয়ে আমাদের ছেলেদের চোখের জলে ভাসাচ্ছে; নিজেদের স্ত্রীদের ভাল ভাল শাড়ী, ম্যাক্সি, মিডি, জড়োয়ার গয়না পরিয়ে আমাদের স্ত্রীদের মুখ ভার করাচ্ছে। যে প্রতিবেশী একদিন আপদেবিপদে আমাদের ছিল সবচেয়ে বড় বন্ধু আজ সে-ই হয়ে উঠেছে আমাদের শত্রু। সঞ্জীবচন্দ্র মিথ্যা বলেন নাই—'ঋষির পাশে প্রতিবেশী বসাও দুদিনে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে।' প্রতিবেশী আমাদের বড় শত্রু। অবশ্য যাদের সহায়সম্বল কম কিংবা বাস একেবারে অজপাড়াগাঁয়ে (Interior Village) তাদের মধ্যে এখনও এই আধুনিকতার সংক্রমণ ঘটে নাই। তবে তারও খুব বেশী দেরী আছে বলে মনে হয় না। এই সমস্ত আধুনিক বা অত্যাধুনিক পরিবার ছাড়া বাকীরা মোটামুটিভাবে প্রাচীনপন্থাই অনুসরণ করে, তাদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা ও রক্ষণশীলতা কিছুটা বজায় আছে তবে কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার ধার অনেক কমে গেছে।

মুসলমান সমাজচিন্তা :

মুসলমান সমাজেও দেখা যায় মূলত দুটি স্তর। একটি উপরের স্তর অভিজাত সম্প্রদায় আর একটি নীচের স্তর প্রলেতারিয়েত। আধুনিক যুগে মুসলিম সমাজে পরিবর্তন এসেছে প্রচুর। এদের যাঁরা উচ্চস্তরে ওঠে গেছেন তাঁরা উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, শিক্ষক হচ্ছেন আবার কেউ কেউ বিদেশে পাড়িও দিচ্ছেন। আর সেই সঙ্গে নীচের স্তরের সঙ্গে এদের ফারাকও বেড়ে যাচ্ছে। নীচের তলার মানুষেরা তাঁদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আচার অনুষ্ঠানের প্রথাগুলিকে অনুসরণ করে দিনগত পাপক্ষয় করছে। উপরতলার মানুষের নীচের তলার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই নাই তা নয়, উপরতলার মানুষ নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য ধর্মের জিগির তুলে নীচের তলার মানুষদের রাজনীতির গুটি হিসেবে ব্যবহার করছেন। জেলায় শহরের মধ্যে দেখা যায় হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে উন্নতমানের ক্রমবর্ধমান জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার চর্চায় নিযুক্ত যেমন এক শ্রেণীর Enlightened মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, মুসলমান সমাজের মধ্যে কিন্তু ঠিক অনুরূপ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে নাই। "মুসলমান সমাজ

প্রধানত ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিভক্ত। যে সামান্য সংখ্যক নিম্ন মধ্যবিত্ত ব্যক্তি আছেন তাঁদের সংখ্যাও এত কম যে কোন সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় তাঁরা বিশেষ আলোকপাত করতে পারে নাই। আশার কথা এই যে এই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যাঁরা মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্যে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছেন তাঁরা ভাল ডাক্তার হচ্ছেন, ভাল শিক্ষক হচ্ছেন, নির্ভরযোগ্য সামাজিক মানুষ, অর্থাৎ এদেশেব মানুষেব প্রাত্যহিক কাজকর্মে এঁবা উত্তরোত্তর চূড়ান্তরূপে প্রয়োজনীয় ওঠে উঠছেন।” (পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সমাজচিন্তা হোসেনুর রহমান, সাপ্তাহিক দেশ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪)

শহরে মুসলমান সমাজে এই উচ্চশ্রেণী ও সামান্য সংখ্যক মধ্যবিত্ত মুসলমানের পাশাপাশি অনেকে বস্তিজীবনও যাপন করছে। তবে যাবা কিছুদিন আগেও অপরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর, বস্তিতে মসজিদ, মাদ্রাসা, কালোপর্দা, আব নর্দমা, মাঝে মাঝে দরগা আর নোংরা হোটেলেব মাঝে বাস করতো তাদেব মধ্যেও আধুনিকতাব ছোঁয়াচ লেগেছে। এরাও এখন লেখাপড়া শিখে স্বনির্ভব হতে আবম্ভ করেছে। কারখানা, মাংসের দোকান বা কসাইখানা, হোটেল খুলে দু'পযসা উপার্জন করছে। এঁদের মহিলারাও শিক্ষার জগতের আলোর সন্ধানে কালো বোরখার আবরণ ভেদ করে ঘরের বাইরে আসছেন। তবে অনেকে অবশ্য এখনও পর্দা ব্যবহারের দ্বারা তাদের সংস্কারের শুচিতা ও নৈতিকতাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন। যুগের হাওয়ায় তাও শেষ পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যেতে বেশী দেরী হবে না।

গ্রামের মুসলমান যাঁরা একটু সঙ্গতিসম্পন্ন তাঁরা জমি নিয়ে পড়ে আছেন। নিজেরা শ্রমিকদের সঙ্গে দিনরাত পরিশ্রম করে বছরে ২/৩ বাব ফসল ফলাচ্ছেন, বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে সব্জি ফলিয়ে কাঁচা তরকারী বাজারে বিক্রি করে বেশ দু পয়সা উপার্জন করছেন, জমি কিনছেন আর যাঁরা গরীব, যাঁদের সংখ্যাই বেশী তাঁরা ক্ষেতমজুর হিসেবে কাজ করছেন। গরুর গাড়ী ভাড়া খাটাচ্ছে, খড়ের ব্যবসা করছে। কিংবা ২/৪ বস্তা করে ধান কিনে তার থেকে চাল করে বাজারে বিক্রী করে দিন গুজরান করছে। আর এদের ছেলেরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মসজিদে, মক্তবে, মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। এই সমস্ত শিক্ষালয়ে যাঁরা শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁদের বেশীর ভাগ আরবী তো দূরের কথা, সাধারণ উর্দু পর্যন্ত ভাল করে বলতে পারে না। এঁদের উর্দুজ্ঞান সাধারণ ভাবে নিজেদের মধ্যে কোন মতে কথাবার্তা চালিয়ে যাবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এঁদের কাছেই এই সব ছেলেরা

৫/৬ বছর শিক্ষা লাভ করে, পবিত্র কোরান পাঠ করার মর্যাদা পায়, ওস্তাদের সম্মান লাভ করে। আর সেই বাড়ীতে ছেলের গৌরবে গর্বিত বাবা-মা ছেলের সাফল্যের জন্যে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে। তারপর এই ছেলেরাই বাপের সঙ্গে মাঠের কাজে নেমে যায় কিংবা বাবার খড়ের ব্যবসায় লেগে পড়ে।

অবশ্য সামান্য সংখ্যক মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে ২/১ জন উচ্চশিক্ষা লাভ করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষক হচ্ছে বা শহরে সরকারী চাকরী করে নিজেদের জীবনযাত্রার মান মার্জিত করে চলেছে।

আদিবাসী সমাজ :

গ্রামের নিম্নবর্ণের আদিবাসীর সংখ্যা খুব কম নয়। Peterson তাঁর 1910 সালের বর্ধমান গেজেটিয়ার-এ বিভিন্ন জাতির যে সংখ্যা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ঐ সময় জেলায় বাগদী ছিল ১৯৭০০০; বাউড়ি ১১৩০০০; ব্রাহ্মণ ১০৯০০০; সদ্‌গোপ ১০৬০০০; গোয়ালা ৭০,০০০; আগুরি ৬৬,০০০। এই বাগ্‌দী বাউড়ি ছাড়াও হাড়ি, মুচি, কোটাল, সাঁওতাল, কোঁড়া এরাও তো আছে। এই সমস্ত আদিবাসীরা গ্রামের এক প্রান্তে বাস করছে। ১৯৭৭ সাল থেকে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ব্যাপক আন্দোলনের ফলে এদের মজুরী অনেক বেড়েছে। তার সঙ্গে অবশ্য কাজের ফাঁকিও অনেক বেড়েছে। কিন্তু পার্টির কাজে নিযুক্ত কিছু নেতৃস্থানীয় পরিবার ছাড়া অধিকাংশ আদিবাসী বা তপসিলীদের অবস্থার খুব বেশী উন্নতি হয় নাই। হিসেব করে দেখলে এদের পরিবারভিত্তিক উপার্জন মোটামুটি ভালই। কারণ পরিবারে বালক-স্ত্রী-পুরুষ সবাই কাজ করে কিন্তু মদে বা অন্যান্য নেশাতে বেশী অপব্যয় হয়।

তবে আগের চেয়ে এদের প্রতাপ বেশ বেড়েছে। আগে মালিকদের সঙ্গে যে সৌহার্দ্য ছিল সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পার্টির প্রতি মিছিলেই এদের ডাক পড়ে, বেআইনী ভাবে ভোগ করা জমিতে লাল ঝান্ডা পুঁততে এদের এগিয়ে যেতে হয়। পূর্বে উচ্চবর্ণের মানুষ যেমন এদের ওপর যে শাসন শোষণ, অত্যাচার চালিয়েছে, প্রায় 'বিনি পয়সায়' বেগার খাটিয়েছে আজ ক্ষমতার আস্বাদ পেয়ে এরা তার সুদে-আসলে উসুল করছে—মালিককে চোখ রাঙাতেও ছাড়ছে না। হঠাৎ ক্ষমতা পেয়ে হয়ত কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলছে কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকতার বিচারে সেটাই স্বাভাবিক। একটা ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করলে অবস্থাটা ভাল বোঝা যাবে। একবার বাসে গ্রাম থেকে আসছি। বাসে প্রচণ্ড ভীড়, আমি নিজেও দাঁড়িয়ে। এমন সময় মাঝপথে ২/৪ জন সাঁওতাল উঠলো, খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ; উঠেই সীটে বসা

কোট প্যান্ট পরা এক ছোকরাকে বেশ চোখ রাঙিয়েই বলল—এই বাবু সীট ছেড়ে দে—এতদিন তোরা বসে এসেছিস, আমরা নীচে বসেছি। এবার তোরা নীচে বস, আমরা সীটে বসবো।' তার দোষ নাই ক্ষমতা পাওয়ার প্রথম চোটে এরকম বাড়াবাড়ি হয়ই। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ। এরা নিজেদের ভাষায় বলে 'হড়'—হড় শব্দের অর্থ মানুষ। এদের প্রতিবেশী অন্য জাতের লোকদের বলে দিকু বা বিদেশী। 'দিকু' মনে হয় 'ডাকাত' শব্দ থেকে এসেছে। সেই দিক দিয়ে বিচার, এদের কাছে আদিবাসীরা এ জেলার তথা দেশের আদি মানুষ, বাকীরা বিদেশী। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আরণ্যক উপন্যাসে এঁদের সম্বন্ধে লিখেছেন। "...সে বিশাল তরুতলে দাঁড়াইয়া যেন সর্বব্যাপী শাশ্বতকালের পিছন দিকে বহুদূরে অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ দেখিতে পাইলাম। পৌরাণিক ও বৈদিক যুগও যার তুলনায় বর্তমানের পর্যায়ে পড়িয়া যায়।

দেখিতে পাইলাম যাযাবর আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মত অনার্য আদিম শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছেন। ...ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস এই আর্য সভ্যতার ইতিহাস, বিজিত অনার্য জাতির ইতিহাস কোথাও লেখা নাই।"...

কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ এদের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—'কাককৃষ্ণ, হ্রস্বাঙ্গ, হ্রস্ববাহু, মহাহনু, হ্রস্বপাণি, নিম্ন নাসাগ্র, রক্তাক্ষ, তাম্রমূর্ধজ—ভাগবত পুরাণ ভারতের আদিম অধিবাসীকে সব দিক দিয়ে হ্রস্ব করে ছেড়েছেন—বলা বাহুল্য, এ ধরনের উক্তি সেই প্রাচীনকালের আর্য ভারতীয়দের জাতিগর্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।' —W. W. Hunter-ও তাঁর The Annals of Rural Bengal গ্রন্থে এদের আদিম আধিবাসী বলে বর্ণনা করেছেন। এদের জাতি ও সমাজ সম্বন্ধে Hunter লিখেছেন। Caste is unknown among the Santals. ...Every Santal feels he is the Kinsman of the whole race; and the only difference he makes between his own clan and the others is, that he thinks the relationship between himself and his clan's women too close to permit of intermarriage. The children belong to the father's clan, and the daughters, upon marriage, give up their ancient clan and its gods for those of their husbands.

....The union of his own tribe with another by marriage (Chhatiar) is the most important ceremony in Santal's life". As a rule a Santal lad marries about his sixteenth or seventeenth year;

girls, are generally provided for at fifteen.... As the santals, have attained an age of discretion before they marry, a feedom of selection is allowed to them, wholly unknown among the Hindus"....

উপজাতিদের নিজস্ব কোন ভাষালিপি পাওয়া যায় না। এদের ভাষাগুলি রোমান অক্ষরে বা আঞ্চলিক ভাষার হরফে লেখা হয়। হালে সাঁওতালদের কিয়দংশ দাবী করেছেন যে তাঁদের 'অলচিকি' বর্ণমালা আছে।

এরা মেয়ে-পুরুষ সারাদিন ধানকলে, কোলিয়ারিতে বা শিল্পাঞ্চলে কারখানায় কিংবা ধানচাষের সময় মাঠে কাজ করে। বিকালে শুঁড়িখানা থেকে 'হাঁড়িয়া' (কাঁচিমদ) খেয়ে বাড়ী ফেরে। জীবন ধারণের জন্য জীবিকার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, সেজন্য উপায় এদের করতেই হয়। কিন্তু অভাববোধটা আগে তো ছিলই না এখন সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে কিছুটা জাগ্রত হয়েছে। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে রঞ্জিতকুমার ভট্টাচার্যের (সাপ্তাহিক দেশ ১১।২। ৮৯) কথায়—"দারিদ্র্য বা দীনতা কাছে ঘেঁষতে পারে না। বিত্তহীন হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যের ছোঁয়া লাগেনি, এরকম জাতির অস্তিত্ব কেবল উপজাতিদের মধ্যেই মেলে।"

অর্থনৈতিক জীবন বাদ দিলে এদের সামাজিক অনুশাসন বা সমাজগঠনের কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন প্রতিটি আদিবাসী বা উপজাতি গোষ্ঠীর বংশ বা কুল বা clan পরিচয় আছে যেমন—Nij-Kasda-had, Mij-murmu-had, Nij-Saran-had, Nij-hasdi-had, Nij-marudi-had, Nij-kiskh-had, Nij-tadu-had. Nij কথার অর্থ the son of, "had" গোষ্ঠী অর্থে ব্যবহৃত। এদের প্রতি গোত্রের রয়েছে একটি গোত্র দেবতা—Ora bonga; পারিবারিক দেবতা, Da-bonga (river demons), Daddi-bonga (Well demons), Pakribonga (tank demons), Buzu-bonga (mountain), Bir-bonga (forest gods). বংশের দেবতাকে (কুলকেতু বা গোত্রদেবতা-Totem), বংশের লোকজন শ্রদ্ধা জানায়, দেবজ্ঞানে পূজা করে। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের দোবরুপান্না বীরবর্দীর মুখেও শোনা যায়। "ও পাহাড়ে আমায় তো প্রায়ই উঠতে হয়, ওর গায়েই আমার বংশের সমাধি স্থান, প্রত্যেক পূর্ণিমায় আমায় সেখানে যেতে হয়। ...এদের জন্য মহিষের দেবতা আছে 'টার বাঁড়ো'।"

এদের খাওয়া-দাওয়া বিবাহ-এর মধ্যে নানা বিধিনিষেধ অনুশাসন আছে। এদের কোন সমাজ দুটো ভাগে বিভক্ত (Moiety)। একদল অন্য দলের মেয়েকে

বিয়ে করবে না। কারো বা দুই-এর বেশী ভাগ বা ভাতৃ গোষ্ঠী (Party) রয়েছে। তবে এ জেলায় দুটি ভাগই সাধারণত দেখা যায়। এ জেলার সমাজ পিতৃকেন্দ্রিক তবে অন্যত্র মাতৃকেন্দ্রিকও কিছু গোষ্ঠী আছে। সমাজে পিতারই প্রাধান্য, পিতার নাম, বংশের ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার। কোন কোন সমাজে বহুপতি বিবাহ প্রচলিত, তবে এ জেলাতে সাধারণত এক বিবাহেরই প্রচলন; অবশ্য স্বামী মারা গেলে বিধবার স্বামীর কোন ভাইকে বিয়ে করার রেওয়াজ আছে। মনে হয় তারা ঘরের বউকে পরকে দিতে চায় না। আবার ভূতপ্রেত বা অশরীবী আত্মাতে বিশ্বাসী। এদের হাত থেকে উদ্ধার করে ডাইনী-ওঝা। তুক্‌তাক্‌ জাদুমন্ত্রও সমাজে আছে। এদের দেবতাদের বলি মুরগী কি শুয়োর; আগে নাকি নরবলি দিত। এখন ও-প্রথা উঠে গেছে। আর আছে আনন্দে উৎসবে উল্লাসনাচ ময়ূর পালক নিয়ে মাদল বাজিয়ে দুর্গাপুজোর নবমীতে, চৈত্র মাসের চড়ক পূজায় দল বেঁধে নাচতে বের হয়। (Background papers on Tribal Development : Scheduled Tribes and Scheduled areas in India 1978).

এদের সমাজে বড় লোক গরীব লোকের অস্তিত্ব নাই। আর্থিক সঙ্গতি সামাজিক মর্যাদারও মাপকাঠি নয়। মর্যাদা নির্ভর করে সামাজিক সম্বন্ধের ওপর। ফলে আর্থ-সামাজিক ভেদ বড় একটা নাই। এদের সমাজব্যবস্থায় অর্জিত পদমর্যাদার স্থান নেই। তবে আজকাল এদের মধ্য থেকে এম.এল.এ হচ্ছে, পঞ্চায়েতের সভ্যও হচ্ছে। জমাদার মাঝি যখন বদ্যিনাথ মাঝিকে হারিয়ে জিতল তখন সিপিএম পার্টি থেকে তার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে নতুন কাপড় জামা কিনে এনে পরিয়ে শোভাযাত্রা করে বের হতে দেখেছিলাম। সভ্যসমাজ এদের ওপর অত্যধিক চাপ না দিলে হয়তো এরা আপন শক্তিতে নিজেদের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে পারতো।

এদের পরব 'বাঁধনা'(?)। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ গরু বা মহিষ নাচানো। শক্ত খুঁটিতে একটা বলিষ্ঠ মোষ বা ষাঁড়কে বেঁধে তাকে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষিপ্ত করে তোলাই এ উৎসবের উদ্দেশ্য। বৈদ্যপুরের কাছে আটকোটিয়া গ্রামে যতদূর মনে পড়ে কালীপূজার পর এই রকম মোষ নাচানো ও মোষের লড়াই, মুরগীর লড়াই দেখেছি। তবে এরা মোষকে বেশী পরিমাণে পচুই (পচান মদ) খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে তাকে উত্তেজিত করে। আগে অস্ত্র দিয়ে খোঁচানো হত; সে ক্ষেত্রে অস্ত্র দ্বারা খোঁচাতে খোঁচাতে মোষটা শেষ পর্যন্ত মরে যেত। তাই বর্তমানে লাঠি দিয়েই খোঁচানো হয়। মোষের বা মুরগীর লড়াই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতার আকার নেয় ও বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের কথায়—"হাজার হাজার বছর পরে খ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে আর্য্য ভারতের সৌহার্দ্যের আহ্বান মাত্র ক্ষীণ স্বরে ঘোষিত হয়ে আদিবাসীদের কানে পৌঁছাতে আরম্ভ করেছে—আদিবাসীরা কেউ এ ডাকের অর্থ বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না; অনেকেই সংশয় করে।" দুর্গাপুরের জঙ্গল, আউসগ্রামের জঙ্গলমহল একদিন আদিবাসী অধ্যুষিত ছিল। আজ শিল্পায়নের ফলে তাদের সেখান থেকে ঘটেছে অবলুপ্তি—এখন তাদের বন্যজীবন থেকে শ্রমিক জীবনে উত্তরণ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে নীরদ সি. চৌধুরীর উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে—"মিশরের নীলনদের জলাধার নির্মাণের ফলে ঐতিহ্যমণ্ডিত মিশরের মন্দিরগুলি যেভাবে ডুবে গেছে, ঠিক তেমনি অবস্থা হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের আদিবাসীদের—সুবিশাল জাঁকজমকপূর্ণ কর্মকাণ্ডে আদিবাসীদের কোন ভূমিকা নেই; যার ফলে মানব ভবিতব্যের অবশ্যম্ভাবী নির্দেশ, অবলুপ্তির দিকে তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে...অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—সত্যি সত্যিই তাঁরা অবলুপ্ত হবেন, না-দাসত্ব ও অবক্ষয়ের নয়া শৃঙ্খলে তাদের জড়ানো হবে।" আসানসোল-দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চল এর সাক্ষ্য দেবে।

এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, তাই খনি অঞ্চলে শ্রমসাধ্য কাজের জন্য এদের চাহিদা খুব বেশী। তাছাড়া কৃষিকার্যের জন্য বর্ষাকালে ও ধানকাটার সময় জেলার সর্বত্র এদের ডাক পড়ে। এরা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের থেকে পৃথক জীবনযাপন করে। বর্তমানে গ্রামের তপসিলী এমনকি ভদ্রসমাজের সংস্পর্শে এসে এদের জীবনযাত্রা অন্য সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এরা নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের ভাষাতেই কথা বলে অথচ বাঙালীদের কাছে কাজ করতে করতে বাংলাটাও মোটামুটি বলতে শিখেছে। এদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন আগে একেবারেই ছিল না। বর্তমানে Integrated Tribal Development Project বা সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে এদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে—কেউ কেউ লেখাপড়া শিখে সরকারী বা আধাসরকারী বিভাগে চাকরীও করছে; তবে এ সংখ্যা নগণ্য।

এখন জেলার আদিবাসী সংখ্যা—৩৭৫৭৪২ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৬.২১ শতাংশ।

প্রকল্প এলাকার (আউসগ্রাম, বুদবুদ, কাঁকসা, ফরিদপুর, দুর্গাপুর, আসানসোল, বরাবনী ও সালানপুর) আদিবাসী সংখ্যা ৫৬,৪৫২। এদের উন্নয়ন সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মের জন্য জেলামঙ্গল (welfare) কমিটি আছে। এদিকে সমাজের মূল স্রোতের সামিল করার জন্য এদের জীবিকার উন্নয়নের সঙ্গে সেচ,

বৃক্ষরোপণে, কুটিরশিল্প প্রভৃতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বর্ধমান পুলিশ লাইনে দুর্গাষষ্ঠী ও সপ্তমীর রাত্রে সাঁওতালি নাটকের অভিনয়ে হাজার হাজার সাঁওতাল জড় হয়। এই ভাবে এদের সাংস্কৃতিক বিকাশের চেষ্টা হলেও খুব কম সংখ্যক যুবকই এই সুযোগ নিচ্ছে। বেশীর ভাগই খনিতে, পাথরকাটার কাজে, চাষবাসের কাজে অংশগ্রহণ করে জীবিকা অর্জন করছে। মজুরী অনেক বেড়েছে সেই সঙ্গে মদ খাওয়াও বেড়েছে। তাই যত্র আয় তত্র ব্যয়। স্বাধীনতার পর ৫৩ বছরেও এদের জন্যে সংরক্ষণ করে, এদের উন্নয়নের জন্য জেলাস্তরে পৃথক বিভাগ খুলে, লেখাপড়া শেখার জন্য স্টাইপেন্ড-এর ব্যবস্থা করেও খুব বেশী জনের উন্নতি ঘটানো যায় নাই।

চৌত্রিশ অধ্যায়



জেলার শিক্ষার সেকাল ও একাল

প্রাচীন কালের শিক্ষা : বর্ধমানের শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক কখন থেকে চালু হলো তার সঠিক কাল নির্ণয় সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁর বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) পুস্তকে উল্লেখ করেছেন—ঋষি পালকাপ্য-এর ''হস্ত্যায়ুর্বেদ', চন্দ্রগোমিনের ''চান্দ ব্যাকরণ', গৌড়াচার্য্য গৌড়পাদের ''গৌড়পাদকারিকা' সম্ভবত বাঙালীর লেখা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মন্তব্য করেছেন এগুলি পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হয় সেই পঞ্চম শতাব্দীর কালেও লিপির উদ্ভব হয়েছিল। তাহলে প্রশ্ন ওঠে তখন লিপি কি রকম ছিল।

অনেকের বিশ্বাস ষষ্ঠ শতাব্দীর পাণিনির 'ছান্দস' ভাষার সংস্কৃত (reconstructed) রূপ য়্যা বর্তমানে সংস্কৃত বলেই চলে আসছে ও পরবর্তী কালের শৌরসেণী, মাগধী অপভ্রংশ এবং দেশীয় ভাষার লিপি সবই একই রকম অক্ষরে লিখিত হত। আর সে অক্ষর ছিল সংস্কৃত দেবনাগরী থেকে উদ্ভূত। পরে বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী এর কিছু কিছু পরিবর্তন হতে থাকে। ডঃ মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ' গ্রন্থে বাংলা লিপির ক্রমবিকাশের একটা নমুনা দিয়েছেন।

কালক্রমে পূর্ব ভারতের মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপির উদ্ভব হয়। সমাচার দেবের কোটালিপাড়ার তাম্রশাসনে যে বাংলা লিপির পরিচয় পাওয়া যায় তা মহীপালের সময় বিস্তার লাভ করে। বলাগড় লিপির অক্ষর তার পরিচয় বহন করছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে প্রায় বাংলা অক্ষরের মত ২২টি অক্ষরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই অক্ষরসমষ্টি সম্পূর্ণ আধুনিক বাংলা অক্ষরে পরিণতি লাভ করে। কাজেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বাংলায় লেখাপড়া

শেখার ব্যবস্থা ছিল না বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন "য়ুরোপের মধ্যযুগের মতো আমাদের দেশে শাস্ত্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার চর্চা হতো টোলে, চতুষ্পাঠীতে। কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল।"

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের উইলিয়াম এডাম্‌সের বাংলার শিক্ষা সংক্রান্ত সমীক্ষায় জানা যায় নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই শিক্ষা বর্ধমানেব মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। মহারাজ কীর্তিচাঁদের সময়ে চতুষ্পাঠীতে সামবেদ শিক্ষা প্রচলিত ছিল।

সংস্কৃত শিক্ষা : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি মানসিংহের সুবেদারির (১৫৪৫–৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) কালে ডিহিদারের অত্যাচারে স্বগ্রাম ত্যাগ করে মেদিনীপুবের আড়রার জমিদার বাঁকুড়া রায়ের কাছে আশ্রয় নেন ও তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এব পূর্বে তিনি স্বগ্রাম দামুন্যায় টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের 'আখেটিক খণ্ডে' শ্রীপতির শিক্ষাব্যবস্থার যে বিবরণ দিয়েছেন তাও ছিল এই সংস্কৃত শিক্ষা। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় যে যে বিষয় পড়ানো হত তা থেকে তৎকালীন শিক্ষার প্রণালী ও বিষয়সূচীরও পরিচয় পাওয়া যায়।

পড়এ সাধুর বালা ক খ আঠার কলা
অঙ্ক আস্ক সিদ্ধ বানান
গুরু বাক্যে দিআ কর্ণ চিনিল অনেকবর্ণ
অষ্ট শব্দি সুবন্ত পাণিন।
পরএ দত্ত শ্রীপতি সন্ধিমূলে সন্ধিবৃত্তি
রাত্রিদিন করএ ভাবনা।
নিবিষ্ট করিআ মন লিখে পড়ে অনুক্ষণ
বিদ্যা বিনে নহে অন্যমনা।
পড়িল ব্যাকরণ টীকা গণবৃত্তি সমাপিকা
অমর জুমর বর্ণ নানা...

দীর্ঘ এই শিক্ষাপদ্ধতি থেকে জানা যায় যে শিক্ষা ছিল গুরুমুখী। প্রথমে অক্ষর জ্ঞান, তারপর সুবন্ত (শব্দরূপ) অবশ্য পাঠ্য আটটি শব্দরূপ, সন্ধির সূত্র ও সূত্রের ব্যাখ্যা, ব্যাকরণ টিকা, ধাতু পাঠের টিকা, সমাস, জুমর নন্দীর ব্যাকরণ, শরণ, দুর্ঘট বৃত্তি অর্থাৎ শরণ রচিত ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য, অভিধান, মাঘ-এর কাব্য, কালিদাসের

মেঘদূত, কুমারসম্ভব; ভারবি, জয়দেব, কাব্য প্রকাশ, রত্নাবলী, সাহিত্য দর্পণ, ছন্দ প্রকরণ, কাদম্বরী, আর্য্য সপ্তশতী কাব্য, দণ্ডী, চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদি।

১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম কর্পূরধবল লাউসেনের বাল্যশিক্ষার বিবরণ দিয়েছেন—সেখানেও সংস্কৃত শিক্ষার কথা আছে।

অষ্ট ধাতু অষ্টসিদ্ধি সুবন্ত অমর।
পড়িল অঙ্কের ভেদ বুদ্ধে করি ভর॥
ধাতু নাম শব্দ ভেদ পড়িল অপর।

অবশেষে—

বেদবাণী জানিতে পাণিনি পড়ে রায়।
*** *** *** ***
কাব্য অলংকার কোষ আগম নিগম।
ভক্তি যোগ সার যার ঘুচে মনোভ্রম॥

সপ্তদশ শতকে মোগল শাসনের সময় সংস্কৃত শিক্ষার রমরমা নষ্ট হয়। তা সত্ত্বেও এডাম সাহেবের রিপোর্টে বর্ধমানে এমন এক চতুষ্পাঠীর বিবরণ পাওয়া যায় যেখানে দ্রাবিড়, উৎকল, কাশী এমন কি মিথিলা থেকেও ছাত্র অধ্যয়ন করতে আসতো। এ সময় পাটালি (বর্তমান পাটুলি) ও সাতগেছিয়ার টোলে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হত। অম্বিকা কালনায় বর্ধমানরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে নৈয়ায়িক শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ, দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন, গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিত গঙ্গাধর, অম্বিকার অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশ এর নাম উল্লেখযোগ্য। রাজারাজবল্লভ তাঁর সভায় এঁদিকে আমন্ত্রণ করে সম্মানিত করেছিলেন।

পঞ্চদশ শতকে আউসগ্রাম থানার কলাইঝুটি গ্রামের রূপমঞ্জরী কাশীতে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করে স্বগ্রামে ফিরে এসে টোল খোলেন। রায়নার সোয়াই গ্রামে হুটী বিদ্যালঙ্কার কাশীতে অধ্যয়ন করতে গিয়ে সেখানকার টোলেই বেদান্ত অধ্যাপনা করেন। শাকনাড়ার কুড়ুনী মহিলা টোল খুলে অধ্যাপনা করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় বর্ধমানে সংস্কৃত চর্চায় মহিলারাও পিছিয়ে ছিল না।

এডাম সাহেব আরও উল্লেখ করেছেন যে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলায় ১৯০ টি সংস্কৃতের টোল ছিল। এর মধ্যে অনেক গ্রামেও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হত। ১৯০টি টোলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩৭৬ জন অর্থাৎ গড়ে ৭ জন আর অধ্যাপক সংখ্যা ১৩৫৮ জন। পাঠ্য বিষয় ছিল ব্যাকরণ, ভেষজবিদ্যা, পুরাণ, জ্যোতিষ, তন্ত্র, ছন্দ, শব্দতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব রাজবিধি (আইন) ইত্যাদি। শিক্ষাদান

পদ্ধতি ছিল গুরুমুখী। রাজা, জমিদারদের অনুদান ছাড়াও সম্পন্ন গৃহস্থদের ঘরে পূজাপার্বণ, বিবাহ, আদ্যশ্রাদ্ধ প্রভৃতি থেকে যা উপার্জন হত, তার থেকেই টোলের ব্যয় নির্বাহ হত। এই ১৯০টি টোলের মধ্যে কালনায় ৩৭টি, আউসগ্রামে ৩২টি, বালকৃষ্ণ (বর্তমানের ভাতার) ২৫, রায়নায় ১৩টি, পোতনায় (বর্তমান গলসী) ১২টি, মঙ্গলকোটে ১০টি, পূর্বস্থলীতে ১৮টি, কন্টকনগরী বা কাটোয়ায় ১৩টি টোল ছিল। এসব টোলে পরীক্ষা গ্রহণেরও ব্যবস্থা ছিল। বর্ধমানের বিজয় চতুষ্পাঠী ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (১৯০০-১) মহারাজ বিজয়চাঁদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ চতুষ্পাঠীতে এখনও সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ধারা সমানে চলেছে। এখানেই এক সময় বর্ধমানের বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ মহাশয় অধ্যক্ষের পদে আসীন ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে রাজ পরিবারের গৌরবসূর্য অস্তমিত হয়। বিজয় চতুষ্পাঠীতেও নেমে আসে অন্ধকার। যাই হোক, পরে সরকার অধিগ্রহণ করায় ও বর্তমান অধ্যক্ষ কমলকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর সুদক্ষ পরিচালনায় এই চতুষ্পাঠী আবার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করেছে। বর্তমানে এই চতুষ্পাঠী ছাড়াও চকদীঘিতে আর একটি Govt. Sponsored চতুষ্পাঠী আছে। এছাড়া এ শহরে ও জেলার যত্রতত্র Lump Grant প্রাপ্ত অনেক চতুষ্পাঠী সংস্কৃত শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রেখেছে।

মুসলমান শাসনে জেলার শিক্ষাব্যবস্থা : ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে) বখতিয়ার খিলজি বাংলা আক্রমণ করেন। এরপর থেকেই বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা হয়। এর ফলে জেলাতেও ইসলাম-শিক্ষার বিস্তার ঘটে। মসজিদে মসজিদে মক্তব, মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। এখানে ছাত্রদের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকতো। কোরান, হাদিস, আরবী, ফারসী, মুসলিম আইন প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হত। পিটারসনের রিপোর্টে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মেমারির নিকট বোহারে একটি মাদ্রাসার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এডামের রিপোর্ট থেকে জানা যায় জেলার ১৩টি থানায় ৯৩টি পার্সিয়ান স্কুল, ৩টি প্রথাগত আরবী স্কুল ও ৮টি উচ্চ আরবী স্কুল ছিল। উচ্চ আরবী স্কুলগুলি মনে হয় বর্তমানের সিনিয়র মাদ্রাসা ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অনুরূপ ছিল। ৯৩টি পার্সিয়ান স্কুলের মধ্যে ১৯টি ছিল আউসগ্রাম থানায়, ১২টি বালকৃষ্ণ বা ভাতার থানায় আর ১০টি করে ছিল বর্ধমানে ও রায়না থানায়। মন্তেশ্বর, পোতনা (গলসী), কালনা, মঙ্গলকোট, সেলিমাবাদ (বর্তমান জামালপুর), গাঙ্গুরীয় (কুলটি) অঞ্চলেও পার্সিয়ান স্কুল ছিল। আরবী মক্তব ও উচ্চ মাদ্রাসা ছিল বর্ধমান, কালনা ও গাঙ্গুরিয়ায়। পার্সিয়ান স্কুলে একজন করে

মৌলবী পড়াতেন, হিন্দু শিক্ষকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। আরবী স্কুলে কোথাও একজন আবার কোথাও দুজন মৌলবী থাকতেন। মসজিদ ছাড়াও জমিদারদের বৈঠকখানায়, কাছারী বাড়ী এবং খানকাতে মক্তব ও মাদ্রাসা বসানো হত। এগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯৭১ জন। মক্তবে হিন্দুছাত্রও পড়ানো হত। সাহিত্যাচার্য সুকুমার সেন তাঁর "দিনের পরে দিন যে গেল" স্মৃতিকথায় লিখেছেন তাঁর মেজো ভাই নিমাইদাস বর্ধমানের তেঁতুলতলার মক্তবে ভর্তি হয়েছিলেন—সেখানে তিনি উর্দু বর্ণমালা শিখেছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা : এডাম সাহেবের রিপোর্ট থেকে প্রাথমিক শিক্ষার যে বিবরণ পাওয়া যায় তার থেকে জানা যায় যে ঊনবিংশ শতকে জেলার ১৩টি থানায় ৯৩১টি পাঠশালা ছিল। এই সব পাঠশালা বসতো জমিদারের বৈঠকখানায় কাছারী বাড়ীতে ও চণ্ডীমণ্ডপে। ৯৩১ টি পাঠশালার মধ্যে ৬২৯টি বাংলা স্কুল, ১৩টি ছিল মিশনারীদের স্কুল। থানাগুলির মধ্যে এক আউসগ্রামেই ছিল ৯১টি পাঠশালা। কোন কোন গ্রামে ৫ থেকে ৯টি পাঠশালাও ছিল।

শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৬২৭ জন হিন্দু, ৯ জন মুসলমান ও ৩ জন ক্রীশ্চান। শিক্ষকদের গড় বেতন ছিল মাসিক ৩ টাকা ৪ আনা ৪ পাই (বর্তমানের ৩.৩০ টা)। ছাত্রসংখ্যা ১৩১৯০ জন অর্থাৎ গড়ে ২১ জন। ছাত্রদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী, নিম্নশ্রেণীর ছেলেরাও পড়তো।

বাংলা শেখার ৪টি স্তর ছিল—প্রথম দশদিন অক্ষর পরিচয় ও লেখা, লেখা হত বালির ওপর, কিংবা তালপাতা, কলাপাতা ও পরে কাগজে। দ্বিতীয় স্তরে আড়াই থেকে চার বছর ধরে নামতা মুখস্থ করতে হত আর ভুসো কালি দিয়ে তালপাতার ওপর করতে হত লেখার অভ্যাস। লেখার জন্য কঞ্চি কাঠের কলম, শরকাঠি বা লৌহ শলাকা ব্যবহার করা হত। তবে কঞ্চির কলমটা পারতপক্ষে বেশীর ভাগ ছাত্র ব্যবহার করতো না। পাড়াগাঁয়ে একটা প্রবাদ বেশ চালু ছিল— "কঞ্চির কলম বেঁটের দড়ি। সরস্বতী বলে আমি ছাড়ি।" নামতা ও হাতের লেখা অভ্যাস ছাড়াও ধারাপাত, যুক্তাক্ষর, সমাজবিদ্যা, ভূগোল পড়ানো হত।

তৃতীয় স্তরে হাতের লেখার অভ্যাস তো ছিলই, তার সঙ্গে গঙ্গাবন্দনা, দাতাকর্ণ, হাতেম তাই-এর গল্প পড়ানো হত। অঙ্কও ছিল—যোগ, বিয়োগ, অঙ্ক, শুভঙ্করী, কৃষিবিদ্যা, হিসাবনিকাশ শেখানো হত।

চতুর্থ স্তর ছিল দু বছরের কোর্স। এ সময় কাগজে শ্রুতিলিখন, ব্যবসা-সংক্রান্ত পত্রলিখন প্রণালী শেখানো ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারতের গল্প, কাশীরাম

দাসের মহাভারতের আদিপর্ব ও মনসামঙ্গল পড়ানো হত। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর অবস্থাপন্ন লোকের বৈঠকখানা, জমিদারের কাছারী বাড়ী, চণ্ডীমণ্ডপ, মসজিদ বাড়ীতে ছেলেরা দুলে দুলে পাঠশালাতেই পাঠ-অভ্যাস করত।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালীতে" প্রসন্ন গুরুমশাই-এর পাঠশালার বর্ণনায় সে সময়ের পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতির একটা বাস্তবচিত্র পাওয়া যায়।— "আট দশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া নানা রূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে। মাঝে মাঝে গুরুমশাই-এর গলা শোনা যায়—এই ক্যাব্‌লা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখছিস? কান মলে ছিঁড়ে দেবো একেবারে। নুটু, তোমার কবার নেতি ভিজুতে হবে? ফের যদি দেখি নেতি ভিজতে উঠেছো...."

সেকালের বেসরকারী প্রচেষ্টায় বৈঠকখানা, কাছারী বাড়ীতে পাঠশালা গড়ে ওঠার পাশাপাশি সরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত প্রথাগত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাও চালুছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল ২টি স্তর—উচ্চ-প্রাথমিক ও নিম্ন-প্রাথমিক। উচ্চ-প্রাথমিকে শিশু শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হত। সরকার স্বীকৃত প্রাথমিকে গুরু ট্রেনিং-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়াও আরও ২/১ জন শিক্ষক থাকতেন। শিক্ষকদেব বিদ্যার দৌড় সাধারণত মাইনর (Middle English বা Middle Vernacular) পর্যন্ত; তার সঙ্গে গুরু ট্রেনিং-শিক্ষণপ্রাপ্ত হলে তো সোনায় সোহাগা। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করা বা ফেল করা শিক্ষক ২/১ জন থাকতেন তবে শহরেই এঁদের সংখ্যা ছিল বেশী।

পল্লীগ্রামে ক্লাস সাধারণত দু শিফটে হতো সকাল ৭টা থেকে ১১টা আবার বিকালে ৩টে থেকে ৫টা। শহরে সাধারণত ১০টা—৪টার স্কুল হত। আবার কোথাও কোথাও সকালে এক শিফটেই সারা হত।

ছাত্রসংখ্যা গড়ে স্কুল প্রতি ৫০/৬০ জন। ছাত্রদের বেতন দু আনা থেকে চার আনা। তবে গ্রামে সাধারণত ছাত্রদিগকে চাল, ডাল, আলু, বেগুনের সিধে মায় মাখাতামাক পর্যন্ত পণ্ডিত মশাইকে মাসে একদিন নজরানা হিসেবে দিতে হত। গ্রামের মধ্যে গুরুমশাই-এর যথেষ্ট সম্মান ছিল। যে কোন বাড়ীতে কোন উৎসবাদি হলে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে গুরুমশাই-এর স্থান সর্বাগ্রে। ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের বেতন সাত টাকার মত, অন্যান্য শিক্ষকদের বেতন মাসিক সাড়ে তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকার মধ্যে।

পাঠ্যসূচীর বিষয় ছিল ভাষাশিক্ষা, ধারাপাত, গণিত, স্বাস্থ্যবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল ও মহাকাব্যের গল্প। ভাষাশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর মশাই-এর বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ অবশ্য পাঠ্য ছিল। এছাড়া ছাত্রদিগকে ধারাপাত গণিত, শুভঙ্করী, স্বাস্থ্যবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, রামায়ণ, মহাভারতের গল্পের বই, হাতেমতাই, পিয়ারীচরণ সরকারের First Book, Second Book পড়ানো হত। পত্রলিখন প্রণালী, দলিল লিখনপ্রণালী, মানসিক অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে ছাত্রদিগকে ব্যবহারিক জীবনের উপযুক্ত করে দেওয়া হত। চতুর্থ শ্রেণীতে কোন কোন স্কুলে ঋজুপাঠ ও চাণক্য শ্লোক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পাঠশালা আরম্ভ হতেই নাম ডাকার পর্ব শেষ হলেই ছেলেদের সারি দিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে ধারাপাত থেকে শতকিয়া, কড়াকিয়া থেকে সেরকিয়া পর্যন্ত ও নামতা ঘোষানো শুরু হত। ঘোষক হতো এক-একদিন এক সর্দার পড়ুয়া। একজন ছেলে মাঝখানে দাঁড়িয়ে "একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ", এইসব বলে যেত আর তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাকীসব ছেলেরা এক সঙ্গে বলে যেত। এর পর যথারীতি ক্লাস শুরু হত। অধিকাংশ স্কুলে ২টি ক্লাসরুম আবার কোন কোনটিতে একটি ক্লাস রুমে সব ছেলেরা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে বাড়ী থেকে চাটাই এনে বসতো, শিক্ষক মহাশয়ের জন্য অবশ্য চেয়ার টেবিল থাকতো। খুব কম পাঠশালায় বেঞ্চির ব্যবস্থা ছিল। উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্ল্যাক বোর্ড ও ম্যাপের ব্যবস্থা থাকতো। নিম্ন প্রাথমিকে (শিশু থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত) ম্যাপ-বোর্ডের বালাই থাকতো না। শনিবার দিনটা ছেলেদের পক্ষে মারাত্মক ছিল। এক এক শনিবার এক এক বিষয়ের পুরানো পাঠ ধরা হত। এর পরে হত শ্রুতিলিখন। ছেলেরা পুরানো পাঠ না পারলে বেত আর মাটিতে পড়তো না; ছেলের পিঠেই ভাঙতো। এছাড়া নাড়ুগোপাল (হাঁটু গেড়ে কান ধরে বসে থাকা)—এই সব শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তবে যে শাস্তিই হোক তাতে অভিভাবকদের সায় থাকতো।

তৃতীয় শ্রেণী থেকে শুভঙ্করীর আর্য্যা মুখস্থ করে আর্য্যার নিয়মমাফিক কাঠা, কালি, সেরকষা, সুদকষা, ইট কালি প্রভৃতি অঙ্ক কষতে হত। আর্য্যার নমুনা :

কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্যে
কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্যে ॥
কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ।
বিশ ধূলে হয় কাঠায় প্রমাণ।...

(কুড়োবা = বিঘা, বর্তমানে ৩৩ শতক; কাঠা = ১.৬৫ শতক বা ৭২০ ব. ফু, ধূল = গণ্ডা; কালি = ক্ষেত্রফল)

এ ছাড়া জমাখরচ, সুদকষা, পত্র-লিখন প্রণালী, মাস-মাহিনার হিসাব, মহাজনি কারবারের হিসাবও শেখানো হত। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা শেষে একজন

ছাত্র মোটামুটি ব্যবহারিক শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারতো। ভালো ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের "পুরাতন চিঠিপত্রে সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা" থেকে জানা যায় আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে কট কোবালা সম্পাদন করে গুরুর কাছে শিখতে দেওয়া হত। এক বছরের মধ্যে অভিভাবকের ফরমাস মত ছেলেকে শিখিয়ে দেবার জন্য গুরুর সঙ্গে "কস্য একরার নামা পত্রমিদং কার্জ্যাঞ্চ আগে"—এরকম চুক্তি করা হত। এর জন্য গুরুর দক্ষিণার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বা ধানের চুক্তি থাকতো। ছেলে না শিখলে গুরুমশাই টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকতেন।

প্রায় সমসাময়িক কালে লিখিত Percival wilde এর "Refund" নামক one act play-তে এই রকম ছাত্রদত্ত বেতন ফেরৎ এর উল্লেখ আছে। Principal আর ছাত্র Wasserkoff এর মধ্যে কথাবার্তার একটু অংশ তুলে দিচ্ছি।

Wasserkoff : Damit, I want my tuition fees back!
Is that plain enough?

The Principal : why do you want it back?

Wasserkoff : ....well, I did n't learn anything, I want my money back.

তবে এখানে অভিভাবক নয় ছাত্রই টাকা ফেরৎ চাইছে। কি আশ্চর্য মিল!

মাধ্যমিক শিক্ষা : মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে এডামস্ তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জেলায় ১৪টি বালকদের বিদ্যালয় আর ১০টি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। এই সব বিদ্যালয়ে বালকদের সংখ্যা ছিল ১২৫৪ জন, আর বালিকাদের সংখ্যা ছিল সাকুল্যে ২৪৩ জন। বালকদের বিদ্যালয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত মহারাজার Anglo-vernacular School-ও ছিল।

এরপরে মিশনারী ও বর্ধমানরাজের উদ্যোগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। ১৮৩০–৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্ধমানে ২টি, কালনার জাপতে ১টি মিশনারী স্কুল ও বর্ধমানে একটি রাজার স্কুলের বিবরণ পাওয়া যায়। রাজার স্কুলটিই "এ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল।" নাম শুনে মনে হতে পারে এখানে বাংলা ও ইংরাজী দুই-ই পড়ানো হত। অধ্যাপক কালীপদ সিংহমহাশয় তাঁর "উনবিংশ শতকে বর্ধমান শহরে ইংরাজী শিক্ষা" প্রবন্ধে লিখেছেন—সে যুগের এটি "ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল", বাংলা যা পড়ানো হতো তা নামে মাত্র। প্রথম দিকে

কোন নির্দিষ্ট সিলেবাস ছিল না—কলকাতার পাঠ্যবই ইংরাজী, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল অনুসরণ করা হত। ১৮৫৩ সালে মহারাজার স্কুলটি লোকাল কমিটির আওতায় আসে। ছাত্রসংখ্যাও বাড়তে থাকে। এটিই বর্তমানে বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল।

উড সাহেবের ডেসপ্যাচের সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে শিক্ষা অধিকর্তা, জেলা পরিদর্শকদের অফিসও গড়ে ওঠে। শিক্ষাবিধি এবং পদ্ধতির পরিবর্তন হতে থাকে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ধমানে আসেন ও মহারাজার যত্নে তাঁর উইল বাড়ীর অতিথি ভবনে মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি-ই এসময় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন আর ব্রাহ্মমন্দিরের সঙ্গে একটি বালকদের বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক পাঁচুগোপাল রায়ের মতে "এই বিদ্যালয়টিই বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের অঙ্কুর।" বর্ধমানে এসময় "বার্ডোয়ান স্কুল" নামে একটি সরকারী বিদ্যালয় ছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল পরিদর্শকের বিবরণ থেকে জানা যায় মহারাজার স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল দু'শোরও বেশী, আর পড়াশোনাও বেশ ভালো হত। অপর পক্ষে সরকারী স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৮। পরে অবশ্য বার্ডোয়ান স্কুলটি উঠে যায়। এই বার্ডোয়ান স্কুলে এক সময় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় প্রধান শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন। "সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র," বিনয় ঘোষ, সংকলনে সংবাদ প্রভাকরের একটি সংবাদে দেখা যায় "কৃষ্ণনগর।" ১৫ই বৈশাখ ১২৫৭ (১৮৫১ এপ্রিল) এখানকার কলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের প্রধান শিক্ষক বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয় বর্ধমান স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করাতে, অধুনা সেই পদ শূন্য হইয়াছে।

"১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় বর্ধমানে গেলেন বটে, কিন্তু সেখানেও বহুদিন সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কযেক মাসের মধ্যে তাঁহার উপবীত পরিত্যাগের গোলযোগ উপস্থিত হইল। হিন্দুসমাজের লোক দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার ধোপা-নাপিত বন্ধ করিল। দাসদাসীগণ তাঁকে পরিত্যাগ করিল।..." (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী)

সমাচার দর্পণের আর একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় এই সময়ে বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে সাধনপুর মোকামে মিশনারী সোসাইটির আর একটি স্কুল ছিল। J. J. Weifbrecht এই স্কুলটি খুলেছিলেন। উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে বাংলা পড়ানোর জন্যই এর খ্যাতি ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি ইংরাজী স্কুল খুলেছিলেন।

সমাচার দর্পণের ১৭ই জুলাই ১৮১৯ সংবাদটি এই রকম—"ঐ সাহেব সাধনপুর মোকামে ইংরাজী স্কুল প্রস্তুত করিয়া তাহারদিগকে ৭ই জুলাই তারিখে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং ইহাতে এক সাহেব স্কুল-মেস্টের হইয়াছেন। কিন্তু এই স্কুলে ছাত্র সংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই। স্কুলটি শুধু দূরে নয়, মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত বলেই হিন্দুদের সংকোচ।"

বর্ধমানে মিশনারীদের উদ্যোগে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে "শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মাতাপচন্দ বাহাদুরের এবং কোন ২ সাহেব লোকের অনুকূলতায় শ্রীযুক্ত রেবরেন্দ ওয়াইৎ ব্রেখৎ সাহেবের যত্নেত" সি. এম. এস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এটি Middle English School ছিল। স্বাধীনতার পরে এটি মাধ্যমিকে উন্নীত হয়। এটি প্রথমে খোসবাগান এলাকায় নির্মিত হয়েছিল। পড়ানো হত ইংরেজী, পারসী, আরবী ও সংস্কৃত, অর্থাৎ মূলত ভাষাশিক্ষা। ছাত্রদের মাসিক বেতন ছিল দু টাকা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ব্রাহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটির আর্থিক সঙ্কট নিরসনের জন্য বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৮২ সালের ১৯শে ডিসেম্বর সেটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমে এর নাম ছিল বর্ধমান ইংলিশ স্কুল ও পরে হয় বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল। ১৮৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান অ্যালবার্ট ভিক্টর ইন্সটিটিউশন বর্ধমানে শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯২ সালে উহাও বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের সঙ্গে মিশে যায়। ১৯২০-২১ সালে মেহেদি বাগানঅঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান হাইস্কুল মিউনিসিপ্যাল স্কুলের সঙ্গে মিশে যায়। পূর্বে এই স্কুলটি সিংদরজার কাছে কুঠী বাড়ীতে ছিল। ডঃ সুকুমার সেনের বিবরণ থেকেও জানা যায় যে, তাঁর বাবা বীরহাটা থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে বড়ো বাজারের মহাজনটুলির ভিতরে এই স্কুল থেকে ১৮৯১ সালে এন্ট্রান্স পাশ করেন। কিন্তু সাহিত্যাচার্যের মতে এই ভিক্টর ইনস্টিটিউশন যার চলিত নাম নিউ স্কুল (১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত) ভেড়ার গোয়াল বললেই হয়। প্রমোশনের কোন আটক নাই। মিউনিসিপ্যাল স্কুলেই পড়াশোনা ভালো হত। তবে ভর্তি হওয়া খুবই কঠিন ছিল।

১৯০১ সালের জনগণনা রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জেলার ১৫৩২৪৭৫ জন লোকসংখ্যার মধ্যে ১৩০০০০ অর্থাৎ ৮.৪০ শতাংশ ছিল সাক্ষর অর্থাৎ সামান্য লিখতে পড়তে, নাম সই করতে এবং সামান্য হিসেব করতে পারতো। এই সাক্ষরদের মধ্যে ১৬৬৫৮ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় একজন ইংরেজী পড়তে ও লিখতে পারতো। যদিও বর্ধমান জেলা শিক্ষার দিক দিয়ে খুব উন্নত ছিল বলা যায় না, তবুও তুলনামূলক বিচারে অন্য জেলা থেকে এ জেলার

শিক্ষার অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে হাজার প্রতি ৮ জন সাক্ষর ছিল। মোটামুটিভাবে প্রতি ৫০ জনে ১ জন পুরুষ ও প্রতি হাজারে একজন মহিলা ইংরাজী লিখতে পড়তে পারতো। জাতিগত বিচারে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে উচ্চ জাতিদেরই প্রাধান্য ছিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যদের সংখ্যাই ছিল বেশী। শিক্ষিতের দিক দিয়ে বৈদ্যদের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তারপরে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের স্থান। ১৯০১ সালের আদমসুমারী অনুসারে জেলায় কমপক্ষে ১৪৭০টি বিদ্যালয় ছিল। এদের মধ্যে ১৪৫৭টি ছিল সরকার পরিচালিত, এগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৩৪৮৩ জন। আর ১৩টি বিদ্যালয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় পরিচালিত হত। এই ১৩টি বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৩৩০ জন।

সরকার পরিচালিত স্কুল পরিদর্শনের জন্য সরকার নিযুক্ত পরিদর্শক ছিলেন। আলোচ্য সময়ে পরিদর্শকদের মধ্যে একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর, তিন জন অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর, নয় জন সাব-ইন্সপেক্টর, তিনজন সহকারী সাবইন্সপেক্টর ও ষোল জন পরিদর্শক পণ্ডিত ছিলেন।

১৯০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩৫, এদের মধ্যে একটি মাত্র বালিকা বিদ্যালয়। এইসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১১৬৩৯ জন ছাত্র ও ৬৯ জন ছাত্রী। ১৩৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৮টি ছিল উচ্চ বিদ্যালয়, ২৮টি-র মধ্যে ১৬টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও ১২টি কোন সাহায্য পেত না। যথা—

সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল

১. বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল,
২. ভৈটা হাইস্কুল
৩. মেমারি হাইস্কুল
৪. নাসিগ্রাম হাইস্কুল
৫. মানকর হাইস্কুল
৬. রায়না হাইস্কুল
৭. বাদলা হাইস্কুল
৮. বাঘনাপাড়া হাইস্কুল
৯. পাটুলি হাইস্কুল
১০. পূর্বস্থলী হাইস্কুল
১১. কাটোয়া হাইস্কুল
১২. দাঁইহাট হাইস্কুল

বিনা সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল

১. বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল
২. বর্ধমান এলবার্ট ভিক্টর স্কুল
৩. গোপালপুর হাইস্কুল
৪. শাঁখারী হাইস্কুল
৫. তোরকনা হাইস্কুল
৬. চকদীঘি হাইস্কুল
৭. কালনা রাজ হাইস্কুল
৮. পুটশুরী হাইস্কুল
৯. মাথরুন হাইস্কুল
১০. উখরা হাইস্কুল
১১. এথোরা হাইস্কুল
১২. সিয়ারসোল হাইস্কুল

১৩. ওকারসা হাইস্কুল
১৪. রানীগঞ্জ হাইস্কুল
১৫. আসানসোল রেলওয়ে হাইস্কুল
১৬. শাকতোরিয়া দিশের গড় হাইস্কুল

এই হাইস্কুলগুলি ছাড়া ৮৫টি Middle English স্কুল ছিল। এই ৮৫টির মধ্যে জেলা বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয় ছিল চারটি, ৬১টি ছিল সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও ২০টি বিনা সাহায্যপ্রাপ্ত।

সমস্ত মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যয় ছিল ১৭৯০০০ টাকা, এর মধ্যে ২২০০০ টাকা সরকারী অনুদান ও ১৫৬০০০ টাকা বেসরকারী সাহায্য। এই অর্থের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় হত ৪৪০০০ টাকা, এই ৪৪০০০ টাকার মধ্যে ২০০০ টাকা সরকারী সাহায্য, ২১০০০ টাকা বেসরকারী সাহায্য থেকে আসত। উচ্চ বিদ্যালয়, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও মধ্যবাংলা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাথা পিছু ব্যয় হত যথাক্রমে ২০ টাকা, ১১ টাকা ও ১২ টাকা।

আলোচ্য সময়ে জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১৩৮; এর মধ্যে ২২১টি উচ্চ-প্রাথমিক ও ৯১৭টি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টি ছিল সরকার পরিচালিত গুরু ট্রেনিং স্কুলের সঙ্গে যুক্ত এবং ১টি মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত। বাকী বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী সাহায্যে ও ছাত্র-দত্ত বেতনে পরিচালিত হত।

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টি ছিল আসানসোল মহকুমার কোলিয়ারী পাঠশালা। বেশীর ভাগ স্কুলে সাহায্য আসতো জেলা বোর্ড থেকে। এই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল উচ্চ-প্রাথমিকে ৯০০০ জন ও নিম্ন-প্রাথমিকে ২৭০০০ জন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য ১৯০৯–১০ সালে ব্যয় হয়েছিল ৮৮২৪৯ টাকা অর্থাৎ এক একটি বিদ্যলয়ের জন্য গড় ব্যয় ছিল ১৩৫ টাকা ৮ আনা আর একটি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য গড় ব্যয় হত ৬৩ টাকা ৮ আনা।

জেলায় এসময় একটি কলেজ ছিল মহারাজা পরিচালিত বর্ধমান রাজ কলেজ। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলেজটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজরূপে সরকারী স্বীকৃতি পায়। ১৯০৪ সালে এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০৩ জন কিন্তু ১৯০৯ সালে এর ছাত্রসংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৫৩ জন। এর প্রধান কারণ কলেজটি প্রথমে ছিল অবৈতনিক। পরে লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালে বর্ধমান আসার পর এটিকে বৈতনিক করা হয়। ১৯০৮ সালে বর্ধমান কলেজ থেকে ২৫ জন ছাত্র এফ.এ. (ফার্স্ট আর্ট)

পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। এদের মধ্যে ১৪ জন পাশ করে—একজন প্রথম বিভাগে, ৯ জন দ্বিতীয় বিভাগে। এবছর এফ.এ পরীক্ষার সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষায় ৫ জন পাশ করে। একজন প্রথম স্থান ও একজন সপ্তম স্থান পায়। ১৯০৭-০৮ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় কলেজের ছাত্রদত্ত বেতন থেকে আয় হয়েছিল ২২৮৭ টাকা আর রাজ এস্টেটের অনুদান ৭২৩২ টাকা; মোট ব্যয় হয়েছিল ৯৫০০ টাকা; ছাত্রপ্রতি বার্ষিক ব্যয় ছিল ১৪৪ টাকা।

১৯০৮-০৯ সালে জেলায় ৭৬টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল, এদের মধ্যে ৭টি সরকারী অনুদান পেত, ৫৯টি জেলাবোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত, ৩টি মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত ও ৭টি বেসরকারী সাহায্যে চলত। সরকারী শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ২টি আদর্শ (Model) বালিকা বিদ্যালয় ছিল, একটি ছিল পারাজে, আর একটি আমাদপুরে। বাকী স্কুলগুলি মিশনারী পরিচালিত ছিল।

নিম্নশ্রেণীতে বালিকাদের সঙ্গে বালকও পড়তো। এই বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল সর্বমোট ১৯৯৮ জন, ৭ জন মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে, ৬২ জন মধ্যবাংলা বিদ্যালয়ে, ১৭৫ জন উচ্চ-প্রাথমিকে ও ১৭৫৪ জন নিম্ন-প্রাথমিকে। বালিকাদের একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয় Asansol Mission Girls' School, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বাৎসরিক ব্যয় হয়েছিল ১৩০০০ টাকা—এর মধ্যে ১৮০০ টাকা সরকারী অনুদান, ১৯০০ টাকা জেলা বোর্ড ও ৩৩৩০ টাকা মিউনিসিপ্যালিটির অনুদান। অধিকাংশ বিদ্যালয় ছিল অবৈতনিক। যে কয়টি বিদ্যালয়ে বেতন নেওয়া হত সেখানে ছাত্রীদত্ত বেতনের পরিমাণ মাত্র ১৪২ টাকা। মিশনারী পরিচালিত ও বর্ধমানরাজ পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হতেন। তবে সাধারণত এই সমস্ত বিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষকই পড়াতেন। অধিকাংশ স্কুলের ছাত্রীদের উত্তরপাড়া হিতকারী সভা পরিচালিত ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসতে হত।

এ সময়ে জেলায় কারিগরী বিদ্যালয় ছিল দুটি। একটি জেলা বোর্ড পরিচালিত বর্ধমান টেকনিক্যাল স্কুল, আর একটি Wesleyan Mission পরিচালিত Karsoli Industrial School। এখানে Overseer-এর কোর্স পড়ানো হত। কাঠের কাজ, লোহার কাজ শেখানো হত। এছাড়া জেলায় ৭৮টি মক্তব ও কোরান স্কুল ছিল এদের ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৫৬৩ জন ও ২৬৫ জন। ১৯০৮-৯ সালেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় ছিল। আদিবাসীদের জন্য ৮টি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৮টি গুরু ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৮৪৪–৪৫ সালের সরকারী নীতি অনুসারে জেলায় গঠিত একমাত্র সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল বার্ডোযান স্কুল। কিন্তু মহারাজার স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে স্কুলটি উঠে যায়। তারপর আর জেলায় সরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। বর্ধমানে সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য মৌলবি আবুল কাশেম ও বদরুদ্দিন উমর সাহেব, লাট সাহেবের কাছে দরবার করায়, তিনি এ জেলায় জিলা স্কুল স্থাপনের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন। বর্ধমানের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বদরুদ্দিন সাহেব লাট দরবারে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। তখন ঠিক হলো বর্ধমানে জিলা স্কুল হবে। গতিপ্রকাশ নন্দের কাছ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকায় কালিবাজারের বর্তমান টাউন স্কুল প্রাঙ্গণের ১০ একর জমি কেনা হল।

বিল্ডিং তৈরী হল। কিন্তু Mr. Hornell-এর ২৪।৭।১৯২৩ তারিখের ১৬৩৪ নং পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন Director of Public Instruction F. F. Ogten, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বর্ধমান বিভাগের পরিদর্শক ও জেলা স্কুল পরিদর্শকের সঙ্গে বর্তমান বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নির্মিত বিল্ডিং-এ Zilla School স্থাপনের জন্য আলোচনা করে Govt. of Bengal-এর Secretary-এর নিকট ১৭/৭/১৯২৪ তারিখে নিম্নলিখিত রিপোর্ট পেশ করেন—I discussed with the district Magistrate, the Inspector of Schools and certain local gentlemen the question of starting an additional High School at Burdwan in the buildings already constructed by Govt. for the proposed Burdwan Zilla School which was to be Govt Institution. In view however, of the policy of gradual deprovincialisation of Govt Schools, I do not favour the starting of Govt High School at Burdwan and it was agreed that a good high School on the aided basis would meet the situation. এর ফলে বর্ধমানে জেলা স্কুল হল না। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মিউনিসিপ্যাল স্কুল ভেঙে সেখান থেকে কিছু শিক্ষক ও ছাত্র নিয়ে Town School আরম্ভ করা হল।

১৯৩১ সালের আদমসুমারী থেকে জানা যায় জেলায় শিক্ষিতের হার ছিল ক্রমবর্ধমান। ১৯৩১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষের হার ছিল শতকরা ৪০.৩৫, মহিলা ছিল শতকরা ২৩.৩১। এদের মধ্যে কিছু পুরুষ ও স্ত্রী ইংরাজীও পড়েছিল।

শিক্ষকদের বেতন ছিল কম কিন্তু আন্তরিকতার কোন ঘাটতি ছিল না। অধিকাংশ ছাত্রেরই গৃহশিক্ষক রাখার প্রয়োজনীয়তা ছিল না। ক্লাসের পড়ানই যথেষ্ট হত। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের কিছু ছাত্র অবশ্য গৃহশিক্ষক রাখতো। তখন একজন শিক্ষকই গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে সব বিষয় পড়াতেন। শিক্ষকদের

বেতনেরও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। একে বেতন কম, তার ওপর ছাত্রদের কাছ থেকে যে বেতন আদায় হত তার থেকে শিক্ষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী ৩/৪ কিস্তিতে কিছু করে দেওয়া হত, তারপর Lump grant-এর টাকা এলে সব মিটিয়ে দেওয়া হত। এছাড়া পল্লীগ্রামের শিক্ষকদের বেতন ছিল দু'রকম। সরকার নির্দিষ্ট রুল অনুযায়ী খাতায় সই করতে হত কিন্তু বাস্তবকালে তিনি পেতেন অনেক কম। শিক্ষকরা এতেই সন্তুষ্ট থাকতেন।

স্ত্রীশিক্ষা : তৎকালীন স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দরকার। এডামসের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৮৩৪-৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলকাতার Ladies' Society-এর সহযোগিতায় ও ইউরোপিয়ান মহিলাদের উদ্যোগে এ জেলায় ৪টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এগুলি সবই মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত হত, Rev J. J. Weifbrecht-এর উদ্যোগে বর্ধমান ও কালনার জাপতে এবং W. Carey-এর উদ্যোগে কাটোয়ায় এই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৭৫ জন; এর মধ্যে ৩৬ জন ক্রীশ্চান, ১ জন মুসলমান ও বাকী সব হিন্দু। ধর্মশিক্ষাই ছিল প্রধান বিষয়বস্তু। ১৭৫ জন ছাত্রীর মধ্যে ১১২ জন পড়তে পারতো কিন্তু লিখতে পারতো না। মেয়েদের বাড়ী থেকে নিয়ে আসার জন্য ও স্কুলে ছুটি হলে বাড়ীতে পৌঁছে দেবার জন্য পরিচারিকা নিযুক্ত হত। বেতন মাসিক দু টাকা। Ladies Society ছাত্রীদের জলযোগের জন্য মাসে দেড় টাকা অনুদান দিত।

বর্ধমান মহারানীর উদ্যোগে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারানী অধিরানী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। হরিসভা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯২৯ সালে। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গালর্স স্কুল ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এছাড়া মহারাজ বিজয়চাঁদ মহতাপের সময় বিজয়চাঁদ টেকনিক্যাল স্কুল বি. সি. রোডের ধারে এখন যেখানে জেলা গ্রন্থাগার রয়েছে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সাধনপুরে উঠে যায়। বিজয়চাঁদের চেষ্টায় শ্যামসায়রের পূর্ব পাড়ে রোনাল্ডসে মেডিকেল স্কুলও গড়ে উঠেছিল। রোনাল্ডসে ছিলেন তৎকালীন বাংলার গভর্নর ও ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত রয়েল কমিশনের সদস্য।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হল। স্বাধীন জেলার জন্য শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হল। ভারতে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে পর্যালোচনা ও সুপারিশ করার জন্য ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা নভেম্বর ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে চেয়ারম্যান করে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন মন্তব্য করেন। Our

Secondary Education remains the weakest link in our educational machinery and needs urgent reforms. সেই অনুসারে ১৯৫২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রকে সভাপতি করে Secondary Education Commission গঠিত হয়। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটানো হয়। শিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক স্কুলগুলিকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধাপে ধাপে জুনিয়র বেসিক স্কুলে পরিবর্তিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিন রকমের Basic School গড়ে ওঠে—১) ৩–৫ বছবের ছেলেদের জন্য নার্শারী বা প্রি-বেসিক, ২) ৬ থেকে ১১ বছরের ছেলেদের জন্য প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত জুনিয়র বেসিক, ৩) ১২ থেকে ১৪ বছরের ছাত্রদের জন্য ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম পর্যন্ত সিনিয়র বেসিক।

১৯৬৭–৬৮ সালের হিসাবে দেখা যায়। জেলার পল্লী অঞ্চলে ২০১টি ও শহরে ২৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পল্লী অঞ্চলে ১৫০টি ও শহরাঞ্চলে ২৬টি বুনিয়াদি স্কুল ছিল।

মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যের সঙ্গে জেলারও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করা হয়।

(১) V–VI ক্লাস নিয়ে Two class Junior High School.

(২) V–VIII ক্লাস নিয়ে Four class Junior High School

(৩) V–X ক্লাস নিয়ে Secondary বা মাধ্যমিক স্কুল

(৪) V থেকে XI অথবা IX ক্লাস থেকে XI ক্লাস পর্যন্ত সর্বার্থসাধক বহুমুখী উচ্চমাধ্যমিক স্কুল (Multipurpose Higher Secondary School)

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে পৃথক করে নব গঠিত W. B. Board of Secondary Education-এর কর্তৃত্বে চলে আসে। সেই সময় বর্ধমান জেলায় ১১৪টি হাইস্কুল ছিল।

১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, জেলায় ৩১৩টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,০৩,০৪৩ জন আর ৬২টি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৪১,৪০০ জন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪০টি বালকদের বিদ্যালয়ে ও ৩০টি বালিকা বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র Humanities Course পড়ানো হত। এগুলির অধিকাংশ ছিল পল্লী অঞ্চলে কারণ Science or Technical Course পড়াবার Infrastructure-এর অভাব। আসানসোল, দুর্গাপুর ও বর্ধমান মহকুমার ৭৩টি স্কুলে আর কালনার ১৮টি ও কাটোয়ার ১৫টি

স্কুলে Science আর Humanities পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। জেলার ৩১টি বিদ্যালয়ে Commerce, ৬টি স্কুলে Technical, তিনটি স্কুলে Agricultural, ৩৮টি বালিকা বিদ্যালয়ে Home Science Course চালু ছিল। বর্ধমানের Municipal Girls এ Humanities. Science, Home Science ও Fine Arts, এই চারটি Course পড়ানো হত।

এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলিতে ত্রিবার্ষিক স্নাতক কোর্স চালু হয়। যারা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে পাশ করতো, তারা সরাসরি এই কোর্সে ভর্তি হতে পারতো। কিন্তু যারা দশ ক্লাসের উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পাশ করতো তাদের এই ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির সুযোগ ছিল না। তাদের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বছরের প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স আর বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভারসিটি এন্ট্রান্স কোর্স চালু হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কলেজেই এই কোর্স পড়ানো হতো। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও এই কোর্স পড়াবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়।

১৯৬৪ অব্দে কোঠারী কমিশন গঠিত হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত অন্য রাজ্যের সঙ্গে এ-জেলাতেও শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়।

১৯৭৩ সাল থেকে কমিশনের সুপারিশকে কার্যকরী করে শিক্ষাব্যবস্থার ৪টি স্তর গঠন করা হয়—

(১) Class I-V : Primary

(২) Class VI-X : Secondary

(৩) Class XI-XII : Higher Secondary

(৪) 3 Year Degree Course

Higher Secondary স্তরকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আওতা থেকে নবগঠিত উচ্চ-মাধ্যমিক কাউন্সিলের অধীনে আনা হয়। Higher Secondaryকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়—General ও Vocational. General-এর মধ্যে Humanities, Commerce, Science ও Vocationalএর মধ্যে Commerce, Para Medical, Technical এইভাবে ভাগ করা হয়। এই ব্যবস্থা এখনও বলবৎ আছে।

যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন জেলায় মাত্র তিনটি কলেজ ছিল—বর্ধমান রাজ কলেজ (১৮৮১), কালনা কলেজ (১৯৪৩) ও সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত আসানসোল কলেজ। পরে অবশ্য এর নাম হয় বনোয়ারীলাল

ভালোটিয়া কলেজ। এই কলেজের জন্য ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের হাতে বনোয়ারীলাল ভালোটিয়া বিপুল অর্থ দান করেন—তখন আসানসোল কলেজের নাম হয় বনোয়ারীলাল ভালোটিয়া কলেজ। এরপর থেকে রায়নার শ্যামসুন্দর কলেজ (১৯৪৮), কাটোয়ায় কাটোয়া কলেজ (১৯৪৮) ও আসানসোল জেলার প্রথম মহিলা কলেজ—মণিমালা গার্লস কলেজ (১৯৫০) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে মণিমালা কলেজের নাম হয় আসানসোল গার্লস কলেজ।

ষাটের দশকে শিক্ষার ক্ষেত্রে জেলার একটা জোয়ার আসে। এক্ষেত্রে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ও বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। বর্ধমানের মহারাজ উদয়চাঁদ মহ্তাব ডঃ রায়ের আবেদনে সাড়া দিয়ে বর্ধমান বাজবাড়ী ও গোলাপবাগ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দান করেন। ১৯৬০ সালের ১৫ই জুন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর থেকে একে একে গুসকরা কলেজ, রানীগঞ্জে ত্রিবেণী ভালোটিয়া কলেজ, বর্ধমানে উদয়চাদ উইমেন্স কলেজ, বিবেকানন্দ কলেজ ও প্রথম বি.টি. কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। পরে অবশ্য কাটোয়া ও কালনা কলেজেও বি.এড্. শিক্ষণ-ব্যবস্থা চালু হয়। জেলার একমাত্র সরকারী কলেজ দুর্গাপুরে—দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জেলায় ১২টি ডিগ্রি কলেজ ও ১টি বি.টি. কলেজ ছিল।

পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল কলেজ ও ল' কলেজ এবং দুর্গাপুরে Engineering College প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় Padmaja Naidu College of Musicও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একবিংশ শতকের সূচনায় দুর্গাপুরে আর একটি B. E. College হয়েছে।

বর্তমানে জেলায় ২৫টি কলেজের মধ্যে ১৫টিতে অনার্স পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। জেলায় মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসহ ৩২টি কলেজের মধ্যে ১৯৭১ সালের পরে প্রতিষ্ঠিত মানকর, মেমারি, চন্দ্রপুর, খাঁদরা, হাটগোবিন্দপুর ও চিত্তরঞ্জন কলেজ রয়েছে। কয়েকটিতে অনার্স পড়াবার ব্যবস্থাও চালু হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে নির্বাচিত কয়েকটি Arts ও Commerce subject-এ correspondence course চালু হয়েছে। রিফ্রেশার ও ওরিয়েন্টেশন কোর্সও চালু হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে W.B.C S. পরীক্ষায় বসবার জন্য ট্রেনিং দেবারও ব্যবস্থা হয়েছে।

দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ২ বছরের Master of Engineering (M.E. ও M.Tech.) পড়াবার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া বর্ধমানের সাধনপুরে

বিজয়চাঁদ টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট্ ছাড়াও জেলার তিনটি পলিটেক্নিক—কলানবগ্রামে সতীশচন্দ্র টেক্নিক্যাল ইন্স্টিটিউট (১৯৪৯), আসানসোলে আসানসোল পলিটেক্নিক (১৯৫৬) ও কন্যাপুরে কন্যাপুর পলিটেক্নিক (১৯৬০)-এ ৩ বছরের Licentiate course ও ২ বছরের Diploma course পড়ান হচ্ছে।

Directorate of Industries পরিচালিত একটি Industrial Training Institute দুর্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে ১০৪০ জন শিক্ষার্থীকে ১৯টি বিষয়ে I.T.I. Training দেওয়া হয়। Tradewise সিটের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

১। Black Smithy–৩২
২। Draughtsman (Civil)—৩২
৩। Diesel Mechanic–৩১
৪। Fitter–২২৮
৫। Mechanical Composit–৯৬
৬। Mech. Miller–২৪
৭। Moulder–৪৮
৮। Welder–৭২
৯। Plumber–৩২
১০। Carpenter–৩২
১১। Draughtsman (Mechanical)–৩২
১২। Electrician–৬৪
১৩। Mech. Grinder–৪৮
১৪। Mech S.S.P.–২৪
১৫। Motor Mechanic–৩২
১৬। Pattern Maker–৩২
১৭। Turner–১২০
১৮। Steel Metal Worker–৩২
১৯। Radio Mechanic–৩২

দুর্গাপুরে অবস্থিত Central Mechanical Engineering Research Institute প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পনায় ড. বিধানচন্দ্র রায়ের অবদান অনস্বীকার্য। এর কাজ হচ্ছে শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সমস্যার সমাধানকল্পে

উন্নততর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োগ, যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা করা, প্রযুক্তির মানোন্নয়ন প্রভৃতি।

বর্ধমান, কালনা ও কাটোয়ায় স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ ছাড়াও কলানবগ্রাম, শক্তিগড়, বিদ্যানগর, কাটোয়া ও লাউডোহে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান Junior Basic Training Institute প্রতিষ্ঠিত আছে। এইসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০০ থেকে ২২৫ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। কাটোয়া Instituteএর সিট সংখ্যা সবচেয়ে কম ১০০ এবং শক্তিগড়ে সবচেয়ে বেশী—১৫০ জন শিক্ষক ও ৭৫ জন শিক্ষিকা।

নীচের সারণী থেকে ১৯৭১-৭২ সালের জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যার একটা চিত্র পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়ের শ্রেণী	স্কুলের সংখ্যা		ছাত্রসংখ্যা		শিক্ষকের সংখ্যা	
	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	পুরুষ	মহিলা
উচ্চতর মাধ্যমিক	১৫৬	২১	৭৬০৬৫	২১৮৪২	৩২২৭	৫৪০
উচ্চ মাধ্যমিক	১৭৪	৩৩	৪০৩২২	২১৭১৫	১৬৪২	৩৭৪
নিম্ন মাধ্যমিক	১৫৭	৪৭	১৪৯৪২	১২৬৫৫	৭৭৪	২৬০
মাদ্রাসা	৬	—	১৩৩৯	১২৩	৪৮	—

১৯৯১ সালের আদমসুমারী রিপোর্ট অনুসারে জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় ও জেলার মোট সাক্ষরের সংখ্যা জানা যায়।

১		২		৩		৪		৫	
প্রাথমিক বিদ্যালয়		**নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়**		**মাধ্যমিক বিদ্যালয়**		**উচ্চতর বিদ্যালয়**		**বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র**	
গ্রামের সংখ্যা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা
২১৮৫	২৭৫০	২১৯	২২৪	২৮১	২৮৭	৪৮	৪৮	২৭৭	৩৫০

১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুসারে জেলায় মোট সাক্ষরের সংখ্যা ৩১৩৬৭৬১ জন; এদের মধ্যে ১৯১০২৭২ জন পুরুষ ও ১২২৬৪৮৯ জন মহিলা।

শহরাঞ্চলে (Notified area সহ) বিদ্যালয়ের সংখ্যা

১	২	৩	৪	৫	৬
মহকুমা	প্রাথমিক	নিম্ন মাধ্যমিক	মাধ্যমিক	উচ্চতর মাধ্যমিক	বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র
বর্ধমান	১৩৮	৫	৩৩	১০	২১৫
কালনা	৩৫	৩	৫	৫	১৩১
কাটোয়া	৪৯	৬	৫	৫	-
দুর্গাপুর	১৫৭	৯	২৫	১৭	২
আসানসোল	৩৩৭	২২	১১	১৯	২
মোট	৭১৬	৪৫	৭৯	৫৬	৩৫০

জেলা পরিদর্শক মহাশয়ের কাছ থেকে ১৯৯৮ সালের স্কুলসংক্রান্ত যে পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে তার থেকে জানা যায়—জেলায় মোট ১১১টি বালকদের ও ১২টি বালিকা বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক কোর্স চালু আছে। এই ১২৩টি দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর বিদ্যালয়ের মধ্যে বর্ধমান মহকুমায় ৪৬টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ও ১টি সিনিয়র মাদ্রাসা, আসানসোল মহকুমায় ২৪টি, দুর্গাপুরে ১৭টি, কালনা মহকুমায় ২০টি ও কাটোয়া মহকুমায় ১৩টি ও ২টি সিনিয়র মাদ্রাসায় General Course পড়ানো হয়।

নীচের সারণী থেকে জেলার শিক্ষার সামগ্রিক চিত্রটা পরিস্ফুট হয়।

মহকুমাভিত্তিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা—১৯৯৮

মহকুমা	উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী		দশম শ্রেণী মাধ্যমিক		নিম্ন মাধ্যমিক	
	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
বর্ধমান	৪২	৪	১৫৫	২৯	৭০	১৪
আসানসোল	১৯	৫	৫২	২৬	২২	৪
দুর্গাপুর	১৬	১	৪৭	১০	১৮	১
কালনা	১৯	১	৪৩	১৩	৩৫	৬
কাটোয়া	১২	১	৬৩	৪	১৮	৪
মোট	১০৮	১২	৩৬০	৮২	১৬৩	২৯

মাদ্রাসা

মহকুমা	সিনিয়র মাদ্রাসা		মাদ্রাসা		জুনিয়র মাদ্রাসা	
	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
বর্ধমান	১	-	৯	১	৯	১
আসানসোল	-	-	-	-	-	
দুর্গাপুর	-	-	-	-	-	-
কালনা	-	-	-	-	১	-
কাটোয়া	২	-	৪	-	৩	-
মোট	৩	-	১৩	১	১৩	১

মহকুমাভিত্তিক বিদ্যালয়—ছাত্র-শিক্ষকের সংখ্যা

মহকুমা	স্কুলের শ্রেণী মাদ্রাসাসহ	স্কুলের সংখ্যা		ছাত্র সংখ্যা		শিক্ষক সংখ্যা
		বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	
বর্ধমান	উচ্চতর মাঃ	৪৩	৪	৩৬৭৩৭	১৩৫৬২	১৩২৯
	মাধ্যমিক	১৬৪	৩০	৬০১১১	৪৬৪৮৪	২৬৩৮
	জুনিয়র	৭৯	১৫	৯৪৬৩	১০৩৬৪	৫৭৩
আসানসোল	উচ্চ মাঃ	১৯	৫	২৬৭৪০	১২৫০৫	৬৯৬
	মাধ্যমিক	৫২	২৬	৩২৭০০	৩১৭৬০	১০৮৫
	জুনিয়র	২২	৪	৫০৮৩	৪২১৫	১৬২
দুর্গাপুর	উ. মা.	১৬	১	১৭৩৪৮	৬৭২৬	৪৭৭
	মাধ্যমিক	৪৭	২০১	২৩১৬১	২২০৮৮	৭৯২
	জুনিয়র	১৮	১	৩২০২	৩১৩৮	১১৩

মহকুমা	স্কুলের শ্রেণী মাদ্রাসা সহ	স্কুলের সংখ্যা		ছাত্র সংখ্যা		শিক্ষক সংখ্যা
		বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	
কাটোয়া মহকুমা	উ.মা.	১৪	১	১২৬৪৮	৩৫১২	৩৯৩
	মাধ্যমিক	৬৩	৪	১৯৬৪৭	১৬৭৩৭	৮৯০
	জুনিয়র	২২	৪	২৫১৯	৩০৭১	১৫৩
কালনা মহকুমা	উ.মা.	১৯	১	১৭২৭৩	৪১২৮	৫৫৯
	মাধ্যমিক	৪৩	১৩	১৩৩৩৮	১৫২০৮	৭৪০
	জুনিয়র	৩৬	৬	৪৪৩৪	৭৪৬১	২৪৭

মাধ্যমিক স্তরে সমগ্র জেলায় কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা ১০৮৪৭, এর মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকে ৩৪৫৪, মাধ্যমিকে ৬১৪৫ ও নিম্ন-মাধ্যমিকে ১২৪৮, জেলার পরিদর্শক সূত্রে জানা যায় আরও প্রায় ১০৪৪টি পদ শূন্য আছে (১৯৯৮ সালের জুলাই-এর হিসাব)।

প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৯৫ সালের পরিসংখ্যান) : জেলায় মোট ৫৫টি সার্কেল আছে। প্রাথমিক সংসদের অধীনে বিদ্যালয়ের সংখ্যা শহরাঞ্চলে ৭১৬, পল্লী অঞ্চলে ২৭৫০, কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা শহরাঞ্চলে ১০১৩৭ ও শিক্ষিকার সংখ্যা ৩৩৪২। মোট ছাত্রসংখ্যা ৬৭৭৮১২-এর মধ্যে বালক ৩৬৭৭৭৪ ও বালিকা ৩১০০৩৮।

১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা-বর্ষে এ জেলাতেও সেপ্টেম্বর মাসে সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচীর সূচনা হয়। ১৯৯১ সালের মে মাসে এই কর্মসূচীর পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৯১ সালের ২৪শে আগষ্ট তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতি মাননীয় শঙ্করদয়াল শর্মা বর্ধমান জেলাকে পূর্ণসাক্ষর জেলারূপে ঘোষণা করেন। সেই সময় সাক্ষরতা পরিসংখ্যান ছিল ৮২.২ শতাংশ।

এরপর সাক্ষরোত্তর প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। জনশিক্ষা নিলয়মের ধাঁচে ধারাবাহিক শিক্ষাপ্রকল্পও চালু আছে। সারা জেলায় মোট দু'হাজার জনশিক্ষা নিলয়ম এই ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পকে সার্থক করার ব্রত গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো নব সাক্ষরদের লব্ধ শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে জীবনের মান উন্নত করা। সুতরাং এই প্রকল্প চলতেই থাকবে। কিন্তু কতটা ফলপ্রসু হবে সেটা ভবিষ্যৎই বিচার করবে।

সাক্ষরতা কর্মসূচীর রূপায়ণ ও নবসাক্ষরদের সমস্যা সম্পর্কে ২৭শে মার্চ ২০০০ Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সংশ্লিষ্ট অংশ তুলে ধরছি—টীকা নিষ্প্রয়োজন।

Post Literary Programmes are said to be the most crucial module in adult education. A few months, break often results in a neo-literate lapsing back to illiteracy, said Dr. Tandra Mitra, asstt. Director of Adult Continuing Education and Extension (A.C.E.E.) Centre. 'A gap of three years may become impossible to roll back.'

Field workers say it is 'very difficult' getting illiterate people to class rooms in the first place. All of them come from the lower most stratum of society and attending classes means losing a few hours of more worth while work.

Almost no one bothers to brush up the reading-writing skills after becoming literate and these have to be lured back to post-literacy programmes.

Field-out-reach Programmes for neoliterates include their economic rehabilitation by backing up their literacy skills with vocational training. These also include packages for improving the lives of street children and other marginal sections. Most universities have not been able to conduct these programme because of severe resource crunch (Statesman News Service. 27.3.2000)

আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি, যে সব বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ের কার্যশেষে non-formal (প্রথা বহির্ভূত) শিক্ষা-প্রকল্পের জন্য ২ জন করে আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল বা যে সমস্ত বিদ্যালয়ে নৈশকালীন বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছিল সেখানে প্রয়োজনীয় ছাত্র যোগাড় করে আনতে শিক্ষকগণ পকেট থেকে পয়সা খরচ করে লজেন্স আর ফুটবল কিনে দিয়েও নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র যোগাড় করতে পারেন নাই। শেষে এই সব স্কুলে এই প্রকল্প বন্ধ করে দিতে হয়।

কয়েকটি গ্রাম ঘুরে শিক্ষার্থীদের ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে লক্ষ্য করেছি এ শিক্ষা সম্বন্ধে তাদের অনীহা। অভিভাবকদের বক্তব্য পরিষ্কার—'কি হবে বাবু এ লেখাপড়া শিখে?—চাকরীও পাবে না—কারিগরও হবে না—

দুদিন বাদে তো সব ভুলে যাবে আবার আমার সঙ্গে কাজে বেরুতে হবে। তার চেয়ে রাখালি করলে নিজের পেটটা চালাতে পারবে।'

'The ground reality is that people are not interested in education because there are opportunities available; and culture is not what our Maculayan schools promote.'

(*Statesman*, 6.3.2000)

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন—

"আমরা ভদ্রলোকেরা যে শিক্ষালাভ করিতেছি সেটাতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমরা অভিমান করি—সেটা আমাদিগকে দান করা, অনুগ্রহ করা নয়, কিন্তু সেটা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের প্রতি অন্যায় করা। এই জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কোন খর্বতা ঘটিলে আমরা উত্তেজিত হইয়া উঠি। আমরা মাথা তুলিয়া শিক্ষা দাবী করি।" আমার মনে হয় আমাদের আপামর লোকসাধারণ যতদিন না মাথা তুলে শিক্ষা দাবী করবে, ততদিন দুই একটা নাইট স্কুল খুলে বা শিক্ষা নিলয় স্থাপন করে এই সব নিরক্ষরদের প্রকৃত অর্থে সাক্ষর করা যাবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা সম্পর্কিত জেলা পরিকল্পনা কমিটি প্রকাশিত তথ্য ও পরিসংখ্যান হ্যাণ্ডবুক ১৯৭১ ও ১৯৯৪ থেকে কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

বৎসর	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	মোট ছাত্রী সংখ্যা	ছাত্রীদের শতকরা হার
১৯৮১-৮২	৩৩৯০	৪৬৪৮৮১	২০৫৬১৪	৪৪
১৯৮৭-৮৮	৩৭৭৫	৫৩৪৮৬৪	২৪৪৪০৭	৪৬
১৯৯৩-৯৪	৩৭৭৫	৬৫৩৮৯১	২৯৪৮০৭	৪৫

পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত তপসিলী জাতি/আদিবাসী ছাত্রছাত্রী সংখ্যা

	তপসিলী জাতি	তপসিলী আদিবাসী
১৯৮৭-৮৮	২৯৩৬২	৪৯০১
১৯৯৩-৯৪	৩৮০০ (প্রায়)	৬০০০ (প্রায়)

সাক্ষরতার হার

সাল	গ্রামীণ সাক্ষরতার হার		সমগ্র জেলার হার	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
১৯৭১	৩৭.৫	১৯.৯	৪২.৯	২৪.৭
১৯৮১	৫৪.৩	২৭.৪	৫৫.৬	২৯.২
১৯৯১	৭৮.২	৬১.৯	৭১.১	৫১.৫

এই সমস্ত বিদ্যালয় ছাড়াও জেলায় মোট ৭টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় আছে—বর্ধমানের আলমগঞ্জে ১, পানাগড়ে ১, দুর্গাপুরে ২, আসানসোলে ১, চিত্তরঞ্জনে ১ ও কৃষ্ণপুর কলিয়াড়িতে ১টি।

C.B.S.E ও I.C.S.E.এর অনুমোদিত ইংরেজী মাধ্যমিক Secondary ও Higher Secondary স্কুলের সংখ্যাও জেলায় কম নয়। বর্ধমানেই রয়েছে সেন্ট জেভিয়ার্স ও হলিরক, তাছাড়া নির্মীয়মান East West Model School. আসানসোল ও দুর্গাপুরেই এদের সংখ্যা বেশি।

বর্ধমানের পূর্বসীমানায় 'বামে' প্রয়াত ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত অন্ধ ও মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। আর ইংরাজী মাধ্যম কে.জি., প্রাইমারী তো ব্যাঙের ছাতার মত জেলার যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছে। তবে এসব স্কুলে ছেলেদের শিক্ষা কতটা হচ্ছে সেটা বিতর্কের বিষয়।

পঁয়ত্রিশ অধ্যায়



বর্ধমান জেলার ক্রীড়াচর্চা

প্রাচীনকালে বিনোদন : প্রাগৈতিহাসিক যুগে জেলায় ক্রীড়াচর্চার হদিস মেলে না। তবে তখন আদিম যুগের মানুষ ছিল খাদ্যসংগ্রাহক, খাদ্যসংগ্রহের প্রধান অঙ্গ পশুশিকার। কাজেই পশুশিকার ও তীরন্দাজি নিশ্চয়ই ছিল, এরকম সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয় না। আর্যদের যখন জেলায় অনুপ্রবেশ ঘটল, তখন গুরুগৃহে বিশেষ করে টোলে যে বিদ্যাচর্চা হত তার মধ্যে যোগ ব্যায়াম, নানাবিধ আসনের অনুশীলন হত বলে অনুমান করা যেতে পারে। তাছাড়া অক্ষ ক্রীড়া বা পাশাখেলা বিনোদনের অঙ্গ ছিল বলেই মনে হয়। তবে অশ্বচালনা যে শিক্ষা করা হত এটা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে। দেশ পত্রিকার ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুলাই সংখ্যায় নগেন্দ্র সর্বাধিকারীর 'ফুটবল' শীর্ষক প্রবন্ধে দেশে ফুটবল খেলার একটা উৎসের উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্বাধিকারীর কথায়—"আমরা ব্যাসের মহাভারতে পাই হস্তিনাপুরের বালকরা ফুটবল খেলেছিল, বল ছিল লোহার। সেটি গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়ে এক শুষ্ক কূপে। দ্রোণ-মহাশয় তা উদ্ধার করে দিয়ে, তাদের ঘরে আচার্য-গিরি পেয়ে যান। বহুকাল পরে কাশীরাম দাস তা সমঝ করতে না পেরে খেলার ধরণ জুড়ে দিয়েছেন 'হকি'। কাশীরামের কিন্তু দোষ নাই কাশীরামের সময় বাংলায় গুলি-ডান্ডার খুব চলন ছিল। কাশীরাম বলেন :

একদিন তথা যত কুরুপুত্রগণ
নগর বাহিরে ক্রীড়া করে সর্বজন।
এক গোটা লৌহ ভাঁটা ভূমিতে ফেলিয়া
হাতে দণ্ড করি তাহা যায় তাড়াইয়া ॥

কাশীবাম এ জেলারই সন্তান অতএব তাঁর চিন্তাধারায় এ জেলার ক্রীড়া-চর্চার প্রতিফলন ঘটেছিল মনে করা যেতে পারে। মুকুন্দরামও তাঁর

কালকেতুকে দিয়ে "লইয়া পাবড়া চেলা" খেলার সাথীদের জীবন সংশয় করে তোলার কথা বলেছেন। জানি না এই ড্যাংগুলি খেলার মধ্যে বর্তমানের বিদেশী ক্রিকেটের নিউক্লিয়াস নিহিত কিনা।

প্রাক্-চৈতন্যযুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : প্রাক্-চৈতন্যযুগে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" চাঁচরী খেলার কথা আছে—"চাঁচরী খেলাওঁ মোর্ত্রে" (শ্রী.কী. ৭৯)। চাঁচরী মনে হয় অগ্ন্যুৎসবাদি হর্ষ ক্রীড়াবিশেষ।

চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগর গৌড়ের রাজার সঙ্গে পাশা-খেলায় অংশগ্রহণ করতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়—"রাত্রি দিন খেলে পাশা, ভক্ষণ সময় বাসা।"

মোগল আমলে অশ্বচালনা, অসিযুদ্ধ, লাঠিখেলা, অক্ষক্রীড়া, পায়রা ওড়ান, শতরঞ্জি বা দাবা খেলার চলন ছিল বলে সমসাময়িক গ্রন্থ থেকে উল্লেখ পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম "পাবড়া-খেলা" ও 'অক্ষ-ক্রীড়া' ছাড়াও মল্লক্রীড়ারও উল্লেখ করেছেন—"মল্লবিদ্যা শেখে অবিরতি।" ঘনরামও মল্লবিদ্যা বা কুস্তিযুদ্ধের উল্লেখ করেছেন। মানিক গাঙ্গুলী লোহার বাঁটুল চূর্ণ করা, উর্ধ্বে তরবারি ছুড়ে লুফে নেওয়া, বুকে বেল ভাঙ্গা প্রভৃতি ক্রীড়ার উল্লেখ করেছেন। আলাওলের 'পদ্মাবতী'তে বর্তমানের 'পোলো' খেলার মত 'চৌগা' খেলার উল্লেখ পাই। চীন দেশীয় পর্যটকগণের বিবরণে বাঘের সঙ্গে খেলার (সার্কাস?) উল্লেখ পাওযা যায়।

সে যাই হোক, বর্তমানের বায়ুপূরিত চর্মগোলক বিদেশী ফুটবলের এ দেশে তথা এ জেলায় আমদানি হয়েছে ইংরেজদের সঙ্গে সাগর পার থেকে। এ জেলায় ফুটবলের সূচনা হয়েছিল ১৮০০ সালে। কিন্তু তাব আগে জেলার গ্রামে-গঞ্জে দেশীয় খেলার চিত্রটা একবার দেখে নেওয়া যেতে পা্: ।

আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে আমরা যখন মাইনব স্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন অবশ্য খেলাধূলা নিয়ে এত মাতামাতি ছিল না। গুরুজন দর একমাত্র উপদেশ ছিল "ছাত্রানং অধ্যয়নং তপঃ।" মা মাসীরাও মন্ত্র দিতেন—লেখাপড়া করে যেই / গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সেই। তা সত্ত্বেও ছেলেদের মধ্যে যে সুপ্ত সহজাত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব থাকে তাব তাগিদেই আমরা গ্রামে প্রচলিত নানা খেলার অনুশীলন করতাম। তবে ঐ অনুশীলন মাত্রই। কোন প্রতিযোগিতার বালাই ছিল না। আর এত ক্লাবেরও বালাই ছিল না। নিজেদের দল গঠন কবে বিকালের দিকে দেশীয় নানা খেলায় মেতে ওঠতাম। এসব খেলা ছিল ধাপ্সা, হাডু-ডু-ডু, লুকোচুরি, বাঘবন্দী, ড্যাংগুলি—এই সব। আর খেলাধূলার উপযুক্ত মাঠও ছিল না। আর খেলাধূলায় উৎসাহ দেবার মত জমিদারের মত কোন ধনী পৃষ্ঠপোষকও ছিল না। তবে সমাজে আমরা যাদের অন্ত্যজ করে রেখেছি সেই সমস্ত বাগ্দী,

দুলে, ডোমদের মধ্যে ধাপ্‌সা, হা-ডু-ডু-ডু খেলা তো ছিলই, তাছাড়া তাদের মধ্যে হত কুস্তির লড়াই-এর মহড়া, আর হত লাঠি-খেলা। সেই লাঠি-খেলার কত রকম কায়দা। পূজা-পার্বণ উৎসব অনুষ্ঠানে তারা এই সব লাঠি-খেলার মহড়া দেখাতো। সাঁওতালদের মধ্যে তীরন্দাজীর অনুশীলন হত। মেলায় খেলায় তারা এই তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতো। আর আমাদের প্রবীণদের তাস, পাশা, শতরঞ্জি বা দাবাখেলার আসর বসতো বিকাল থেকে।

আমরা যখন উচ্চ বিদ্যালয়ে ঢুকলাম তখন থেকে ফুটবল, ভলিবল, টেনিকোয়েট, ব্যাডমিন্টন এই সব খেলার সঙ্গে পরিচিত হলাম। স্কুলে তখন কোন পৃথক ক্রীড়াশিক্ষক ছিলেন না। কোন শিক্ষকের ওপর ছেলেদের খেলাধূলা শেখাবার জন্য ২/১টা পিরিয়ড নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত। তারপর দেখলাম শীতকালীন স্পোর্টস। কত রকম ইভেন্ট—হাই জাম্প, লঙ্‌ জাম্প, ২২০ গজের দৌড়, ৪৪০ গজের দৌড়, আরও কত কি? সবচেয়ে মজা লাগত টাগ্‌ অব্‌ ওয়ার। পল্লীগ্রামে তখন লেখাপড়ার বিশেষ চর্চা ছিল না। কাজেই গ্রামের জনসাধারণ এই সব খেলা, স্পোর্টস 'হাঁ' করে উপভোগ করতো। তখনও স্কুল-কলেজে খেলাধূলা ছিল Extra curricula। তারপর ক্রীড়াশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে ব্রতচারী, রায়বেশে এই সবের নানা ইভেন্ট নানা ধরনের নাচ শেখাতেন। ধীরে ধীরে খেলধূলা হল Co-curricular.

বর্তমানে এইসব খেলা আছে তবে অন্য নামে, অন্য প্রক্রিয়ায়—কবাডি, খো-খো ইত্যাদি, তবে তীরন্দাজী তখনও ছিল, এখনও আছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে রাইফেল সুটিং। বর্তমানে শহরে তো বটেই অনেক পল্লীতেও ব্যায়ামাগার স্থাপিত হয়েছে। আর ক্লাব তো যত্র তত্র। যত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে ক্লাবের সংখ্যাও বাড়ছে। এবার বর্তমানে ক্রীড়াচর্চার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

আগেই বলেছি বর্ধমানে ফুটবলের সূচনা হয় ১৮০০ সাল নাগাদ। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বর্ধমান রাজ পরিবার। রাজা-রাজড়াদের অবশ্য উৎসব অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে মোগল আমলের ঐতিহ্যবাহী কুস্তি, পালোয়ানি-কসরৎ, অশ্বচালনা, শতরঞ্জ খেলার প্রচলন ছিল।

ফুটবল : ১৮৯০ সালে বর্ধমানে দুটো ক্লাবের নাম পাওয়া যায়। সান স্পোর্টিং ক্লাব-এর উদ্যোক্তা ছিলেন প্রমদা মুখোপাধ্যায়। আর একটা ছিল স্পোর্টিং ক্লাব, উদ্যোক্তা ছিলেন মন্মথ চট্টোপাধ্যায়। সান ক্লাব খেলতো বর্তমানের ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড-এর মাঠে আর স্পোর্টিং ক্লাব খেলতো টাউন হলের মাঠে। পরে দুটি ক্লাব এক হয়ে নাম হয় বার্ডোয়ান ইউনাইটেড ক্লাব।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে একটি ক্লাব গড়ে উঠেছিল—নাম হয় ডায়মণ্ড জুবিলী ক্লাব। রাজা বনবিহারী কাপুর ফুটবল খেলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বনবিহারী কাপুরের পৃষ্ঠপোষকতায় বনবিহারী এ্যাথেলেটিক ক্লাব স্থাপিত হয়। মিশনারী চার্চের সম্পাদক রেভাঃ ললিতমোহন দে, এর প্রথম সম্পাদক হন। স্যার রাসবিহারী ঘোষের তৃতীয় ভ্রাতা অতুল ঘোষ, গিরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এই ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। প্রথম দিকে ২/১টি ক্লাব এবং কিছু স্কুল ও কলেজ এই এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বনবিহারী নিজে কিন্তু তৎকালীন ইংরেজ জেলা শাসক ও জেলা জজের সঙ্গে পুলিশ লাইনে পোলো খেলতে যেতেন। রাজবংশের লালা বংশগোপাল নন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয় টাউন ক্লাব।

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেই ইংরেজদের লড়াই হয় নাই, খেলার মাঠেও সাহেবদের সঙ্গে এদেশের ক্লাবের ফুটবল খেলার লড়াই জমতো। তখন ইংরেজদের সঙ্গে খেলায় জিতলে জেলার খেলোয়াড়দের বুক গর্বে ভরে উঠতো আর হারলে একেবারে সব হতোদ্যম হয়ে পড়তো।

১৯০৭ সালে বর্তমানে যেখানে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড সেখানে বহু ব্রিটিশ মিলিটারী ক্লাবও ফুটবল খেলায় অংশ নিত। এক সময় ভারতের শ্রেষ্ঠ সেনাদল ডি.সি.এল.-এর বিরুদ্ধে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের প্রথম দিকের ক্রীড়া-শিক্ষক সুচাঁদ মুখোপাধ্যায় (ফুজো মাষ্টার) আচমকা গোল দিয়ে হৈ-চৈ ফেলেছিলেন। সেই সময় বনবিহারী লীগ ও চ্যালেঞ্জ কাপ—এই দুটি টুর্নামেন্ট চলতো। এই টুর্নামেন্টের খেলা হত বর্তমান কাম্পিং গ্রাউন্ডের ময়দানে। এই সব টুর্নামেন্টে অংশ নিত স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল স্কুল, রাজ কলেজ, রাজ স্কুল ও স্থানীয় ২/১টি এ্যাথলেটিক ক্লাব।

এই চ্যালেঞ্জ কাপের টুর্নামেন্টে কলকাতার মোহনবাগান ক্লাব ও শোভাবাজার ক্লাবও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতো। ১৯১৮ সালের পর বহু ব্রিটিশ মিলিটারীদলও এই সব টুর্নামেন্টে যোগ দিত।

১৯২৩ সালে বর্ধমানের ক্রীড়াক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। বর্ধমানে বনবিহারী জেলা একাদশের সঙ্গে কলকাতার বিখ্যাত মোহনবাগান ক্লাবের একটা প্রদর্শনী ম্যাচ হয়। এই ম্যাচটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই জন্যে যে এই ম্যাচে বনবিহারী একাদশ মোহনবাগানকে ৩-২ গোলে হারিয়ে দেয়। এই খেলায় বর্ধমানের পক্ষে খেলেন অধিনায়ক ফণিভূষণ সামন্ত, গিরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুচাঁদ মুখোপাধ্যায়, জাফর আলি, মথেরাল ইসলাম, বিনোদ রায় প্রমুখ। মথেরাল

ছিলেন গোলরক্ষক। মোহনবাগানের পক্ষে খেলেন অধিনায়ক গোষ্ঠ পাল, এল. ঘোষ, উমাপতি কুমার, বি. মুখার্জী প্রমুখ। এই খেলার আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা মোহনবাগানের বলাই চট্টোপাধ্যায় এমনভাবে বর্ধমান একাদশের জ্যোতিপ্রকাশকে আঘাত করে যে তাকে চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজে পাঠাতে হয়। আর বর্ধমানরাজ জ্যোতিপ্রকাশের চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। এর দ্বারা বর্ধমানে ক্রীড়াচর্চায় বর্ধমান মহারাজাদের প্রশংসনীয় ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। যাই হোক, মোহনবাগানের বিরুদ্ধে এই জয়ের ফলে বর্ধমানে ফুটবলারদের মধ্যে এক উত্তেজনা ও উৎসাহের জোয়ার আসে।

পরের বছর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মোহনবাগান বর্ধমানে খেলতে এসে গতবারের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য মরিয়া হয়ে বর্ধমান একাদশকে আক্রমণ করে; তাতেও অবশ্য শেষ রক্ষা হয় নাই, কোনমতে ১–১ গোলে ড্র করে মুখরক্ষা করে। এবাবে বর্ধমানের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন বিনোদগোপাল রায়। বর্ধমানের মহারাজা সব সময় এই সব খেলার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন ও খেলায় উৎসাহ দিতেন। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে একমাত্র গোলটি দেবার পুরস্কারস্বরূপ মহারাজ বিজয়চাঁদ তাঁকে রাজ স্কুলের ক্রীড়াশিক্ষক নিযুক্ত করেন। জাফর আলি ও রাসবিহারী পরে মোহনবাগান দলে যোগ দেন আর ফণীভূষণ সামন্ত যোগ দেন জোড়াবাগান স্পোর্টিং ক্লাবে ও ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আই.এফ. শিল্ডে ও ট্রেডার্স কাপে অংশগ্রহণ করেন।

১৯২৭ সালে বনবিহাবী চ্যালেঞ্জ কাপের যে টুর্নামেন্ট হয় তাতে কলকাতার ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব অংশগ্রহণ করে ও বয়েজ এ্যাথলেটিক ক্লাবের সঙ্গে খেলায় বয়েজ এ্যাথলেটিককে এক বিতর্কিত গোলে হারিয়ে দেন। এই সব খেলাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজ উপস্থিত থাকতেন ও খেলায় উৎসাহ দিতেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টুয়ার্ট নিজের বাংলোর কাছে একটা ফুটবল খেলার মাঠ তৈরী করেছিলেন।

১৯৩৪ সালে রায়গড় রাজার দলের সঙ্গে কলকাতার ইষ্টবেঙ্গল দলের একটা প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় রায়গড়রাজ তাঁদের দলের পক্ষে খেলবার জন্য বর্ধমান থেকে ফণীভূষণ সামন্ত, সুচাঁদ মুখার্জী, প্রণবকুমার সরকার (টোগো), জাফর আলি প্রভৃতি কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। খেলাটি শেষেব দিকে মারামারিতে ভণ্ডুল হয়ে যায়। খেলার মাঠে মারামারি করে খেলা ভণ্ডুল করার Tradition আজও চলে আসছে।

১৯৩৫ সালে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে জি.সি.এল.আই নামে এক মিলিটারি দলের সঙ্গে বর্ধমান একাদশের খেলা হয়। এই খেলায় মিলিটারি দলের গায়ের জোরের

কাছে বিশেষত পায়ে বুট পরে খেলার লড়াই-এ বর্ধমান একাদশ ৯–১ গোলে একেবারে পর্য্যুদস্ত হয়। উল্লেখযোগ্য, সেই সময় একমাত্র ফণীভূষণ সামন্ত ছাড়া বর্ধমানের কোন খেলোয়াড় বুট পরে খেলতেন না।

এই সময় কাটোয়ার এক ধনী ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা কাটোয়ার টাউন ক্লাবের সঙ্গে এক টুর্নামেন্টে বর্ধমান বয়েজ ক্লাব কাটোয়ার টাউন ক্লাবকে পরাজিত করে, কিন্তু দ্বিতীয় দফার খেলায় বর্ধমান বয়েজ ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের কাছে পরাজিত হয়।

জেলায় এই সময় অনেক স্কুলে ও কলেজে ফুটবল খেলার ওপর জোর দেওয়া হয়। অনেক স্কুলে ক্রীড়াশিক্ষকও নিযুক্ত হন। বর্ধমান রাজ কলেজের ক্রীড়াশিক্ষক ছিলেন বিনোদ রায় (দুলো মাষ্টার)। তিনি বর্ধমানরাজের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ছিলেন সুধাংশু ভট্টাচার্য ও পরে শ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আর টাউন স্কুলে ছিলেন সুচাঁদ মুখোপাধ্যায়। এঁদের পরিচালনায় স্কুল-কলেজে ছাত্রদের মধ্যে খেলাধূলার একটা জোয়ার আসে। মিউনিসিপ্যাল স্কুলে শ্রীরঞ্জনবাবু বেশী দিন ছিলেন না। তিনি সরকারী ক্রীড়া বিভাগে চাকরী পেয়ে স্কুল ছেড়ে দেন। তারপর তারাকুমার মিশ্র, মথুরা রায়, যাদবোত্তম সামন্ত এঁদের পরিচালনায় বিদ্যালয়ের ছেলেরা খেলাধূলায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। টাউন স্কুলে তো সুচাঁদবাবু একাই একশো।

পূর্বে টিম ভাগ হত উচ্চতার মাপকাঠিতে A.B.C চ্যাম্পিয়ানশিপে 'এ' টিমই ছিল সিনিয়র। আবার A B C টিমকে নানারকম হাউসে ভাগ করা হত রেড্ হাউস, গ্রীন হাউস, ইয়েলো হাউস ইত্যাদি। স্কুলে স্কুলে টিমে টিমে টুর্নামেন্ট হত। বেশীর ভাগ খেলা হত টাউন স্কুল মাঠে কারণ এত বড় মাঠ কারো ছিল না। মেডিকেল স্কুল গ্রাউণ্ডও বেশ বড় মাঠ, সেখানেও টুর্নামেন্টের খেলা হত, এখনও হয়। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত যে বিভিন্ন আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতা হয় তাতে শহরের স্কুলের মধ্যে টাউন স্কুল, মিউনিসিপ্যাল স্কুল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

১৩৭৭ সালের 'দেশ' পত্রিকার বিনোদন সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধূলা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এসময় যুক্ত ছিল বিয়াল্লিশটি কলেজ, আর এই সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলিত ছাত্রসংখ্যা ৬৫ থেকে ৭০ হাজারের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ফুটবল বা অন্য কোন খেলার টুর্নামেন্টে ২৮টির বেশী কলেজ অংশগ্রহণ করতো না। কলেজের নিজস্ব মাঠ থাকলেও সেগুলি বড় বড় টুর্নামেন্টের উপযোগী ছিল না;

এর জন্যে মাঠের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়কে জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের ওপর নির্ভর করতে হত। বর্ধমান রাজ কলেজের মাঠটি অবশ্য ভালো। কলেজের খেলাধূলার মানও ভালো। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টুর্নামেন্টে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনালে, বাস্কেটবলে সেমি-ফাইনালে যেতে পেরেছিল। অবশ্য আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধূলাব যে মান ছিল আজকে তার থেকে অনেক উন্নত পর্যায়ে উঠেছে; এর কৃতিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরই; তারাই আন্দোলনের পর আন্দোলন করে খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে এতদূর পৌঁছে দিয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অসুবিধা যে নাই তা নয়। দূর-দূরান্তের কলেজ থেকে খেলোয়াড় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দল গঠন করা, তাদের নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা করা, তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা একটা কঠিন কাজ। ফুটবলে একজন পার্ট টাইম কোচ নিযুক্ত হয়েছে। সত্তরের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধূলার দায়িত্ব একজন অধ্যাপক প্রফুল্ল গড়াই-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। পরে অবশ্য একজন Full time sports officer নিযুক্ত হয়েছেন। যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়ার মান উন্নত করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে ১৯৭৬-৮৬ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় তিনবার সর্বভারতীয় চ্যাম্পিযন হয় ও কয়েকবারই রানার্স আপ হয়েছে। এর কৃতিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল প্রশিক্ষক ও সহকারী স্পোর্টস অফিসার রথীন ভট্টাচার্যের। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৫ তে জুনিয়ার বিভাগে রাজ্য জয়ী হয় ও ১৯৮৮-তে সাবজুনিয়ার বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়; ১৯৮৫-তে সিনিয়র গ্রুপে রানার্স আপ হয়।

১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দেবাশিস কোনার সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে World University Tournament-এ ঢাকার বিরুদ্ধে খেলেছে।

১৯৭৩ সালে প্রকাশিত উদয় অভিযান পত্রিকায় খেলাধূলা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় এসোসিয়েশনের তালিকাভুক্ত এ গ্রুপে খেলতো ১১টি ক্লাব, বি গ্রুপেও খেলতো ১১টি ক্লাব। ২০০০ সালের সূচনায় দেখা যায় জেলা ভলিবল ও বাস্কেটবল এ্যাসোশিয়েশন অনুমোদিত ফুটবল বিভাগে ৪২টি দল এ্যাসোশিয়শন আয়োজিত টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে (সারণী-১)।

এছাড়া বহু ক্লাব ও স্কুল আসানসোল সাব-ডিভিশন, দুর্গাপুর সাব-ডিভিসন এ্যাসোসিয়েশন, চিত্তরঞ্জন সেন্ট্রাল স্পোর্টস এসোসিয়েশন, রেফারিজ এসোসিয়েশন আসানসোল এবং বর্ধমান ভলিবল ও বাস্কেটবল এ্যাসোসিয়েশনের তালিকাভুক্ত হয়।

কালনাও খেলাধুলার দিক দিয়ে পিছিয়ে নাই। কালনার অঘোরনাথ পার্ক (বর্তমানে স্টেডিয়াম) ছিল এখানকার ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার প্রধান মাঠ। এখানে দু'টি শিল্ডের খেলা হত। বেণীমাধব সাহা স্মৃতি শিল্ড ও চণ্ডীচরণ শিল্ড—এই দুই শিল্ডের খেলায় কলকাতার টালিগঞ্জ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, ব্যারাকপুরের সেনাদল খেলতে আসতো। ১৯৩৬-এ সমস্ত নাম করা দলকে হারিয়ে কালনার ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ন দল শিল্ড জয় করে।

এ ছাড়া 'সেভেন স্টার' নামে একটি দল ছিল, এই দলও বহু প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখায়। এখানকার খেলোয়াড় মৃত্যুঞ্জয় সিংহরায় বর্ধমানের বনবিহারী একাদশের পক্ষে আই.এফ.এ শিল্ডে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলে গোল করেন। এখানকার ফুটবল দল হিসেবে ইয়ং ব্লাড, ইলেভেন ফ্রেন্ডস্, দীপালি সঙ্ঘ, পিনাকী মেমোরিয়েল, কালনা স্পোর্টিং ক্লাব অনেক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

১৯২৩ সালে যখন বর্ধমান বনবিহারী একাদশের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলা হয় তখন মোহনবাগানের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন কালনার চা-গ্রামের উমাপতি কুমার। ছোট বহরকুলির বলাই চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণদেবপুরের বিদেশ বসুও ফুটবলে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। পূর্বস্থলী থানার ন-পাড়ার সৌরীন্দ্র কুমার গুপ্ত প্রথমে মোহনবাগান ও পরে আই.এফ.এ.-এর সভাপতি হয়েছিলেন। উমাপতিবাবুও মোহনবাগান ক্লাবের একবার সভাপতি হন।

স্বাধীনতার পর থেকে ফুটবল খেলা গ্রামে-গঞ্জে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পিপলন গ্রামে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ইছুব ভাকরা, পূর্বস্থলী ও অঙ্গারসন গ্রামের তরুণ সঙ্ঘ, কালিবামনী স্পোর্টিং ক্লাব, বৈদ্যপুর ও রামনগরে অনেক ফুটবল ক্লাব গড়ে উঠেছিল। শুধু কালনা নয়—এ চিত্র জেলার প্রায় সমস্ত বর্ধিষ্ণু গ্রামের।

ক্রিকেট : মঙ্গলকাব্যে কালকেতুর যে "লইআ পাবড়া চেলা / জার সনে করে খেলা / তার হয় জীবন সংশয়"—খেলার বর্ণনা আছে। তার মধ্যে অনেকে ক্রিকেটের ব্যাটের সূত্র খুঁজে পান। ক্রিকেটের জন্ম ইংলণ্ডে। ইংরেজরা যখন যেখানে গেছেন সেখানেই ধর্ম এবং খেলাধূলার প্রচার ও প্রসারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সেই হিসেবে ইংরেজদের সঙ্গে এদেশে তথা এ জেলাতেও আমদানী হয়েছে ক্রিকেট। এই সূত্রে ভারতে ক্রিকেটের জন্ম ভারতের কাম্বে উপকূলে। প্রথম প্রথম এ জেলায় ক্রিকেটের মান উল্লেখ করার মত কিছুই ছিল না। তবে সম্প্রতি ক্রিকেটের বাজার রমরমা। প্রথম প্রথম টাউন স্কুল মাঠেই খেলা হত। যাদবোত্তম সামন্ত, অমিয় সামন্ত ক্রিকেট খেলায় পারদর্শিতা দেখান। বিশ্ববিদ্যালয়

স্তরে বর্ধমান সারা বাংলায় একবার চ্যাম্পিয়ন ও একবার রানার্স হয়। ১৯৮৪-৮৫ সালে জেলা জুনিয়র গ্রুপে ও ১৯৮৮-৮৯ সালে সিনিয়র গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়। ক্রমে সিনিয়র গ্রুপে বর্ধমান এ্যাথেলেটিকস্, আর.এ.ইউ.সি, বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, কল্যাণ স্মৃতি সঙ্ঘ, শিবাজী সঙ্ঘ, আজাদ স্পোর্টিং, ইছলাবাদ ক্লাব, মিলনী, রতন স্মৃতি সঙ্ঘ, যাদব স্মৃতি সঙ্ঘ, শ্যামবাজার ইয়ং ক্লাব, ও ট্রান্স দামোদর এ.সি, সেহরাবাজার ক্রিকেট খেলায় কিছুটা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে ও সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ১৬টি ক্লাব ক্রিকেট-এ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। তবে আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে, কালনা ও কাটোয়াতে অনেক ক্লাব নিজেদের মধ্যে আন্তঃক্লাব ও আন্তঃস্কুল-কলেজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। রনদ্রি ঘোষ, সুভাষ সামন্ত, মথুরা ঘোষ, পশুপতি চ্যাটার্জী, রাজগুরু, অমল ভট্টাচার্য, সত্যেন কর, অলোক লাহিড়ী, অমিত ঘোষ ক্রিকেট খেলায় সুনাম অর্জন করেছেন। যদিও বর্তমানে প্রায় সারা বছরই ক্রিকেট খেলার রমরমা কিন্তু এ জেলায় সাধারণত শীতকালেই যা খেলার অনুশীলন বা প্রতিযোগিতা হয়। একটা জিনিসের সবচেয়ে বর্ধমানে বড় অভাব—ইনডোর প্র্যাকটিস্-এর জায়গা আর বাঁধানো কংক্রিটের পিচও নাই। একথা স্বীকার করতেই হবে বর্তমানে ছেলেরা যেমন ক্রিকেটের হুজুগে মেতে পড়াশোনা বাদ দিয়ে টি.ভি.র পর্দায় ক্রিকেট খেলায় আত্মনিমগ্ন হয়ে থাকে বা রাস্তায়-মাঠে যেখানে পায় তিনটে কাঠ পুঁতে ক্রিকেট খেলায় মাতে, তাদের খেলার মানের উন্নয়নের দিকে তত কিন্তু মনোযোগ নাই। পড়াশোনাটাই শুধু মার-খাচ্ছে।

হকি : হকিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ২/১ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। টাউন স্কুল মাঠে, মিউনিসিপ্যাল স্কুল মাঠে হকি খেলা হত। বাইরের ক্লাব সাধারণত পুলিশ লাইনে খেলতো। দুর্গাপুর, আসানসোল শিল্পাঞ্চলে এখনও হকির কিছুটা চর্চা আছে তবে সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে জেলায় হকির জনপ্রিয়তা ক্রমশই কমে আসছে। বর্ধমানে হকি লীগে উদয় সংঘ, মিলনী, যাদব স্মৃতি সঙ্ঘ, রাজ কলেজ অংশগ্রহণ করে। বিপিনবিহারী মিত্র জেলার হকির সম্পাদক ও একজন কৃতি খেলোয়াড়। অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যে অপরেশ মিত্র, শক্তি গাঙ্গুলী, সনৎ ব্যানার্জী, সজল ব্যানার্জী জেলায় হকি খেলায় অংশ নিতেন। ১৯৭৩ সালে বর্ধমান হকি আন্তঃজেলা হকি প্রতিযোগিতায় রানার্স-এর সম্মান লাভ করে।

ভলিবল : বর্ধমানে ভলিবলের বয়স খুব বেশী নয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ভলিবল বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। বিষ্ণুপদ

তেওয়ারী, ভূতনাথ চন্দ্র—এঁদের প্রশিক্ষণে ভলিবল খেলা দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। ১৯৫২ সালে বিষ্ণুপদ তেওয়ারী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে রাশিয়া সফর করে আসেন। ৫০-এর দশকে ভূতনাথ চন্দ্র জেলার দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। ১৯৬০ সালে দার্জিলিং-এ যে আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতা হয় তাতে বর্ধমান চ্যাম্পিয়নত্বের গৌরব অর্জন করে। মাঝে কয়েক বছর জেলার ভলিতে ভাটা পড়লেও সত্তর দশক থেকে ভলির জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। প্রতি বছরই আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতায় হয় চ্যাম্পিয়ন না হয় রানার্স হয়। আশির দশকেও ১৯৮৮ তে চ্যাম্পিয়ন এবং ১৯৮৯ তে রানার্স হয়।

বর্ধমান ভলিবল ও বাস্কেটবল এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সুভাষ সামন্ত, মানস রায়, আবদুর রশিদ-এর উদ্যোগে কালনা রোডের ধারে ধোপাপুকুর বুঝিয়ে অরবিন্দ স্টেডিয়াম তৈরী হয়েছে। স্টেডিয়াম তৈরীর ব্যাপারে তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য, জেলাশাসক মিহির মৈত্রের অবদান অনস্বীকার্য। ভলিবল প্রশিক্ষণে বরুণ পাল, বিষ্ণুপদ তেওয়ারী, ভূতনাথ চন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যে টি.পি. গোপালন, জর্জ, নবকুমার ঘোষ, সেলিম জাফর, স্বপন ঘোষ বেশ নাম করেছেন।

বাস্কেটবল : পঞ্চাশের দশকে রাধানগর দ্বিজপ্রসাদ মেমোরিয়াল ক্লাব বাস্কেটবল খেলার সূচনা করে। আবদুর রশিদ ও মিহির মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ধারাবাহিক অনুশীলনের ব্যবস্থাও হয়েছিল। সত্তরের দশকে বর্ধমান টাউন স্কুলে বাঁধানো কংক্রিটের কোর্টে বেশ কয়েক বছর রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা হয়েছিল। বর্তমানে তো ভলিবল-বাস্কেটবল এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অরবিন্দ স্টেডিয়ামে ধারাবাহিক অনুশীলনের ব্যবস্থা হয়েছে। বাস্কেটবলে মিলন সঙ্ঘ, সি.এম.এস স্কুল, রাজ স্কুল, টাউন স্কুল, মিউনিসিপ্যাল স্কুল, রাজ কলেজ, কল্যাণ স্মৃতি সঙ্ঘ, বেশ নাম করেছে। সি.এম.এস. স্কুল প্রাঙ্গণেও নিয়মিত অনুশীলন হয়। বাস্কেট বলে মেয়েরাও পিছিয়ে নাই। মেয়েদের মধ্যে অনুশ্রী পাল, মালা ঘোষ এবং ছেলেদের মধ্যে সমরেন্দ্র কুণ্ডু, মহম্মদ ইকবাল, নাজেশ আফরোজ, আশীষ বটব্যাল বেশ নাম করেছিল। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হয় চাকরী পেয়ে অন্যত্র চলে গেছে কেউ বা ব্যবসায়তে জড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া আসানসোল, দুর্গাপুর, কালনা, কাটোয়া স্পোর্টস এসোসিয়েশন-এর তত্ত্বাবধানে ভলিবল ও বাস্কেটবলের রীতিমত অনুশীলন চলছে।

টেবিল টেনিস : ১৯৭০ সালে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে গড়ে উঠেছে জেলা টেবিল টেনিস সংস্থা। এর পর থেকে আশির দশকের প্রথমাবধি আসানসোল,

দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, বার্ণপুর, কুলটি, চিত্তরঞ্জন, রূপনারায়ণপুর, বরাকর-এ এই খেলা দ্রুত প্রসার লাভ করে। বর্ধমানেও বিচ্ছিন্নভাবে ও অসংগঠিত উপায়ে এই খেলা চলছে। তবে বিশেষ প্রতিযোগিতা হয় না। এই খেলাকে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেবার জন্যে এ পর্যন্ত কোন উদ্যোগও নেওয়া হয় নাই। দুর্গাপুর-শিল্পনগরীতে মাঝে মধ্যে যা প্রতিযোগিতা হত। বর্ধমানেও ১৯৭২ সাল থেকে দলগত ভাবে কয়েক বছর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন সে সময় শ্যামল চৌধুরী ও সুশান্ত চৌধুরী। কেউ কেউ রাজ্যদলে স্থান লাভ করে। নির্মাল্য ঘোষের প্রশিক্ষণের দক্ষতায় টেবিল টেনিসে গৌতম দুবে, শতাব্দী বর্মণ, প্রদীপ সামন্ত, দেবাশিস চৌধুরী বেশ নাম করেছিল।

এ্যাথলেটিকস : এ্যাথলেটিকস-এ বর্ধমানের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র দুর্গাকুমার চৌধুরী পোলভল্টে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন। দুর্গা চৌধুরী পরে টাউন স্কুলে ভর্তি হয়; আমোদবিহারী বসুও স্পোর্টস-এ সকল বিভাগে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন তিনি ১৯৩০ সালে সারা বাংলায় সিকি মাইল (৪৪০ গজ) দৌড় প্রতিযোগিতায় দৌড়বীর রূপে সম্মানিত হয়েছিলেন। দুর্গা চৌধুরী পোলভল্টে অতি সহজেই ত্রিশ ফুট লাফাতে পারতেন। লঙ্ জাম্পে তাঁর রেকর্ড ২২ ফুট। পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্পোর্টস অফিসার হন। অন্যান্য এ্যাথলিটদের মধ্যে জাফর আলি লঙ্ জ্যাম্পে, ফণী সামন্ত ৪৪০ গজ দৌড়ে, আনন্দ মুখার্জী, পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় ২২০ গজ দৌড়ে, আমোদ বসু ৪৪০ গজ দৌড়ে কৃতিত্ব অর্জন করেন। দুর্গা চৌধুরী এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে বেস্ট এ্যাথলিটের সম্মান পান। আসানসোলের মীনা দশ হাজার মিটার দৌড়ে সর্বভারতীয় রেকর্ড করেন।

পূর্বে মিউনিসিপ্যাল স্কুলের একটা জিমনেসিয়াম গড়ার চেষ্টা হয়েছিল। রাজ কলেজে ভাল জিমনেসিয়াম ছিল। রাজবাড়ীর কাছে শূলিপুকুর পাড়ে, ও ইছলাবাদ ক্লাবেও জিমনেসিয়াম, কুস্তি, বক্সিং, ভারোত্তোলন, বারের ব্যায়াম-এর ব্যবস্থা আছে। তবে আজকাল মফস্বল শহরে তো বটেই, অনেক গ্রামেও জিমনেসিয়াম গড়ে উঠছে ও সেখানে রীতিমত ব্যায়ামের অনুশীলন চলে।

ব্যাডমিন্টন : দুর্গাপুর আসানসোল শিল্পাঞ্চলে কতকগুলি যথেষ্ট ভালো কমিউনিটি স্টেশনে ইনডোর হল থাকার জন্য ব্যাডমিন্টনের মত ইনডোর খেলার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা আছে। বর্ধমানে আফতাব ক্লাবের একটি অংশে হলঘরকে ব্যাডমিন্টনের ইনডোর হলে পরিণত করে বর্ধমান জেলা ক্রীড়া সংস্থা ছোট ছোট

ছেলেমেয়েদের ব্যাডমিন্টনের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করেছে। দুর্গাপুরের তানসেন ক্লাবের উদ্যোগে নিয়মিত ব্যাডমিন্টনের অনুশীলন চলে। বর্ধমানের নিজস্ব ব্যাডমিন্টন দলে বেশ কিছু নামী খেলোয়াড় আছেন। অবশ্য সর্বভারতীয় স্তরে জেলার কৃতিত্ব হতাশাব্যঞ্জক।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুবসমাজের প্রতিভার প্রস্ফুরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে বর্ধমান নেহরু যুবকেন্দ্রেরও অবদান কম নয়। ১৯৭৪ সালেই পশ্চিম বাংলায় ৫টি যুবকেন্দ্র খোলা হয়। বর্ধমানে তেলমারুই রোডে জেলার প্রধান নেহরু যুবকেন্দ্র অবস্থিত। এই কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যুবশক্তির প্রতিভাকে সঠিক পথে পরিচালনার উদ্দেশ্যে পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো। ১৯৮০ সাল থেকে শুরু করে সরকারী উদ্যোগে এ জেলাতেই গ্রামাঞ্চলে ৮৩টি খেলার মাঠের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। বর্ধমানে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে একটি স্টেডিয়াম তৈরী হয়েছে, ঝিঙ্গুটি ও তালিতগড়ের মধ্যবর্তী মাঠে একটি স্টেডিয়ামের নির্মাণ সমাপ্তির পথে। এছাড়া প্রতিটি মহকুমা শহরেও স্টেডিয়াম হয়েছে বা হবার উদ্যোগ চলছে। ভাতছালার রানীর মাঠে একটি বিরাট স্টেডিয়াম আছে।

খেলাধূলার প্রতি যুবসমাজের স্বাভাবিক সহজাত প্রবণতাকে উদ্দীপিত করবার জন্য ১৯৮১ সাল থেকে প্রতি গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন খেলাধূলায় প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগের ফলে ৯০-এর দশকেই প্রায় ১৫০০০ গ্রামীণ এলাকার যুবক-যুবতী খেলাধূলার প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছে। এ ছাড়া প্রতি বছর ব্লকভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির থেকে বাছাই করা প্রতিভাবান খেলোয়াড় নিয়ে নিবিড় আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবির জেলাস্তরে চালানো হচ্ছে। প্রতি বছরই প্রশিক্ষণ শিবিরে ফুটবল, ভলিবল, জিমন্যাস্টিকের সাজসরঞ্জাম নিয়মিত ভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। এমন কি প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অঞ্চল, ব্লক, মহকুমা ও জেলাস্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। যে সমস্ত খেলোয়াড় খেলাধূলার কোন না কোন ক্ষেত্রে মহকুমা, জেলা বা রাজ্যস্তরে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে, উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে এমন কি চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। সরকার থেকে এই সব ব্যবস্থার ফলে জেলায় ক্রীড়াচর্চার ক্ষেত্রে একটা উদ্দীপনার জোয়ার এসে গেছে।

ফুটবল, ক্রিকেট এইসব বিদেশী খেলা ছাড়া দেশীয় খেলাধূলার পুনরুজ্জীবন ঘটানো হচ্ছে। জেলাস্তরে কবাডি, খো-খো, তীরন্দাজ খেলার আয়োজন করা হচ্ছে। তীরন্দাজী তো এখন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে আপন স্থান করে নিয়েছে।

কবাডি খেলায় কালনার নিভুজি বাজার, ইসুব ভাকরা, সুলতানপুর বিটরা, মদন হাঁসা ক্লাব থেকে নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয় ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।

এই কবাডি খেলা আগেকার হা-ডু-ডু-ডু খেলার নবতম সংস্করণ। কবাডি এসেছে হিন্দী কবড্ডী থেকে। খেলাটি আগের মতই দু দুলের মধ্যে হয়। এক দলের একটি বালক ডি.ডি. ডিগ্ ডিগ্ চু-এইরূপ শব্দ করতে করতে দম ধরে বিপক্ষের একজনকে ছুঁয়ে দম থাকতে থাকতে স্বস্থানে ফিরে এলে সে যাকে ছুঁয়ে এসেছে সে "মোর" হয়ে গেল অর্থাৎ খেলার অযোগ্য হয়ে গেল। এইভাবে যে পক্ষের সব খেলোয়াড়ই 'মরে' সেই পক্ষেরই হার হয়।

জেলাস্তরের খেলাধূলার জগতে বিভিন্ন সংগঠন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন যুব ও ছাত্র সংগঠন, পৌর প্রতিষ্ঠান, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা দপ্তরের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির যৌথ উদ্যোগে যে ভাবে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণের উন্নতি সাধনের জন্য হাত মিলিয়েছেন—এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে জেলার ক্রীড়াক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ আরও সুন্দর, উজ্জ্বল ও অর্থবহ হয়ে উঠবে এবং উদীয়মান ক্রীড়াবিদ্‌রা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারবে।

সারণী-১

বর্ধমান জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন এর অনুমোদনপ্রাপ্ত বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশগ্রহণকারী ক্লাবের তালিকা

(বি.ডি.এস.এ-এর পক্ষে সুভাষ সামন্ত মহাশয়ের সৌজন্যে)

(ক) ফুটবল :

১. নির্ভীক সঙ্ঘ
২. জি. ওয়াই. এস. এস.
৩. পুরাতন চক এস.সি.
৪. রাজগঞ্জ এ.সি.
৫. কল্পতরু ক্লাব
৬. ডব্লিউ. বি. এ. সি
৭. কিশোর সঙ্ঘ
৮. লাকুরডি যুব সঙ্ঘ
৯. লাকুরডি তরুণ সঙ্ঘ
২২. ইছলাবাদ এ্যাথলেটিক ক্লাব
২৩. এ্যাপোলো এ্যাথলেটিক ক্লাব
২৪. রসিকপুর স্পোর্টিং ক্লাব
২৫. শ্রীসঙ্ঘ
২৬. গোলাহাট প্রগতি সঙ্ঘ
২৭. বিধানপল্লী এ্যাথলেটিক ক্লাব
২৮. চৌরঙ্গী ক্লাব
২৯. ছোটনীলপুর তরুণ সঙ্ঘ
৩০. রসিকপুর ইউনাইটেড ক্লাব

১০. বিবেকানন্দ সঙ্ঘ
১১. জাতীয় সঙ্ঘ
১২. রতন স্মৃতি সঙ্ঘ
১৩. আরাধনা সঙ্ঘ
১৪. আর. বি. ইউ. সি.
১৫. বাম এ্যাপোলো সঙ্ঘ
১৬. উদয় সঙ্ঘ
১৭. শিবাজী সঙ্ঘ
১৮. সুভাষ এ্যাথলেটিক ক্লাব
১৯. মৌসুমী এ্যাথলেটিক ক্লাব
২০. অসীম মেমোরিয়াল
২১. তেজগঞ্জ ক্রীড়াচক্র
৩১. আর. এ. ইউ. সি.
৩২. সেন্টার অব্ ইয়ং সোসাইটি
৩৩. নীতু স্মৃতি সঙ্ঘ
৩৪. জাগরণী সঙ্ঘ
৩৫. গলসী উদয়ন সঙ্ঘ
৩৬. বেগুট মিলন সঙ্ঘ
৩৭. কল্যাণ স্মৃতি সঙ্ঘ
৩৮. ভাতছালা ইউনাইটেড ক্লাব
৩৯. তরুণ স্পোর্টিং ক্লাব
৪০. বি. এল. ওয়াই. এস
৪১. আমবাগান অগ্রণী সঙ্ঘ
৪২. দাতা মেহবুব স্মৃতি সঙ্ঘ।

(খ) ক্রিকেট :

১. কল্পতরু ক্লাব
২. আদিত্য স্মৃতি সঙ্ঘ
৩. বোরহাট তরুণ সঙ্ঘ
৪. বিবেকানন্দ সঙ্ঘ
৫. বাম এ্যাপোলো সঙ্ঘ
৬. উদয় সঙ্ঘ
৭. শিবাজী সঙ্ঘ
৮. মিলনী
৯. নেতাজী সঙ্ঘ (পি)
১০. ন্যাশান্যাল স্পোর্টিং ক্লাব
১১. সুব্রত স্মৃতি সঙ্ঘ (এস)
১২. রসিকপুর ইউনাইটেড ক্লাব
১৩. কল্যাণ স্মৃতি সঙ্ঘ
১৪. দিলীপ স্মৃতি সঙ্ঘ
১৫. মিঠাপুকুর এ্যাথলেটিক ক্লাব
১৬. বি. পি. সি. সি.।

(গ) এ্যাথলেটিকস্ :

১. রাজগঞ্জ এ. সি.
২. বোরহাট তরুণ সঙ্ঘ
৩. জাতীয় সঙ্ঘ
৪. ইছলাবাদ এ্যাথলেটিক ক্লাব
৫. মৌসুমী এ্যাথলেটিক ক্লাব
৬. শ্রী সঙ্ঘ
৭. ন্যাশন্যাল স্পোর্টিং ক্লাব
৮. বিধান পল্লী এ্যাথলেটিক ক্লাব
৯. আর. এ. ইউ. সি
১০. গলসী উদয় সঙ্ঘ
১১. কল্যাণ স্মৃতি সঙ্ঘ
১২. গুসকরা জোনাল স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশন
১৩. বি. পি. সি. সি.।

সমস্ত খেলার জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত :

১. আসানসোল সাব-ডিভিশন্যাল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন
২. দুর্গাপুর সাব-ডিভিশন্যাল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন
৩. কাটোয়া সাব-ডিভিশন্যাল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন
৫. কালনা সাব-ডিভিশন্যাল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন।

বর্ধমান জেলা ভলিবল ও বাস্কেটবল এ্যাসোসিয়েশন-এর ভলিবল ও বাস্কেটবল খেলার জন্য অনুমোদপ্রাপ্ত ক্লাবের তালিকা।

ভলিবল :

১. অগ্রদূত সঙ্ঘ
২. জাতীয় সঙ্ঘ
৩. রাইপুর নবীন সঙ্ঘ
৪. রতন স্মৃতি সঙ্ঘ
৫. সি.এম.এস (এম) রিক্রিয়েশন ক্লাব
৬. নবোদয় সঙ্ঘ
৭. নতুনপাড়া যুবক সঙ্ঘ
৮. মেমারি বয়েজ প্লেয়িং ক্লাব
৯. দেশবন্ধু তরুণ সঙ্ঘ
১০. South বর্ধমান এ্যাথলেটিক ক্লাব
১১. কল্পতরু ক্লাব
১২. তরুণ সঙ্ঘ
১৩. আমবাগান অগ্রণী সঙ্ঘ
১৪. চৌরঙ্গী ক্লাব
১৫. অনাদি মালখানি স্মৃতি সঙ্ঘ
১৬. ইছলাবাদ এ্যাথলেটিক ক্লাব
১৭. বি.এল.ওয়াই.এস
১৮. বি.পি.সি.সি
১৯. মৌসুমী এ্যাথলেটিক ক্লাব
২০. ভাতছালা পিওনপাড়া এ্যাথলেটিক ক্লাব

বাস্কেট বল :

১. কল্যাণ স্মৃতি সঙ্ঘ
২. সি. এম. এস. স্পোর্টস ক্লাব
৩. অগ্রদূত
৪. মিলন সঙ্ঘ
৫. তরুণ দল
৬. আমরা সবাই
৭. আর. এ. ইউ. সি

ভলিবল ও বাস্কেটবল

১. আসানসোল সাব-ডিভিসন্যাল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন
২. দুর্গাপুর সাব-ডিভিসন্যাল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন
৩. কাটোয়া সাব-ডিভিসন্যাল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন
৪. কালনা সাব-ডিভিসন্যাল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন

ছত্রিশ অধ্যায়



জেলার অর্থনৈতিক চিত্র

পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার বর্ধমান জেলা—জেলার অর্থনৈতিক ভিত্তি হল কৃষি। ঊনবিংশ শতকের সূচনা থেকে রানীগঞ্জে কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ার পব এবং বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক থেকে দামোদর পরিকল্পনা কার্যকবী হওয়ায় জেলার পশ্চিমাংশে খনি ও শিল্পাঞ্চলের প্রাধান্য সূচিত হলেও, কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে জেলা শীর্ষস্থান দখল করে। কৃষি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এসে পড়ে বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন, উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদনের সমস্যা, ভূমিসংস্কার, সেচব্যবস্থা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও কৃষকদের অবস্থা।

কৃষির পরেই আসে ভারী শিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য ও জেলার অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক বিশেষ করে সমবায় ব্যাঙ্কের ভূমিকা। এ সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনার পূর্বে আধুনিক যুগের সূচনায় জেলার অর্থনৈতিক চিত্রটা একবার পর্যালোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে।

বিদেশী লুট :

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ঋণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে শাসন করার সংকল্প করে মীরকাশিম মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলাসহ সমগ্র বর্ধমান জেলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার কোম্পানীকে দান করেন। ফলে ১৭৬০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সমগ্র জেলা ব্রিটিশ শাসনের আওতায় আসে। জনস্টনের রিপোর্ট থেকে এই সময়ে এই হস্তান্তরিত জমি ও বর্ধমান জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমি সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

The territory thus alienated and ascertained by Mr. Johnstone after an arduons scrutiny by 70 persons for eight months in 1763-64 A.D is 568736 begas making near a fifth part of the

arable productive ground in the Zamindary. এসময়ে জেলার অর্থনৈতিক চিত্র ছিল খুব সঙ্কটপূর্ণ। একটি সরকারী প্রতিবেদন থেকে জানা যায়: The early days of British rule in Burdwan was trouble ones. The Burdwan Raja was against the transfer of Govt. and against the British authorities but Major White completely defeated him on 29 Dec. 1760.

এই সময়ে জমিদারীর রাজস্ব ছিল According to Grant's analysis the revenue of Zamindari when ceded to British Govt. into, amounted in all to Sikka Rs. 3175391 after allowing a deduction of Sikka Rs. 51543 on account of collection charges (Burdwan Gazettee 1910).

১৭৬০ সালের এপ্রিল জুন পর্যন্ত শিউভাটের নেতৃত্বে তেলেঙ্গানা সৈন্যদল জেলার দক্ষিণ অঞ্চল আক্রমণ করে। জমিদারীর অধীনস্থ মণ্ডলঘাট, মানকর, চিতুয়া, ভুরশুট, বালিগড়ী, চৌমহা ও জাহানাবাদ পরগনায় লুঠতরাজ চালিয়ে প্রায় ২/৩ লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করে। এর আগে ত্রিলোকচাঁদের (১৭৪৪-৭০) জমিদারীর সময়ে বর্গী হাঙ্গামায় বর্ধমান শ্মশানে পরিণত হয়। গ্রামের পর গ্রাম হয় ভস্মীভূত, খাদ্যবস্তু লুণ্ঠিত ও গ্রাম হয় জনশূন্য। রাজকোষের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে ত্রিলোকচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর পারলৌকিক কার্যের জন্য তাঁর উত্তরাধিকারীকে কোম্পানীর কাছে ঋণের প্রার্থনা জানাতে হয়। এর ওপর কোম্পানীর কর্ণধার ওয়ারেন হেস্টিংসকে বিরাট অঙ্কের উৎকোচ দিতে হয়। ত্রিলোকচাঁদের আমলে কোম্পানী বর্ধমানরাজের উপর চুপীর ব্রজকিশোরকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এই ব্যাপারে বর্ধমানের রেসিডেন্ট জন গ্রাহাম ও তাঁর পরবর্তী রেসিডেন্ট-এর প্রত্যেককে ২ লক্ষ টাকা করে উৎকোচ দিতে হয়। হেস্টিংসকে দিতে হয় ১,৫০,০০০ টাকা। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী কাউন্সিলের আদেশে দেওয়ান ব্রজকিশোরকে বরখাস্ত করে মহারানী বিষণকুমারীকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই কাজের জন্য কাউন্সিলের সদস্যগণ ২ লক্ষ টাকা উৎকোচ নেন—এর সিংহভাগ হেস্টিংসকে দিতে হয়।

বর্ধমান-মহারাজার এস্টেটের অবস্থা তখন এত খারাপ যে মহারানী বিষণ-কুমারী এস্টেটের দেয় রাজস্ব ৬ লক্ষ টাকা উসুল দিতে পারেন নাই। হেস্টিংসের চক্রান্তে নবকৃষ্ণ মুন্সী সাঁজোয়াল পদে নিযুক্ত হন। মহারাজা তেজচন্দ্রকে এসময় নবকৃষ্ণের কাছে শতকরা ১২ টাকা হার সুদে ৯ লক্ষ টাকা ঋণ করতে হয়। নবকৃষ্ণ এই সময় শতকরা ৫ টাকা হারে ৩ লক্ষ টাকা ওয়ারেন হেস্টিংসকে ঋণ দেন। হেস্টিংস ঐ টাকা আর কোন দিন শোধ দেন নাই।

বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট জেমস বেলফোর ওগ্‌লবি পরাণচাঁদের কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা উৎকোচ নিয়ে জাল প্রতাপচাঁদ সংক্রান্ত মামলাটি বর্ধমানের পরিবর্তে হুগলী কোর্টে স্থানান্তরিত করেন। এছাড়া রেসিডেন্ট ও রাজকর্মচারীগণ যাঁরা বর্ধমান জমিদারীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, সকলেই অবৈধভাবে প্রচুর টাকা উপার্জন করেন। এই সমস্ত টাকা রাজকোষ থেকে যায়। এই সব অসৎ কর্মচারীর মধ্যে রেসিডেন্ট জনস্টন ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, গ্রাহাম ২ লক্ষ টাকা, চালর্স ষ্টুয়ার্ট ২ লক্ষ টাকা, হেস্টিংস এর কলকাতা কাউন্সিলের সদস্যগণ ২ লক্ষ টাকা লাভ করেন এবং অবৈধভাবে নিযুক্ত দেওযান ব্রজকিশোর প্রায় ১১ লক্ষ টাকা তহবিল তছরূপ করেছিলেন। এই অর্থের সিংহভাগ হেস্টিংস ও গ্রাহামের পকেটে যায়। আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের কাছে Burdwan had the reputation of being a lucrative station for any company servant with its revenue (P.J. Marshal—East Indian Fortunes).

কোম্পানী যখন দেওয়ানী লাভ করে তখন কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি হয় শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যে ব্যয় হবে সেই টাকা বাদ দিয়ে বাকী টাকা কোম্পানী ইচ্ছামত খরচ করতে পারবে। কোম্পানীর কর্মচারীগণ এই বাকী টাকা দিয়ে বিনা মূলধনে ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিয়োগ করেন ও এদেশ থেকে জিনিসপত্র কিনে বিলেতে চালান দিতে থাকেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিলাতেই থেকে যায়। এদেশ থেকে রপ্তানী দ্রব্যজাত যে পরিমাণ টাকা বিদেশে যেত তার বিনিময়ে কোন দ্রব্য বা টাকা এদেশে ফিরে আসতো না। এই ভাবে দেওয়ানি লাভের পর তিন বৎসরে (১৭৬৬-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) মোট ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের জিনিস বিলেতে রপ্তানি হয়েছিল আর তার পরিবর্তে মাত্র ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার জিনিস আমদানি হয় অর্থাৎ ৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বিলেতে থেকে যায়। এই বিপুল অর্থের সিংহভাগ ছিল বর্ধমানরাজের দেয় রাজস্ব ও ঘুষের টাকা। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের পার্লামেন্টে যে হিসাব দাখিল করা হয় তাতে দেখা যায় বাংলার মোট রাজস্ব (যার সিংহভাগ বর্ধমানরাজের দেয়) তের কোটি টাকার মধ্যে এদেশে খরচ হয়েছে ৯ কোটি, বাকী চার কোটি বিলেতে থেকে যায়। এইভাবে বিদেশী লুটের ফলে জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এদেশে ইংরেজ সরকারের স্বার্থ ছিল—যাতে এদেশে নতুন প্রণালীর কারখানা শিল্প গড়ে না ওঠে, আর বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্যের দ্বারা এদেশের অর্থশোষণ অব্যাহত থাকে। ইংরেজ কোম্পানী ও কর্মচারীদের এদেশের জনসাধারণের উন্নতি সাধনের কোন লক্ষ্যই ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশের লোকের স্বাধীন চেষ্টা যাতে সফল না হতে পারে।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে বাংলার শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে "সোমপ্রকাশ" পত্রিকার মন্তব্য থেকে এর একটা চিত্র পাওয়া যাবে।

"বর্দ্ধমান বিভাগে কালনায় লাল বাগানে যে সকল ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা এখনও উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিলাতের বস্ত্রের আমদানিতে ইহারও ক্রমশ অবনতি হইতেছে। বর্ধমান জেলায় ৯টা পাটের কল ও ৩টা কাপড়ের কল আছে। এই সকল কলে চট ও বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। গত বৎসরে পাটের কলে ৭,১৪,৭৫৭ মণ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

বর্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর অঞ্চলে অধিকাংশ ধাতুপাত প্রস্তুত হয়, তাহাও বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৮৮২-৮৩ অব্দে বর্দ্ধমান জেলা হইতে আট লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকার কাঁসা বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল।....বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে কাঞ্চননগর শিল্পের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। তথায় ছুরি কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্র সকল অতি উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। রানীগঞ্জ ও বর্দ্ধমানের কাটরা বিভাগে কুম্ভকারের কার্য্যের কিছু কিছু উন্নতি আছে। বর্দ্ধমানের মধ্যে রঘুনাথচক নামক স্থানে পোর্ট সিমেন্ট প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা প্রস্তুত হইতেছে। ইহার কার্য্য অদ্যাপি আরম্ভ হয় নাই। বালির কাগজের কার্য উত্তমরূপে চলিতেছে।"

সোমপ্রকাশের মতবাদ থেকে জানা যায় বর্ধমানে ৩টি কাপড়ের কল ছিল। কাজেই এ জেলায় তুলো চাষ যে যথেষ্ট পরিমাণে হত সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। ৩টি কাপড়ের কল ছাড়াও গ্রামে কুটির শিল্পে তাঁতবস্ত্রও উৎপাদিত হত। জেলায় যে তুলা উৎপাদিত হত, সেটা জেলাতেই বস্ত্রশিল্পে লেগে যেত। কাজেই তুলোর রপ্তানী বাজার সে রকম গড়ে ওঠে নাই। তারপর কোম্পানী যখন থেকে বিলাতী কাপড় আমদানী করতে আরম্ভ করল, তখন থেকে তার সঙ্গে জেলার তাঁতশিল্প ও বস্ত্রশিল্প প্রতিযোগিতায় টিকতে পারল না। তুলোর উৎপাদনও বন্ধ হয়ে গেল। একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় ১৮৬০ সালে বর্ধমানে ১০ হাজার মণ তুলো উৎপন্ন হত। ১৮৮০ সালে তা কমে ৫ হাজার মণে দাঁড়াল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন থেকে প্রচুর পরিমাণে বিলাতী কাপড় আমদানী হতে লাগল তখন এই চাষ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

এর আগেও উল্লেখ করেছি বর্ধমান ও কালনায় নীলচাষ হত। বর্ধমানে এ চাষের সূচনা হয়েছিল বর্তমানের নীলপুরে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নীল সূচনা করেন জন চীপ। দিন দিন এই চাষ ব্যাপক ভাবে হতে থাকে, বড় নীলপুর, ছোট নীলপুর, বর্তমানের কালীবাজার এলাকায় ও জি.টি. রোডের ধারে যেখানে

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল রয়েছে সেখানে। মিউনিসিপ্যাল স্কুলেব মাঠে নীলকর সাহেবদের কুঠী ছিল। সে সময নীলচাষ দুরকম পদ্ধতিতে হত : নিজ চাষ ও রায়তী চাষ বা দাদনী চাষ। কিন্তু বর্ধমানে নিজ চাষ পদ্ধতিতেই চাষ হত। কাজেই মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, কৃষ্ণনগর, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা, দিনাজপুর প্রভৃতি জিলাতে রায়তদের ওপর নীলকর সাহেবদের যেমন অত্যাচার হয়েছিল, বর্ধমানে সেরকম অত্যাচাবেব কথা জানা যায় না। এখানে নীলকর সাহেবরা জমি ইজাবা নিয়ে সাঁওতাল 'কুলি' দিয়ে নিজেরা চাষ করাতেন। বর্ধমান-রাজের কাছ থেকে জমি ইজারা নিতে সেলামী দিতে হত ঠিকই খাজনাও দিতে হত কিন্তু তা সত্ত্বেও কুলিদিগকে ইচ্ছামত খাটিয়ে সাহেবরা ভালই লাভ করতো। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ডিগো কমিশনে যারা সব সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কালনার নীলকর মিঃ সয়ার্সও ছিলেন। মি সয়ার্স-এর বিবৃতি থেকে জানা যায় কালনায় তখন ১৭ হাজার বিঘায় নীলচাষ হত। এক মণ নীল উৎপাদন করতে পারলে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে নীট লাভ হত ৫০ টাকা। ২০ বিঘা জমিতে ১ মণ নীল উৎপন্ন হত। কাজেই ১৭০০০ বিঘা চাষেব ফলে নীল পাওয়া যেত ৮৫০ থেকে ৯০০ মণ; কাজেই এই ১৭০০০ বিঘায় নীলচাষ করে বছরে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে নীট লাভ হত ৮৫০ x ৫০ টাকা বা ৪২৫০০ টাকা। কাজেই এখানকার নীলকরেরা অন্য জেলার নীলকবদের মত দাদনী চাষের পথ ধরে না গিয়ে 'নিজ-এলাকা' চাষেই প্রচুব লাভ পেত।

বর্ধমান কালনা ছাড়া মানকর রানীগঞ্জ বুদবুদেও নীলচাষ হত। Peterson-এর 1910 সালের বর্ধমান গেজেট থেকে জানা যায়—"At Nilpur, a suburb on Burdwan Town, mosquito curtains of cotton thread are made by the Muhammadan weavers, which are imported in some quantity to Calcutta. Indigo was formerly manufactured on a considerable scale in Kalna and Burdwan and so late as 1877 the area under cultivation was estimated at 16000 acres. Most of the Burdwan factories were under native management and as they failed to secure uniformity in the colour of their indigo, the price obtained for the dye in Calcutta was usually only between Rs 100 and Rs 200/- a maund even in the best days of the industry. It has now practically died out entirely."

Peterson-এর তথ্য ও মি. সযার্স-এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় গঙ্গার ধারে কালনায় উৎপাদন ভালই হত ও নীলকর সাহেবরা নিজ-এলাকা হিসাবে চাষ করতো। বর্ধমান ও বুদবুদের উৎপাদন বিঘা প্রতি কম হতো ও

বর্ধমান ও বুদবুদ-এর কিছু কিছু এলাকায় দেশীয় লোকের পরিচালনায় চাষ হত। এই নীলের গুণগত মান কালনার নীলের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। যাই হোক, ইতিমধ্যে ইউরোপে রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীলচাষ শুরু হয় ফলে বাংলাদেশের নীলের চাহিদা কমতে থাকে। ১৮৬২ সালের পর কালনা, কাটোয়া ও বর্ধমানে মশাবাহিত Burdwan fever মহামারীরূপে দেখা দেয়। নীলকর সাহেবরাও আক্রান্ত হতে থাকে। ফলে তাঁরা এ জেলা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যায়। তবে দিনাজপুর, রাজশাহী, যশোহর প্রতি অঞ্চলে রায়তী বা দাদনী চাষের আধিক্য থাকায় সেখানে চাষীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় ও এ সব অঞ্চলে ব্যাপকভাবে নীলবিদ্রোহ দেখা দেয় কিন্তু বর্ধমান জেলায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 'নিজএলাকা চাষা' পদ্ধতিতে নীলচাষ হওয়ায় এখানে নীলবিদ্রোহের প্রভাব বিশেষ পড়ে নাই।

জেলা থেকে বিদেশী লুট ছাড়াও জেলার তৎকালের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য বর্গী হাঙ্গামাও অনেকখানি দায়ী। শিউভাটের নেতৃত্বে তেলেঙ্গানা বাহিনীর লুণ্ঠনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তার আগে ভাস্কর পণ্ডিতের আক্রমণের ফলে জেলার পূর্বাঞ্চল একরূপ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। এর পরে বর্ধমানের বুকে নামে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ১৭৬৮ সালে দারুণ খরা ও অনাবৃষ্টি, ১৭৬৯ সালে ৯ মাস অনাবৃষ্টির পর বন্যা ও ১৭৭০ সালের আশ্বিন মাসে দামোদর, অজয় ও ভাগীরথীতে প্রবল বন্যা। ফলে জেলায় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কবলে পড়ে। ১৭৫১ থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত বাঙালীর প্রধান খাদ্য চালের দাম যে ভাবে বাড়তে থাকে তার একটা তুলনামূলক চিত্র থেকে জেলায় সমকালীন চাষবাস ও সাধারণ লোকের দুরবস্থার একটা চিত্র পাওয়া যাবে।

সাধারণের ব্যবহারোপযোগী চাউলের দাম টাকা প্রতি

১৭৫১	১৭৫২	১৭৬৮	১৭৬৯	১৭৭০	১৭৮২
৫৭ সের	২২ সের	১২০ সের	৩০ সের	৩ সের	১০৯ সের

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়, বাংলা ১১৮৭ সালে (১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ) একটি দুর্গাপূজার হিসাব থেকে সে সময়ের চাউলসহ অন্যান্য জিনিষপত্রের দামের চিত্র পাওয়া যায়।

	টাকা	আনা		টাকা	আনা
প্রতিমা	৫	-	সন্দেশ	৭	-
পুরোহিতের দক্ষিণা	৮	-	তরকারি	২	-
ভাল চাউল (১৭ মণ)	৬	৪	তৈল $১^{১}/২$	২	-
ময়দা (৪ মণ)	২	২	ফুল ফুলারি	১	-
ক্ষীর	৫	-	মশলাদি চূর্ণ	১	$২^{১}/২$
গুড়	৬	-	কাপড়	৮	-
দধি	৫	-	উত্তম আতপ চাউল	২	৪
চিনি	-	৮	কলাই	-	৮
কাষ্ঠ	২	-	নারিকেল	২	-
			লবণ		৮
			পানসুপারী	-	৮
			চন্দন ধূপ	-	$৬^{১}/২$
			নাপিত	-	৮
			বাদ্যকর	৩	-
			বেহারা	১	-
			অন্যান্য	-	৮
			মোট ব্যয়	৮০ টা. ৩ আনা	

(তথ্যসূত্র ঃ যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী)

১৭ মণ চালের দাম ৬ টাকা ৪ আনা হলে এক টাকায় চাউল পাওয়া যাচ্ছে ২ মণ ২৮ সেরের কিছু বেশী। আর ১৭ মণ চালে লোক খাবে কমপক্ষে ২৫০০, কাজেই ২৫০০ লোকেবও খাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও পূজার যাবতীয় খরচা ৮০ টাকা শুনলে একালের ছেলেরা এটাকে নেহাৎ আজগুবি গল্প বলেই মনে করবে।

জেলার কৃষি : জেলার কৃষি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে জেলার ভূমিরূপ সম্পর্কে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে (প্রথম ভাগ) বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যায় জেলার পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের ভূমিরূপের পার্থক্যের ফলে উভয় অঞ্চলের উৎপাদনের প্রকৃতি ও অর্থনৈতিক বিকাশে পার্থক্য ঘটেছে। ভূ-পৃষ্ঠের গঠন অনুযায়ী জেলাকে প্রধানত তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়।

১. জেলার পশ্চিম প্রান্তে মানভূম, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগনার অনুচ্চ পাহাড় ও বিন্ধ্য পর্বত থেকে শিলা ক্রমশ অবক্ষয়িত হতে হতে গলসী পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে এসেছে।

২. অন্ডালের খনি অঞ্চল থেকে আউসগ্রামের জঙ্গলমহল পর্যন্ত লালবর্ণ রুক্ষ ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অঞ্চল।

৩. পূর্বাঞ্চলের ভাগীরথী, অজয়, খড়োশ্বরী, দামোদর, দ্বারকেশ্বর বিধৌত বিরাট সমভূমি। এই বিরাট সমভূমি জেলার তিন পঞ্চমাংশ জুড়ে বিস্তৃত। এর ফলে পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বিরাট বনভূমি অঞ্চল; পরে অষ্টাদশ শতকে রানীগঞ্জে কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এই অরণ্যভূমি নির্মূল হতে থাকে ও স্বাধীনতার পর দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার রূপায়ণ হওয়ার ফলে এই অংশে আসানসোল-কুলটী-বার্ণপুর-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে। তবে রাজবাঁধের পর থেকে আউসগ্রাম-গলসী পর্যন্ত মধ্যাঞ্চলে দামোদর-অজয়ের পলি পরে ক্রমে ক্রমে এই অঞ্চল কৃষির যোগ্য হয়ে ওঠে। ফলে পূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল হয়ে ওঠে কৃষিপ্রধান।

এই কৃষিপ্রধান অঞ্চলের প্রধান শস্য ধান, আলু, আখ, তুলা। পূর্বাঞ্চলে ধান ও আলুর প্রাধান্য, মধ্যাঞ্চলে ধান ও আখের প্রাধান্য। তুলাচাষ বর্তমানে উঠে গেছে। মধ্য অঞ্চলের লাল লাটেরাইট মাটির মধ্যে hydrated Sesquioxide of iron ও phosphorus থাকার জন্য এই মাটি ইক্ষুচাষের খুবই উপযোগী। তা সত্ত্বেও এই অঞ্চল থেকে ইক্ষুর চাষ ক্রমশ উঠে যাচ্ছে। কারণ ইক্ষুচাষের জন্য জমিকে সারাবছর জোড়া রাখতে হয় অথচ সে পরিমাণে লাভ হয় না। আর সেই জমিতে ইক্ষুচাষ না করে ২/৩ বার ধান, ও রবিখন্দের চাষ করলে প্রচুর লাভ।

Peterson-এর দেওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনায়—

আমন ধান ও ইক্ষুচাষের জমির পরিমাণ ছিল ৯০০৬০০ একর, যার মধ্যে ৮৭৪৮০০ একর ধানের ও ২৫৮০০ একর ইক্ষুচাষের জন্য ব্যবহৃত হত। ১৮১৭০০ একর জমিতে আউশ ও অন্যান্য ভাদুই ফসলের চাষ হত। আর ১৫৬৬০০ একর জমিতে বোরো ও অন্যান্য রবিশস্যের চাষ হত; নিম্নলিখিত তালিকা থেকে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

Name of Crop	Normal aere age	P.C on the net cropped area	Name of the crop	Aere age	P.C on cropped area
Winter rice (Aman)	874800	81	Summer rice (Boro)	300	–
Sugarcane	25800	2	Wheat	1800	–
			Barley	7000	1/2
Total Aghani crops (a)	900600	83	Gram	9100	1
Autumn Rice	140000	13	other Rabi cereals and pulse	51200	5
Maize	3000	1/2	Other rabi food crops	40,000	4
Other 'Bhadoi' cereals and pulses	6700	2/3	Linseed	22500	
other 'Bhadoi' Food crops	2200	1/5	Rape and mustard	21100	2
other 'Bhadoi' non-food crops	10,000	1	other oilseeds	1500	–
			Til (rabi)	500	–
Jute	16500	1.5			
Til (Bhadoi)	3300		Tobacco	400	–
Total Bhadoi crops (b)	1,81,700	17	Total rabi non food crops (c)	156600	14 1/2
			orchard + Garden produce (d)	5000	1/2
Total of (a) (b) (c) (d)				1243900	105
Deduct area cropped more than once				162200	5
Net area (normal) cropped				1081700	100

এর থেকে দেখা যাচ্ছে মোট ১০৮১৭০০ একর জমি ছিল কৃষিযোগ্য চাষ (আমন), আউশ ও বোরো হতো ১০,১৫,১০০ একর জমিতে। বিঘা প্রতি ৫ মণ করে ফসল ধরলে ধানের মোট উৎপাদন হতে হয় ১৬২২৬৫০০ মণ; জেলার লোকসংখ্যা তখন ছিল ১৫৩২৪৭৫, মাথাপিছু বছরে খোরাক উৎপাদন হতো

১০.৫৮ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ১০ মণ। সেদিক দিয়ে বিচার করলে জেলা খাদ্যের দিক দিয়ে স্বনির্ভর ছিল বলা যায়। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। তখন সেচের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। ইডেন ক্যানেল ছিল কাঞ্চননগর থেকে জামালপুর পর্যন্ত, আর মাঠের পুকুর থেকে দুনির সাহায্যে সেচ হতো। তাও এসব পুকুরে সব সময় জল থাকতো না। আর খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা তো লেগেই থাকতো। কাজেই লোকের অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী।

এসময় চাষের পদ্ধতিও মোটেই উন্নত ছিল না। চিরাচরিত লাঙ্গল আর বলদ দিয়ে কোন মতে চাষ উদ্ধার করা হত। সারের মধ্যে ছিল গোবর, উনানের ঘুঁটের ছাই আর যাদের সঙ্গতি থাকতো তারা পুকুরের পাঁক ও হাড়গুঁড়ো ব্যবহার করতো। রাসায়নিক সারের সেটা যুগ ছিল না।

প্রধান যে ফসল 'ধান', সেটা একবারই হতো আর যে জমিতে আউশ দেওয়া হতো, আউশ উঠে গেলে সেই জমিতে আলু বা ছোলা, যব, গম বা অন্য রবিখন্দের চাষ হত। বোরো ধান খুব কম জমিতেই হতো, হতো না বললেই হয়।

১৯২৭–২৮ সালের সেটেলমেন্ট রেকর্ড থেকে জানা যায় জেলায় কর্ষণযোগ্য পতিত জমি ছিল ২৬৫৯১৩ একর ও অকর্ষণযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ৩০১৯৯৫ একর। ১৯৪৪–৪৫ সালের ঈশাক রিপোর্ট-এ দেখা যায় কর্ষণযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ১৮৮৪৩৫ একর ও অ-কর্ষণযোগ্য জমি ৩১৪৪২ একর। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ১৭ বছরের মধ্যে ৭৭৪৭৮ একর জমিকে চাষের আওতায় আনা হয়েছে। এই সময় চাষের জমি কিন্তু সাময়িকভাবে পতিত (current fallow) জমির পরিমাণ ছিল ৬১১১৬ একর।

১৯৩০, ১৯৪০ ও ১৯৬০ সালে বিভিন্ন মহকুমায় প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণের একটা তুলনামূলক হিসাব বিবেচনা করলে দেখা যায় জমির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ক) ১৯৩০ সাল

(একরে)

মহকুমা	ধান	আলু	ইক্ষু	পাট	ডালকলাই
বর্ধমান সদর	৪১৭৯৮৫	৬৫৯৪	৩৯২২	৪৯৪	১০৪৯৭
কালনা	১৫৫৫৮৮	২১৬১	৩২৯	১৮২৬	১৫৫৪৭
কাটোয়া	১৮১৮৬৪	২২৬৪	৯১৮	২৫	১৬৯৯৫
আসানসোল	১৭০১০৭	—	১৪৪৭	১০০	১০৪৩৮

(খ) ১৯৪০ সাল

মহকুমা	ধান	আলু	ইক্ষু	পাট	ডালকলাই
বর্ধমান সদর	৫১০৮৩৫	৯৩৪৫	২৮৭৭	২০৬৫	১৭২৭৬
কালনা	১৫৯০৫০	২৯২৯	৯৯৮	৩১৯১	১৫৩১৮
কাটোয়া	১৭০৬৫৩	২০৫৫	২৯২৯	৮৩১	১৩২৩৬
আসানসোল	১৮২১৮০	৬২১	২৫৯৮	১০৪	৯৯৫০

(গ) ১৯৬০ সাল

মহকুমা	ধান	আলু	ইক্ষু	পাট	ডালকলাই
বর্ধমান সদর	৫৭৩৪৭০	৯৯৩০	৩৯২০	২৯৭০	২৫৫১০
কালনা	১৭২২৯০	১৪০০	৯৯০	৮৩৬০	১৮২৬০
কাটোয়া	১৯৮৮৭০	৩২৮০	২৪৮০	৩৮৬০	১১৭০০
আসানসোল	১৮৬৮৭০	৫৯০	২১৮০	১০	১০৭১০

প্রধান শস্য সমূহের আবাদি জমির অনুপাত

ধান	৮৯ শতাংশ
আলু	০২ শতাংশ
ইক্ষু	০১ শতাংশ
পাট	০২ শতাংশ
অন্যান্য	০৬ শতাংশ

গড় উৎপাদন প্রতি একরে

মহকুমা	ধান ক্যানেল এলাকা	ক্যানেল এলাকার বাইরে	ইক্ষুজাত গুঁড়	আলু
সদর	২৮ মণ ২০ সের	১৬ মণ ৩০ সের	৭০ মণ	১০৪ মণ
কাটোয়া	২২ মণ ১৫ সের	১৫ মণ ৩২ সের	৮৫ মণ	১৫০ মণ
কালনা	৩০ মণ ১৫ সের	২২ মণ ২০ সের	৭০ মণ	১৪০ মণ
আসানসোল	—	১৬–২০ সের	৬০ মন	৬৫ মণ

প্রধান প্রধান শস্যের চাষের খরচ

১৯৩০ সালের মন্দার বাজার ও ১৯৬০ সালের তুলনামূলক হিসাব

আমন ধান (প্রতি একরে খরচ)

বিভিন্ন খাত	১৯৩০	১৯৬০
বীজ ধানের মূল্য	১·১২ টাকা	৩·৭৫ টাকা
সার	৩·৭৫ টাকা	১৫ টাকা
বীজ ক্ষেত তৈরী লাঙ্গল দেওয়া ইত্যাদি	৯ টাকা	১৮ টাকা
বীজক্ষেত থেকে চারা এনে রোয়া	৩·৩৭ টাকা	১৫ টাকা
জমি নিড়ান	১·৮৭ টাকা	১০ টাকা
সেচন ৩ বার	৩.৩৭ টাকা	১৮ টাকা
ধান কাটা খামারে আনা ও ঝাড়াই	৬.৩৭ টাকা	২৪ টাকা
মোট :	২৮.৮৭ টাকা	১০৩·৭৫ টাকা

১৯৯৯ সালের একরে আমন চাষের খরচ দাঁড়ায় ৫৩৪৫ টাকা

প্রতি একরে :

আলু উৎপাদনের হিসাব (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে)

১। জমি তৈয়ারী (অক্টোবরে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া প্রায় ১৫ বার) প্রতিবারে ২টি মুনিষ ১.৭৫ হিঃ	৫২.৫০ টাকা
২। জমিতে গোবর সার ১২ গাড়ী	২৪ টাকা
৩। কয়েকবার লাঙ্গল দেওয়ার পর আবার গোবর সার	২৪ টাকা
৪। বীজ লাগাবার আগে খইল সার ১২ মণ ১০ টাকা হিসাবে	১২০ টাকা
৫। ১৫ মন রাসায়নিক সার ১১.৫০ টাকা হিঃ	১৭২.৫০ টাকা
৬। ১০ মন বীজ ২৫ টাকা হিঃ	২৫০ টাকা
৭। মুনিস (৩০) ১.৭৫ টাকা হিঃ	৫২.৫০ টাকা
৮। চারা বের হবার পর রেড়ির খইল বা অন্য সার	৫৫ টাকা
৯। সেচ (মুনিস ৩০) ২ টাকা হিঃ	৬০ টাকা
১০। আলু তোলা ও খামারে আনার ব্যয়	৫০ টাকা
	মোট— ৮৬০.৫০ টাকা

১৯৯৯ সালে এক একরে আমন ধান চাষের খরচ
(এক একরে ফলন—১৬ কুইন্টাল) নিজ সমাক্ষ

১.	বীজধান ২৫ কেজি	১২৫.০০
২.	বীজতলা তৈরি (লাঙল ও মুনিষ)	২০০.০০
৩.	সার ও ওষুধ	২৫০.০০
৪.	চাষের জমি তৈরি (১০টি লাঙল ও মুনিষ)	১০০০.০০
৫.	গোবর সার ও রাসায়নিক সার	৩৭৫.০০
৬.	চারা রোয়া (১৫ লেবার, ৭০৲ হিসাবে)	১০৫০.০০
৭.	নিড়ান (৭ লেবাব × ৫০৲)	৩৫০.০০
৮.	ওষুধ ও মুনিষ	৩৭৫.০০
৯.	ধানকাটা ও আটি বাঁধা	১২০০.০০
১০.	মাঠ থেকে আনা ও ঝাড়াই	৪২০.০০
		৫৩৪৫.০০

প্রতি একরে ইক্ষু চাষে ব্যয় (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে)

১. ফাল্গুন-চৈত্র মাসে জমি তৈরী লাঙ্গল ১৫.১ ॥ হিসাবে	২২.৫০ টাকা
২. জল সেচ মুনিস ৯–১ ॥ হিসাবে (১.৫০ হিঃ)	১৩.৫০ টাকা
৩. ৬ কাহন চারার মূল্য ১০ টাকা হিসাবে	৬০ টাকা
৪. রোয়া— *চারা তৈরী, সারি দিয়ে বসান, জলসেচ,* মুনিষ ৩৬–১ ॥ হিসাবে	৫৪ টাকা
৫. চারিপাশে বেড়া দেওয়া	৪০ টাকা
৬. *বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে চারার ২ পাশে নালা কাটা* মাঝে চারার গোড়ায় মাটি দেওয়া ১·৭৫ হিসাবে ৬০ টি মুনিস	১০৫ টাকা
৭. পুনরায় জলসেচ মুনিস ২৭–২, হিসাবে	৫৪ টাকা
৮. সার, ১৮ মন খইল ১০ টা হিঃ	১৮০ টাকা
১৫ মুনিস ১·৭৫ টা হিসাবে	২৬.২৫ টাকা

৯. আষাঢ়-শ্রাবণে পাতা ভাঙ্গা	
মুনিস ৪৮–২·০০টা হিসাবে	৯৬ টাকা
জোর বাঁধা মুনিস ২৪, ২টা হিসাবে	৪৮টাকা
১০. জলসেচন পৌষ থেকে ফাল্গুন	
মুনিস ১৫–২·০০ হিসাবে	৩০টাকা
১১. আখ কাটা বাড়ীতে আনা, মাড়াই, গুড় তৈয়ারী	
মুনিষ ৭২; ১॥ হিসাবে	১০৮ টাকা
মোট :	৮৩৭.২৫ টাকা

(বর্ধমান পরিচিতি)

৪টি = ১ গণ্ডা

২০ গণ্ডা = ১ পণ

১৬ পণ = ১ কাহন

পঞ্চাশের দশক থেকে বিশেষ করে জঙ্গলমহল এলাকার জমিকে চাষের আওতায় আনা হতে থাকে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ও স্বাধীনোত্তর যুগে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য জঙ্গলের জমিকে কর্ষণযোগ্য করা হতে থাকে। ফলে জঙ্গলের এলাকা ক্রমশ কমতে থাকে। ১৯৫৮–৫৯ থেকে ১৯৬২–৬৩ পর্যন্ত জেলার জমির যে তালিকা পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে এই কয় বৎসরে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত জমির চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হাজার একরে

	১৯৫৮–৫৯	১৯৫৯–৬০	১৯৬০–৬১	১৯৬১–৬২	১৯৬২–৬৩
মোট জমির পরিমাণ	১৭৩১.৫	১৭৩১.৫	১৭৩১.৫	১৭৩১.৫	১৭৩১.৫
অরণ্য ভূমি	৩৬.৫	৪৪.৯	৪৪.৯	৪৪.৯	. ৪৪.৯
চাষ ছাড়া অন্য ভাবে ব্যবহৃত জমি	৩৪০.৫	৩৪১.১	৩৪১.৫	৩৪১.৬	৩৪৫.৫
চলতি পতিত ছাড়া অন্য আচষা জমি	১০৫.০	১০০.০	৮৮.৫	৮৯.১	৮৮.৫
সাময়িক ভাবে পতিত জমি	৮৪.২	৭৫.২	২৫.৮	২৬.৯	২৯.২

	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩
চাষের জমি (Net area sown)	১১৬৫.৩	১১৭০.৩	১২৩০.৮	১২২৯.০	১২২৩.৪
একাধিক ফসলী জমি	৭০.৩	৮৪.৩	৮৮.০	৮২.৮	৮১.০
মোট শস্য উৎপাদনের জমি (Net cropped area)	১২৩৫.৬	১২৫৪.৬	১৩১৮.৮	১৩১১.৮	১৩০৪.৪

কৃষির আওতায় আনা জমির পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ জলসেচের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচ হতো মাঠের পুকুর থেকে দুনির সাহায্যে, এছাড়া পুকুরভাঙ্গা জল, মাঠগড়ানি জল, কাঁদর-ভাসা জল থেকে মেলান প্রথাতেও সেচ হত। জেলায় একমাত্র ক্যানেল ছিল ইডেন ক্যানেল—বর্ধমানের কাঞ্চননগর থেকে জামালপুর পর্যন্ত। ১৯০৪ সালে কালেক্টরের রিপোর্ট থেকে জানা যায় এই ক্যানেল থেকে ২০,০০০ একর জমিতে জলসেচ হত, পরে বেড়ে এই পরিমাণ দাঁড়ায় বর্ধমান, জামালপুর থানা ও মেমারি ফাঁড়ির ৩৩ বর্গমাইল।

দামোদর পরিকল্পনা অনুসারে ক্যানেল কাটা শুরু হয় ১৯২৬ সনে ও ১৯৩৩ সন পর্যন্ত যতটা কাজ সম্পূর্ণ হয়, তার দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় মেন ক্যানেল ২৬ মাইল (৪০.৯০ কিমি) ও শাখা ক্যানেল ২৩৩ মাইল (৩৭৫.১০ কি.মি)। এই ক্যানেলের দ্বারা ১৮১০০ একর জমিতে জলসেচ হত। দামোদর পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে শেষ পর্যন্ত ইডেন ও দামোদর ক্যানেল থেকে ৬৭৪৩৯৭ একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হয়। এ ছাড়া ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার দ্বারা কেতুগ্রাম থানার ১৬০০০ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়।

জলসেচ বৃদ্ধি সত্ত্বেও সাধারণ কৃষকদের অবস্থার যে খুব বেশী উন্নতি হয়েছিল বলে মনে হয় না। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত All India Rural credit Survey কর্তৃক বর্ধমান জেলাসম্পর্কিত District Monograph (সমীক্ষা) থেকে জানা যায় সর্বশ্রেণীর কৃষকদের পরিবারপিছু গড় জোতের আয়তন ৪.১ একর। যে সমস্ত কৃষক পরিবারের জোতের গড় আয়তন ১৪.৮ একর, তারা Big cultivator (বড় চাষী) শ্রেণীভুক্ত, যাদের জোতের গড় আয়তন ৮.৯ একর, তারা মধ্যম বড় চাষী (Large cultivators); যাদের জোতের গড় আয়তন ২.৭ একর, তারা মধ্যবিত্ত কৃষক সম্প্রদায় ও ছোট ছোট চাষীদের জোতের আয়তন ছিল মাত্র ০.৮ একর বা ২ বিঘা থেকে আড়াই বিঘার

মধ্যে। কৃষক পরিবারের সংখ্যা ছিল জনসংখ্যার শতকরা ৭২.৬। ঋণগ্রস্ত কৃষক পরিবারের ঋণের গড় পরিমাণ ছিল ৩৬৬ টাকা, বড় চাষীদের ক্ষেত্রে এই ঋণের পরিমাণ ছিল গড়ে পরিবার পিছু ৭২০ টাকা আর ছোট চাষীদের গড়ে ২৬১ টাকা।

জেলাকে খাদ্যে স্বনির্ভর করে তোলার জন্যে ১৯৬২ সালের ১২ই আগষ্ট থেকে নিবিড় কৃষি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এছাড়া অগভীর নলকূপ এবং সেচের পুষ্করিণী ও কূপ খনন করেও ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৬৭–৭০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের দ্বারা ৩২০০০ হেক্টর বা ৮০,০০০ একর জমিতে জলসেচ হয়।

দামোদর ক্যানেল থেকে ১৯৭০–৭১ সালে খরিফ মরশুমে ও রবি মরশুমে সেচসেবিত জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬৯৭৩ ও ১৮৮৩৬.৪৭ একর।

১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণ নিম্নরূপ ছিল। (Project Executive officer, IADP Burdwan এর প্রদত্ত তথ্য)।

জমির পরিমাণ একরে

শস্যের নাম	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০
চাউল	১১০৭৩০০	১০৭৮০০০	১১৩৩৩০০	১১৬৭২০০	১১৪৭৯২০
গম	৯৫০০	১২২০০	২০,০০০	২৮,৪০০	৪১,৩৬৬
ইক্ষু	১২১০০	৬৯০০	৬৫০০	৯০০০	৯৪০০
আলু	৩৯৯০০	৩৪৬০০	৩৭১০০	৩৫০০০	৩২০০০
পাট	২৪২০০	৩১০০০	৪০৮০০	১৩৪০০	৩১৭০০
যব	৭০০	৬০০	৭০০	৭০০	৯৫০
ভুট্টা	১০০	৭০০	৭০০	৭০০	–
ছোলা	৭৬৪০০	৭৮৯০০	৫৯৮০০	৭০৩০০	৬৫৮০০
সরিষা	৫১০০	৮০০০	৪৫০০	৯৫০০	১০,৮০০
তিসি	১৫০০	১৬০০	৮০০	৯০০	–
বাগিচা ফসল ও সব্জী	৩৫১০০	৩৫৬০০	৩৭৯০০	৪০,০০০	৪২৫০০

Brochure for the State cabinet Burdwan 1972 of District officer Burdwan থেকে জানা যায়।

১৯৭১–৭২ সালে :

১. এক ফসলী জমির আয়তন	১০২৯৪৪০ একর
২. একাধিক ফসলী জমি	৪০৩৬৮০ একর
সর্বমোট ফসলী জমির মধ্যে সাময়িকভাবে পতিত জমি (current fallow)	৩৫০০০ একর

১৯৭১–৭২ সালে :

খরিফ চাষের জন্য ডি.ভি.সি থেকে সেচসেবিত জমির আয়তন	৫৪২০৫৯ একর
রবিচাষের জন্য ডি.ভি.সি থেকে সেচসেবিত জমি	৩৫১৪৯ একর
খরিফচাষের জন্য ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের দ্বারা সেচসেবিত জমি	৩৯০০০ একর
খরিফচাষের জন্য অগভীর নলকূপ দ্বারা সেচসেবিত জমি	৩৬৯৫০ একর
রবিচাষের জন্য অগভীর নলকূপের দ্বারা সেচসেবিত জমি	২৯৬৫০ একর
টিউবওয়েলের সংখ্যা	১৯৫ টি
নদী থেকে পাম্পের সাহায্যে জলসেচ প্রকল্প	১০১ টি

সম্প্রতি জেলার কৃষিবিভাগ উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাতির আমন, আউশ ও বোরো ধানের চাষের পদ্ধতির উদ্ভাবন ও সংকর জাতীয় ধান বীজ উৎপাদন করেছেন যার ফলে জেলার ধান উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে। তাছাড়া একই জমিতে দুই তিনবার চাষ করা হচ্ছে, ১৯৬৫-৬৬ সালে কম করে ২৪ রকম উচ্চ ফলনশীল ধান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে।

এই সব উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ উৎপাদনের জন্য জেলা স্তরে ২টি বীজ খামার আছে, প্রতিটির আয়তন ২০০ একর। তাছাড়া ব্লক স্তরে ১৭টি ও ১টি জাপানী পদ্ধতি চাষের খামার আছে, প্রতিটির আয়তন ২৫ একর। জেলার বীজের খামার ও তৎসংক্রান্ত তথ্য নীচে সারণীতে সংযোজিত হল।

সারণী-১

SEED FARMS IN BARDHAMAN DISTRICT WITH LOCATION AND OTHER PARTICULARS

Name of farm with location	Year of establish-ment	Area (in acres)	Cropped area (in acres)	Expenditure Rs.	Receipt Rs.
District Seed Farm, Barddhaman	1950-51	203.17	174.25	2,58,460.30	2,81.436.56
District Seed Farm, Kanksa	1957-58	205.00	127.66	1.62,480.44	1,13,387.92
Japanese Model Farm, Purbasthali-I Block	1965-66	27.14	21.66	22,369.96	12,989.75
Block Seed Farm Memari-I Block	1958-59	27.55	21.77	33,896.77	34,204.06
Block Seed Farm, Bhatar	1958-59	24.19	21.00	36,355.05	35,756.23
Block Seed Farm, Ausgram-I Block	1958-59	26.29	19.50	24,025.63	29,571.71
Block Seed Farm, Mangolkot	1958-59	25.35	19.94	28,751.50	25,496.66
Block Seed Farm, Raina-I Block	1964-65	27.79	20.00	26,950.80	27,525.32
Block Seed Farm, Jamalpur	1964-65	25.94	22.00	32,588.84	36,310.18
Block Seed Farm, Katoya-I Block	1965-66	31.64	26.66	26,733.29	26,811.20
Block Seed Farm, Memari-II Block	1966-67	28.86	22.41	41,357.36	39,558.74
Block Seed Farm, Ketugram-I Block	1966-67	24.63	20.66	27,118.68	10,931.35
Block Seed Farm, Ketugram-II Block	1966-67	27.31	24.83	26,475.69	20,411.39
Block Seed Farm, Galsi-I Block	1966-67	25.58	21.50	24,713.13	21,341.68
Block Seed Farm, Kalna-I Block	1966-67	25.80	23.88	15,504.10	15,561.42

Name of farm with location	Year of establish-ment	Area (in acres)	Cropped area (in acres)	Expenditure Rs.	Receipt Rs.
Block Seed Farm, Ausgram-II Block	1966-67	27.08	24.70	21,781.18	19,812.20
Block Seed Farm, Kanksa	1966-67	30.55	22.00	32,811 59	38,940.60
Block Seed Farm, Monteswar	1966-67	21.90	18.04	23,251 74	15,740.80
Block Seed Farm, Raina-II Block	1967-68	21.00	19 00	21,591 84	21,017.25
Block Seed Farm, Purbashali-II Block	1966-67	29.24	27.09	25,805 05	19,923.40

(বর্ধমান গেজিটিয়ার ১৯৯৪)

জেলা পরিকল্পনা কমিটি প্রকাশিত হ্যান্ডবুক ১৯৯৫-৯৬ থেকে দেখা যায় আউশ, আমন বা আলুচাষের এলাকা খুব বেশী না বাড়লেও বোরো চাষের এলাকা বিগত ১০/১২ বছর বেড়েছে প্রায় ৫ গুণ। ফসল আবৃতির (cropping intensity) হারও ক্রমশ বাড়ছে। নীচের সারণীতে ১৯৮১ থেকে ১৯৯০-৯৪ সালে কত হাজার হেক্টরে কোন শস্যের চাষ হয়েছিল এবং তাদের উৎপাদনশীলতা ও ফসল আবৃত্তি (cropping intensity) এর চিত্র পাওয়া যাবে।

সারণী ২

	মোট কত জমি চাষ হয়েছিল হাজার হেক্টরে				উৎপাদনশীলতা প্রতি হেক্টরে/কেজি				ফসল আবৃতি শতকরা হিসাব
সাল	আউস	আমন	বোরো	আলু	আউস	আমন	বোরো	আলু	–
১৯৮১-৮২	২৩.৮	৪৩৫.৩	৩৩.৯	২৬.৯	১৮২৪	১৩৪৪	২৩৭১	২০৯৯৩	–
১৯৮৬-৮৭	২৫.৪	৩৯২.৯	১০৫.৭	৩০.৬	১৮৫৪	২১৪৩	২৮৬৫	২১৭৬৮	১৪৮%
১৯৯০-৯৪	৩৩.৯	৪১৬.৯	১৫৮.৮	৩১.৯	২৫২২	২৫৩৬	৩২০৭	২৮৫৭৭	১৬৫%

পরের পাতার সারণী থেকে ১৯৮১ থেকে ৯৩ পর্যন্ত জল সম্পদ ব্যবহারের একটা চিত্র পাওয়া যাবে।

সারণী-৩

সাল	গভীর নলকূপের সংখ্যা (সরকারি)	নদী-জলোত্তলন সেচব্যবস্থা (সরকারি)	অগভীর নল-কূপ সরকারি ও বেসরকারি	বিদ্যুৎচালিত অগভীর নলকূপ
১৯৮১-৮২	৩৬২	২৩৮	১৫৮০৮	২২৯৮
১৯৮৯-৯০	৩৯৮	২৬৫	৩৭০৪৭	৩১৩০
১৯৯৩-৯৪	৫৪৩	২৬৫	—	১০১৫৮

বিভিন্ন সমীক্ষা বৎসরে কৃষি ও জলোত্তোলনে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ

১৯৭৯-৮০	১৫০০০	(হাজার কিলোওয়াট ঘন্টা)
১৯৮৮-৮৯	৪৫১৪৪	(হাজার কিলোওয়াট ঘন্টা)
১৯৯৪-৯৫	৯৮২৫৪	(হাজার কিলোওয়াট ঘন্টা)

১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭০ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় ১৯৬৬ সালে যেখানে ৪০০ ডিপোর মাধ্যমে ২৬১৭৯ টন সার বিক্রয় হয়েছিল ১৯৭০ সালে তার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ৮২৫ ডিপোর মাধ্যমে ৫০৬২৫ টনে দাঁড়িয়েছে।

তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে রাসায়নিক সার ব্যবহারের আগে মাটি পরীক্ষা করালে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কারণ এক একরকম মাটিতে এক এক-রকম সারের প্রয়োজন হয়। কোন মাটিতে Ammonium Sulphate, কোন মাটির পক্ষে Super phosphate, কোথাও Muriate of Potash ঘাটতি থাকে। সেই অনুসারে সঠিক সারপ্রয়োগে উৎপাদন অনেকগুণ বেড়ে যায়—নীচের সারণী থেকে মাটি পরীক্ষার সুফল সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যাবে। নীচের সারণীতে চাষীদের চিরাচরিত পদ্ধতিতে চাষকে A শ্রেণীভুক্ত, মাটি পরীক্ষা ছাড়া রাসায়নিক সার প্রয়োগের পদ্ধতিতে চাষকে B শ্রেণীভুক্ত ও C শ্রেণীতে মাটি পরীক্ষার পর রাসায়নিক সারপ্রয়োগে উৎপাদন দেখানো হয়েছে—

সারণী ৪

সাল	প্রতি একরে শস্যের ফলন (কুইন্টালে)			প্রতি একরে ব্যয়			ফেরৎ লাভ প্রতি একরে (টাকায়)		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
১৯৬৯	১৪·২৯	১৯·৪৪	১৯ ৬৭	৪০৬৮৭	৫৫২·৪৭	৫৫৫·৫০	৯৯৮·৮৮	১৩৪৮·৭১	১৩৯২·৮৯
১৯৭০	১৩·১৩	১৮ ৯৬	১৯ ৪৯	৪৩৯ ৬২	৫৭৫·৭১	৫৭৮ ০০	৯১৯·১০	১৩২৭·২০	১৩৯৪·৩০

(তথ্যসূত্র : পশ্চিমবঙ্গ ১৪০৩)

সারণীটি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে মাটি পরীক্ষার পর রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে সারের জন্য টাকা ৪.৭৮ অতিরিক্ত খরচ করে টাকা ৩৫.১২; অতিরিক্ত আয় আসছে অর্থাৎ ব্যয় ও লাভের অনুপাত ১: ৭.৩৪।

বর্তমানে কৃষি গবেষণাগার থেকে উদ্ভাবিত কয়েকটি উচ্চফলনশীল ধান—যেগুলি জেলায় চাষ হচ্ছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। এই সারণী থেকে প্রতিটি উচ্চফলনশীল ধানের নাম ফলনের স্থিতিকাল, বৈশিষ্ট্য ও একরে গড় ফলন সম্পর্কে একটা ধারণা হবে।

ভূমি সংস্কার : লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতের বড়লাট রূপে কার্যভার গ্রহণ করার পর এদেশে ব্রিটিশ সরকারের আস্থাভাজন এক শ্রেণীর, জমিদার-পত্তনিদার সৃষ্টি ও রাজস্ব থেকে আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সেই সংক্রান্ত আইন চালু করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সামাজিক প্রতিপত্তিও অনেক বেড়ে যায় এবং দেশে ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদার একশ্রেণীর অভিজাত সৃষ্টি হয়।

জমিদারগণ প্রজাদের কাজ থেকে ঠিকমত খাজনা আদায় করতে না পারলে সরকারের রাজস্ব যথাসময়ে জমা দিতে পারতেন না, ফলে জমিদারী নিলাম হয়ে যেত। পরে জমিদারদের আবেদনের ভিত্তিতে সরকার নতুন আইন পাশ করেন, ফলে জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে জোরজবরদস্ত করে খাজনা আদায় করতে থাকেন। প্রজাদের ওপর এই ঘোর অত্যাচার প্রশমনের জন্য কুখ্যাত সপ্তম-পঞ্চম (Regulation VII of 1799 ও Regulation V of 1812) আইন পাশ হয়। এই কুখ্যাত আইনকে হাতিয়ার করে জমিদারগণ সংবাদ প্রভাকরের ভাষায় "প্রজার বক্ষের উপর বাঁশ দিয়া টাকা সংগ্রহ করে।"

রেভারেন্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ ও ২০ জন মিশনারীর কথায় জমিদারেরা চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ঠিক প্রজাদের মতো নয়, কতকটা ক্রীতদাসের মতো। তাঁরা নিজেদের রাজা-মহারাজা মনে করেন। প্রজাদের কাছে খাজনাদি যা তাদের ন্যায্য পাওনা তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁরা নানা কৌশলে আদায় করেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে নিজেদের নানারকম কাজে প্রজাদের খাটিয়ে নেন। তা ছাড়া অত্যাচার যে কত রকমের করেন তা বলে শেষ করা যায় না (এপ্রিল ১৮৭৫)।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রজাদের উপর জমিদার ও তাঁর নিযুক্ত গোমস্তার নানা রকম অত্যাচার ও পার্বণী, মাঙ্গন, বাটা, শুল্ক, বাজে আদায় প্রভৃতি নানারকম আবওয়াব আদায়ের মর্মন্তুদ বিবরণ দিয়েছেন। বর্ধমানে

মহারাজ তেজচন্দ্র ও মাতা বিষণকুমারীর চেষ্টায় বর্ধমান রাজ এস্টেটের অধীন পত্তনি-তালুক সৃষ্টি হয় ও ঐ সব পত্তনি রাজ এস্টেটের বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার পুনরুদ্ধার করে। ফলে রাজকোষে প্রভূত ধন সঞ্চিত হয়। বিষণকুমারী, তেজচন্দ্র ও দেওয়ান পরাণচাঁদের উদ্ভাবিত Burdwan Model of Revenue Administration পদ্ধতি অন্য জমিদারগণও গ্রহণ করে লাভবান হন। কিন্তু এই পত্তনি বিলি ও এর দ্বারা খাজনা সংগ্রহ সম্পর্কে তৎকালে কোন আইন ছিল না, ফলে অনেক পত্তনীদার রাজস্ব ঠিক মত জমা দিতেন না। বর্ধমানরাজ এ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮নং আইন (Patni Taluk Regulations Reg VIII of 1819) পাশ হয়। এই আইনের দ্বারা পূর্বেকার পত্তনিদারদের অধিকার স্বীকৃত হয় এবং তাঁরা ও তাঁদের পত্তনিকে ভাগ করে দর পত্তনি, সে পত্তনি, দরাদরপত্তনি বিলির দ্বারা রাজস্ব আদায় করার অধিকার লাভ করেন।

পত্তনি আইনে রায়ত ও কৃষকদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় না, ফলে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ভূমিরাজস্ব নিষ্পত্তি আইন করে প্রজার স্বার্থরক্ষার চেষ্টা হয়।

এর পর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে Rent Act দ্বারা প্রজার স্বার্থরক্ষার পথ সুনিশ্চিত করা হয়। তা সত্ত্বে প্রজার উপর অত্যাচার ও পীড়ন এবং প্রজা-উচ্ছেদ একেবারে বন্ধ করা যায় না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়। এই আইনটি প্রজাদের ওপর জমিদারের অত্যাচার ও কারণে-অকারণে জোত জমা থেকে প্রজা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে একটি আইনী রক্ষাকবচ।

এই আইনের বিভিন্ন ধারা মোতাবেক সমস্ত জমির ম্যাপ, জোতজমার খাজনা, প্রজার নামস্বত্ব রেকর্ড (খতিয়ান) করার সূচনা হয়। সর্বপ্রথম বর্ধমান জেলার আসানসোল অঞ্চলে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কাজ শুরু হয়, চলে ১৯২১ পর্যন্ত এবং জেলার অন্যান্য অংশে ম্যাপ ও রেকর্ড তৈরীর কাজ শুরু হয় ১৯১৭, চলে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এসময় জেলার সেটেলমেন্ট অফিসার ছিলেন K.A.L. Hill, শেষের দিকে S.N. Roy, এঁদের তত্ত্বাবধানে রেকর্ড তৈরীর মাধ্যমে প্রজার স্বত্ব নির্ধারণের কাজ সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হয়।

এসময় জেলায় ভাগচাষ ও তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই গণ-অসন্তোষের মোকাবিলা করার জন্য ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের ফ্লাউড কমিশন গঠিত হয়। বর্ধমানের মহারাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব এই কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই কমিশন দীর্ঘ

দিন কৃষকদের অবস্থা পর্যালোচনা করে এবং তাদের ও জমিদারদের বক্তব্য শুনে ১৯৪০ সনে তাঁদের সুপারিশ পেশ করেন। এই সুপারিশে ছিল মধ্যস্বত্বভোগী ও জমিদারীর বিলোপসাধন ও কৃষিযোগ্য জমির উর্ধসীমা ১০ একর পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। বিজয়চাঁদও এই সুপারিশে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় এই সুপারিশকে তখন কার্যকর করা যায় নাই।

যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালে। এই সময় ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ ও জমিদারী উৎচ্ছেদ সম্পর্কে মতামত দেবার জন্য রোনাল্ডস্ কমিটি (Ronalds Committee) গঠিত হয়। রোনাল্ডস্ কমিটিও জমিদারী অধিগ্রহণের সুপারিশ করে।

ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালের ৫ই মে পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী উচ্ছেদ আইন (West Bengal Estate Acquisition Act) পাশ হয় ও ১৯৫৪ সালের ১৫ই এপ্রিল ১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ থেকে এই আইন কার্যকর করা হয়। এই আইন দ্বারা সমস্ত জমিদারী সরকারে বর্তায় ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার বিলুপ্ত হয়। এই আইনের দ্বারা রায়তদের জমির উর্ধ্বসীমা রাখা হয় কৃষিজমি ২৫ একর ও অকৃষিজমি ১৫ একর। এছাড়া বিল্ডিং, বাগান, চা-বাগান, পুকুর, মৎস্যচাষ ও দেবোত্তর জমি সম্পর্কে পৃথক অতিরিক্ত সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়।

এই আইন প্রবর্তিত হওয়ায় আবার সেটেলমেন্ট রেকর্ড সংশোধনের (Revisional Settlement)-এর প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৫৪ সাল থেকেই রেকর্ড নবীকরণের কাজ শুরু হয়ে যায়। এই কাজ শেষ হয় ১৯৬০ সালে। জোতদারদের কাছ থেকে তাদের উর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমির খতিয়ান দাগ, শ্রেণী ও পরিমাণসহ ৬ ধারা মতে রিটার্ন চাওয়া হয়। ১৯৫৩ সালের আইনের দ্বারা জেলার ২,৮৯,৯৮৩ জন জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপসাধন ঘটে ও ৩৮২৫ জন বড় জোতদার চিহ্নিত হয়।

১৯৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সরকারে ন্যস্ত জমির পরিমাণ ও প্রকৃত প্রস্তাবে সরকারে দখলে আসা জমির পরিমাণ—কৃষিজমি ৪০১৭৫.৬৭ একর, অকৃষিজমি ৩৭৮০১.১৪ একর। (সারণী ৫, ৫ক ; পৃষ্ঠা ৬০৮–০৯)

১৯৫৮ সালের আইনে কিছু ফাঁক ছিল। জোতদার বা মধ্যস্বত্বভোগীগণ ২৫ একর কৃষি ও ১৫ একর অকৃষি জমি ছাড়াও বিল্ডিং, বাগান, চা-বাগিচা, মৎস্য চাষের পুকুর, ফল বাগিচা, দেবোত্তর জমি নিজ দখলে রাখতে পারতেন। কাজেই জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীগণ আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য রাতারাতি মাঠের মধ্যে

সারণী - ৫

STATEMENT SHOWING TOTAL AREA OF LAND VESTED UNDER W. B.E. A. ACT 1953 AND POSSESSION TAKEN THERE OF

Name of the sub-division	Total Area of vested land.			Area hit by injunction.		
	Agri.	Non agri & others	Total	Agri.	Non agri & others	Total
Sadar	21578.56	12539.56	34118.12	3500.88	792.87	4293.75
Asansol	1427.69	7152.12	8579.81	205 57	311 66	517.23
Durgapur	6761.75	10765.80	17527.55	981.47	922 18	1903.65
Katwa	5497.92	2247 94	7745.86	1301.71	198.35	1500.06
Kalna	4909.75	5095 72	10005.47	706.66	338.38	1045.04
Total	40175.67	37801.14	77976.81	6696.29	2563.44	9259.73

(Brochure for The State Cainet Development activities / Sept. 1972)

সারণী - ৫ক

STATEMENT SHOWING TOTAL AREA OF LAND VESTED UNDER W. B.E. A. ACT 1953 AND POSSESSION TAKEN THERE OF

Area available for taking over possession.			Area taken over possession upto 31-8-72				Area yet to be taken possesson of.		
Agri.	Non agri & others	Total	Agricultural unsuita-ble	Agricultural suitable	Non agri & others	Total	Agri	Non agri & others	Total
18077.68	11746.69	29824.37	5064.84	11203.15	8426.13	24694 12	1809.69	3320.56	5130.25
1222.12	6840.46	8062.58	10 82	1012.99	5604.26	6628.07	198.31	1236.20	1434.51
5780.28	9843.62	15623.90	265.09	2379.83	9256.27	11901.19	3135.36	587.35	3722 71
4196 21	2049.59	6245.80	594.64	3038.51	1221.36	4854.51	619.87	828.23	1391 29
4203.09	4757.34	8960.43	190.71	3806.76	4293 05	8290 52	205.62	464.29	669 91
33479.38	352337.70	68717.08	6126.10	21441.24	28801 07	56368 41	5968 85	6436.63	12348 67

(Brochure for The State Cainet Development activities Sept. 1972)

পুকুর কাটিয়ে মাছ চাষ আরম্ভ করে দিলেন। মাঠের জমিতে ফলের বাগিচা তৈরী করলেন। তাছাড়া আত্মীয়-স্বজন, এমনকি বাড়ীর বিশ্বস্ত চাকর বাকরদের নামে অতীতের তারিখ দিয়ে আমলনামা বা চেকে বন্দোবস্ত দেখাতে লাগলেন। কেউ কেউ Deed of Family Settlement (আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য বন্টননামার নামান্তর) রেজেষ্ট্রী করে ছেলেদের বা আত্মীয়দের মধ্যে জমি ভাগ করে দিলেন। কাজেই সরকার এই আইনের একটি সংশোধনী ৫ক ধারা যোগ করে বে-আইনী হস্তান্তর-এর বৈধতা বিচার করতে নির্দেশজারী করেন। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জেলায় ৬৭৭টি হস্তান্তর অবৈধ ঘোষিত হয়, ফলে ৭৮০৩.৬৭ একর জমি সরকারে ন্যস্ত হয়।

১৯৭২ সালে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৫ সালের সংশোধিত ভূমি সংস্কার আইনে ৫(১) ধারা সংযোজিত হয়। এই ধারা অনুসারে যে কোন হস্তান্তর এমন কি বিভাগ বন্টন সংক্রান্ত দলিলেরও রেজেষ্ট্রীকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়। তাছাড়া 14(P) ধারামতে ১৯৬৯ সালের ৭ই আগষ্টের পর যে কোন হস্তান্তর বে-আইনী ঘোষণা করা হয় ও 14 (M) ধারামতে পরিবারভিত্তিক জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারিত হয়। এক সদস্যের পরিবারের জন্য ৬ একর সেচসেবিত এলাকায় জমি অথবা ৯ একর অন্য জমি রাখার অধিকার স্বীকৃত হয়। পরিবার বড় হলে জমির উর্ধ্বসীমাও বাড়বে, তবে কোন ক্ষেত্রেই জমির উর্ধ্বসীমা সেচসেবিত অঞ্চলে ১৭ একর বা অন্য ধরনের জমি ২৪ একরের উর্ধ্বে হবে না। এই আইনের দ্বারা মনে করা হয়েছিল বে-আইনী হস্তান্তর বন্ধ হবে ও অনেক উদ্বৃত্ত জমি সরকারে বর্তাবে। কিন্তু আইন যাঁরা প্রয়োগ করবেন তাঁদের এবং জোতদারদের সততা না থাকলে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব হয় না। তাই দেখা গেল ভূমি সংস্কার আইনকে সংশোধন করে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সমগ্র জেলায় মাত্র ৭২০৫ পরিবারের ২৭৬৫০.৫০ একর কৃষিজমি ও ১৫২৩১ একর অন্যান্য জমি সরকারে ন্যস্ত হয়।

ভাগচাষী ও তেভাগা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন পাশ হয়। এই আইনের দ্বারা ভাগচাষে বর্গার হার স্থির হয়। তাছাড়া উচ্ছেদের ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। মালিক চাষের সমস্ত খরচ দিলে আধাআধি পাবেন আর তা না করলে বর্গাদার পাবে ৬০ ভাগ ও মালিক ৪০ ভাগ। আর মালিক নিজে চাষ করলে বা বর্গাদার চাষে অবহেলা করলে ও মাঠহারী উৎপাদন না করলে মালিক বর্গাদারকে ছাড়াতে পারবেন। ফলে ব্যাপক হারে ভাগ চাষী উচ্ছেদ হতে লাগল। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়

২০ বৎসরে ভাগচাষীদের সংখ্যা ৫০ শতাংশ থেকে কমে ১৫ শতাংশে দাঁড়াল। ১৯৫৪ সালের জমিদারী উচ্ছেদ আইনে বর্গাদার রেকর্ড করার নির্দেশ ছিল কিন্তু উচ্ছেদের ভয়ে বেশীর ভাগ বর্গাদার এগিয়ে আসে নাই। ফলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। এরপর আশির দশকে যখন আবার রেকর্ড নবীকরণের কাজ শুরু হয়। তখন সরকার থেকে "অপারেশন বর্গা" চালু করে বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করার জন্য কঠোর নির্দেশ জারী হয়। তাছাড়া কৃষক সমিতি, কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীগণ ও পঞ্চায়েত এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা করে। নথিভুক্ত বর্গাদারকে ব্যাঙ্ক থেকে কৃষিঋণ দেবার নির্দেশ জারী হয় ফলে বর্গাদাররা নিজের স্বার্থেও নিজেদের নাম নথিভুক্ত করায়।

ভূমি সংস্কার আইনের ৪৯ ধারা মতে সরকারে ন্যস্ত জমি বিলিবন্টন করার নির্দেশিকা জারী হয়। যোগ্য প্রার্থী বাছবার জন্য পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। পঞ্চায়েতের দ্বারা প্রস্তুত উদ্বৃত্ত জমি পাওয়ার হকদারদের তালিকা মহকুমা শাসক অনুমোদন করলে প্রাপককে বিধিবদ্ধ পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

১৯৯৫ সালের মার্চ পর্যন্ত পাট্টা প্রাপক ও নথীভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা নিম্ন সারণী থেকে জানা যায় (জেলা পরিকল্পনা সমিতি প্রকাশিত 'ব্লক প্রোফাইল' পুস্তিকা)

সারণী - ৬

বন্টনযোগ্য খাসজমি		বন্টিত জমি	নথীভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা	
আয়তন (হেক্টর)	মোট পরিমাণ (হেক্টর)	মোট প্রাপকের সংখ্যা	তফসিল জাতি	আদিবাসী
৩২৯৪৭	১৭৭০৯	১৭৪১৯	৪২২৭৩	১৬০৭০

বাস্তুজমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী পাট্টাপ্রাপকদের সংখ্যা

তফঃজাতি	আদিবাসী	অন্যান্য	সর্ব মোট	মোট জমি
২৮৩৩১	১৬২৭৫	১২৮৯০	৫৭৩৪৯৬	২০২১·৮৯ একর

১৯৯৬-এর জুন পর্যন্ত যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় বাস্তুজমি প্রাপকদের সংখ্যা ৫৮২৮০ জন ও জমির পরিমাণ ২০৪৫·১৭ একর।

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা ১৪০৩-এ বর্ধমান জেলা সংখ্যায় অধ্যাপক অজিত হালদার মহাশয়ের 'বর্ধমানের কৃষি' প্রবন্ধে দেখা যায় নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা

দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ১১ হাজার এবং সরকারে ন্যস্ত জমির মোট পরিমাণ ৭৫ হাজার একরের মধ্যে ৫০ হাজার একর অধিগ্রহণ করে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেড় লক্ষ ক্ষেতমজুরকে বন্টন করা হয়েছে। এই বন্টিত জমির পরিমাণ মোট কৃষি জমির ৫ শতাংশের বেশী নয়। কাজেই প্রতি ক্ষেত মজুরের ভাগে গড়ে কৃষিজমি পড়ছে ০.৩৩ একর অর্থাৎ ১ বিঘা। আমার ধারণা এই এক বিঘা কি দেড় বিঘা জমি নিয়ে নিজ হালে চাষ একরূপ অবাস্তব। কাজেই এদের অনেকেই এই সব জমি বিক্রি করে দিচ্ছে আর ক্ষুদ্র চাষীরা এসব জমি কিনে নিচ্ছেন এবং এঁরা মাটি পরীক্ষা করিয়ে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে অগভীর নলকূপের সাহায্যে জলসেচ করে বছরে ২/৩ টি ফসল উৎপাদন করছে ও নিজেদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল করে ফেলেছে। আর বর্গাদার ও প্রান্তিক চাষীরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে যাচ্ছে।

তাছাড়া নিবিড় চাষ পদ্ধতি দ্বারা জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে ও গভীর নলকূপের সাহায্যে জলসেচ করে বর্তমানে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব হলেও কতদিন এটা সম্ভব হবে সেটা কিন্তু বিতর্কের বিষয়। কারণ পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় প্রথম প্রথম সবুজ বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হলেও উৎপাদন এখানে বর্তমানে আশাতীত ভাবে কমে গেছে। এর কারণ অধিক রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটির উৎপাদিকা শক্তি কমে যাচ্ছে। গভীর ও অগভীর নলকূপ ব্যবহারের দ্বারা মাটির জলস্তর ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। তাছাড়া অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান তত্ত্বের প্রতিফলন তো আছেই। এ সম্বন্ধে Statesman পত্রিকায় ২১/২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ প্রকাশিত K. B. Sahay এর Green Revolution—Claim of Excellence Myth—প্রবন্ধের উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক হবে।

Punjab and Haryana are the two major states of India that are considered the most successful of models of the agricultural excellence in the country and indeed the food grain productivity in these two states are significantly higher than the national average. But both these states are now facing serious soil health problems and the productivity of the soil has now started to decline after reaching a plateau. Intensive cultivation using high yielding short duration and fertilizer-responsive cultivars, the removal of plant nutrients has increased Micro-nutrient dificiencies and are now becoming a matter of serious concern.

Again the spread of the Green revolution technology has led to a phenomenal increase in private shallow tube well in Punjab

and Hariyana resulting in over-exploitation of ground water which is now a serious problem.... .

আমাদের জেলাতেও জলস্তর ক্রমশ নেমে যেতে আরম্ভ করেছে। জমির Soil health problem-ও আরম্ভ হয়েছে। তাছাড়া অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ও নানারকম কীটনাশক ব্যবহারের ফলে দিন দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই জেলার উৎপাদনবৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখবার জন্য জেলার কৃষিদপ্তরকে এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে হবে।

পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি সংস্কারের ফলে জেলার খাদ্যশস্যের উৎপাদনে কতটা উন্নতি হয়েছে তার আলোচনা করা যেতে পারে। সরকারের তথ্য অনুযায়ী সত্তরের দশকে রাজ্যে কৃষি উৎপাদনে যে নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছিল, আশির দশকে তা সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে কৃষি উৎপাদন চমকপ্রদ ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই তথ্য সঠিক হলে বর্তমান সরকারের ভূমি-সংস্কার নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা এই জেলা খাদ্যশস্য উৎপাদনে ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করে। সাহা ও স্বামীনাথনের (১৯৯৪) গবেষণাপত্র অনুযায়ী সরকারের তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৮১-৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের বার্ষিক গড় শতকরা ০.৬ হারে বাড়ছিল কারণ এসময় সর্বভারতীয় হার ছিল ২.২।

কিন্তু খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক কৃষি-গবেষক জেমস বয়েসের মতে সরকারের আশির দশকে উৎপাদনের তথ্য সংকলনের পদ্ধতিটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। কারণ ডঃ প্রশান্ত মহলানবীশ নির্দেশিত ব্যুরো অব্ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স অ্যান্ড স্টাটিস্টিক্স (B.A.E.S)-এর পদ্ধতিতে তথ্য সংকলন না করে রাজ্যের কৃষি দপ্তর আশির দশকে আপন ইচ্ছানুযায়ী বি.এ.ই.এস.-এর তথ্য বদলে দিয়ে উৎপাদনের হার বেশী করে দেখিয়ে বাহবা নেবার চেষ্টা করে। গজদার ও সেনগুপ্তের গবেষণায় রাজ্য সরকারের তথ্যের ভিত্তিতেই ১৯৮৩-৮৪ সালকে ভিত্তি হিসাবে ধরলে বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৪.৩, জেমস বয়েসও এই যুক্তি সমর্থন করেছেন। একই ভাবে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে নব্বইয়ের দশকে কৃষি উৎপাদনের হার আবার কমে গিয়েছে। (তথ্য : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯.২.২০০০)

আমার ধারণা উৎপাদন কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের জন্য soil health problem বা অর্থনীতির ক্রম হ্রাসমান নীতি আবার পরিসংখ্যানগত ত্রুটিও হতে পারে। পরিসংখ্যানগত গবেষণা সম্পর্কে একটি প্রবাদ বাক্য হল গারবেজ ইন, গারবেজ আউট। অর্থাৎ

তথ্য পরিসংখ্যানই যদি ক্রটিপূর্ণ হয় তবে বিশ্লেষণও ক্রটিপূর্ণ হতে বাধ্য। তাই এ জেলার কৃষিক্ষেত্রে সরকারের ভূমি-সংস্কার ও অপারেশন বর্গা কঠোর ভাবে প্রয়োগ করার ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতটা উন্নতি ঘটেছে সেটা সঠিক ভাবে নির্ণয়ের প্রথম প্রয়োজন নিরপেক্ষ গবেষণা ও তার জন্য চাই গ্রহণযোগ্য তথ্য পরিসংখ্যান।

মূল্যমান ও প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের মূল্য :

বর্ধমান জেলা মূলত কৃষিপ্রধান ও দেশের অন্যান্য জেলার মত বর্ধমানও অনুন্নত অর্থনীতির এলাকাভুক্ত জেলা। কাজেই অনুন্নত অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী খাদ্যশস্যের মূল্য অন্যান্য ভোগ্য সামগ্রীর মূল্য নির্ণায়ক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে এ জেলা ছিল খাদ্যে স্বনির্ভর; গ্রামের উৎপন্ন ফসলের দ্বারা গ্রামের জন সাধারণের নিত্য প্রয়োজন মিটে যেত। তাছাড়া তখন অভাব থাকলেও অভাববোধটা ছিল না। মোটা ভাত মোটা কাপড়েই লোকে সন্তুষ্ট থাকতো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তারপর সপ্তম-পঞ্চম আইন প্রয়োগের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। অর্থনীতির যোগান ও সরবরাহের ঘাত প্রতিঘাতে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের দাম উর্ধ্বমুখী হয়। এই মূল্যবৃদ্ধির ধারা বিশ্লেষণ করলে জেলার অর্থনীতির Trend বা ধারাটি ও মূল্যবৃদ্ধির কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মুদ্রার অবমূল্যায়ন, দুর্ভিক্ষের আভাস, মজুতদারদের খাদ্যশস্য মজুত করে কালোবাজারী সৃষ্টি এই সমস্ত কারণে জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বাড়তে থাকে।

খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা এবং রেলপথ বিস্তারের ফলে অন্য রাজ্যে খাদ্যশস্যের রপ্তানী হলেও ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়তে থাকে। আধুনিক যুগের সূচনা থেকে খাদ্যশস্য বিশেষ করে জেলাবাসীর প্রধান খাদ্যশস্য চাউলের মূল্যের তালিকা বিশ্লেষণের দ্বারা জেলার অর্থনীতি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

চাউলের ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের মূল্য তালিকা

সারণী-৭

বৎসর	শস্য	প্রতি টাকায়	পরিমাণ
১৭৫১	চাউল	১ টাকা	৫৭ সের
	ছোলা	১ টাকা	৪০ সের
	আটা	১ টাকা	২৪ সের
	তৈল	১ টাকা	৮ সের

১৭৫২
(দুর্ভিক্ষের বৎসর) সাধারণের ব্যবহারযোগ্য

বৎসর	শস্য	প্রতি টাকায়	পরিমাণ
	চাউল	১ টাকায়	২২ সের
	ময়দা	১ ”	৫ সের
	সরিষার তৈল	১ ”	৩ সের ১০ ছটাক
	গম	১ ”	১৯ সের ১১ ছটাক
	ছোলা	১ ”	১৫ সের ২ ছটাক
১৭৮৮ খ্রী:	সাধারণ চাউল	১ ”	২৫–২৮ সের
১৭৯৮ খ্রী:	সাধারণ চাউল	১ ”	৪৫ সের

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সংবাদ প্রভাকরের ২রা জুন, ১২৬৪ সালে ২৩শে জ্যৈষ্ঠের চিঠিপত্রে প্রকাশিত সংবাদ থেকে ঐ সময়ে খাদ্যশস্যের মূল্যের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

"প্রদেশ মধ্যে মনুষ্যের জীবনধারণোপযোগী আহার্য-দ্রব্যাদি যেরূপ দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে এমতাবস্থায় কিছুকাল থাকিলে নানাপ্রকার দুর্ঘটনার উৎপত্তি হইবে তাহার সোপান এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে, কখন টাকায় আটান্ন ওজনের (অর্থাৎ ৫৮ সেরে এক মণ হিসাবে) চৌদ্দপোয়া তৈল (সাড়ে তিন সের), পঁয়ত্রিশ সের দেশী চাউল বিক্রয় শ্রুত ছিল না, দুগ্ধ ও তজ্জাত বিবিধ উপাদেয় দ্রব্য এবং বনজ তরি-তরকারী ও মৎস্যাদি স্বর্ণাপেক্ষাও মূল্যবান হইয়াছে, এক সময়ে বেগুন যাহা ভদ্র সমাজে অপরিচিত ছিল তাহাতেও আগুন লাগিয়াছে।

সারণী-৮

মূল্য তালিকা ১৮৬৬ হইতে

বৎসর	শস্য	পরিমাণ (মণ)	মূল্য (টাকায়)
১৮৬৬	চাউল	৮ সের	১ টাকা
১৮৭১–৭২	চাউল	২৫.৫ সের	১ টাকা
১৮৮৭	চাউল	.২২ সের	১ টাকা
১৮৮৮–৯২		১৫.৮৫ সের	১ টাকা
(পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য)			

বৎসর শস্য	পরিমাণ (মণ)	মূল্য (টাকায়)
১৮৯৩–১৯০২ (৫ বৎসরের গড়)	১৩.১৬ সের	১ টাকা
১৯০৩–১৯১৩ (১০ বৎসরের গড়)	১১.৪০ সের	১ টাকা
১৯১৪–১৯১৮ (৫ বছরের গড়) (যুদ্ধের বছর)	৮.৮১ সের	১ টাকা
১৯১৯–১৯২৩ (৫ বৎসরের গড়)	৬.২৫	১ টাকা
১৯২৪–১৯২৮ (৫ বৎসরের গড়)	৯.৮৭	১ টাকা
১৯২৯–১৯৩৩ (৫ বৎসরের গড়)	১০.৪৪	১ টাকা
১৯৩৪–১৯৩৮ (৫ বৎসরের গড়)	১০.২৮	১ টাকা

সারণী-৯

১৯১৪ সনকে ভিত্তি বৎসর ধরে ১৯১৭ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের বিভিন্ন বৎসরে পাইকারী মূল্যের সূচনাঙ্ক (Index Number)

বৎসর	সূচনাঙ্ক	বৎসর	সূচনাঙ্ক
১৯১৭	১৪৫	১৯২৯	১৪১
১৯১৮	১৭৬	১৯৩০	১১৬
১৯১৯	১৯৬	১৯৩১	৯৬
১৯২০	২০২	১৯৩৫	৯৯
১৯২১	১৭৯	১৯৩৬	৯১
১৯২৩	১৭২	১৯৩৭	১০২
১৯২৫	১৫৯	১৯৩৮	৯৫
১৯২৮	১৪৫	১৯৩৯	১০৮

সারণী-১০

১৯৩৯ কে ভিত্তি বৎসর ধরে বিভিন্ন বৎসরে ১৯শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে তার ভিত্তিতে সর্বভারতীয় সূচনাঙ্ক

আর্থিক বৎসর	খাদ্যশস্য	কৃষিজ দ্রব্য	শিল্পের কাঁচামাল	শিল্পজাত দ্রব্য	সাধারণ গড় সূচনাঙ্ক
১৯৩৯-৪০	—	১২৭.৫	১১৮.৮	১৩১.৫	১২৫.৬
১৯৪০-৪১	১০৬.৫	১০৮.৬	১২১.৫	১১৯.৮	১১৪.৮
১৯৪১-৪২	১২২.১	১২৪.২	১৪৬.৯	১৫৪.৫	১৩৭.০
১৯৪২-৪৩	১৭৪.৬	১৬৬.২	১৬৫.৯	১৯০.৪	১৭১.০
১৯৪৩-৪৪	২৬৩.৪	২৬৮.৭	১৮৫.০	২৫১.৭	২৩৬.৫
১৯৪৪-৪৫	২৩২.৯	২৬৫	২০৬.৯	২৫৮.৩	২৪৪.২
১৯৪৫-৪৬	২৩৭.০	২৭২.৬	২১০.০	২৪০.০	২৪৪.৯
১৯৪৬-৪৭	২৫৬.৪	৩১৩.৮	২৩৫.৩	২৫৯.১	২৭৫.৪

(Source Nalanda year book 1947–48)

মহকুমা ভিত্তিক চাউলের দাম (প্রতি মণে)

বৎসর	সদর মহকুমা	আসানসোল	কাটোয়া	কালনা
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১৯৩৯	৩.৯১	৩.৬২	৩.৭৫	৪.২৩
১৯৪০	৪.৮০	৪.৬৪	৪.৭২	৫.১৫
১৯৪৩ (আগস্ট)	৩৭.৬৫	৩২.০০	৩৭.৬৫	৩৩.৬৭

খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণ (control) জারী হয় ১৯৪২ সালে ও খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী হয় ১৯৪৩ সালে (দুর্ভিক্ষের বৎসর); সরকার চালের সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেন ২২ টাকা মণ। ফলে কালোবাজারী সৃষ্টি হয় ও কালোবাজারে চাল বিক্রি হয় ৫০–৫২ টাকা মণ।

সারণী–১১

চাউলের দাম প্রতি মণে

সাল	সদর	আসানসোল	কাটোয়া	কালনা
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১৯৪২	১৪.৫৫	১৩.৩৩	১৪.৫৫	১৫.২৪
১৯৪৫ (মার্চ)	১২.৫৯	১৩.৩৩	১২.৮০	১৩.৩৩
১৯৪৭	১৪.২০	১৫.০০	১৩.৫০	১৩.৭৫
১৯৪৮	১৭.৫০	১৬.৫৮	১৪.৭০	১৭.৬৪
১৯৪৯	১৭.৩৭	১৭.৫০	—	—
১৯৫০	১৮.২০	১৪.১৪	১৮.৭	২১.০৩
১৯৫১	১৯.৯৪	১৬.১৪	২২.৭৭	২৭.৩৭
১৯৫২	২০.০০	১৭.৫০	২২.৩৭	৩০.২৭
১৯৫৩	২১.১৬	২০.০৯	২০.৫৯	২১.৯০
১৯৫৪	১৬.০৪	১৫.৭৭	১৪.৮৭	১৬.৬৬
১৯৫৫	১৭.৫৫	১৬.২০	১৬.৬৮	১৬.৩৭

(Souice : Hindusthan Standard 4.5.1968)

১৯৬৪ সালের ৮ই জানুয়ারী Statutory rationing চালু হয়। শিল্পাঞ্চলে Rationing চালু হয় ১৯৬৬ এর মার্চ থেকে।

সারণী-১২

সে সময় চালের পাইকারী মূল্য ছিল কুইন্টাল প্রতি

	পাইকারী মূল্য (টাকা)	খুচরা মূল্য (টাকা)
মোটা চাল	৬০.২৮	৬৩.৬৩
মাঝারি	৬৪.৩৮	৬৭.৭৩
সরু চাল	৭১.৫০	৭৪.৮৫
অতি সরু চাল (Superfine)	৭৫.৯৭	৭৯.৩১

১৯৬৫ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে বড় চাষীদের ওপর বাধ্যতামূলক লেভি চালু হয়।

১৯৬৮ সালে	চালেব খুচরা দর প্রতি কেজি			
	সদর	আসানসোল	কাটোয়া	কালনা
১লা এপ্রিল	টা. ১.৪০	টা ১.৮১	টা. ২.১০	টা. ১.৫০
১৯৬৯ সালে	মোটা	মাঝারি		
১লা জানুযারি র‍্যাশনে দব	টা. ১.২০	টা. ১.৩৮		

সারণী-১৩

বর্ধমান কেন্দ্রের বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের সূচনাঙ্ক

(ভিত্তি বৎসর—নভেম্বর ১৯৫০—১০০)

	১৯৫৬		১৯৬১		১৯৬৬		১৯৬৯	
খাদ্যশস্য	ফেব্রু—	অক্টো	ফেব্রু—	অক্টো	ফেব্রু—	অক্টো	ফেব্রু—	অক্টো
চাউল	১১০	১২৭	১১৯	১৩১	১৫৬	১৫৬	২৫৪	২৮৫
আটা	৭৫	৭৫	৭৫	৭৪	৯৯	৯৭	১৪৩	১৪৪
মুগ ডাল	৮৭	৮০	১২০	১২০	২১০	২২০	২৪৭	২৪৩
মসুব	৯৮	৯৩	১১৩	৯৮	১৬৩	২০০	১২৪	২২১
কলাই	৮৫	১০৪	১০১	১০৪	১৪৯	১৮৯	১৬২	১৭৬
অন্যান্য ডাল	৮২	৯১	১০৭	১০৪	১৭৩	১৭৬	১৯০	১৯০
সরিষা তৈল	৬৩	১০৩	১২০	১০৬	১৪৯	১৭৩	১৬৯	১৯০
লবণ	৭৮	৭৫	৯২	১০০	৯২	৯২	১৫৪	১৩৮
মসলা	৭৫	৭৯	১৭৪	১৯৪	৩৭১	৪০৪	৩৯৪	৪৭৭
চিনি	১০০	১০৫	১৩২	১৪৫	১৪৭	১৫৪	২৯২	২৩১
গুড়	৮৬	৫৫	৭২	৯০	৯৬	১৩১	১৭৮	১৭৩
দুধ	৮৩	৯১	১০৮	১০৮	১৩৩	১৩৩	১৬৭	১৩৩
ঘি	৮৪	৮৯	১০৬	১১০	১৬৫	১৭৪	২১৩	২২২
আলু	২৮	৫৬	২৪	১০০	৪০	৮২	৪৪	৮২
পিঁয়াজ	৯৩	৭৮	৯৬	১৫৩	১১৫	১৫৮	২২৪	১৭৬
অন্যান্য তরকারী								
আনাজ	৬৭	৮২	২৭	১১০	৮৩	১৬৪	৮১	১৭৯
শাকসব্জী	৬১	১০০	৫৭	১৪৩	৮৪	১৭২	৯২	১৮৪
মাছ	৯৮	৮১	১৪৩	১৫৩	১৫৯	২০২	২৫০	২২৯
মাংস	৯৩	৯২	১০৮	১০৩	১৮৭	১৮৮	২০৯	২২৩
ডিম	৭৫	৮৫	১০৭	১২১	১৭৩	১৯৬	২০৮	২৩৭

সারণী -১৪

১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে জেলায় প্রচলিত কৃষি শ্রমিকের দিন মজুরির তালিকা (বর্ধমান জেলায়)

AVERAGE DAILY WAGE OF AGRICULTURAL LABOURERS IN BARDHAMAN DISTRICT (in Rs.)

M=Men, W=Women, Ch=Child, hr.=Normal daily working hrs]

	Field Labour			Other Agr. Labour			Herdsmen			hr.
1956	M	W	Ch	M	W	Ch	M	W	Ch	8
January	2.12	1.88	1.44	1.96	1.62	1.19	1.37	1.25	0.75	8
February	1.81	1.56	1.06	1.62	1.25	0.81	1.37	1.25	0.75	8
March	1.75	1.50	0.96	1.69	1.37	0.81	1.31	1.19	0.81	8
April	1.81	1.62	1.66	1.69	1.50	0.81	1.31	1.19	0.81	8
May	1.75	1.75	0.96	1.69	1.37	0.81	1.31	1.12	0.81	8
June	1.88	1.62	1.12	1.87	1.56	1.00	1.37	1.31	0.88	8
July	2.12	1.81	1.00	2.00	1.56	1.00	1.62	1.37	1.00	8
August	2.25	1.94	1.19	2.19	1.75	1.06	1.50	1.31	1.00	8
September	2.00	1.88	1.25	1.88	1.50	1.00	1.31	1.75	1.00	8
October	1.75	1.56	0.81	1.69	1.56	0.94	1.31	1.25	0.81	8
November	1.81	1.56	0.94	1.75	1.37	0.94	1.44	1.28	0.87	8
December	2.00	1.75	1.12	1.88	1.53	1.06	1.50	1.31	.87	8

	Field Labour			Other Agr. Labour			Herdsmen			hr.
1966	M	W	Ch	M	W	Ch	M	W	Ch	8
January	2.44	2.25	1.00	2.25	1.75	-	1.25	0.75	.92	8
February	2.31	2.12	1.00	2.50	2.00	-	1.25	0.75	0.87	8
March	2.25	2.00	-	2.25	2.12	-	1.25	0.75	0.86	8
April	2.12	2.00	-	2.00	2.00	-	1.50	0.75	1.00	8
May	2.25	2.00	-	2.25	2.00	-	1.25	1.25	1.08	8
June	2.53	1.69	-	2.81	2.50	-	1.25	1.25	1.08	8
July	3.12	3.00	-	3.00	2.50	-	1.50	1.25	1.12	8
August	3.28	2.84	-	3.00	2.50	1.50	1.50	1.25		8
September	3.12	3.00	-	3.00	2.50	-	1.50	1.50	1.16	8
October	3.44	3.25	-	3.50	2.00	-	1.00	-	1.00	8
November	3.40	3.08	-	-	-	-	1.37	1.25	1.25	8
December	3.88	3.50	-	2.50	2.00	-	2.00	1.75	1.25	8

1969	Field Labour M	W	Ch	Other Agr. Labour M	W	Ch	Herdsmen M	W	Ch	hr. 8
January	3.37	3.18	–	3.00	2.50	1.75	2.50	2.00	1.75	8
February	3.44	3.19	–	3.00	2.50	1.75	2.50	2.00	1.75	8
March	3.37	3.12	–	2.75	2.50	1.75	2.25	2.00	1.75	8
April	3.40	3.00	–	3.00	2.50	–	2.75	2.00	1.75	8
May	3.25	2.92	–	3.00	2.00	1.75	2.75	2.00	1.75	8
June	3.00	2.90	–	3.10	2.75	2.00	3.00	2.50	2.00	8
July	3.00	–	–	2.00	–	–	2.75	–	2.00	8
August	3.00	–	–	2.50	–	–	2.75	–	2.00	8
September	3.00	2.50	–	3.00	2.50	–	2.00	–	1.75	8
October	3.00	2.25	–	2.62	2.12	–	2.00	–	1.75	8
November	2.75	2.50	–	2.75	2.25	–	2.00	–	2.00	8
December	3.00	2.75	–	3.00	2.50	–	2.00	–	2.00	8

[Source : Bardhaman Gazetteer 1994

সারণী-১৫

১৯৭১ (জুন), ১৯৭২ (আগষ্ট) ও ১৯৯৬ (আগষ্ট) কতকগুলি দ্রব্যের সমকালীন মূল্য-তালিকা (বর্ধমান শহরে)

১৯৭১ (আগস্ট) প্রতি কেজি	টাকা	১৯৯২ (আগস্ট) প্রতি কেজি	টাকা	১৯৯৬ (আগস্ট) প্রতি কেজি	টাকা
খুব সরু চাল	২.৬০	খাস চাল	১৪.০০	খাস চাল	২২.০০
ময়দা	১.৫০	চিনি	১০.২০	লবণ	২.০০
বিশুদ্ধ ঘৃত	১৫.০০	লবণ	১.৪০	ময়দা	৭.৮০
ছানা (খামি)	৭.০০	মুগ ডাল	১৮.০০	বিশুদ্ধ ঘি	১৩২.৫০
বাঁধাকপি	১.০০	সরিষা তেল	৩২.০০	সরিষা তেল	৭৮.০০
আলু	১.২০	পটল	২.৮০	চিনি	১৪.৫০
পটল	১.১২	চা	৮০.০০	মুগ ডাল	২৯.০০
পিঁয়াজ	.৪৫	তাঁত শাড়ি	৪১.৭৫	মাছ	৮০.০০
শাক	.৫০	ধুতি	৫৬.০০	মাংস	৮০.০০
আপেল	৪.৫০			আলু	৫.৬৫

১৯৭১ (আগস্ট)		১৯৯২ (আগস্ট)	১৯৯৬ (আগস্ট)	
প্রতি কেজি	টাকা	প্রতি কেজি টাকা	প্রতি কেজি	টাকা
চা	৮.০০		পটল	১০.০০
মাছ	৭.৫০		বেগুন	১০.০০
খাসির মাংস	৫.০০		পিঁয়াজ	৬.০০
ল্যাঙ্গড়া আম	১.২৫		শাক	২.৫০
টেরিকট জামার ছিট (মিটার)	১৭.৫৬			
ফাইন ধুতি	৯.০০			
তাঁতের শাড়ি	১২.২৫			

এই মূল্য তালিকাগুলি বিশ্লেষণ করে বর্তমান কালের তুলনায় ৫০ বৎসর পূর্বে স্বল্প মূল্য দেখে যদি কেউ মনে করেন যে ৫০ বৎসর পূর্বে দেশ প্রাচুর্যে পূর্ণ ছিল; লোকে মহাসুখে জীবনযাপন করতো, দেশে কারও কোন অভাব ছিল না, তাহলে তিনি মহা ভুল করবেন। কারণ তখন শ্রমের মূল্য ছিল খুবই কম। ১৯৩৭ সালে একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষকের বেতন ছিল মাসিক ৩০ টাকা—৩৫ টাকা। একজন সরকারী বা ব্যাঙ্কের করণিকের বেতন ছিল ৩০ টাকা, গ্রামের কৃষি-শ্রমিকের বেতন ছিল দৈনিক চার আনা আর চালের দর ছিল ৪ টাকা মণ। এছাড়া ১৪ নং সারণী থেকে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কৃষি-শ্রমিকের দৈনিক মজুরীর তালিকা ও সমকালীন দ্রব্য-মূল্য পর্যালোচনা করলে তৎকালে সাধারণ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পরিস্ফুট হবে।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষকের বেতন ছিল ৬০ টাকা। ১৯৫৪ সালে একজন ম্যাট্রিকুলেট করণিকের বেতন ৫০ টাকা ও একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর বেতন মাসিক ৩৫ টাকা।

১৯৭৬ সালেও একজন শ্রমিকের দিনমজুরি ছিল ৭ টাকা ও দিনে ৯–১০ ঘন্টা কাজ আর ১৯৯৬ সালের দিনমজুরি ৩২ টাকা ও ৭ ঘন্টা কাজ এবং ১৯৯৯ সালে দিন মজুরি হয়েছে ৫০ টাকা ও ৬ ঘন্টা কাজ। আর চালের দাম ১০ টাকা কেজি। অবস্থার কি খুব বেশী উন্নতি হয়েছে? মনে তো হয় না।

মাপ ও ওজন : উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জেলায় কৃষিজ দ্রব্য কাঁচি ওজনে কেনাবেচা হত। তবে শিল্পাঞ্চলে ও শিল্পজাত দ্রব্য পাকি মাপে কেনাবেচা হত। বর্ধমানে আউসগ্রাম, মন্তেশ্বর, রায়না, জামালপুর, খণ্ডঘোষ,

সাতগেছিয়া ও গলসী থানায় কাঁচি অর্থাৎ ৬০ তোলায় ১ সের মাপে জিনিসপত্র কেনাবেচা হতো। কাঁকসা, পূর্বস্থলী, সাহেবগঞ্জে কয়লা, খইল এগুলি পাকি মাপে অর্থাৎ ৮০ তোলায় সের হিসেবে ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্য ধান, চাল, সব্জী, মাছ, মাংস, কাঁচি সেরে কেনাবেচা হত। কাটোয়া থানায় এক এক জায়গায় এক একরকম মাপ প্রচলিত ছিল। কোথাও ৫৮ তোলা, কোথাও ৮০ তোলা, কোথাও ৬০ তোলা আবার কোথাও বা ৮২.৬২৫ তোলায় সের হিসেবে কেনাবেচা হত। দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল এসব ক্ষেত্রে হাত মাপ, ফুট, গজ প্রচলিত ছিল। তবে সাধারণত ১৮ ইঞ্চিতে একহাত ধরা হত। তবে জমি মাপা ক্ষেত্রে সিকান্দারী হাতে অর্থাৎ ২০ ইঞ্চিতে এক হাত ধরা হত। সেটেলমেন্টের চেইন ছিল ২২ গজ বা ৬৬ ফুট ও লিঙ্ক ছিল ৭.৯২ ইঞ্চি–১০০ লিঙ্কে এক চেইন।

তরল পদার্থের মাপ হত তোলা, ছটাক, পোয়া, সের, মণ।

দৈর্ঘ্যের মাপ ছিল ইঞ্চি, ফুট, গজ, মাইল, আঙ্গুল ইত্যাদি। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে General conference on weights and Measures সমস্ত দেশের জন্য আন্তর্জাতিক মান (System International) মেট্রিক পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় ও ১৯৬০ সাল থেকে এই পদ্ধতি চালু হয়।

১ টাকা = ১০০ পয়সা। ১ মাইল = ১.৬০৯৩ কিমি। ১ কিমি = ০.৬২১৪ মাইল।

১ একর = ৪৮৪০ বর্গ গজ = ০.৪০৪৭ হেক্টর। ১ বর্গ মাইল = ৬৪০ একর = ২৫৯.০০৪ হেক্টর।

১ হেক্টর = ২.৪৭১ একর। ১ তোলা = ১১.৬৬ গ্রেণ; ১ সের = ০.৯৩ কেজি। এক মণ = ০.৩৭ কেজি।

হাট ও বাজার : অর্থনীতিতে বাজার বলতে একটা দ্রব্যের বাজারকে বোঝায়। যেমন—ধানের বাজার, চালের বাজার, পাটের বাজার, ফলপট্টি, পোস্তাবাজার ইত্যাদি। ঐ দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা নিয়ে গড়ে ওঠে এই বাজার। অর্থনীতির বাজারের দ্বারা কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না। এই বাজার একটা পরিবেশ, যেখানে কোন দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে দ্রব্যটির বিনিময় হয় মূল্যের মাধ্যমে।

কিন্তু সাধারণ অর্থে বাজার বলতে একটা স্থানকে বোঝায় যেখানে প্রতিদিন সকাল বা বিকালে নানা জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসে বিক্রেতারা; আর ক্রেতারা আসে দর যাচাই করে, নিজেদের পছন্দমত জিনিস প্রয়োজনমত কিনতে। বাজার বলতে বোঝায় এমন একটা সাধারণ স্থান যেখানে প্রত্যহ সেই নির্দিষ্ট স্থানে যথা

সময়ে কেনাবেচা হয়। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানকেই বাজার বলে। বাজার হলো ক্রেতা-বিক্রেতার মিলন-স্থান। বিক্রেতা দ্রব্যটি বিক্রয় করতে চায়। আর ক্রেতা চায় কিনতে। এই ক্রেতা ও বিক্রেতার চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে কোন বিশেষ দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।

হাটও একরকম বাজার, ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান। তবে হাট প্রত্যহ বসে না। হাট হলো সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে ক্রেতা-বিক্রেতার কেনাবেচার স্থান। সাধারণ তরিতরকারী, সব্জীর ক্রয়-বিক্রয় নিয়েই গড়ে ওঠে হাট। তবে সব্জী ছাড়াও চাল, ডাল, মাছ, মাংস, পাট, জামাকাপড় মসলাপাতিও বিক্রয় হয় হাটে। আবার গরু-বলদও কেনা-বেচা হয় গরুর হাটে।

ষোড়শ শতকে রচিত দ্বিজমাধবের সারদামঙ্গল কাব্যে ভাঁড়ু দত্ত শীর্ষক ষষ্ঠ পালাগানে ভাঁড়ুর বেসাতির বর্ণনায় সেকালের হাটের একটা ছবি পাওয়া যায়।

ভাঙা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বান্ধিয়া।
ছাওয়ালের মাথায় বোঝা দিলেক তুলিয়া ॥
কুড়ি বুড়ি নাই ভাঁড়ু, বাক্যমাত্র সার।
ত্বরায় পাইল গিয়া নগর বাজার ॥
ধনা নামে চালুয়া পসরা দিয়া আছে।
ধীরে ধীরে ভাঁড়ু দত্ত গেল তার কাছে।

* * * * *

চাউল লইব্রা হইল তবে ভাঁড়ুর গমন।
আনাজের পসারে গিয়া ছিল দরশন ॥
সাত পাঁচ বুলি তারে বোলে ভাই ভাই।
শাক, বাইগণ, মূলা লইল তার ঠাঞি ॥
আনাজ লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন।
লোণের পসারে গিয়া দিল দরশন ॥
লবণ লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন।
তৈলের পসারে গিয়া দিল দরশন ॥

* * * * *

মাছোনি বসিছে মৎস্যের পসার লৈয়া কোলে।
পসার হোস্তে মৎস্য ভাঁড়ু বাছি বাছি তোলে ॥
মৎস্য ধরি ডোমনীরে করে টানাটানি।
কড়ি না দিয়া মৈছ্য লৈয়া যাও কেনি।

ষোড়শ শতকের মধ্য ভাগে (১৫৫৫–৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও "চতুর্থ দিবস দিবা" সর্গে ১৩৭নং পদে হাটের বর্ণনা পাওয়া যায়।

মস্করা পুতিআ বীর বান্ধে বনমালা।
হাটুআ আনিআ বীর দিল তাড় বালা॥
বেরু নিঞা জন আমি বান্দে নদী পানি।
জত জন আসিব বেবাজ হাটগুলি॥
কেহ তৈল আনে কেহ আনে খন্ড দধি।
ভক্ষ-দ্রব্য বেচে উপহার নানাবিধি।

* * * * *

শাক বাইগণ মূলা হাটে ভিন্ন লয় তোলা
ঘরে আস্যা লয় তার বেটা

* * * * *

চালু লয় চালু আতির ঘরে কড়ি চাহিতে তারে মারে
গুয়াপান নিত্য লয় বৈঠা।

(তাড় বালা = আঁট বালা, হাতে, পায়ে অথবা কানে। চালু আতি = ধান ভানা যার বৃত্তি)

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট' কবিতায় আধুনিককালের 'হাটের' বর্ণনার সঙ্গে এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগায়—

দূরে দূরে গ্রাম দশ বারোখানি, মাঝে একখানি হাট
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচাকেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায়,
বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পূবের মাঠ,
দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে ওঠে দীপ—আঁধারেতে থাকে হাট।

* * * * *

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল চেনা-অচেনার ভিড়ে;
কত-না ছিন্ন চরণচিহ্ন ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে।
মাল চেনাচিনি, দর জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি
হানাহানি ক'রে কেউ নিল ভ'রে, কেউ গেল খালি ফিরে

দিবসে থাকে না কথার অন্ত, চেনা অচেনার ভিড়ে।
কত কে আসিল, কত বা আসিছে, কত না আসিবে হেথা,
ওপারের লোক নামালে পসরা ছুটে এপারের ক্রেতা।
শিশির বিমল প্রভাতের ফল
শত হাতে সহি পরখের ছল
বিকাল বেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা।
হিসাব নাহিরে—এল আর গেল কত ক্রেতা-বিক্রেতা।
নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরানো হাটের মেলা।
দিবস রাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্য নাটের খেলা।
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে, ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে, চিরকাল একই খেলা।

দশ-বারোখানি গ্রামের মাঝখানে খোলা জায়গায় বসে হাট। দূরদূরান্ত থেকে হাটুরেরা পসরা সাজিয়ে নিয়ে আসে। চারিপাশের গ্রামের মানুষ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে এই হাট থেকে। হাট সাধারণত মাঝারি গ্রামেই বসে। সপ্তাহে সাধারণত দুদিন তবে কোথাও সপ্তাহে ১ দিন বা তিন দিন বসে। আর বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও শহরে বসে দৈনন্দিন বাজার। কারণ জনসংখ্যাও এখানে বেশী লোকের চাহিদাও বেশী আর শহরে বেশী দাম পাবার আশায় দূরদূরান্ত থেকে পসারীরা তাদের সামগ্রী নিয়ে আসে বিক্রয়ের জন্য। বড় বড় শহরে সারাদিন তো বটেই অধিক রাত্রি পর্যন্ত বাজার খোলা থাকে।

১৯৯১ সালের District Census Hand Book পর্যালোচনা করে ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে গোটা জেলায় "প্রায় অর্ধশতাধিক হাট, হাটি, গঞ্জ ও বাজার অন্ত গ্রাম বা অঞ্চল রয়েছে। হাট ও বাজার সম্পর্কে এই প্রবন্ধের সূচনাতেই আলোচনা করা হয়েছে। গঞ্জ বলতে বোঝায় 'হট্টস্থান বা আড়ত যেখানে পণ্য আনীত ও রক্ষিত হয় ও যেখান থেকে অন্যত্র রপ্তানী হয়।' সেই অর্থে গঞ্জ বলতে পাইকারী বাজার বোঝায়। এসব তো বোঝা গেল। কিন্তু হাটি? কারণ হাটি অন্ত প্রায় ১৮টি গ্রামের নাম পাওয়া যাচ্ছে। হাট শব্দের উত্তর ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' প্রত্যয় করে হাটিকা হওয়া অসম্ভব নয়। তার পর ছুরিকা থেকে যেমন 'ছুরি', ছোট ছোরা বোঝায়; তেমনি হাটি অর্থে ছোট হাটও বোঝান অসম্ভব নয়।

আমার ধারণা হাট-হাটি, গঞ্জ-বাজার অন্ত নিম্নলিখিত গ্রাম ও অঞ্চল-গুলিতে পূর্বে ছোট বড় হাট বা বাজার বসত।

হাট-অন্ত গ্রাম : নবাবহাট, বেচারহাট, কোটালহাট, বোরহাট, পারহাট, কানপুরহাট, নতুনহাট, নহাটা, খালেরহাট, পানুহাট, মণ্ডলহাট, একাইহাট, বিকি-হাট, পাতাইহাট, চরপাতাই হাট, রাজহাট, তেহাটা, দুররাই হাট, গোলা হাট।

হাটি-অন্ত গ্রাম : মাণিকহাটি, লাউহাটি, রানীহাটি, পারহাটি, আবুজ হাটি, কামারহাটি, খেজুরহাটি, পাতরাহাটি, আদরাহাটি, খানহাটি, হাসানহাটি, চম্পাহাটি, জালাহাটি, সীতাহাটি, চিতাহাটি, নৈহাটি, (কেতুগ্রাম থানা) কাকুরহাটি, নলাহাটি।

বাজার-অন্ত গ্রাম ও অঞ্চল : লালবাজার, দলুই বাজার, শ্যামবাজার, বড়বাজার, তেঁতুলতলা বাজার, রানীগঞ্জ বাজার, বড়নীলপুর বাজার, কলেজমোড় বাজার, বাস্তুহারা বাজার, স্টেশন বাজার, কালনা গেট বাজার, নতুনগঞ্জ বাজার, শ্যামবাজার (কাঁকসা থানা), রেকাবিবাজার, লালবাজার, গৌবাজার, ঠাকুরাণিবাজার।

গঞ্জ অন্ত অঞ্চল : প্রেমগঞ্জ, পিয়ারীগঞ্জ, নতুনগঞ্জ, মোবারকগঞ্জ, মাধাইগঞ্জ, আলমগঞ্জ, তেজগঞ্জ, রাজগঞ্জ, কেশবগঞ্জ, নিজ্জৎগঞ্জ, চককেশবগঞ্জ।

আধুনিককালে বর্ধমান গেজেটিয়ার ১৯৯৪তে ১৭৮টি হাট ও বাজাবের তালিকা সংযোজিত হয়েছে। এই তালিকাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১৭৮টির মধ্যে ১৩৭টি হাট ও ৪১টি বাজার, এই ৪১টির মধ্যে ৫টি 'A' শ্রেণীভুক্ত, ১৫টি 'B' শ্রেণীভুক্ত ও ২১টি 'C' শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে প্রধান প্রধান পণ্যের আমদানী-রপ্তানী, ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু ১৯৯১ এর District Census Hand Book—Bardhaman বিশ্লেষণ করে জেলার পল্লী-অঞ্চলে সর্বমোট ২৬৩টি হাট ও বাজারের অস্তিত্ব জানা গেছে। জেলার মোট গ্রামের ১০.৫৭ শতাংশে এই হাটবাজার আছে। গ্রামের এই হাট বাজার ছাড়াও ৮টি মিউনিসিপ্যালিটিভুক্ত শহর আছে। শহরগুলিতে বসতি অনুসারে জনগণের প্রয়োজন অনুসরণ করে বাজারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্ধমান শহরে চল্লিশের দশকে ৪টি ছোট-বড় বাজার ছিল, বর্তমানে কম করে ১৩টি বাজার গড়ে উঠেছে। যেমন নতুনগঞ্জ বাজার, বড়বাজার, রানীগঞ্জ নতুন বাজার (নাম নতুন হলেও নতুন মোটেই নয়) তেঁতুলতলা বাজার, গণেশতলা বাজার, সর্বমঙ্গলাপাড়া বাজার, পারবীরহাটা বাস্তুহারা বাজার, কাঠের পুলের বাজার, কালনা গেট বাজার, বড়নীলপুর বাজার। এই হিসেবে যদি ৮টি

Statutory town গড়ে ৪টি করেও বাজার থাকে তাহলে জেলায় বর্তমানে হাট ও বাজারের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে কম করে ২৯৫টি। এর মধ্যে ১৫২টিতে এই হাট বসে প্রধানত সপ্তাহে ২ দিন। ২/১ ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে সপ্তাহে ১ দিন ও সপ্তাহে ৩ দিন বসতে দেখা যায়। গ্রাম অঞ্চলের বাজারের সংখ্যা ১১১টি ও ৮টি Statutory Town এর গড়ে ৪টি করে ধরলেও ৩২টি মোট ১৪৩টি।

নীচে ১নং সারণীতে ১৯৯১ সালের জনগণনার রিপোর্ট মোতাবেক থানা ও মহকুমাভিত্তিক হাট ও বাজারের তালিকা ও ২নং সারণীতে বর্ধমান গেজেটিয়ার ১৯৯৪ এ সংযোজিত হাট-বাজারের তালিকা দেওয়া হল।

সারণী-১

কোন থানায় কত সংখ্যক গ্রামে এই সুবিধা আছে
তার শতকরা হিসাব বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

থানার নাম	মোট গ্রামের সংখ্যা	থানার মধ্যে কয়টি গ্রামে বাজার/হাট আছে তার সংখ্যা
বর্ধমান মহকুমা		
১. বর্ধমান	১৪৮	১৩ (৮.৭৮ শতাংশ গ্রাম)
২. আউসগ্রাম	১৫৯	১৭ (৯.৮৮ শতাংশ গ্রাম)
৩. ভাতার	১০৪	১১ (১০.৫৮ শতাংশ গ্রাম)
৪. মেমারি	২১৭	১৯ (৮.৮৫ শতাংশ গ্রাম)
৫. জামালপুর	১২১	৮ (৬.৬১ শতাংশ গ্রাম)
৬. রায়না	১৯৭	২১ (১১.৫৫ শতাংশ গ্রাম)
৭. খণ্ডঘোষ	১০৬	১৫ (১৪.১৫ শতাংশ গ্রাম)
৮. গলসী	১৫৯	১২ (৭.৫০ শতাংশ গ্রাম)
মোট	১২১১	১১৬ (৯.৭৪শতাংশ গ্রাম)
কালনা মহকুমা		
৯. পূর্বস্থালী	১৮৪	২৮ (১৫.৩৪ শতাংশ গ্রাম)
১০. কালনা	২১১	১৮ (৮.৬৮ শতাংশ গ্রাম)
১১. মন্তেশ্বর	১৩৬	১৩ (৯.৫৬ শতাংশ গ্রাম)
মোট	৫৩১	৫৯ (১১.১৯ শতাংশ গ্রাম)

থানার নাম	মোট গ্রামের সংখ্যা	থানার মধ্যে কয়টি গ্রামে বাজার/হাট আছে তার সংখ্যা
কাটোয়া মহকুমা		
১২. মঙ্গলকোট	১২৮	৩২ (২৫.০০ শতাংশ গ্রাম)
১৩. কেতুগ্রাম	১১৭	১৫ (১২.৮ শতাংশ গ্রাম)
১৪. কাটোয়া	১২৫	১১ (৮.৭৯ শতাংশ গ্রাম)
মোট	৩৭০	৫৮ (১৫.৫৩ শতাংশ গ্রাম)
দুর্গাপুর মহকুমা		
১৫. ফরিদপুর	৫০	৩ (৬.০০ শতাংশ গ্রাম)
		(শহরাঞ্চল ও নোটিফায়েড এলাকা বাদে)
১৬. কাঁকসা	৮৪	১৩ (১৫.৪৮) ,,
১৭. অণ্ডাল	৩২	১ (৩.১৩) ,,
মোট	১৬৬	১৭ (৮.২০) ,,
আসানসোল মহকুমা		
১৮. সালানপুর	৬৫	৬ (৯.২৩)
		(শহরাঞ্চলে বাদে)
১৯. বরাবাণি	৫০	৩ (৬.০০) ,,
২০. রাণীগঞ্জ	১৬	০ (০০) ,,
		(শহরাঞ্চল ও নোটিফায়েড এলাকা বাদে)
২১. আসানসোল	২৪	১ (৪.১৭) ,,
২২. জামুরিয়া	৫৫	৩ (৫.৫৫) ,,
মোট	২১০	১৩ (৪.৯৯)
জেলায় মোট	২৪৮৮	২৬৩ (১০.৫৭)

নিম্নে সারণী ও বর্ধমান গেজেটিয়ারে (১৯৯৪) সংযোজিত হাট ও বাজারের তালিকা।

সারণী-২

'A' CLASS MARKETS OF BARDHAMAN DISTRICT

Name of market	Year of starting	Days of sitting	Police Station	Principal Agricultural commodittics dealt with	Mainly wholesale or retail	Daily average attendance
1. Memari	1906	Daily	Meman	Paddy, Pulses, Potato, Vegetables, Jute & Onion	Wholesale & Retail	650
2. Raniganj	1806	,,	Ranigang	Spices, Pulses, Potato, Rice, Vegetables, Fish, Meat and Eggs, Rice, Paddy	,, ,,	5,000 to 6000
3. Asansol Munshibazar	1900	,,	Asansol	Spices, Vegetables, Potato, Pulses, Fish, Meat, Eggs & Fruits	,,	8.000 to12,000
4. Nadanghat	1850	Sunday & Wednesday	Purbsthali	Paddy, Rice, Vegetables, Potato, Pulses, Spices, Gur, Fish	,,	1,500 to 2,000
5. Kalna	1850	Daily	Kalna	Rice, Paddy, Potato, Vegetable, Spices, Jute, Paddy-straw	,,	1,000 to 1,500
6. Katoya	1896	Daily Except Sun.	Katoya	Jute, Rice, Pulses, Paddy-straw, Cane Gur	,,	700
7. Bardhaman Barabazar	1820	Daily	Bardhaman	Rice, Pulses, Vegetables, Fish, Gur, Oil-cakes, Meat	,,	6.000

Contd.

'B' CLASS MARKETS OF BARDHAMAN DISTRICT

Name of market	Year of starting	Days of sitting	Police Station	Principal Agricultural commodittíes dealt with	Mainly wholesale or retail	Daily average attendance
8. Raniganj Market	1922	Daily	Barddhaman	Potato, Rice, Vegetable, Fish, Meat	Wholesale-cum-retail	1,000
9. Daluibazar hat	1880	Mon. & Fri	Memari	Potato, Vegetable, Onion, Pulses, Rice, Mustard oil, Water-melon	"	250 to 700
10. Barakar market & hat	1920	Bazar–Daily Hat–Wed. Saturday	Kulti	Mutard oil-cake, Spices, Mustard oil, Pulses, Gur, Potato, Gram, Onion, Vegetables, Meat, Fish, Eggs, Rice & Paddy	"	2,000 to 2,500
11. Niamatpur Market	1890	Daily	"	Rice, Spices, Gur, Mustard oil, Mustard oil-cakes, Pulses, Potato, Vegetables, Meat, Fish, Eggs, Onion, Gram	"	1,000 to 1,500
12. Jamuria Market & hat	1920	Bazar–Daily Hat–Sun & Thursday	Jamuria	Vegetables, Rice, Onion, Mustard oil-cakes, Gur, Mustard oil, Pulses, Spices, Gram, Potato, Fish, Meat, Eggs		3,000 to 6,000
13. Panagar Bazar	1900	Daily	Kanksa	Paddy, Gur, Mustard, Rice, Potato, Onion, Spices, Pulses, Gram, Vegetable, Meat and Fish	"	500 to 600
14. Domohani hat	1930	Wed. & Sat	Barabani	Rice, Pulses, Spices, Vegetables, Sheep, Goats and Poultry etc	"	1,000 to 2,000
15. Pachandi hat	1754	Thus. only	Ketugram	Potato, Vegebales, Cows, Buffaloes of all kinds, Sheep and Goats	Retail	6,000 to 8,000
16. Nibhuji Bazar	1878	Daily	Kalna	Paddy, Rice, Pulses, Jute, Paddy-straw, Vegetables, Potato, Fish, Meat and Groceries	"	450 to 750

Contd.

Name of market	Year of starting	Days of sitting	Police Station	Principal Agricultural commodittics dealt with	Mainly wholesale or retail	Daily average attendance
17. Manteswar hat	1930	Monday & Thursday	Manteswar	Gram, Vegetables, Jute, Potato, Onion, Potato, Onion & Fish	”	200 to 250
18. Purbasthali markt.	1927	Daily	Purbasthali	Rice & Vegetables	100	
19. Sure-Kalna daily market	1925	Daily	Jamalpur	Potato, Vegetables, Rice, Fish & Molasses	”	300
20. Raniganj (New) (Burdwan Town)	1938	Daily	Bardhaman	Vegetables, Fish, Rice, Potato, Meat & fruit	Wholesale-cum-retail	700
21. Tetul tala	1945	Daily	Bardhaman	Vegetables, Fish, Rice & Potato	Retail	1,000
22. Saktigarh	1936	”	”	Rice, Fish, Milk, Vegetables & Potato	Wholesale-cum-retail	300
23. Hat Gobindapur	1924	Mon.-Thurs.	”	Vegetables, Fruits, Potato, Fish & Eggs	Retail	600
24. Satgachhia	1931	Wed. &Tues.	Memari	Fish, Vegetables, Oils, Oil-cakes, Salt, Coal, Spices & Potato	”	350
25. Ajhapur	1932	Sat. & Tues	Jamalpur	Vegetables, Rice, Potato, Molasses & Fish	”	300
26. Jamalpur	1918	”	Jamalpur	Veg., Rice, Potato, Molasses & Fish	”	500
27. Sehara Bazar	1922	Daily	Raina	Paddy, Rice, Vegetables, Fish, Milk & Potato	”	1,000
28. Ausgram	1923	Sun. & Thus.	Ausgram	Vegetables, Rice, Fish & Potato	”	200
29. Mankar hat	1918	”	Galsi	Paddy, Rice, Vegetables, Fish & Eggs	Wholesale-cum-retail	1,800
30. Galsi	1917	”	”	Paddy, Rice, Vegetables, Fish & Eggs	”	1,500
31. Satidanga cattle market	1935	Sunday	”	Cattle only	”	300
32. Bhanra hat	1938	”	Barabani	Rice, Pulses, Vegetables, Potato, Onion, Eggs, etc.	Retail	600

Contd.

Name of market	Year of starting	Days of sitting	Police Station	Principal Agricultural commoditties dealt with	Mainly wholesale or retail	Daily average attendance
33. Andal market	1938	Daily	Andal	Rice, Pulses, Spices, Vegetables, Fruits, Eggs, Meat, Gur, etc.	"	1,000
34. Agradwip hat	1950	Monday	Katoya	Vegetables	"	"
35. Natunhat	1852	Fri. & Mon.	Mangalkot	Cattle, Paddy, Gur & Vegetables	Wholesale-cum-retail	800 to 1,000
36. Dainhat	1901	Fri & Tues.	Katoya	Jute, Paddy, Potato, Vege. & Pulses	"	1,500
37. Madhabitala	1900	Daily	"	Vegetables	Retail	100 to 200
38. Srikhanda	1751	Sun. & Thus	"	Potato & Vegetables	"	200 to 400
39. Jamalpur cattle market	1945	Sunday	Purbsthali	Cattle, Rice, Vegetables, etc.	Wholesale & Retail	5,000 to 7,000
40. Burnpur hat	1936	Sun, Tues, Wed, & Fri	Asansol	Rice, Pulses, Potato, Spices, Vegetables, Eggs, Meat, etc.	Retail	1,500
41. Ichhapur Cattle hat	1952	Tues. & Sat.	Memari	Cow, Buffalo, Vegetables & Pulses	Wholesale & Retail	100 to 250
42. Amadpur market	1899	Daily	"	Potato, Vegetables, Pulses, Coconut oil, Gur, Spices & Eggs	Retail	100 to 150

'C' CLASS MARKETS OF BARDHAMAN DISTRICT

Name of market	Year of starting	Days of sitting	Police Station	Principal Agricultural commoditties dealt with	Mainly wholesale or retail	Daily average attendance
43 Jamuria hat	1909	Sun. & Turs.	Salanpur	Rice, Paddy, Pulses, Potato, Onion. Vegetables & Gur	Retail	500 to 800
44. Gopalpur hat	1937	"	Kanksa	Vegetables, Potato, Onion, Pulses, Rice, Chhana, Ghee, Mango & Eggs	"	300 to 500
45. Churulia hat	1927	"	Jamuria	Potato, Vegetables, Rice, Gur, Onion		
46. Purulia hat	1892	Sun. & Thus. Bazar–Daily	Barabani	Rice, Vegetables Gur, Mustard-cake, Chira, Mustard oil, Pulses, Potato, Fruits, Gram, Paddy, Onion, Tobacco & Eggs.	"	500 to 1,000

Contd

Name of market	Year of starting	Days of sitting	Police Station	Principal Agricultural commodittics dealt with	Mainly wholesale or retail	Daily average attendance
47. Rajbhandh hat	1932	Mon. & Fri.	Kanksa	Vegetables, Rice, Potato, Gur, Onion & Pulses	"	200 to 500
48. Bhunara hat	1937	Sunday	Barabani	Vegetables, Potato, Onion, Gur, Mustard-cake, Pulses, Eggs, Meat & Mustard-oil	"	200 to 500
49. Chobka hat	1900	Tues. & Sat	Kulti	Vegetables, Rice, Potato, Onion, Spices, & Pulses	Retail	2,000 to 3,000
50. Haripur hat	1830	Sun. & Thus.	Andal	Vegetables, Potato, Onion, Rice, Fish, Meat & Eggs	"	1,000 to 1,500
51. Sanctoria hat	1893	"	Kulti	Vegetables, Rice, Gur, Potato, Mustard, Spices, Onion, Fish, Meat, Eggs & Mustard Oil	"	800 to 1,200
52. Sripur hat	1933	Sun. & Thus.	Jamuria	Vegetables, Chhatu, Mustard, Rice, Gur, Potato, Mustard oil, Gram, Pulses, Spices, Onion, Fish, Meat & Eggs	Retail	1,500 to 3,000
53. Kenda hat	1948	Tues. & Fri.	"	"	"	700 to 1,000
54. Pandaveswar hat	1900	Mon. & Fri.	Andal	"	"	800 to 1,200
55. Radhanagar hat	1910	Sun. & Wed.	Kulti	"	"	2,000 to 4,000
56. Ukhra hat	1900	Tues. & Sat.	Andal	"	"	1,000 to 2,000
57. J. K. Nagar hat	1945	Sun, Wed & Tuesday	Raniganj	"	"	2,000 to 4,000
58. Kendua hat and market	1900	Sun, Fri & Tuesday	Kulti	Vegetables, Chhatu, Mustard, Rice, Gur, Potato, Mustard oil, Gram, Pulses, Spices, Onion, Fish, Meat & Eggs	Retail	2,000 to 4,000

Contd.

Name of market	Year of starting	Days of sitting	Police Station	Principal Agricultural commodities dealt with	Mainly wholesale or retail	Daily average attendance
59 Durgapur hat and market	1900	Wed & Sun market daily	Faridpur	Vegetables, Chhatu, Mustard, Rice, Gur, Potato, Mustard oil, Gram, Pulses, Spices, Onion, Fish, Meat & Eggs	"	2,000 to 3,000
60 Lalganj hat (Cattle hat)	1900	Tuesday	Barabani	Dry cattle, Milch cattle, Beef-cattle & Buffaloes	"	5,00 to 1,000
61 Simuldhawara hat	1942	Mon, Turs, Wed & Sat	Kulti	Rice, Vegetables, Potato, Onion Fish, & Eggs	"	7,00 to 1,000
62 Kanksa hat	1920	Sun & Thurs	Kanksa	Vegetables, Potato, Onion, Rice, Paddy, Pulses, Mustard, Mustard oil, Gram, Spices, Fish & Eggs	Retail	1,500to 2,500
63 Baharan hat	1939	Wed & Sun	Ketugram	Potato, Vegetables & Onion	"	100 to 250
64 Nirol hat	1903	Mon & Fri	"	Potato & Vegetables	"	150 to 200
65 Gangatikuri hat	1925	Wed & Sat	"	Potato, Brinjal & Kachu	"	100 to 150
66 Gopalpur hat	1800	Tues & Sat	"	"	"	50 to 100
67 Kandra hat	1917	Wed & Sun	"	Potato, Vegetables, Onion & Eggs	"	300 to 500
68 Mangram hat	1906	"	"	Potato & Vegetables	"	150 to 300
69 Ankhona hat	1893	Fri & Mon	"	Potato, Vegetables, Onion & Eggs	"	200
70 Rajoor hat	1929	"	"	Potato, Brinjal, Kachu, Vegetables & fish		75 to 150
71 Kaichar hat	1908	Sun	Mangalkote	Cattle, Potato, Kachu, Onion, & Khero	"	500 to 800
72 Dhatrigram hat	1750	Mon, Wed, & Saturday	Kalna	Potato, Onion, Vegetables, Pulses, Rice & Fish	Wholesale-retail	1 000 to 1,500
73 Poler hat	1912	Tues & Sat	Purbasthali	Rice, Onion, Vegetables, Jute, Pulses & Fish		200 to 300
74 Patuli market	1893	Daily	"	Jute, Whole pulses, Gur, Vegetables, Rice, Paddy, Fish & Potato	"	400 to 500

Contd

Name of market	Year of starting	Days of sitting	Police Station	Principal Agricultural commoditties dealt with	Mainly wholesale or retail	Daily average attendance
75 Sibtala market	1950	Daily	,,	Paddy, Rice, Jute, Potato, Onion, Vegetables, Pulses & Paddy-straw	,,	200 to 400
76 Kusumgram hat	1900	Mon & Tues Sat –cattle market only	Manteswar	Vegetables, Milch cow, Milch buffalo, Dry Cattle, Bullock, Buffalo	Wholesale & Retail	200
77 Bibir hat	1914	Mon & Thus	Purbasthali	Paddy, Rice, Jute, Potato, Vegetables, Fish & Whole pulses	Wholesale & retail	700 to 800
78 Kasthasali market	1915	Daily, except Mon & Fri	,,	Paddy, Rice, Vegetables & Fish	,,	300
79 Beler hat	1877	Mon & Thus	,,	Rice, Paddy, Jute, Pulses, Potato, Vegetables & Fish	,,	600 to 1,000
80 Chupi hat	1922	Mon & Fri	,,	Rice, Paddy, Potato, Vegetables, Whole pulses & Fish	,,	500 to 600
81 Nadaihati hat	1902	Thus & Fri	Kalna	Potato, Onion, Vegetables, Fish & Rice	,,	200 to 330
82 Lakshmipur hat	1853	Sun Fir &	Purbasthali	Rice, Vegetables, Fish, Jute, Pulses, Potato, Onion & Garlic	,,	200 to 300
83 Bagnapara market	1910	Daily	Kalna	Rice, Paddy, Fish & Vegetables	,,	200
84 Ichhapur hat	1952	Tues & Fri	Memari	Cow, Buffalo & Vegetables	Wholesale & Retail	100 to 250
85 Bhatar market	1802	Daily	Bhatar	Paddy, Rice, Pulses, Gur, Eggs, Mustard oil, Mustard oilcake & Fish	,,	150 to 250
86 Chauberia hat	1890	Sun & Thus	Jamalpur	Vegetables, Onion, Potato, Sweet Potato, Fish & Meat	,,	400
87 Sadipur hat	1896	Wed & Sat	Jamalpur	Potato & Vegetables	Wholesale & Retail	25
88 Paratal hat	1853	Mon & Fri	,,	Potato, Vegetables & Fruits	,,	150

Contd

Name of market	Year of starting	Days of sitting	Police Station	Principal Agricultural commoditties dealt with	Mainly wholesale or retail	Daily average attendance
89 Atpara hat	1751	"	"	Potato, Brinjal, Karala, Rice, & Veges	Wholesale & Retail	200
90 Gonpur	1932	Tues & Sat	Bardhaman	Vegetables and Potato, Fish	"	300
91 Borsul	1934	Sun & Wed	"	Rice, Fish, Milk, Veges , Potato & Meat	"	600
92 Mandalkona	1926	Mon & Thus	Memari	Vegetables, Fish & Potato	"	250
93 Bohar	1937	Wed & Sun	"	Fish Vegetables & Potato	"	300
94 Palsit	1947	Tues & Sat	"	Fish, Vegetables & Potato	"	200
95 Kuchut	1942	"	"	"	"	200
96 Bijur	1925	Mon & Fri	"	"	.	200
97 Sridharpur	1932	Thus & Sat	"	"	"	150
98 Debipur Station	1941	Daily	"	"	"	150
99 Jaugram Station	1940	Sat & Tues	Jamalpur	Vegetables, Rice, Potato, Molasses, Fish	"	400
100 Sahajpur	1924	Mon & Fri	Raina	Potato, Vegetables, Rice & Fish	"	200
101 Chhota Bainan	1935	Sun & Wed	"	"	"	200
102 Pasand	1923	Mon & Thus	"	.	.	200
103 Barati	1929	"	"	"	"	300
104 Chak Chandan	1928	Sun & Wed	"	"	.	300
105 Palasan	1926	Fri & Mon	Raina	"	.	300
106 Aharbelma (Shyam Sundar)	1952	Sun & Thus	"	"	.	200
107 Eklakshmi	1935	"	"	.	"	300
108 Kaithi	1927	Sat & Wed	"	"	.	350

Contd

Name of market	Year of starting	Days of sitting	Police Station	Principal Agricultural commoditties dealt with	Mainly wholesale or retail	Daily average attendance
109. Sahebaganj hat	1929	Daily	Bhatar	Potato, Vegetables. Rice & Fish	Wholesale & Retail	350
110. Orgram hat	1932	Mon. & Fri.	Bhatar	"	Retail	260
111. Bamunara hat	1934	Thus. & Sun.	"	"	"	200
112. Mahata hat	1937	Wed. & Sat.	"	"	"	250
113. Barabelun	1940	Daily	"	"	"	250
114. Karjana hat	1935	"	"	"	"	200
115. Silakot hat	1937	Sun. & Wed.	"	"	"	200
116. Kamarpara	1929	Daily	"	"	"	200
117. Bhatar	1926	"	Bhatar	Potato, Vegetabless, Pan, Fish & Meat	"	500
118. Belenda hat	1952	Wed. & Sun.	"	"	"	500
119. Nityanandapur	1938	Mon. & Fri.	"	"	"	200
120. Dignagar	1928	Sat. & Wed.	Ausgram	"	"	400
121. Bhedia hat	1930	Mon. & Fri.	"	Potato, Vegetables, Rice and Fish	"	400
122. Billagram	1932	Wed & Sat.	"	Rice, Pulses. Vegetables, Potato, Onion & Eggs	"	350
123. Bahanura hat	1938	Sunday	Barbani	"	"	600
124. Sidhuli hat	1930	Mon. & Fri.	Andal	Rice, Pulses & Potato	"	350
125. Hijalgora	1943	Sun, Tues, Thus, Fri.	Jamuria	Rice, Pulses, Gur, Mustard oil,Spices, Vegetables, Potato and Eggs	"	1,500
126.Kajora market	1939	Daily	Andal	Rice, Vegetables, Spices, Eggs& etc.	"	500
127.Bahula hat	1948	Mon. & Fri.	"	Rice, Vegetables, Potato, Pulses, Eggs & Fish	"	400
128.Ayodhya hat	1940	"	"	Rice, Pulses, Potato,and Vegetables	"	300

Contd.

Name of market	Year of starting	Days of sitting	Police Station	Principal Agricultural commoditties dealt with	Mainly wholesale or retail	Daily average attendance
129. Singi hat	1920	Wed. & Sat.	Katoya	Potato, Onion & Vegetables	"	200 to 300
130. Panchberia	1901	Tues & Fri	"	"	"	200 to 400
131 Dinabandhu hat	1952	Daily	"	Vegetables & Fish	"	300 to 500
132. Gidhgram	1901	Mon & Fri.	"	Potato, Onion, Vegetables & Fish	"	150 to 300
133. Khajurdihi hat	1901	Mon & Thus	"	Vegetables, Fish	"	100
134. Nigon hat	1922	Tues & Sat.	Mangalkote	Paddy, Rice, Vegetables, Potato & Fish	"	300 to 500
135. Shyambazar hat	1850	Mon & Fri.	"	Potato & Vegetables	"	400
136 Ketugram	1926	Tues & Sat.	Ketugram	Potato, Vegetables, Eggs & Cattle	"	200 to 300
137. Srigopalpur hat	1950	Tuesday	"	Cattle & Vegetables	"	800 to 1,500
138. Sribati hat	1890	Wed & Sat	Katoya	Potato, Onion & Vegetables	"	150 to 300
139. Kaithan	1894	"	"	Potato & Vegetables	"	500
140. Mangalkote	1900	Daily	Mangalkote	Potato & Vegetables, Fish	"	200 to 300
141. Bairangyatola	1821	Tues & Sun.	"	"	"	150 to 200
142. Dadhia Bairagyatola	1806	Tues. & Sat.	Ketugram	"	"	300 to 400
143. Kumarpur hat	1922	Mon & Fri	"	"	"	150 to 200
144. Chakta hat	1947	Tues & Fri	"	"	"	100 to 200
145. Bagnapara	1910	Daily	Kalna	Potato, Vegetables & Fish	"	200
146. Singerkon	1910	Mon. Thus.	Kalna	Paddy, Rice, Vegetables & Potato	Retail	200 to 300
147. Satgachia	1950	Daily	"	Rice, Vegetables and Grocery	"	200 to 300
148. Poler hat	1912	Tues & Sat.	Purbasthali	Rice, Vegetables, Potato and Jute	"	300 to 500

Contd

Name of market	Year of starting	Days of sitting	Police Station	Principal Agricultural commodittіes dealt with	Mainly wholesale or retail	Daily average attendance
149 Patuli Bazar	1893	Daily	Purbasthali	Jute, Whole Pulses, Rice, Vegetables, Paddy & Gur	Retail	500 to 800
150 Mestalla hat	1920	Wed & Sat	"	Potato & Vegetables	"	100
151 Putsuri	1900	Tues Sat	Monteswar	Potato, Vegetables Onion & Fish	"	300 to 500
152 Raigram	1850	"	Kalna	"	"	150 to 200
153 Belerhatpur	1854	Daily	"	Rice, Vegetables & Fish	"	200
154 Bhaturia	1923	Sun & Wed	Purbasthali	Paddy, Rice, Potato, Vegetables Pulses & Jute	"	800
155 Dogachhia	1912	Mon & Fri	"	Paddy, Rice & Vegetables	"	300
156 Belerhat	1860	Sun & Thus	Kalna	Potato, Onion & Vegetables	"	200
157 Rautgram	1852	Wed & Sun	Monteswar	Vegetables & Potato	"	200
158 Maldanga	1915	Mon & Thus	"	Paddy, Rice, Potato, Veges, Kachu, Fish	"	1,200
159 Kulingram	1923	Mon & Fri	Jamalpur	Vegetables, Rice, Potato, Molasses & Fish	"	500
160 Nabagram	1938	Wed & Sat	"	"	"	300
161 Sankari	1919	Tues & Sat	Khanda-ghosh	Vegetables, Rice, Fish & Potato	"	500
162 Khandaghosh	1917	Wed & Sat	Khanda-ghosh	Vegetables, Rice, Fish & Potato	"	500
163 Waripati	1923	Tues & Sat	"	"	"	300
164 Bowaichandi	1926	"	"	"	"	1,000
165 Ukrid Shibtala	1932	"	"	"	"	200
166 Jubila Sibtola	1931	Mon & Fri	"	"	"	200

Contd

Name of market	Year of starting	Days of sitting	Police Station	Principal Agricultural commodities dealt with	Mainly wholesale or retail	Daily average attendance
167 Boro	1920	Mon & Fri	Raina	Vegetables, Rice, Fish & Potato	Retail	300
168 Raina	1918	Wed Sat	"	"	"	700
169 Amarpur	1926	Tues & Sat	Ausgram	"	"	200
170 Ramnagar hat	1929	Mon & Fri	"	"	"	200
171 Khatnagar	1927	Tues & Sun	"	"	"	500
172 Bhuiyara	1934	Mon & Fri	"	"	"	200
173 Ramgopalpur hat	1925	Tues & Sat	Galsi	Vegetables, Potato, Molasses, Pulses, Spices, Eggs & Milk products	"	1 600
174 Kundra hat	1925	Thus & Sun	Andal	Rice, Potato, Vegetables & Eggs	"	400
175 Natundanga hat	1947	Sat, Tues, & Friday	Faridpur	Rice Pulses, Vegetables, Potato, Onion & Gur	"	400
176 Sribati hat	1890	Wed & Sat	Katoya	Potato, Onion, Vegetables & Fish	"	150 to 300
177 Chanditala hat	1907	Mon & Thus	Kalna	Potato, Vegetables Onion & Fish	"	300 to 500
178 Baidyapur	1854	Daily	"	Rice, Vegetables & Fish	"	220

N. B. : The classification of markets into A, B and C is based on the average volume of transaction of the principal commodities as well as average volume of attendance

সারণী-৫
"উচ্চ ফলনশীল ধানবীজের কয়েকটি জাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বিশেষ চাষ-পদ্ধতি

১	২	৩	৪		৫		৬	৭	৮	৯
ক্রম. সংখ্যা	ধানের জাতের নাম	স্থিতিকাল ক) খারিফ মরশুমের জন্য খ) বোরো মরশুমের জন্য (১৫-২০ দিন বেশী)	চারার বয়স-দিন		গোছ থেকে গোছের দূরত্ব (ইঞ্চি)		দৈর্ঘ্য (গড়) (ইঞ্চি)	ধানের আকার	ধানের বৈশিষ্ট্য	গড় ফলন একর প্রতি কুইন্টাল খারিফ মরশুম
			খারিফ	বোরো	খারিফ	বোরো				
১	ললাট (আই. আই. টি ১৯৪৭)	১১৫-১২০ দিন	২৫-৩০	৩৫-৪০	৮-৬	৬-৬	৩৬	লম্বা ও মাঝারি ধান	আই. আর ৩৬-র পরিবর্তে চাষ করা যায়। কিছুটা রোগ / পোকা প্রতিরোধ সক্ষমজাত।	২০-২১ কুইঃ
২	আই. আর. ৩৬ (আই. আই. টি ৪৫৫৫)	১১৫-১২০ দিন	২৫-৩০	৩৫-৪০	৮-৬	৬-৬	৩৬	লম্বা ও সরু দানা ও দানার অগ্রে শুঁয়ো থাকে।	মাঝারি উঁচু জমির উপযোগী। পাশ কাঠির সংখ্যা অধিক। মাজরা, তেঁতু-পোকা ও বাদামী শোষক পোকা ও পাতা ধ্বসা রোগ ও ঝলসা রোগ প্রতিরোধ সক্ষমজাত।	১৯-২০ কুইঃ
৩.	মিনিকীট (আই. আই .টি ৪৭৮৬)	১০০-১০৫ দিন	২০-২৫	৩০-৩৫	৮-৬	৬-৬	৩৬	অত্যন্ত সরু ও লম্বা দানা।	উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে রোপণের উপযোগী জাত। পাশ কাঠির সংখ্যা মাঝারি। অধিক সার প্রয়োগে গাছ পড়ে যায়।	১৬-১৮ কুইঃ
৪.	ক্ষিতীশ (আই. আই. টি ৪০৯৪)	১১০-১১৫ দিন	২০-২৫	৩০-৩৫	৬-৬	৬-৬	৩৬	অত্যন্ত সরু ও লম্বা দানা	মাঝারি উঁচু জমিতে রত্না ধানের পরিবর্তে চাষ করা যায়। রত্না ধানের মত সহজেই ঝরে পড়ে না। অধিক সার প্রয়োগে ধানের শিষে চিটা ধান হয়।	১৮-২০ কুইঃ

১	২	৩	৪		৫		৬	৭	৮	৯
ক্রম. সংখ্যা	ধানের জাতের নাম	স্থিতিকাল ক) খারিফ মরশুমের জন্য খ) বোরো মরশুমের জন্য (১৫-২০ দিন বেশী)	চারার বয়স-দিন		গোছ থেকে গোছের দূরত্ব (ইঞ্চি)		দৈর্ঘ্য (গড়) (ইঞ্চি)	ধানের আকার	ধানের বৈশিষ্ট্য	গড় ফলন একর প্রতি কুইন্টাল খারিফ মরশুম
			খারিফ	বোরো	খারিফ	বোরো				
৫.	অন্নদা (আই. আই. টি ৬২২৩)	৯০-৯৫ দিন	২০-২৫	৩০-৩৫	৮-৬	৬-৬	৩৩	বেঁটে, মোটা দানা।	উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে রোপণের উপযুক্ত। কিছুটা খরা সহনশীল জাত। পাশ কাঠির সংখ্যা বেশী হয়। রোগ / পোকা প্রতিরোধ করতে পারে।	১৮-২০ কুইঃ
৬.	সারথী ও. আর. ৭৯-২১	১০৫-১১০ দিন	২০-২৫	৩০-৩৫	৮-৬	৬-৬	৩৬	বেঁটে, মোটা দানা।	মাঝারি ও উঁচু জমিতে রোপণের উপযুক্ত। অধিক সংখ্যায় পাশ কাঠি ছাড়ে। অধিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে ঝলসা খোলা ধ্বসা রোগের প্রবণতা দেখা যায়।	
৭.	পারিজাত (আই. আই. টি) ২৬৮৪	৯০-৯৫ দিন	২০-২৫	৩০-৩৫	৮-৬	৬-৬	৩৬	মাঝারি, লম্বা, সরু	উঁচু ডাঙ্গা ও মাঝারি উঁচু জমিতে রোপণের উপযোগী। পাশ কাঠিব সংখ্যা বেশী। অধিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে ঝলসার প্রবণতা দেখা যায়।	১৮-২০ কুইঃ
৮.	দয়া (ও. আর ১৩১-১৩-১৩	৯৫-১০০ দিন	২০-২৫	৩০-৩৫	৮-৬	৬-৬	৩৮	মাঝারি, সরু, বেঁটে দানা।	উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে রোপণ-এর উপযোগী। পাশকাঠির সংখ্যা বেশী। ভেঁপু পোকা ও বাদামী শোষক পোকা প্রতিরোধে সক্ষম।	২০-২১ কুইঃ

১	২	৩	৪		৫		৬	৭	৮	৯
ক্রম. সংখ্যা	ধানের জাতের নাম	স্থিতিকাল ক) খারিফ মরশুমের জন্য খ) বোরো মরশুমের জন্য (১৫-২০ দিন বেশী)	চারার বয়স-দিন		গোছ থেকে গোছের দূরত্ব (ইঞ্চি)		দৈর্ঘ্য (গড়) (ইঞ্চি)	ধানের আকার	ধানের বৈশিষ্ট্য	গড় ফলন একর প্রতি কুইন্টাল খারিফ মরশুম
			খারিফ	বোরো	খারিফ	বোরো				
৯.	এম. টি. ইউ ১০০৪	৯৫-১০০ দিন ১২০-১২৫ দিন	১৮-২০	৩৫-৪০	৮-৬	৬-৬	৩৫	সরু ও লম্বা	পারিজাতের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।	১৫-১৮ কুইঃ ২৪-২৬ কুইঃ
১০.	এন. ডি. আর ৯৭ নরেন্দ্র ধান ৯৭	৯৫-১০০ দিন ১২০-১২৫ দিন	১৮-২০	৩৫-৪০	৮-৬	৬-৬	৩৫	সরু ও লম্বা	উঁচু-মাঝারি উঁচু জমির উপযোগী।	১৫-১৮ কুইঃ ২৪-২৬ কুইঃ
১১.	স্বর্ণ মাসুরী (এম. টি. ইউ ৭০২৯)	১৪০-১৪৫ দিন	৩০-৩৫	—	৮-৬	—	৩৬	বেঁটে মোটা দানা বাদামী রঙের খোসাযুক্ত।	মাঝারি নীচু জমির জন্য উপযুক্ত। পাশকাঠি এক সাথে ছাড়ে, সংখ্যায় অধিক হয়। ধান পেকে গেলেও গাছ-এর রঙ সবুজ থেকে যায়। তবে খোলা ধ্বসার প্রবণতা আছে।	২৩-২৫ কুইঃ
১২.	স্বর্ণধান (আই. ই. টি ৫৬৫৬)	১৪৫-১৫০ দিন	৩০-৩৫	—	৮-৬	—	৪৮	বেঁটে-মোটা দানা	নীচু জমির উপযোগী। রোগ/পোকা প্রতিরোধে সক্ষম। বিশেষ করে টুংরো ভাইরাস ও বাদামী শোষক পোকা প্রতিরোধ করতে পারে।	২২-২৪ কুইঃ
১৩.	সবিতা (এন. সি. ৪৯২)	১৬০-১৬৫ দিন	৩৫-৪০	—	৮-৮	—	৬৫	লম্বা-সরু দানা।	নীচু জমির জন্য উপযোগী। পাশ কাঠির সংখ্যা বেশী হয়। ৩০-৪০ ইঞ্চি অব্দি জল সহ্য করতে পারে।	১৬-১৮ কুইঃ

১	২	৩	৪		৫		৬	৭	৮	৯
ক্রম. সংখ্যা	ধানের জাতের নাম	স্থিতিকাল ক) খারিফ মরশুমের জন্য খ) বোরো মরশুমের জন্য (১৫-২০ দিন বেশী)	চারার বয়স-দিন		গোছ থেকে গোছের দূরত্ব (ইঞ্চি)		দৈর্ঘ্য (গড়) (ইঞ্চি)	ধানের আকার	ধানের বৈশিষ্ট্য	গড় ফলন একর প্রতি কুইন্টাল খারিফ মরশুম
			খারিফ	বোরো	খারিফ	বোরো				
১৪.	সাবিত্রী (সি.আর.১০০৯)	১৫৫-১৬০ দিন	৩৫-৪০	—	৮-৮	—	৫৫	বেঁটে-মোটা দানা	নীচু জমিতে রোপণের জন্য উপযোগী। কিছুটা রোগ/পোকা প্রতিরোধ করতে পারে পাশ কাঠির সংখ্যা অধিক।	২২-২৪ খুইঃ
১৫.	(সি.আর.১০১০)	১৫৫-১৬০ দিন	৩৫-৪০	—	৮-৮	—	৫৬	বেঁটে-মোটা দানা	নীচু জমিতে রোয়ার উপযোগী। পাশ কাঠির সংখ্যা ভালো। কিছুটা রোগ/পোকা প্রতিরোধ সক্ষমজাত।	২৩-২৪ কুইঃ
১৬.	(সি.আর. ১০১১)	১৬০-১৬৫ দিন	৩৫-৪০	—	৮-৮	—	৪২	বেঁটে-মোটা দানা	নীচু জমি রোপণের উপযুক্ত ও পাশ কাঠির সংখ্যা অধিক। গাছ সহজে পড়ে যায় না। রোগ / পোকা প্রতিরোধসক্ষম।	২৩-২৪ কুইঃ
১৭.	ধরিত্রী (সি.আর. ১০১৭)	১৫৫-১৬০ দিন	৩৫-৪০	—	৮-৮	—	৫০	বেঁটে-মোটা দানা	নীচু জমির জন্য উপযোগী। পাশ কাঠির সংখ্যা খুব বেশী। কিছুটা রোগ/পোকা প্রতিরোধ সক্ষমজাত।	২২-২৪ কুইঃ
১৮.	গায়ত্রী (সি.আর. ১০১৮)	১৫০-১৫৫ দিন	৩৫-৪০	—	৮-৮	—	৪৪	বেঁটে-মোটা দানা	নীচু জমির জন্য উপযোগী। পাশ কাঠির সংখ্যা খুব বেশী। কিছুটা মাজরা পোকা, ভেঁপু পোকা ও ঝলসা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।	২২-২৪ কুইঃ

১	২	৩	৪		৫		৬	৭	৮	৯
ক্রম. সংখ্যা	ধানের জাতের নাম	স্থিতিকাল ক) খারিফ মরশুমের জন্য খ) বোরো মরশুমের জন্য (১৫-২০ দিন বেশী)	চারার বয়স-দিন		গোছ থেকে গোছের দূরত্ব (ইঞ্চি)		দৈর্ঘ্য (গড়) (ইঞ্চি)	ধানের আকার	ধানের বৈশিষ্ট্য	গড় ফলন একর প্রতি কুইন্টাল খারিফ মরশুম
			খারিফ	বোরো	খারিফ	বোরো				
১৮..	গায়ত্রী (সি.আর. ১০১৮)	১৫০-১৫৫ দিন	৩৫-৪০	—	৮-৮	—	৪৪	বেঁটে-মোটা দানা	নীচু জমির জন্য উপযোগী। পাশ কাঠির সংখ্যা খুব বেশী। কিছুটা মাজরা পোকা, ভেঁপু পোকা ও ঝলসা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।	২২-২৪ কুইঃ
১৯.	উৎকলপ্রভা (সি.আর. ১০৩০)	১৫৫-১৬০ দিন	৩৫-৪০	—	৮-৮	—	৬০	মাঝারি, লম্বা ও সরু দানা।	নীচু জমির উপযোগী। ২০ ইঞ্চি পর্যন্ত দাঁড়ানো জল সহ্য করে। খড় যথেষ্ট শক্ত। সহজে পড়ে না। ঘর ছাউনীর জন্য আদর্শ খড়। অধিক সার প্রয়োগে ধান চিটা মেরে যায়। ফলে ফলন কমে যায়।	২২-২৪ কুইঃ
২০.	শ্যামলী আই.ই.টি ৩৩৫০ (সি.আর. ৯৫২)	১৫০-১৫৫ দিন	৩৫-৪০	—	৮-৮	—	৬০	খুব লম্বা ও সরু দানা। বাদামী রঙ এর খোসা যুক্ত ধান ও চাল সাদা।	নীচু জমির জন্য উপযুক্ত ধান। পাশ কাঠির সংখ্যা মাঝারি। ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত জল সহ্য করতে পারে।	১২-১৪ কুইঃ
২১.	রণজিৎ	১৫০-১৫৫ দিন	২৫-৩০	—	৮-৬	—	৫০	মাঝারি, লম্বা ও মাঝারি সরু।	পাশ কাঠির সংখ্যা প্রচুর। আই.আই.টি. ৫৬৫৬ পঙ্কজ এমনকি এম. টি. ইউ. ৭০২৯-এর বিকল্প ধান।	২০-২১ কুইঃ
২২.	লুনিশ্রী (আই. ই. টি ১০৬৭৮)	১৫৫-১৬০ দিন	৩৫-৪০	—	৮-৮	—	৬৫	খুব লম্বা ও সরু দানা।	নীচু জমিতে রোপণের উপযোগী। পাশকাঠির সংখ্যা ভালো। ১৫-২০ ইঞ্চি জল সহ্য করে এবং উপকূল অঞ্চলের লোনা জলও সহ্য করতে পারে।	১৬-১৮ কুইঃ

সাঁইত্রিশ অধ্যায়



শিল্প

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রানীগঞ্জে কয়লা খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে আসানসোল, রানীগঞ্জ-দুর্গাপুর অঞ্চলে শিল্পোদ্যোগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এছাড়া আশেপাশে মাটিডি ও রনডিহিতে লৌহপিণ্ড, রঘুনাথপুরে চুনাপাথর, কেন্দরার নিকটে উত্তম শ্রেণীর Metallurgical কয়লা ও বরাকর নদী থেকে জল সরবরাহের সম্ভাবনা শিল্পস্থাপনের পরিবেশ তৈরীতে সহায়ক হয়। ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সনে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন আইন পাশ হয়। সেই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন (D.V.C) গঠিত হয়। ডি.ভি.সি দামোদরের জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে।

রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল, নোয়ামুণ্ডি, সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জের খনির লৌহ, মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানিজ, বিসরায় চুনাপাথর, গাংপুরের ডলোমাইট, রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে তাপসহনক্ষম ইট, দামোদরের নদীর জল, ডি.ভি.সির বিদ্যুৎ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুলভ শ্রমিক, জি.টি. রোড ও রেলপথে মাল পরিবহণের সুবিধা, কলিকাতা বন্দরের নৈকট্য আসানসোল, দুর্গাপুর, কুলটি অঞ্চলে শিল্পোদ্যোগের পরিবেশ গড়ে তোলে।

ভারী ও মাঝারি শিল্প : ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫-এর মধ্যে দুর্গাপুরে একের পর এক ভারী ও মাঝারি শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে।

১৯৭০—৭১ সনে এখানে কম করে ২০টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়। প্রাথমিক ভাবে এখানে শিল্প গড়ে তোলার জন্য ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এর ফলে ৬০,০০০ কর্মীর কর্মের সংস্থান হয়।

দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলে প্রধান প্রধান শিল্প-কারখানার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (Durgapur Steel Plant)

২. Durgapur Project Ltd. (D.P.L)

৩. ACC Vickers Bebcock (AVP)। এই কারখানায় সিমেন্ট উৎপাদিত হয় ও নানারকম যন্ত্রপাতি, বয়লার, প্রেসার ভেসলস ইত্যাদিও প্রস্তুত হয়।

৪. Alloy Steel Unit (SAIL)—নানারকমের Alloy Steel উৎপাদিত হয়।

৫. Durgapur Chemicals Ltd.—জৈব ও অজৈব ভারী রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করে।

৬. Durgapur Thermal Power Station (unit of DVC)

৭. Mining and Allied Machinery Corporation (কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ)—উৎপাদন করে কয়লাখনিতে ব্যবহৃত bulk handling equipment ও ভারী যন্ত্রপাতি।

৮. Kulti Iron Works—Pig iron ও Iron casting-এর উৎপাদন করে। PWD-এর দাবী গ্রহণ করে এর নাম হয় The Barakar Iron Works। পরে সরকার ১৮৯৯ সালে কারখানার নতুন নামকরণ করেন, Bengal Iron and Steel Company Ltd. ও 1892-তে R.N. Mukherjee ও Sir Acquin Martin-কে যৌথভাবে লিজ নেন। Sir R.N. Mukherjee ও Acquin Martin যৌথভাবে Managing agents নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কারখানাটি লিকুইডেশানে যায় ও নব গঠিত Indian Iron and Steel Co. Ltd. (IISCO) এর সঙ্গে মিশে যায়।

IISCO (Indian Iron and Steel Co. Ltd) গঠিত হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জঙ্গলমহল অঞ্চলে হীরাপুর, সাতনা, নরসিংবাদ, নপুরিয়া ও ধরমপুর এলাকা জুড়ে Blast furnance স্থাপন করে Pig Iron ও কয়েকটি By products (উপজাত) দ্রব্য উৎপন্ন করতে থাকে।

IISCO ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রেকর্ড উৎপাদন ও লাভ করে। এরপর ১৯৩১-৩৪ সালে অর্থনৈতিক অবমূল্যায়নের (economic depression) যুগে IISCO-তে উৎপাদিত দ্রব্যের বাইরে চাহিদা কমে যায়। তখন ১৯৩৭ সালে গঠিত Steel Corporation of Bengal (SCOB)-এর সঙ্গে যৌথভাবে উৎপাদন শুরু করে।

১৯৫৩ সালে IISCO ও SCOB পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় ও Integrated Burnpur Works নামে পরিচিত হয় ও Pig Iron বিভিন্ন আকারের ইস্পাত তৈরী করতে থাকে। ১৯৫০ ও ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে Burnpur

Works এর দুবার সম্প্রসারণ ঘটান হয় ও ১০ লক্ষ টন Ingot Steel তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ তে ক্রমাগত শ্রমিক অসন্তোষের ফলে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছান সম্ভব হয় নাই।

১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৭০-৭১ পর্যন্ত IISCO-তে Ingot উৎপাদন ও বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের পরিমাণ হাজার টনে নিম্নরূপ ছিল।

	ইনগট	বিক্রয়যোগ্য (ইস্পাত)
১৯৬৬–৬৭	৮৯৭	৭০৯
১৯৬৭–৬৮	৭৯১	৬১৩
১৯৬৮–৬৯	৭৭৭	৬৪০
১৯৬৯–৭০	৭০০	৫৬৮
১৯৭০–৭১	৬২৭	৫০৮

তালিকাটি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন ও বিক্রয় দুই-ই ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

এর ফলে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার IISCO-এর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই সময় পরিচালকবর্গ কারখানাটির আমূল সংস্কার সাধন করে পূর্বের উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রায় পৌছাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

৯. দুর্গাপুর কোল মাইনিং মেশিনারী—১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই শিল্পের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক ব্রিটিশ ও রাশিয়ার বিশেষজ্ঞদের আহ্বান করা হয়। ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞগণ অপেক্ষাকৃত ছোট ইউনিট স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। অবশেষে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার সোভিয়েত রাশিয়ার বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ মত ৩০,০০০ টন মেশিনারী উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন Coal Mining Machinery Plant (CMMP) স্থাপন করেন। এই প্ল্যান্টে ২৭ রকমের কয়লাখনি-শিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি—যেমন Coal mining, Loading, Underground transporting, Ventilating, Dewatering সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, তাছাড়া ১৫০ কেজি ওজনের ছোট ছোট Face pump থেকে রাক্ষুসে আকারের ১৫০ টন ওজনের winding engine-ও তৈরী করা হয়।

খনিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতির ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে C.M.M.P.-এর উৎপাদন ক্ষমতা ৪৫০০০ টন করা হয়। ১৯৬২ সালে C.M.M.P.-এর সম্প্রসারণের জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে ১৭৮.৫৮ কোটি টাকা ঋণ পাওয়া যায়।

C.M.M.P. দুর্গাপুরে ৮৬ একর জায়গা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত। এই কারখানার ৫টি storage buildings ছাড়া ১৫টি প্রধান ও সহায়ক উৎপাদন কেন্দ্র আছে। প্রধান ও সহায়ক উৎপাদন কেন্দ্রটি রাশিয়ার পরিকল্পনা মত ৯৫,৪৭২ বর্গমিটার অর্থাৎ প্রায় ১৭ একর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে। বাকী অংশে আছে প্রশাসনিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিল্ডিং ও ৫টি ডিপো গ্যারেজ। প্রধান প্রধান ইউনিটগুলি হলো Cast Iron Foundry, Steel Foundry, Forge Shop, Structural Shop, Machine ও Assembly Shop. সহায়ক শিল্পের (Ancillary shop) মধ্যে আছে Fitting ও Heat Treatment Shop, Wood Working Shop, Skull Cracker, Scarp Preparation Yard, Oxygen Plant, Boiler House, Compressor House ইত্যাদি।

এই কারখানার জন্য ৪৮টি Travelling Crane, ২৬২টি Conveyors ও Elevators ও ৮০টি Job cranes-এর অধিকাংশই সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এসেছে।

Coal Mining Plant ও রাঁচির অন্য দুটি প্রজেক্ট ১৯৫৯ সালের মে মাসে রাঁচির Heavy Engineering Corporation Ltd.-এ স্থানান্তরিত করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দুর্গাপুরে Mining and Allied Machinery Corporation (MAMC) স্থাপিত হয় ও এর জন্যে ২০ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করা হয় ও CMMPকে ১৯৬৫ সালে ১লা এপ্রিল রাঁচির Heavy Engineering Corporationএ স্থানান্তরিত করা হয়।

১০. **MAMC :** ১৯৬৫ সালের ১লা এপ্রিল ভারত সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৎসরে এর উৎপাদন ক্ষমতা ধরা হয় ৪৫০০০ টন। এই কারখানায় মিশ্র উৎপাদনের (Product Mix) জন্য যেখানে কয়লা যোগানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪৮ থেকে ২০০ মিলিয়ন টন সেখানে কয়লার যোগান আসে ৭৪ মিলিয়ন টন, কাজেই এই কারখানা থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। এই কারখানায় কয়লাখনিতে ব্যবহারের নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ছাড়াও তৈরী হয়। (i) Equipments for bulk handling of raw materials for ports, power station (ii) Casting and forging for railways, (iii) Coal washing plant, (iv) Ore Benefication plant (v) Heavy Duty gear box ও Fluid coupling, (vi) Front-end Loader, (vii) Spare for ropeways, (viii) Forged-neck flanges for steel plants, Fertilizer and chemical industry। MAMCতে দক্ষ ও অদক্ষ এবং প্রশাসনিক স্তরের মোট কর্মী সংখ্যা ৬১৯৯। MAMC-এর পরিচালনায় আছে

৮০ বেডের হাসপাতাল, Blood Bank, সর্বার্থসাধক Co-operative Multipurpose Society, Co-operative Canteen।

এই করপোরেশনের জন্য বিদ্যুৎ আসে Durgapur Project Ltd. থেকে আর কাঁচামাল আসে Durgapur Steel Plant ও Alloy Steel Plant থেকে। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১-৭২ পর্যন্ত এই করপোরেশনে উৎপাদন হয়েছিল নিম্নরূপ :

বৎসর	মোট উৎপাদন (টনে)	উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য (লক্ষ টাকায়)
১৯৬৯–৭০	৫৭৬৪.৪	২৮৩.৯৩
১৯৭০–৭১	৭৭৪২.১	৪৮৭.৯৯
১৯৭১–৭২	১১৯৯০.৭	১০২০.০০

সম্প্রতি ক্রমাগত শ্রমিক অসন্তোষ ও বিশ্বায়নের উপযুক্ত পরিকাঠামোব অভাবে কারখানাটি বন্ধের মুখে।

Durgapur Steel Plant (DSP)—দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা DSP হিন্দুস্তান স্টীল-এর একটি ইউনিট। Sir Eric Coates-এর নেতৃত্বে কলম্বো পরিকল্পনা মিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৫৭ সালে দামোদর নদের তীরে স্থাপিত হয়।

অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ : দামোদরেব জল, কযলাখনির নৈকট্য, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে ও জি. টি. রোডের মাধ্যমে পরিবহনের সুবিধা, কলকাতায় ইস্পাতের বাজার ও ডি.ভি.সি থেকে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্পকারখানা স্থাপনের এই সমস্ত অনুকূল পরিবেশের জন্য এই খানেই Steet Plant খোলার উপযোগী স্থান বলে বিবেচিত হয়।

এই কারখানায় উৎপাদন শুরু ১৯৫৭ থেকে ও ১৯৫৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর থেকে প্রথম Blast Furnace (ধাতু গলাইবার চুল্লী) চালু হয়। ১৯৬০ সালের ২৫শে এপ্রিল থেকে ব্রিটিশ কারিগরি পদ্ধতিতে ইস্পাত পিণ্ড (Steel Ingot) উৎপন্ন হতে থাকে। প্রথমে এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১০ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড তৈরীর, পরে প্রায় সমস্ত unit চালু হয় ও ১৬ লক্ষ টন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়। DSP-এর সমস্ত Share ভারত সরকারের। Hindusthan Steel Ltd.-এর ওপর এর পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত আছে। এখানকার দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৪৮২৬ ও ৩২৩২ (১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর)। দুর্গাপুর স্টীলের কয়লা আসে ঝরিয়া, বরাকর ও দিশেরগড় কোলিয়ারী থেকে। এই কয়লা প্রধানত ইস্পাত তৈরীর জন্য চুল্লী জ্বালাতে প্রয়োজন হয়। তাছাড়া এই কয়লা Blast

Furnace-এর জন্য প্রয়োজনীয় metallurgical coke তৈরীতে লাগে। খনিজ লৌহ (Iron Ore) আসে উড়িষ্যার বোলানী ও বড়'জামদা কোলিয়ারী থেকে আর চুনাপাথর (Lime Stone) আসে উড়িষ্যার বীরমিত্রপুর, বিহারের আড়গাদা ও মধ্যপ্রদেশের সাতনা থেকে আর ডলোমাইট আসে বীরমিত্রপুর ও জয়ন্তী অঞ্চল থেকে। এই Plant এ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে দৈনিক প্রয়োজন হয় ১৫০০০ টন কাঁচা মাল। Steel Plant-এর নিজস্ব ধৌতাগার বা Washery আছে। জল আসে দামোদর থেকে আর DVC বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।

Steel Plant-এর সঙ্গে একটি সুসজ্জিত গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণ বীক্ষণাগার (Research and Control Laboratory) আছে। এর তিনটি শাখায় Metallurgical, Chemical ও Inspection-এ Steel Plant-এর উৎপাদনের গুণগত মান উন্নয়ন বজায় রাখার জন্য পরীক্ষানিরীক্ষা চালান হয়।

এই Plant-এ ৮ টন ওজনের পিন্ডের আকারে ইস্পাত তৈরী হয়। Rolling Mill-এ ইস্পাতপিণ্ডকে বারবার আবর্তন (Roll) করিয়ে পাত তৈরী হয়। এছাড়া রেলের জন্য B. G. Sleepers ও Wheel Set; ও উপজাত দ্রব্য আলকাতরা Bitumen তৈরী হয়। লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য যেমন—Crossing Sleepers, heavy Structurals, medium and light structurals, track materials, rods in coils, wheels, wales, plate, Sheets, Strips, tin plate, Electricity-resistance welded pipes উৎপন্ন হয়।

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত এই Plant থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের বিক্রয়জাত মূল্যের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

(১০ লক্ষ টাকা অঙ্কে)

উৎপন্ন দ্রব্য	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০
Pig iron	৯৮.৭	৬৯.২	৯৪.৬	১৩৫.৪	১৫৭.০
Ingots	১.৭	—	—	১২.০	৬০.৭
Semis	১২৪.৮	৯৮.২	৯৯.৩	১০১.৬	৯০.৬
Finished Steel	৩৮৪.২	৩০৩.৫	২৭৫.৯	৩৫০.১	৩৪৮.৭
Scrap & de-	২৪.৯	১৮.৬	১৬.৪	২২.৬	৬৪.৭
fective Coke	৫.৪	১.৭	১.৭	২.৭	৯.৬
By Products	৮.৪	৮.৪	৯.২	২১.০	২৩.৪
মোট	৬৪৮.১	৪৯৯.৬	৪৯৭.১	৬৪৫.৪	৭৫৪.৭

১২) **Alloy Steel Plant :** (মিশ্র ইস্পাত তৈরীর কারখানা)—প্রথম দিকে ৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ১৯৬৫ সালে Alloy Steel Plant স্থাপিত হয়। এখানে কার্বন, এলয়, ইঞ্জিনিয়ারীং শিল্পে প্রয়োজনীয় বিশেষ গুণমানের ইস্পাত ও মিশ্র ইস্পাত তৈরী হয়। বর্তমানে কিছু কিছু Stainless Steel-ও তৈরী হচ্ছে।

Alloy Plant আসে জাপান থেকে ও কারিগরী দক্ষতা ও know-how আসে কানাডার কারখানা থেকে। নিম্নে সারণী থেকে এখানকার Plant-এর বিভিন্ন মিলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ সম্বন্ধে জানা যাবে।

সারণী-১

বিভিন্ন মিলে উৎপাদন	১৯৬৫-৬৬ টন	১৯৬৬-৬৭ টন	১৯৬৭-৬৮ টন	১৯৬৮-৬৯ টন	১৯৬৯-৭০ টন
Steel Ingots					
S.M.S I	–	–	৩৩৫০	২৭৯১৪	৫১৭০৯
S.M.S II	১১৫৩৯	১২২৫২	১০৪৮২	১১৮৪৫	১৩৯০৬
সর্বমোট	১১৫৩৯	১২২৫২	১৩৮৩২	৩৯৭৫৯	৬৫৬১৫
উৎপাদিত উৎপাদন (Finished Products)					
Forge Shop	১২০	২৩৭৪	২৭১৮	১৫১৭	৫০২৪
Bar Mill	–	২০	৩২৭৫	৯২২৯	১৭১৮৫
Billet Mill	–	–	৫৮২	৯৮৩৭	১৫২০৪
Sheet Mill	–	–	–	৮২৯	৩৭২৩
Total	১২০	২৩৯৪	৬৫৭৫	২৩৪১২	৪১১৩৬

সারণী-২

গুণগত মান অনুযায়ী রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ (১৯৬৯—৭০)

গুণগত মান	Ingot (ইস্পাত পিণ্ড) টন	Rolled (বোলার) টন	Forged (পেটা) টন	Steels (পাত) টন	Total মোট টন
Carbon Construction Steel	–	১০৬৪৩	২০৩৬	১৩২৫	১৪০০৪
Alloy Construction Steel	২১৪৭	৯৫৭৫	৯৭৩	৪৭৮	১৩১৭৩
Case Hardening Steel	–	৭৩৫১	৩৭৩	১২৫	৭৮৪৯
Nitriding Steel	–	৮৮	৭২	–	১৬০
Ball bearing Steel	–	৭২	১৫	–	৮৭
Spring Steel	–	৭৪৫	৭	–	৭৫২
Valve Steel	–	৩৯	–	–	৩৯
Carbon Tool Steel	–	২২৪	৫	–	২২৯
Die Block Steel	–	–	২৭৬	–	২৭৬
Shock resisting Steel	–	–	৭৮	–	৭৮
Hot work Tool Steel		২	৬৮	–	৭০
Cold work Tool Steel		৭	৩৯	–	৪৬
High Speed Steel	–	২৩	৪৩	–	৬৬
Stainless Steel	–	৬	৬৫	৩৩৬	৪০৭
Others	–	১২৩	–	–	১২৩
সর্ব মোট	২১৪৭	২৮৮৯৮	৪০৫০	২২৬৪	৩৭৩৫৯

(Source Sales Statistics 1969-70 H. S. Ltd. 1970)

১৩. Durgapur Fertilizer Project : পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সার উৎপাদন কেন্দ্র। প্রায় ১০০০ একর জুড়ে ৪৮ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করে এই Projectটি দুর্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি পশ্চিবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ, সরকার অবশ্য নিজ পরিচালনাধীনে না রেখে projectটিকে Fertilizer Corporation of India-কে নামমাত্র খাজনায় লিজ দিয়েছেন। এই প্রজেক্টের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১,৪০,০০০ টন নাইট্রোজেন সার সমন্বিত ৩,০৫,০০০ টন ইউরিয়া রাসায়নিক সার। এই উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল ন্যাপথা ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন-এর বারউনি থেকে পাইপ লাইনের মধ্য দিয়ে সরবরাহ হয়। শতকরা ৪৬ ভাগ নাইট্রোজেন সমন্বিত ইউরিয়া সার ধান, পাট ও চা চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। এই কারখানা ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের পরিকল্পনা মতো তৈরী হয়েছে। বিদেশী সহযোগিতার বিশেষ ভরসা করা হয় নাই। এই project-এর সহায়ক শিল্প হিসাবে Carbon dioxide bottling plant, Polythene-lined bag manufacturing ও Chemical Industries গড়ে উঠেছে। কৃষিকার্যের জন্য ইউরিয়া উৎপাদন ছাড়াও এই কারখানা থেকে রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী ১৫০০০ টন অতি উন্নত মানের ইউরিয়ার উৎপাদন হয়। এই কারখানার সঙ্গে গড়ে উঠেছে পরীক্ষামূলক খামারবাড়ী (Experimental Farm); এই গবেষণাগারে বিভিন্ন পরিমাণে ইউরিয়া ব্যবহারের দ্বারা ফলনের তারতম্য পরীক্ষা করা হয়। চাষীদের মাটি পরীক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

১৪. দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড (DPL) : এটি একটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ। দুর্গাপুরে ১৫০০ একর জুড়ে এই Project-এর অন্তর্গত সুসংবদ্ধভাবে নিম্নলিখিত কারখানাগুলি গড়ে উঠেছে।

ক. কোক ওভেন প্ল্যান্ট ও এর সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে আলকাতরা নিষ্কাষণ প্ল্যান্ট। খ. তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Thermal Power Station), গ. কলকাতায় শিল্প ও গৃহস্থালিতে গ্যাস সরবরাহের জন্য Gas Grid, ঘ. নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ও শিল্পে সর্বাধুনিক সুযোগসুবিধা দানের জন্য একটি নতুন Industrial Complex।

উপজাত দ্রব্যের কারখানাসহ কোক ওভেন প্ল্যান্ট ১৯৫৯ সালে চালু হয়। এই Oven-এর লক্ষ্যমাত্রা দৈনিক ১৩০০ টন কয়লা থেকে ১০০০ টন hard coke তৈরী করা। এর জন্য দিশেরগড় খাদ থেকে কম শক্তিসম্পন্ন কোক ও ঝরিয়া বা লাইবাড়ি খাদ থেকে উন্নত মানের কোক আনা হয়। এই দুই কোকের মিশ্রণে তৈরী হয় নির্ভরযোগ্য খুব উন্নত মানের Metallurgical Grade I hard

coke। এই কোক সাধারণত ধাতু গলানোর চুল্লী Blast Furnace, Ferro Alloy ও রাসায়নিক শিল্পে প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া Benzol, Toluene ও Xylene জাতীয় উপজাতও উৎপন্ন হয়। সাধারণত জামসেদপুরের টাটা কোম্পানী, রেলওয়ে কারখানা, অর্ডিন্যান্স কারখানা এই Coke-এর প্রধান খরিদ্দার।

১৫. Durgapur Thermal Power Station (তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র) : দুটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কারখানা থেকে ৩০,০০০ KW বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এই কারখানা স্থাপিত হয়েছে। বিদেশী সহায়তায় এই Stationটি গড়ে তুলতে খরচ হয়েছে পৌনে ৭ কোটি টাকা। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এর উৎপাদন শুরু হয়।

DPL-এ বেসরকারী কারখানা গড়ে তোলার জন্য জমি দেওয়া হয়। Projects শিল্পাঞ্চলে নিজস্ব ড্রেন, রাস্তা তৈরী এবং বিদ্যুৎ ও কোক-ওভেন গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

১৬. দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র : DVC Thermal Power Station—দুর্গাপুরে উচ্চচাপের ৭৫ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন Plant স্থাপিত হয়েছে। জার্মান ও আমেরিকা কোম্পানীর সঙ্গে সহযোগিতায় এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। এটি তৈরী করতে ২৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে ও কারখানায় ৭৫০ দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী কাজ করে।

১৯. Sankey Wheel Ltd : আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে এটি নির্মিত হয় ও ১৯৬৪ সালের ১৭ই আগষ্ট থেকে চালু হয়। বাণিজ্যিক সংস্থায়, মিলিটারীতে এবং দেশীয় যানবাহনে উচ্চচাপ সহনক্ষম ইস্পাতের চাকা তৈরীর কাজে কারখানাটি নিযুক্ত। HSL (Hindusthan Steel Ltd.) IISCO ও HSCO-তে প্রস্তুত ইস্পাত এবং অন্যান্য কাঁচামালের জন্য গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই প্ল্যান্টের বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার Wheel।

২০. Indian Oxygen Ltd. : বার্ণপুরে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তরল অক্সিজেন তৈরীর এই কারখানাটি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু গ্যাসের চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় ১৯৫৮ সালে তরল গ্যাস ও Dissolved Acetylene উৎপাদনের জন্য আসানসোলেও একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে আসানসোলের কারখানার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬১১৬০০০ কিউবিক লিটার তরলগ্যাস, ৪০৮০০০ কিউবিক মিটার dissolved acetylene, ১২২০০০ cu.m. আর্গন ও ৬১২০০০ cu.m. নাইট্রোজেন। ১৯৭২ সালে এই কারখানার কর্মী সংখ্যা ছিল

৩১৮ জন। এখানে গ্যাস ও উপজাত দ্রব্য উৎপাদনের কাঁচামাল আসে কলকাতা ও মুম্বাই থেকে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় দিশেরগড় Power Supply থেকে। ১৯৭০ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ ও অর্থে তার মূল্যের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

উৎপাদিত দ্রব্যের নাম	পরিমাণ Cu.M এ (কিউবিক ইউনিট মিটার)	উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য
Oxygen	৪৯৪৪৫০০	৯০,১০,০০০ টাকা
Dissolved Acetylene	২৯০০০০	
Argon	৬৬০০০	
Nitrogen	২৭০০০	

২১. Durgapur Chemicals Ltd.—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ, ১৯৬৮ সালে স্থাপিত। বিভিন্ন কারখানায় যেমন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, এ্যালয় ইস্পাত কারখানা, বেঙ্গল পেপার মিল, দামোদর-ভ্যালি করপোরেশন, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, দুর্গাপুর প্রজেক্টস্, ফার্টিলাইজার করপোরেশনে বিভিন্ন কারখানার চাহিদামত বিভিন্ন রকমের কস্টিক সোডা, তরল ক্লোরিন, সোডিয়াম পেন্টাক্লোরোফেনেট (Sodium Penta Chlorophenete) প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ করে।

২২. ACC Vickers-Babcock Ltd.—১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগে ব্রিটিশ সহযোগিতায় নির্মিত বয়লার ও মেশিনারী নির্মাণের কারখানা।

২৩. Graphite India : Graphite India-এর প্রধান কার্যালয় কলকাতা। Graphite India দুর্গাপুরে একটি কারখানা স্থাপন করেছেন। এই কারখানায় বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ব্যবহারের উপযোগী বিশেষ ধরনের ইস্পাত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় Graphite Electrodes, Anodes, Paste প্রভৃতি বিশেষ ধরনের শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদিত হয়। ৫ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগে এটি নির্মিত। একটি বোর্ড অব্ ডিরেক্টারের দ্বারা এটি পরিচালিত হয়। এই কারখানার কাঁচামাল আসে Indian Carbon, Indian Oil Corporation, ভিলাই-এর Hindusthan Steel প্রভৃতি কারখানা থেকে, আর বিদ্যুৎ আসে DPL থেকে। দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী সংখ্যা ৫২৯, এর মধ্যে ৪১৩ জনই অদক্ষ। (১৯৭২-এর পরিসংখ্যান)।

২৪. PIBCO Ltd. : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের M/s Johns—Manville Ltd. Company-এর সহযোগিতায় দুর্গাপুরে বিধানচন্দ্র রায় অ্যাভেনিউতে খনিজ রেশম (mineral wool) উৎপাদনের কারখানা ১৯৭০-এর জানুয়ারী থেকে উৎপাদন শুরু হয়েছে। উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ১৯৫০০ মেট্রিক টন। কাঁচামাল আসে রাজস্থান, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় DPL থেকে।

পেট্রোকেমিকেল, তৈল শোধনাগার প্রভৃতি কারখানায় mineral wool-প্রচুর চাহিদা। কাজেই হলদিয়া পেট্রোকেমিকেল ও বারাউনী তৈল শোধনাগার নিকটে থাকায় PIBCO-র সম্প্রসারণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

২৫. Jessop and Co. : ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে জেশপ কোম্পানী ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাপুর রেল স্টেশনের কাছে এই কারখানাটি স্থাপন করেছে। এই কারখানা উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন Iron Casting Laminated Spring, Coil Spring প্রভৃতি উৎপাদন করে। ১৯৬৬ থেকে উৎপাদন শুরু হয়েছে। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলেই এই সমস্ত জিনিসের বিশেষ চাহিদা থাকায় এই কারখানারও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এছাড়াও দুর্গাপুরে আছে Opthalmic Glass Project, Hind Refactories, Heileman Ltd. কারখানা।

২৬. চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস : এটি একটি ভারত সরকারের উদ্যোগ। আসানসোল থেকে ৭ মাইল দূরে মিহিজাম রেল স্টেশনের কাছে রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের এই কারখানাটি স্থাপিত হয়েছে। কারণ এখানে রয়েছে—ইঞ্জিন তৈরীর উপযুক্ত পরিবেশ, যেমন—দশ মাইল দূরে রানীগঞ্জ, অণ্ডাল ও দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে কয়লাখনি, বার্ণপুর ও জামসেদপুরে ইস্পাত তৈরীর কারখানা, হাজারিবাগ, বিহার, উড়িষ্যা থেকে সুলভ শ্রমিক সরবরাহ, কলকাতা বন্দরের নৈকট্য। ১৯৫০ সাল থেকে এখানে বাষ্পীয় ইঞ্জিন নির্মাণ শুরু হয়। প্রথমে WS, WT, WP, WL type এর অর্থাৎ ২০০ সাধারণ আকারের রেল ইঞ্জিন তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ২২৫৪ বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরী হয়েছে। ১৯৬৩ সাল থেকে বৈদ্যুতিক ও ডিজেল ইঞ্জিন তৈরী শুরু হয়েছে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জন্য প্রায় সমস্ত (শতকরা ৯৭ ভাগ) ও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের জন্য ৭৬ শতাংশ কাঁচামাল এ দেশ থেকেই পাওয়া যায়।

২৭. Hindusthan Cables Ltd. : বর্ধমান জেলার পশ্চিম সীমান্তে চিত্তরঞ্জনের কাছে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফে ব্যবহারোপযোগী 'তার' উৎপাদনের কারখানাটি ১৯৪৯ সালে লণ্ডনের M/s Standard Telephone & Cables

Ltd.-এর সহযোগিতায় নির্মিত। ১৯৫৪ সাল থেকে উৎপাদন শুরু হয়েছে। বর্তমানে Underground Dry Core Telephone Coaxial Cables, Plastic Cables প্রভৃতি নানা আকারের বৈদ্যুতিক তার এখানে তৈরী হচ্ছে। প্রধান খরিদ্দার ভারতীয় ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ। সামান্য কিছু প্রতিরক্ষা দপ্তর, রেলওয়ে এবং কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগে বিক্রয় হয়।

২৮. সেন-র‍্যালে কোম্পানী লিমিটেড : আসানসোলের কাছে কন্যাপুরে সাইকেল তৈরীর এই কারখানাটি গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ ও জার্মানীর কারিগরী প্রযুক্তি নিয়ে এই কারখানা তৈরী হয় ১৯৪৯ সালে। ১৯৫২ সাল থেকে উৎপাদন শুরু হয়। প্রথমে ৫০ থেকে ৭৫টি সাইকেল দৈনিক তৈরী হত। ১৯৭৩ সালে এর দৈনিক গড় উৎপাদন দাঁড়ায় ১৫০০টি। কর্মীসংখ্যা ৩৫০০ জন।

২৯. জে. কে. নগর এ্যালুমিনিয়াম শিল্প : জে. কে. শিল্পগোষ্ঠীর এ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশনের একটি উদ্যোগ। আসানসোল ও রানীগঞ্জের মধ্যবর্তী অঞ্চলে জে. কে নগর প্রতিষ্ঠিত। বিহারের রাঁচী জেলার লোহারডাঙ্গা ও বিহারের পালামৌ-এর নিকটবর্তী খামারে এ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশনের নিজস্ব খনি থেকে খনিজ এ্যালুমিনিয়াম কাঁচামাল হিসাবে আমদানী হয়। লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ২৩৩৭ টন খনিজ এ্যালুমিনিয়াম থেকে ২১৩৪ টন এ্যালুমিনিয়াম পাত ও তৈজসপত্র তৈরী। ১৯৭৩ সালের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় এবং ১০৯৬০০ পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ৪৯৪ কুইন্টাল অ্যালুমিনিয়াম তৈজসপত্র ও ৪৯৭ টন এ্যালুমিনিয়াম পাত তৈরী হয় এবং এর কর্মী সংখ্যা ছিল ২০৮৭ জন (১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ)।

৩০. বেঙ্গল পেপার মিল রানীগঞ্জ : দেশের অন্যতম বৃহত্তম কাগজ-কল। ১৯৫০ সালের কাগজ ও কাগজের অন্যান্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১৪১২ টন। কাঁচামাল আসে বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ থেকে, পশ্চিমবঙ্গে আছে সাবাই ঘাস ও বাঁশ, বিহার ও উড়িষ্যা থেকেও সাবাই ঘাস আমদানী করতে হয়, শনের ছাঁট (hemp cutting) আসে বারানসীর সিয়াপুর থেকে আর কলকাতা থেকে আসে ছেঁড়া কাপড়, বাজে কাগজ ইত্যাদি। শ্রমিক সংখ্যা ২০৫০। শ্রমিক অসন্তোষে কারখানাটি অনেকদিন বন্ধ ছিল। বর্তমানে মালিকানা হস্তান্তরিত হওয়ায় কোনরকমে চালু হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও সহায়ক শিল্প :

দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলে ১৯৭৮ সালে ভারত সরকারের রচিত বি.পি.ই. কর্মনীতির মাধ্যমে সহায়ক (Ancillary) শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। এই শিল্পাঞ্চলে ১৪টি কেন্দ্রের পরিচালনাধীন বড় বড় শিল্প কারখানার মধ্যে দশটিতেই

সহায়ক শিল্প গড়ে উঠেছে। এর জন্যে সরকারের উদ্যোগে সহায়ক শিল্প উন্নয়ন সেল গঠিত হয়েছে—এই সংস্থার কাজ হচ্ছে নতুন নতুন শিল্প গঠনে সাহায্য করা, নতুন নতুন নকশা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান দিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন ঘটানো, কাঁচামাল সরবরাহ, কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়া, পেমেন্টের সাহায্য করা ইত্যাদি। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের সহায়ক শিল্প হিসাবে ১৮৩টির মত ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলার অনুমোদন পেয়েছে। নিম্নে তার একটা তালিকা দেওয়া হলো—

বড় শিল্পের নাম	সহায়ক শিল্পের সংখ্যা
১। দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্প	২৯
২। অ্যালয় স্টিল প্রকল্প	৬
৩। হিন্দুস্তান কেবল্‌স	৬
৪। ইস্টার্ন কোলফিল্ড, সাঁকতোরিয়া	১২৯
৫। হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার	৪
৬। বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড	৯
	মোট ১৮৩

১৯৯৩ সালে বড় বড় শিল্প ইউনিটগুলি ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিটগুলিকে ৯.৮৯ কোটি টাকার উৎপাদনের বরাত দেয়—

১। দুর্গাপুর ইস্পাত্ প্রকল্প	৩.৭৯ কোটি টাকা
২। অ্যালয় স্টিল প্রকল্প	১.৬ কোটি টাকা
৩। হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার	০.২৭ কোটি টাকা
৪। ইস্কো	১.৪০ কোটি টাকা
৫। বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড	০.৩১ কোটি টাকা
৬। হিন্দুস্তান কেবল্‌স	২.৫২ কোটি টাকা
মোট :	৯.৮৯ কোটি টাকা

(তথ্যসূত্র : পশ্চিমবঙ্গ ১৪০৩, পৃ. ২১৩)

আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ (ADDA)এর চেয়ারম্যান মহাশয়ের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় পর্ষদ এই শিল্পাঞ্চলে বাণিজ্যিক কেন্দ্র, আবাসন নগরী ও সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নয়নের ও শিল্পের প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য কতকগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রকল্পগুলি হলো—

১। ১৫০ একর জুড়ে Export Promotion Industrial Park (EPIP)

২। ২৫০ একর জুড়ে Industrial Development at Raturia Angadpur area.

৩। ভারী শিল্পের উপযোগী দুর্গাপুরে—Kamalpur Industrial Park.

৪। ১৫০ একর জুড়ে Subsidiary Industrial Area, Durgapur.

৫। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্পকে আকর্ষণ করার জন্য রানীগঞ্জে—Mangalpur Industrial Area.

৬। Kanyapur Industrial Area, Asansol

এই প্রকল্পে ৩০টি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

৭। দুর্গাপুরে City Centre এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প—এই প্রকল্পের আওতায় তৈরি হবে : Stadium, Durgapur Park, Toy Train, Lake, Auditorium Complex, Art Gallery।

৮। দুর্গাপুরের আরও একটি ডিগ্রী কলেজ স্থাপন।

৯। 14 MGD Water Treatment Plant নির্মাণ।

১০। সিটি সেন্টারে ৮.৩৩ একর জুড়ে আবাসন অঞ্চলের উন্নয়ন।

১১। বিধাননগরে (২এ) ৬০ একর জুড়ে বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্প; ইতিমধ্যে লটারীর মাধ্যমে আড়াই কাঠা থেকে ৫ কাঠা পরিমিত প্লট ৪০০ ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করা হয়েছে।

১২। ১৩১ একরে Residential Area Development Centre।

১৩। রানীগঞ্জে Mangalpur Satellite Township Project (MSTP) এর জন্যে ৭০ একর জায়গা বরাদ্দ হয়েছে।

১৪। ৬০ একর জুড়ে আসানসোলে Kalyanpur Satellite Township Project (KSTP)।

১৫। ১০০ একরে New Asansol Township Project।

১৬। বিভিন্ন সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে ৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ।

এছাড়া দুর্গাপুরে Auditorium, আসানসোল ও রানীগঞ্জে Truck Terminus, Asansol Stadium প্রভৃতি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও চিন্তা করা হচ্ছে। *(Source : Statesman, 31 Jan–1st Feb 2000)*

আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলির যদি সার্থক রূপায়ণ হয় তাহলে এই অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের খুবই সহায়ক হবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু বর্তমান যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে তাদের সমস্যাগুলির দিকে আগে নজর দিলে বোধহয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণ হতো।

ভারী শিল্পের সমস্যা : বর্তমানে যে সমস্যাগুলি প্রকট হয়ে উঠেছে ও যার জন্য এখানকার কারখানাগুলি মার খাচ্ছে সেগুলি হলো—(১) দক্ষ শ্রমিকের অভাব, (২) কোক-কয়লার অপ্রতুলতা, (৩) তাপসহনক্ষম ইটের অভাব, (৪) অত্যধিক উৎপাদনমূল্য, (৫) একটা অসৎচক্রের যোগসাজসে কাঁচামাল ও উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যাপক পাচার, (৬) ক্রমাগত শ্রমিক অসন্তোষ, (৭) বর্তমান বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর অভাব যার ফলে জাপান, জার্মানি, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে এখানকার উৎপাদন ব্যয় অত্যন্ত বেশি পড়ছে, তার ফলে দেশেরই অনেক কারখানা এখানকার উৎপাদিত দ্রব্যের চেয়ে বিদেশের অনেক কম দামে উৎপন্ন দ্রব্যকেই পছন্দ করছে। বিদেশের বাজারেও এখানকার মাল প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পাচ্ছে না। ফলে প্রতিটি কারখানায় ক্রমাগত লোকসানের ফলে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে; বহু দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে যাচ্ছে। কাজেই সর্বাধুনিক পরিকাঠামো দ্বারা প্রতিটি কারখানার সংস্কার, দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীদের work cultureএর উন্নয়নের দিকে আগে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপ্রতিহত জয়যাত্রা, তজ্জনিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও চিন্তাজগতের পরিবর্তন, সর্বোপরি যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্লব, ইন্টারনেটের আবির্ভাব ও বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আসানসোল ও দুর্গাপুরে কারখানায় মান্ধাতা আমলের পরিকাঠামো ও প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে উৎপাদন করলে বিশ্বের বাজার প্রতিযোগিতায় এখানকার মাল কোনদিনই টিকতে পারবে না; ক্রমাগত লোকসান হতে হতে একদিন সব কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। বিশ্বের বাজারের চাহিদার অনুযায়ী কারিগরী শিক্ষা ও দক্ষতার যদি উন্নয়ন না ঘটানো যায় উৎকর্ষের দফা-রফা অনিবার্য; কাজেই যে শিল্প গড়ে উঠেছে। তার আমূল সংস্কার ঘটিয়ে যাতে এখনকার পণ্যকে বিদেশী প্রতিযোগিতার যোগ্য করে তুলতে পারা যায় তার যথাযথ ব্যবস্থা করে পরে নতুন প্রকল্পে হাত দিলে মনে হয় ভালো হতো।

তাঁতশিল্প : তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য কাটোয়া তাঁত শিল্পকেন্দ্র সংগঠিত হয়েছে। এই তাঁতশিল্পের অন্তর্গত সমবায় অঞ্চলে ও সমবায় বহির্ভূত অঞ্চলে তাঁতের সংখ্যা ১৯৬৫-৭১ বৎসরে ছিল নিম্নরূপ :

বৎসরে	সমবায় সেক্টরে তাঁতের সংখ্যা	সমবায় বহির্ভূত অঞ্চলে তাঁতের সংখ্যা	সর্বমোট
১৯৬৫-৬৮	৪৩৯৪	১১৫৯০	১৫৯৮৪
১৯৬৮-৭১	৪৪১৮	১১৫৬৬	১৫৯৮৪

পূর্বস্থলী, কালনা, মন্তেশ্বর, মেমারী, জামালপুরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বহু তাঁত ছিল—প্রায় ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ জন তাঁতীর দৈনিক রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হতো। বর্তমানে মানুষের রুচি বদলাচ্ছে, সিনথেটিক পোশাকে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে; কাজেই তাঁতশিল্প মার খাচ্ছে—এদের সঙ্গে গুণমানও মূল্যের প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। বড়শুলে ও বর্ধমানে দুটি সূতাকল প্রতিষ্ঠিত আছে। বড়শুলের সূতাকলটি সরকারী আনুকূল্য লাভ করে কোনরকমে টিকে থাকলেও বর্ধমানে নবগঠিত সূতাকলটি শ্রমিক অসন্তোষের ফলে ও উপযুক্ত বাজার না পাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে।

জেলার সর্বত্র বহু রাইস মিল, চিঁড়াকল, হাস্কিং মিল, তেলকল গড়ে উঠেছে। কিন্তু জেলায় যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়, তার উপযুক্ত চালকল নাই। সাম্প্রতিক-কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ নতুন চালকল স্থাপন ও হাস্কিং মিল আধুনিকীকরণের যে কর্মসূচী নিয়েছেন তার ফলে জনগণের মধ্যে নতুন নতুন আধুনিক উন্নতমানের রাইস মিল স্থাপনের ও পুরানো রাইস মিলগুলিকে Remodelling করার জন্য বেশ সাড়া পড়ে গেছে। আধুনিক মডেলের অনেক নতুন চালকল স্থাপিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্পোন্নয়নের যে কর্মসূচী নিয়েছেন রাইসব্রান (Rice Bran) তৈল উৎপাদন তার মধ্যে একটি। বর্ধমানে ইতিমধ্যেই এই কল স্থাপিত হয়েছে এবং এই তেল বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে, কিন্তু উপযুক্ত আধুনিক চালকলের অভাবে একটা বিরাট পরিমাণ তেল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কয়েক কোটি টাকা মূল্যের তেল বয়লারের আগুনে পুড়ে যাচ্ছে।

কালনা মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাট চাষ হয়। প্রায় ১৬২০০০ বেল পাট উৎপাদন হয়। পূর্বে জেলায় তিনটি পাটকল ছিল, যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামো ও কাঁচামালের যোগানের অভাবে সেগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। সমুদ্রগড়ে পাটের সুতলির কারখানা আছে। বর্ধমানেও এই সুতলি তৈরীর চেষ্টা হয়েছিল, উৎপাদনও শুরু হয়েছিল। কিন্তু ঠিক বাজার না পাওয়ায় সেটি বর্তমানে বন্ধ আছে।

উৎপাদনমূলক, পরিষেবামূলক ব্যবসার জন্য উৎসাহী শিক্ষিত বেকার যুবকদের প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। এই যোজনার সুযোগ গ্রহণ করে অনেক বেকার যুবক-যুবতী আটাচাকি,

মশলাচাকি, তেলকল, পেরেক তৈরীর কারখানা, গ্রিল তৈরীর কারখানা, পলিপ্যাক তৈরী, কাঠের সামগ্রী, মেসিনে মুড়ি ভাজা, শাড়ি-ফলস্, শালপাতার থালা-বাটি তৈরী, ওষুধের দোকান, বায়ো-কেমিকেল ল্যাবরেটরী, তাঁত বোনা, জেরক্স মেসিন, বইয়ের ও পত্রপত্রিকার স্টল ইত্যাদি শিল্প ইউনিট স্থাপন করে স্বনির্ভর হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষিত বেকারের অনুপাতে এই যোজনার সাফল্য খুব আশাপ্রদ নয়। নিম্নের সারণী থেকে তার প্রমাণ মিলবে।

সাল	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকল্প অনুমোদন		টাকা প্রদান		প.বঙ্গে বর্ধমান
		সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	জেলার স্থান
			লক্ষ টাকা		লক্ষ টাকা	
৯৩-৯৪	৫৫০	১৫৭	১২৮.৩৩	১৩২	৯১.৯৬	১৬ শতাংশ
৯৪-৯৫	২৫৭০	৯১৩	৬৭৫.৩	৫১২	৩১২.২	১২.৬ শতাংশ

জেলায় উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য স্থান

উৎপাদিত পণ্য	*উৎপাদনের স্থান*
ইঞ্জিনিয়ারিং মালপত্র	আসানসোল বৈদ্যনাথপুর, বাসকা, চক বাঁকোলা, ছোড়া, দক্ষিণ খণ্ড, দলুর বাঁধ, দিঙ্গলা, হরিপুর, কাজোরা, মান্দারবাণী, পরশকোল, বহুলা
কাগজ	বল্লভপুর
সরিষার তেল	বর্ধমান, রঘুনাথচক, রানীগঞ্জ, গুসকরা, মেমারী
লৌহ পিণ্ড (Pig iron)	বার্ণপুর
বৈদ্যুতিক/ডিজেল রেল ইঞ্জিন	চিত্তরঞ্জন
পাটের দড়ি	দাঁইহাট
সুতী ও সিল্কের শাড়ী	ধাত্রীগ্রাম
দেশীমদ	দিশেরগড়
ইস্পাত	দুর্গাপুর
ইট	গুসকরা, বর্ধমান, গাংপুর, ধাত্রীগ্রাম
টেলিফোনের তার	হিন্দুস্তান কেবলস টাউন, চিত্তরঞ্জনের কাছে
কয়লার উপজাত দ্রব্য	জামুরিয়া, DPL Township দুর্গাপুর, নিঙ্গা পরিহরপুর, শ্রীপুর

উৎপাদিত পণ্য	উৎপাদনের স্থান
এ্যালুমিনিয়াম পাত	জে.কে. নগর টাউনশিপ, (আসানসোল ও রানীগঞ্জের মধ্যস্থলে অবস্থিত।)
ধানের তুষের তেল (Ricebran oil)	বর্ধমান, মেমারি
কাঠের তৈরী জিনিস	কালনা, বর্ধমান, গুসকরা
তাঁতের কাপড়	কাটোয়া, জামালপুর, কালনা, ধাত্রীগ্রাম
পাকানো বা গুটানো পাইপ (Spun pipe)	কুলটি, বরাকর
লোহার গ্রিল	বর্ধমান, মেমারি, কামারপাড়া, গুসকরা, আসানসোল, রানীগঞ্জ
চুন	নিয়ামতপুর
বাই-সাইকেল	সেন-র‍্যালে টাউনশিপ (শরাকদি-নডিহা)
বিড়ি	শুকডাল, বর্ধমান
বিস্কুট	বর্ধমান

আমদানী ও রপ্তানী	অন্য জেলা বা প্রদেশ থেকে আমদানীকৃত দ্রব্যের তালিকা	পরিমাণ (হাজার টনে)
চাল	বাঁকুড়া, কলকাতা, উড়িষ্যা	৫০.২
ধান	বীরভূম, উড়িষ্যা	৪
কলাই	নদীয়া, বীরভূম মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার	৫০
রেপসীড ও সরিষা	পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ	১০০
গম	উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব	৫০

	এ জেলা থেকে অন্যত্র রপ্তানী পণ্য কোথায় যাচ্ছে	(হাজার টনে)
*চাল	কলকাতা, ২৪ পরগনা, হুগলী, নদীয়া	৮৮.৬৪
ধান	হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনা, নদীয়া	১৭.৫

আলু	বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বিহার বাংলাদেশ, ২৪ পরগনা	২৫
পাট	কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনা	১৫০.৬৪

** এ জেলার চাল কলকাতা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশেও কিছু রপ্তানী হয়।*

অন্যান্য পণ্য	কোথা থেকে রপ্তানী হয়
কয়লা	আমকুলা, আসানসোল, বাগড়া, বহুলা, বৈদ্যনাথপুর, বানালী, বক্সা, চকবাঁকোলা, ছোড়া, দক্ষিণখণ্ড, দলুর বাঁদ, দিঙ্গলা, দিশেরগড়, হরিপুর, জামুরিয়া, কাজোরা, কনখ্যা, কেন্দা, খান্দবা, কোনারডিহি, মান্দারবাণী, মুরগাথল, নিয়ামতপুর, নিমেহা, লিঙ্গা, অণ্ডাল, পলাশবন, পরাশ-কোল, পরসিয়া, পরিহবপুর, রতিবাটি, সিয়ারসোল, শ্রীপুব, উখরা, সর্পি।
কাগজ	বল্লভপুর
ইস্পাত দণ্ড	বার্নপুর
বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন	চিত্তরঞ্জন
ইস্পাত	দুর্গাপুর
সরিষার তৈল	গুসকরা, বর্ধমান, মেমারি, রানীগঞ্জ, রঘুনাথপুর চক
টেলিফোনের কেবল	হিন্দুস্তান কেবল টাউন
অ্যালুমিনিয়াম পাত	জে. কে. নগর
ইট	কালনা
পাকানো পাইপ	কুলটি-বরাকর
বাইসাইকেল	সেন-র‍্যালে টাউনশিপ

	কোথায় আমদানী হয়
কেরোসিন তেল	আমকুলা, বাগড়া, নিমেহা, বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া
বাঁশ	বল্লভপুর
কাপড়চোপড়	বর্ধমান, গুসকরা, আসানসোল, মেমারি
খনিজ লৌহ	বার্ণপুর, দুর্গাপুর
রেলইঞ্জিন তৈরীর মেশিনারী	চিত্তরঞ্জন
চিনি	দাঁইহাট, বর্ধমান, আসানসোল, দুর্গাপুর, মেমারি

সুতো	ধাত্রীগ্রাম, মেমারি, জামালপুর, কাটোয়া
তামা	হিন্দুস্তান কেবলস্
মসলাপাতি	কালনা, বর্ধমান, মেমারি, গুসকবা
লৌহপিণ্ড	মেমারি, বর্ধমান, আসানসোল, গুসকরা, কালনা, কাটোয়া
বাই-সাইকেল	সেনর‍্যালে টাউনশিপ
ভোজ্য তৈল	বর্ধমান, মেমারি, জামালপুর, শুকডাল

ব্যাঙ্ক পরিষেবা

এ দেশে ব্যাঙ্ক পরিষেবার সূচনা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে। অবশ্য অধ্যাপক ডি. এইচ. সিন্‌হা তাঁর Early European Banking in India গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন Joint Stock (যৌথ কারবারী) প্রথায় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা যখন ইউরোপেও চালু হয় নাই তার আগে থেকে এ দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু ছিল। এদেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার পথিকৃৎ ইউবোপিয়ান্ এজেন্সি হাউসগুলি। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এরাই ব্যাঙ্কব্যবস্থা চালু করে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এরপর থেকে পুরোদমে ব্যাঙ্ক পরিষেবা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এর পূর্বে টাকা লেনদেনের কি ব্যবস্থা ছিল? কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলে তাঁর যে আত্মজীবনী দিয়েছেন তাতে পোতদারের কথা জানা যায়। "পোতদার হইল যম টাকায় আড়াই আনা কম"।

এই পোতদার হল মুদ্রার কারবারী বেনে। এরা ছিল গ্রামীণ মহাজন। সোনার জিনিস বা জমি বন্ধক রেখে ঋণ দিত আর বিনা বন্ধকে ঋণ দিলে টাকায় আড়াই আনা অর্থাৎ দুই আনা ৬ পাই Discount কেটে নিত, সুদের হারও বেশী হত।

দেশীয় ব্যাঙ্কিং এজেন্সির কাজ করতেন ফতেচাঁদ জগৎশেঠ। এই জগৎশেঠের ব্যাঙ্কিং এজেন্সির মাধ্যমেই জমিদাররা নবাবের কোষাগারে রাজস্ব জমা দিতেন। নবাবও যে সব রাজস্ব ও নজরানা দিল্লী পাঠাতেন তাও এ শেঠ পরিবারের Banking Agency-এর হুণ্ডির মাধ্যমে। আচার্য যদুনাথ সরকার তাঁর History of Bengal Vol II-তে লিখেছেন He (Shujauddin the Nawab) realised 'Najor' from them (defaulting Zamındars) worth one krore and fifty lakhs of rupees and sent the amount to the Emperor's treasury at Delhi through the banking Agency of Fatechand. ফতেচাঁদ ছিলেন মুর্শিদকুলী খানের কোষাধ্যক্ষ এবং মুর্শিদকুলীর সুপারিশ ক্রমে তিনি দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে বংশানুক্রমিক জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন।

এই শেঠ পরিবার বাংলার সমকালীন অর্থনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি নবাব ছাড়াও স্থানীয় বণিক ও বড় বড় ব্যবসায়ীদেরও ঋণ দিতেন।

গিরিয়ার যুদ্ধে ইংরেজের কাছে পরাজিত হওয়ার পর মীরকাশিম শেঠ পরিবারের কাজে অসন্তুষ্ট হন ও কয়েকজন বন্দীর সঙ্গে জগৎশেঠকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন।

শেঠদের ব্যাঙ্কিং এজেন্সির আগে গ্রামের মহাজনরাই চাষী ও ব্যবসাদারদের ঋণ দিতেন ও প্রচুর সুদ নিতেন।

'সংবাদ প্রভাকরে'র ২১.৪.১২৫৮ সালের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মহাজনদের সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য উদ্ধৃত করছি।

"পূর্ব্বকালে কর্জ্জের টাকার অধিক সুদ অর্থাৎ বৃদ্ধি গ্রহণের নিয়ম এদেশে চলিত ছিল না। হিন্দু-নৃপতিগণ বাজনিয়ম দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে সুদ গ্রহণের প্রথা রহিত করিয়াছিলেন, পরে এই রাজ্য পর জাতির অধীন হওয়াতে প্রজাপুঞ্জের যেমন ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই রূপ সুদ বৃদ্ধিও হইয়া আসিয়াছে, কোম্পানীরা আপনারদিগের রাজ্যের সীমা মধ্যে শতকরা বার্ষিক সুদের নিয়ম ১২ টাকা করিয়াছেন, বিচার স্থলে তাহা গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বীজ ধান্যের মহাজন ও কিস্তি প্রদানকারিগণ দুঃখীদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়া থাকে, রাজকর্ম্মচারি মহাশয়েরা তাহার কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না, ঐ দুরাত্মারা প্রজাকে যদ্যাপি এক মোণ ধান্য প্রদান করে তবে খাতায় দুই মোণ লেখাইয়া নেয়, এক টাকা লইলে প্রতি দিবস দুই পয়সা বা চারি পয়সার হিসাবে সুদ দিতে হয়।

ঋণ গ্রহণস্থলে কমিস্যন দিবার নিয়ম কোন কালেই ছিল না, ঐ নিয়ম সাহেব দিগের সঙ্গে ২ জাহাজে চড়িয়া আসিয়াছে, কমিস্যন শব্দের যথার্থ অর্থ আমারদিগের অভিধানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অধুনা কি চমৎকার! ঐ কুপ্রথা প্রায় সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে, ধনী লোকেরা জমিদারী বা অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিলেও কমিস্যন লইয়া থাকেন, অতএব সহেজেই বলিতে হইবেক যে পূর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজাধিকারে সুদ গ্রহণের অন্যায় নিয়ম অতি বাহুল্যরূপে প্রচলিত হইয়াছে, এই প্রথা নিবারণের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না।..."

এছাড়াও ঐ পত্রিকার ২৩/১১/১৮৮৩ তারিখের সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত মহাজনদের অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনীর বিবরণ আছে। "ইদানীন্তন গ্রাম্য মহাজনদিগের অত্যাচার-বিবরণ যে কেবল সমাচার পত্রেই বাহুল্যরূপে আন্দোলিত হইতেছে এমন নহে, নদীয়া বিভাগের বিচক্ষণ কমিস্যনার সাহেব যে বার্ষিক রিপোর্ট গবর্ণমেন্টের নিকটে প্রেরণ করিয়াছে, তাহাতেও ঐ বিষয় লিখিত

হইয়াছে, কৃষকেরা অতিকষ্টে ভূমিকর্ষণ, বীজবপন এবং শস্যোৎপন্ন করে বটে, কিন্তু তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ মহাজনদিগেব দাসত্ব শৃঙ্খলে এমত দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াছে যে, কোন কালেও তাহা ছেদন করিতে পারিবে না, তাহারা যে শস্যোৎপন্ন করে তাহা হইতে জমিদারের খাজানা প্রভৃতি দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে আপনারদিগের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ নিমিত্ত অত্যাল্পাংশমাত্র প্রাপ্ত হয়। যেহেতু সেই অবিশিষ্টাংশ ঐ মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধ নিমিত্ত নিঃশেষিত হইয়া যায় সুতরাং পুনর্ব্বার ঐ মহাজনদিগের নিকটে ঋণ না করিলে কৃষকদিগের দিনযাপন হইতে পারে না।

মহাজন সকল অসময়ে কৃষককে শস্যাদি কর্জ দেয় এবং বীজবপন সময়ে বীজধান্যও প্রদান করিয়া থাকে, একথা অতি যথার্থ বটে, কিন্তু যে পরিমাণে তাহার বৃদ্ধি গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা প্রায় অর্দ্ধাংশ বলিলেই হয়, কারণ তাহারা কৃষককে ধান্য ও নগদ টাকা দিয়া থাকে, যদ্যপি ১০ টাকা নগদ প্রদান করে, তবে কোন সময়ে ১২ টাকা কোন সময়ে ১৫ টাকার খত লেখাইয়া লয়, এবং সেই খতের উপর ১২ পারসেন্টের সুদ চলিয়া থাকে, আর মহাজনগণ যদ্যপি ধান্য কর্জ দেয়, তবে আড়ি হিসাবে তাহার বৃদ্ধি ধরিয়া থাকে, কিন্তু আড়ি প্রভৃতি পরিমাণ যদিও এদেশে চলিত আছে, কিন্তু সর্বত্র একরূপ নহে, অতএব আমরা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ স্থলে হিসাব লিখিতেছি, মহাজনেরা যদ্যপি কোন কৃষককে এক মোণ ধান্য কর্জ দেয়, তবে কেহ সওয়া মোণ, কেহবা দেড় মোণ আপনার খাতায় লেখাইয়া লয় এবং প্রতিমাসে সেরের হিসাবে তাহার সুদ অর্থাৎ বৃদ্ধি ধরিয়া থাকে, বীজবপন সময়ে বীজধান্য কর্জ নিলে তাহার নিয়ম আবার স্বতন্ত্র প্রকার, এক গুণ দিলে চতুর্গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে।...” এই ব্যবস্থা এ-জেলাতে স্বাধীনতার পরও প্রচলিত ছিল।

বামফ্রন্ট সরকার আশির দশকে অপারেশন বর্গার মাধ্যমে বর্গাদারদের নাম পর্চায় নথিভুক্ত করিয়ে, নথিভুক্ত বর্গাদারদের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ দেবার ব্যবস্থা চালু করার পূর্ব পর্যন্তও এই সমস্ত কৃষককে গ্রামের জোতদার ও সম্পন্ন গৃহস্থের কাছ থেকে বর্ষাকালে দশ সের ধান ‘বাড়ি’ কবুল করে এক মণ ধান কর্জ নিতে হত; পৌষ মাসে ধান ঝাড়া হলে ‘বাড়ি’ শুদ্ধ এই ধান শোধ করতে হত। অর্থাৎ শ্রাবণ থেকে পৌষমাস পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে অর্থাৎ বাৎসরিক ৫০ টাকার হিসাবে সুদ দিতে হত। আবার কোন খাতক যদি কোন বৎসর ‘বাড়িশুদ্ধ ধান’ শোধ করতে অক্ষম হতেন তাহলে পর বৎসর বাড়িশুদ্ধ মূল ধানের উপর মণে দশ সের হিসাবে ‘বাড়ি’ দিয়ে পর বৎসর সমস্ত শোধ

করতে হত। জিনিসপত্র বন্ধক রেখে কর্জ নিলে টাকা প্রতি মাসে দু পয়সা সুদ, কোথাও কোথাও টাকায় এক আনা হিসাবে সুদ দিতে হত অর্থাৎ বছরে শতকরা ৩৭.৫০ টাকা বা ৭৫ হিসাবে সুদ গুণতে হত।

ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০ সালে Money Lenders' Act পাশ করে মহাজনদিগকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তিন বৎসর মেয়াদী লাইসেন্স নিতে বাধ্য করেন। এর ফলে মহাজনরা সুদের সুদ আদায় করতে পারতেন না। অতিরিক্ত কিছুও আদায় করতে পারতেন না।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত এ রকম লাইসেন্সপ্রাপ্ত মহাজনের সংখ্যা ছিল সদর মহকুমায় ১০৫, আসানসোলে ২১১, দুর্গাপুরে ৪০, কালনায় ১২ ও কাটোয়ায় ৯।

বর্ধমান শহরেও এই সব মহাজনদের রমরমা কারবার ছিল। এদের আস্তানা গড়ে উঠেছিল বর্তমানের বেশ্যাপল্লী মহাজন টুলিতে। পরে মহারাজা ও ক্ষেত্রীদের রক্ষিতার এখানে বসবাসের ব্যবস্থা হলে এই সমস্ত মহাজন জহুরীপট্টীতে উঠে যায়।

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত ব্যাঙ্কগুলি শেয়ার হোল্ডারদের যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হত। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ব্যাঙ্কের সমস্ত শেয়ার সরকারে হস্তান্তরিত হয়। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে এমন কি স্বাধীনোত্তর পর্বেও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের আগে পর্যন্ত ক্ষুদ্র চাষী বা ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৬৯ সালের জুলাই-এ ১৪টি ও পরে ১৯৮০ সালের ১লা এপ্রিল ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করা হয়। এরপর থেকে ব্যাঙ্কের আমানত গ্রহণ ও ঋণদান পদ্ধতি সরলীকৃত হয়। ক্ষুদ্র চাষী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ীরা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসার উন্নতির জন্য ব্যাঙ্ক থেকে সহজেই অল্প সুদে ঋণ পেতে থাকে।

১৯২৫ সাল থেকে State Bank of India-র শাখা জেলার বিভিন্ন স্থানে খোলা শুরু হয় বর্তমানে আসানসোল, বার্ণপুর, বর্ধমান, চিত্তরঞ্জন, রানীগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর, মেমারি, রায়না, দাঁইহাট, ভাতার, পাণ্ডবেশ্বর, মুরগাশোল, রূপনারায়ণপুর, লাউডোহা, শক্তিগড়, গলসি, কামারপাড়া ও বর্তমানে জেলার প্রত্যন্ত গ্রামেও শাখা খোলা হচ্ছে। স্টেট ব্যাঙ্ক ছাড়াও বর্ধমানে আরও ব্যাঙ্ক শহরে, জেলার প্রধান প্রধান শহরে ও গ্রামে শাখা খুলে যাচ্ছে। বর্তমানে ১৯৮৬-এর জুন পর্যন্ত জেলায় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের শাখা ছিল ৩৬৬ ও সমবায় ব্যাঙ্কের শাখা ৩০। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক শাখার সংখ্যা ২৯৪ (সমবায়সহ) ১৯৯৬-এর জুনের হিসাবে জেলার প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কগুলি হল—

১. স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ২. এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ৩. ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা, ৪. ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ৫. কানাড়া ব্যাঙ্ক, ৬. সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ৭. ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ৮. নিউ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ৯. ইউনাইটেড কর্মাসিয়াল ব্যাঙ্ক, ১০. ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব্ কমার্স, ১১. পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, ১২. সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক, ১৩. দেনা ব্যাঙ্ক, ১৪. ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ১৫. ইউনিট ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক। এছাড়া আছে ১৬. বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপরারেটিভ ব্যাঙ্ক, ১৭. বর্ধমান ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক, ১৮. প্রণবানন্দ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (দুর্নীতির অভিযোগে ব্যাঙ্কটি এখন বন্ধ), ১৯. ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব্ অ্যাগ্রিকালচার এ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট, ২৫. শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, ২১. ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার ব্যাঙ্ক ২২. গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। দুর্গাপুরে ইউনিট ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কেরও একটি শাখা সম্প্রতি খোলা হয়েছে।

জেলার বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কর্মক্ষেত্র বর্ধমান, দুর্গাপুর ও আসানসোল অঞ্চলে আর কালনা-কাটোয়া-সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কর্মক্ষেত্র কাটোয়া ও কালনা মহকুমায়।

১৯৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৭১ জন ও এর অধীনে ছিল ৪৯৮ টি সোসাইটি।

১৯৭০-৭১ সালের এর মূলধন	৩২১৫১০০০ টাকা
আমানতী জমা	২০১৪৫০০০ টাকা
ঋণমঞ্জুর	১২৭৬৩০০০ টাকা
অনাদায়ী ঋণ	২৪৩৬৪০০০ টাকা
মুনাফা	৪২০০০ টাকা

বর্ধমান কো-অপারেটিভ ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক লিঃ-এর ১৯৭০-৭১ সালের অবস্থা।

সদস্য সংখ্যা	:	৩৫০৯
কার্যকরী মূলধন	:	৩৯৯২০০০ টাকা
মঞ্জুরীকৃত ঋণদান	:	৭০৪০০০ টাকা
বকেয়া ঋণ	:	৩৫৯০০০০ টাকা
আমানত	:	২০০০০ টাকা
মুনাফা	:	১৮০০০ টাকা

এগ্রিকালচার‍্যাল ক্রেডিট সোসাইটির ১৯৭০-৭১ সালের অর্থনৈতিক চিত্র :

সদস্যসংখ্যা	৬১৬৬০
কার্যকরী মূলধন	২২২৬৫০০০ টাকা
মঞ্জুরীকৃত ঋণদান	৭২২৬০০০ টাকা
অনাদায়ী ঋণ	১৭২৭১০০০ টাকা
আমানত	১২৪৪০০০ টাকা

জেলার এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটির সংখ্যা – ২৩

বিভিন্ন সোসাইটির কোনটিতে কিছু মুনাফা হয় তবে লোকসানের পরিমাণই বেশী। সর্বসাকুল্যে গণ-লোকসানের পরিমাণ ৩৫৮০০০ টাকা (১৯৭০–৭১-এর হিসাব)

নন এগ্রিকালচার‍্যাল ক্রেডিট সোসাইটির সংখ্যা ৩৩০। বর্তমানে অধিকাংশ ব্যাঙ্কের সমস্যা—বকেয়া ঋণের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। ঋণ আদায়ের জন্য কঠোর ব্যবস্থা না নিলে ব্যাঙ্ক পরিষেবা অচিরেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

জীবনবীমা :

জীবনবীমা জাতীয়করণের পূর্বে হিন্দুস্তান, বঙ্গলক্ষ্মী, ক্রাউন প্রভৃতি বহু স্বদেশী-বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানী ছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবনবীমাকে জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর Life Insurance Corporation of India গঠিত হয়। জীবনবীমাকে জাতীয়করণ করার ফলে জনগণের প্রিমিয়াম প্রদত্ত অর্থকে দেশের উন্নয়নের কাজে বিনিয়োগ করার পথ প্রশস্ত হয়। সারাদেশে নিগমের ১৬৬০টি শাখা অফিস ও ১০০টি ডিভিশন্যাল অফিস গড়ে উঠেছে। বর্ধমান জেলায় মোট ৫টি শাখা অফিস ও আসানসোলে বিভাগীয় অফিস আছে। শাখা অফিসের মধ্যে বর্ধমানে ২টি, কালনা ও দুর্গাপুরে ১টি করে এবং আসানসোলে ১টি শাখা ও একটি বিভাগীয় অফিস আছে। ১৯৬৯-৭০ জেলায় নিগমের ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৯.৮২ কোটি টাকা। সারা দেশে নিগমে মোট পরিবৃদ্ধি (accretion) ঘটে ৭৫ শতাংশ যার পরিমাণ ১৯৯৮-এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৮০৯৪৫ কোটি টাকা; সমস্তই Central Govt. Securities, প্রাদেশিক সরকারের সিকিউরিটি নিগম থেকে বিদ্যুৎ, গৃহ নির্মাণ, জল সরবরাহ, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, চিনি সমবায়, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে। নিগমের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পলিসি হল—Whole Life Assurance Plan, Term Assurance Plan, Plans for Children, Pension Plan, Jeevan Sarita, Jeevan Griha Plan, Mortgage

Redemption plan, New Jeevan Raksha, Marriage Endowment, Educational Annuity, Convertible whole life, Money Back Plan, Jeevan Suravi, Jeevan Sathi, Jeevan Mitra, Jeevan Shree, Asha Deep, Jeevan Aadhar, Jeevan Suraksha, Jeevan Sanchay, Jeevan Sneha, Group Insurance Scheme, Group Gratuity Scheme, Voluntary Retirement Scheme, Rural Group Life Insurance Scheme। অনেক বেকার যুবক Insurance-এর Agency করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সরকারী, বেসরকারী কর্মচারীদের যত বেতন বাড়ছে, ব্যবসাদারদের যত লাভ হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাবার জন্য লোকে তত Insurance-এর দিকে ঝুঁকছে।

জেলায় সদর, দুর্গাপুব ও আসানসোল মহকুমায় ১২টি বড় আকারের Primary Co-operative Agricultural Marketing Society আছে। ১৯৭০-৭১ সালে এদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭০২৪, কার্যকরী মূলধন ৩৭২১০০০ টাকা। এদের মাধ্যমে বিক্রীত পণ্যের মূল্য ৫২৫৬০০০ টাকা, কোন কোন সমবায়ে লাভ হলেও লোকসানের মাত্রাটাই বেশী। এই তিন মহকুমায় ৬টি পাইকারী ক্রেতা সমবায় সমিতি আছে। Burdwan, Asansol, Durgapur Whole Sale Consumers' Co-operative Society Ltd., Raniganj Colliery workers Co-operative Society, এদের সদস্য সংখ্যা ৫৩১, কার্যকরী মূলধন ৫৫৭২০০০ টাঃ, ক্রয় ৪১৯২৪০০০ টাঃ, বিক্রয় ৪৩৬৬৮০০০ টাকা, গড়ে লোকসান ১৪৪০০ টাকা।

আড়ৎদারী :

মেমারি, বর্ধমান, আসানসোল, কালনা, গুসকরা, জামালপুর, কাটোয়া ও রানীগঞ্জে আড়ৎদারী বাজার আছে—এখানে পাইকারী কেনাবেচা হয়। ১৯৬৬-৬৭ সালের হিসাবে দেখা যায় এই সমস্ত বাজারে বছরে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার টন মালের কেনাবেচা হয়েছে। বর্তমানে পণ্যের দাম ৮ গুণ বেড়ে গেছে, উৎপাদনও বেড়েছে। কাজেই বর্তমানে এই সমস্ত আড়তে লেনদেন কয়েক কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এই সব আড়তে সাধারণত চাল, ধান, পাট, আলু, গুড়, কলাই প্রভৃতির কেনাবেচা হয়।

এই সমস্ত আড়তে লেনদেনের সময় বিক্রেতাদের কাছ থেকে নানারকম বৃত্তি, কমিশন আদায় করা হয়—যেমন আড়তদারের কমিশন, দালালী, ধলতা। এই ধলতার আবার বিভিন্ন রেট আছে। চাষীদের কাছ থেকে কেনার সময় ৬০ কেজিতে আড়াই কেজি ও ছোট আড়তদারের কাছ থেকে ৬০ কেজির বস্তায়

১ কেজি ধুলো, ময়লা, শুক্তির জন্য বাদ দেওয়া হয়; তাতে ধূলা-ময়লা না থাকলে বা একেবারে শুকনো খটখটে ধান-চাল হলেও ধলতা কমে না। মিল মালিক আবার আড়তদারের কাছ থেকে বস্তায় ১ কেজি ধলতা বাদ দেয়। এগুলি ছাড়া শতকরা ১৬ পয়সা ঈশ্বর বৃত্তি, ওজন করার জন্য, বস্তা ওঠানো নামানোর জন্য কয়ালী বস্তায় ৬ পয়সা দাম থেকে বাদ দেওয়া হয়। এর ফলে চাষীরা প্রকৃত বাজার দরের চেয়ে শতকরা ৩ থেকে ৪ টাকা কম দাম পায়। এছাড়া পল্লীগ্রামে বাটখারার হেরফের আছে। পণ্য কেনার সময় বেশী ওজনের বাটখারা 'কেনারাম' ও বিক্রয়ের সময় কম ওজনের বাটখারা "বেচারাম" ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে চাষীরা চালাক হয়ে গেছে। আড়তদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও বাড়ছে, ফলে এই সব 'আবওয়াব' জাতীয় বৃত্তি বাটখারার কারচুপি উঠে যাচ্ছে। তবে 'ধলতা' এখনও পুরোদমে চলছে। ফল মাছ সব্জি পাইকারী কেনার সময় ধলতা ঈশ্বর বৃত্তি বহাল আছে।

আড়তদারদের মধ্যে বিশেষত ফল ও সব্জী বাজারে আর এক রকমের মাল বিক্রয়ের কারসাজি চালু হয়েছে—পণ্য ট্রাকে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিলামে চড়ানো হয়। আড়তদারের যাতে দুধে হাত না পড়ে অর্থাৎ সবচেয়ে কম লাভ যোগ করে একটা সরকারী দাম ঘোষণা করে নিলামে ডাক দেওয়া হয়। খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে কেনার সময় একটা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। যে সর্বোচ্চ ডাক দেয় সেই কিনে নিয়ে চলে যায়।

চাল কলের সংখ্যা :

১. জেলার মোট চালকলের সংখ্যা ৩১৫, এর মধ্যে ২৯০ টি চালু আছে। বাকী ২৫ টি বন্ধ। ২. হাসকিং মিলের সংখ্যা ২০০০-এর মধ্যে ১৯৫৮ সালের রাইস মিল আইন অনুসারে (Repealed) ১২০০ ও বিনা লাইসেন্সে ৮০০। বর্তমান আইনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হাসকিং মিল ১২৫, বিনা লাইসেন্সে চলে ১৮৭৫। ৩. চিঁড়া মিল ২০০-এর মধ্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ২৫ ও বিনা লাইসেন্সে ১৭৫। ৪. তেলকল ১০৩। ৫. রাইস ব্রান ওয়েল মিল ৫।

মুদ্রা :

তুর্কী সুলতানদের শাসনকালে তাঁরা নিজ নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করতেন, তাতে নাম ও সন অঙ্কিত থাকতো। মোগল সম্রাটদের শাসনকালে তাঁদের মুদ্রাই সম্রাটের নামাঙ্কিত টঙ্ক (Tanka) বাংলা তথা এ-জেলাতেও প্রচলিত ছিল। সাধারণ কেনাবেচায় কড়ি ব্যবহৃত হত। কড়ি ছিল সবচেয়ে কম মূল্যমানের গরীবের মুদ্রা। কারো কারো মতে আড়াই হাজার কড়িতে এক টাকা হত। আবার

ধরাপাতের নিয়ম মেনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ১২৮০ কড়িতে টাকা হত। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর বিবাহের খরচ ১৩ গণ্ডা। কড়ি ধরে বলেছেন আড়াই পয়সার কিছু বেশী অর্থাৎ ১২৮০ কড়ায় এক টাকা।

১৭৯২ সাল থেকে অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পর বাংলা ও উড়িষ্যায় বিভিন্ন রকমের Legal Tender মুদ্রা চালু করেছিল। W. W. Hunter তাঁর The Annals of Rural Bengal গ্রন্থে এব একটি তালিকা দিয়েছেন—কলকাতা টাঁকসালে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে যে সিক্কা টঙ্ক মুদ্রিত হয়েছিল তার মূল্যমানের সঙ্গে প্রচলিত সিক্কার একটা তুলনামূলক হিসাব এর থেকে পাওয়া যায়।

Species of Rupees	**Intrinsic value compared with sicca Rupees**		
	Rs.	a.	P.
1. Siccas of Moorshidabad, per sicca weight 100	100	0	0
2. Siccas of Patna	100	0	0
3. Siccas of Dacca	100	0	0
4. Pholy Sonats	100	0	0
5. Delhi Mahomet Shai	99	8	0
6 Money Surat, Large	99	8	0
7. Benares Sicca	99	8	0
8. Bissun Arcot	97	14	6
9. Sonats Sabic	97	8	0
10. Sonats Duckie	97	8	0
11. Forshee Arcots	97	6	6
12. French Arcots	97	0	0
13. Patanea Arcots	96	9	6
14. Aurungzebe Arcots	96	9	6
15. Gursaul	96	9	6
16. Madras Arcots new	96	4	9
17. Muslipatum Arcots	96	0	0
18. Shardar Arcots	96	0	0
19. Patna Sonatts, old	96	0	0
20. Beneras Rupees, old	95	14	6
21. Madras Arcots, old	95	14	6
22. Furrakabad Rupees	95	12	6

23. Jehanjee Arcots	95	11	3
24. Chunta Arcots	95	11	9
25. Calcutta Arcots	95	11	3
26. Moorshidabad Arcots	95	6	6
27. Old Arcots	95	3	3
28. Dutch Arcots	95	0	0
29. Surat Arcots	95	0	0
30. Benares Frisolie	92	6	6
31. Viziery Rupees	63	0	0
32. Narray half rupee	63	0	0

১২৬১ ৪ঠা আশ্বিন সংখ্যার 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার 'স্বর্ণমুদ্রা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মোগল আমল থেকে এ জেলাসহ অন্যত্র স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। ইংরেজ কোম্পানী প্রথম প্রথম এ মুদ্রা চালু রেখেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁরা এর প্রচলন বন্ধ করে দেন ও ব্যাঙ্ক নোট চালু করেন—

স্বর্ণমুদ্রা ৪.৬.১২৬১

"ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনকরণ বিষয়ে গত গুরু-বাসরীয় ফ্রেন্ড অব্ ইণ্ডিয়া পত্রে তদগুণাকর সম্পাদক মহাশয় যে সমস্ত সদভিপ্রায় লিখিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠকরতঃ পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। পৃথিবীর যখন সকল দেশেই উক্ত প্রকার মুদ্রা প্রচলিত আছে তখন এই সুবর্ণভূমি ভারতবর্ষে তাহার চলন রহিত করা বিলাতের কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই; পুরাকালে অর্থাৎ স্বাধীন নৃপতিদিগের সময়ে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত ছিল, যবন নৃপতিরাও স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আকবর বাদশাহ উৎকৃষ্ট স্বর্ণে মোহর প্রস্তুত করাতে তাহার মূল্য অদ্যাবধি বাজারে বৃদ্ধি রহিয়াছে, এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য লোকেরা অতি যত্নপূর্বক সেই মোহর রক্ষা করেন ও তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট আভরণাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে।"

পরন্তু ইংরাজেরা এদেশের অধিকারি হইয়াও স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতকরণে বিরত হন নাই, তাঁহারা ইংরাজী ১৭৯৫ সালে যে মোহর এবং তাহার আধুলি ও সিকি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপিও বাজারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা মুদ্রার মূল্যে বিক্রয় হয় না, স্বর্ণের মূল্যেই বিক্রয় হইয়া থাকে।

এইখানে টাঁকশালে আর স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হয় না, গভর্নমেন্ট রাজস্ব সংগ্রহ সময়েও মোহর গ্রহণ করেন না, এ কারণে মোহরের দর নিরূপিত নাই, তামা, দস্তা, পিতল প্রভৃতি অন্যান্য ধাতুর ন্যায় স্বর্ণের মূল্যেরও সময় সময় ন্যূনাতিরেক হইতেছে।

ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা চলিত না থাকাতে সাধারণের অনেক কষ্ট হইতেছে, কোন দেশ হইতে কোন দেশে নগদ পাঠাইবার উপায় নাই, রৌপ্যমুদ্রা একত্রে অধিক পাঠাইতে হইলে তৎপ্রেরণকারীর অধিক ব্যয় হইতে পারে ও বিংশতিজন বাহক একশত জন প্রহরী ব্যতীত ১০,০০০ মুদ্রা প্রেরণ করা যাইতে পারে না।

এই স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, "ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গাল নোটের চলিত থাকাতে অনেক সুবিধা হইতেছে। এই কথা আমরা কোনমতে স্বীকার করিতে পারি না, কলিকাতার বেনেতি দোকানে ব্যাঙ্ক নোট ভাঙ্গাইতে হইলেও দুই চারি পয়সা বাঁটা লাগিয়া থাকে, পশ্চিমের কোন মহাজনেরাই ব্যাঙ্ক নোট গ্রাহ্য করেন না, তথায় যে-সকল কুটিওয়ালা ব্যাঙ্ক-নোট লইয়া থাকেন তাঁহারা অধিক বাঁটা চাহিয়া বসেন, তাহাতে ভ্রমণকারী ও অন্যান্য মহাজনদিগের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হইলে ও গভর্নমেন্ট তাহার মূল্য নিরূপণ করিয়া দিলে সাধারণ প্রজাদিগের এই ক্লেশ অনেক নিবারণ হইতে পারিবেক....."

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এদেশে রৌপ্যমাণ মুদ্রা প্রচলিত হয়। বিলাতী মুদ্রার সঙ্গে এর অনুপাত ছিল ১ টঙ্ক = ১ শিলিং ৪ পেনি (স্বর্ণমান)। বিদেশের সঙ্গে বিনিময় হতো স্বর্ণমাণ মুদ্রায়। এর জন্যে ভারতের টাঁকশালে Sovereign মুদ্রা মুদ্রিত হতো—টাকায় এর বিনিময় মূল্য ছিল ১৫ টাকা।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের একটি আইনের বলে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কাগুজে নোট চালু হয়। রূপার টাকায় ১৬৫ গ্রেন রূপা ও ১৫ গ্রেন খাদ থাকতো। ১৯৪০ সালের পর নিকেলের টাকা, আধুলি, সিকি টাঁকশালে মুদ্রিত হতে থাকে।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রিক পদ্ধতি চালু হয়। এক টাকার মূল্য হয় ১০০ নয়া পয়সা, ০৬ পয়সায় এক আনা, ১২ পয়সায় দুই আনা, ১৯ পয়সায় তিন আনা ও ২৫ পয়সায় চার আনা। রূপার টাকা এখন উঠে গেছে। যত টাকার নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ইস্যু হয় তার জন্যে আগে ৪০ শতাংশের মত সোনা রিজার্ভ রাখতে হতো যাতে নোটের ওপর ব্যাঙ্কের গভর্নরের স্বাক্ষরে 'I Promise to pay the bearer the sum of Rupees.....' এই চুক্তিমত কেউ সমমূল্যের স্বর্ণমান দাবী করলে চুক্তি রক্ষিত হয়। মহাযুদ্ধের পর থেকে ওসব চুক্তি মূল্যহীন হয়ে গেছে। টাকার মুদ্রা এখন লোহার ওপর নিকেলের কোটিং দেওয়া—চুম্বক দিয়ে এর শুদ্ধতা পরীক্ষা করা হয়। নোটগুলি অধিক ব্যবহারের ফলে ক্রমাগত জীর্ণ হয়ে পড়ায় অচল হয়ে পড়ছে; কাজেই সরকার বিদেশ থেকে coin মুদ্রিত করিয়ে আমদানী করছেন।

আটত্রিশ অধ্যায়



স্বাস্থ্য পরিষেবা

সেকাল ও একাল : জনগণের স্বাস্থ্য নির্ভর করে ভূমির প্রকৃতি, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ও জনগণের খাদ্যাভ্যাসের ওপর। জেলার পূর্বাংশ ও পশ্চিমাংশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমপ্রান্ত থেকে গলসী পর্যন্ত পাথুরে কাঁকুরে লাল ল্যাটেরাইট শুষ্ক উচ্চভূমি, বৃষ্টিপাতও পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা কম। ফলে পশ্চিমাঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম। পূর্বাঞ্চলে খানাখন্দ বেশী, বৃষ্টিপাত ও পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে বেশী, কাজেই বর্ষায় এইসব খানাখন্দ জলে পূর্ণ হয়। বন্যা হলেও বন্যার জল নেমে গেলেও খানাখন্দ পুকুর জলে পূর্ণ থাকে। এইসব খানাখন্দগুলি হয়ে ওঠে মশার জন্মস্থান। এই মশাই ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু রোগের জীবাণু ছড়ায়।

পূর্বে পল্লীগ্রামে নলকূপ ছিল না— গ্রামের মধ্যে হয় একটা দুটো ঘরে পাটের কূয়ো আর ৫।৬ গ্রামের মধ্যে ২।১ টা পাকা ইঁদারা থাকতো।'কাজেই গ্রামের অধিকাংশ মানুষই পুকুরের জল স্নান-পানের জন্য ব্যবহার করতো। তাছাড়া গ্রামে পায়খানার বালাই প্রায় ছিলই না। মাঠ, পুকুরপাড়ই গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় কর্মের একমাত্র স্থান। আর এইসব স্থান থেকে ময়লাসহ জলধারা পুকুরেই পড়ে পুকুরের জলকেও দূষিত করে। আর এই জল পান করার ফলে গ্রামের জনগণ জলবাহিত সান্নিপাতিক, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগের শিকার হয়।

আবার গ্রামে ২।১ ঘরে বসন্ত, কলেরা দেখা দিলে এইসব রোগীর ব্যবহৃত জামাকাপড় বিছানা পুকুরেই কাচা হয়, ফলে শীঘ্রই এই সমস্ত রোগের সংক্রমণ সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে—কলেরা বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দেয়।

প্রাচীনকালে জেলার প্রধান প্রধান রোগ ছিল ম্যালেরিয়া, পেটের অসুখ, কলেরা, আমাশয়, সান্নিপাতিক, নানারূপ চর্মরোগ—খোস-পাঁচড়া, দাদ, শিশুদের

পেঁচোয় পাওয়া (রিকেট), নারেঙ্গা, তাছাড়া ছিল নিউমোনিয়া, মৃগী, সন্ন্যাস ইত্যাদি। তবে জ্বরের প্রকোপই ছিল বেশী। কখনও কখনও বসন্ত, কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিত।

জেলায় পাশ করা ডাক্তার ছিল না। গ্রামে বা শহরে ছিল বৈদ্য বা মুসলমান হেকিম। এদের ওষুধ ছিল জড়ি-বুটি, পাঁচন ইত্যাদি। জ্বর হলে চিরতা ভিজানো জল, কোষ্ঠবদ্ধতায় সোনাপাতা ভিজানো জল, ও রোগ অনুযায়ী শিউলি পাতার রস, থানকুনি পাতার রস, হেলেঞ্চা, কুলেখাড়া প্রভৃতি ভেষজ ওষুধই ছিল একমাত্র ঔষধ। আর তাছাড়া ওঝা, মাদুলি, তাবিজ, ঠাকুরের স্নান-জল, এইসব ব্যবহার হতো গ্রামবাসীদের আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী। "মন্ত্রেতীর্থে দ্বিজে-দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ/যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে এই রকম বৈদ্য ও জড়িবুটির উল্লেখ করেছেন। কালকেতু গুজরাটে নগরপত্তন করে বিভিন্ন বৃত্তির লোকের সঙ্গে বৈদ্যদের বসতি করান। তাদের চিকিৎসা পদ্ধতিরও বিবরণ দিয়েছেন কবিকঙ্কণ মহাশয়—

গুজরাটে যেখানে 'প্রজা বৈশে সুখে' সেখানে আপন আপন কুলস্থানে গুপ্ত, সেন, দাস, দত্ত উপাধিকারী বৈদ্যগণ বসতি স্থাপন করেন—

বৈদ্যক জনের তত্ত্ব গুপ্ত সেন দাস দত্ত
কর আদি বৈসে কুলস্থান
মুনিকায় কার যশ কেহো প্রয়োগের বশ
নানা তন্ত্র করয়ে বাখান।
উঠিয়া প্রভাতকালে উৰ্দ্ধফোঁটা করি ভালে
বসন মণ্ডিত করি শিরে
পরিআ উজ্জ্বল ধুতি কাখে করি লয়া পুঁথি
গুজরাটে বৈদ্যজন ফিরে।
জার দেখে সাধ্য রোগ ঔষধ করএ যোগ
বুকে ঘা মারিআ আগে ধায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ পালাইতে করে যোগ
নানা ছলে করএ বিদায়।
কর্পূর পাঁচন করি তবে জিয়াইতে পারি
কর্পূরের করহ সন্ধান
রোগী সবিনয়ে বলে কর্পূর আনিতে চলে
সেই পথে বৈদ্যের পালান।

বৈদ্যদের এক একজন এক বিষয়ে দক্ষ—কেউ "মুনিকায় (মুনিকা) অর্থাৎ জড়িবড়ি" ব্যবহার করে রোগ সারান—আবার কেউ মালিশ তেল বা পাঁচন প্রয়োগ করে রোগীকে সারিয়ে তোলেন।

বৈদ্যদের বর্ণনাটিও সুন্দর; পরিধানে ধোপদুরস্ত কাপড়, কপালে চন্দনের ফোঁটা, বগলে পুঁথি নিয়ে বৈদ্যগণ রোগী দেখে বেড়ান, রোগ সাধ্যায়ত্ত হলে ওষুধ প্রয়োগ করেন আর অসাধ্য দেখলে রোগীকে কর্পূরের পাঁচনের ব্যবস্থা দেন ও রোগী কর্পূরের সন্ধানে বের হলে বৈদ্যমশাই সেই পথে চম্পট দেন। "যঃ পলায়তে স জীবতি"।

আবার শল্য চিকিৎসাও ছিল—সেও বড় অদ্ভুত :

এক ভিতে বসিল মারাটা
ফিরে তারা গুজরাটে সুলঙ্গে পিলুই কাটে
ছানি ফোঁড়ে চক্ষে দিআ কাঁটা।

দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়া রোগে ভুগলে প্লীহা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। গুজরাটের শল্য চিকিৎসক সুলঙ্গে (সুরঙ্গে) অর্থাৎ পেট ফুটো করে প্লীহা অপারেশন করেন আর চোখের ছানি অপারেশন করতে কাঁটা ব্যবহার করেন।

কাজেই মুকুন্দরামের সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও ছিল যথেষ্ট, কারণ দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়া রোগে ভুগে প্লীহা বৃদ্ধি ঘটলে পেট ফুটো করে প্লীহা সারানো হতো। বসন্ত হলে শীতলা, দিদি ঠাকরুন-এর কাছে মানসিক করা, ওঝা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক এই সবই চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল। ১০ই পৌষ ১২৪৪ (২৩।১২।১৮৩৭) তারিখের জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার একটি রিপোর্টে দেখা যায়—বর্ধমান রাজবাড়ীতে কোন এক যুবরাজের বসন্ত রোগ হওয়ায় গোপীনাথপুর (রঙ্কিণী মহল্যা)এর রঙ্কিণীদেবীর নিকট নরবলি দেওয়া হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকেও দেখা গেছে যখন ১৯৪৫ সালে বর্ধমান শহরের ও আশেপাশের গ্রামে গুটিবসন্ত মহামারী রূপে দেখা দেয় তখন (পাশ করা নয়) হাতুড়ে কবিরাজ ডেকে নিমের ডাল দিয়ে ঝেড়ে দিয়ে মন্ত্রপূত তেল মালিশ করে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা ছিল। হয়ত নিমডাল বা মন্ত্রপূত তেলে বসন্ত রোগ নিরাময়ের কোন ভেষজগুণ থাকতো যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে রোগী সেরেও যেত, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগী মারা যেত।

১৮৬২ সালের পূর্ব পর্যন্ত বর্ধমান ছিল স্বাস্থ্যকর স্থান—এখানে ভিন্ন জেলা ও ভিন্ন প্রদেশ থেকে দীর্ঘদিনের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী রোগ নিরাময় ও

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে বর্ধমানে এসে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতো। এই সময় এই ভয়ঙ্কর রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল বিশেষ করে বর্ধমানের পার্শ্ববর্তী হুগলী, নদীয়া, যশোর প্রভৃতি জেলায। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই মারাত্মক ম্যালেরিয়া হুগলী, যশোহর, নদীয়া সীমান্ত অতিক্রম করে, বর্ধমানের কালনায় প্রবেশ কবে ও সেখানে মহামারীরূপে দেখা দেয়। অচিরে এই রোগ কাটোয়া ও বর্ধমানে ছড়িয়ে পড়ে এবং মহামারীরূপে দেখা দেয়। এই রোগ ১৮৬২ সালে সংক্রামিত হলে জেলার লোকসংখ্যার তৃতীয়াংশ উজাড় হয়ে যায়। একটি পরিসংখ্যান-এ দেখা যায ১৮৬৯ সালে বর্ধমানের জনসংখ্যা ছিল ৪৬,০০০; ১৮৭২ সালে এর লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৩২,৬৮৭ অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে জেলার ত্রিশ শতাংশ লোক উজাড় হয়ে যায়। এই সময় কাটোয়ার ১৭টি গ্রামে ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে দেখা দেয়। ঐ ১৭টি গ্রামের তখন লোকসংখ্যা ছিল ১৪,৯৮২। এই লোকের মধ্যে যারা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় তাদের মধ্যে ৬২৪৩ জনের মৃত্যু হয় অর্থাৎ আক্রান্তদের মধ্যে ৪১.৭ শতাংশ লোক উজাড় হয়। (বর্ধমান গেজেট, পিটার্সন ১৯১০)

১৮৭২ সালে জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসার জন্য ৫৬টি ভ্রাম্যমাণ ও ৫টি স্থায়ী হাসপাতাল গড়ে ওঠে। এগুলির কতক সবকারী ও কিছু বেসরকারী—৫টি হাসপাতাল ছিল—বর্ধমানে (১৮৩৭), কাটোয়া (১৮১০), চকদীঘি (১৮৫৯), বুদবুদ (১৮৬৪) ও রানীগঞ্জে (১৮৬৯)।

১৮৮১ সালের জনগণনায় দেখা যায় ১৮৬২ থেকে ১৮৭৪-এর মধ্যে ১২ বৎসরে জেলায় ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। এই ম্যালেরিয়ার বিভিন্ন টাইপ ছিল—সবিরাম, অবিরাম বা একজ্বরী, ম্যালিগ্ন্যান্ট। ওষুধ ছিল চিরতা ভিজানো জল, শিউলি পাতার রস, সোনাপাতা, হরিতকী আমলকী বহেড়া সিদ্ধ পাঁচন, বড়জোর পোষ্ট অফিসের কুইনাইন বড়ি, অবশ্য কুইনাইন বড়ির ব্যবহার শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। এইসব ওষুধ খেয়ে জ্বর ছাড়লে তার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যেত না। এই জ্বর আরম্ভ হতো বর্ষা শেষে আর সারা শীতকাল ধরে এর প্রকোপ অব্যাহত থাকতো।

১৮৭১ সালের হিসাবে দেখা যায় স্থানীয় চিকিৎসালয়ে ৪ লক্ষ ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসা হয়েছিল। সরকার এদের চিকিৎসার জন্য কুইনাইন প্রয়োগ ও অন্যান্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন—এর জন্যে সরকারের ব্যয় হয় প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা। এসময় জেলার সিভিল সার্জেন ছিলেন **Captain N.W. Mackworth, M.S.**

তিনি এসময় এ জেলার প্রাদুর্ভূত নিম্নলিখিত রোগগুলিকে চিহ্নিত করেছেন :

১. Intermittent Fever (সবিরাম জ্বর)
২. Quotidian (প্রাত্যহিক জ্বর, একজ্বরী)
৩. Tertian (দুদিন অন্তর পালা জ্বর)
৪ Quartian (৩ দিন অন্তর পালাজ্বর)
৫. Double Quotidian (দিনে ২ বার জ্বর আসে)
৬. Typho malarial (সান্নিপাতিক ম্যালেরিয়া—জ্বর বিকার)
৭. Remittent Fever (অবিরাম জ্বর)
৮. Bilious Remittent (পিত্তাধিক্যসহ অবিরাম জ্বর)
৯. Pernicious Malarial fever (বিশেষ ক্ষতিকারক সাংঘাতিক রকমের ম্যালেরিয়া)
১০. Unclassified Fever (বিশেষ ধরনের জ্বর)
১১. Pernicious cachectic fever (ক্ষতিকারক দুর্বলকারী দীর্ঘকালীন জ্বর)
১২. Typhoid Fever (সান্নিপাতিক জ্বর)
১৩. Kala-Azar (কালাজ্বর)

প্রধান প্রধান অসুখের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

Intermittent Fever : কম্প দিয়ে জ্বর আসে—২/৩টি লেপ চাপা দিয়েও কাঁপুনি থামতে চায় না—ছাড়ার সময় প্রথমে ঘাম হয়, দীর্ঘদিন ভোগার পর কুইনাইন প্রয়োগে জ্বর বন্ধ হয়। আবার জ্বর আসে ও একদিন অন্তর বা ২ দিন অন্তর পালাজ্বরে দাঁড়ায়, প্লীহা বড় হয় যকৃৎও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Bilious remittent : পাকাশয়, যকৃৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জন্ডিস বা ন্যাবার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। জ্বর ২ সপ্তাহে না ছাড়লে Typhoid-এ পরিণত হতে পারে। জ্বর সাধারণত ৭দিন, ৯ দিন, ১১ দিন বা ১৩ দিনের ছাড়ার সম্ভাবনাথাকে।

Typhoid : জলবাহিত সান্নিপাতিক জ্বর—অন্ত্রে ক্ষত হয়, জ্বর একেবারে ছাড়ে না—মলের সঙ্গে আলকাতরার মত রক্ত থাকে—৩ সপ্তাহ, ১ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়—Chloromycetin আবিষ্কারের পূর্বে ফাজ জাতীয় ঔষধই ছিল ভরসা—দীর্ঘস্থায়ী হলে মৃত্যু ঘটতে পারে।

Kala-Azar : একপ্রকার Sand-fly বাহিত Leishmania Denovani Parasite বাহিত আসামী রোগ—Spleen Punctureএর জন্য অপারেশন প্রয়োজন হয়। এ জেলায় এ-রোগের বিশেষ প্রকোপ নাই। বর্ধমান জেলার

জামালপুরের উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৮৭৫-১৯৪৬) এই রোগের একমাত্র ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কার করে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ম্যালেরিয়াই ছিল জেলার সর্বপ্রধান রোগ। নামই ছিল Burdwan Fever। ১৯০০-১৯০৯ সাল পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা নীচের তালিকা থেকে পাওয়া যাবে—

সাল	মৃত্যুর সংখ্যা	জেলার মোট জনসংখ্যার অনুপাতে হাজার করা হার
১৯০০	৩২০৭২	২৩.০৪
১৯০১	৩৩৬৬২	২১.৯৬
১৯০২	২৮৭১৮	১৮.৭৪
১৯০৩	৩৬৯৫৩	২৪.১১
১৯০৪	৩০৪২৫	১৯.৮৫
১৯০৫	৩৮৮৪৭	২৫.৩৫
১৯০৬	৩৯৪৯৬	২৫.৭৭
১৯০৭	৪৫৮১৫	২৯.৮৯
১৯০৮	৪২৮১৬	২৭.৯৩
১৯০৯	২৮২১০	১৮.৪১

১৯৪২ সালে মিলিটারী থেকে ব্যাপক ভাবে DDT spray করায় ম্যালেরিয়া নির্মূল হয়—তবে বর্তমানে ১৯৮০-র দশক থেকে আবার এর প্রাদুর্ভাব বেড়েছে।

কলেরা : ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত এ-জেলায় কলেরার প্রকোপ তেমন ছিল না। কিন্তু এরপর যখনই কোথাও কলেরার প্রাদুর্ভাব হতো গ্রাম একেবারে উজাড় হয়ে যেত। এর থেকে মনে হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জেলায় জলদূষণ বাড়তে থাকে। জেলার পশ্চিমাঞ্চলে আসানসোল রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে কলেরার প্রাদুর্ভাব বাড়তে থাকে। কুলি ধাওড়ায় পায়খানার অবস্থান, ঘন বস্তি, অপরিচ্ছন্ন নোংরা পরিবেশ ও কলেরা একবার আরম্ভ হলে ময়লাযুক্ত কাপড়চোপড় সন্নিহিত পুকুরে কাচার অভ্যাস-এর জন্যই দ্রুত এর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে।

১৯০৪ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত এই রোগের মৃত্যুর সংখ্যা থেকে এই রোগের সংক্রমণের ব্যাপকতা সম্বন্ধে ধারণা হবে :

সাল	মৃত্যুর সংখ্যা
১৯০৪	২৫৬০
১৯০৫	৪৩০১
১৯০৬	২৮১৪
১৯০৭	৫৯১৩
১৯০৮	১৪২৬৮
১৯০৯	১৩৯৯

তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে—১৯০৭ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত এই রোগ মন্তেশ্বর, রানীগঞ্জ, পূর্বস্থলী, কাটোয়া, আসানসোল, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম ও সাহেবগঞ্জ এলাকায় মহামারী রূপে দেখা দেয়। ১৯০৭ জুলাই থেকে ১৯০৮ জুন পর্যন্ত ১ বছরে মৃত্যুর সংখ্যা ১৬,৪৪৬ জন অর্থাৎ জনসংখ্যার নিরিখে হাজারে ১০.৭৩ জন। এক মন্তেশ্বরেই ১৯০৮ সালে কলেরায় মৃত্যুসংখ্যা ছিল হাজারে ২০ জন। ১৯০৮-এর পর এর ব্যাপকতা কমতে শুরু করে।

গুটিবসন্ত : ১৯০০-এর পূর্বে এই রোগের তেমন ব্যাপকতা ছিল না। এই রোগের মধ্যে জলবসন্ত তেমন ক্ষতিকর নয় তবে গুটিবসন্ত ও চাপড়াবসন্ত ভীষণ ক্ষতিকর। ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত, এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৯৮২ অর্থাৎ হাজারে ০.৬৪ জন। ১৯৪৫ সালে এই রোগ বর্ধমান শহরে ও আশেপাশে গ্রামে মহামারী রূপে দেখা দেয়।

প্লেগ : ইঁদুরবাহিত রোগ। প্রবল জ্বর হয়, হাত-পা-এর গাঁট ফোলে ও মৃত্যু হয়। এ জেলায় এর বিশেষ প্রকোপ নাই—১৯০৬ সালে কলকাতা থেকে এ রোগের আমদানী হয় ও সংক্রমণে ৯০ জনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়।

সর্পদংশন : বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বেশী—তবে বিষধর সর্পের সংখ্যা কম। গড়ে বছরে সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার হাজারে ১৬৫। পূর্বে হাসপাতালে এর চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। তখন ওঝার ঝাড়ফুঁক, টোটকা জড়ি-বুটি, দংশনের জায়গা থেকে রক্ত চুষে নেওয়া, ক্ষতের স্থানে একপ্রকার ছোট পাথর বসিয়ে বিষকে শোষণ করার পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। বর্তমানে হাসপাতালে Anti Venum Serum প্রয়োগ করে অনেককে নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে।

টিকাকরণ : ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে টিকাকরণ ব্যবস্থা সিভিল সার্জেনের তত্ত্বাবধানে আসে। প্রথমে ৩২ জন লাইসেন্স-প্রাপ্ত টিকাদারকে দিয়ে টিকা দেবার ব্যবস্থা হয়। এদের মজুরী ছিল যতজনের টিকাকরণ হবে টিকাদার মাথা পিছু দু-আনা করে পাবে। মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় মাসমাহিনা বেতনে টিকাদার নিযুক্ত হতো—

বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটিতে ছিল ২ জন, আর আসানসোল, রানীগঞ্জ, কালনা মিউনিসিপ্যালিটির প্রত্যেকটিকে একজন করে আর কাটোয়া ও দাঁইহাটের জন্য একজন। মিউনিসিপ্যাল এলাকা ভাগ করে দেওয়া হতো—প্রত্যেক এলাকায় সপ্তাহে ২ দিন করে টিকাদারকে টিকা দিয়ে বেড়াতে হতো। কেবলমাত্র বসন্তের টিকার জন্য Lanoline Lymhই ব্যবহার করা হতো। বছরে ৫০৭১৩ জনকে প্রাথমিক ও ৩৬৯৮ জনকে পুনর্টিকাকরণ করা হতো। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষত উগ্রক্ষত্রিয় ও মুসলমানদের টিকা নিতে প্রবল আপত্তি ছিল। টিকাদার গ্রামে ঢুকলে অনেকে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে মাঠে আশ্রয় নিত। শতকরা ৯৭.৯৪ ক্ষেত্রে টিকাদান সাফল্যমণ্ডিত হতো। প্রতি টিকাদানের জন্য সরকারের মাথাপিছু ১১১/২ পাই খরচ পড়তো। ১৯৪৫ সালের পর মিলিটারী থেকে গ্রামে গ্রামে বাধ্যতামূলক ভাবে টীকাকরণ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। যতদূর মনে পড়েছে "Pox Free World" পরিকল্পনা অনুসারে ৬০ এর দশকে নিবিড় টিকাকরণ প্রকল্প গৃহীত হয় যার ফলে বর্তমানে Small Pox (গুটিবসন্ত) নির্মূল হয়েছে।

ডিসপেনসারী : বিংশ শতকের প্রথমদিকে বর্ধমান কাটোয়া রানীগঞ্জে ও দাঁইহাটে মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। এছাড়া ১০টি জেলাবোর্ড পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। কাঞ্চননগরে ব্যক্তিগত দানে দীননাথ দাস দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছিল। বর্ধমান মহারাজা বর্ধমান ও কালনায় হসপিটাল স্থাপন করেছিলেন। পরে ১৯০৮ সালে বর্ধমানের মহারাজার ৮০,০০০ টাকা ও সরকারের ৮০,০০০ টাকার অনুদানে বর্ধমানে জেলা হসপিটাল স্থাপিত হয়। এর নির্মাণের ব্যয় ধরা হয়েছিল ২ লক্ষ টাকা। লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার এ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের নামানুসারে এর নাম হয় ফ্রেজার হসপিটাল। বর্তমানে স্যার এ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার হসপিটাল নাম পরিবর্তিত হয়ে ও নাম হয় বিজয়চাঁদ হসপিটাল—বর্তমানে এর সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজও স্থাপিত হয়েছে।

নিম্নের তালিকাভুক্ত ডিসপেনসারীতে ১৯০৭, ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালের চিকিৎসিত রোগীর গড় সংখ্যা দেওয়া হলো।

ডিসপেনসারীর / হাসপাতালের নাম	প্রতিষ্ঠার তারিখ	চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা	দৈনিক গড় রোগীর সংখ্যা	অপারেশনের সংখ্যা
১। বর্ধমান	১৮৩৭	২২৮১৪	১৮২.৫১	২০৪৭
২। কাটোয়া	১।২।১৮৬০	৫৪৮১	৫৯.৭১	১৯০
৩। রানীগঞ্জ	১।১।১৮৬৭	৪৩২১	৪৭.৩৭	৪৬১
৪। দাঁইহাট	১।৬।১৮০২	৫৫০২	৪৩.৭৭	২৬৮

ডিসপেনসারীর / হাসপাতালের নাম	প্রতিষ্ঠার তারিখ	চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা	দৈনিক গড় রোগীর সংখ্যা	অপারেশনের সংখ্যা
৫। পূর্বস্থলী	১।৮।১৮৯৬	৬৫৫২	৫১.২৩	২৩৬
৬। কুলীনগ্রাম	১।১২।১৮০৫	৪৮৯৫	৩১.৬২	৯৩
৭। মাহাতা	১।৬।১৮০২	৭৩১৪	৯২.২৮	৫৪৯
৮। মেড়াল	১।৬।১৮০২	৭৪১৩	৩৮.৩৮	২৪২
৯। জামনা	১।৪।১৮০৬	৮৭৩৬	৬১.৬৬	১৫৪
১০। আদরা	১৫।৫।১৮০৪	১০৭২৯	১৩৩.২৬	৩৯৪
১১। খণ্ডঘোষ	৯।৯।১৮০৪	৭১৭০	৬৪.৫৯	১৩৫
১২। মঙ্গলকোট	১১।১১।১৮০৪	৬৫০২	৬৪.৬৬	২২৮
১৩। কেতুগ্রাম	১।৯।১৮০৫	৭০৩৪	৪৫.৮৮	২৯১
১৪। আউসগ্রাম	১৮।৯।১৮০৫	৬৮৫৪	৪৭.৬৫	১২৬
১৫। চকদীঘি	১৫।৪।১৮৫৯	৮৩৩৫	৫৭.০১	৩৫৪
১৬। কাঞ্চননগর	৮।৭।১৯০৬	৪৩৩৪	৪৬.৬৪	৯

এছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর নিজস্ব পরিচালনায় বর্ধমান, আসানসোল, অণ্ডাল ও সীতারামপুরে রেলওয়ে কর্মীদের জন্য রেল হাসপাতাল আছে।

কুষ্ঠাশ্রম : Wesleyan ক্রীশ্চান মিশনারী পরিচালিত দু-একটি কুষ্ঠাশ্রম ছিল রানীগঞ্জে ও আসানসোলে। আসানসোল কুষ্ঠাশ্রমে বর্ধমানের মহারাজা ও বাবু ভগবানদাস মাড়োয়ারী প্রত্যেকের একটি করে Ward ছিল। পরে বর্ধমান শহরে মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত একটি কুষ্ঠাশ্রম ছিল—বর্তমানে তিনকোনিয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে। কিছুদিন চলার পর কুষ্ঠাশ্রমটি বন্ধ হয়ে যায়।

জন্ম-মৃত্যুহার : ১৯৪১ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুহার পর্যালোচনা করে দেখা যায় জন্ম-হার ক্রমশ উর্ধমুখী কিন্তু মৃত্যুহার ক্রমশ নিম্নমুখী। এর দ্বারা বোঝা যায় এই ২০ বৎসরে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্য মৃত্যুহার কমেছে কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের অনীহা ছিল। (সারণী–১)

আবার ১৯৬১ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুহার থেকে দেখা যায় জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই ক্রমশ নিম্নমুখী। কাজেই এই সময় থেকে বোঝা যায় জনসাধারণের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। (সারণী–২)

সারণী-১

	১৯৪১-৫০				১৯৫১-৬০			
	জন্ম	জন্মহার	মৃত্যু	মৃত্যুহার	জন্ম	জন্মহার	মৃত্যু	মৃত্যুহার
পুরুষ	২,১৮,৩৩৮	১১.৫	১৯২৪১২	১৯.৩	২৭৬৭৬২	১২.৬৩	১০৬৯০৫	৯.২১
মহিলা	২০৩৪১১	৭.৮	১৭৯৮০২	২০.২	২৫৭৭৭৯	১১.৭৬	৯৩২৮৯	৯.০৫

সারণী-২

১৯৬১–৬৬ জেলায় শহর ও গ্রামভিত্তিক জন্মমৃত্যু হার

সাল	শহর (জন্ম)	গ্রাম (মৃত্যু)	জন্মহার	শহর (জন্ম)	গ্রাম (মৃত্যু)	মৃত্যুহার
১৯৬১	৫৪৬৮	৫২৯৭৭	১৮.৮	১২৮৭	১৬৪৭৯	৯.০
১৯৬২	৫০৭৩	৫৩২৮২	১৮.২	১১৩১	১৫৯২২	৮.৬
১৯৬৩	৪৫৬৭	৪৮৩৫০	১৬.১	১২১২	১৬৮৯০	৫.৫
১৯৬৪	৬৩৯০	৪৪৮৪২	১৫.২	১৭০৩	১৬৩৫২	৫.৩
১৯৬৫	৪৯৭৭	৪০৪১৬	১৩.২	১০৩৪	১৪১২৫	৪.৭
১৯৬৬	৪৭৪৮	৪৫৭৪৭	১৪.৩	১১৪৩	১৬৭১৪	৫.০

(Source : Directorate of Health Services) বর্তমানে জেলায় প্রাদুর্ভূত বিভিন্ন রোগের যে নাম পাওয়া যায় তার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

Anaemia, Bronchitis, Cholera, Diabetis, Diphtheria, Dysentery, Aemiambi and baccilary, Food poisoning, Gastritis, Gonococeal infection, Heart diseases, Leprosy, Malaria—Malignant Neoplasury Measles, Small Pox, Chicken Pox, Pneumonia, Pregnancy Diseases, Snake bite, Titanus, T.B. (Bones, Meninges, Pulmonary), Respiratory System, Typhoid, এছাড়া আছে Blood Pressure, Stroke, Cholera, Enteric, Allergic diseases, Diabetes, Eye diseases, Filariasis, Infectious Hepatitis, Influenza, Kala-Azar, Paratyphoid fever, Whooping cough, Asthma, T.B. Intestine Blood Cancer, Cancer, Japanese Encaphalitis, Poliomyeelitis etc.

স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুষ্ঠরোগ, পোলিও দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য সরকার থেকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন

করা হয়েছে। এর জন্যে একদিকে অধিকাংশ কুষ্ঠরোগ সংক্রামক নয় ও যথাসময়ে চিকিৎসা করালে কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায় বলে প্রচার চালানো হয়েছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে এদের বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরীক্ষা দেখা গেছে শতকরা ৭৫ ভাগ কুষ্ঠরোগ সংক্রামক নয়। অবশ্য জেলার উত্তর-পশ্চিমে শিল্পাঞ্চলে কুষ্ঠের প্রকোপ বেশী। এর জন্য আসানসোল Mines Board of Health আসানসোল ও রানীগঞ্জে অনেকগুলি কুষ্ঠাশ্রম পরিচালনা করে। খনি অঞ্চলে ২৪২ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ও কয়েকটি Segregation Camps কুষ্ঠ পরিষেবা প্রতিষ্ঠান আছে।

Asansol Mines Board of Health ও Asansol Relief Association নিম্নে বর্ণিত কুষ্ঠাশ্রম পরিচালনা করে।

Leprosy Institutions in Asansol Mining Area 1972

Name	Date of Establishment	P. O.	No. of Beds
1. Asansol Leprosy Hospital & Settlement	Not available	Asansol	60
2. Raniganj Leprosy Home & Hospital	,,	Ballavpur	100
3. Barakar Leprosy Segregation Camp	1934	Barakar	Not available
4. Chaindra Leprosy Segregation Camp	1936	Chaindra	,,
5. Domohini Leprosy Segregation Camp	1936	Domohini	,,
6. Situgpur Leprosy Segregation Camp	1948	Dishergarh	,,
7. Jamuria Leprosy Segregation Camp	1950	Jamuria	,,
8. Sitarampur Leprosy Segregation Camp	1955	Sitarampur	,,

দেশ থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করার জন্য বর্ধমান এবং কালনায় Malaria Eradication Unit স্থাপিত হয়েছে। Railway Hospital ও Asansol Mines Board of Health-এর সঙ্গে Malaria Eradication Unit আছে।

দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—Durgapur Steel Plant, Mining and Allied Machinery Corporation (MAMC), Fertilizer, Corporation, Durgapur Chemicals, Durgapur Project Ltd, Durgapur Thermal Power Station এদের সঙ্গে এদের নিজস্ব হাসপাতাল আছে। Durgapur Development Authority শিল্পাঞ্চলে Sanitation ও স্বাস্থ্য-পরিষেবা দেখাশোনা করে।

পরিবার-পরিকল্পনা কার্যসূচী : পরিবার-পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৬৫–৭১ পর্যন্ত জেলার নিবীর্যকরণের বিভিন্ন কর্মসূচীর অগ্রগতি নিম্ন সারণী থেকে জানা যাবে—তবে আমার মতে অগ্রগতি না বলে নিম্নগতি বলাই যুক্তিযুক্ত।

Vasectomy and Tubectomy

Year	No. of Sterilizations	Target	% of target achieved
1966-67	3690	3500	105.4
1967-68	13571	11100	122.3
1968-69	9443	22700	41.6
1969-70	7005	20600	34.0
1970-71	7811	24000	32.6

Intra-Uterine Cervical Device (I. U. C. D)

1965-66	11448	10421	109.9
1966-67	6457	20842	31.0
1967-68	1488	12162	12.0
1968-69	817	15120	5.4
1969-70	782	3900	20.1
1970-71	1353	5300	25.5

Conventional Contraceptives distributed

	Condom	Dia	Jelly	Foam Tablet	Target	PC
1968-69	108630	40	57	6948	–	–
1969-70	147581	–	2437	2347	11700	20.8
1970-71	221026	4	3005	6137	20,800	17.2

১৯৪৬ সালে ভোর কমিটি তৈরী হয়—এই কমিটি তৎকালীন স্বাস্থ্যচিত্র অনুসন্ধান করে এক পরিকল্পনা তৈরী করে—এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল :–

১. রোগ প্রতিরোধ ও রোগের চিকিৎসার দুইটি বিভাগকে একত্রিত করা।

২. প্রতি ৪০০০ জনগণের জন্য একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন।

৩. দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ জনসংখ্যার জন্য একটি করে সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

এছাড়া বাধ্যতামূলক ভাবে অন্তত তিন মাস অন্তর জনস্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও সামাজিক চিকিৎসক তৈরী করা। এই কমিটির সুপারিশক্রমে জেলার বিভিন্ন স্থানে হসপিটাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠে—এর একটি তালিকা ১, ২, ৩নং সারণীতে সংযোজিত হলো।

ভোর কমিটির সুপারিশকে ভিত্তি করে ১৯৭৭ সালে Rural Health Scheme তৈরী হয় ও সেই অনুসারে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির খসড়া প্রস্তুত হয়। এই নীতির লক্ষ্য হল "২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য"। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য কতকগুলি কর্মসূচী পালনের কথা বলা হয়েছে। যেমন—

১. জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা এবং এলাকার মধ্যেই তার সমাধানের ব্যবস্থা করা।

২. বিশুদ্ধ জল-সরবরাহের ব্যবস্থা এবং পরিচ্ছন্নতার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বৈষম্য এবং অব্যবস্থাগুলি দূর করা।

৪. নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করা, যাতে স্বাস্থ্য পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়িত হতে পারে।

৫. স্বাস্থ্যরক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া।

৬. অপুষ্টির কারণগুলি দূরীকরণ।

৭. নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা; যাতে অন্য কোন উপায়ে অল্প খরচে রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব হয়।

৮. সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা এবং বিভিন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন।

এই নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচীও নেওয়া হয়েছিল—

ক. প্রতি পাঁচ হাজার এবং পাহাড়ী বা দুর্গম এলাকায় প্রতি তিন হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি করে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র স্থাপন, যেখানে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী থাকবেন।

খ. প্রতি ত্রিশ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

গ. প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার জন্য একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন।

ঘ. এক হাজার জনসংখ্যায় একজন করে C.H.G. (Community Health Guide)

ঙ. গ্রামীণ দাইদের প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেওয়া।

চ. অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া।"

(উৎস : জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের প্রতিবেদন)

এই কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়ণের লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যপরিষেবা কেন্দ্রও স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৯১ সালে জনগণনা রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে গ্রাম ও Town-এ নিম্নলিখিত সংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা জানা যায়।

ক. গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা :

1. Primary Health Sub-centre (P. H. S)	২৪৪
2. Dispensary (D)	৮৬
3. Health centre (H. C)	১২৭
4. Hospital (H)	৭
5. Maternity Home (M. H)	৮
6. Registered Private Practitioner (R. P)	১৮৯
7. Primary Health Centre (P. H. C)	১৪
8. Child Welfare Centre (C.W.C)	৬৬
9. Maternity and Child Welfare (M. C. W)	৩০
10. Community Health Workers (C. H. W)	৫৫৯
11. Family Planning Centre (F. P. C)	৭
12. Others	২৫

খ. ৮ টি Statutray Town-এর স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিসংখ্যান :

(ব্রাকেটের মধ্যে শয্যা সংখ্যা)

i.	Hospital (H)	২৮ (৫০১৬)
ii.	Dispensary (D)	৫৯
iii.	Health Centre (H. C)	২০ (১৭৮)
iv.	Family Planning Centre (F. P. C)	৫ (১৬)
v.	T.B. Hospital with one annexe	৮ (১১০)
vi.	Nursing Home	২ (১০)
vii.	Homeo Centre	৭
viii.	Others	৫ (১৯৪)

১৯৯১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী থানাভিত্তিক পরিসংখ্যান

থানা	PHS	MH	PHC	D	HC	CHW	RP	FPC	Others	CWC	MCW	H
বর্ধমান	৩০		৫									
আউসগ্রাম	২০			২৩	১২	৯০	২৪					
ভাতার	৩২			৬	৬	১	১	৩				
মেমারী	২৩	৩		৬	৪	২৭	২২		৬	১		
জামালপুর	৩৩			২	৫	৩৬	৪২			৬৫		
রায়না	২৫			১৪	৫	৫৪	৩৬					
খণ্ডঘোষ	২				২	১০৬	২১	২			২৩	
গলসী	৪		৬									
বর্ধমান মহকুমা	১৬৯	৩	১১	৫১	৩৪	৩১৪	১৪৬	৫	৬	৬৬	২৩	
পূর্বস্থলী	৩		২		১							১
কালনা	১২	৩		৮	৮	১	১১					
মন্তেশ্বর	৩২			৩	৪	৮৫	৩				৪	
কালনা মহকুমা	৪৭	৩	২	১১	১৩	৮৬	১৪				৪	১
মঙ্গলকোট					২৯		৪	২				
কেতুগ্রাম	১৯			৪	৪	১৫৯	২২		১৪		৩	
কাটোয়া	১				১৭							
কাটোয়া মহকুমা	২০			৪	৫০	১৫৯	২৬	২	১৪		৩	
ফরিদপুর				১৫	৮				২			
দুর্গাপুর												
কাঁকশা					৩							

থানা	PHS	MH	PHC	D	HC	CHW	RP	FPC	Others	CWC	MCW	H
পাণ্ডবেশ্বর (অণ্ডাল ব্লক)	৩		১	১								১
দুর্গাপুর মহকুমা	৩	১	১	১৬	১১				২			১
সালানপুর	১	১		২	৪		১		১			১
বরাবনি	৪			১	৫							২
রানীগঞ্জ		১		১	২							
আসানসোল	১	২	২		২							২
জামুরিয়া	৬	২			৬		২		২			
আসানসোল ম:	৫	২	৪	১৯		৩		৩			৫	
বর্ধমান জেলা	২৪৪	৮	১৬	৮৬	১২৭	৫৫৯	১৮৯	৭	২৫	৬৬	৩০	৭

সর্বমোট : ১৩৬২

এই তালিকার সঙ্গে (সারণী-১) ১৯৭১ সালের Health Centre, Hospital ও ডিসপেনসারীর তালিকা তুলনা করলে ২১ বছরে অগ্রগতির হিসাব পাওয়া যাবে।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের প্রতিবেদনে জেলায় সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্পে জেলার performence-এর যে চিত্র পাওয়া যায় তা নিম্নের সারণীতে প্রদত্ত হল :

ব্লক –১২
আসানসোল করপোরেশন–১
বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি–১
শিল্পাঞ্চল হসপিট্যাল–১৬
নার্সিংহোম–১২৪
চালু স্বেচ্ছাসেবী সঙ্ঘ–৮
জাপানি এনকেফেলাইটিস অনুসন্ধানকেন্দ্র–১

Performance of the district (১৯৯৫–'৯৬ সালের হিসাবে)

(1) Sterilization :

1990–90	1991–92	92–93	93–94	94–95	95–96
48986	44721	52387	49279	4854	44021

(2) Pulse Polio Immunization 109% (contg.)
a) Coverage P. P 1st round— 416416–77.7% P.P.I
b) Coverage P. P. 2nd round of P.P.I 92.2%

(3) School Health (Total check of)	356559
(4) Total outdoor patients treated	(approx) 32,00,000
(5) Total Deliveries	(approx) 63000
(6) Total T.B. Patients Treated	29256
(7) Total Leprosy Patients Treated	10,478
(8) Total Diarrhea cases	
a) Affected (in 1062 village)	18147
b) Death	251
9) Total Encephalitis (a) Attack	597
(b) Death	164
10) Infant Mortality rate	69.2%
11) Maternal Mortality rate	2.4%
12) Birth rate	27.9%
13) Growth rate	+ 24.8%
14) Death rate	8.2%

২০০০ সাল তো চলে গেল। ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্যের কর্মসূচীর কি সার্থক রূপায়ণ হয়েছে? যে হারে রোগী, রোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালের অবহেলা বাড়ছে তাতে কিন্তু আশার আলো দেখা যাচ্ছে না।

সারণী-১

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES

LIST OF HOSPITALS AND DISPENSARIES IN BARDHAMAN : 1971

	Name	P. O.	Controlled by	No. of beds
1.	Bejoy Chand Hospital* (formerly Fraser Hospital)	Bardhaman	State Government	550
2.	Kalna Subdivisional Hospital*	Kalna	,,	30
3.	Katoya Subdivisional Hospital	Katoya	,,	68
4.	Asansol L.M. Hospital*	Asansol	,,	74
5.	Subdivisional Hospital, (Formerly Durgapur Medical Unit)	Durgapur	,,	–
6.	Bardhaman Police Hospital	Bardhaman	State Government –(Departmental)	44
7.	Bardhaman Jail Hospital	-do-	State Government –(Departmental)	36
8.	Asansol Special Jail Hospital	Asansol	State Government –(Departmental)	30
9.	Central Hospital*, Kalla Dhadka Union	Asansol	Coal Mines, Welfare Board, Govt. of India	62
10.	Regional Hospital, Chora (Ukhra Union)	Andal	,,	30
11.	Regional Hospital, Searsol	Raniganj	,,	50
12.	Asansol Loco Hospital	Asansol	Eastern Railway	109
13.	Ondal Railway Health Unit	Andal	,,	17
14.	Bardhaman Railway Health Unit	Bardhaman	,,	–
15.	Panagarh Railway Health Unit	Panagarh	,,	–
16.	Domohoni Railway Health Unit	Domohani	,,	–
17.	Sirampur Railway Health Unit	Sitarampur	,,	–
18.	Barakar Railway Health Unit	Barakar	Eastern Railways	–

* Has a Family Planning Centre attached.

	Name	P. O.	Controlled by	No. of beds
19.	12 & 13 (Colonies) Railway Health Unit	Asansol	Eastern Railways	–
20.	Traffic Dispensary	Asansol	,,	–
21.	Durgapur Steel Plant Hospital	Durgapur	Respective organisations	–
22.	Durgapur Project Ltd., Hospital	Durgapur	,,	–
23.	Mining and Allied Machinery Corporation Hospital	,,	,,	–
24.	Fertiliser Corporation* of India Hospital	,,	,,	–
25.	Durgapur Thermal Power* Station Hospital	,,	,,	–
26.	ACC-Vickers-Babcock Hospital	,,	,,	–
27.	Durgapur Notified Area Authority Hospital	,,	,,	–
28.	State Transport Service Hospital	,,	,,	–
29.	Sankey Wheels Ltd., Hospital	,,	,,	–
30.	Graphite India Ltd., Hospital	,,	,,	–
31.	Philips Carbon Black Ltd. Hospital	,,	,,	–
32.	Jessop & Co. Ltd., Hospital	,,	,,	–
33.	Opthalmic Glass Project Hospital	,,	,,	–
34.	Burn & Co. Hospital*	,,	,,	–
35.	Hind Refractories Hospital	,,	,,	–
36.	Hindustan Refractories	,,	,,	–
37.	Heileman Ltd. Hospital	,,	,,	–
38.	Marwari Relief Society* Hospital	Ranigang	Private (aided)	79
39.	Dainhat Trandda Sundari Matri Sadan	Dainhat	Private	8
40.	Aldih Maternity Home	,,	Asansol Mines Board of Health	2
41.	Banksimulia Maternity Home	,,	,,	2

* Has Family Planning Centre attached.

	Name	P. O.	Controlled by	No. of beds
42.	Charanpur Maternity Home	Dainhat	Asansol Mines Board of Health	2
43.	Jamuria Maternity Home	,,	,,	2
44.	Moira Meternity Home	,,	,,	2
45.	Samla Maternity Home	,,	,,	2
46.	Sitalpur Maternity Home	,,	,,	2
47.	Selected Jambad Maternity Home	,,	,,	2
48	West Victoria Maternity Home	,,	,,	2

Adra Charitable Dispensary	Galsi	Zilla Parishad
Meral Charitable Dispensary	Raina	,,
Panchra'Charitable Dispensary	Jamalpur	,,
Amarpur Charitable Dispensary	Memari	,,
Kaleswar Charitable Dispensary	Memari	,,
Ghosh Charitable Dispensary (Fever)	Memari	,,
Palla Charitable Dispensary	Memari	,,
Satgachhia Charitable Dispensary	Satgachhia	,,

১৯৭১ সালের পরে আরও অনেক Health Centre, Health Sub-centre স্থাপিত হয়েছে— যাদের থানাভিত্তিক তালিকা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে।

(তথ্যসূত্র : বর্ধমান গেজেটিয়ার ১৯৯৪)

সারণী-২

PATIENTS TREATED IN THE HOSPITALS, HEALTH CENTRES AND DISPENSARIES OF BARDHAMAN DISTRICT : 1964

Outdoor patients treated				Indoor patients treated (20–sample)				
						Total treated		Total treated Fatality ratio in percentage
Year	Total new and old	Total New	Percentage of new cases to Total (old and new)	Total bed for which returns received	No.	Patients treated per bed	No.	
1964	30.03.067	12.05.059	40.1	1.389	45.234	32.6	1.742	3.9
1965	23.28,545	7.07.658	30.4	1.358	6.634	21.2	874	3.0
1966	20,97.327	9,30.622	44.4	1.056	6.955	–	987	3.3

(তথ্যসূত্র : বর্ধমান গেজেটিয়ার ১৯৯৪)

সারণী-৩

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES

RURAL HEALTH CENTRES IN BARDHAMAN DISTRICT : 1971

Name of Development Blocks	Sub-division	Primary Health Centres at	Subsidiary Health Centres at
Ansgram I	Sadar	–	1) Goswamikhanda 2) Amarpur* 3) Bhakundi 4) Bahadurpur
Bhatar	,,	Bhatar (10)*	1) Sahebganj 2) Bonpas (Haribati) 3) Eruar (10)
Mongolkot	Katoya	Mongolkot (10)*	1) Chanak Kasemnagar 2) Singat
Memari-I	Sadar	Memari (50)*	1) Debipur (10) 2) Durgapur (10)
Memari-II	,,	Bohar (10)	1) Kuchut (4) 2) Barapalasan
Purbasthali-I	Kalna	Chandpur	1) Dogachhia (4) 2) Noapara
Purbasthali-I	,,	Purbasthali (10)*	1) Patuli 2) Kubajpur
Ketugram-I	Katoya	Kandra (10)*	1) Ankhona (10) 2) Pandugram
Ketugram-II	Katoya	Ketugram (10)*	1) Sitahati 2) Nabagram (10)
Kalna-I	Kalna	Atgharia (10)* (Athoria)	1) Bagnapara (10) 2) Sultanpur (10)
Kalna-II	,,	Badla (10)*	1) Baidyapur (10) 2) Hazi Osman Gani Ch. Dispy. at Angerson 3) Akalpous
Faridpur-Durgapur	Asansol	Laudoha (10)*	
Katoya-I	Katoya	Katoya S.D. Hospital (Tentative)	1) Srikhanda (10)* 2) Chanderpara 3) Sudpur
Katoya-II	,,	Noapara (10)*	Agardwip (4)

* Has a Family Planning Centre attached.

Name of Development Blocks	Sub-division	Primary Health Centres at	Subsidiary Health Centres at
Jamalpur	Sadar	Jamalpur (10)*	1) Chaksanjadi (10) (Berugram) 2) Nabagram (4) 3) Chakdighi (10) 4) Illsorah
Manteswar	Kalna	Manteswar (10)*	1) Putsuri 2) Majhergram (10)
Raina-I	Sadar	Mahisabati (10)*	1) Narugram 2) Meral
Raina-II	,,	Madhabdihi (10)*	1) Painta 2) Gotan 3) Kaity (10)
Hirapur	Asansol	–	–
Khandaghosh	,,	Khandaghos (10)*	1) Pitambarpur 2) Khudkuri
Galsi-I	Sadar	Mankar (10)* (Tentative)	–
Galsi-II	Sadar	Satinandi (10)* (Tentative)	–
Kanksa	Asansol	–	Malandighi
Ondal	,,	–	–
Salanpur	,,	–	–
Barbani	,,*	–	–
Raniganj	,,	Raniganj (20)*	–
Kulti	,,	Barakar (10)* (Tentative)	– –
Asansol	,,	–	–
Jamuria-I	,,	–	–
Jamuria-II	,,	–	–
Ausgram-I	Sadar	Bana-Nabagram (10)	1) Guskara (10) 2) Ukta 3) Dignagar
Bardhaman	,,	Bardhaman B.C. Hospital (Tentative)	1) Baghar (4) 2) Hat Gobindapur (4) 3) Rayan (4) (Jadur) 4) Barsul (10)* (Saktigarh)

Figures in brackets indicate the number of beds. Subsidiary Health Centres having no figures will mean that they have two beds each.
* Has a Family Planning Centre attached.

উনচল্লিশ অধ্যায়

পরিবহন ও যাতায়াতের ব্যবস্থা

সেকাল ও একাল : বর্ধমান জেলার সভ্যতার বিকাশের ধারার ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল সেই খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ সালে, যখন দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে বীরভানুপুরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাইক্রোলিথিক শিল্পদ্রব্যের আবিষ্কার হয়। কিন্তু সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে পরিবহন ও যাতায়াতের ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। সবটাই অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে ভূমধ্যসাগরীয় ক্রীট দ্বীপের হাইরোগ্লিফিক চিত্রাক্ষর সমন্বিত গোলাকার শিলের আবিষ্কার সে যুগে এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপে বাণিজ্যিক আমদানী-রপ্তানীর প্রমাণ দেয়। এই বাণিজ্য খুব সম্ভবত জলপথেই হত। স্থলপথে বাণিজ্যের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু জনবসতি যখন ছিল রাস্তাঘাট নিশ্চয়ই ছিল। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর "বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব" গ্রন্থে লিখেছেন "জীবনধারণের প্রয়োজনে জীবন বিকাশের প্রেরণায় মানুষ সুপ্রাচীন দুর্গম বনজঙ্গল কাটিয়া পাহাড় ভাঙিয়া নদী ডিঙাইয়া যে সব পথের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে সে সব পথ একদিনে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় না।" খুবই যুক্তিপূর্ণ তথ্য—এ সব পথ নিশ্চিহ্ন তো হয়ই না বরং মানুষ পশু বা যান চলাচলের ফলে দিন দিন তার প্রসার ঘটাই স্বাভাবিক।

মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বঙ্গাধিপতির "সদস্রাবী পর্বতসদৃশ দশ সহস্র কুঞ্জর সমভিব্যাহারে দুঃশাসনের অনুগমনের" কথা আছে। তাই যদি হয় তাহলে বঙ্গদেশ থেকে কুরুক্ষেত্র পর্যন্ত দশ সহস্র কুঞ্জর যাবার উপযুক্ত প্রশস্ত রাস্তা থাকার কথা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

হর্ষবর্ধনের সময় হিউয়েন সাঙ এদেশে পর্যটনে এসেছিলেন, তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে যে পথপরিক্রমার নির্দেশ আছে, তাতে তাম্রলিপ্ত থেকে বর্ধমানের ওপর দিয়ে কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত স্থলপথের উল্লেখ. পাওয়া যায়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই

পথ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। "ভাগলপুর হইতে বর্তমানে যে রেলপথ রাজমহল পাহাড়ের ভিতর দিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় দক্ষিণামুখী হইয়া চলিয়া গিয়াছে—সিউড়ি-রানীগঞ্জ-বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-পুরুলিয়ার দিকে, এই পথই ছিল যুয়ান চোয়াঙের পথ। এই সব পথ শুধু যাতায়াতের পথ নয়, বাণিজ্য পথও বটে এবং এই সব পথ বাহিয়াই বাংলাদেশে লক্ষ্মীর আনাগোনা।"

অভয়ামঙ্গলে পাই মুকুন্দরাম দামুন্যা গ্রামে তাঁর বিপর্যস্ত আর্থিক অবস্থার চাপে পড়িয়া শ্রীমন্ত খাঁর পরামর্শে যখন্ দামুন্যা গ্রাম ত্যাগ করেন, তখন তিনি যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন সেই পথই ছিল দামুন্যা থেকে আরড়া যাবার পথ। এই পথ দামুন্যা থেকে ভেলিয়া, ভেউটিয়া গ্রাম ও কোঁচড়িয়া নগর হয়ে আরড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মধ্যে তিনটি নদী অতিক্রম করতে হতো—মুড়াই মুণ্ডেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর ও শিলাই।

দামিন্যা ছাড়িয়া জাই সঙ্গে রামানন্দী ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশন,
ভেলিঞাতে উপনীত রূপ রায় নিল বিত্ত
যদু কুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা
বাহিয়া মুড়াই নদী সদাই স্মঙরিল বিধি
ভেউঠিয়ায় হৈলাঙ উপনীত
দারুকেশ্বর তরি পাইনু মাতুলপুরী
গঙ্গা দাস বহু কৈল হিত।
নারায়ণ পরাশর এড়াইয়া আমোদর
উপনীত কোঁচড়িয়া নগরে
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া জাই
আড়রায় হইল উপনীত!

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে জেলার এক জলপথের নির্দেশ আছে। "বেহুলার নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, সে সবই বর্ধমান জেলার মধ্যে পড়ে। সে সবই দামোদরের পূর্বতন প্রবাহপথের যে জলপথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া দামোদরের প্রধান প্রবাহ হইতে উত্তর-পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া মগরা ত্রিবেণী-কালনা অঞ্চলে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত—সে প্রবাহ পথের চিহ্নাবশেষ

বাঁকা-বেহুলা-বল্লুকা-গাঙ্গুরের তীরে অবস্থিত...যেমন জুঝাটি, গোবিন্দপুর, বর্ধমান, গাঙ্গপুর, কেজ্যা, মণ্ডলগ্রাম, দেপুর, নেয়াদা আদমপুর (আমদপুর) হাসানহাটি নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, পীড়তালী, গহরপুর, ত্রিবেণী।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন পর্বে' উল্লেখ করেছেন, 'বাংলায় বহু নদনদী থাকায় শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্য প্রেরণের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। স্থলপথে যাইবার জন্যও বড় বড় রাস্তা ছিল।' ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে যখন বখতিয়ার খিলজী ১৯ জন অশ্বারোহী নিয়ে বিহারে বিক্রমাদিত্য-বিহার ধ্বংস করে নুদিয়া আক্রমণ করেন তখন তিনি যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সেটি বিহারের ভাগলপুর রাজমহলের মধ্য দিয়ে নদীয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলেই অনুমান হয়।

মীনহাজের বিবরণ থেকে জানা যায় তুর্কী সুলতান গিয়াসুদ্দিন প্রজার মঙ্গলকামী সুশাসক ছিলেন। তিনি লখনৌতি থেকে মঙ্গলকোট, দিগনগর দাউদপুর হয়ে দামোদর অতিক্রম করে জাজনগর (উড়িষ্যা)-এর নিকট কাটাসিন পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথ নির্মাণ করান।

জনশ্রুতি হোসেন শাহের সময়ে গৌড় হতে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার মধ্য দিয়ে কেতুগ্রাম থানা পার হয়ে মঙ্গলকোটের ভেতর দিয়ে অজয় ও দামোদর অতিক্রম করে গড় মান্দারণ পর্যন্ত রাস্তা নির্মিত হয়। এই সড়কটি বাদশাহী বা হোসেন শাহী সড়ক নামে পরিচিত।

কিন্তু হোসেন শাহ যে সড়কটি নির্মাণ করেছিলেন তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই; মনে হয় হোসেন শাহ গিয়াসুদ্দিনের নির্মিত রাস্তার সংস্কার ও কিছু প্রসারণ ঘটিয়ে ছিলেন।

প্রবাদ শেরশাহ সোনার গাঁ থেকে বর্ধমানের ভিতর দিয়ে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করান। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে রাজপথের মধ্যের অংশ বহু পূর্বে নির্মিত হয়েছিল (অবশ্য বিহার থেকে রাজমহল হয়ে সোনার গাঁ পর্যন্ত রাস্তাটি তাঁর সময়েই নির্মিত হয়।) এই রাজপথ কলকাতা থেকে ৫২তম মাইল থেকে ১৪৯তম মাইল বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত। Van den Brouche (AD 1660) এর ম্যাপে Medinapoor (Medinipur) থেকে দক্ষিণ বর্ধমান হয়ে উত্তরে কাশিমবাজার পর্যন্ত যে দীর্ঘপথটি দেখা যায় সেটাই মনে হয় বাদশাহী রোড। এই Map থেকে আরও দেখা যায় একটি Padshahi or Royal Road বর্ধমান থেকে Midnapore ও আর একটি অপেক্ষাকৃত Smaller Road বর্ধমান সেলিমাবাদের ও ধনিয়াখালির ভিতর দিয়ে হুগলী পর্যন্ত প্রসারিত। আর

একটি রাস্তা Jessor ও Oegly হয়ে বর্ধমান এবং সেখান থেকে উত্তরে Kirtanagar পর্যন্ত বিস্তৃত। ধর্মমঙ্গলের লাউসেন গৌড় দরবারে গিয়ে নিজ শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেওয়ার জন্য যখন গৌড়ের পথ ধরেছিলেন তখন তিনি এই বাদশাহী পথ ধরেই গিয়েছিলেন। এই রাস্তার ধারে ৮ মাইল অন্তর হোসেন শাহ একটি করে মসজিদ ও সরাইখানা নির্মাণ করান। তবে বর্তমানে কর্জনার মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত; কর্জনার ৮ মাইল উত্তরে Kalutur বা সায়েরের ধারে মসজিদটির চিহ্ন এখনও বর্তমান। বর্ধমানে পীর বাহারামের মসজিদ এই মসজিদের স্মৃতি বহন করছে। উচালনের কাছে সরবকপুরের মসজিদটিও প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। মঙ্গলকোটের মসজিদটিও মাটির ঢিবিতে পরিণত। এই মসজিদটি বৌদ্ধ স্তূপের ওপর নির্মিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা।

সড়ক পথ : রেনেলের মানচিত্র ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে পথের একটা Network লক্ষ্য করা যায় : রেনেলের মানচিত্রে (১৭৬৪-৭৯) প্রধান প্রধান যে রাস্তাগুলি চিহ্নিত করা যাচ্ছে, তার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. Hooghly থেকে Burdwan, Banpass ও Dignagar হয়ে Kirtanagar পর্যন্ত।

২. এই ১নং রাস্তার আলমপুর থেকে (মাহিনগর?) হয়ে একটি রাস্তা Oregang, Gubandpur, Soopur ও Omderra হয়ে সেখান থেকে পূর্ব দিকে Cutwa পর্যন্ত। আর একটি রাস্তা কামনারা, ভাতার, নিগন ও শ্রীকান্ত হয়ে Cutwa পর্যন্ত।

৩. Hooghly থেকে আর একটি রাস্তা উত্তরে Culna হয়ে Ahgadeep ও সেখান থেকে Plassey পর্যন্ত।

৪. Hooghly থেকে অপর একটি রাস্তা উত্তর দিকে Culna ও সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে বরাবর Ninghan (Nigon?) ও নিগন থেকে উত্তর-পূর্বে কাটোয়া হয়ে গঙ্গা অতিক্রম করে পলাশী—

৫. Hooghly থেকে Burdwan হয়ে পশ্চিমে Pachete।

৬. Tamlook থেকে একটি রাস্তা বের হয়ে Bilegar-এ দুই ভাগ হয়ে এক ভাগ Indus, Soonamukhy হয়ে পুরুলিয়া জেলার Roganatpur আর এক ভাগ Deneacoly (ধনেখালি) এর উত্তরে কালনার ৩নং রাস্তার সঙ্গে মিশেছে।

৭. Deneacoly (ধনিয়খালি) থেকে আর একটি রাস্তা সেলিমাবাদ হয়ে বর্ধমানের আগে Barsool-এ ৪নং রাস্তায় মিশেছে।

৮. বর্ধমান থেকে ১নং রাস্তা থেকে একটি রাস্তা উত্তরে Tarrapour পর্যন্ত গেছে।

৯. ১নং রাস্তার Daudpour-এর দক্ষিণে Gegang থেকে বের হয়ে একটি রাস্তা বীরভূমের Illambazar গেছে।

১০. বর্ধমান থেকে একটা রাস্তা Satgutchy হয়ে Sucheroy থেকে পূর্ব-দক্ষিণে culna পর্যন্ত বিস্তৃত।

১১. বর্ধমান থেকে একটা রাস্তা দক্ষিণ-পশ্চিমে Indus হয়ে Gopalnagar-এ Bissenupur (বিষ্ণুপুর)-এর রাস্তায় মিশেছে।

১২. বর্ধমান থেকে একটি রাস্তা ধনিয়াখালি হয়ে Ghyrretty Cantonment পর্যন্ত গেছে। এই ভাবে Rennell-এর ম্যাপে নবাবী আমলের অনেক রাস্তার-হদিস মেলে। বর্ধমান ছিল জেলার মধ্যমণি ও প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। এখান থেকে জেলার ভিতরেও অনেক রাস্তা অনেক স্থানে প্রসারিত।

Peterson-এর বর্ধমান গেজেটে (১৯১০) সমকালীন ২২টি রাস্তার বিবরণ আছে—

১. জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে ৪০ ফুট প্রশস্ত ৫১তম মাইল থেকে ১০০ মাইল দীর্ঘ জি. টি. রোড।

২. বর্ধমান থেকে কাটোয়া পর্যন্ত ৩৪ মাইল ৭০ গজ—এই রাস্তাটি বরাবর পাকা ও এর রাস্তার ধারে ৮ম, ১৫শ, ২৯তম ও ৩৫তম মাইলে Inspection Bunglow ছিল। তাছাড়া প্রয়োজনমত এই রাস্তার বিভিন্ন অংশে 'পুল' নির্মিত আছে।

৩. মেমারী থেকে মণিরামবাটি ১৬ মাইল।

৪. হুগলীর পাণ্ডুয়া থেকে কালনা ১৫ মাইল। এই ১৫ মাইলের মধ্যে প্রথম ১২ মাইল হুগলী জেলায় বাকী বর্ধমান জেলায়।

৫. খানা জংশন স্টেশন থেকে জি.টি. রোড পর্যন্ত ১ মাইল ৫ ফার্লং ফিডার রোড।

৬. গুসকরা থেকে নিত্যানন্দপুর পর্যন্ত ১৪ মাইল ১ ফার্লং; রাস্তা গুসকরা থেকে এক মাইলের মধ্যে একটি Inspection Bunglow.

৭. গুসকরা থেকে মানকর পর্যন্ত ১৪ মাইল ৬ ফার্লং রাস্তা।

৮. মানকর থেকে বুদবুদ পর্যন্ত ২ মাইল ২ ফার্লং ফিডার রোড।

৯. পানাগড় থেকে ইলামবাজার পর্যন্ত ১৪ মাইল রাস্তা। পানাগড় থেকে পঞ্চম মাইলে অজয়ের ওপর ৭৫ ফুট চওড়া ৭৫০ বর্গফুট ঝুলন্ত পুল।

১০. পানাগড় থেকে দামোদর পর্যন্ত ৩ মাইল ফিডার রোড। এই খানে পূর্বে দামোদর পার হয়ে রাঙামাটি হয়ে গরুর গাড়ীতে সোনামুখী যাওয়া যেত। এখন বাস সার্ভিস হয়েছে।

১১. রাজবাঁধ থেকে গোপালপুর পর্যন্ত ৩ মাইল।

১২. রঘুনাথচক ফেরী রোড—৬ ফার্লং।

১৩. রানীগঞ্জ থেকে মঙ্গলপুর ২ মাইল।

১৪. রানীগঞ্জ থেকে অজয় ১৬ মাইল—এখানে ফেরীঘাটে অজয় পার হয়ে সিউড়ি পর্যন্ত রাস্তা বিস্তৃত।

১৫. সীতারামপুর থেকে নিয়ামতপুর ১ মাইল ৪ ফার্লং।

১৬. বরাকর ফিডার রোড ৪ ফার্লং।

১৭. রাধানগর থেকে সাঁকতোরিয়া ৩ মাইল ২ ফার্লং।

১৮. নিয়ামতপুর থেকে দামোদর নদী পর্যন্ত ৩ মাইল ২ ফার্লং লিথোরিয়া রোড।

১৯. বনপাশ স্টেশন থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত ৫ মাইল কাঁচা ফিডার রোড (বর্তমানে পাকা রাস্তা)।

২০. ভাতার থেকে নাসিগ্রাম ৭ মাইল।

২১. কর্জনা থেকে পারহাট। (১৯, ২০, ২১নং রাস্তাগুলি Peterson উল্লেখ করেন নাই) এমনি আরও বহু কাঁচা রাস্তা গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে আছে।

Peterson উপরের ১৮টি রাস্তা ছাড়া—১. বর্ধমান থেকে বাঁকুড়া রোডের মোড় ১০ মাইল ৩ ফার্লং, ২. বর্ধমান থেকে কালনা ৩৩ মাইল, ৩. কাটোয়া থেকে কালনা—৩৩ মাইল ৭ ফার্লং পাকা রাস্তার উল্লেখ করেছেন। গোহগ্রাম থেকে চকদীঘি—মশাগ্রাম থেকে চকদীঘি রোড—এ রকম বহু রাস্তার অস্তিত্ব ছিল; এখনও আছে। Peterson সমগ্র জেলায় জেলা বোর্ড পরিচালিত ২০৩$\frac{১}{২}$ মাইল পুল সমন্বিত পাকা রাস্তা, ২৯৮ মাইল কাঁচা রাস্তা ও ৬৫২ মাইল গ্রাম্য রাস্তার উল্লেখ করেছেন।

বর্ধমান থেকে কালনা পর্যন্ত রাস্তাটি বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র (১৭৭০-১৮৩২) আমূল সংস্কার করেন ও রাস্তার ধারে ৮ মাইল অন্তর শিবমন্দির, পুষ্করিণী, হাতিশালা, আস্তাবল ও বিশ্রামাগার নির্মাণ করেছিলেন; রাজবংশানুচরিত গ্রন্থে রাখালদাস মুখোপাধ্যায় এই রাস্তা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন।

"মহারাজা তেজচন্দ্র বর্ধমান হইতে অম্বিকায় যাইবার যে সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করেন ঐ পথের প্রতি চার ক্রোশ ব্যবধানে এক একটি আড্ডা-বাটি প্রস্তুত করাইয়া তন্মধ্যে পুষ্করিণী খনন ও তদুপরি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়া ছিলেন, আটঘরিয়া, রাইপুর, সাতগেছিয়া ও কুচুটে ৪টি আড্ডাবাটি ছিল।" "সংবাদে সেকালের কথায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উল্লেখ করেছেন যে মহারাজা বহুলোক নিয়োগ করে ইট দিয়ে বর্ধমান থেকে কালনা রাস্তা নির্মাণ করান এবং রাস্তার প্রতি ৮ মাইল অন্তর বিশ্রামাগার, আস্তাবল, হাতিশালা, একটি শিবমন্দির নির্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করান। কিন্তু মহারাজা যে এই সমস্ত নির্মাণ করিয়েছিলেন; এই তথ্য ঠিক নয়। কারণ তার আগেই রেনেলের (১৭৬৪-৭৯) ম্যাপে বর্ধমান থেকে Mangolkot হয়ে একটি ও বর্ধমান থেকে আর একটি রাস্তা Mongolkot-কে পশ্চিমে রেখে Cutwa পর্যন্ত ২টি রাস্তার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়ত ১৭৬০ সালে জুন মাসে মহারাজ ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে কোম্পানীর মনোমালিন্য চরমে পৌঁছালে কাপ্টেন হোয়াইট-এর নেতৃত্বে ২০০ জন সৈন্য কালনা থেকে এই পথে বর্ধমান আসেন। রাজার ৭/৮ শত সিপাহীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এছাড়া রেনেলের ম্যাপে জেলার মধ্যে নৌচলাচলের উপযুক্ত কয়েকটি জলপথের চিহ্ন দেখা যায়। এদের মধ্যে ফলতার কাছে গঙ্গা পর্যন্ত দামোদরের জলপথ, অগ্রদ্বীপ ও কাটোয়া হয়ে মুরুট পর্যন্ত ভাগীরথীর জলপথ বর্ধমান থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত জলপথ; সেলিমাবাদ থেকে বাঁকিপুর পর্যন্ত একটি পথ; রানীগঞ্জ থেকে কাটোয়া পর্যন্ত অজয়ের জলপথ। তবে অধিকাংশ জলপথ শুকিয়ে গেছে—কিছু কিছু এখনও আছে।

Peterson বর্ধমান রানীগঞ্জ, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে প্রায় ৫০ মাইল রাস্তার উল্লেখ করেছেন।

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে সৈন্য চলাচল, ডাক-ব্যবস্থার উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে রাস্তা তৈরী বা রাস্তা সংস্কারের দিকে নজর দেওয়া হত। তবে সৈন্য চলাচলের দিকটাই সবচেয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হত। ১৮০২ সালে ৯ মার্চ জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট (একই ব্যক্তি)-এর একটি চিঠিতে দেখা যায় Three grand and most useful roads, leading to Hooghly, Cutwa and Culna which may be termed the ports of the district have been completely made. এই পথ ধরেই Clive হুগলী থেকে মুর্শিদাবাদ যাবার পথে কাটোয়া গিয়েছিলেন। এছাড়া কিউল উপত্যকার চাকাই, লাকরাকুণ্ড হয়ে বর্ধমান জেলা পর্যন্ত প্রসারিত একটা রাস্তা ছিল। মীরকাশিম যখন পাটনায় রাজধানী স্থানান্তরিত করে বিদেশী সেনাপতির সাহায্যে তাঁর

সৈন্যবাহিনীকে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে উপযুক্ত করে তোলার ব্যবস্থা করছিলেন তখন কোম্পানী Captain Knox-কে এই পথ ধরে পাটনা পাঠান, সেখানে ব্রিটিশ বাহিনীকে সাহায্যের জন্য। আর একটা রাস্তা ছিল কলকাতা থেকে বর্ধমান, উখড়া, খড়্গডিহা, জামুই, নোওয়াদা হয়ে বিহারে ফতুয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। রেনেলের ম্যাপে এই পথের হদিস পাওয়া যায়। মীরকাশিমকে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত করে ইংরেজবাহিনী মেজর এডামসও খুব সম্ভবত এই পথ ধরেই কলকাতা ফিরেছিলেন। এরপর থেকে কোম্পানী সৈন্য চলাচলের সুবিধার ওপর গুরুত্ব বুঝে রাস্তা নির্মাণের দিকে মনোযোগ দেয় ও জি. টি. রোডের সংস্কার সাধনে অধিক মনোনিবেশ করে। Hooghly Medical Gazetteer (1903)-এ একটি রিপোর্টে দেখা যায় জি. টি. রোডের অনেকটা অংশ হুগলী নদীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এর সংস্কার শুরু হয়। কিন্তু এই সংস্কার ও জি. টি. রোডের পুনর্নির্মাণের কাজ বেশী দূর এগোয় নাই। যার ফলে নিজামত আদালতের মহামান্য বিচারককে কোম্পানীর এই রাস্তার প্রতি উদাসীনতার জন্য এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। In 1820 the Judge of the Nezamat Adalat on circuit calles attention to the state of the Roads which he says is very indifferent, and in some places next to impossable especially west of Pandua (Hoogly Medical Gazetteer, Cal., 1903) "In 1836 it had been carried beyond Burdwan and in 1845 had come into full use."

যাই হোক, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া থেকে বর্ধমান পার হয়ে কিছু দূর পর্যন্ত রাস্তা মেরামতির কাজ চলে ও ১৮৪৩ সালে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়।

প্রথমে রাস্তা সংস্কারের দায়িত্বে ছিল Road Cess Committee তারপর ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৬ পর্যন্ত মিলিটারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজস্ব বোর্ডের ওপর। তাতেও অবস্থার খুব বেশী উন্নতি হয় না। শেষে ১৭৮৬ থেকে ১৮৫৪ পর্যন্ত Military Board-এর ওপর দায়িত্ব পড়ে। লর্ড ডালহাউসীর সময়ে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের পত্তন হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে Military-এর দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত প্রধান প্রধান রাস্তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এই Public Works Department-এর ওপর অর্পিত হয়। সেই ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত চলে আসছে। তবে বর্তমানে জেলা বোর্ড ও P.W.D মধ্যে কিছু কিছু রাস্তার দায়িত্ব নিয়ে টানাপোড়েন চলছে।

অবশ্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় রাস্তাগুলির দায়িত্ব অর্পিত হয় P.W.D.-এর ওপর। জেলার মধ্যস্থ রাস্তাগুলির দায়িত্ব Road Cess Committee-র ওপর বহাল

থাকে। তারপর ১৮৮৫ সালে জেলা বোর্ড গঠিত হলে Cess Committee-এর হাত থেকে এই জেলার এই সমস্ত রাস্তার দায়িত্ব জেলা বোর্ডের ওপরই অর্পিত হয়। এর জন্য রোড সেসের শতকরা একটা অংশ জেলা বোর্ডকে দেওয়া হত। কিন্তু এই অর্থে জেলা বোর্ডের পক্ষে নতুন রাস্তা নির্মাণ ও পুরানো রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হত না। ফলে সরকার ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সেস বাবদ আদায়ীকৃত সমস্ত টাকাই জেলা বোর্ডের হাতে তুলে দেন। ১৯১৯ সাল থেকে ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকাভুক্ত রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতের দায়িত্ব ইউনিয়ন বোর্ডের ওপরেই অর্পিত হল। জেলা বোর্ড সেস বাবদ যে অর্থ পেত তার একটা অংশ ইউনিয়ন বোর্ডকে বরাদ্দ করে। তবে এই সামান্য টাকা চৌকিদার দফাদারের মাহিনা দিতে খরচ হয়ে যেত; রাস্তার যে হাল তাই থাকতো। আর সেসের টাকা এত কম যে তাতে জেলা বোর্ডের পক্ষেও ঠিক মত রাস্তার তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হচ্ছিল না। এর ফলে জেলা বোর্ডের কাজের বিরুদ্ধে জন-বিক্ষোভ প্রবল হয়ে ওঠে। তখন সরকার কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের উভয় সভার কিছু সদস্য নিয়ে এম. আর জয়াকরের নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠন করে জেলাপরিষদ, মন্ত্রিপরিষদ ও জনগণের বক্তব্য শুনে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা সুপারিশ করতে নির্দেশ দেন। ১৯২৮ সালে জয়াকর কমিটি সমস্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেন যে আন্তঃরাজ্য পরিবহনের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে দায়িত্বগ্রহণ করা উচিত। জয়াকর কমিটির সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোলের ওপর সারচার্জ ধার্য করে ও এই ট্যাক্স থেকে আদায়ীকৃত অর্থ দিয়ে Central Road Fund গঠন করেন। এই Fund থেকে বছরে একটা থোক টাকা প্রাদেশিক সরকারকে অনুদান হিসেবে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ১৯৪৭ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বহাল থাকে। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার ঠিকমত পরিকল্পনা করে সড়ক উন্নয়নের কাজে সেন্ট্রাল রোড ফান্ড হতে বরাদ্দ অর্থ-খরচ করতে পারে না। তখন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্র বাংলাদেশের প্রাদেশিক সরকারের স্পেশাল অফিসার A. J. King-এর নেতৃত্বে King Committee গঠন করে সেন্ট্রাল রোড ফান্ডের টাকা কিভাবে সুপরিকল্পিত ভাবে ব্যয় করে সড়কের যথাযথ উন্নয়ন করা যায় তার জন্য সুপারিশ করতে বলেন। A. J. King জেলার সমস্ত রাস্তা সম্বন্ধে তদন্ত করে বাংলাদেশের সরকারের কাছে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর Report পেশ করেন। King- এর রিপোর্টে দেখা যায় সমগ্র জেলার কাঁচা ও পাকা রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৪২৫১ মাইল (৬৮৪৪.১১ কিমি)। তিনি জেলার রাস্তাগুলিকে মোট ৪টি ভাগে ভাগ করেন। (১) আন্তঃরাষ্ট্রীয় ট্রাঙ্ক রোড, (২) বিভিন্ন জেলার সঙ্গে সংযোগকারী

আন্তঃজেলা সড়ক, (৩) জেলার অভ্যন্তরস্থ প্রধান প্রধান সড়ক, (৪) জেলার মধ্যস্থ অপ্রধান কাঁচা রাস্তা। King তাঁর রিপোর্টে জেলার সমস্ত ট্রাঙ্ক ও পাকা রাস্তা এবং এই প্রধান সড়কের সঙ্গে মিলিত ফিডার রাস্তাগুলি সম্পূর্ণ সংস্কার ও পূর্ণ সদ্ব্যবহারের সুপারিশ করেন। King Report ১৯৩৯-এর প্রথমদিকে পেশ করা হয় আর ঐ বছরের সেপ্টেম্বরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হলে সৈন্য ও রসদ চলাচলের জন্য প্রধান প্রধান সড়কের গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে দাঁড়ায় ও বিনা বাধায় দ্রুত সৈন্য চলাচলের জন্য সুপ্রশস্ত জাতীয় সড়কের গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সে কারণে ভারত সরকারের উদ্যোগে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে সমস্ত প্রদেশের চিফ ইঞ্জিনীয়ারদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সেখানে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর নাগপুর পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। নাগপুর পরিকল্পনায় King Report-এর মত দেশের সড়কগুলিকে প্রধান চার ভাগে ভাগ করা হয়। (১) সারা দেশে দ্রুত যানচলাচল অব্যাহত ও সুনিশ্চিত করার জন্য জাতীয় রাজপথ (২) আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ও জাতীয় রাজপথের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য প্রাদেশিক রাজপথ (৩) প্রদেশের অভ্যন্তরে জেলা সড়কসহ স্থানীয় প্রধান ও অপ্রধান সড়ক (৪) বিভিন্ন গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য গ্রামীণ সড়ক। তাছাড়া রেলস্টেশন থেকে প্রধান রাস্তার যোগাযোগের জন্য Feeder Road. এরপর যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালে; স্বাধীনতা আসে ১৯৪৭-এ। স্বাধীন দেশের উপযোগী রাস্তাঘাটের উন্নয়নের জন্য নানা উন্নয়ন পরিকল্পনা (Development Plan) গৃহীত হয়। এই উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী এই জেলার সড়ক উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পঞ্চবার্ষিকী কর্মসূচীতে বিভিন্ন শ্রেণীর রাস্তার উন্নয়নের পরিকল্পনার কথা বলা হয়। যেমন : (১) জাতীয় রাজপথ ১২৪ মাইল (১৯৯.৬৪ কিমি) (২) প্রাদেশিক রাজপথ ১২৪ মাইল (১৯৯.৬৪ কিমি) (৩) প্রধান প্রধান জেলা সড়ক ১৭৮ মাইল (২৮৬.৫৮ কিমি) জেলার অন্যান্য অপ্রধান সড়ক ৩০৪ মাইল (৪৮৯.৪৪ কিমি), গ্রামীণ রাস্তা ৬৫০ মাইল (১০৪৬.৫ কিমি)। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য নিম্নের রাস্তাগুলিকে বেছে নেওয়া হয়।

রাজ্যের রাজপথ : ইলাম বাজার—পানাগড় সড়ক।

প্রধান প্রধান জেলা সড়ক : ১. মন্তেশ্বর—কুসুমগ্রাম—মেমারি, ২. সপ্তগ্রাম—গুপ্তিপাড়া ধাত্রীগ্রাম—সমুদ্রগড়—নবদ্বীপ পূর্বস্থলী সড়ক (জেলার অংশে পড়ে গুপ্তিপাড়া থেকে পূর্বস্থলী, ৩. পাণ্ডুয়া—কালনা, ৪. বর্ধমান—কাটোয়া, ৫. বর্ধমান—কালনা, ৬. মানকর—বলগনা।

গ্রামীণ সড়ক : কুদরুকী—গোলগ্রাম, সগড়া—রায়না।

কেন্দ্রীয় সড়ক ফান্ড-এর রাস্তা : বর্ধমান—আরামবাগ (১০-১২ মাইল), সদরঘাটে দামোদরের ওপর শীতকালীন অস্থায়ীপুল তৈরী। আসানসোল থেকে রূপনারায়ণপুর পর্যন্ত জি.টি. রোডের উন্নয়ন।

এই উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ধরা হয় ১,৩৩,৫৮,০০০ টাকা।

১৯৬৮-৬৯ সালের তথ্য অনুযায়ী জেলার বিভিন্ন সংস্থার অধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিলোমিটারে)

Maintained by	As on (Date)	Black Top Kms	Cement Concrete Kms	Water bound Kms	Motor-able Kms	Unmoto -able Kms	Total Kms
Asansol Municipality	31.3.68	30.75	4.05	31.74	15.25	16.49	98.28
Bardhaman Zilla Parishad	31.3.69	55.00	-	220.00	1608.00	612.00	2495.00
Bardhaman Municipality	31.3.68	66.88	-	-	-	18.40	85.28
Dainhat ,,	31.3.69	3.43	0.79	3.88	21.31		29.41
Kalna ,,	31.3.69	10.24		9.79	8.40	8.40	36.83
Katoya Municipality	31.3.68	31.24		2.53	3.31	3.03	40.11
Raniganj Municipality	31.3.69	7.50	-	0.27	0.50	1.00	9.27
Public Works	31.3.69	1150.22	3.55	25.00	3.00	75.49	1257.26
Total		1355.26	8.39	293.21	1659.77	734.81	4051.44

দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার পর জি.টি. রোড দিয়ে পণ্য চলাচল অনেক বেড়ে যায়। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে, গ্রাম থেকে শহরে লোকের যাতায়াত অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং জনগণের একটা অংশের আর্থিক স্বাচ্ছল্য আসায় স্কুটার, বাস, ট্যাক্সি ও লোকচলাচলের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এই বিরাট সংখ্যক যানবাহন ও লোকচলাচলকে সামাল দেওয়া জি.টি. রোডের পক্ষে সম্ভব হয় না। সে কারণে কলকাতা থেকে হাওড়া-কর্ড লাইন বরাবর পালসিট পর্যন্ত ও পালসিট থেকে জি.টি. রোডের সমান্তরালভাবে দুর্গাপুর পর্যন্ত ১৯৬১-৬২ সালে একটি সুপ্রশস্ত Express way তৈরীর পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু যে উদ্যম নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল অর্থের অভাবে কাজের অগ্রগতি সে রকম হয় নাই। Express High Way-এর নির্মাণ সম্পন্ন হলে জেলার মধ্যে এর দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ১১৯ কিমি. বর্তমানে ১৯ কিমির নির্মাণ

সম্পূর্ণ হয়েছে। ১৯৯১ সালের জনগণনা হ্যান্ডবুক অনুসারে জেলার ৬১টি Census Town-এ পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৪৪২.১১ কিমি ও কাঁচারাস্তার দৈর্ঘ্য ১০৬১.১১, মোট-২৫০৩.২২। শহরাঞ্চল অনুযায়ী রাস্তার দৈর্ঘ্যের তালিকা :

(কিলোমিটারে)

	পাকা রাস্তা	কাঁচা রাস্তা	মোট
১. আসানসোল শহরাঞ্চল— ১১টি শহর এর অন্তর্ভুক্ত	৪৫৫.৩৬	৪৩৫.২৫	৮৯০.৬১
২. বনগ্রাম শহরাঞ্চল (বনগ্রাম ও মান্দারবানী এর অন্তর্ভুক্ত)	—	৩.০০	৩.০০
৩. বর্ধমান শহর	৮৫.৫	২.৯৫	৮৮.৪৫
৪. চিত্তরঞ্জন ও হিন্দুস্তান কেবলস্ এর চিত্তরঞ্জন শহরাঞ্চল	২০৮.০০	১.০০	২০৯.০০
৫. দাঁইহাট শহর	১৯.৯৫	১০.৭৫	৩০.৭০
৬. দালুরবাদ শহরাঞ্চল (বৈদ্যনাথপুর ও দালুরবাদ এর অন্তর্ভুক্ত)	৮.০০	১২.০০	২০.০০
৭. ধাত্রীগ্রাম শহর	৫.০০	৫.০০	১০.০০
৮. দুর্গাপুর	৪৪২.৪	—	৪৪২.৪
৯. গুসকরা শহর	১৬.০০	২৫.০০	৪১.০০
১০. কালনা	৪৭.০০	২৪.৯	৭১.৯
১১. কনক্ষয়	৩.০০	১২.০০	১৫.০০
১২. কাটোয়া শহর	১৩.৪০	৪৩.০০	৫৬.৪০
১৩. মেমারি শহর	৭.০০	১৮.০০	২৫.০০
১৪. নন্দী	২.০০	৩.০০	৫.০০
১৫. রানীগঞ্জ শহরাঞ্চল (১২টি ছোট শহর এর অন্তর্ভুক্ত)	৬২.০০	১৩৯.১১	২০১.১১
১৬. অণ্ডাল শহরাঞ্চল (১৭টি শহর এর অন্তর্ভুক্ত)	৬৩.০০	৯৯.০০	১৬২.০০
১৭. শুকডাল	৪.৫	৩.৫	৮.০০
	১৪৪২.১১	৮৩৭.৪৬	২২৭৯.৫৭

King Report-এ দেখা যায় বর্ধমান জেলার সমস্ত শ্রেণীর রাস্তার দৈর্ঘ্য ৬৮৪৪.১১ কিমি এই দৈর্ঘ্য থেকে শহরাঞ্চলের রাস্তা বাদ দিলে গ্রামীণ রাস্তার দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে—৬৮৪৪.১১–২২৭৯.৫৭ = ৪৫৬৪.৫৪ কিমি সর্বশ্রেণীর গ্রামীণ রাস্তা।

সারণী-১

১৯৯১ সালের Census Hand Book-এর তথ্যমত জেলার ৮টি মিউনিসিপ্যালিটিভুক্ত রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য পাকা রাস্তা ৯৩০.৭৫ কিমি, ও কাঁচা রাস্তা ৪৬৮.৭০ কিমি।

	পাকা রাস্তা (কিমি)	কাঁচা রাস্তা (কিমি)
আসানসোল	২৯০.০০	১২০.০০
বর্ধমান	৮৫.০০	২.৯৫
দাঁইহাট	৪৪২.৪০	—
গুসকরা	২৬.০০	২৫.০০
কালনা	৪৭.০০	২৪৯.০০
কাটোয়া	১৩.৪০	৪৩.০০
মেমারি	৭.০০	১৮.০০
দাঁইহাট	১৯.৯৫	১০.৭৫
	মোট : ৯৩০.৭৫ কিমি	৪৬৮.৭০ কিমি

১৯৭২ সালে প্রকাশিত উভয় আভিযান; বর্ধমান সংখ্যা পত্রিকায় ১৯৭২ সালে প্রকাশিত সরকারী পি. ডব্লুউ. ডি.-এর কর্তৃত্বাধীন রাস্তা সমূহের তালিকা এর সঙ্গে সংযোজিত হল। তালিকাটি থেকে পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন রাস্তার একটা চিত্র পাওয়া যাবে। এই তালিকাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় P.W.D (Roads)-এর কর্তৃত্বাধীনে ছিল ৩০৯ ৩/৪ মাইল দু ফার্লং-এ (৪৯৮.৩৮ কিমি) এবং P.W.D-এর অধীনে ছিল ৫০৩ ১/২ মাইল (৮১০.১২ কিমি)

সারণী-২

জেলা পর্ষদের কর্তৃত্বাধীনে রাস্তার দৈর্ঘ্য

২০০০ সালের তালিকা		১৯৭২-এর তালিকা	মাইল	কিমি
স্টেজ এ	৪৩২ কিমি	পাকা রাস্তা	১৮১	২৯১.২৩
স্টেজ বি	১৩৩৬ কিমি	কাঁচা	৯৯২ $\frac{১}{২}$	১৫৯৭.০০

স্টেজ সি ৩৩৭ কিমি গ্রামীণ রাস্তা ৩৮০ ৪৯৫.৫৭

মোট ১৮০৫ কিমি মোট ২৩৮৩.৮০

এক্সপ্রেস হাইওয়ে (চালু) ১৯ কিমি

জেলার মধ্যে জিটি রোড ১২১ কিমি.

জাতীয় সড়ক ১৫৮ কিমি

রাজ্য সড়ক ১৮৯ কিমি

ব্ল্যাকটপ (PW(R)+PWD)১৩৬২ কিমি

১৯৭২ এই সমস্ত সড়কে যাত্রী চলাচ জন্য যে সমস্ত বাসরুট ছিল তার সংখ্যা ও অনুমোদিত বাসের পারমিটের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ।

বাসরুট, বাসের অনুমতিপত্রের সংখ্যা

সারণী-৩ অনুসারে

	বাসরুটের সংখ্যা	বাসের অনুমতিপত্রের সংখ্যা
বর্ধমান সেকশন	৬২	২০৯
কাটোয়া সেকশন	১২	৪৯
দামোদর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চল	১৫	৮৬
আসানসোল বিভাগ	১৭০	৩৭২
মোট :	২৫৯	৭১৬

বিংশ শতাব্দীর শেষে কমপক্ষে আরও ১০০টি বাসরুট মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। ১৯৭০ সালের জেলায় বাস চলাচল ও যাত্রী পরিবহনের ২৪ ঘন্টার Survey Report-এ দেখা যায় ২৪ ঘন্টায় মোট ৩৯৭৮ টি বাস চলাচল করেছে এবং তাতে ভিতরে ও বাইরে যথাক্রমে ২০২২০১ ও ৩১৪২৮ সর্বমোট ২৩৩৬২৯ জন যাত্রী চলাচল করেছে।

রেলপথ : ১৮৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত প্রথম রেল লাইন খোলা হয়। এই লাইনকে ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয় ও পরে এই রেলপথকে বর্ধমান ও খানা জংশনের মধ্য দিয়ে রানীগঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। ১৮৫৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী এর উদ্বোধন হয়। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি হয়েছিল বর্ধমান স্টেশনেই। হাওড়া থেকে প্রথম ট্রেনের বর্ধমান পৌঁছাতে লাগে ২ ঘন্টা ৫০ মিনিট। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড-লাইনের উদ্বোধন হয় ১৯১৭ সালের ১লা জানুয়ারী। বর্তমানে

জেলার মধ্যে ব্রড্ গেজ ও লাইট রেলওয়ের মোট দৈর্ঘ্য (স্থাপনের তারিখসহ) নিম্নের সারণীতে দেখানো হল।

লাইন প্রতিষ্ঠার তারিখ ও দৈর্ঘ্য (কিলোমিটারে)

লাইন	তারিখ	দৈর্ঘ্য
(১) দেবীপুর থেকে চিত্তরঞ্জন	৩.২.১৮৫৫	১৬৩
(২) নবগ্রাম থেকে বর্ধমান	১১.১.১৯১৭	২৬
(৩) খানা জংশন থেকে ভেদিয়া লুপ লাইন	৩.১০.১৮৬৮	৩১
(৪) অণ্ডাল থেকে পাণ্ডবেশ্বর	১০.১২.১৯০৬	২০
(৫) কোল ফিল্ডের লাইন আসানসোল থেকে দামোদর	ডিসেম্বর ১৮৮৯	৭.৪৩
অণ্ডাল থেকে গৌরাঙ্গডি ও উখরা পর্যন্ত	১.৫১৮৫৪	৫০.৬
	মোট —	২৯৮.০৩
(৬) বর্ধমান থেকে কাটোয়া মিটার গজ (BKR)	১.১২.১৯১৫	৫৩
(৭) কাটোয়া থেকে কেন্দা (AKR)	২৯.৯.১৯১৭	২০
(৮) ইন্দাস থেকে সেহারা বাজার (বর্তমানে বন্ধ) (BDR)	১.৪.১৯১৭	১৮.৭৭
	মোট —	৯১.৭৭

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের সূচনায় হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত ইলেকট্রিক ইঞ্জিনচালিত সুদৃশ্য মালটিপল কোচ চালু হয়। এর উদ্বোধন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। এরপর থেকে ধীরে ধীরে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন বিদায় নিচ্ছে—তার বদলে বিদ্যুৎ ও ডিজেলচালিত দ্রুতগামী গাড়ী হাওড়া থেকে আসানসোল মেন লাইন ও কর্ড লাইনে চালু হয়ে গেছে। যেখানে এখনও বিদ্যুৎচালিত গাড়ী চালু হয় নাই সেখানেও বিশেষ করে দূরপাল্লার মেল এক্সপ্রেসে ডিজেল চালিত ইঞ্জিনে গাড়ী চলছে।

ফেরীঘাট : জেলা পরিষদের অধীনে জেলায় ২২টি ফেরীঘাট আছে। সেগুলি এক বৎসরের মেয়াদে প্রকাশ্য নিলামে জেলা পরিষদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। নিলাম হয় সাধারণত মার্চ মাসে।

ফেরীঘাটের তালিকা (২০০০ সালের তালিকা)

ফেরীঘাটের নাম	মহকুমা	থানা	নদীর নাম
কসবা	সদর	গলসী	দামোদর
একলকী	সদর	রায়না	দ্বারকেশ্বর
শিল্যা	সদর	গলসী	দামোদর
কুলপাড়া	সদর	গলসী	দামোদর
দেওয়ানগঞ্জ	কাটোয়া	কাটোয়া	ভাগীরথী
বেগুনকোলা	কাটোয়া	কেতুগ্রাম	অজয়
শাঁকাই	কাটোয়া	কেতুগ্রাম	ভাগীরথী
উদ্ধারণপুর	কাটোয়া	কেতুগ্রাম	ভাগীরথী
মালতীপুর বা গ্রাম কালনা	কালনা	কেতুগ্রাম	ভাগীরথী
নসরৎপুর	কালনা	পূর্বস্থলী	ভাগীরথী
জালুইডাঙ্গা	কালনা	পূর্বস্থলী	ভাগীরথী
মেরতলা	কালনা	পূর্বস্থলী	ভাগীরথী
চর কমলনগর	কালনা	পূর্বস্থলী	ভাগীরথী
কমল নগর	কালনা	পূর্বস্থলী	ভাগীরথী
তামাঘাটা	কালনা	পূর্বস্থলী	ভাগীরথী
মাজিদা	কালনা	পূর্বস্থলী	ভাগীরথী
কাষ্ঠশালী	কালনা	পূর্বস্থলী	ভাগীরথী
এডরাকপুর	কালনা	পূর্বস্থলী	ভাগীরথী
শংকরপুর	কালনা	পূর্বস্থলী	ভাগীরথী
নারিকেল তলা	কালনা	পূর্বস্থলী	ভাগীরথী
হাট কালনা	কালনা	পূর্বস্থলী	ভাগীরথী

এছাড়া দামোদর, ভাগীরথী ও অজয়ের ওপর যে সব ফেরীঘাট আছে সেগুলি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের ল্যান্ড রিফর্মস অফিসারের অধীনে বিলি হয়।

ডাকবাংলো : দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে, বনবিভাগে ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পৃথক পৃথক পরিদর্শন বাংলো আছে। জেলা পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে ডাকবাংলো-২০ (সারণী–৪)।

জেলা পরিষদ ছাড়া অন্যান্য পরিদর্শন বাংলো ও রেষ্ট হাউস-২৭। বর্ধমানে একটি সারকিট হাউস এবং আসানসোল ও নিয়ামতপুরে একাধিক ধরমশালা আছে।

ডাক-তার পরিষেবা : আফগান সম্রাট শেরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসে বাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দেশব্যাপী সুপ্রশস্ত রাস্তার নেটওয়ার্ক বিস্তার করেন ও রাস্তার ধারে ধারে সরাইখানা স্থাপন করেন। এই সরাইখানাই ডাকঘরের কাজে ব্যবহৃত হতো। শেরশাহ দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। পরবর্তীকালে তাপ্পি নামে ডাকহরকরা ও কাসিদ (Cassids) নামে অশ্বারোহী ডাকহরকরা চিঠিপত্র ডাকসড়ক দিয়ে দ্রুত নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিত। কলকাতা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত একটা ডাক রাস্তা ছিল, বর্তমান জি. টি. রোডই এই ডাকসড়কের কাজে ব্যবহৃত হত।

লর্ড ডালহাউসীর শাসনকালে এদেশে ডাক ও টেলিগ্রাফ পরিষেবা চালু হয়। এ জেলায় প্রথম ডাকঘর স্থাপিত হয় বর্ধমান ও কাটোয়ায়। কাটোয়ার ডাকঘর প্রথমে মুখ্য ডাকঘর (Head Post Office) ছিল—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কাটোয়া পোষ্ট অফিসকে Head Post Office থেকে Sub Post Office-এ degrade করা হয়। মনে হয় বর্ধমান ও কাটোয়া ডাকঘরের কাজের পরিমাণের তুলনামূলক বিচারে বর্ধমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় ও কাটোয়ার কাজের পরিমাণ কম হওয়ায় এর অবনয়ন ঘটানো হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে জেলায় মোট ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ২৬৩। এ সময় বর্ধমান মুখ্য ডাকঘবই জেলার সমস্ত ডাকঘরের হিসাব নিয়ন্ত্রণ করতো। পরে আসানসোল সাব পোষ্ট অফিসের উন্নতি ঘটিয়ে আসানসোল সাব পোষ্ট অফিসকে মুখ্য ডাকঘরে উন্নীত করা হয়। এই পোষ্ট অফিসই আসানসোল বিভাগের সমস্ত পোষ্ট অফিসের হিসাব নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। পরবর্তী ১ম, ২য় ও ৩য় পরিকল্পনাকালে পোষ্ট অফিসের সংখ্যা যথাক্রমে ১৩৫, ৭১ ও ২৪ বৃদ্ধি করা হয়। দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত ওয়ারিয়া ও ভিরিঙ্গিতে দুটি Extra Departmental Branch ছিল। শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার পরে এখানে ৯টি সাব পোষ্ট অফিস ও ১টি Non-delivery sub Post Office গড়ে ওঠে। যেমন Durgapur CSO (Durgapur-1), Durgapur Coke Oven (Durgapur-2), Durgapur Steel Project Sub-office (Durgapur-3), Durgapur Township A Zone C.S.O (Durgapur-4), Durgapur Township B Zone (Durgapur-5), Durgapur Thermal Power Station (Durgapur-6) Durgapur Brick field (Durgapur-7), Alloy Steel Project C.S.O (Durgapur-8), Durgapur Regional Engineering College C.S.O. (Durgapur-9), Durgapur Industries Board & Zone (Non delivery sub offfice)।

১৯৯১ সালে Census Hand Book অনুসারে দেখা যাচ্ছে পল্লী ও শহর অঞ্চলে ডাক পরিষেবার নিম্ন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে—

	ডাকঘর	ফোনের সুবিধাসহ ডাকঘর	ডাক ও তার ঘর	টেলিগ্রাফ অফিস
গ্রামাঞ্চল	৪৭৬	৭৬	৫	—
শহরাঞ্চল	—	৫০	৯৩	৪৮
মোট	৪৭৬	১২৬	৯৮	৪৮

বর্তমানে টেলিকমিউনিকেশন বা দূরসংযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এই উন্নয়নের কার্য অব্যাহত আছে। আসানসোলে একটি Secondary Switching area-এর অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ধমানেও Telecommunication বিভাগে বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়ারের অফিস প্রতিষ্ঠিত। তবে Electro-mechanical Exchange নাই। আশা করা যায় Electro-mechanical Exchange-ও শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হবে। Switching Area-এর তত্ত্বাবধানে Telephone পরিষেবা আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে জেলায় ৯১টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আছে। দিন দিন এই Exchange-এরও সম্প্রসারণ হচ্ছে। বর্তমানে Internet ও বিশ্বায়নের যুগে এই সম্প্রসারণ অনিবার্য। নতুন নতুন Technology Switch ও বর্তমান Exchange-এর সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শহরে ও গ্রামে STD ও ISD Centre খোলার জন্য বেকার যুবকদের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। জরুরী ভিত্তিতে তৎকাল টেলিফোনের মঞ্জুর করা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী দশকে সুদূর গ্রামেও টেলিযোগাযোগ সম্প্রসারিত হবে। তবে সর্বত্র work culture নষ্ট হওয়ায় সম্প্রসারণের আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে না। এর জন্যে রেলপথ ও ডাক-তার বিভাগের কিছু অংশের বেসরকারীকরণের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। বেসরকারীকরণের প্রথম ধাপ হিসেবে Telecommunication Dept. সম্প্রতি ভারত সঞ্চার নিগমে switch over করেছে।

BUS ROUTES IN BARDHAMAN DISTRICTS : 1971

Name of route	Existing sanc-tioned permits	Recomendation for additional bus by Asansol Planning Org.
Bardhaman—Chittaranjan	4	1
Bardhaman—Barakar via G. T. Road	8	2
Bardhaman—Barakar via Raniganj	2	Nil
Bally—Barakar	5	Nil
Bardhaman—Asansol via G. T. Road	8	5
Bardhaman—Asansol via Jamuria	2	Nil
Bardhaman—Raniganj	7	1
Bardhaman—Sitarampur via Durgapur	1	Nil
Bardhaman—Sibpur via Durgapur	4	1
Bardhaman—Sibpur via Rajbandh	1	1
Bardhaman—Sibpur via Andal, Ukhra	3	Nil
Bardhaman—Illambazar	2	Nil
Bardhaman—Durgapur	8	1
Bardhaman—Ramgopalpur	2	Nil
Bardhaman—Adrahati	3	2
Bardhaman—Gushkara via Suri Road	9	5
Bardhaman—Nabagram via Budbud	—	Nil
Gushkara—Illambazar via Ban Nabagram	—	Nil
Durgapur—Benachiti (Via Kashem bazar)	5	Nil

Government of West Bengal, Asansol Planning Organisation, Bus Passanger Study for Burdwan District, Asansol, 1971, pp. 20–31.

Name of route	Existing sanctioned permits	Recomendation for additional bus by Asansol Planning Org.
Gushkara—Bhedia via Baragram	1	1
Balgana—Randiha via Gushkara	1	Nil
Bardhaman—Panagarh via Gushkara	1	Nil
Gushkara—Kashemnagar	—	—
Durgapur—Bolpur	—	—
Benachiti–Bolpur via Durgapur	1	1
Mankar—Raniganj via Durgapur	1	2
Bardhaman—Gushkara via Budbud	1	1
Bardhaman—Suri (Express)	2	Nil
Bardhaman—Gushkara via Galigram	1	3
Bardhaman via Gushkara, Balgana, Budbud	1	1
Budbud—Balgana	5	Nil
Durgapur—Illambazar (Kashembazar)	5	Nil
Durgapur—Illambazar	2	1
Durgapur—Navadwip (Express) D.S.T.S	4	Nil
Durgapur—Sreerampur via Barddhaman Rly. Station	1	Nil
Bardhaman—Kalna via Kalna Road	17	1
Bardhaman—Kalna via Memari	2	Nil
Bardhaman—Kalna via Malamba	1	Nil
Bardhaman—Sitarampur via Memari and Satgechhia	1	Nil
Bardhaman—Sitarampur via Kalna Rd.	1	Nil
Bardhaman—Manteswar via Memari	4	1

Name of route	Existing sanctioned permits	Recomendation for additional bus by Asansol Planning Org.
Bardhaman—Manteswar via Kalna Rd.	1	1
Bardhaman—Navadwip via Kalna Rd	2	Nil
Memari—Maldanga via Satgechhia	6	Nil
Kalna—Ghupi	1	Nil
Patuli—Kalna	2	Nil
Kalna—Manteswar	4	Nil
Kalna—Katoya	2	Nil
Kalna—Baidyapur	4	Nil
Kalna—Nadanghat	1	Nil
Navadwip—Kalnaghat via Nadanghat	1	Nil
Kalna—Pandua	—	—
Bardhaman (Express) via Dhatrigram, Katoya	2	1
Bardhaman to Malamba via Memari and Satgachhia	1	Nil
Bardhaman—Memari via Parhati	1	1
Memari—Malamba via Parhati	1	Nil
Bardhaman—Bara Palasan	1	1
Bardhaman—Madhyamgram via Malamba	1	1
Bardhaman to Nadanghat via Bhandardihi and Malamba	13	6
Kalna—Bagnapara	—	—
Memari—Bijur	—	—
Katoya Section		
Bardhaman—Dainhar	9	10
Bardhaman—Katoya	2	3
Bardhaman—Nutanhat	2	6
Kashemnagar—Katoya	—	—
Nutanhart—Katoya	—	—
Gushkara—Katoya	?	?
Bardhaman—Gushkara via Balgana	4	1

Name of route	Existing sanctioned permits	Recomendation for additional bus by Asansol Planning Org.
Bardhaman—Balgana	1	1
Balgana—Katoya (extended upto) Katoya—Palsona	—	—
Bardhaman—Nasigram	4	4
Bardhaman—Patuli (Express)	1	1
Trans-Damodar Section		
Bardhaman—Arambagh	19	9
Local Seharabazar trips	—	—
Bardhaman—Raina	9	Nil
Bardhaman—Chhota Bainan	4	Nil
Bardhaman—Mocedanga	3	1
Bardhaman—Kaiti	2	1
Bardhaman-Bankura via Metadanga (by R. T. A Bankura)	1	2
Bardhaman—Eklakshmi	2	Nil
Bardhaman—Tarakeswar	11	2
Bardhaman—Barsul	2	Nil
Bardhaman—Sikshaniketan	1	Nil
Memari—Tarakeswar	3	Nil
Masagram—Tarakeswar	2	Nil
Bardhaman—Jaugram	2	Nil
Bardhaman—Bally	8	2
(Asansol Subdivision)		
Asansol—Barakar via Kulti	22	6
Asansol—Barakar via Dishergarh	11	3
Asansol—Panchet Hill	2	1
Asansol—Maithon	2	1
Puruliya—Asansol	1	1
Raniganj—Katras	3	1
Asansol—Karmataur via Salanpur	2	1
Asansol—Jamtara via Barakar	3	Nil
Asansol—Sindri	1	Nil
Asansol—Dhanbad via Barakar	3	2
Mejiaghat—Karmataur via Raniganj	1	1

Name of route	Existing sanctioned permits	Recomendation for additional bus by Asansol Planning Org.
Asansol—Deoghar	1	1
Raniganj—Jharia	1	1
Asansol—Jamtara via Salanpur	1	1
Raniganj—Jharia	1	1
Asansol—Jamtara via Salanpur	1	1
Burnpur—Chittaranjan via Asansol, Barakar	2	1
Gaurandi—Barakar via Asansol	2	Nil
Gaurandi—Maniganj via Asansol	1	Nil
Asansol—Jamuria via Gaurandi	2	2
Bardhaman—Chittaranjan via Barakar	4	1
Mejiaghat—Kalyaneswari via Asansol and Barakar	1	1
Rupnarayanpur—Raniganj via Salanpur	2	Nil
Asansol—Kalyaneswari via Dishergarh	1	1
Rupnarayanpur—Asansol via Barakar	2	Nil
Asansol—Rupnarayanpur via Salanpur	1	Nil
Andal—Barakar via Raniganj	1	1
Kulti—Chittaranjan	2	1
Asansol—Mejiaghat via Namuria	5	2
Asansol—Raniganj via Jamuria and Domohani	10	3
Asansol—Churulia	3	1
Asansol—Ukhra via Jamuria	1	Nil
Asansol—Pandaveswar via Domohani, Jamuria	1	3
Samlakendra—Asansol Court via Jamuria, Domohani	3	1

Name of route	Existing sanctioned permits	Recomendation for additional bus by Asansol Planning Org.
Mejiaghat—Nunakaraghat	2	Nil
Panagarh—Barakar via Asansol	1	1
Asansol—Raniganj via G T Road	7	1
Asansol—Mejiaghat via G T Road	1	1
Asansol Court—J K Nagar (extended to Dighari)	3	1
Gopalpur —Asansol via Raniganj	2	Nil
Asansol—Durgapur via Raniganj	2	Nil
Mechan—Asansol via Raniganj	2	1
Asansol—Raniganj via J K Nagar	2	Nil
Asansol—Gushkara	1	Nil
Panagar—Asansol via Raniganj	1	2
Panagar—Asansol via Raniganj Gopalpur	[illegible]	[illegible]
Shibpur—Asansol via Raniganj	2	1
Asansol—Shibpur via Jamuria	2	1
Gourbazar—Asansol via Raniganj	5	2
Rakshitpur—Asansol	[illegible]	[illegible]
Illambazar—Asansol via Raniganj	2	1
Bangora—Asansol via Raniganj	2	1
Ukhra—Raniganj via Baktarnagar		
Sibpur—Raniganj	1	1
Andal—Ukhra	2	Nil
Madaipur—Durgapur Rly Station	—	—
Ukhra—Raniganj	[illegible]	[illegible]
Asansol—Burnpur	21	1

Name of route	Existing sanctioned permits	Recomendation for additional bus by Asansol Planning Org.
Asansol—Surajnagar	?	?
Dehika—Mejiaghat via Asansol. Domohani, Jamuria, Raniganj	1	1
Asansol—Radhanagar	3	Nil
Asansol town—Court	?	?
Asansol—Samla via Raniganj	1	1
Asansol—Panagar Base	1	1
Burnpur—J. K. Nagar via G. T. Road	1	1
Burnpur—Chatapathar	?	?
Burnpur—Sen Raleigh via Asansol	2	1
Panchgachhiya—Burnpur via Sen Raleigh	?	?
Asansol—Bardhaman	8	2
Burnpur—Durgapur	3	1
Asansol—Bardhaman via Jamuria	2	Nil
Dighari—Sripur	1	Nil
Asansol Court—Sripur Colliery	1	1
Asansol Rly. Station-River side	1	1
Asansol—Kumardihi via Chanda	1	2
Dishergarh—Durgapur via Muchipara	3	1
Asansol—Ukhra via Raniganj	1	Nil
Asansol—Bahula via Raniganj	1	1
Asansol—Kajora (extended upto Haripur)	1	1
Churulia—Durgapur via Domohani, Jamuria	1	Nil
Raniganj—Chittaranjan	?	?
Gourbazar—Raniganj	1	Nil
Raniganj—Sibpur via Andal	1	1
Sibpur—Durgapur via Andal	2	Nil

Name of route	Existing sanctioned permits	Recomendation for additional bus by Asansol Planning Org.
Sibpur—Asansol via G. R. Road	?	?
Barakar—Mejiaghat via Asansol	2	1
Barakar—Durgapur via G. J. Road.	4	3
Kalyaneswari—Durgapur via Muchipara	1	1
Asansol—Durgapur via Muchipara	3	3
Mejiaghat—Chittaranjan via Asansol & Sitarampur Rly. Station		
Bhurighat—Asansol via Raniganj	1	1
Khettardihi—Asansol via Jamuria	1	Nil
Darbardangalghat—Asansol Court	1	1
Asansol—Jamuria via Chandu	1	1
Bangara—Raniganj via Kajora	1	2
Durgapur—Andal via Benachiti	1	Nil
Panagar—Raniganj	1	Nil
Durgapur Notified Area (D.S.T.S)	32	Nil
Durgapur—Raniganj (D.S.T.S)	5	Nil
Durgapur—Arambagh via Bankura	1	1
Durgapur—Sainthia via Illambazar	1	Nil
Durgapur—Asansol Court	8	2
Durgapur—Chittaranjan	5	1
Durgapur—Puruliya via Beliatore	3	2
Durgapur—Berhampur	4	Nil
Bankura—Durgapur	—	—
Gorabari—Durgapur	—	—
Bishhnupur—Durgapur	—	—
Sonamukhi—Durgapur	—	—
Tiluri—Durgapur	—	—

Name of route	Existing sanctioned permits	Recomendation for additional bus by Asansol Planning Org.
Bankura—Digha	—	—
Burnpur—Domohani	1	Nil
Metadanga—Durgapur	1	—
Radhanagar—Durgapur	—	No bus trips required
Raghunathpur—Durgapur	—	,,
Barakar—Kandra	—	—
Asansol—Ajayghat	—	—
Chittaranjan—Asansol	—	—
Santaldihi—Asansol	—	—
Panchet—Barakar	—	—
Dishergarh—Asansol	—	No extra bus trips
Barakar—Raniganj	—	—
Chittaranjan—Raniganj	—	—
Ranchi—Durgapur	—	No extra bus trips
Ranchi—Dumka via Dhanbad	—	—
Dhanbad—Karo	—	—
Dhanbad—Bhagalpur	—	—
Asansol—Pariharpur via Girmint	—	—
Asansol—Girmint	—	—
Bankura—Calcutta	—	No extra bus trips
Burnpur—Raniganj	—	,,
Ban Navagram—Bardhaman	—	,,
J. K. Nagar—New town	—	—
D. S. T. S. No. 4	—	No extra bus trips
D. S. T. S. No. 7	—	—
D. S. T. S. No. 5	—	—
Gopalpur—Ramnagar	—	No extra bus trips
Raniganj—J. K. Nagar	—	,,
Durgapur—J. K. Nagar	—	,,
Asansol—Haripur	—	—
Asansol—Domohani	—	—
Asansol—Navadwip	—	No extra bus trips
Durgapur—Panagar	—	,,
Puruliya—Calcutta	—	—
Durgapur—Ramnagar	—	—
Bardhaman—Dhanbad	—	—
Bardhaman—Puruliya	—	No extra bus trips
Bardhaman—Benachiti	—	—

Name of route	Existing sanctioned permits	Recomendation for additional bus by Asansol Planning Org.
Asansol—Digha	—	No extra bus trips
Asansol—Andal	—	,,
Mahashila Colony—Burnpur Via Court	1	Nil
Nachan—Benachiti	—	—
Asansol—Benachiti	—	—
Asansol—Kulti	—	No extra bus trips
Barakar—Jamuria via Asansol	—	—
Raniganj—Jamuria	—	No extra bus trips
Raniganj—Kalyaneswari	—	,,
Raniganj—Domohani	—	—
Asansol—Adra	—	—
Bardhaman—Jamuria	—	No extra bus trips
Jamuria—Mejiaghat	—	,,
Barakar—Kulti	—	,
Bahula—Barakar	—	,,
Asansol—Chirkunda	—	,,
Bardhaman—Gopalpur	—	—
Bardhaman—Digha	—	No extra bus trips
Bardhaman—Bolpur	—	—
Asansol—Bolpur	—	—
Bardhaman—Andal	—	No extra bus trips
Raniganj—Bankura	—	,,

সারণী-৪

LIST OF DAK BUNGLOWS IN BARDHAMAN DISTRICT UNDER ZILLA PARISHAD : 1972

Name	Location		Controlling authority
	Police Station	Subdivision	
Asansol Dak & Inspection Bunglow	Asansol (at 138th mile of G.T. Road)	Asansol	Administrator, Zilla Parishad, Bardhaman
Bardhaman Dak & Inspection Bunglow	Bardhaman	Bardhaman	-do-
Gushkara Inspection Bunglow	Ausgram	-do-	-do-
Kalna Inspection Bunglow	Kalna	Kalna	-do-
Kandra Inspection Bunglow	Ketugram	Katoya	-do-
Kanksa Inspection Bunglow (Panagarh)	Kanksa	Durgapur	-do-
Katoya Inspection Bunglow	Katoya	Katoya	-do-
Khandaghosh Inspection Bunglow	Khandaghosh	Bardhaman	-do-
Kusumgram Inspection Bunglow	Manteswar	Kalna	-do-
Memari Inspection Bunglow	Memari	Bardhaman	-do-
Malandighi Inspection Bunglow	Kanksa (at 6th mile of Ajay Road)	Durgapur	-do-
Mongalkote Inspection Bunglow	Kalna	Kalna	-do-
Nadanghat Inspection Bunglow	Purbasthali	-do-	-do-
Raina Inspection Bunglow	Raina	Bardhaman	-do-
Raniganj Inspection Bunglow	Raniganj (near Raniganj Rly. Station)	Asansol	-do-
Rupnarayanpur Inspection Bunglow	Salanpur (near Rupnarayanpur Rly. Station)	Asansol	Administrator, Zila Parishad, Bardhaman

Name	Location		Controlling authority
	Police Station	Subdivision	
Sagrai Inspection Bunglow	Raina	Bardhaman	-do-
Satgechhia Inspection Bunglow	Memari	Bardhaman	Administrator, Zilla Parishad, Bardhaman
Srikhanda Inspection Bunglow	Katoya	Katoya	-do-
Uchalan Inspection Bunglow	Raina	Bardhaman	-do-

LIST OF INSPECTION BUNGLOWS (OTHER THAN ZILLA PRARISHAD), REST HOUSES, etc. IN BARDHAMAN DISTRICT : 1972

Name	Location		Controlling authority
	Police Station	Subdivision	
Asansol Inspection Bunglow	Asansol (At 139th mile of G.T. Road)	Asansol	Assistant Engineer, Public Works Directorate, Asansol Subdivision, Asansol
Balgana Inspection Bunglow	Bardhaman	Bardhaman	Executive Engineer, Damodar Canal Division, Asansol
Barakar Inspection Bunglow	Kulti (near Barakar bridge	Asansol	Executive Engineer, Public Works Directorate, Bardhaman Division, Bardhaman
Budbud Inspection Bunglow	Budbud	Bardhaman	-do-
Edilpir Inspection Bunglow	Bardhaman	Bardhaman	As in Sl. No. 2
Galsi Inspection Bunglow	Galsi	-do-	Executive Engineer, Damodar canal division
Guhagram Inspection Bunglow	-do-	-do-	-do-
Kalna Inspection Bunglow	Kalna	Kalna	Executive Engineer (Roads), Hooghly Constraction Division, Chinsura
Kanainatshal Inspection Bunglow	Bardhaman	Bardhaman	As in Sl. No. 2
Katoya Inspection Bunglow	Katoya	Katoya	Executive Engineer (Roads), Bardhaman Constraction Division, Bardhaman

Name	Location		Controlling authority
	Police Station	Subdivision	
Palla Inspection Bunglow	Memari	Bardhaman	As in Sl No 2
Rajbandh Inspection Bunglow	Kanksa (At 107th mile of G T Road)	Durgapur	As in Sl No 3
Rest House at Aduria (Panagarh Range—on the road side of Sri chandrapur-Aduria Rd About 2 miles east from 11th mile road side of Panagarh-Illambazar Road)	Ausgram	Bardhaman	Divisional Forest Officer Bardhaman Division
Rest House at Arrah (Durgapur Range—On the road side of Durgapur-Sibpur Road *via* Khatpukur One mile north of G T Road)	Kanksa	Durgapur	-do-
Rest House at Ausgram (Gushkara Range—on Gushkara-Ausgram road side About 6 miles off from Gushkara Rly Stn	Ausgram	Bardhaman	-do-
Rest House at Parsadih Maithon (Asansol Range —Barakar-Maithon road, *via* Kalyaneswari)	Salanpur	Asansol	Divisional Forest Officer, Bardhaman Division
Rest House at Ramnabagan, Bardhaman Divisional Head-quarters, Bardhaman	Bardhaman	Bardhaman	Divisional Forest Officer, Bardhaman Division
Srirampur Inspection Bunglow, Navadwip	Purbasthali	Katoya	Divisional Forest Officer Bardhaman
Temporary Cottage Type of Rest House at Amulia (Asansol Range —On the road side of Barabani-Amulia Road *via* Sarshatali just near Ajay river on the north)	Barabani	Asansol	-do-

Name	Location		Controlling authority
	Police Station	Subdivision	
Temporary Cottage Type of the Rest House at Khandari (Panagarh Range—on the west of Budbud-Mankar Road and along road side of Mankar-Khandari Road)	Ausgram	Bardhaman	-do-
Temporary Cottage Type Rest House at Nabaghanapur (Ukhra Range—on the road side of Ukhra-Sibpur Road *via* Kataberia. About 5 miles (8.05 Km) off from Ukhra Railway Station of the north-east)	Faridpur	Durgapur	-do-
Temporary Cottage Type Rest House at Orgram (Gushkara Range —On the Gushkara-Ausgram road side. About 6 miles (9.66 Km.) off from Gushkara Railway Station	Ausgram	Bardhaman	-do-
Coke-Oven Inspection Bunglow	Durgapur (Coke-Oven Colony)		
D. V. C. Circuit House	Durgapur (Coke-Oven Colony)		
Chummery House	Durgapur		Durgapur Steel Project
Tagore House	-do-		-do-
Youth Hostel	-do-		Education Deptt., Govt. of West Bengal.

(তথ্যসূত্র : Bardhaman Gazetteer 1994)

সারণী-৩

রাস্তাঘাট ও বিভিন্ন জ্ঞাতব্য [সরকারী পি. ডব্লু (রোডস্) কর্তৃত্বাধীনে রাস্তাসমূহ]

রাস্তার নাম	দৈর্ঘ্য (মাইল)	প্রস্থ	পাকা	কাঁচা
১. গুসকরা-ভেদিয়া রোড	১০	২৪′-০″	১০	×
২. ভেদিয়া-ছোড়া রোড	১০	২০′-০″	১০	×
৩. গুসকরা-আউসগ্রাম-ছোড়া-জাঙ্গল রোড	১৮	২৬′-০″	১৮	×
৪. মিরজাপুর-কলিগ্রাম-কুসুমগ্রাম রোড	২০	২৭′-০″	২০	×
৫. ভাতার-নাসিগ্রাম রোড	৭	২৪′-০″	৭	×
৬. গোলগ্রাম কুদরুকি-চণ্ডীপুর রোড	৮	২২′-০″	৮	×
৭. মহাচান্দা রোড	১	২০′-০″	১	×
৮. তালিত-গুসকরা রোডের উপর খাড়ী ব্রীজ অ্যাপ্রোচ রোড	২ ফার্লং	২৪′-০″	২ ফার্লং	×
৯. মাঝের গ্রাম-মালম্বা রোড	৭	২৪′-০″	৭ মাইল	×
১০.জামনাগ্রাম রোড	১$\frac{১}{২}$	২২′-০″	১$\frac{১}{২}$ মাইল	×
১১.মেমারী-জোগ্রাম রোড .	৬	২৪′-০″	৬	×
১২.জি. টি. রোড—দুর্গাপুর হেলথ সেন্টার রোড	২	২২′-০″	২	×
১৩.কলানবগ্রাম-শিক্ষানিকেতন রোড	১$\frac{১}{২}$	২২′-০″	১$\frac{১}{২}$	×
১৪.রসুলপুর-পাল্লা রোড	৩	২৪′-০″	৩	×
১৫.আহারবেলমা-পহলানপুর রোড	১১	২০′-০″	১১	×
১৬.রায়না-জামালপুর রোড	৭	২৪′-০″	৭	×
১৭.পূর্বস্থলী-কাটোয়া রোড (পাটুলী রোড দাঁইহাট লিংক রোডসহ)	২২	৩২′-০″	২২	×
১৮.পাটুলী বাজার-পাটুলী রেল স্টেশন রোড	২	২০′-০″	২	×
১৯.পূর্বস্থলী-কাটোয়া রোড	২	২০′-০″	২	×
২০.পূর্বস্থলী বাজার-চুপিহাট রোড	২	২৪′-০″	২	×
২১.কাটোয়া-কেতুগ্রাম-রামজীবন রোড	১৪	২৪′-০″	১৪	×

রাস্তার নাম	দৈর্ঘ্য (মাইল)	প্রস্থ	পাকা	কাঁচা
২২.উদ্ধারণপুর-সিলুরী রোড (সিডিপি)	৪	২০´-০´	৪	×
২৩.কাটোয়া শহর ও কাটোয়া-কেতুগ্রাম-রামজীবনপুর লিংক রোড	৩ ১/২	২৪´-০´´	২ ১/২	১
২৪.কাটোয়া-করোই রোড	১০	২৪´-০´´	৪	×
২৫.মন্তেশ্বর-দাঁইহাট রোড	১৬	২৪´-০´´	১৫	×
২৬.কৈচোর-নন্দীগ্রাম-সিঙ্গিরোড	১৬	২৪´-০´´	৩	×
২৭.মঙ্গলকোট লিংক রোড	১	২৪´-০´´	১	×
২৮.এম. টি. কে. কে রোড	২৩	১২´-০´´	১৩	×
২৯.কালনা-বৈদ্যপুর রোড	৭ ১/২	২৪´-০´´	৭	×
৩০.পাণ্ডুয়া-কুলটি রোড	১ ১/২	২০´-০´´	১	×
৩১.বোহার ডাইভারসান রোড	১	২০´-০´´	১	×
৩২.নাদনঘাট-কুসুমগ্রাম রোড	৭ ১/২	২৪´-০´´	৭	×
৩৩.নবদ্বীপ-লিংক রোড	৩	২৪´-০´´	৩	×
৩৪.জি.টি. রোড-দুর্গাপুর ব্যারেজ অ্যাপ্রোচ রোড ও দুর্গাপুর ব্যারেজ ফীডাব রোড	৪	৩২´-০´´	৪	×
৩৫.দুর্গাপুর রেলস্টেশনের দক্ষিণে নব নির্মিত লিংক এস. এইচ রোড	১	৩২´-০´´	১	×
৩৬.এন. এইচ. ২ হইতে আসানসোল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং, স্কীম পর্যন্ত	৩	৩২´-০´´	৩	×
৩৭.রানীগঞ্জ-ফীডার রোড	১ ১/২	২৪´-০´´	১ ১/২	×
৩৮.রানীগঞ্জ-মঙ্গলপুর রোড	১ ১/২	২৬´-০´´	১ ১/২	×
৩৯.অজয় ব্রীজের অ্যাপ্রোচ রোড	১ ১/২	৩২´-০´´	১ ১/২	×
৪০.পানাগড়-ইলামবাজার রোডের উপর কুনুর ব্রীজের অ্যাপ্রোচ রোড	১/৪	৩২´-০´´	১/৪	×
৪১.অভিরামপুর-মিল্লা রোড	১০	২৬´-০´´	৫	৫
৪২.আকুই তোড়কোণা-মোগলমারী রোড (ও. ডি. আর)	৭	২৪´-০´´	×	৭
৪৩.দীঘলগ্রাম হইতে বর্ধমান-আরামবাগ রোড	৩	২৪´-০´´	×	৩
৪৪.নাসিগ্রাম-মন্তেশ্বর রোড (ও.ডি.আর)	৪	২৪´-০´´	×	৪

রাস্তার নাম	দৈর্ঘ্য (মাইল)	প্রস্থ	পাকা	কাঁচা
৪৫.কাটোয়া-চুরপুনি-বিলেশ্বর পালিতা রোড	১২	২২´-০´´	x	১২
৪৬.দেবীপুর-বুলবুলিতলা রোড (অবশিষ্ট ৩ মাইল এখনও কাজে হাত দেওয়া হয় নাই)	১০	২৪´-০´´	৪	৩
৪৭.সাহাপুর-পর্বতপুর রোড	১	২০´-০´´	১	-
৪৮.জৌগ্রাম আর. এস. হইতে জৌগ্রাম ভিলেজ পর্যন্ত লিংক রোড	১½	২০´-০´´	১½	-

সরকারী পি. ডব্লুউ. ডি-এর কর্তৃত্বাধীনে রাস্তাসমূহ

রাস্তার নাম	দৈর্ঘ্য (মাইল)	প্রস্থ	পাকা	কাঁচা
১. বর্ধমান-আরামবাগ রোড (দামোদরের দক্ষিণ পার হইতে)	২০	৩২´-০´´	২০	-
২. দুর্গাদাস রোড	৪	২২´-০´´	৪	-
৩. সগরাই-রায়না রোড	৬	২৪´-০´´	৬	-
৪. বলগনা-গুসকরা-মানকর রোড	৩৭	৩২´-০´´	৩৭	-
৫. জি. টি. রোড	১১০	৩৮´-০´´	১১০	-
৬. বর্ধমান-কাটোয়া রোড	৩৬	৩২´-০´´	৩৬	-
৭. বর্ধমান-গুসকরা রোড	২৬	২৪´-০´´	২৬	-
৮. বনপাশ গ্রাম হইতে বনপাশ রেলস্টেশন	৫	২০´-০´´	৫	-
৯. মেমারী-মন্তেশ্বর	১৯	৩২´-০´´	১৯	-
১০.গোলাপমণি রোড	৬	২০´-০´´	৬	-
১১.ওল্ড জি. টি. রোড (মেমারী)	১	৩৪´-০´´	১	-
১২.গোলাপমণি রোড	৬	২০´-০´´	৬	-
১৩.ওল্ড মেমারী-মন্তেশ্বর রোড	১	২৪´-০´´	১	-
১৪.বর্ধমান-কালনা রোড	৩৭	২৪´-০´´	৩৭	-
১৫.বর্ধমান-কালনা লিংক রোড	২	২৪´-০´´	২	-
১৬.আটাগড়-শক্তিগড় রোড	৪	২২´-০´´	৪	-
১৭.মনমোহন দে রোড	৩	২২´-০´´	৩	-
১৮.লিথুরিয়া রোড	৪	২৪´-০´´	৪	-
১৯.রাধানগর রোড	৩	২৪´-০´´	৩	-

রাস্তার নাম	দৈর্ঘ্য (মাইল)	প্রস্থ	পাকা	কাঁচা
২০. বাঁকুড়া-পুরুলিয়া রোড	৪	২৪′-০″	৪	–
২১. রানীগঞ্জ-মেদিনীপুর রোড	৩	২৪′-০″	৩	–
২২. অণ্ডাল-উখরা রোড	৫$\frac{১}{২}$	৩২′-০″	৫$\frac{১}{২}$	–
২৩. উখরা-মাধাইগঞ্জ রোড	৮	৩২′-০″	৮	–
২৪. উখরা-হরিহর রোড	৩	৩২′-০″	৩	–
২৫. রানীগঞ্জ-সিউরী রোড	১২	৩২′-০″	১২	–
২৬. অণ্ডাল ষ্টেশন-অ্যাপ্রোচ রোড	২	২৪′-০″	২	–
২৭. ডি. ভি. সি ফীডার রোড	৩	২৪′-০″	৩	–
২৮. পানাগড়-ইলামবাজার রোড	১৩	৩২′-০″	১৩	–
২৯. সমুদ্রগড়-নাদনঘাট রোড	৫	৩২′-০″	৫	–
৩০. নতুনহাট-মুরাতিপুর রোড	৫	৩২′-০″	৫	–

কোল রোডস্ কনস্ট্রাকশন বিভাগ নং-২ আসানসোল-এর
সরকারী পি, ডব্লুউ (রোডস্) কর্তৃত্বাধীনে রাস্তাসমূহ

রাস্তার নাম	দৈর্ঘ্য (মাইল)	প্রস্থ	পাকা	কাঁচা
১. ফীডার রোড নং ৫	৩ M ৪২ Ch	′-০″	৩ M ১১.৫০ Ch	
২. " " " ৬	৫M ১১.৫০ Ch	৩০′-০″	৫M ১১.৫০ Ch	
৩. " " " ৭	৪$\frac{৭}{৮}$ মাইল	"	৪$\frac{৭}{৮}$ মাইল	
৪. " " " ৮	৪$\frac{৩}{৪}$ "	২৬′-০″	৩$\frac{১}{১০}$ "	১$\frac{১৩}{২০}$ মাইল
৫. " " " ৯	৪$\frac{৩}{৪}$ "	৩২′-০″	৪$\frac{৩}{৪}$ "	
৬. " " " ১০	৭$\frac{১}{৮}$ "	"	৭$\frac{১}{৮}$ "	
৭. " " " ১২	৯$\frac{১}{২}$ "	৩২-০′ } ২৬′-০″ }	৯$\frac{১}{২}$ "	
৮. " " " ১৩	৩$\frac{১}{২}$ "	২২′-০″	৩$\frac{১}{২}$ "	

রাস্তার নাম	দৈর্ঘ্য (মাইল)	প্রস্থ	পাকা	কাঁচা
৯. ,, ,, ,, ১৪	৯	৩২´-০´´	৯	
১০. ,, ,, ,, ১৫	৩ $\frac{৭}{৮}$,,	৩০´-০´´	৩ $\frac{৭}{৮}$	-
১১. ,, ,, ,, ১৬	৩ $\frac{১}{২}$	,,	৩ $\frac{১}{২}$	-
	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	পাকা	কাঁচা
১২. ,, ,, ,, ১৭	৪ $\frac{১}{২}$ M	২৪´-০´´	২ মাইল	২ $\frac{১}{২}$ মা.
১৩. ,, ,, ,, ১৯	৮ M	২৪´-০´´ হইতে ৩০´-০´´	৭ $\frac{৭}{১০}$	$\frac{৩}{১০}$
১৪. ফীডার দোমহানী-গৌরাণ্ডী-রনকুরি ঘাট (ও. ডি. আর)	৮ M ৩৬.২০ Ch	২৬´-০´´	৮ M ৩৬.২০ Ch	-
১৫. ফীডার দোমোহানী-চুরুলিয়া রোড	৪ $\frac{৩}{৪}$,,	২৪´-০´´	-	-
১৬. ফীডার আসানসোল ও এন. এইচ-২ এর বাইপাস	১৪ M ১৮.৫০ Ch	৩৮´-০´´	৫ মাইল ১৭.৬০ Ch	-

বর্ধমান জেলায় মোটর-ভেহিক্‌ল বিভাগের মোট রাজস্ব আদায় হয় বাৎসরিক ৭০.৪৬ লক্ষ টাকা (৭১–৭২)। বর্তমানে স্থায়ী ব্যাসের ৫৩৫টি এবং অস্থায়ী বাসের সংখ্যা যথাক্রমে ১১৭টি। এই জেলার প্রতিটি বাসই নির্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা বহু অধিক সংখ্যক যাত্রী বহন করতে বাধ্য হয়। বর্তমানে মোট বাসের রুটের সংখ্যা ২১০টি। সুতরাং এরকম পরিস্থিতিতে একমাত্র উপায় হচ্ছে বাস রুটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সেই সঙ্গে বাসের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা। কিন্তু বর্ধমানে R. T. A.-এর সেই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেছে হাইকোর্টের ইনজাংশন জারী হওয়ার জন্য। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বর্তমানে R. T. A. কিছু অস্থায়ী পারমিট ইস্যু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা আশা করা যাচ্ছে যে ইনজাংশনের ঝামেলা শেষ হলে R. T. A. এক বছরে ১০০টি নতুন বাসের পারমিট দিতে সক্ষম হবেন। আগামী তিন মাসের ভিতর R. T. A. ১৮টি স্থায়ী ২৮টি অস্থায়ী বাসের পারমিট দিতে মনস্থ করেছেন এবং সেই সঙ্গে দুর্গাপুর ও আসানসোল এলাকায় ১৮টি মিনি বাসেরও পারমিট দেবার মনস্থ করেছেন।

দুর্গাপুর নোটিফায়েড এলাকায় দুর্গাপুর স্টেট ট্রান্সপোর্ট বোর্ড বা এক কথায় D. S. T. S.-এর কর্তৃত্বাধীনে মনোপলি বাস সার্ভিস চালু আছে। উক্ত বোর্ডের কিছু কিছু বাস নোটিফায়েড এলাকার বাহিরেও চলাচলের ব্যবস্থা করিয়েছেন। বর্তমানে উক্ত বোর্ডের মোট ১১২টি বাস আছে তাহার মধ্যে কেবলমাত্র ৫৫টি বাস চালু অবস্থায় আছে। ইহার মধ্যে আবার মাত্র ১৩টি বাস দূরপাল্লার রুটে চলাচল করে। গত ১৯৭১–৭২ সালে আর্থিক বছরে বোর্ডের মোট বাস ছিল ৭৪.৭৬ লক্ষ টাকার। ঐ বছরে উক্ত বোর্ডের আয় ২০.৩৯ লক্ষ টাকা। বর্তমানে ৭টি টাউন শিপে ও ৮টি দুরপাল্লার রুটে D. S. T. S.-এর বাস চলাচল করে। বর্তমানে বোর্ডের শ্রমিক সংখ্যা ৮১৭ জন।

জেলার কতকগুলি এলাকায় যেমন—বরাকর, নিয়ামতপুর, বার্নপুর, আসানসোল বাজার, জামুরিয়া বাজার, সীয়ারসোল মোড় এবং রানীগঞ্জ স্টেশন প্রভৃতি এলাকায় বাস ষ্ট্যাণ্ড নির্মাণ আশু প্রয়োজন। (১৯৭১–৭২ সালের তথ্য)

(কৃতজ্ঞতা—উদয় সংঘ)

উদয় অভিযান : বর্ধমান সংখ্যায় ১৯৭২-এর প্রদত্ত তালিকা



পরিশিষ্ট–১

শাসক কুলজী (প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন যুগ)

কালপঞ্জী	কেন্দ্রশাসন	প্রদেশ	জেলা
খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ ৫০০০			বীর ভানুপুরের মাইক্রোলিথিক যুগে মানব সভ্যতার উন্মেষ, অস্ট্রিক জাতির যাযাবর বৃত্তি থেকে খাদ্যোৎপাদন বৃত্তিতে উত্তরণ।
১৭০০–১৫০০			অজয়-খড়োশ্বরী সভ্যতার যুগ —ধাতুর ব্যবহার ও সমুদ্র পথে ক্রীটের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ—Proto democratic বা গোষ্ঠীতন্ত্রের পঞ্চায়েতী শাসন? / পুরোহিততন্ত্র?
১৪০০–১২৫০			প্রাক্ তাম্রাশ্মীয় যুগ
১২৫০–১০৫০			তাম্রাশ্মীয় যুগ
১০৫০–৯৫০			মিশ্র তাম্রাশ্মীয় যুগ
৬৩০–৪৫০	দিল্লী-থানেশ্বর রতথ পাল Raithapala (noble)	পুন্ড্রস, সুহ্ম বঙ্গস্ (Pundras Vangus)	সুহ্ম Ref H C Roy Chowdhury (Suhmas) রাজতন্ত্র??
৫৯৯–৫২৮	বৈশালী— মহাবীর বর্ধমান		মহাবীর বর্ধমান-এর অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে সংঘাত মহাবীরের উজুবালিয়া (বল্লুকা-চম্পা) তীরে আর্হৎ লাভ।
৫৬৬–৪৮৬	কপিলাবস্তু— গৌতমবুদ্ধ		বুদ্ধদেবের রাঢ় অঞ্চলে পর্যটন?? ৭ম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা ভরতপুরে স্তূপ নির্মাণ।
৪৭০–৪৮৬			সীহবাহু — রাজতন্ত্র
৫৪৪–৪৯৩	পাটলিপুত্র— বিম্বিসার ও অজাতশত্রু		সামন্তরাজ মহামাত্রের শাসন

কালপঞ্জী	কেন্দ্রশাসন	প্রদেশ	জেলা
৪০০–৩৪৫	দিল্লী	কুরুসঙ্ঘ অঙ্গরাজ কর্ণের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন	সামন্তরাজ
৩৪৫–৩২৪		নন্দবংশ মহাপদ্মনন্দ উগ্রসেন ধননন্দ	প্রাসই, গঙ্গারীডি — আগ্রামেস—সামন্তরাজ
৩২৭–৩২৪	আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ		গঙ্গারীডাই
৩২৪–৩০০	মৌর্যবংশ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বিন্দুসার		মহামাত্র
২৭৩–২৩২	অশোক		গ্রামিক
খ্রীষ্টাব্দ			
৭৮–১০১	কণিষ্ক. বাসিষ্ক হুবিষ্ক		মহামাত্র গ্রামিক
তৃতীয় শতাব্দী		বর্মন বংশ সিংহবর্মন চন্দ্রবর্মন	রাজতন্ত্র
৩৩৫–৩৮০	গুপ্তবংশ সমুদ্রগুপ্ত	উপরিক মহারাজা	বিষয়পতি
৩৭৬–৪১৪	২য় চন্দ্রগুপ্ত		লৌহস্তম্ভ খ্যাত চন্দ্রবর্মন ??
৪১৫–৪৫৫	১ম কুমার গুপ্ত (মহেন্দ্রাদিত্য)	উপরিক মহারাজা	বিষয়পতি
৪৫৫–৪৬৭	স্কন্দগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য)		
৪৬৮–৪৭৩	পুরুগুপ্ত		
৪৭৪	২য় কুমারগুপ্ত		
৪৭৭–৪৯৫	বুধগুপ্ত বৈন্যগুপ্ত		
৪৯৫–৫০৫	নরসিংহ গুপ্ত		
৫৩০–৫০০	মান্দাসোরের যশোধর্মন		বিষয়পতি

কালপঞ্জী	কেন্দ্রশাসন	প্রদেশ	জেলা
			(রাজতন্ত্র)
৫২৫–৫২৭			গোপচন্দ্র
৫২৭–৫৩০			ধর্মাদিত্য
৫৩১–৫৪৪			সমাচার দেব, পৃথুজবীর
৫৪৪–৫৭৫			শ্রী সুধন্যাদিত্য
৫৭৬–৬০৬			রত বংশ—শ্রীজীবধরণ রত
			শ্রীশ্রীধরন রত
			খড়্গা বংশ—খড়্গোদ্গম
			জাত খড়্গা
			দেব খড়্গা
			রাজরাজ ভট্ট
	কনৌজ—পুষ্যভূতিবংশ		
৬০৬–৬৩৭	হর্ষবর্ধন		কর্ণসুবর্ণ এর
			শশাঙ্ক
			মানব
			জয়নাগ
৬৩৭–৭৩৬		মাৎসন্যায়	মাৎস্যন্যায়
৭৩৬–৭৪৯	কনৌজের যশোধর্মন ললিতাদিত্য (কাশ্মীর)		
		গৌড়	
		পালবংশ	কুমার
৭৫০–৭৭০		গোপাল	রাজন্যক
৭৭০–৮১২	বৎসরাজ—নাগভট্ট	ধর্মপাল	মহাসামন্ত
৮১২–৮৫০		দেবপাল	
৮৫১–৮৫৪		বিগ্রহপাল	জ্যেষ্ঠ কায়স্থ
৮৫৪–৯০৮		নারায়ণ পাল	
৯০৮–৯৪০		রাজ্যপাল	
৯৭৭–১০২৭		প্রথম মহীপাল	রনশূর

খ্রীষ্টাব্দ	কেন্দ্রশাসন	প্রদেশ (গৌড়)	জেলা
১০২১–১০২৩		চোল বংশীয় রাজেন্দ্র চোলদেবের আক্রমণ	রাজেন্দ্র চোলদেব
১০৭০–১০৪৩		নয়াপাল	
১০৭০–১০৭১		২য় মহীপাল	
১০৭১		কৈবর্ত্যরাজ দিব্বক	
১০৭২–১১১২		রামপাল	১. ঢেক্কড়ি বা বর্ধমানে রাজা প্রতাপসিংহ ২. বীরগুণ ভাল্‌কী কোটা ?? ৩. ভাস্কর—উচালন ?? ৪. চন্দ্রার্জুন—সামকাট বা সাকোট—(রায়না) ??
		সেন বংশ	
১০৯৫–১১৫৮		বিজয়সেন	মহাসামন্ত }
১১৫৮–১১৭৯		বল্লালসেন	সামন্ত }
১১৭৯–১২৩৭		লক্ষ্মণসেন	জ্যেষ্ঠ কায়স্থ }

মধ্যযুগ

কুলপঞ্জী	সুলতানগণ	
১. ১২০৪ আ.–১২০৬	ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী	
২. ১২০৬–১২০৮ আ :	ইজ্জুদীন মুহম্মদ্‌ শিরান খিলজী	
৩. ১২১০–১২১৩ আ :	আলিমর্দ্দান বা আলাউদ্দিন	
৪. ১২১৩–১২২৭	গিয়াসুদ্দিন ইয়াজ শাহ	
৫. ১২২৭–১২২৯	নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ (ইলতুৎমিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র)	
৬. ১২২৯–১২৩১	ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন দৌলৎ শাহ-ই-বলকা	
৭. ১২৩১–১২৩৩	আলাউদ্দিন জানী	
৮. ১২৩৩–১২৩৬	সৈফুদ্দীন আইবক যুগানতৎ	সপ্তগ্রামের
৯. ১২৩৬–১২৩৭	আওর খান	শাসনকর্তা ভূদেব
১০. ১২৩৭–১২৪৫	ইজ্জুদ্দীন তুগরল তুগান খান	
১১. ১২৪৫–১২৪৭	কমরুদ্দীন তমুর খান }	
১২. ১২৪৭–১২৫১	জলালুদ্দীন মাসূদ জানী }	
১৩. ১২৫১–১২৫৭	ইখতিয়ারুদ্দিন যুজবক তুগরল খান বা মুগীসুদ্দীন } যুজবক শাহ	

কুলপঞ্জী	সুলতানগণ
১৪. ১২৫৮	জলালুদ্দীন মাসুদ জানী (২য় বার)
১৫. ১২৫৯–১২৬০	ইজ্জুদ্দীন বলবন য়ুজবকী
১৬. ...–১২৬৫	তাজুদ্দীন আর্সলান খান
১৭. ১২৬৫?	তাতার খান (আর্সলান খানের পুত্র)
১৮. ...?–১২৬৯	শের খান
১৯. ১২৬৯–১২৭৮	আমিন খান
২০. ১২৭৮–১২৮২	তুগরল বা মুগীসউদ্দীন

বলবনী বংশ

১. ১২৮২–১২৯১	বুগরা খান বা নাসিরুদ্দিন মাহ্মুদ শাহ্ (গিয়াসুদ্দিন বলবনের পুত্র)
২. ১২৯১–১৩০১	রুকনুদ্দীন কাইকাউস

ফিরোজশাহী বংশের সুলতান

১. ১৩০১–১৩২১	শ্যামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ
২. ১৩০৭ বা ১৩০৯	জালালুদ্দীন মহম্মদ শাহ (ফিরোজ শাহের পুত্র)
৩. ১৩১৭–১৩১৮	শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ (ফিরোজশাহের পুত্র)
৪. ১৩১০–১৩২২ ১৩২২–১৩২৩ ১৩২৫–১৩২৮	গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ (ফিরোজ শাহের পুত্র)
৫. ১৩২৪–১৩২৭	নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ (ফিরোজ শাহের পুত্র)

মুহম্মদ তোগলকের অধীনস্থ শাসকগণ

১. ১৩২৭–৩৮	তাতার খান বা বহ্রাম খান (সোনার গাঁ)	বর্ধমান শাসিত হতো সপ্তগ্রাম থেকে
২. ১৩২৫–১৩৩৮	কদর খান (লখনৌতি)	
৩. ১৩২৫ ?	ইজ্জুদ্দীন য়াহিয়া (সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা)	

মবারক শাহীবংশ

১. ১৩৩৮–১৩৪৯	ফগরুদ্দীন মুবারক শাহ্
২. ১৩৪৯–১৩৫২	ইখতিয়ারুদ্দীন গাজীশাহ্ (সোনার গাঁও এর সুলতান) (মুবারকের পুত্র)
৩. ১৩৪১–১৩৪২	আলাউদ্দীন আলী শাহ (লখনৌতির সুলতান)

ইলিয়াস শাহীবংশ

১. ১৩৪২–১৩৫৮ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
২. ১৩৫৮–১৩৯০ সিকান্দর শাহ (ইলিয়াসের পুত্র)
৩. ১৩৯০–১৪১০ গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (সিকান্দরের পুত্র)
৪. ১৪১০–১৪১২ সৈফুদ্দীন হঁমজা শাহ (আজম্-এর পুত্র)

বায়াজিদ শাহীবংশ

১. ১৪১২–১৪১৪ শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ্ শাহ
২. ১৪১৪ আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ (বায়াজিদ শাহের পুত্র)

রাজা গণেশ ও তাঁর বংশের সুলতান

১. ১৪১৫, ১৪১৭–১৪১৮ রাজা গণেশ বা দনুজমর্দন দেব
২. ১৪১৫–১৪১৬, ১৪১৮–১৪৩৩ জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ (গণেশের পুত্র)
৩. ১৪১৮ মহেন্দ্র দেব (রাজা গণেশের পুত্র)
৪. ১৪৩৩-১৪৩৬ শামসুদ্দিন আহমদ শাহ (মুহম্মদ শাহের পুত্র)

মাহ্মুদ শাহীবংশ

১. ১৪৩৬–১৪৫৯ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ্
২. ১৪৫৫–১৪৭৬ রুকনুদ্দীন বারবক শাহ
১৪৫৫–৫৬ পিতার সঙ্গে ও
১৪৭৪–৭৬ পুত্র শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের সঙ্গে একত্রে।
৩. ১৪৭৪–১৪৮০ শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ (বারবকের পুত্র)
৪. ১৪৮১–১৪৮৭ জলালুদ্দিন ফতেহ্ শাহ (মাহ্মুদ শাহের পুত্র)

সুলতান শাহজাদা ও হাবসী সুলতান

১. ১৪৮৭ বারবক বা সুলতান শাহজাদা
২. ১৪৮৭–৯০ সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ্ (হাবসী)
৩. ১৪৯০–৯১ দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (হাবসী) (ফিরোজের পুত্র)
৪. ১৪৯১–১৪৯৩ শামসুদ্দীন মুজাফ্ফ্র শাহ (হাবসী)

হোসেন শাহীবংশ

১. ১৪৯৩–১৫১৯ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
২. ১৫১৯–১৫৩২ নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ (হোসেনের পুত্র)

৩. ১৫৩২–১৫৩৩	দ্বিতীয় আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ (নসরৎ শাহের পুত্র)
৪. ১৫০৩–৩৮	গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ (হোসেনের পুত্র)

হুমায়ুন ও শেরশাহ-এর অধীনস্থ শাসক

১. ১৫৩৮–১৫৩৯	হুমায়ুন
২. ১৫৩৯	জাহাঙ্গীর কুলী বেগ (হুমায়ুনের অধীনস্থ)
৩. ১৫৩৯–৪০	শের শাহ
৪. ১৫৪০–১৫৪১	খিজর খান (শের শাহের অধীনস্থ)
৫. ১৫৪১–?	কাজী ফজীলৎ („)
৬. ... ১৫৫৩	মুহম্মদ খান („)

খ্রীস্টাব্দ	দিল্লীর সম্রাট	বাংলার মুহম্মদশাহী বংশ
১৫৪৫–১৫৫৪	ইসলাম শাহ	শামসুদ্দীন
১৫৫৪	ফিরোজ শাহ	মুহম্মদ শাহ গাজী
১৫৫৫	হুমায়ুন	(১৫৫৩-৫৫)
১৫৫৬	পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ	
১৫৫৬	জালালউদ্দিন আকবর	শাহবাজ খান (আদিলের অধীনস্থ)
১৫৫৬–৬০		গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ (মুহম্মদ শাহ গাজীর পুত্র)
১৫৬০–৬৩		দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন (মুহম্মদ শাহের পুত্র)
১৫৬৩–৬৪		তৃতীয় গিয়াসুদ্দিন

করনানী বংশ

১৫৬৪–১৫৬৫	তাজখান করনানী
১৫৬৫–৭২	সুলেমান করনানী (তাজ খানের ভ্রাতা)
১৫৭৩–৭৬	দাউদ করনানী (সুলেমানের পুত্র)

মুসলিম রাজত্বের প্রথম দিকে বর্ধমান ভুক্তি সাতগাঁ ইক্তা থেকে শাসিত হতো ও মোগল শাসনের পূর্বে হোসান শাহী রাজত্বকালে ইক্তার নাম হয় মুলুক। তখন সাঁতগাঁ মুলুক থেকে মুলুকপতি দ্বারা শাসিত হতো।

কালপঞ্জী	সম্রাট	কালপঞ্জী	বাংলার সুবাদার	কালপঞ্জী	বর্ধমানের উল্লেখযোগ্য ঘটনা
১৫৫৬—১৬০৫	আকবর			১৫৭৪	বর্ধমানের যুদ্ধে দাউদের পরাজয়
				১৫৭৫	তুকারই এর যুদ্ধ
		১. ১৫৭৫	খান-ই-খানান	১৫৭৬	দাউদ খানের মৃত্যু
		(কয়েক মাস)	মুনিম খান		
		২. ১৫৭৫—৭৮	হোসেন কুলী বেগ	১৫৭৬	পাঠানদের সঙ্গে বর্ধমান
			(খান-ই-জাহান)		ও মঙ্গলকোটের যুদ্ধ
		৩. ১৫৭৮—৭৯	ইসমাইল কুলী		
			(অস্থায়ী)	১৫৭৪—	সুবাদারের শাসন
		৪. ১৫৭৯—৮০	মুজাফর খান	১৬০৫	
			তুরবতী		
		১৫৮০—১৫৮৩	(বাংলাদেশ আকবরের ভ্রাতা মীর্জা হাকিমের সমর্থক বিদ্রোহী সেনাধ্যক্ষদের অধিকারে ছিল।)		
		৫. ১৫৮৩	খান-ই-আজম মীর্জা আজিজ কোকাহ্		
		৬. ১৫৮৩	ওয়াজীর খান (অস্থায়ী)		
		৭. ১৫৮৩—১৫৮৫	শাহবাজ খান		
		৮. ১৫৮৫—১৫৮৬	সাদিক খান		
		৯. ১৫৮৬	শাহবাজ খান (দ্বিতীয়বার)		
		১০. ১৫৮৬—১৫৮৭	ওয়াজীর খান		
		১১. ১৫৮৭—১৫৯৪	সৈয়দ খান		
১৬০৫—১৬২৭	জাহাঙ্গীর	১২. ১৫৯৫—১৬০৬	মানসিংহ	১৬০৬	শের আফগান (জায়গীরদার)
		১৩. ১৬০৬—১৬০৭	কুৎবুদ্দীন খান কোকাহ্	১৬০৭	শের আফগানের মৃত্যু
		১৪. ১৬০৭—৮	জাহাঙ্গীর কুলী বেগ		
		১৫. ১৬০৮—১৬১৩	ইসলাম খান চিস্তী		
		১৬. ১৬১৩—১৪	সেখ হোসাঙ্গ (অস্থায়ী)		

কালপঞ্জী	মোগল সম্রাট	কালপঞ্জী	বাংলার সুবাদার	খ্রীষ্টাব্দ	বর্ধমান জায়গীর
		১৬১৪—১৭	১৭. কাশিম খান চিস্তী	১৬২৪	শাহজাহানের বিদ্রোহ বর্ধমান অধিকার
		১৬১৭—২৪	১৮. ফতেহ্-ই-জঙ্গ ইব্রাহিম খান		
		১৬২৪—২৫	১৯. দাবার খান (শাহজাহানের অধীনস্থ)	১৬২৪-২৫ ১৬২৫-	জায়গীরদার মীর্জা শালে বৈরাম খাঁ
		১৬২৫—২৬	২০. মহাবৎ খান		
১৬২৭—৫৯	শাহজাহান	১৬২৬—২৭	২১. মুকারম খান চিস্তী		
		১৬২৭—২৮	২২. ফিদাই খান বা মীর্জা হেদায়েৎ উল্লাহ্		
		১৬২৮—৩২	২৩. কাশিম খান জুয়িনী		
		১৬৩২—৩৫	২৪. অজম খান মীর মুহম্মদ বাকর		
		১৬৩৫—৩৯	২৫. ইসলাম খান মাশাদী		
		১৬৩৯	২৬. সৈফ খান (অস্থায়ী)		
		১৬৩৯—১৬৬০	২৭. শাহজাদা মুহম্মদ শুজা	১৬৫৭	রাজবংশের পত্তন আবু রায়-নগর কোতোয়াল ও চৌধুরী

কালপঞ্জী	মোগল সম্রাট	কালপঞ্জী	বাংলার সুবাদার	খ্রীষ্টাব্দ	বর্ধমান জায়গীর
১৬৫৮—১৭০৭	ঔরংজেব	১৬৬০—৬৩	২৮. মীর জুমলা বা খান-ই-খানান মুআজুম খান	১৬শ দশক	বাবু রায়
		১৬৬৩	২৯. দিলীর খান (অস্থায়ী)	ঐ	ঘনশ্যাম রায়
		১৬৬৩—৬৪	৩০. দাউদ খান (অস্থায়ী)		
		১৬৬৪—৭৮	৩১. শায়েস্তা খান	১৬৭৫—৯৬	কৃষ্ণরাম বায়
১৬৬৬	শাহজাহানের মৃত্যু				
		১৬৭৮	৩২. ফিদাই খান বা আজম খান কোকাহ্		
		১৬৭৮—৭৯	৩৩. শাহজাদা মুহম্মদ আজম		
		১৬৭৯—৮৮	৩৪. শায়েস্তা খান (দ্বিতীয় বার)		
		১৬৮৮—৮৯	৩৫. খান-ই-জহান বাহাদুর		
		১৬৮৯—৯৭	৩৬. ইব্রাহিম খান		
১৭০৭	আওরঙ্গজেবের মৃত্যু				
		১৬৯৭—১৭১২	৩৭. শাহজাদা আজিম-উস-শান	১৬৯৯—১৭০২	জগৎরাম রায়
১৭০৭	মোয়াজ্জেম বা প্রথম বাহাদুর শাহ (প্রথম শাহ আলম)			১৭০২—১৭৪০	কীতিচাঁদ রায়

খ্রীষ্টাব্দ	দিল্লীর সম্রাট	খ্রীষ্টাব্দ	বাংলার সুবাদার	খ্রীষ্টাব্দ	বর্ধমান রাজবংশ
১৭১২-১৩	জাহান্দার শাহ	১৭১৩	শাহাজাদা ফরখুণ্ডা সিয়র (শিশু)	১৭০২-১৭৪০	মহারাজা কীর্তিচাঁদ রায়
		১৭১৩-১৬	মীরজুমলা বা মুজাফ্ফরজঙ্গ		
১৭১৩-১৯	ফারুক-শিয়ার		(ফরকুণ্ড ও মীর জুমলা বাংলায় আসেন নাই। এদের শাসনকালে প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন।)		
		১৭১৩-১৬	মুর্শিদকুলী খান (সহকারী শাসনকর্তা)		
			আধুনিক যুগ : নবাবী আমল		
১৭১৯-৪৮	রোশন আখতার (মহম্মদ শাহ)	১৭১৭-১৭২৭	১. মুর্শিদকুলী খান	১৭২২	চাকলা বর্ধমানের সৃষ্টি; সমগ্র সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদের কিয়দংশ, সাতগাঁও-এর কয়েকটি পরগনা ও মান্দারণের অর্ধেক নিয়ে চাকলা বর্ধমান গঠিত।
		১৭২৭-৩৯	২. শুজাউদ্দীন মহম্মদ খান (মুর্শিদকুলী খানের জামাতা)		
		১৭৩৯-১৭৪০	সরফরাজ খান (শুজাউদ্দিনের পুত্র)		
		১৭৪০-৫৬	আলিবর্দী খান মহাবৎজঙ্গ	১৭৪০-৪৪	মহারাজা চিত্রসেন রায়
১৭৪৮-৫৪	আহম্মদ শাহ্			১৭৪২-	বর্গী হাঙ্গামা
		১৭৫৬-১৭৫৭	সিরাজ উদ্-দৌল্লাহ্ (আলিবর্দীর দৌহিত্র)	১৭৪৩	বর্গীদের সঙ্গে কাটোয়ার যুদ্ধ
১৭৫৪-৫৯	আজিল উদ্দিন (দ্বিতীয় আলমগীর)			১৭৪৪	মানকরায় মারাঠা নেতা ভাস্কর রামের নিধন

খ্রীষ্টাব্দ	দিল্লীর সম্রাট	খ্রীষ্টাব্দ	বাংলার সুবাদার	খ্রীষ্টাব্দ	বর্ধমান রাজবংশ
		১৭৫৭-র	পলাশীর যুদ্ধ ও	১৭৪৪-১৭৭০	মহারাজ ত্রিলোকচাঁদ রায়
		২৩শে জুন	সিরাজ-উদ-দৌল্লাহ-কে হত্যা	১৭৬০	সঙ্গত গোলার যুদ্ধে মেজর
১৭৫৯-১৮০৬	দ্বিতীয় শাহ আলম্	১৭৫৭-১৭৬০	মীরজাফর	২৯শে ডিসেম্বর	হোয়াইটের নিকট
		১৭৬০-৬৩	মীরকাশিম		ত্রিলোকচাঁদের পরাজয়।
			(মীরজাফরের জামাতা)		
		১৭৬৪	বক্সারের যুদ্ধ ও		
			মীরকাশিমের পরাজয়		
		১৭৬৪-৬৫	মীরজাফর (২য় বার)		
			ব্রিটিশ শক্তির প্রসার		
		১৭৫৬-১৭৬০	রবার্ট ক্লাইভ		
		১৭৬৫	কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ		
			ইংরাজদের অধিকার		
			আইনতঃ স্বীকৃত		
		১৭৬০-৬৪	ভ্যান্সিটার্ট		
		১৭৬৪-৬৭	লর্ড ক্লাইভ (২য় বার)		
		১৭৬৭-৬৯	ভেরেলেষ্ট		
		১৭৬৯-৭২	কার্টিয়ার	১৭৭০-১৮৩২	মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র রায়
		১৭৭০	ছিয়াত্তরের মন্বন্তর		
		১৭৭২-৭৪	ওয়ারেন হেস্টিংস		

খ্রীষ্টাব্দ	দিল্লীর সম্রাট	খ্রীষ্টাব্দ	ইংরাজ শাসন	খ্রীষ্টাব্দ	বর্ধমান রাজবংশ
	বাংলার গভর্নর জেনারেলগণ (১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুসারে)				
		১৭৭৪-৮৫	ওয়ারেন হেস্টিংস		
		১৭৮৫-৮৬	স্যার জন ম্যাকফারসন		
		১৭৮৬-৯৩	লর্ড কর্ণওয়ালিশ		প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চাকলার আয়তন কমিয়ে বর্ধমান জেলার পত্তন
		১৭৯৩	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন		
		১৭৯৩-৯৮	স্যার জন শোর	১৭৯৫	চাকলা বর্ধমানের ভাগ
		১৭৯৮-১৮০৫	লর্ড ওয়েলেসলী	১৭৯৯	জমিদারীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ায় মহারাজ তেজচন্দ্র একতরফাভাবে পত্তনী প্রথা প্রবর্তন করেন।
১৮০৬-১৮৩৭	২য় আকবর শাহ্	১৮০৫	লর্ড কর্ণওয়ালিস (২য় বার)		
		১৮০৫-০৭	স্যার জন বার্লো		
		১৮০৭-১৮১৩	আর্ল অব্ মিন্টো (১ম)		
		১৮১৩-১৮২৩	মারকুইস্ অব্ হেস্টিংস		
		১৮২৩-২৮	লর্ড আমহার্স্ট		
		১৮২৬-৩৩	লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক	১৮৩২-৭৯	মহারাজাধিরাজ মহাতাপ চন্দ্র বাহাদুর
১৮৩৭-১৮৫৭	২য় বাহাদুর শাহ (শেষ মোগল সম্রাট)				

খ্রীষ্টাব্দ	দিল্লীর গভর্নর জেনারেল	খ্রীষ্টাব্দ	বাংলার গভর্নর	খ্রীষ্টাব্দ	বর্ধমান রাজবংশ
	ভারতের গভর্নর জেনারেলগণ (১৮৩৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট অনুযায়ী)				
১৮৩৩-৩৫	লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক				
১৮৩৫-৩৬	স্যার চার্লস (লর্ড) মেটকাফ				
১৮৩৬-৪২	লর্ড অকল্যান্ড			১৮৩৭	বর্ধমান চাকলা ভেঙে বাঁকুড়া জেলার সৃষ্টি।
১৮৪২-৪৪	লর্ড এলেনবরা				
১৮৪৪-৪৮	লর্ড হার্ডিঞ্জ				
১৮৪৮-৫৬	লর্ড ডালহাউসী				
১৮৫৬-৫৮	লর্ড ক্যানিং				
১৮৫৭-	সিপাহী বিদ্রোহ				
১৮৫৮	মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র অনুসারে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং।				
	গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়		বাংলাদেশের প্রথম ১৩ জন ছোটলাট বা গভর্নর		
১৮৫৮-৬২	লর্ড ক্যানিং	১৮৫৪-৫৯	স্যার জন ফ্রেডারিক হ্যালিডে		
		১৮৫৯-৬২	স্যার জন পিটার গ্র্যান্ট		
১৮৬৩	স্যার রবার্ট নেপিয়ার				
		১৮৬২-৬৭	স্যার সিসিল বিডন		
১৮৬৩-৬৪	স্যার ডেনিসন				

খ্রীষ্টাব্দ	দিল্লীর গভঃ জেনারেল	খ্রীষ্টাব্দ	বাংলার গভর্নর	খ্রীষ্টাব্দ	বর্ধমান রাজবংশ
১৮৬৪-৬৯	স্যার জন লরেন্স	১৮৬৭-৭১	স্যার উইলিয়াম গ্রে		
১৮৬৯-৭২	আর্ল অব্ মেয়ো	১৮৭১-৭৪	স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল		
১৮৭২	স্যার জন স্ট্রাচী				
১৮৭২	লর্ড নেপিয়ার				
১৮৭২-৭৬	লর্ড নর্থ ব্রুক	১৮৭৪-৭৭	স্যার রিচার্ড ক্যাম্পবেল		
১৮৭৬-৮০	লর্ড লিটন	১৮৭৭-১৮৮২	স্যার অ্যাসলি ইডেন	১৮৭৯-৮৫	মহারাজাধিরাজ আফতাব চাঁদ মহ্তাপ (দত্তক পুত্র গ্রহণ)
১৮৮০-৮৪	লর্ড রিপন	১৮৮২.১৮৮৭	স্যার অগাস্টাস বিভার্স টম্পসন	১৮৮৫-৮৭	কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস জয়েন্ট ম্যানেজার—বনবিহারী কাপুর ও টি.ভি. বর্গ মিলার; পরে মিলারের মৃত্যুর পর এইচ আর রেইলি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। পরে রেইলি ওড়িশায় বদলী হওয়ায় বনবিহারীর একক দায়িত্ব
১৮৮৪-৮৮	লর্ড ডাফরিন	১৮৮৭-৯০	স্যার স্টুয়ার্ট কলভিন বেলী ইনি ১৮৭৯ সনের ১৫ই জুলাই থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্থায়ী ছোটলাট ছিলেন	১৮৮৭-১৯৪১	মহারাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্তাব
১৮৮৮-৯৪	লর্ড ল্যান্সডাউন	১৮৯০-৯৫	স্যার চার্লস আলফ্রেড		
১৮৯৪-৯৯	লর্ড (দ্বিতীয়) এলগিন	১৮৯৫-৯৮	স্যার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি		
		১৮৯৮-১৯০২	স্যার জন উড বার্ন		
১৮৯৯-১৯০৫	লর্ড কার্জন	১৯০৩-১৯০৫	স্যার এ্যান্ড্রু হেন্ডারসন লিথ ফ্রেজার	১৯০৩ ১লা জানুয়ারী	বিজয়চাঁদ মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত

	দিল্লি		পশ্চিমবাংলা		বর্ধমান
১৯০৫ খৃ	লর্ড কার্জন বাংলার গভর্নর স্যার এ্যান্ড্রু ফ্রেজারের বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে বঙ্গভঙ্গ করেন।	১৯০৫	বোর্ডিলিয়ন	১০ ফেব্রুয়ারী	লেফটেন্যান্ট গভর্নর বোর্ডিলিয়ন-এর উপস্থিতিতে বিজয়চাঁদের রাজ্যাভিষেক।
				১৯০৪	লর্ড কার্জনের বর্ধমানে আগমন; শহরের প্রবেশ পথে স্টার অব্ ইণ্ডিয়া নামে সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ। নাম হয় পরে কার্জন গেট
১৯০৫-১৯১০	লর্ড (২য়) মিন্টো	১৯০৬—১০	রোনালড্সে (লর্ড জেটল্যান্ড)		
১৯১০-১৬	লর্ড হার্ডিঞ্জ				
১৯১৬-২১	লর্ড চেমস ফোর্ড				
১৯২১-২৬	লর্ড রীডিং				
১৯২৬-৩১	লর্ড আরউইন	১৯৩৩	জ্যাকসন		
১৯৩১-১৯৩৬	লর্ড উইলিনডন				
১৯৩৬—৪৩	লর্ড লিনলিথগো	১৯৩৭—৩৯	লর্ড ব্যাবোর্ণ	১৯৪১—৫৫	মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাপ
১৯৪৩—৪৭	লর্ড ওয়াভেল	১৯৪৪—৪৬	স্যার জন কেসী		
১৯৪৭	লর্ড মাউন্টব্যাটেন	১৫.৮.৪৭—	জন বারোজ		
		২০.৬.৪৮	চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী		

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ ভারতের স্বাধীনতা লাভ

	কার্যকালের মেয়াদ	
১.	১৯৪৭-৪৮	লর্ড মাউন্টব্যাটেন (স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল)
২.	১৯৪৮-৫০	চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী

১৯৪০ সালের ২৬শে জানুয়ারী নূতন সংবিধান গৃহীত ও ভারত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত।

	কার্যকালের মেয়াদ	ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিগণ
১.	২৬.১.৫০—১৩.৫.৬২	ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
২.	১৩.৫.৬২—১৩.৫.৬৭	ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
৩.	১৩.৫.৬৭—৩.৫.৬৭	ডঃ জাকির হোসেন
৪.	৩.৫.৬৯—২০.৭.৬৯	বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি
৫.	২০.৭.৬৯—২৪.৮.৬৯	বিচারপতি মহম্মদ হিদায়েতুল্লা (অস্থায়ী)
৬.	২৪.৮.৬৯—২৪.৮.৭৫	বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি
৭.	২৮.৪.৭৪—১১.২.৭৭ (মৃত্যু)	ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ
৮.	১১.২.৭৭—২৫.৭.৭৭	বি. ডি. জাত্তি (অস্থায়ী)
৯.	২৫.৭.৭৭—২৫.৭.৮২	নীলম সঞ্জীব রেড্ডি
১০.	২৫.৭.৮২—২৫.৭.৮৭	গিয়ানী জৈল সিং
১১.	২৫.৭.৮৭—২৫.৯.৯২	রামস্বামী ভেঙ্কটরামন
১২.	২৫.৯.৯২—২৫.৭.৯৭	ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা
১৩.	২৭.৭.৯৭—	কে. আর. নারায়ণন

কার্যকালের মেয়াদ	পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালগণ
১৯৪৭-৪৮	চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী
১৯৪৭	বি. এল. মিশ্র (অস্থায়ী)
১৯৪৮-৫১	কৈলাসনাথ কাটজু
১৯৫১-৫৬	ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী
১৯৫৬	এস. লাহিড়ী (অস্থায়ী)
১৯৫৬-৬৭	পদ্মজা নাইডু
১৯৬৭-৬৯	ধর্মভীরা
১৯৬৯	দীনেন্দ্র নারায়ণ সিংহ (অস্থায়ী)
১৯৬৯-৭১	শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান
১৯৭১-৭৭	এ. এল. ডায়াস
১৯৭৭-৮১	ত্রিভুবন নারায়ণ সিংহ
১৯৮১-৮৩	ভৈরব দত্ত পাণ্ডে
১৯৮৩-৮৪	অনন্ত প্রসাদ. শর্মা
১৯৮৪-৮৬	উমাশঙ্কর দীক্ষিত
১৯৮৬-৮৯	সৈয়দ নুরুল হাসান
১৯৮৯	টি. ভি. রাজেশ্বর রাও
১৯৯০-৯৩	সৈয়দ নুরুল হাসান
১৯৯৩-৯৮	কে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডি
১৯৯৮-৯৯	এ. আর. কিদোয়াই
১৯৯৯	শ্যামল সেন (অস্থায়ী)
১৯৯৯-	বীরেন জে. শাহ

বর্ধমান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গণ

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান চাকলা ভেঙে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বর্ধমান জেলা গঠিত হয়। প্রথম থেকে অদ্যতক জেলা শাসকদের নাম সংগ্রহ করতে পারি নাই।

জেলা শাসক স্বামী সিং আই.এ.এস মহাশয়ের কাছে আবেদন করায় তিনি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জেলা শাসকদের নামগুলি সরবরাহ করেছেন। এর জন্যে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই। (পত্র সংখ্যা ৬৫৬/ সি. তাং-২৩.৪.২০০০)

যে সমস্ত জেলা শাসকদের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি তাঁদের তালিকা প্রদত্ত হলো।

১৭৯৩	সাময়েল ডেভিস্ (প্রথম জেলা শাসক)
১৮২১	জেঃ আর. হাচিনসন
১৮৩৫	জেমস বেলফোর ওগলবি
১৮৬৫	এস এস হগ
	(এ বছর বর্ধমান পৌরসভা প্রথম গঠিত হয়)
১৮৮৭ ?	রমেশচন্দ্র দত্ত, আই.সি.এস., বার এট ল
১৯২৫	মিঃ স্টুয়ার্ট
১৯২৬ ফেব্রুয়ারী	সি সি ভি আর সেলস আই.সি.এস.

স্বাধীনোত্তর বর্ধমানের জেলাশাসকদের নাম ও কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ

নাম	তারিখ
১. সর্বশ্রী কুমার অধিক্রম মজুমদার	১৭.৮.১৯৪৭
২. বি.এল. ঘোষ	২.৬.১৯৪৮
৩. বসন্ত কুমার ব্যানার্জী	১৮.৬.১৯৪৮
৪. কুমার অধিক্রম মজুমদার (২য় বার)	২৬.৪.১৯৫০
৫. আই. বি. এস. আর সুরিটা (এম.সি.আই.এ.এস)	২৭.৯.৫০
৬. শম্ভুনাথ ব্যানার্জী আই.এ.এস	১৯.৫.৫২
৭. অশোক মিত্র (আই.সি.এস)	২৭.১২.৫৪
৮. অমিয়কুমার সেন (আই.এ.এস)	২.৮.৫৫
৯. ডঃ এ. বি. রুদ্র (আই.এ.এস)	৫.৬.৫৭
১০. শ্রী সুহাষ রঞ্জন দাস (আই.এ.এস)	১২.৬.৫৮
১১. শ্রী এ. কে. দত্ত (আই.এ.এস)	২০.৩.৬১
১২. শ্রী কে. পি. এ. মেনন (আই.এ.এস)	৬.৪.১৯৬২
১৩. শ্রী বি. কে. ব্যানার্জী (আই.এ.এস)	২৩.৪.৬৫
১৪. শ্রী জে. কে. কোহলী (আই.এ.এস)	১৯.৬.৬৭
১৫. শ্রী জি. এস. ব্যানার্জী (আই.এ.এস)	২৬.৭.৬৮

১৬. শ্রী তরুণ চন্দ্র দত্ত (আই.এ.এস)	২৯.৮.৬৯
১৭. শ্রী এস. ব্যানার্জী (আই.এ.এস)	৪.৫.৭০
১৮. শ্রী অশোককুমার চ্যাটার্জী (আই.এ.এস)	৮.১০.৭১
১৯. শ্রী মিহির কুমার মৈত্র (আই.এ.এস)	৩০.৯.৭৪
২০. শ্রী প্রদীপ কুমার ব্যানার্জী (আই.এ.এস)	৪.৫.৭৬
২১. শ্রী জে.ভি.আর প্রসাদ রাও (আই.এ.এস)	১.৯.৭৭
২২. শ্রী টি.কে. দাস (আই.এ.এস)	২৫.৩.৮০
২৩. শ্রী ভি. সুব্রামানিয়ান (আই.এ.এস)	১৪.৯.৮১
২৪. শ্রী এস. এস. আহুজা (আই.এ.এস)	২৩.৯.৮৩
২৫. শ্রী জহর সরকার (আই.এ.এস)	১৭.৭.৮৫
২৬. শ্রী আর বন্দ্যোপাধ্যায় (আই.এ.এস)	২.১২.৮৬
২৭. শ্রী অসীম কুমার বর্মন (আই.এ.এস)	২৩.৬.৮৯
২৮. শ্রী মদনলাল মীনা (আই.এ.এস)	৩.৬.৯৪
২৯. শ্রী দেবাশিস সেন (আই.এ.এস)	৯.৯.৯৬
৩০. শ্রী স্বামী সিং (আই.এ.এস)	১০.১২.৯৯

পরিশিষ্ট – ২

গ্রন্থপঞ্জী

যে কোন তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থাদির প্রামাণিকতার স্বপক্ষে তথ্যাদির জন্য যে সমস্ত লিখিত ও অলিখিত উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয় তাদের একটা সুদীর্ঘ তালিকা গ্রন্থের সঙ্গে সংযোজিত করার রীতি সুপ্রচলিত। আমার এই বইটির অধিকাংশ উপাদান বহু ইংরাজী ও বাংলা পুস্তক, ইংরাজী ও বাংলা পত্র-পত্রিকা, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্ট ছাড়াও অনেক অমুদ্রিত আকর থেকেও সংগ্রহ করতে হয়েছে। তথ্যের জন্য এবং ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ-কার্যে যখন যেখানে মুদ্রিত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুস্তকের যথাস্থানে তা উল্লেখ করেছি। এমন অনেক গ্রন্থ বা পত্রিকা আছে যেগুলি থেকে সরাসরি কোন উদ্ধৃতি নেই বলে সেগুলির উল্লেখ করি নাই। সেই সব গ্রন্থের গ্রন্থকার, পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদকদের কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছি যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের বহুল তথ্য সমৃদ্ধ তিন খণ্ড "বর্ধমান—ইতিহাস ও সংস্কৃতি" নামক গ্রন্থ, Burdwan Gazetteer 1910, Bardhaman Gazetteer 1994, Census Hand Book 1951, Census Hand Book 1991 Bardhaman Part XII A, XIIB, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা বর্ধমান সংখ্যা ১৪০৩, Hunter's Annals of Rural Bengal, Hunter's Statistical Account of Burdwan Distict. History of Bengal Vol.II—Jadunath Sarkar, History and Culture of Bengal—Dr. A. K. Sur, প্রাচীন ভারতবর্ষ পত্রিকা, সবুজ পত্র এবং ১৯৬৩ সাল থেকে অদ্যতক আমার নিজস্ব সংগ্রহের সাপ্তাহিক, পাক্ষিক দেশ পত্রিকা, সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকা ও ঐ সময়ে প্রকাশিত দেশ সাহিত্য ও বিনোদন সংখ্যা, দেশ শারদীয়া, আনন্দবাজার বার্ষিক সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা থেকে। এই সমস্ত গ্রন্থের গ্রন্থকার ও পত্রিকার প্রতিবেদকদের নিকট ঋণ স্বীকার করছি ও জানাচ্ছি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। প্রথম জীবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ এবং ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগে দীর্ঘ দিন কর্মসূত্রে জেলার প্রায় প্রতিটি মহকুমার বহু গ্রামে যেতে হয়েছে বা ২/১ বছর ক্যাম্প অফিসে থাকতেও হয়েছে। সে সময় গ্রামীণ লোকজনদের আচার আচরণ, ব্রত-পার্বণ, পূজাপদ্ধতি, গ্রামে প্রচলিত প্রবাদ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। এগুলি আমার রচনায় বিশেষ কাজে লেগেছে। আমার কাছে এইগুলিই গ্রামের জীবন্ত ইতিহাস বলে মনে হয়েছে। আমাদের সময়ে সেটেলমেন্ট বিভাগে কোন মৌজার তসদিক কার্য সম্পন্ন করার পর সেই মৌজা সম্পর্কে গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস, গ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক নিদর্শন, দেবদেবীর মন্দির সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়ার রীতি ছিল। এগুলিও আমার অনেক কাজে লেগেছে। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Ethnology ও Anthropology special paper সহ Ancient Indian History & Culture ও

Modern Indian History-তে M.A. পড়বার সময় বহু পুস্তক সংগ্রহ করতে হয়েছিল অনেক দুর্লভ পুস্তক থেকে note নিতে হয়েছিল। তার অনেকগুলি নিজস্ব সংগ্রহে আছে। সেগুলি থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি।

এছাড়াও যে সমস্ত গ্রন্থের ও পত্রপত্রিকার উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করতে হয়েছে তাদের একটা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ইংরাজী গ্রন্থ :

1. Cambridge History of India—vol. 1–vol. 2
2. Ancient India : R.C. Mazumder
3. The Vedic Age : Ed. R. C. Mazumdar, (Bharatiya Vidya Bhawan)
4. The Age of Imperial unity : Bharatiya Vidya Bhawan
5. The Classical Age. ...Do...
6. Early History of Ancient India : V. A. Smith.
7. Asoke : Bhandarkar
8. Political History of Ancient India : H. C. Roy Chowdhury
9. Age of Imperial Guptas : S. R. Goyal
10. The Caste in India : Hutton
11. Gupta Empire : P.L. Gupta
12. Excavations at Pandu Rajar Dhibi : P. Gupta
13. Archaeological Discovery at Banewar Danga : P. C. Das Gupta.
14. Final Report on Survery and Settlement : K. A. L Hill D.L.R.S.
15. The Statesman 22.4.90 & 1.5.94
16. Rennal's Map of Burdwan Dist.
17. Historioal Geography and Topography of Bengal and Bihar : Ms. Pandy.
18. The New Popular Encyclopaedia 1902
19. Ancient Irrigation System : Wild Cork
20. History and Culture of Bengal : Dr. A. K. Sur
21. Agricultural Economy of Bengal : Dr. P. K. Roy
22. The Antiquities of Kalna, Bengal Past and Present
23. Economic Hist. of Bengal : N.K. Singha
24. The Tribes and Castes of Bengal : H.H. Risely
25. Brick Temple of Bengal : Ed. G. Michell, Vol. 1
26. Late Mediaeval Temples of Bengal.
27. Ancient India as decribed by Megasthenes and Arrian
28. Historical Geography of Ancient India : B. C. Law.
29. Report of the Study group for coal.

30. National Commission on Labour 1968
31. Report on an enquiry into conditions of labour in the Coal Mining Industry : S. R. Despande—Director, Cost of Living Index Scheme Govt. of India 1945.
32. List of Ancient Monuments in Bengal 1896.
33. The Economic Development of India : Vera Austey.
34. The Telegraph 6.6.97
35. Bulletin of the Anthropological Survey of India Vol. XIX
36. German News 15.10.1988
37. The Statesman 1.6.99
38. Advanced History of India—Mazumdar & Dutta.
39. Govinda Samanta : Rev. Lal Beehari De.
40. Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report, Cal–1917
41. West Bengal Dist. Records New Series Burdwan, P. 11, 233, 238
42. Home Dept. Notification, No. 1644 Pl. Cal. Gazette Extra ordinary 8.4.1960.
43. Home Dept. General Administration Notification No. 946, G.A.C. 6.4.1968
44. Dist. Gazetteers Hooghly 1972
45. Damodar Valley Corporation Data Book, Cal. Jan 1961
46. The Forests of the Southern circle : Its Hist. and Management : in W.B. Forests : Centenary, Vol. 1964
47. Journal of Asiatic Society of Bengal XI. P-1
48. Labour in W.B 1972. Govt. of W. B.
49. The Damodar Valley Project 1948 : S. C. Bose
50. The Origin and Development of the Bengali Language Vol. I + II by Dr. S. Chatterjee
51. Akbarnama : Abul-L-Fazl—H. Beveridge (Tr)
52. The History and Culture of the Indian People, Vol. 1, by B. Mazumdar and Pulas Kar
53. Ain-I-Akbari : Tr. Blockmann.
54. Tabaqut-i-Nusiri, Vol. I+II, Minhaj Uddin (Tr) Ravery Major H. G
55. W.B. Dist. Records New Series Burdwan 1788-1802 Cal, 1985
56. The Tribes and Castes of W.B by Dr. A. Mitra 1953
57. Linguistic Survey of India Vol. V., Indo Aryan Family 1899 Eastern Group.
58. Dist Hand Book on Agricultural Marketing for the Dist. of Burdwan, Cal-1970.
59. West Bengal Forest : Centenary Volume 1964
60. Riazus Salatin : Golam Hossain Salim.

61. History of Bengal II : Jadu Nath Sarkar
62. The History of Man—Carlton Coon.

বাংলা :
১. বিষ্ণুপুরাণ
২. দিগ্বিজয় প্রকাশ
৩. বাঙালীর ইতিহাস (১ম পর্ব) ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
৪. আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক সংখ্যা (দোল) ১৩৮৫
৫. পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পূজা পার্বণ, ৫ম খণ্ড : ডঃ অশোক মিত্র
৬. ধর্মমঙ্গল : রূপরাম
৭. চণ্ডীমঙ্গল : কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, সম্পাদনা ডঃ সুকুমার সেন
৮. বর্ধমান নবাব হাটের ১০৮ শিবমন্দিরের দ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ
৯. বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী
১০. বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা : মৎপ্রণীত, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, ৩রা নভেম্বর ১৯৭২
১১. বর্ধমান জেলার ইতিহাস : বলাই দেব শর্মা
১২. বর্ধমান পরিচিতি : উদয়সঙ্ঘ
১৩. পশ্চিমবঙ্গ—বর্ধমান সংখ্যা ১৪০৩
১৪. কালনার ইতিহাস : দীপককুমার দাস
১৫. বর্ধমান জেলার মেলা : সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা—ডঃ গোপীকান্ত কোঙার
১৬. হরিহরমঙ্গল : পরাণচাঁদ কাপুর
১৭. বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ : ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার
১৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ডঃ সুকুমার সেন
১৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
২০. বর্ধমান পরিচিতি স্মরণিকা
২১. বাংলার ইতিহাস : (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২২. মধ্যযুগে গৌড় : শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ
২৩. মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : আশুতোষ ভট্টাচার্য
২৪. প্রবাসী-শ্রাবণ ১৩৪৬
২৫. সংবাদপত্রে সেকালের কথা : ব্রজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬. প্রাগৈতিহাসিক বাংলা : পরেশ দাশগুপ্ত
২৭. বর্ধমান পরিচিতি ১৯৫৮
২৮. পূজাপার্বণের উৎসকথা : ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত
২৯. দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫.১.৯৪
৩০. ধর্মমঙ্গল : মানিক গাঙ্গুলী

৩১. সাপ্তাহিক কাটোয়া : ১.৯.১৯৭২ — বঙ্কিম ঘোষের নিবন্ধ
৩২. ভারতের শাক্ত ও শক্তি সাধনা : ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৩৩. ইসলামের ইতিহাস : (২য় খণ্ড) সৈয়দ আবদুল হালিম
৩৪. বাংলাদেশের ইতিহাসের দুশো বছর : সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫. ইস্টার্ন ইন্ডিয়া—বুকানন হ্যামিল্টন (মার্টিন)
৩৬. গৌড়ের ইতিহাস : রজনীকান্ত চক্রবর্তী
৩৭. বাংলাদেশের ইতিহাস : ডঃ সুশীল মণ্ডল
৩৮. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ষোড়শ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
৩৯. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : বিনয় ঘোষ
৪০. গৌড় রাজমালা : রমাপ্রসাদ চন্দ
৪১. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড) : নগেন্দ্রনাথ বসু
৪২. Tabkat-i-Nasiri : J. Ravery
৪৩. বঙ্গীয় শব্দকোষ : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম ও ২য় খণ্ড
৪৪. বর্দ্ধমান সম্মিলনী—১৯৭৪
৪৫. বাংলাদেশের ইতিহাস—প্রাচীন ও মধ্যযুগ, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
৪৬. বঙ্গ অভিধান : যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৪৭. বর্ধমান পৌরসভা শতবার্ষিকী স্মারক পত্রিকা
৪৮. বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল শতবার্ষিকী স্মরণিকা
৪৯. বর্ধমান রাজ কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।
৫০. বর্ধমান পরিক্রমা : সুধীরচন্দ্র দাঁ
৫১. বঙ্কিম রচনাবলী—নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি
৫২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী—নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি
৫৩. বর্ধমান পরিচিতি : অনুকূল চন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী
৫৪. বর্ধমান পরিক্রমা : সুধীরচন্দ্র দাঁ
৫৫. বাংলা ভাষায় অভিধান : জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ, সাহিত্য সংসদ ১৯৭৯
৫৬. চণ্ডীদাসের পদাবলী : সম্পাদনা, বিমানবিহারী মজুমদার, পাটনা ১৯৬০
৫৭. বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়
পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি ১৩৮৬
৫৮. চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-১৩৮৫, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
৫৯. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৭৫ (১৩৮১)
৬০. বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি—১ম ও ২য়, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী
৬১. বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য, জিজ্ঞাসা
৬২. চর্য্যাগীতি : সম্পাদনা, সুকুমার সেন (১৯৭৩)
৬৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) : অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৪. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী (বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৮৩)
৬৫. আত্মচরিত : শিবনাথ শাস্ত্রী (বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৮৯)
৬৬. রাঙামাটি : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—বর্ধমান শাখার মুখপত্র—১৩৬৮, ১৩৬৯
বৈদিক যুগের বঙ্গ-মগধ জাতি : রাজমোহন নাথ বি.ই. তত্ত্বভূষণ
৬৭. মধ্যযুগের বাংলা : কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৮. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কথা : তমোনাশ দাশগুপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮
৬৯. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা-১৯৫৮
৭০. মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬
৭১. পুরাণ ও হিন্দু-সংস্কৃতি : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৌষ ১৩৩৯
৭২. মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল : রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০০ বঙ্গাব্দ
৭৩. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র
১৮৪০—১৯০৫ প্রথম খণ্ড—সম্পাদনা বিনয় ঘোষ
৭৪. সাপ্তাহিক দেশ : ২৫ / ৫ / ৩৯
৭৫. (”) : ৩.৫.৪৭
৭৬. (”) : ৯.১.৬৫—পৃ. ৯১৩, ৯১৭, ৯২৩, ৯৪৫
৭৭. (”) : ৬.৮.৬৬, পৃ : ৩১
৭৮. (”) : ৬.৭.৬৮, পৃ : ১০৮৫
৭৯. (”) : ২০শে আষাঢ় ১৩৭৬, পৃ. ১০৬১
৮০. (”) : ১১.৭.৭০, পৃ. ১১৯৯
৮১. (”) : ২৪.৭.৭২, পৃ. ১০০১
৮২. (”) : ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪, পৃ. ১৭
৮৩. (”) : ৬.২.৭৮ (২১শে মাঘ ১৩৮৪) পৃ. ৪৩
৮৪. (”) : ৩০শে অঘ্রাণ ১৩৮৫, পৃ. ১০
৮৫. (”) : ৭.৮.৮২, পৃ. ৫৩
৮৬. (”) : ২৫.১১.৮২, পৃ. ৬
৮৭. (”) : ৩১.১০.৮৭, পৃ. ১৯
৮৮. (”) : ১০.১১.৮৪, পৃ. ২৯
৮৯. (”) : ১৯.১.৮৫, পৃ. ১২
৯০. (”) : ৮.২.৮৬, পৃ. ৩৭
৯১. (”) : ২৯.৩.৮৬, পৃ. ৩৫
৯২. (”) : ১২.৪.৮৬, পৃ. ৮৬
৯৩. (”) : ১.৮.৮৭, পৃ. ৬০, ৬৯

৯৪. (") : ২৬.৯.৮৭, পৃ. ৩৭
৯৫. (") : ৩১.১০.৮৭, পৃ. ১৯
৯৬. সাপ্তাহিক দেশ ৯.৪.৮৮ পৃ. ৫৮
৯৭. (") : ১৬.৪.৮৮, পৃ. ৫৭
৯৮. (") : ১১/২/৮৯, পৃ. ৫৩
৯৯. দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৮, পৃ. ১৮৯
১০০. (") পৃ. ১৩৭
১০১. শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৩, পৃ. ১৭
১০২. পাক্ষিক দেশ ২২.৫.১৯৯৩, পৃ. ৩২
১০৩.(") ৩০.৭.৯৪, পৃ. ৬৫
১০৪. (") ১৫.৭.৯৫, পৃ. ২৫
১০৫. (") ১১.১২.৯৯, পৃ. ৮৬
১০৬. (") পৃ. ৯৭
১০৭. (") পৃ. ১২২
১০৮. পাক্ষিক দেশ ৩০.৭.৯৪, পৃ. ৬৫
১০৯. বর্ধমান সম্মিলনী
১১০. দুর্গাপুরের ইতিহাস : প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়
১১১. আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮৫
১১২. Agricultural Economy of Bengal : Dr. P. K. Roy

1. The History of Bengal Vol. II : Jadunath Sarkar (The University of Dacca, 1948)
2. History and Culture of Bengal : Dr. Atul Sur (1963)
3. An Advanced History of India : Mazumdar, Roychowdhuri and Dutta.
4 The Cambridge History of India, Vols. V + VI, H. H. Dodwell, S. Chand
5. Bengal under the Lieutenant Governors : C. E. Buckland
6. Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century.
7. An Account of the Religious sects of Hindus (1832) : M.H. Wilson
8. Bengal Gazetteer Burdwan Piterson 1910
9. Bengal Gazetteer Burdwan 1994
10. Annals of Rural Bengal : W. W. Hunter
11. History and Culture of the Indian People (Bombay), Vol. X
12. Reports on Vernaculer Education in Bengal and Biher 1835, 1836 and 1838

13. India-Today : R. Palme Dutta.
14. History and Culture of the Indian People, Vol. IX.
15. History of Mediaeval Bengal : R. C. Mazumdar
16. Selection from unpublished Records of Govt. Nos. 313, 324, 325.
17. Bengal Nawabs : Sir Jadunath Sarkar,
18. Alivardi and His Times : K. K. Dutta
19. History of Aurangzeb : Vol. V. Sir J. Sarkar.
20. The Early Annals of the English in Bengal : C. R. Wilson, Vol. I
21. Riyaz-S-Salatin : Ghulam Husian Salim
22. A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Bengal : M. Chakraborty.
23. Modern History of the Indian Chiefs, Rajas and Zamindars etc. Lokenath Ghosh
24. Bengal Historical Records : Burdwan (Vol.I+II) Ed. Asoke Mitra.
25. Dist Census Hand Book Burdwan 1951. Ed. Asoke Mitra
26. Economic History of Bengal : N. K. Sinha.
27. Statistical Accounts of Bengal. W. W. Hunter, Burdwan Dist.
28. Economics in Kautilya. B. C. Sen.
29. Indian Land System. Radha Kumud Mukherjee
30. Final Report on the Survey and Settlement operation in the Dist. of Burdwan. K.A.L. Hill
31. Bengal Past and Present 1910, Vol.VI
32. The Jatak : E. B. Cowell, Vol. V
33. The Tribes and Castes of W. B. : Dr. Ashoke Mitra.
34. Bengal in 1756-57, 3 Vols., S. C. Hill
35. Hist. of Bengal : C. Stuart, 1813
36. Early Annals of the English in Bengal : C.R. Wilson
37. Bengal Celebrities : History and Culture of Indian People. Vol. X.
38. Hand Book of Bengal Mission : Rev. James Long
39. History of Modern Bengal-I : R. C. Mazumdar
40. Tarikh-i-Nasiri by Minhajuddin translated by Abu-Umar-i-Usman, Vol. I + II, London 1881.
41. West Bengal Dist Records New Series Burdwan Letters Received 1788–1802, Cal. 1955
42. W.B. Dist. Gazetteers 1910 by Peterson
43. W.B. Dist. Gazetteers 1994
44. Dist Census Hand Book XIIA, XIIB, 1991
45. Statistical Accounts of Bengal—Burdwan Dist. (Reprint)— W. W. Hunter
46. Annals of Rural Bengal—W. W. Hunter.
47. Census of India 1911, Vol. V, by Malley, Cal. 1913

48. Census of India : 1971
49. Census of India 1961 XVI Part IIA General Population Tables
50. –Do– Part II-C(i) Social and Cultural Tables by J. Datta Gupta, Delhi 1966
51. A short Note on the progress of the Intensive Agricultural Dist. Programmes Burdwan Calcutta, 1971
52. Administration Report 1965–66 + 1966–67—Durgapur Development Report.
53. Burdwan : Brochure for the State Cabinet (Developmental Activities —Govt. of W.B. District office Burdwan (23.9.1972)
54. Travels of a Hindu, Vol.1, Bhola Nath Chunder (London 1869)
55. First Spark of Revolution. Fakir Ch. Roy (Orient Longman)
56. On Trade Union Movement : B T Ranadive (A Citu Publication, 1990)
57. Freedom Movement in Burdwan, 1800-1939, A Survey by, Bhaskar Chattopadhyay and Ramakanta Chakraborty.
58. Labour in W. B., Calcutta, 1972, Directorate of Labour.

১. বর্ধমান রাজবংশানুচরিত : রাখালদাস মুখোপাধ্যায়
২. বৃহৎ বঙ্গ : দীনেশচন্দ্র সেন—২য় খণ্ড
৩. বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ২য় ও ৩য় খণ্ড
৪. মুর্শিদাবাদের ইতিহাস : নিখিলনাথ রায়-১ম
৫. ক্ষিতীশ বংশাবলিচরিত
৬. রাজসভার কবি ও কাব্য—দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭. ভারতবর্ষের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)—কিরণ চৌধুরী
৮. সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম ও ২য়)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৯. ভারত গৌরব—(১ম) সুরেন্দ্রনাথ বসু
১০. বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ : রমেশচন্দ্র মজুমদার
১১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড : সুকুমার সেন
১২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - ৩য় খণ্ড, ১৯৮০, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩. চৈতন্যোত্তর—প্রথম চারিটি সহজিয়া—পুঁথি, পরিতোষ দাশ, ১৯৭২
১৪. বর্ধমান পরিচিতি : নারায়ণ চৌধুরী ও অনুকূলচন্দ্র সেন
১৫. বাংলা নাটকের ইতিহাস : অজিতকুমার ঘোষ, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৮৫
১৬. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (নাট্য সাহিত্য ১ম খণ্ড)
১৭. বাংলা ছোট গল্প (১৮৭৩—১৯২৩), শিশির দাশ, ১৯৬৩
১৮. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান—সাহিত্য সংসদ, সম্পাদক সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু, ১৯৭৬
১৯. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৮৪

২০. ভারতবর্ষ পত্রিকা— চৈত্র ১৩২৬
২১. „ — বৈশাখ ১৩৩৫
২২. „ — চৈত্র ১৩৪০
২৩. „ — মাঘ ১৩৪৬
২৪. „ — ভাদ্র ১৩৪৬
২৫. „ — কার্তিক ১৩৫৫
২৬. শারদীয় বর্ধমান — ১৩৮৪
২৭. ভারতবর্ষ — অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৪৯
২৮. বর্ধমান জেলার মেলা, সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা—ডঃ গোপীকান্ত কোঙার
২৯. বাংলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, নভেম্বর, ১৯৬৬
৩০. বাংলার ব্রতপার্বণ—ড. শীলা বসাক (মে, ১৯৯৮)
৩১. পূজাপার্বণের ইতিকথা—পল্লব সেনগুপ্ত, (মে ৯, ১৯৯০)
৩২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—বর্ধমান শাখার মুখপত্র, রাঙামাটি (১৩৬৯)-তে প্রকাশিত প্রবন্ধ—মোগল ও বৃটিশ আমলের সন্ধিক্ষণে বর্ধমান রাজকাহিনী—ড. পঞ্চানন মণ্ডল
৩৩. শারদ দামোদর—১৩৭০
৩৪. বাংলার ব্রত (বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ)—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রাবণ ১৩৫০
৩৫. একশত আট শিব মন্দিরের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উৎসব স্মরণিকা (১৯৮৯)
৪০. ত্রৈমাসিক লোকভারতী-পত্রিকা, (মাঘ-চৈত্র ১৩৮৭)
৪১. উদয় অভিযান (অক্টোবর, ১৯৭৩)—(কার্তিক ১৩৮০)
৪২. বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব ১৪০৭ (অন্বেষণ-বর্ধমান)
৪৩. Nalanda Year Book 1947–48
৪৪. পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি—পশ্চিমবঙ্গ সরকার
(তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ১৬/১২/১৯৭০)
৪৫. রাঙামাটি : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—বর্ধমান শাখার মুখপত্র ১৩৬৮, ১৩৬৯
৪৬. মোঘল যুগে কৃষি, অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ—গৌতম ভদ্র (১৯৮৩)
৪৭. মেয়েদের ব্রতকথা—প্রাণকৃষ্ণ পাল
৪৮. সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২১
৪৯. পৌরাণিক অভিধান—সুধীরচন্দ্র সরকার (আষাঢ়, ১৩৬৫)
৫০. বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য একাদেমী, নিউ দিল্লী
(১৩৪০-৪৫)
৫১. *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা—কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণ সংখ্যা-১৪০৬—*
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ
৫২. পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা—স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি (বিশেষ সংখ্যা)—
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৫৩. পশ্চিমবঙ্গ : নববর্ষ সংখ্যা ১৪০১ শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালি—
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার
৫৪. স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর (১৫/৮/১৯৭৩)—
(তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ পঃ বঃ সরকার)
৫৫. বাংলা পুঁথি—প্রথম খণ্ড, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও স্বাতী দাস সম্পাদিত
বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৯)
৫৬. রাঢ়ের গ্রাম দেবতা—মিহির চৌধুরী কামিল্যা (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)
৫৭. আঞ্চলিক দেবতা : লোকসংস্কৃতি —মিহির চৌধুরী কামিল্যা
(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)
৫৮. বঙ্কিম রচনা-সংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড (প্রথম ও শেষাংশ), পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা
দূরীকরণ সমিতি (এপ্রিল ১৯৭৩)
৫৯. রবীন্দ্র রচনাবলী—দশম খণ্ড, প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (মার্চ ১৩৮৯)
৬০. পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি—৩৯ তম রাজ্য সম্মেলন ১৯৯৮, স্মরণিকা
৬১. বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ —সৈয়দ শাহে-দুল্লাহ্
(সেপ্টেম্বর ১৯৯১)
৬১(ক). আজকের বোধন— ১৯৯১
৬২. পাঁচ অধ্যায় —রবীন সেন, মে ১৯৯৫
৬৩. দিনের পরে দিন যে গেল, ১ম ও ২য়—সুকুমার সেন (১৯৮২, ১৯৯৩)
৬৪. ভারতের সাধক (৬ষ্ঠ খণ্ড) : শঙ্করলাল রায় (১৯৯৬)
৬৫. পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ (১৯৫৮)
৬৬. পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৫ম খণ্ড, সম্পাদনা —ডঃ অশোক মিত্র,
আই.সি.এস
৬৭. শ্রীশ্রী বসন্তচণ্ডীমাতার আবির্ভাব ও ইতিবৃত্ত—বলরাম মাঝি
৬৮. শ্রীশ্রী ফৌজদারী কালীমাতার নামকরণ ও ইতিবৃত্ত —শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য্য
৬৯. শারদীয়া শিউলি পত্রিকা
৭০. বর্ধমান পৌর শতবার্ষিকী স্মরণিকা, (১৯৬৪-৬৫)
৭১. বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায় জীবনী—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৭২. প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসঙ্গ সঙ্গীত —শ্রী অনুপচন্দ্র দত্ত
৭৩. বর্ধমানের ইতিহাস—বলাই দেবশর্মা
৭৪. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র : সংবাদ প্রভাকর ২, বিনয় ঘোষ
৭৫. শিবনাথ রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড।
৭৬. বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য —ড. আবদুস সামাদ (সেপ্টেম্বর, ১৯৯১)
৭৭. বর্ধমানে সংস্কৃত চর্চা—শারদীয় বর্ধমান, ১৩৭৭, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
৭৮. বর্ধমানের ইতিহাস—প্রাচীন ও আধুনিক যুগ—নগেন্দ্রনাথ বসু
৭৯. স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় : ফকিরচন্দ্র রায় (১৯৭৮)

৮০. Burdwan District Congress Centenary, Vol. Published by
Congress Centenary Committee 1985.
৮১. পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, ৩রা নভেম্বর ১৯৭২
৮২. বর্ধমান সম্মিলনী হীরক জয়ন্তী, ১৯৭৪
৮৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ঠা জানুয়ারী ২০০০
৮৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০শে আগষ্ট ১৯৯৯
৮৫. লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার —ড. বরুণ চক্রবর্তী
৮৬. আনন্দবাজার পত্রিকা (জেলা পরিক্রমা), ৬ই জুলাই, ২০০০
৮৭. People's Democracy—Weekly organ of the Communist Party of
India (Marxist), May 14 2000
৮৮. বর্ধমান জেলা শাসকের পত্রাংক সংখ্যা ৬৫৬ /সি তাং ২৩.৪.২০০০
৮৯. শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত —শ্রীশ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ
৯০. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল —সম্পাদনা, সুকুমার সেন
৯১. Report on an enquiry into conditions of labour in the Coal Mining Industry in India. —S. R. Despande, Director of cost and living Indian Scheme Govt. of India 1945.
৯২. কালনার ইতিবৃত্ত—দীপককুমার দাস
৯৩. Traditional Arts and Crafts of West Bengal. —
A sociological Survey, Binoy Ghosh
৯৪. বাংলার লোকশিল্প-১ম ও ২য় খণ্ড, আশরাফ সিদ্দিকী
৯৫. পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব —সুধীর চক্রবর্তী

সাপ্তাহিক দেশ : সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, প্রবন্ধ সংকলন

১৪/৪/৩৪ আমাদের চড়ক, অমূল্য বিদ্যাভূষণ
১৪/৭/৩৪ ফুটবল, নগেন্দ্র অধিকারী
৭/১০/৩৯ প্রগতির স্বরূপ ও বাঙালী সমাজ, বিমল সিংহ
১৩/১১/৪৩ অক্ষক্রীড়া ও প্রাণিদ্যূত, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, বর্ধমান সংখ্যা, ১৪০৩
দেশ, কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা : ১৮৮৫-১৯৮৫
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় কংগ্রেস—অমলেশ ত্রিপাঠী পৃ. ৭
শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা—১৩৭১ পৃ. ২৬৭
দেশ, সাহিত্য সংখ্যা—১৩৭২ পৃ. ৬৫, ৯১, ১০৩
দেশ, সাহিত্য সংখ্যা—১৩৭৩ পৃ. ৫২
দেশ, বিনোদন সংখ্যা—১৩৭৭ পৃ. ২৮৫
অমৃত, নববর্ষ সংখ্যা—১৩৭৬ পৃ. ১১১-১১৬, ১৪৪
শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা—১৪০৫ পৃ. ৩১
জালরাজার গল্প (প্রতাপচাঁদ মহতাপ) সম্পর্কিত রচনা—গৌতম ভদ্র

পরিশিষ্ট-৩

নির্ঘন্ট

ব্যক্তিনাম

স্থাননাম